কাকলী আমার উঠে তব পানে
পাখীর গানের সম,
শকতি-বিচার করেনাক তার
ভকত বিহঙ্গম !
মহাকাশ-ধ্যানে বিভোর চেতন
যোগী জিনি একনিষ্ঠ
চিত্ত-কমলে তোমার চরণ
রাখ হে দেবি বরিষ্ঠ !
জয় তোমার, জয় তোমার !

সব ইন্দ্রিয় শ্রবণেতে লীন
হউক ঘুচায়ে বাদ,
মরমে মরমে করুক প্রবেশ
তব অনাহত নাদ !
বীণাবাদিনীর বীণার নিক্কন
অবিরাম মনোহর
শুনি অন্তরে বাহিরেতে যেন
হে প্রিয় পরাৎপর !
জয় তোমার, জয় তোমার !

সুরময়ী তুমি হে সরস্বতী,
তোমারি সুরের তার
বচনেতে মনে কায়েতে রচুক
সুরময় সংসার !
হোক্ মম প্রাণ একখানি গান
মানে লয়ে অবিকার,
জীবন হউক ছন্দোবদ্ধ
সুললিত ঝঙ্কার !
জয় তোমার, জয় তোমার !

শ্রীমতী সরলা দেবী।

ভাষার ডোর *

কাল অগ্রসর হয়েছে—বাঙ্গলাদেশ কালের পশ্চাতে পড়ে' নেই। এই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-তরীকে উন্নতি-সমুদ্রে বহুযোজন পথ উত্তীর্ণ করে এনেছে। আজ ১৭ বৎসরের সেই সমুন্নত প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের কর্ণধার মনোনীত হয়ে আমি কৃতার্থম্মন্য বোধ করছি। গত বৎসর ঠিক আজকার দিনে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য-সম্মিলনে সভানেত্রীরূপে আহূত হয়েছিলুম। স্বদেশে যে সম্মান কোন বঙ্গ-দুহিতা আজ পর্য্যন্ত লাভ করেননি, দীর্ঘপ্রবাসের পর বঙ্গে ফিরে আসবামাত্র সেই সম্মানের অধিকারী হ'য়ে, আজকের সভায় সভানেত্রী-পদের গৌরব-লাভে আমার দেশবাসী ও আমার ভাষাভাষী ভাইবন্ধুগণের স্নেহের পরিচয়ে অভিভূত হৃদয়ে, আনম্রচিত্তে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমাদের ভাষার জন্ম কবে কোথায় কেমন করে হ'ল কেউ ঠিক বলতে পারে না। এ বিষয়ে অনুমান মাত্র চলে। পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মানুষের সহজাত। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের বঙ্গভূখণ্ডবাসী আদিম মানুষের সহজাত যে ভাষাবীজ ছিল, তাই ক্রমে অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হ'য়ে বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে, এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত যাঁদের কথিত ভাষা ছিল, সেই আর্য্যনামধেয় জাতি যখন ভারতে বিস্তার লাভ করেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশীভাষা প্রচলিত ছিল। সেই দেশী ভাষাগুলি বিদেশী সংস্কৃত ও সংস্কৃতপ্রভ প্রাকৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'লেও, চেহারায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হ'লেও আজ পর্য্যন্ত সেই দেশী ভাষাই আছে। গৌড়ীয় ভাষা বা বঙ্গভাষা তাদের অন্যতম। হুঁকোর খোল ও নলচে দুই বদলে গেছে, কিন্তু হুঁকোটি সেই আছে। লিখিত ও কথিত বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অভিধানের সমস্ত শব্দসম্পদ আত্মসাৎ করেছে অথচ বাঙ্গলাই রয়ে গেছে। বাঙ্গলার নিজত্বের পরিচয় প্রথমতঃ নঞয়ের

* ১৭শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ।

শবসয়ের ও যজয়ের আবহমানকাল প্রচলিত অভেদে ; দ্বিতীয়তঃ তার শরীরে এখন পর্য্যন্ত এমন কতকগুলি আদিম শব্দের অবস্থানে যাদের সংস্কৃত বা সংস্কৃতপ্রসূ কোন শব্দের সঙ্গেই সৌসাদৃশ্য নেই ; এবং শেষতঃ কতকগুলি রীতিতে বা ছাঁদে যাকে বৈয়াকরণেরা গৌড়ীয় রীতি আখ্যা দিয়েছেন। খাঁজ বাঙ্গলার সংস্কৃত হ'তে স্বতন্ত্রতার সিদ্ধান্ত কল্পনাপ্রসূত নয়, অনুমানসাধ্য। অনুমানও একটি প্রমাণ যা যুক্তিযুক্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ববিদ্বজ্জনগণের বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনার স্থান এ নয়, যাঁদের সে বিষয়ে অভিরুচি জাগ্‌বে তাঁরা যেন স্বয়ং প্রাকৃতব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান খুলে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন।

বুদ্ধদেবের সময়ে, অর্থাৎ অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গলিপির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে ভাষার লিপি এত প্রাচীন, তার সাহিত্য প্রাচীনতর হবে সন্দেহ নেই। আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে পুরাণো যে বাঙ্গলারচনা পাওয়া গেছে তার বয়স অনুমান এক হাজার বৎসরেরও অধিক। সেটি রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপুরাণ বা শূণ্যপুরাণ। সে বাঙ্গলা আধুনিক বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য নয়। তার একটখানি নমুনা দিই :—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জলথল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহারা নহি পূজিবার দেহ।
মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অছি কেউ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পর্ব্বত পাহাড় নহি নহিক স্থাবর জঙ্গম॥
সুন্নথল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগরসঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আম্বার॥
বারবস্তু ন ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীর্থ থল নহি ছিল গআ বরানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
স্বগ্‌গ মর্ত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘতারাগণ
আউ মিত্ত নহি ছিল যমর তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধর্ম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী।

এক হাজার বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা যদি দুটি একটি শব্দ বাদ দিয়ে আমাদের সুবোধ্য হয়, তবে বুদ্ধের সমসাময়িক বাঙ্গলা দেড়-হাজার বৎসর পরের রামাই পণ্ডিত ও তাঁর সমকালীনদেরও দুর্ব্বোধ্য না হওয়ারই কথা। এইরূপে লোকসৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে পরম্পরায় প্রাপ্ত পিতৃপিতামহাগত এক এক ভাষা চলে' আসছে, পরিবর্ত্তমান হ'তে হ'তেও প্রত্যেক পুরুষে লোকসমাজে তারা ভাবের আদান-প্রদানের সহায়তা করছে ও সামাজিক জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখছে।

বাঙ্গলা-মাটির উর্ব্বরতা যেমন অসাধারণ,

বাঙ্গালী-মনের ভাবুকতাও তেমনি অসামান্য। সেই চিরাগত ভাবুকতায় বাঙ্গালীপরম্পরা ভাবের উত্তম বাহন মাতৃভাষাকে আঁকড়িয়ে ধরে' রেখেছে। যেমন বৈদিকযুগের আর্য্যভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষা লোপ পায়নি, তেমনি মুসলমান-যুগের ফার্সির প্রতাপেও বঙ্গভাষা আত্ম-বিসর্জ্জন করেনি। উত্তর-পশ্চিম হার মেনেছে, প্রাকৃত-হিন্দির পাশাপাশি উর্দ্দু নামক আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী লোকভাষাকে অর্দ্ধ রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে, এবং সেখানে নাগরী লিপির সঙ্গে আরবী লিপি আজ সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বাঙ্গলাভাষা ও লিপির অসপত্ন রাজ্য কায়েম রয়েছে। বাঙ্গলা দেশে পাঠান-মোগলের অভিযান প্রচণ্ড হ'লেও, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেকগুণে বৃদ্ধি পেলেও, বাঙ্গলার বুকের ভিতর উর্দ্দুর স্থান হয়নি, এবং বাঙ্গলা লিপির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আর কোন লিপি এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়নি। বাঙ্গালী মুসলমান হ'লেও বাঙ্গালী রয়ে গেছে। তার ভাবনা চিন্তা, ধ্যানধারণা, দুঃখসুখের অনুভূতি তার জন্মভূমির ভাষাতেই ব্যক্ত না করে' সে থাকতে পারেনি।

মোগলপাঠানেরা বঙ্গবিজয় করলেও বাঙ্গলা বাঙ্গালীর রইল। যদি দৈববশে বাঙ্গলার সীমান্ত প্রদেশে একটি অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে উঠ্‌ত, বাঙ্গলার বাহিরের কোন মুসলমান আর বাঙ্গলায় পদার্পণ করতেই না পারত, তবে কেবলমাত্র হদিশকোরাণসহায় বাঙ্গালী মুসলমান ও বেদপুরাণসহায় বাঙ্গালী হিন্দুতে ভাই ভাই এক ঠাঁই হ'য়ে, পরস্পরের জ্ঞানধর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও বলবীর্য্যের সাহায্যে এমন একখানি দেশ, এমন একটি জাতি গড়ে' তুলতে পারত, যা পৃথিবীর সকলের দর্শনীয় হ'ত। কামাল পাশার ধর্ম্মদ্বন্দ্বমুক্ত এক বলীয়ান্ তুরস্ক রাজ্যের তুল্য বাঙ্গলায় একটি নির্দ্বন্দ্ব সুডোল সুষম জাতি গড়ে' ওঠার সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান রয়েছে, কেননা বাঙ্গালী—হিন্দু ও মুসলমান—ভাষার ডোরে বাঁধা। হিন্দুমুসলমান বাঙ্গালীর গাঁটে গাঁটে ভাষার গিঁট—বড় শক্ত গিঁট। এ গিঁট আজ পর্য্যন্ত কেউ খুলতে পারেনি। আরব, ইরাণ, কাবুল, পঞ্জাব, দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের ধাক্কায়ও এ গিঁট আজ পর্য্যন্ত খোলেনি। বিদেশী বিজেতাগণ ইতর, অশিক্ষিত বাঙ্গালীর দেহে কোরাণের অত্যুগ্র মদিরা ঢেলে দিলেও, ভয়ে ও অজ্ঞতায় দলে দলে বাঙ্গলার অজ্ঞ সাধারণ ইস্‌লাম-পন্থী বনে' গেলেও বাস্তু-মাটির প্রেম তাদের ছাড়েনি, মায়ের বুলি তারা ভুলতে পারেনি। বিদেশী মুল্লাদের সততভাষণে অনেকগুলি পার্শি ও আরবী শব্দ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে' তাদের বাঙ্গলাকে কিছু বিকৃত করেছে বটে, কিন্তু তা বাঙ্গলাই রয়েছে, উর্দ্দু হয়নি। সেই বাঙ্গলায় মুসলমান চাষী ধান বোনে, সেই বাঙ্গলায় মুসলমান মাঝি দাঁড় টানে, সেই

বাঙ্গলায় মুসলমান মা শিশুদের ঘুম পাড়ায়, সেই বাঙ্গলায় মুসলমান যোগী দীক্ষা নেয়। হিন্দুমুসলমান দুয়েরই দরবারী ভাষা হ'ল ফার্সি, ঘরের ভাষা উভয়েরই রইল বাঙ্গলা, এবং সেই বাঙ্গলায় হিন্দুমুসলমান দুজনের প্রাণ হ'তেই নিঃসৃত হ'ল বাঙ্গলা সাহিত্য। কে বলবে নিম্নলিখিত গানটি পূর্ব্ববঙ্গের কোন হিন্দুর বা মুসলমানের রচনা ?

মনমাঝি সামাল্ সামাল্ ডুব্‌ল তরী
ভবনদীর তুফান ভারি !
তোর হেলে পেলনা জল,
তোর হেলে পেলনা জল, কি করবি বল,
কেমনে জোমাবি পাড়ি !
তোর হেলে ছয়খান দ'ড়ি যাচ্ছে ছিড়ি,
ঐ দ্যাখ্ পোটাস্ পোটাস্ করি!
ডুব্‌ল তোর ভগ্ন তরী হায় কি করি
কেমনে জোমাবি পাড়ি!
মাঝি তরঙ্গ হেরি সইতি নারি
তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি
বল্ দেখি কোন্ মাস্তিরি শিখায় তোরে
ওজগুবি এ মাঝিগিরি !

উপনিষদের দেবভাষায় প্রচারিত যে অপরূপ সত্যটি নিম্নের গানে ফুটে উঠে, বাঙ্গলা ভাষায় ব্যক্ত হ'য়ে, বাঙ্গলামায়ের মূর্খ সন্তানদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বিতরণ করছে, কি আসে যায় মুসলমান ভাবুকের চিত্ত হ'তে তা উদ্ভূত হয়েছে বা হিন্দুর ?

রূপ দেখিলাম রে নয়নে,
আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে।

সাহিত্য মনুষ্য-সমাজে মানুষেরই এমন একটি আত্মজ, যা গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে, জনপদ হ'তে জনপদান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে বিচরণ করে' মনে মনে, ভাবে ভাবে, কল্পনায় কল্পনায় মিলনগ্রন্থী বেঁধে দেয়। যা আমার ভিতর নেই তা তোমার কাছ থেকে এনে আমায় দেয়, যা তোমাতে নেই তা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে তোমায় দেয়।

যেমন মানুষের দুটী শরীর—প্রাণময় ও অন্নময়, একটির বিহনে আর একটির অস্তিত্ব লোপ পায়, তার আত্মজ সাহিত্যেরও তেমনি দুটি শরীর, একটি ভাবের ও একটি ভাষার। একের বিরহে অপরের অস্তিত্ব থাকে না ও দুয়ের মিলনে শরীরী সাহিত্যের প্রকাশ হয়। ভাবের প্রাচুর্য্য থাকলে ভাব নিজেকে ভাষায় খুঁজে বাহির করে' সাহিত্য-রূপ ধরে, আর ভাষার কুশলতা থাকলে ভাষাই ক্ষীণভাবকে পুষ্ট করে', সুপ্তভাবকে উদ্বুদ্ধ করে', নিগূঢ়ভাবকে বাইরে টেনেও সাহিত্যের সৃষ্টি করে। ভাব ও ভাষা দুয়েরই যেখানে অপ্রতুল, সেখানেই সমাজ সাহিত্যে অপুত্রক থেকে যায়।

সমাজ-সন্তান সাহিত্যের পিতৃকৃত্যে কৃতিত্বের পরিচয় আমরা বারম্বার পেয়েছি। বৈদিক যুগের সাহিত্য এককালে শুধু শ্রুতিগম্য ছিল। এই শ্রৌত সাহিত্যের তেজ, ক্ষমতা ও শক্তির কথা সর্ব্বজনবিদিত।

বৈদিক সাহিত্যই সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সভ্যতার ছত্রতলে এনেছিল। যে ভাষা নিজের ভাষা, সেই ভাষার সাহিত্যই সমাজের ভূরি-সেবক, কিন্তু পরভাষাবিৎ হ'য়ে, পর-সাহিত্যে প্রবেশপূর্ব্বক তার নিকট হ'তেও সেবা গৃহীত হ'তে পারে, যদিও তা কষ্টলব্ধ। তথাপি এইরূপেই প্রাচীন ভারতের আদিম-নিবাসী প্রাকৃত-ভাষীগণ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়ে তার নিকট হ'তে সেবা আদায় করেছিলেন।

যাঁদের মাতৃভাষা বৈদিকভাষা বা সংস্কৃতভাষা ছিল না, তাঁরাও আর্য্যভাষা শিক্ষা করে' আর্য্য-সাহিত্যের মর্ম্মগ্রাহী হ'য়ে আর্য্য-সভ্যতার অংশভাগী হয়েছিলেন। যেমন আমরা আজ-কালকার ভারতবাসীরা পাশ্চাত্যভাষা শিক্ষা করে', পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা আত্মসাৎ করছি। মানুষ নানা দেশের নানা ভাষা ও সাহিত্য হ'তে, নানা চিন্তা ও কল্পনা হ'তে যে পুষ্টি গ্রহণ করে, তা নিজের ও পরের দেশকে নিজেরই ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিদান করে। আমরা আধুনিক বাঙ্গালীরা বাহির হ'তে যা কিছু মানসিক খোরাক গ্রহণ করছি তা বাঙ্গলা সাহিত্যেরই পুষ্টি-বর্দ্ধনের কাজে লাগছে। আমাদের ভাবের প্রাচুর্য্য যত বাড়ছে ভাষাও ততই শক্তিশালী হচ্ছে। ঋদ্ধিপ্রাপ্ত ভাব ও ভাষায় মিলে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে' তুলছে এবং সম্পন্ন সাহিত্যই জাতির প্রত্যেকের জীবনের প্রসার বাড়াচ্ছে, তার জীবনী-শক্তিকে স্ফীত করছে। প্রাচীন কালেও তাই হয়েছিল। তখনও একবার প্রাচ্য তথা-কথিত অনার্য্য ভারতে পাশ্চাত্য তথা-কথিত আর্য্য সভ্যতার প্লাবন এসেছিল। প্রথমে আদিম ভাষাভাষীরা আর্য্যভাষা শিক্ষা করে', আর্য্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে' নিজেদের মানসভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকেন। ক্রমে আর্য্য-অনার্য্য-রক্ত যখন একাকার হ'য়ে ভারতবর্ষীকে অন্যান্য বর্ষের প্রজাগণ হ'তে স্বতন্ত্র করলে, তখন লোক-ভাষায় যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়ল, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যও লোক-হৃদয়ের ভাণ্ডার হ'তে ভাব ও চিন্তারত্নের সম্ভারে পূর্ণাবয়ব হ'ল। এইরূপে আদান প্রদানের দ্বারা উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হ'তে থাকল।

সংস্কৃত ভাষায় নিখিল ভারতে আদৃত বাঙ্গালীর রচিত কাব্য, দর্শন, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক গুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। বিদ্যাভিমানীরা সংস্কৃতে লিখতেন। লোক-সাধারণ মাতৃভাষায় লিখত। পণ্ডিতম্মন্যের কাছে তার আদর হবে না জেনে ভাবের আবেগে ঘরে-বসে-লেখা পুঁথি প্রায় ঘরেই থেকে যেত। বৌদ্ধযুগে দেশভাষার প্রতি পণ্ডিতদের আর অবজ্ঞা নেই দেখে লোকে সাহস করে' হয়ত আপন আপন রচনা তাঁদের সামনে বের করত—যেমন পৈশাচী 'বৃহৎ কথা'। পৈশাচী নামক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার রীতি গৌড়ীয় রীতির সঙ্গে সবচেয়ে মেলে বলে' প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা নির্দ্দেশ করেছেন—পৈশাচী বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ। শুনা যায় কোন আধুনিক মাদ্রাজী প্রত্ন-

তাত্ত্বিক এ বিষয়ে মতদ্বৈধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সন্দর্ভ আমি দেখিনি, সুতরাং যতক্ষণ তাঁর প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হচ্ছি, কিম্বা তাঁর যুক্তি সর্ব্বসুধীগ্রাহ্য হয়েছে বলে' না জানছি, ততদিন পূর্ব্বসুধীদের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়ে স্বীকার করব—পৈশাচী ভাষার অর্থ তদানীন্তন গৌড়ীয় ভাষা বা বঙ্গভাষা। তাই যদি হয়, তবে 'বৃহৎ কথা' বাঙ্গালীর সাহিত্যিক অধ্যবসায়ের একখানি বিপুল পরিচয়। 'বৃহৎ কথা'র অধিকাংশ পাণ্ডিত্যাভিমানী রাজার অনাদরে ধ্বংস হয়েছে, তার সপ্তমাংশ মাত্র কথাসারিৎসাগরে রক্ষিত হয়েছে। সে কথাসরিৎসাগর এখন সংস্কৃতে নিবদ্ধ, মূল বাঙ্গলা বিধ্বস্ত। চীন জাপানের সাহিত্য ও তিব্বতের 'তেঙ্গুর' যেমন ভারতের অনেক লুপ্ত সাহিত্যের সন্ধান দেয়, এই সংস্কৃত কথাসরিৎসাগরও তেমনি বাঙ্গলার লুপ্ত সাহিত্যিক জীবনের একখানি অলিখিত ইতিহাসের সম্পূর্ণ উপকরণ দান করে।

বাঙ্গালী ভাবময় জাতি। ভাবপ্রবণতা বা কল্পনা-জীবিতা তার সত্তার প্রধান উপাদান। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাতেই তা লক্ষ্য করা যায়। এই যে আজকাল শত শত মোটর-বাস্ দিনরাত কলিকাতা মেদিনী কম্পিত করে' দৌড়াদৌড়ি করছে, এদেরই শরীরে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের পরিচয় প্রতিভাত হচ্ছে। ইংরেজ, হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবী কোম্পানীর বাসের নাম নিতান্ত গদ্যাত্মক, বড়জোর মোটা মোটা ভাব-ব্যঞ্জক —যেমন 'ওয়ালফোর্ড এণ্ড কো' 'খালসা মোটর সার্ভিস', অথবা হদ্দ—'জয় সত্যনারায়ণ'—

কিন্তু বাঙ্গালীর কবিত্ব ব্যবসায়েও ফুটে বাহির হয়েছে,—কিবা নাম সব!—অপ্সরা, কিন্নরী, বিমান, নিয়তি, উদয়, প্রভা, শেফালী, বিজলী—আরও কত কি। শুধু কি ভদ্রলোকের ছেলে লেখা-পড়া শিখে কবিত্বে ভরা? তা নয়। বাঙ্গলার তাঁতিদের দেখ—কল্পনার দুখানি ডানা তাদেরও স্কন্ধে আঁটা আছে। তাঁতের ভিতর দিয়ে উনিয়ে বুনিয়ে কত রকম কবিকল্পনায় রঙিয়ে এক এক জাতের সাড়ীর নামকরণ হচ্ছে,—কেউ নীলাম্বরী, কেউ চাঁদের আলো, কেউ ফুর্‌ফুরে হাওয়া, কেউ গুলবাহার। আবার পাড়ের নামেও কত কল্পনার খেলা—কোনটি সতরঞ্চি পাড়, কোনটি রেলপাড়, কোনটি গঙ্গা-যমুনা, কোনটি রঙঢঙ।

তাঁতিপাড়া ছেড়ে যদি ময়রার দোকানে ওঠা যায় সেখানেও কল্পনা ও কবিত্বের গড়াগড়ি—'আবার খাবো,' 'রাজভোগ' 'মনোহরা' আরো না জানি কি। একটি টুকটুকে-লাল ক্ষীরের গোলার 'লেডিক্যানিং' নামকরণে মোদকজাতির একাধারে কল্পনা-শক্তি ও রাজরমণীস্তুতির পরিচয়ে রসদ্রব যিনি না হবেন তিনি নিশ্চয়ই বেরসিক।

বোধ হয় অনুসন্ধান করলে বাঙ্গালী শ্রমিকের প্রত্যেক স্তরেই—কাংস্যজীবী, মৎস্যজীবী, পর্ণজীবী—সকল শ্রেণীর মধ্যেই

এই কবিত্বের অথবা ভাবপ্রবণতার ছড়াছড়ি পাওয়া যাবে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলির মরা বঙ্গের প্রত্নতত্ব উদ্ধার ছাড়া—জীবন্ত বাঙ্গলার এই এক আধটা আধুনিক তত্ত্ব সংগ্রহেও কিঞ্চিৎ কালক্ষেপ করা উচিত।

ভাব এমন একটা জিনিষ যাকে আটুকে রাখা যায় না। ভাব নিজের প্রকাশের পথ খুঁজে বের করবেই। চিত্রে, মূর্ত্তিতে, স্থাপত্যে, গতিতে, স্বরে ও ভাষায়—নানা আধারে ভাব নিজেকে ব্যক্ত করে। দৈনন্দিন লোক-ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক-কেই নিজের অভিপ্রায় ভাষায় ব্যক্ত করতে হয়। কিন্তু অভিপ্রায় বা প্রয়োজনব্যঞ্জক ভাষা ও বিনা প্রয়োজনে শুধু ভাবব্যক্তির ভাষায় তফাৎ আছে। একটির ভিতর আছে শুধু আপাতদৃষ্টি ও শ্রবণ, অন্যটির ভিতর আছে এক অদৃষ্টশ্রুত-পূর্ব্বের অনুসরণ, সৌন্দর্য্যের অনুধাবন। প্রয়োজন-বাঞ্জনার জন্যে মোটামুটি ভাষাজ্ঞান চাই, ভাবব্যক্তির জন্যে চাই ভাষায় কলাবিৎ হওয়া—যে কলার নাম সাহিত্য-কলা, যা অন্যান্য কলার ন্যায় সৌন্দর্য্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা মানুষের চিত্তকে সুন্দরের জন্য লালায়িত করে' তোলে,—কল্পনায়, কার্য্যে, স্বপ্নে, জীবনে সর্ব্বত্রই সুন্দরের জন্য অনুগমন ও প্রতিষ্ঠা-ব্যাকুল করে।

মানবসমাজকে ব্যবহারিক ও হার্দ্দিক ঐক্যডোরে বেঁধে রাখার বিষয়ে ভাষার হাত যে কত বড় তার পরিচয় আমরা বাইবেলের টাওয়ার-অব-ব্যাবেলের উপাখ্যানে পাই। এ জগতে মানুষে মানুষে সদ্ভাবে বাস করছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে ভাষার ব্যবধান এসে পড়ল, কেউ আর কাউকে বুঝতে পারে না, কেউ কারো হৃদয়ে পৌঁছতে পারে না। সহৃদয়তার পরিবর্ত্তে তখন ঘোর দৌর্ম্মনস্যে ভুবন ভরে' গেল। এক ভাষা ভাষী মানুষে মিলে যে স্বর্গের সিঁড়ি রচতে বসেছিল, তা আর রচা হল না।

ভাষার ঐক্যের উপরই জাতীয়তা নির্ভর করে। বালিকা জোয়ান-অব আর্ক ফ্রান্সের মুক্তিকল্পে এই কথাটাই হৃদয় হ'তে অনুভব করেছিল। মূর্খ, গ্রাম্য ষোড়শী স্বদেশের দাসত্ব-মোচনে অনুপ্রেরিতা হ'য়ে, ভাবের আবেগে এই একটি সত্যের দর্শন পেয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারে যখন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ জোয়ান-অব-আর্ককে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার দেশ কোথায়? লোরেনের অন্তর্গত ডোমরেমিতে না?"

জোয়ান উত্তর দিল—"হাঁ তাতে কি আসে যায়? আমরা সবাই ফরাসীভাষী।"

সেনাপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন—"ইংরেজ সৈনিক কি ভীষণ লড়াই করে দেখেছ?"

বালিকা বললে—"তারা ত মানুষ। বিধাতা আমাদেরই মত তাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিজের দেশ ও নিজের ভাষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন নয় যে তারা আমাদের দেশে আসবে আর আমাদের ভাষা বলতে চেষ্টা করবে।"

সেনাধ্যক্ষ উষ্ণ হয়ে বল্লেন—"এ সব গাঁজাখুরি কে তোমার মাথায় ঢোকালে? সৈনিকরা তাদের প্রভুর অধীন, সে প্রভু বার্গাণ্ডির ডিউক, ফ্রান্সের রাজা বা ইংলণ্ডের অধীশ্বর যখন যেই হোক! তাদের নিজের ভাষার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

জোয়ান উত্তর দিল—"আমি তা বুঝিনে। আমরা সবাই বৈকুণ্ঠের রাজার অধীন; তিনিই আমাদের আপন দেশ ও আপন ভাষা দিয়েছেন, আমাদের তাতেই নিষ্ঠা চান। তা যদি না হ'ত, তবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও ইংরেজকে মারা নরহত্যা হ'ত, আর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবার ভয় থাকত তোমার। নরপ্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভেবো না, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভেবো।"

ব্ল্যাক প্রিন্স ও তার সৈন্যদের কথায় জোয়ান বললে—"ঈশ্বর তাদের জন্যে যে দেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং যে দেশের জন্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই স্বদেশে ফিরে গেলে ইংরেজরা ঈশ্বরের সুবোধ শিশু হবে। আমি ব্ল্যাক প্রিন্সের কথা শুনেছি। সে যে মুহূর্ত্তে আমাদের দেশে পাদক্ষেপ করে, শয়তান সেই মুহূর্ত্তে তার ভিতর প্রবেশ করে' তাকে দানব বানিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের দেশে—যেখানকার জন্যে সে সৃষ্ট—সে অতি ভালমানুষ। সব ঘটেই এই কথা। আমিও যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দখল করতে যেতুম, সেখানে বাস করতে ও সেখানকার ভাষা বলতে চেষ্টা করতুম, আমারও ভিতর শয়তান প্রবেশ করত।"

জোয়ান-অব্-আর্কের অবিচলিত ধারণা হয়েছিল যে, যে ভাষা যার, সেই ভাষা যে দেশে কথিত হয়, সেই দেশ তার। অতি সহজ সরল কথা। শিশুও বুঝতে পারে, অশিক্ষিত সৈনিকও বুঝতে পারে, গ্রাম্য নরনারীও বুঝতে পারে। আমার ভাষা যে বলে না সে আমার পর, আমার দেশ তার নয়, সে বিদেশী। বিদেশীর আমার দেশে আধিপত্য করা অস্বাভাবিক, এবং আমার দেশকে পরের অধীনতা থেকে মুক্ত করার কামনা আমার স্বাভাবিক।

যেখানে অন্ন পরিমিত, কিন্তু তার প্রার্থী অপরিমেয়, যেখানে জোর যার অন্ন তার, এই নীতি চলে, সেখানে জোয়ানের পরিকল্পিত ভাষাবিভাগে দেশ-বিভাগের দ্বারা আত্মরক্ষা চেষ্টা অনিবার্য্য। যে জাতি পরকৃত পীড়নে দুর্ব্বল, পরকৃত লুণ্ঠনে নিরন্ন ও পরচালিত নীতিতে ছিন্ন ভিন্ন, সে জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য আত্মভাষা ও পরভাষার মধ্যে ভেদের রেখাটি সুস্পষ্ট করে' টান্‌তে হয়। জাতীয়তারূপ সঙ্কীর্ণতাই সে জাতির ধর্ম্ম হয়। কিন্তু সে কাল-ধর্ম্ম মাত্র, চিরন্তন ধর্ম্ম নয়। জাতীয়তা প্রত্যেক জাতির সাধন, বিশ্বাত্মবোধ তার সাধ্য এবং সার্ব্বদেশিক ভাষাজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রীতিই তার উদ্বোধক।

মোগলপাঠান একই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেও যে যখন বঙ্গদেশকে ও বঙ্গভাষাকে আপন দেশ ও আপন ভাষা বলে জেনেছে সেই অপরের অভিযানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। হৃদিশেও আছে—

হুব্ বলে বতন মিনালে ইমান্।
দেশ-প্রীতি ধর্ম্মেরই অঙ্গ ॥

সুতরাং যেখানে যেই মুসলমান থাকুক, তার মানবধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ভাষার ঐক্যডোরে সে আর-যে-সব মানব-পরিবারের সঙ্গে হৃদয়ের ও ব্যবহারের সূত্রে বাঁধা আছে তাদের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে যে সে, পৃথিবীর অন্তত্রবাসী, অন্য ভাষাভাষী চীন, তাতার, আফগান, ইরাণ, রুম বা ভারতের স্বস্ব স্বার্থনিমগ্ন, মৎলবী মানুষদের পায়ে নিজেদের বলিদান করবে এটা স্বাভাবিকও নয়, সত্যও নয়। হাতে হাতেই দেখা গিয়েছে খিলাফৎবিপর্য্যয়ে তুর্কীর প্রাধান্য অপলোপের ভয়ে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের মুষ্টিমেয়মাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল—যে মুষ্টিমেয় বা অঙ্গুলিগণ্য ব্যক্তিরা খিলাফতের ধ্বজাধারী হয়ে নিজেদের নেতৃত্ব-পরিচালনের একটা মহাসুযোগ পেয়ে-ছিলেন। এও দেখা গিয়েছে স্বজাতির স্বার্থ পরিষ্কার ষোল আনা যে বোঝে সেই তুর্কী, ভারতীয় খিলাফতীর উচ্ছ্বাস যখন নিজেদের স্বার্থবিঘ্নকারী বুঝলে—তখন তাদের একেবারেই আমল দিলে না—হুঙ্কার করে উঠ্‌ল—'হঠ্ যাও, আমার আত্মরক্ষার জন্যে যা ভাল বুঝি তাই করব, তোমাদের নাকে কাঁদুনিতে কর্ণপাত করে' নিজের স্বার্থ নাশ করব না'।

তুর্কীর মত আমাদেরও বুঝতে হবে আমরা বাঙ্গালী হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই—সোণার বাঙ্গলা আমাদের জন্মভূমি, মধুঢালা বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা। হিন্দুমুসলমানে মিলে আমরা এই বাঙ্গলায় সাহিত্যের মণিমন্দির গড়ে' তুলব—যে সাহিত্যই আমাদের মানুষ করবে।

কথিতভাষায় মুখে মুখে দশ যোজন অন্তরে কিছু-না-কিছু তফাৎ হয়ে যায়; লিখিত ভাষা স্থির থাকে। কথিত ভাষা যখন লিখিত হয় তখন তার ভিতর নানা সংস্কার প্রবেশ করে, নানা নিয়মের আটে-ঘাটে সে বাঁধা পড়ে। সেই লিখিত সাহিত্যিক ভাষা দেশের আদর্শ ভাষা হয়। সে আদর্শ সকলের অনুবর্ত্তনীয় হয়ে সকলের কথিত ভাষার মধ্যেও একতার সঞ্চার করে। সূর্য্যের উদয়াস্তকালের তারতম্য অনুসারে পশ্চিমঘেঁসা বা পূর্ব্বঘেঁসা লোকদের ঘড়ির কাঁটা আগে পিছে হওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে সময়চুক্তি রক্ষার যে অসুবিধে হয়, তা দূর করার জন্যে যেমন ঘড়িতে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ঠিক করে নেওয়া হয়—সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুসারে সকলে চল্‌লে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারের সৌকর্য্য হয়, ভাষা সম্বন্ধেও তেমনি একটা আদর্শের অনুবর্ত্তন জাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় প্রতীত হয়। সর্ব্বজনআদৃত সাহিত্যের ভাষা দেশকে সেই আদর্শ দান করে। মুসলমানদের মধ্যে যত শিক্ষার প্রচার হবে ততই 'মুসলমানী বাঙ্গলা" উৎকর্ষ লাভ করবে, প্রাঞ্জল ও সুললিত হবে। বাঙ্গলায় উর্দ্দু বা ফার্সি শব্দের প্রবেশাধিকার যথেষ্ট আছে—কিন্তু জায়গা বুঝে এবং কায়দা করে'

তাদের প্রবেশ করাতে হবে যাতে বাঙ্গলার ধাতে মিলে যায়, কিম্ভুতকিমাকার না দেখায়, শ্রুতিমধুর হয়। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অনেক সময় চলিত ফার্সি শব্দ সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে, সংস্কৃত শব্দের অঙ্গে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে তার সঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও খট্‌কা লাগায়নি। নিম্নলিখিত গানটি তার দৃষ্টান্ত –

পাগল মানুষ চেনা যায়,
তার হাসি হাসি মুখ শশী
খুসী ফোটে চেহারায়।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
তার নাহি আপন পর।
সে জানে না দুনিয়াদারী—
ভালবাসে দুনিয়ায়।

এমন আরও অনেক হিন্দু কবি ও লেখক আছেন যাঁরা প্রচলিত ফার্সি শব্দের ভাণ্ডার থেকে অপর্য্যাপ্তভাবে গ্রহণ করেও বাঙ্গলার কায়দ্যুতি নষ্ট করেন নি, কিন্তু মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই ওজন ঠিক রাখতে পারেন না, তাঁদের হাতে আরবী ফার্সির অযথাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাঙ্গলার শ্রী অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর গদ্য প্রবন্ধে অনেক ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেন, স্থানে স্থানে তাতে ভাষার জোর বাড়ে, 'কত্ত কখন কখন বেকায়দা যে হয় না আঁটির মত গলায় বেধে যে না যায় তা নয়।

প্রয়োজনের ভাষায় তবু নানা দিক্‌দেশ থেকে শব্দ সংগ্রহ চলে, কিন্তু কাব্যের ভাষায় অর্থাৎ ভাবের ভাষায় শব্দনির্ব্বাচনী শক্তির কুশলতা অপরিহার্য্য। কবি নজরুলের সেই কুশলতা আছে। ভাবের তোড়ে তাঁর কবিতা অপ্রচলিত উর্দ্দ, শব্দবহুল হ'লেও খট্‌কা লাগায় না, চমৎকৃত করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান-কবির রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

মুসলমানদের সব কিছু কাজেকর্ম্মে 'ফাতেহা' নামক যে বোধনগীতি গীত হয়, কবি গোলাম মোস্তাফা কৃত তার নিম্নলিখিত অনুবাদটি মনোরম ও সর্ব্বজনবোধ্য।

তোমারেই মোরা করি প্রণিপাত,
তোমারেই মোরা পূজি দিনরাত,
তোমারি কাছে যাচি হে শক্তি—
মোরা যে শক্তি-হীন।
সরল সঠিক পুণ্য-পন্থা
মোদেরে দাও গো ব'লে।
চালাও সে পথে—যে পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চ'লে।
যে পথে তোমার চির-অভিশাপ,
যে পথে ভ্রান্তি—চির-পরিতাপ,
সে পথে যেন গো না চলি কখনো
এ জীবনে কোন দিন।

কিন্তু এর উপরের দুই চরণে মূল আরবী শব্দের ব্যবহারে বাঙ্গলাটি সুন্দর হয় নি। যথা –

তুমি হে খোদা, 'রহমান্-রহিম,'
'মালেকে ইয়াও মেদ্দিন্'
শত প্রশংসা তোমারি নামে
হে 'রাব্বিল আল্‌আমিন্'!

'মোহাম্মদী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় মুসলমান কবিদের দেখাদেখি হিন্দু কবির রচনায়ও 'খোদা' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গলাকে ক্লিষ্ট করেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বাঙ্গলায় 'খোদা'র স্থলে দ্বি-অক্ষর 'বিভু' শব্দ ব্যবহার করে' ছন্দের যতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার লালিত্য সাধন করতে পারেন। মনে করে দেখুন খৃষ্টান-বাঙ্গালী বাঙ্গলা কবিতা লিখতে গিয়ে ঈশ্বর অর্থে যদি "গড্" শব্দ ব্যবহার করেন তবে সে কেমন বাঙ্গলা হয়? পূর্ব্বোক্ত গোলাম মোস্তাফার "নবযুগ" নামক কবিতাটী বাঙ্গলা ভাষা হিসেবে প্রায় অনবদ্য। তার দুই একটি চরণ উদ্ধৃত করছি :—

আজকে এ কোন্ নূতন যুগের
নূতন আলোকে
ভারতভূমি উঠল' হেসে
পরম পুলকে!
নয়নে মোর পুলক লাগে,
হৃদয় কোণে কি গান জাগে!
কোন্ বাণী আজ ছড়িয়ে গেল
দ্যু'লোক-ভূলোকে!
নূতন নূতন—সবই নূতন,
নূতন এ দিনে,
নূতন মানুষ, নূতন গীতি,
নূতন এ বীণে!

বাঙ্গলা বানানে মুসলমান লেখকেরা 'স'য়ের স্থানে যে 'ছ' লেখেন, তাতে তাঁদের রচনার উপর 'মুসলমানী' টিকিট লেগে তা নিষ্প্রয়োজনে একঘরে হয়ে থাকে।

মোহাম্মদীতে একটি প্রবন্ধের শিরোনামা দেখলুম—"বুলবুলে বাঙ্গলা"। বাঙ্গলা-রীতি অনুসারে এর অর্থ হবে, "যে বাঙ্গলা বুলবুলযুক্ত"। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় আর কিছু,—তিনি ফার্সীরীতি লাগিয়ে "বুলবুলে বাঙ্গলা" এই পদের দ্বারা বোঝাতে চান "বাঙ্গলার বুলবুল।" এক ভাষার রীতি আর এক ভাষায় ঢোকান চলে না, বেমানান বা অর্থশূন্য হয়।

বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বাহন হ'লে, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল বাঙ্গালীর বাঙ্গলাই এক আদর্শের অনুগামী হবে, সমীকরণে বাঙ্গলার শ্রী ও শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। সেদিন বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাঙ্গলা-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজন হবে না। যাঁর মৃত্যু-সম্বাদে মুসলমান বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে, অনেকেই বোধ হয় জানেন না—সেই ইমদাদুল হক বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতী পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁর বঙ্গভাষা অতি বিশুদ্ধ সুললিত ভাষা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শুধু মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী নয়—এই নিখিল বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেরও শোক-প্রকাশ কর্ত্তব্য।

আবদর রহিমের মত মাতৃভাষার স্তন্যপায়ী পদস্থ বাঙ্গালী মাতৃভাষার হন্তারক হ'তে চাইলেও বাঙ্গলার উলেমারা আত্মহত্যা-কারী প্রস্তাবের প্রতিরোধ করে' বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গের অঙ্গবিচ্ছেদ বাঙ্গালী হিন্দুতে হ'তে দেননি, বঙ্গের ভাষা-

বিচ্ছেদ বাঙ্গালী মুসলমানে হ'তে দিলেন না। তুর্কীদের মত দেশ, বেশ ও ভাষা এ তিনেই এক হয়ে বঙ্গমাতার সব সন্তানগুলি যেদিন পাশাপাশি সৌভ্রাত্রভাবে দাঁড়াবে, ধর্ম্মভেদ যেদিন আর তাদের মর্ম্মচ্ছেদ করতে পারবে না, সেদিন বঙ্গসাহিত্যের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হবে।

"আসিবে সেদিন আসিবে।"
এই কবি বাণী সত্য হবে।

সপ্তকোটীমিলিতকণ্ঠে বল ভাই—
"আসিবে সেদিন আসিবে"

নদীবহুলা বঙ্গধরিত্রীর প্রতি নদীতট হ'তে, প্রতি বাঁক, প্রতি মোড় হ'তে প্রতিধ্বনি উঠুক্—

আসিবে সেদিন আসিবে।
ভেদরিপুনাশিনি মম বাণি
গাও সেই অমৃত গান।

গুজ্জরী *

(ধর্ম্মমূলক কাহিনী)

—*—

গুজ্জরী ছিল গোয়ালার মেয়ে। নদীর ওপারে তার বাড়ী। সে রোজ নদী পার হ'য়ে এপারে যখন দুধ দিতে আসত, তখন ব্রাহ্মণকে ভক্তি-গদগদ স্বরে বলতে শুনত—

"রামনাম দৃঢ়া নৌকা সংসারার্ণবতারিণী।

শুনে শুনে গুজ্জরীর অতিশয় ভক্তি হোল। একদিন সে তার কষ্টে-সংগৃহীত এক কেঁড়ে দুধ নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে রেখে ব'ল্লে, ঠাকুর, এই দীনার একটি প্রার্থনা আছে।

ব্রাহ্মণ বল্লেন, কি?

গুজ্জরী বল্লে, বলতে সাহস হয় না, কিন্তু না বল্লে নয়। প্রভুর ভগবদ্‌ভক্তি দেখে আমার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে, যে প্রভুকে গুরু করি। দুধ বেচেই জীবনটা কাটলো, পরকালের কিছু ব্যবস্থা যদি প্রভুর কৃপায় হ'য়ে যায়।

তার ধৃষ্টতার কথা শুনে ব্রাহ্মণের হাসি এলো। বল্লেন, গুজ্জরী, তা কি করে হয়?

* বিহারে প্রচলিত ধর্ম্ম-মূলক কাহিনী।

গুজ্জী জিজ্ঞাসা করলে, কেন হয় না প্রভু ?

ব্রাহ্মণ বল্লেন, তুমি যে জাতে অনেক নীচু, গুজ্জী !

গুজ্জী বল্লে, প্রভু আমি ত' ছোটই থাকতে চাই !

জবাব দেওয়া কঠিন। ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলেন। উপযুক্ত উত্তর যোগালো না। বল্লেন, ভেবে দেখব, আর একদিন এসো।

গুজ্জী রোজই আসে, রোজই প্রার্থনা করে। অবশেষে ব্রাহ্মণের মন টললো। তিনি গুরু হ'তে স্বীকার করলেন গুজ্জী শিষ্যা হ'ল।

গুজ্জীর কৃপায় গুরুর ভোগটা চলতে লাগলো ভালই। গুজ্জী রোজই দুধ, দই এনে গুরুকে পরিতুষ্ট করে। এমনি করে কিছুদিন যায়; তারপর গুজ্জী ধ'রে বসল যে একদিন তার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়ে প্রসাদ দিতে হবে।

মাঝে প্রকাণ্ড নদীটার সম্বন্ধে গুরুর ভয় ছিল। তিনি নানা উপায়ে গুজ্জীর অনুরোধ এড়িয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু গুজ্জী নাছোড়বান্দা, অবশেষ পর্য্যন্ত এড়ানো চললো না; গুরু নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন।

গুরু যাচ্ছেন আগে আগে, গুজ্জী পেছনে পেছনে। অবশেষে এলো সেই নদী।

গুরু ফিরে বল্লেন, গুজ্জী, এ পার হবার কি উপায় ?

গুজ্জী বল্লে, এর জল ত বেশী নয়, হেঁটেই পার হওয়া চলবে।

গুরু বল্লেন, সে কি কথা গুজ্জী ! সবাই জানে এ নদী অত্যন্ত গভীর, আর তুমি কি না বলছ, হেঁটে পার হওয়া যাবে !

গুজ্জী বল্লে, আমি ত রোজ হেঁটেই পার হই !

গুরু বল্লেন, কই দেখি কেমন হেঁটে পার হও !

গুজ্জী অনায়াসে হেঁটে ওপারে চলে গেল, হাঁটু পর্য্যন্ত ভিজলনা। ওপারে গিয়ে বল্লে, দেখলেন এবার আসুন।

গুরু একটু নামতেই বুকজল। চেঁচিয়ে বল্লেন, গুজ্জী একি কাণ্ড ?

গুজ্জী ওপার থেকে বল্লে, বলুন রাম নাম। আপনিই ত শিখিয়েছিলেন, রাম নাম দড়া নৌকা।

গুরু রাম রাম বলে আর একটু এগোতে গলাজল। হাবু ডুবু খেয়ে বল্লেন, গুজ্জী যাই যে!

গুজ্জী ততক্ষণে এসে তাঁকে ধরেছে। হেসে বল্লে ভয় কি ? চলুন আমার সঙ্গে। বলে গুরুকে হাত ধরে নিয়ে অনায়াসে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল।

গুরু তখন কাঁপছেন। আপনার আঁচল দিয়ে গুজ্জী তাঁর দেহের জল মুছিয়ে দেওয়ার পর কাঁপুনি কমল। গুরু বিস্ময়ের স্বরে ডাকলেন, গুজ্জী !

গুজ্জী হেসে বল্লে, প্রভুর বুঝি রামনামের শক্তিতে সন্দেহ হয়েছিল ? কিন্তু আপনার কাছেই শেখা, আমার ত কোনও সন্দেহ হ'লনা !

গুরু বল্লেন, গুরুজী অন্ততঃ একটা বিষয়ে আজ সন্দেহ ঘুচল। সেটা এই যে পৃথিবীতে গুরু হওয়া সহজ, কিন্তু সত্যকার শিষ্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"ঘর সামলাও" *

—:•:—

প্রায় ৮ বৎসর কাল আমি ইউরোপে বাস করেছি এবং ৪ বার যাতায়াত করেছি, আর গত ৩ বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী অন্যূন ৪০ হাজার মাইল আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছে, এমন কি গত ৩ মাসের মধ্যে হিসাব ক'রে দেখেছি—৮ হাজার মাইলের বেশী পর্য্যটন করেছি, এখন জীবনের সন্ধ্যা সময়ে সকল বিষয়ে আলোচনা করবার বড়ই স্পৃহা হয়েছে।

সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশবার আমার সুযোগ হয়েছে। বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের যারা বহু ক্রোরপতি ধন-মদে মত্ত তাদের থেকে যারা কুটীরবাসী তাদের সকলের সঙ্গে আমি সমানভাবে সংশ্রবে এসেছি। এই যে একটা নব জাগরণের তরঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়েছে, তার সঙ্গে-সঙ্গে, ঢেউতে নৌকা যেমন মাঝখানে হাবু-ডুবু খায়, উঁচু নীচু হয়, আমিও সেরূপ কিছু কিছু হয়েছি, অন্ততঃ নিজকে হ'তে দিয়েছি। কিজন্য আমরা অত পিছিয়ে আছি, এখন তা বুঝতে পারছি। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মত এক একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়, দেখা যায় শীঘ্রই সেটা শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায়। আমাদের অন্তরতম প্রদেশে তার ঢেউ প্রবেশ করতে পারে না। উপরে যেন ভাসা-ভাসা। তার কারণ কি তলিয়ে দেখতে হ'বে।

আমরা বাঙালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। কোন একটা কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে, যাকে বলে লেগে-পড়ে-থাকা, কামড়ে থাকা, তা থাকতে পারি না। এখান থেকে অনেকবার বলেছি—আমাদের আবেগ, উৎসাহ, ঠিক খড়ে আগুণ লাগছে যেমন খানিক দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে কিন্তু পরক্ষণেই

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বক্তৃতা।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, তার কিছু চিহ্নও দেখা যায় না, ঠিক সেই রকম, কিন্তু এমন কাঠ আছে, যেমন—তেঁতুল কাঠ, শাল কাঠ, একবার যদি জ্বেলে দেওয়া যায়, উপরে দেখা যায় ভস্ম আচ্ছাদিত কিন্তু ভিতরে একমাস দু'মাস পর্য্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকে। কারণ কি? বাঙালী জাতির মধ্যে এমন কিসের অভাব আছে যে কারণে আমরা কোন কাজে সে রকম সফলকাম হ'তে পারি না, আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়, একবার আলোচনা করে দেখা যাক।

হলাণ্ডের মত একটী দেশ, বোধ হয় বাংলার সামান্য একটী অংশ কেটে দিলে যা হয়—এক ময়মনসিংহ জেলার আয়তন হয় কিনা সন্দেহ, আবার তার অধিকাংশ সমুদ্র-গর্ভের নীচে, বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায়, হলাণ্ডের অর্দ্ধেক সমুদ্র-নিমজ্জিত হ'য়ে যাবে—এই ছোট দেশ যার অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মহাযুদ্ধ সাধন করছে, সেখানে প্রায় ৩ শত বৎসর আগে বিপুলকায় স্পেন প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল। যখন স্পেন সাম্রাজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যখন ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধেক স্পেনের পদতলে, যে স্পেন হ'তে রৌপ্য বোঝাই হ'য়ে এসে মুদ্রায় পরিণত হ'ত, যে স্পেন একদিন ইংলণ্ড বিজয় করতে প্রবল চেষ্টা করেছিল, সেই স্পেন অতি ক্ষুদ্রকায় হলাণ্ডকে কখনও জয় করতে পারে নি, সে তার প্রটেষ্টেণ্ট ধর্ম্ম বজায় রেখেছিল. এরই বা কারণ কি, আর আমরা এতবড় একটা জাতি, সংখ্যায় পাঁচ কোটী, আমরা জগতের কাছে উপহাসাস্পদ হই কেন? আমাদের ভিতর যে কত রকম দুর্ব্বলতা আছে, গলদ আছে, বাহিরের লোক—স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে না। মানুষ মানুষের হাতে খাবে না, তার ছায়া মাড়াবে না, হিন্দু-ভারতবর্ষের বাইরের লোক তা ধারণা করতে পারে না এমন কি এই ভারতবর্ষের মধ্যে সাঁওতাল কোল, ভীল, গারো তারা পর্য্যন্ত ধারণা করতে পারে না—মানুষ মানুষকে ছুঁলে অপবিত্র হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—কুকুরকে আদর করে' মানুষ কোলে করে, কিন্তু মানুষ কাছে এলে তথাকথিত উচ্চশ্রেণী যাদের বলি, তারা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে! সম্প্রতি মাদ্রাজে তথাকথিত একজন অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ভাবের আবেগে মন্দিরে অর্চ্চনা করবার জন্য পরিচ্ছন্ন হয়ে ঢুকেছিল। মন্দিরের সম্মুখীন হয়ে দেবতাকে প্রণিপাত করল, তারপর তার স্মরণ হ'ল সে অস্পৃশ্য, তখন সে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল আর কতগুলি লোক তাকে চিনে ফেল্লে এবং অমনি চীৎকার করে উঠল—মন্দির অপবিত্র হয়েছে—সর্ব্বনাশ হল, তখন তাকে চোর ডাকাত পরহন্তার মত পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হ'ল, বিচারপতি বোধ হয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন; সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁর জরিমানা হ'ল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রীযুত রাজগোপাল আচারিয়া—যদিও তিনি আদালতে প্র্যাকটীস বন্ধ

করেছেন, নিজকে সম্বরণ করতে পারলেন না, তার হ'য়ে উচ্চ আদালতে আপিল করালেন, আপিলে অবশ্য সে নিষ্কৃতি পেল কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারপতি আসল বিচার করলেন না। ইংরাজিতে যাকে বলে টেকনিকল গ্রাউণ্ড—এ যে ইচ্ছা করে অপবিত্র ক'রেছে—তার কোন প্রমাণ নাই—এই বলে নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করলেন। দেখুন, দেবতা অর্চ্চনা করতে মন্দিরের সম্মুখীন হয়েছিল, এই অপরাধে তাকে কত নিগৃহিত লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে, এই একটা ব্যাপার।

তারপর অনেক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা তুলতে আমি অনেকের ঘরে ঘরে ঘুরেছি, অবশ্য খুলনা দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ বন্যায় অজস্র টাকা পেয়েছি কিন্তু জাতীয় কাজে, নানাবিধ অনুষ্ঠান—যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হ'তে পারে—এমন অনেক রকম কাজে দেখেছি অর্থ পাওয়া যায় না—এর কারণ তলিয়ে দেখা দরকার হয়েছে। কথা এই—দেশাত্মবোধ জন্মেছে কয় জনের মধ্যে ?—মুষ্টিমেয় সামান্য কয়জন, যাদের আমরা শিক্ষিত বলি—তাদের মধ্যে। তাদের সংখ্যা কত ? জর্জ্জ দি ফার্ষ্টের সময় সিভিল ওয়ারের কথা আপনারা পড়ে থাকবেন। যখন ক্রমওয়েল হেমডেন প্রভৃতি জর্জ্জকে বাধা দিবার জন্য পার্লামেণ্টে অগ্রণী হলেন, তখন এক লণ্ডন সহরে যত ধনী সব একত্র হ'য়ে স্বদেশ-সেবকের পক্ষাবলম্বন করলেন, তাঁরা অজস্র অর্থ দিলেন আর যারা নবলমেন, যাঁরা রাজার পক্ষ অবলম্বন করলেন, তাঁরা অর্থ পেলেন না—তাঁরা সাধারণের সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত হলেন, সাধারণ লোকেরা নিজেদের গয়না, রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসন ইত্যাদি বিক্রী করে সাহায্য করতে লাগল, সহরে যারা ছিল তারা অজস্র অর্থ দিল। সেইরূপ স্পেন যখন হলাণ্ডের দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল বড় বড় সহরের যারা ধনী বাণিজ্য করে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করত, তারা সে টাকা দেশের কাজে নেতাদের হস্তে অর্পণ করল! কিন্তু আমরা অতি সামান্য টাকা পাই, কারণ কি ? আমাদের দেশে যাদের ভিতর দেশাত্মবোধ হয়েছে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কোন রকমে তারা দিনপাত করে, তাদের অর্থ দেবার সামর্থ্য নাই, বাংলা দেশে যাদের হাতে ধন, সে হচ্ছে—বড়বাজারের মাড়োয়ারী, ভাটীয়া; বাঙালীর মধ্যে সাহা, তিলী, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে কি না। সহানুভূতি কথা হচ্ছে দুটী কথার সংযোগে, স আর অনুভূতি। একটা সাড়া যখন জাতির ভিতর প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেমন পরিচালক ধাতুর ভিতর দিয়ে যায়, সেরূপ সেটা সমস্ত জাতিকে স্পন্দিত করে তোলে। আর অনুভূতি কিসের দ্বারা বুঝা যায় ? জাতি তখন হ'ল স, যখন সকলে একটা বিষয় সমান ভাবে ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন ওদের কাছে আবেদন

করি, তারা কিছু বুঝতে পারে না। বাংলার অঙ্গচ্ছেদের সময়ের কথা মনে করুন, সে আজ ১৭।১৮ বৎসরের কথা, যখন সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী পণ করলে, বিদেশী কাপড় পরব না, সে পণ কি টিকল? কেন টিকল না? শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র আর নিরক্ষর অশিক্ষিত, যারা কোন রকম দেশের কথা ভাবতে পারে না, তাদের সংখ্যা ৫ কোটী। চাষারা জিজ্ঞাসা করল—"বাবুরা এখন খোসামোদ করছে কেন—বিলেতী কাপড় পরিস না। বাবুদের বুঝি দরকার হয়েছে, আর কখনও ত তারা আমাদের কাছে আসে নাই", হেসে উড়িয়ে দিল। আসল কথা—আমরা কয়জন দেশের জন্য চিন্তা করতে শিখেছি, ওরা শিখে নি।

বাংলার অধিবাসী মোটামুটী ৫ কোটী, তার মানে ৫ শত লক্ষ, এর মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ২৫ লক্ষ প্রায় সমান সমান আর বৈদ্য এক লক্ষের চেয়ে কম, মোট ২৫।২৬ লক্ষ যাদের মধ্যে কিছু শিক্ষার বিস্তার আছে, তাহলে ৫ লক্ষের মধ্যে শতকরা ৫ জন মাত্র শিক্ষিত। বাকী ৯৫ জন কোথায়? তারপর যখন বলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ শিক্ষিত, তার অর্থ কি? অবশ্য যখন পাশের লিষ্টে দেখি, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় এরা অবশ্য উচ্চ শ্রেণী কিন্তু ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়জন চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত? পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দেখুন কত নিরক্ষর রয়েছে, প্রত্যেক কায়স্থ কি শিক্ষিত? বহুতর ঘর শিক্ষিত, আবার অনেক অশিক্ষিত আছে। কথায় বলে—জাত হারালে কায়েত, ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঁধুনী বামুন, পূজারী বামুন, ভিখারী বামুন আছে। মজার কথা, দেখুন—ব্রাহ্মণ শব্দ, আর ঠাকুর শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সম্মানসূচক কিন্তু বামুন-ঠাকুর বল্লে যাদের বুঝায় তারা যে খুব সম্মানীয়—মনে হয় না। হাসি পায় বটে, কান্নাও পায়, আমি ১৫।১৬ বৎসর আগে বক্তৃতা করতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে বাঁকীপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে একজন অধ্যাপক বল্লেন—বিহারে যদি অনুন্নত শ্রেণী বলতে হয়; সে ব্রাহ্মণ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও তাই, তারা দোবে চোবে পাঁড়ে, কলিকাতার বড় বড় বাড়ীতে দারোয়ানগিরি করে, তাদের পৈতা আছে, 'দিনান্তে ময়দা দলে' চাপাটী করে খায়, অন্ন-চিন্তায় কোন্ দেশ ছেড়ে কোথায় এসেছে। বিহারী ব্রাহ্মণদের আমরা উড়ে বামুন বলি, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যারা নেতা সব কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, পরলোকগত সাদিলাল এঁরা সকলে কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ, কেহ ১০০।১৫০।২০০ বৎসর ধরে বাস করছেন। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ গেল কোথায়? এদের অত হীন অবস্থা কেন, আলোচনা করা দরকার।

কথা এই—যখন কোন একটা সম্মান, কোন একটা সুবিধা, কি যা-কিছু অধিকার আয়ত্ত করি এবং সেটা যখন অভিজাত্যের

সম্মান বলে' জন্মগত করা হয়, বংশপরম্পরাগত করা হয়, তখন থেকে সে শ্রেণীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, তখন আর লেখাপড়া শিক্ষা হবে না, অথচ পূজা করব, দক্ষিণা পাব, সে জন্য আমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি ৫৪ বৎসর আগে কলিকাতা এসেছি। যখন স্কুলে আসতাম, দেখেছি রাস্তার পাশে লোক দাঁড়িয়ে থাকত ছোট ব্রতের বাটী নিয়ে, জিজ্ঞাসা করত—মশায়, আপনি কি ব্রাহ্মণ?—একটু পাদোদক দিন। এখন দেখা যায় না, সাবেককালের বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এখনও আছে—একাদশীর পর, ব্রতের পর পাদোদক পান না করে আহার করবে না। অর্থাৎ আমি যতই গণ্ডমূর্খ হই না কেন আমার যদি কতগুলি প্রভুত্ব থাকে, ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার আর নিজের কোন রকম চেষ্টা করবার দরকার হয় না, অলস হয়ে পড়ি, যেমন বংশগত জমীদার, দেখে দুঃখ হয়; সম্প্রতি আমাকে তাদের অনেকের কাছে যেতে হয়েছে, দেখেছি যেমন অলস তেমনি বিপুলকায়—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, কোন রকম ব্যায়াম করবে না, বেড়াবে না, মাটীতে পা স্পর্শ করবে না তাহলে তাদের অপমান হয়, তাতে হয় কি?—ব্যামো নিত্য লেগে আছে। অথচ বিলেতে যান—বহু ক্রোরপতি—কোন শ্রেণীবিভাগ নেই—ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাসে শ্রমজীবী ক্রোরপতি পাশাপাশি বসল আধ মণ ওজনের ব্যাগ নিয়ে, অথচ আমাদের দেশে যদি একটু অর্থ হয়, বাপ যদি কিছু রোজগার করে রেখে গেল, চৌদ্দ পুরুষ কাজে খতম, সে রকম যারা ব্রাহ্মণ বলে একবার কতকগুলি ক্ষমতা পেল, সমাজে যারা কুলীন হল—বল্লালসেনের সময় কুলীনের লক্ষণ দিলে—আচারোবিনয়োবিদ্যাপ্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং ইত্যাদি—একি কখনও হয়েছে? হয় না—কিন্তু কৌলিন্য বংশ-পরম্পরাগত হয়ে গেল। তাঁরা শাস্ত্রকথা বলেন, পূজা করেন, সব তাঁদের হাতে। প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিঙ্কিঙ উঠে গেল, নিজের পরিশ্রমে রোজগার করে থাকে—এ রীতি উঠে গেল। বল্লালসেনের পর কুলীন, নৈকষ্য কুলীনের প্রথার সৃষ্টি হল, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি—কুলীনের ছেলে ৫০।৬০টা বিবাহ করেছে, কখন কখন ৩।৪টা বালিকাকে এক পাত্রে একই সময়ে সম্প্রদান করা হয়েছে, এক সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে দেওয়া হল—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কথা এই—ব্রাহ্মণ বলে যখন কতগুলি দাবী দাওয়া করি আর তা যখন ২।৩ হাজার বৎসর ধরে চলে তখন সেখানে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত হল, যেমন শরীরের মধ্যে থাইসিসের বীজ নিহিত থাকে, বুঝা যায় না সেরূপ বংশানুক্রমিক কৌলিন্য প্রথার মধ্যে অধঃপতনের বীজ নিহিত থাকে। কিন্তু বিলেতে দেখুন আর্চ্চ বিশপ অফ কেন্টারবেরী, কত ধর্ম্মযাজক, তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, অন্যান্য সকল শ্রেণীর সঙ্গে তারা মাথা তুলতে পারে, খৃষ্টান মিশ-

নারীরা রামমোহন রায়ের সময় থেকে এ দেশে এসে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে কত সহায়তা করেছে, এখনও কত মিশনারী কলেজ আছে, ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী, ধর্ম্মযাজকের পদ বংশগত নয়, যে কোন লোক—খৃষ্টানদের মধ্যে বলুন, মুসলমানের মধ্যে বলুন—ধর্ম্মযাজক হতে পারে। আর আমাদের ধর্ম্মযাজক—মোহান্তগণের চরিত্র কি রকম বলবার প্রয়োজন নাই, আমাদের পুরোহিত—যাদের দ্বারা আমরা ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে থাকি—অনেকে সংস্কৃত জানে না, অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না, কোন রকম করে মুখস্থ করে, লক্ষ্মীপূজায় দক্ষিণা দু পয়সা কি জোর চার পয়সা, আর আলো চাউল, কলা গামছা বগলে করে অর্দ্ধেক মন্ত্র তাও উচ্চারণ করতে পারে না—করতে করতে চল্ল আরেক বাড়ীতে, মন্ত্র বুঝে না, ক অক্ষর গোমাংস, সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় নাই অথচ সে উচ্চারণ করলে তবে ভগবানের কানে পৌছবে, আমি তুমি করলে পৌছবে না—যতই আমরা সংস্কৃত জানি। তাদের স্বভাব চরিত্র কি রকম—শ্লোকেই আছে—পুরীষের পু, রোষের রো, হিংসার হি এবং তস্করের ত—এ সমস্তের সার পদার্থ লইয়া আমাদের পুরোহিতের সৃষ্টি হইয়াছে, বাণভট্টের আরেকখানি বইতে পেটুক ব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউয়েন্থ সঙ্গ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন তখন তিনি ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা দেখে গেছেন! এখন দেখুন ওদের ধর্ম্মযাজক আর আমাদের মোহান্তে কত প্রভেদ।

তারপর সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করছি।

মেকলে বলেছেন—ওদের মধ্যে যে কোন লোক পিয়ার পর্য্যন্ত হতে পারে। চোখের উপর দেখুন আমাদের ভাইসরয় লর্ড রেডিং—একদিন সামান্য লস্কর হয়ে জাহাজের মাস্তুলে উঠত, ডেক পরিষ্কার করত, এই রকম কাজ করতে করতে কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি জাতিতে জু, আজ তিনি ভাইসরয়; লর্ড চিফ্ জাষ্টিস ছিলেন, প্রতিভা বলে কিরূপ উন্নীত হয়েছেন। অনেক রকম দৌত্য-কার্য্যে যুদ্ধের সময় আমেরিকা-প্রেরিত হন, তাতে খ্যাতি অর্জ্জন করেন তারপর পিয়ার অব দি রিলম হয়েছেন। সুতরাং বিলেতের পিয়ার আর আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ে অনেক প্রভেদ। আমি যদি নৈকষ্য কুলীন—খড়দহের মেল হলাম, অন্য মেলের সঙ্গে আমার ক্রিয়াকলাপ হবে না, কি রকম গণ্ডীর ভিতর আমরা আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছি, প্রত্যেক পরিবার যেন এক একটী গড় কেটে চারিদিকে পরিখা করে রেখে দিয়েছে, পাছে বাহিরের শত্রু আসে, এ রকম করে করে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, আলোচনা করা দরকার।

আগে বলেছি ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ২৫৷-২৬ লক্ষ, মুসলমান প্রায় অর্দ্ধেক শতকরা

৫২, নমশূদ্র ২২ লক্ষ, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় মাহিষ্য প্রভৃতি রয়েছে বাগদী আছে, চামার আছে, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় আর এক সম্প্রদায়—যাদের মালী বলে—তারা আছে, তারাও এক রকম অস্পৃশ্য! থার্ম্মোমিটারের যেমন স্কেল আছে, আমাদেরও সে রকম স্কেল করে গ্রেডেশান করে দেওয়া হয়েছে। ১২।১৩ বৎসরের আগে আমি একবার সোসিয়েল কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হয়ে ছিলাম, তাতে বলেছিলাম মান্দ্রাজে পেরিয়া প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায়কে থার্ম্মোমিটারে স্কেলের মত বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা ক'রে রেখেছে তাদের মধ্যে দৃষ্টিদোষ আছে। তফাৎ থেকে দেখলেও খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবে, ফেলে দিতে হবে। মান্দ্রাজে একটা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে খায় পাছে নিম্ন শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিদোষ ঘটে, টেলিস্কোপ মাইক্রোসকোপ লাগিয়ে দেখলেও বোধ হয় ফেলে দিবে। মান্দ্রাজে বড় বড় পণ্ডিত আছে। নানাদিকে তাদের মাথা খেলে, কিন্তু মাথার ভিতর যেন ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেণ্ট আছে। সামাজিক প্রথা আর বিদ্যাবত্তা, তেল আর জলের মত আলাদা আলাদা থাকে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন বিদ্যা জাহির করতে হবে, বড় বড় বক্তৃতা করতে হবে, তখন তাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার কোন পরিচয় পাবেন না। সে তুলনায় বাংলা ত স্বর্গ, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে অহি-নকুল সম্বন্ধ, সেখানে অব্রাহ্মণদলকে জাষ্টিস পার্টি বলে, তাদের বড় বড় সভা হচ্ছে, কি করে যে সত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা পুনঃ লাভ করবে তার উপায় উদ্ভাবন করছে, মান্দ্রাজে মিনিষ্ট্রেল থেকে ব্রাহ্মণ বিতাড়িত হয়েছে, ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট। সেখানে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। সে একটা জারম ঢুকেছে। কিন্তু অক্টোবর মাসে আমি নাগপুর জব্বলপুর ও আমরাবতীতে গিয়াছিলাম, অমরাবতী বেরারের রাজধানী, বেরার মানে শূদ্র, তুলার চাষে সেখানকার ধন, তুলার দাম ক্রমাগত বাড়ছে, সব রায়তি বন্দোবস্ত, জমিদার নাই, তাদের আয় ১০।১২ হাজার টাকা, নিজেরা জোদ্দার কিন্তু তারা অনুন্নত শ্রেণী, যে রকম করে তারা আমাকে তাদের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করল, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। নিজেরা স্কুল করছে, এতদিন তারা অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এখন জাগরিত হচ্ছে, হৃদয়ে দ্বেষ-রাগ-হিংসা পোষণ করছে কিন্তু এখনও কিছু করে উঠতে পারছে না, সম্প্রতি কন্‌ফারেন্স করেছে। নিজেদের মধ্যে লোক নাই বলে মান্দ্রাজ থেকে অব্রাহ্মণ নেতাদের আহ্বান করে আনছে। সেখানে দেখলাম ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ, মানুষ মানুষের প্রতি এ রকম বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে, আগে জানতাম না। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম, ভেবেছিলাম সেখানে এখানকার মত কোন গণ্ডগোল নাই! জাতি-গঠনের অনেক সুবিধা আছে।

কাগজে দেখেছি—অমরাবতী এই করেছে, ঐ করেছে তারা রেসপনসিভ কো-অপারেশন করছে, কেউ বা ননকোঅপারেশন করছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম করছে জনকয়েক মাত্র মুধোলকার, যোশী, খাপার্ডে প্রভৃতি ৫।৬ জন লোক—যাকে ইংরাজিতে বলে—থ্রি টেলরস অব দি টুলীষ্ট্রীট, বাকী শতকরা ৯৯ জন অনুন্নত শ্রেণীর লোক যারা রক্তের ভিতর ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করছে। নাগপুরে ২টী কাপড়ের কল আছে, তাতে যারা খাটে তারা মাহারা—প্রায় পেরিয়া—অস্পৃশ্য। সেখানকার একজন ইংরাজ প্রিন্সিপাল আমাকে বল্লেন মাহারারা অন্ত্যজ শ্রেণী বলে ব্রাহ্মণেরা এমন ঘৃণার চক্ষে দেখে যে পশুর চেয়ে অধম বলে ব্যবহার করে কিন্তু তারাও মানুষ। একদিন একটী মাহারা ছেলে কলেজে এসেই প্রিন্সিপালকে বল্লে—আমাকে ছুটী দিন, গ্রামে যেতে হবে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে—আমি যদি একজন ব্রাহ্মণকে খুন করতে পারি—জীবনকে সার্থক মনে করব। ভাবুন, কি রকম বিদ্বেষ সেখানে। এর কারণ আমাদের সমাজের ভিতর গলদ আছে, সেটা দেখাতে চাই।

তারপর বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত। মোগল পাঠান অফগানের বংশধর কয়জন মুসলমান? আপনারা জানেন, মৌলানা আক্রাম খাঁ এবং আমাদের ঠাকুর বংশ এক বংশ। তাঁরা দিল্লীর নবাব সরকারে উচ্চ পদে কাজ করতেন, ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং এই অপরাধে হিন্দু-সমাজ তাঁদের সমাজচ্যুত করল। পিরালী ব্রাহ্মণের ইতিহাস আপনারা অবগত আছেন,—তাঁদের মধ্যে ধন আছে, বিদ্যা আছে, অশেষ জ্ঞান আছে, তাঁদের কত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে আছে আপনারা জানেন—হিন্দু-সমাজ তাঁদেরও সমাজচ্যুত করেছে। সেই মৌলানা আক্রাম খাঁর পূর্ব্বপুরুষ এই ভাবে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হয়ে থাকার চেয়ে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করা ভাল, এই বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। মুসলমানেরা কারো উপর জোর জবরদস্তি করে নাই। আপনারা বলবেন মুসলমান বাদশারা জোর করে' ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়েছে। তা যদি করত তাহলে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য এতদিন কোথায় থাকত, দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে যত দূরে যাবেন—ততই মুসলমানের সংখ্যা বেশী—যেমন চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি যায়গায় কোন রকম অত্যাচার এর কারণ নয়, এর কারণ—তখন অধিকাংশ লোকই কৃষি-জীবি ছিল, এরা অবনত শ্রেণী বলে' অত্যন্ত লাঞ্ছিত নিগৃহিত হ'ত। তারা হিন্দু-সমাজের কোন স্বত্ব স্বাধীনতা পেত না, পদদলিত হত। তারপর যখন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে বড় বড় মৌলানা এলেন তখন তারা সুবিধা দেখে গ্রামকে গ্রাম সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করল। আমাদের বাগের-হাটে দেখেছি—মুসলমান জমিদার (ঝুন-ঝুনওয়ালা ?)—এখনও তাদের শ্বেত

গম্বুজ রয়েছে, দিঘী রয়েছে, শত সহস্র হিন্দু সেখানে মানত করে, প্রতিবৎসর মেলা হয়, তাদের প্রতি সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা আছে, যদি অত্যাচার করত, যদি অসি-প্রয়োগে তাদের মুসলমান করত, তবে হিন্দুরা কখনও এই রকম শ্রদ্ধা প্রকাশ করত না, মেলাল সাহেবের কাছে হিন্দুরা মানত না করলে তিনি আপত্তি করেন. শ্রীহট্টের একজন মুসলমান পীরকে হিন্দুরা হজরত পর্য্যন্ত বলে থাকেন। রাগদ্বেষের ভাব থাকলে অত শ্রদ্ধা কখনও করত না। মুসলমান হলে সুবিধা কত! যেই মুসলমান হলাম, জুম্মা মসজিদে বাদশাই হউন, ফকিরই হউন, আর মুটেই হউন পাশাপাশি নমাজ পড়বে, আমির, ফকির এক পাত্র থেকে ভোজন করবে। কারলাইল বলেছেন—খৃষ্টান ধর্ম্মও ইসলাম ধর্ম্মের মত উদার নহে, যেদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলাম যে কোন শ্রেণী হউক না কেন, নিগ্রো কাফ্রী হউক না কেন, যে কোন পদবী লাভ করি না কেন, এক সঙ্গে বিবাহ ও আদান প্রদানে বাধা নাই, আর আমাদের চোখের উপর কি না কত হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করছে! মুসলমান ভাইদের বলি, ভয়ের কারণ নাই—৫০টা শ্রদ্ধানন্দ এলেও ৫জন মুসলমানকে হিন্দু করতে পারবেনা কিন্তু ৫০০ হিন্দু মুসলমান হচ্ছে চোখের উপর দেখছি। কত বিধবা কোন রকমে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছে, তার পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। আমি জানি, এক স্বামী তার পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে' অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর কন্না করছে। মর্ম্মপীড়িত পিতা ভাবল—এখন করব কি? হিন্দুধর্ম্মে বিবাহ-চ্ছেদ নাই, মুসলমান-ধর্ম্মে নিকা বিবাহ প্রথা আছে। তিনি মেয়েকে বল্লেন—তুমি ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন কর, তাতে তালাক করা যায়, বিবাহ খণ্ডন করা যায়। এই ভাবে মেয়ে আবার বিবাহ করল। ব্যাপার কি এখন বুঝুন। এভাবে ধর্ম্ম কয়দিন টিকতে পারে, ভাববার বিষয়। আজ হাজার হাজার বৎসর ধরে ব্রাহ্মণেরা সুবিধা ভোগ করছে, জাতিভেদের সে বিষময় ফল আমার ভোগ করছি।

মাড়োয়ারী কলিকাতায় বাস করে সুতরাং এক হিসাবে তারা বাঙালী, তাদের ধন বিদেশে চলে যায় না, এখানে তারা বসত বাটী করে আছে। সাহা, তিলী, সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক, এদের মধ্যে হতে ২।৪ জন শিক্ষিত আছে তাতে কিছু আসে যায় না। তিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর মত কয়জন আছে? কেহ কেহ বলেন তিলির মধ্যে অমুক শিক্ষিত আছে, যাহার মধ্যে অমুক শিক্ষিত আছে। আমি বলি তাতে হল কি? যতলক্ষ তিলি সাহা সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আছে, তাদের শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের পাশাপাশি রাখুন, কি

দেখবেন—শিক্ষিত সংখ্যা মাইক্রস্কোপিক মাইনরিটী। যখন জাতীয় জাগরণ আসে তখন সকল লোক যদি এক ভাবে দেশের জন্য ভাবতে পারে—যেমন লণ্ডনের বণিকেরা অজস্র অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল, যেমন হলাণ্ডের এণ্ডোয়ার্গ, লিজ প্রভৃতি করেছিল—তেমন যদি করতে পারত তবে সেটা জাতীয় জাগরণ হত। আমাদের নানা কাজে অর্থের প্রয়োজন, ওরা যদি শিক্ষিত হত এবং ওদের কাছে যদি আবেদন করতাম তোড়া তোড়া টাকা আসত, কিন্তু সব অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, কিছু বুঝেনা। আমার একজন ছাত্র রিসার্চ স্কলার ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের কাজে নেমেছেন, পূর্ব্ব বাংলার বিক্রমপুরের দিকে আছেন; সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় করে' দেহ মন প্রাণে কাজ করছেন, টাকা পান না। অথচ একজন বাবাজী এসে যদি বরাদ্দ করেন—এই এই চাই, তখন সকলে গিয়ে গললগ্নীকৃতবাসে বলবেন প্রভু কি করতে পারি, আপনার জন্য? তিনি প্রথমেই হুকুম করবেন—একসের গাঁজা চাই! তখন কে গাঁজা দিবে পরস্পর প্রতিযোগিতা হয়। গাঁজা খেয়ে বাবাজী বল্লেন—মহোৎসব করব, কাকে কাকে অধিকার দেওয়া হবে? এই রকম অবস্থা কুম্ভ মেলায় যান—বড় বড় মোহান্ত হাতী চড়ে একেবারে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হয়ে আছেন। বড় বড় ধনী মহাজন কৃতাঞ্জলীপুটে বলেন, প্রভু আজ যত লোক খাবে, আমার উপর অনুগ্রহ করে' ভার দিন। হুকুম হল—অত মণ ঘি, এই এই সরঞ্জাম। বাস্ চরিতার্থ হল। স্বর্গকে এরা যেন মৌরসী পাট্টার মত কিনেছে। সাহা, তিলী এরা কোন দেশহিতকর কার্য্যে দান করবে না, মহোৎসব, মন্দির-প্রতিষ্ঠা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ১০।২০।৫০ হাজার টাকা খরচ করবে। অমুক অত টাকা খরচ করেছে আমি কি কম?

একবার নাগপুরে গিয়েছিলাম. সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, বিপিন কৃষ্ণ বোস অনেক টাকা দিয়েছেন, গভর্ণমেণ্টও দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের নিকট একজন মাড়োয়ারী মন্দির করেছে, দুগ্ধফেননিভ মন্দির শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়ান হয়েছে, বহুদূর থেকে মার্ব্বেল পাথর এনে, ৮।১০ লাখ টাকা খরচ করে মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। বৃত্তি করে দিয়েছেন তাতে দেবার্চ্চনা, দেবসেবা চলবে। অবশ্য পরকালের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যে ব্যয় তার মত সদ্ব্যয় আর কি হ'তে পারে কিন্তু এরা দেশের কাজে টাকা দিবেনা। কথা এই—এই সব লোককে হিন্দু সমাজের যারা মস্তিষ্ক—ব্রাহ্মণ—তারা যদি পদদলিত, নির্য্যাতিত, অধঃপতিত করে' না রাখত, সমাজ কত বলীয়ান হ'ত। সকলে যদি সমানভাবে শিক্ষিত হত, সকলের মধ্যে সমবেদনা সহানুভূতির ভাব থাকত, আমাদের কোন কাজের জন্য অর্থের বা

সামর্থ্যের অভাব হত না। লর্ড ডাফরিণ বিদ্রুপ করে বলেছেন—কংগ্রেস যারা করছে মাইক্রসকোপিক মাইনরিটী। একথা ভাবতে হবে, শাসনকর্ত্তাদের কাছে জবাব দিতে পারি বা না পারি, নিজের কাছে কি জবাব দিব? আমরা যে একটা জাতি বলে পরিচয় দিই, সত্য সত্যই কি আমরা জাতি? আমাদের কি দুরবস্থা একবার ভেবে দেখুন দেখি। জাতিভেদ আমাদের কত সর্ব্বনাশ করেছে! সাহা সম্প্রদায়ের কথা বলেছি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ এমন একজন লোক হয়েছেন যাঁকে আমার তারা শিষ্য বলে' পৃথিবীর সম্মুখে গর্ব্বিত বক্ষে দাঁড়াতে পারি। মেঘনাদ সাহা সমস্ত বিদ্বজ্জনের কাছে, বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর কাছে তাঁর যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। দূরবর্ত্তী নক্ষত্র কি উপাদানে গঠিত, এতদিন ইউরোপ, আমেরিকার কেহ ঠিক করতে পারে নি, বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদরাও তা পারে নি। আজ জগতের সম্মুখে তা গূঢ়তম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে মস্তিষ্ক-চালনার ফলে যদি এতটা হতে পারে, তবে ৫ কোটী লোক মস্তিষ্ক চালনা করলে কত কিছু হতে পারত, জাতটা কত বড় হতে পারত, একবার ভেবে দেখুন দেখি। পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট উইলসনের একখানা বই আছে। তাতে তিনি বলেছেন—আমেরিকার বিশেষত্ব এই, রাস্তার মুটে, মেথর মুদ্দফরাসের কাজ আজ যে করছে সেও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। আমেরিকা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝে। কেহ সেজন্য কাহাকে উপহাস করে না, যে ছোট কাজ করে তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না, গ্রীষ্মাবকাশে রেলে ষ্টীমারে মুটে হয়ে হোটেলের খানসামা হয়ে টাকা রোজগার করে কলেজে পড়তে পারে। বহুক্রোরপতি—যেমন রক-ফেলার তাঁর ছেলের সঙ্গে যার অর্থ-সামর্থ্য-নাই তার ছেলে সহাধ্যায়ী হয়ে এক সঙ্গে থেকে এক কলেজে পড়ে; কোনরকম বিদ্রুপ ঠাট্টা করবার উপায় নাই, করলে তখনি তাকে বিতাড়িত করে' দেওয়া হয়—সে ভদ্রতার ব্যবহার জানে না। আমেরিকা কত বড় জাতি—সেখানে শ্রমের মর্য্যাদা—ডিগনিটী অব লেবার কত বড়। আর আমাদের দেশে ৷৷০আনা দিয়ে ইলসা মাছ কিনলে সেটা আনতে মুটেকে দিতে হয় আরো ৶০ আনা, সাহস করে' কেহ আনতে পারে না।

নরমেনরা যখন ইংলণ্ড দখল করে বসল তখন তারা বিজেতা, ইংলণ্ড বিজিত। বিজেতারা বিজিতদের জমিজমা জোর করে' দখল করে' নিল। নিয়ে মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত করল, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করল, বিজেতা-বিজিতের মধ্যে মারমারি কাটাকাটি চলল কিন্তু কিং জনের কাছ থেকে যেদিন মেগনাকার্টা আদায় করল, দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য শ্রমজীবি কৃষিজীবি সকলে মিলে

নিজেদের অধিকার আদায় করলে, যেকলে বলেন—সেই সময় থেকে ইংলণ্ডে বিজেতা-বিজিত ভাব চলে গেল। পরস্পর আদান-প্রদান চল্ল, জাতিগঠন হ'তে লাগল, তার ফলে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। আদান-প্রদান থাকলে মনোমালিন্য থাকতে পারে না, ৫০ বৎসর, জোর ১০০ বৎসর তার বেশী থাকতে পারে না, কিন্তু জাতিভেদের ব্যাপার দেখুন। শত শত বৎসর আগে যে কায়স্থ পদ্মার ওপার গিয়েছে, সে বঙ্গজ হয়েছে, পদ্মার এপার আর ওপারে, উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীতে বিবাহ হবে না, ১০০ বৎসর আগে গিয়ে যারা জমিজমা পেয়েছে, নানা রকম সুবিধা পেয়েছে তাদের সঙ্গে এদের বিবাহাদি আদান-প্রদান হবে না, এর ভিতর কোন রকম যুক্তি নাই। আমি পশ্চিমে নানা জায়গায় গিয়েছি। অনেক উকিল, ব্যবসাদার সে সকল জায়গায় আছে, এক একবার মেয়ের বিবাহ দিতে বেচারাদের ৬ মাস বরেন্দ্র ভূমিতে এসে থাকতে হয়, খোঁজ করতে হবে কোথায় বর পাওয়া যায়। আসা যাওয়ায় অনেক টাকা খরচ হয়। বোম্বাইয়ে ১০।১২০ জন বাঙালী আছেন, অবশ্য তাঁরা ব্যবসায়ী নন, চাকুরে, মেয়ের বিবাহ দিতে হলে ৫।৭ বৎসরে যা জমিয়েছেন, কলিকাতা এসে ৬ মাস থাকতে, ঘটক পাঠিয়ে খোঁজ খবর করতে, পরিবার নিয়ে যাতায়াত করতে, সব খরচ হয়ে যায়। জব্বলপুর নাগপুরে একই কথা। আবার আরেক রকম মুস্কিল আছে সেখানে বাংলা পড়াবার যো নাই, ২।৪ জন বাঙালী ছেলের জন্য শিক্ষক পাওয়া যায় না, তাদের লেখা পড়ারও অসুবিধা কিন্তু একজন ইংরেজ ফরাসী-দেশে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে, ফরাসীর মেয়ে বিবাহ করে, আবার ফরাসীরা ইংলণ্ডে আসে, আমেরিকার যায়, যেখানে যায় স্বচ্ছন্দে আদান-প্রদান করে, মুসলমানের মধ্যেও এই নিয়ম, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী, কোটর করে' প্রত্যেকে যেন এক একটী খাঁচার ভিতর চুপ করে' বসে আছি। এ হচ্ছে সর্ব্বনাশের কারণ, এই সব ভাবতে গেলে মনে হয় না আমাদের কোন আশা আছে।

১৮৭০ সালে জাপানের জাগরণ আরম্ভ হয়েছে, কাউন্ট ওকুমা প্রভৃতি জাপানের নেতারা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন জাপানে এনেছেন, এই ৫৫ বৎসরের মধ্যে জাপান পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের সমকক্ষ হয়েছে, এক আসনে পাশাপাশি বসছে, আমরা পারি না কেন? আমাদের ভিতর গলদ আছে কিন্তু আমরা সকল দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, ভাবি তাতেই বুঝি আমাদের দোষ ঘুচে যাবে। ভাববেন না আমি গভর্ণমেণ্টের খোসামোদ করছি, তা নয়, নিজের দোষ ধামা-চাপা দিয়ে রাখায় বিপদ আছে, ভিতরে পূতিগন্ধময় ক্ষত, উপরে মলম দিয়ে রেখে বলি আমার কিছু হয় নাই। কত রকম বন্ধন রয়েছে,

সার্জ্জিকেল অপারেশন দরকার। মলম দিয়ে হবে না।

খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় আমি একটী গ্রামে গিয়েছি, ভদ্রলোকের গ্রাম, জ্যৈষ্ঠ মাস, কয়েকজন যুবক এসে বল্লে মশায়, আপনি ত দুর্ভিক্ষে টাকা তুলতে এসেছেন, দেখে যান—কত বিধবা পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে, আজীবনের গচ্ছিত ধন নিয়ে আজ লাঙ্গলবঙ্গ তীর্থে যাবে। কথা এই—আমাদের দেশে অনেক বিধবা একবেলা অন্ন খেয়ে যে পুঁজিপাটা করে, এমন ভয়, তা কুলুঙ্গের ভিতর, কুটীরের মধ্যে রাখতে সাহস করে না, অনেক সময় মাটীতে পুঁতে রাখে। কোন রকম করে, ৪০।৫০।৬০ টাকা যেই করেছে, ভাবে একবার অর্দ্ধোদয় যোগে লাঙ্গলবঙ্গ কি শ্রীক্ষেত্র গিয়ে ২।৪ জায়গায় তীর্থ করলে, গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, পরকালের গতি সুনিশ্চয় হয়ে গেল, এই তাদের সংস্কার। আমি সে কথা বলছি না, আমি অর্থনীতির দিক থেকে বলছি, দুর্ভিক্ষের সময় এক একটা তীর্থ—যেমন চন্দ্রনাথ কি শ্রীক্ষেত্র যেতে হলে যেই রেলে কি ষ্টীমারে উঠলাম তখনি তার ১৪ আনা লণ্ডনে কি মেঞ্চেষ্টারে চলে গেল, যে ২ আনা রইল তা গরীব ষ্টেশন মাষ্টার, সারেঙ্গ খালাসী এরা ভাগ করে' নিল, এই যে প্রতি বৎসর তীর্থ-যাত্রায় কত লক্ষ কোটী টাকা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় হিমালয়ের উচ্চ শিখর বদরিকাশ্রম, আর কোথায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর—এই যে তীর্থযাত্রায় কোটী কোটী টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এতে কি দেশের দুরবস্থা আরো বাড়ছে না? অথচ সৎকার্য্যে টাকা পাওয়া যায় না, পরের হিত করা, জলাশয় করা, দীঘি পুষ্করিণী করা, রাস্তা ঘাট করা—একি ধর্ম্মের অঙ্গ নয়? পূর্ব্বকালে রাণী ভবানীর, বল্লালসেনের অনেক কীর্ত্তি আছে কিন্তু সে সকল লোপ পাচ্ছে। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মের একটা মূল ভিত্তি—

তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঃ

গ্রামে জলের অভাবে ক্রন্দন আরম্ভ হয়েছে, কলেরা দেখা গিয়াছে, রাস্তা ঘাট নাই, সেদিকে দৃষ্টি নাই, যদি বুঝতাম—রেল ষ্টীমার নাই—যেমন ৫০।৬০ বৎসর আগে ছিল না—মাঝি মাল্লার ঘরে টাকা যাচ্ছে, দেশের টাকা দেশে রয়েছে, তা হ'লে এক রকম ভাল ছিল, তীর্থযাত্রার ন্যায় অন্যায় এখানে বলছি না যদিও ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির থেকে বল্লে কেহ দোষ দিতে পারবে না! কত রকম সর্ব্বনাশ আমাদের হচ্ছে, এই যে একটা বিশ্বাস—আমার উদ্ধার হউক, এর ভিতর কত বড় স্বার্থপরতা রয়েছে, দুনিয়া উচ্ছন্ন যাউক, আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে, কুম্ভমেলায় গিয়ে, গয়ায় পিণ্ড দিয়ে, গঙ্গাসাগরে স্নান করে, প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে স্বর্গে যাব—এই যে অন্ধ সংস্কার রয়েছে, এ অপনোদন করতে পারলে কত উপকার হয়। আমরা আমেরিকাকে বলি জড়বাদী,

আর আমরা আধ্যাত্মিক জাতি। আমেরিকায় অনেক ধনকুবের আছে, তাদেরকে মিলিয়নিয়ার বল্লে অপমান হয়, তারা মাল্টি-মিলিয়নিয়ার, রকফেলার প্রভৃতি অনেক ধনকুবের রয়েছেন, এঁরা প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা দান করেন। রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের জন্য, ইউনি-ভার্সিটির জন্য, হাসপাতালের জন্য এঁরা কোটী কোটী টাকা দান করছেন। এণ্ড্রু কর্ণেজী বহু লক্ষ টাকা যাঁর দৈনিক আয়, তিনি সমস্ত টাকা পরোপকারের জন্য ব্যয় করেন। যে সমাজ থেকে কুশিক্ষা কুসংস্কার বিদুরিত হয়েছে—সে সমাজে কল্যাণকর কাজে, দেশহিতকর কাজে অজস্র অর্থ আসে, আমাদের দেশ আমাদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, মাড়োয়ারী বলুন সাহা বলুন, তিলি বলুন, কি তথাকথিত উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য বলুন যাদের লক্ষ্মী আশ্রয় করেছে তাদের কাছ থেকেও আমরা সাহায্য পাই না, তবে মাড়োয়ারী সম্বন্ধে আমি বলতে বাধ্য—নইলে অকৃতজ্ঞ হব—যেখানে দুর্ভিক্ষে নরনারী মরছে কিম্বা বন্যা-পীড়িত হয়ে মানুষ যেখানে না খেয়ে মরছে শুনলে মাড়োয়ারী-হৃদয় বিগলিত হয়, মুক্ত হস্তে তারা দান করে, তাদের কাছ থেকে তোড়া তোড়া টাকা পেয়েছি—একথা বলতে আমি বাধ্য। তারপর পাসি'রা সংখ্যায় বোধ হয় ১ লক্ষেরও কম, তারাও দেশের কাজে দান করে, ভাটীয়াদের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার হচ্ছে, ভিটল দাস ঠাকুর ইউনিভার্সিটীর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন, আরেক জন ১৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, আরো অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে, শিক্ষিত ভাটীয়ার সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তাই বলছি একটা জাতির সকলের মধ্যে সমান ভাবে যদি লেখাপড়ার বিস্তার না হয়, আদান-প্রদান না হয় সে জাতির উন্নতি হতে পারে না, ১৮৭১ সালের আগে জাপান আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল, সামুরাই বলে' এক ক্লাস ছিল, তারা জাপানের মস্তকস্বরূপ ছিল, আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ সেরূপ। তারা দেখল বিদেশীরা জাপানে ঢুকতে চায়। ১৮৫৩ সালে তারা জাপানের এক বন্দরে এসে উপস্থিত হ'ল, বল্ল—আমাদিগকে যদি অবাধ ব্যবসা করতে না দাও—জোর করে ঢুকব, কামানের সাহায্যে ঢুকব। তখন জাপানের চোখ ফুটল। তারপর ১৮৭০ সালে সামুরাই সম্প্রদায় তাদের সমস্ত ক্ষমতা, অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত ক্ষমতা,—তাদের হাতে যত ক্ষমতা ছিল, রাজার হাতেও তত ছিল না—সব ক্ষমতা রাজার হাতে অর্পণ করল। তারা দেখল—ফিউডেল সিষ্টেম থাকলে জাপান বিদেশীর সঙ্গে পারবে না, তখন সকলে নিজে স্বেচ্ছায় সম্রাটের চরণে তার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করল, সম্রাটকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করল, সামুরাইদের সংখ্যা জাপানের লোক সংখ্যার ১/১৬ আমাদের ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ যেমন ১/১০। সামুরাইগণ

দেখল সমস্ত জাতি যদি এক হতে না পারে, সাধারণ লোকে যদি তাদের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়—স্বএর অনুভূতি তারা পাবে না, মস্ত একটা অনুলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দেশের মধ্যে থাকবে। ৫০ বৎসর আগে জাপানেও একটা অস্পৃশ্য জাতি ছিল যাদের আমরা ডোম চামার বাগদী, হাড়ি মুচি বলি, তারা এই রকম ঘৃণিত ছিল, ১৮৭১ সালের ১২ অক্টোবর জাপানের একটী স্মরণীয় দিন। আভিজাত্য-দর্পে দর্পিত সামুরাই জাতি সেদিন এদেরকে আলিঙ্গন করল, বল্ল—আজ থেকে সমস্ত জাপান এক, আজ থেকে অস্পৃশ্য অনুন্নত ও আভিজাত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ভাই!—বলে সকলে সকলকে আলিঙ্গন করল। আর আমাদের অবস্থা দেখুন, বিক্রমপুরের বৈদ্যদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈদ্যের ক্রিয়াকর্ম্ম হবার যো নাই। একজন ইংরেজ গণনা করেছেন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫ হাজার শ্রেণীবিভাগ আছে, কেহ কারো সঙ্গে খাবে না, কলেজ অব সায়েন্স এবং বেঙ্গল টেকনিকেল কলেজে আমরা দেখেছি ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন উনুন করে রাঁধছে। বল্লাম "আচ্ছা,তোমাদের সকলেরই ত পৈতা আছে, সকলেই ব্রাহ্মণ—কেন এই রকম অকারণ কয়লা পোড়াও, পালা করে রাঁধ না কেন?" "বাবু, জাত যাবে এ বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কনৌজী ব্রাহ্মণ, সে গয়ালী ব্রাহ্মণ, কারো অন্যের হাতে খাবার যো নাই।" শিক্ষিত হয়েও আমরা এ সব দোষ ছাড়তে পারি না। পাড়াগাঁয়ে যেখানে সমাজপতিরা আছে, এদিকে বড় বড় বক্তৃতা করবে—"জাতিভেদ দেশের সর্ব্বনাশ করল" তারাই তলে তলে ঘোঁট পাকাচ্ছে, তারাই সর্দ্দার, নাম করতে পারি করব না, আমার কাছে লিষ্ট আছে, আর যাদের যত লম্বা শিখা, তাদের ধার্ম্মিকতা তার ইনভার্স রেসিও। বরিশাল কলেজে কি রকম হয়েছে আপনারা শুনেছেন। আমি ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি, রমনায় যে বাড়ীতে থাকতাম, তার বারান্দা থেকে রমনা কালীবাড়ী সন্নিকট, সন্ধ্যাকালে সেখানে আরতি হয়, ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হয়। আশ্চর্য্য এই কালীবাড়ী থেকে ২।৩ রশি দূরে গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে, কোন কালের জাহাঙ্গীরের সময়ের, সয়েস্তা খাঁর সময়ের। তারা যদি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করত কালীবাড়ী হতে পারত না। ২৫০ বৎসর আগে তাদের প্রাধান্য থাকবার কথা অথচ তখন ২।৩ রশি ব্যবধানে নমাজ হত, আরতি হত, ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজত, কিন্তু এখন ঘোরতর বিবাদ, সর্ব্বদা হৃদকম্প হয়—নূতন কোথায় কি বাধল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে, হিন্দু-মুসলমানে আত্মঘাতী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর কারণ কি? রোগ-নির্ণয় না করলে চিকিৎসা হতে পারে না, তাই বলছি—ঘর সামলাও; বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী অনিষ্টকারী, বল্লালসেনের সময় থেকে কৌলিন্য-প্রথা আভিজাত্যের

গর্ব্ব আমাদের রক্তের ভিতর প্রবাহিত হয়ে আসছে, অন্যকে কোন অধিকার দিব না—এভাব আমাদের ভিতর রয়েছে, এ ভাব থাকলে উন্নতি হবে না, কোন কালে হবে না। জাপান দেখুন কি রকম করে পৃথিবীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্পৃশ্যতা জাতিভেদরূপ বিষম পাপ কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর কুত্রাপি পাবেন না। একজন বিখ্যাত ইংরেজ বলেছেন সমস্ত পাপের মধ্যে অস্পৃশ্যতাই মহাপাপ। মানুষ মানুষকে ছুঁয়ে খাবে না—এত ঘৃণা-এত দম্ভ ভগবান সহ্য করেন না তাই আমাদের এই দুরবস্থা।

আমরা ব্রাহ্মণের হাতে খাই, উড়িষ্যা থেকে কি বিহার থেকে পৈতা গলায় দিয়ে একটা লোক এলে আমরা তার হাতে খাই, সে ডোম চামার কি বাগ্দী সে খবর রাখিনা, তাদের অনেকে অনেক রকম দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগছে।

২০০০ হাজার বৎসর আগে যারা আমাদের সমাজ গঠন করেছিল, হয়ত তখন তার প্রয়োজন ছিল। যখন বিজেতা এসে বিজিতদের মধ্যে বাস করে তখন হয়ত আইন কানুনের কঠোরতার দরকার ছিল, এখন সে সকল বজায় রাখবার চেষ্টা করলে তার বিষময় ফল উৎপন্ন হবে। গত সপ্তাহে দেখলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে—'ফেল ইন লাভ উইথ এ গার্ল'—মেয়েটী কায়স্থ হতে পারে। কাজেই বিবাহ হবার যো নাই, সমাজ বাধা দিল, বেচারী ছেলে আত্মহত্যা করল। আলো ও ছায়ার কবি লিখেছেন…

সংসারে… বাঁধিলে হাতে
বাঁধিতে নারিলি হৃদয়ে হৃদয়ে।

আমাদের দেশে যত রকম কৃত্রিম নিয়ম আইন কানুন তৈয়ার করে' বাঙলী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা প্রমাণ করছে। এক সময় বলেছি—রঘুনন্দন যে সময় গবেষণায় ব্যস্ত ছিল—৯ বৎসরের বালিকা বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করলে কোন নরকে পতিত হবে, কত পুরুষ নিরয়গামী হবে, অমুক সময় নৈঋত কোণে একটা কাক কা কা করে ডাকলে তার কি ফল হবে, সে সময় ইউরোপে গেলিলিও, নিউটন কি সব আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছিল। আজ পৃথিবীর বৈঠকে বাঙালীর, ভারতবাসীর স্থান কোথায়? আমরা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, পেরিয়ার মত কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে আছি। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আবার তিনি এই ভারতবর্ষে এমন একজন যুগাবতার প্রেরণ করুণ—যিনি তাঁর বিশাল বক্ষে হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খৃষ্টান সকলকে সমানভাবে আলিঙ্গন করে আপন কোলে স্থান দান করবেন, যাঁর দৃষ্টান্তে ভারত জগতের সমক্ষে আপনার মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত স্থানে পুনরায় অধিষ্ঠিত হবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বাণী-বিতান

—:০:—

রঙ্গভূমে

তুমি কে আমার জীবন রঙ্গে
রয়েছ গোপনে সতত সঙ্গে
সাজায়ে আমারে দিতেছ স্বকরে
বাহির করিছ বাহিরে।

কখনো ভূপতি আকর্ষি সিঞ্জিনী
কখনো কিশোরী লম্বিত বেণী
কভু ধ্যানমগ্না পূতা তপস্বিনী
পটে পটে রূপ ধরিরে।

কে তুমি আমার তাহাও না চিনি
কে আমি আমার তাহাও না জানি
মাঝে মাঝে 'ওঠে করতালি ধ্বনি
দেখে নির্ব্বাক হ'য়ে রহিরে।

তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র তোমার
যখন বাজাও বাজে সপ্ততার
নহিলে পড়িয়া আছি নির্ব্বিকার
আমি বলে' কিছু নাহিরে।

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

জিজ্ঞাসা

—•—

চলে, আরো চলে
এই যে জগৎ প্রতি পলে
অনাদির কোন্ আদি হ'তে
শত স্রোতে
জানা হ'তে অজানার, চেনা হ'তে অচেনার পানে,
কোন্ টানে
চলেছে এ—কেন—কার লাগি,
ব্যাকুল বিবাগী
শ্রান্তিহীন চির-বেগবান
গ্রন্থিহীন গতিমাল্য গাঁথিয়া অম্লান
শেষ-হীন সুদূরের বাটে ?...
সীমা-পাত্রখানি ল'য়ে হাতে
শুধু ভরি' ভরি'
বারবার অ-সীমার অমৃত আহরি'
রচিছে কি অপূর্ব্ব পাথেয়,—কেবা জানে !
কে কহিবে, যাত্রা তার কোন্খানে
পূর্ণ হবে কোন্ পরিণামে ?

আর, যদি নাহি থামে
যতি-হারা এ গতি তাহার,
আমি—ল'য়ে জীবন আমার
ঐ পথ বেয়ে
চলিতেছি, চলিব কি ধেয়ে
কালে-কালে যুগে-যুগে
সুখে-দুখে

আলোকে-আঁধারে
বারে বারে
নব-নব জাগরণে
জন্ম হ'তে বিচিত্র মরণে
মৃত্যু হ'তে বিকশিয়া অ-পূর্ব্ব জীবনে
তরঙ্গিয়া অজস্র প্লাবনে
চিরদিন এক হ'তে আরেক বিস্ময়ে
এই আমি চির-আমি হ'য়ে ?

নিরুত্তর !...
হায় ! কে দেবে উত্তর
এই জিজ্ঞাসার !
তবু বার বার
এ জিজ্ঞাসা আজি মোর করিছে আকুল
মরমের মূল।
জানি আমি, এ জিজ্ঞাসা চিরন্তন,—নাই
এর সমাধান কোন ঠাঁই !
তবু, ফিরে' ফিরে' নিরবধি
মনে হয়,—ওই ফুল, আর ওই নদী,
ওই মত টুটে-ফুটে, দুলে'-ফুলে'
আপনারে ফেলে-তুলে'
চলি, আর চলি এ যে আমি
দিবাযামি,
এ আমার গতি,
কেন,—কার প্রতি ?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

অপরিচিতা

—•—

তৃষিত এ আঁখি যদি লুব্ধ হ'য়ে চায়
তোমার ও অকলঙ্ক মুখ-পানে দেবী,
অন্তরের পশু মোর চেতনা হারায়—
তোমার ও অপরূপ রূপসুধা সেবি' !
হৃদয় দলিয়া তাই এই ক্ষোভ জাগে,
হায়, যদি আমাদের দেখা হোতো আগে !
হয়ত' জীবন হোতো অন্যরূপ আজ,
অসমাপ্ত রহিত না জগতের কাজ ;
আমার এ জীবনের যৌবন-উৎসবে
কামনার ঐক্যতান বেজেছিল যবে,
মনোমন্দিরের পূত বেদীখানি মোর
চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেছে ঝঞ্ঝা-বায়ু ঘোর !
একদা দেবতা ছিল সে বেদীর 'পরে
এ কথা বিশ্বাস যে গো কেহ নাহি করে !
কেমনে হবে তা' বলো তা'দের প্রত্যয়
তা'রা যে দেখেছে দেবী চিতা-ভস্মময় !
তা'রা তো জানেনা সেটা হোমের বিভূতি—
নহে সে শ্মশান-ধূলি অস্পৃশ্য জঞ্জাল !
স্মৃতি যদি উপবাসী-প্রাণের আকূতি
পারিত রাখিতে পূর্ণ অফুরন্ত কাল
সে যদি না বিশ্বাসের করি অপচয়
চ'লে যেতো ফেলে মোরে একা অসময়,
তা'হ'লে যে পারিতাম সমাধিস্থ চিতে
দগ্ধ এ পাপের স্তূপে ডুবিয়া রহিতে।
তুচ্ছ করি সর্ব্ববাধা-বিপদের ভয়
হৃদয় গাহিত শুধু প্রলয়ের জয় !
কিন্তু দেবী হোল' না তা,' সৌন্দর্য্য তোমার
কী অপূর্ব্ব মায়া-মন্ত্র করিয়া প্রচার

অকস্মাৎ হৃত-বিষ ভুজঙ্গের মত'
আমারে করেছে যেন তব পদানত!
আনন্দ-প্রদীপ জ্বালি মরম-দুয়ারে
চিনায়ে' দিয়াছে মোর অপরিচিতারে!
ঊষার অনিন্দ্য জ্যোতি মনে হয় ম্লান
হেরি তব জ্যোতির্ম্ময় অকলঙ্ক মুখ,
সকল ব্যথার মোর বেদনা প্রধান
তোমারে এ অবেলায় দেখার সে দুখ!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

অতিথি

—•—

রাত্রি শেষে অতিথ্ এল দ্বারে;
আজ কেমনে ফিরাই কহ তারে?
তবুও আঁখি রুদ্র করি'
মনের মুখ চাপিয়া ধরি'
কহিনু, হেথা হবে না ঠাঁই
ফিরিয়া তুই যারে।
আর কেমনে ফিরাব আমি তারে?
কহিতে গিয়া কাঁপিল বুঝি স্বর
বহিল চোখে অশ্রু ঝর ঝর।
অতিথি ধীরে নিকটে আসি'
দাঁড়াল মৃদু-করুণ হাসি'
নীরবে কহে, পেয়েছি ঠাঁই
তোমার মনের পারে!
আর কি করে' ফেরানো যায় তারে!

শ্রীমণীশ ঘটক।

রবীন্দ্রনাথ

—•—

হে বঙ্গের কবি,
যে বিশ্ব-হিয়ার আকুল-কামনা-কল্পলতা
সাগর বিপুল-গভীরতা
মন্থনব্যথায় তব জন্ম দিল, তারে তরঙ্গিতে
চাহ তুমি রহস্য-সঙ্গীতে !

যত কবি গেয়ে গেছে, যত অনাগত
আসিবে গাহিবে গান আমাদেরি মত
নিত্য নব নব প্রেমে, নব বেদনায়
নব স্বপ্নে নিত্য অভিনব চেতনায়
অসীম শূন্যের পথ-পাশে
সুরের পাখাটি পূর্ণ মেলে
তাদের সবার গান তুমি গেয়ে গেলে !

যেদিন জাগিল কবি
হে রবি,
তোমার হৃদয়-নিকেতনে,—
সেদিন গভীর সুরে ত্রিভুবন জাগিল গোপনে।
নবীন রসের টানে ভুবনের নাড়ীর বন্ধন
বারে বারে করিল স্পন্দন !

সেদিন হইতে পলে পলে
তুমি যেন আমাদের হ'লে,
সেদিন হইতে কেমনে যে
ধরণী হইল আরো প্রিয়,
ধুলো-মাটি ফলে-ফুলে
পাখীর কণ্ঠে নদীকূলে
আলোকে আকাশে এ নিখিলে
গোপনে তুমি যে ভরে দিলে
আরো রঙ, আরো মধু আরো কী অমিয় !

আমরা—গেয়েছি যারা, যাহারা গাহিনি,
চেয়েছি পেয়েছি যারা, পাইনি চাহিনি—
মোদের সবার সুখ, দুখ, স্বপ্ন, আশা,
ব্যর্থতা, বেদনা, ভালোবাসা,
অর্দ্ধ-গীত, অগীত রাগিণী—
তোমার সঙ্গীতে তারা পেল বাসা, পেল তার ভাষা!
তব পরিমলে পাই তাদের সন্ধান
যারা—ফোটে নাই, ঝরে গেছে—তাহাদেরি অসমাপ্ত গান!

চিরদিন পূর্ণতার লাগি
আমরা ছিলাম সবে জাগি,
অসীমেরে সীমার বন্ধনে
বাঁধিবারে চেয়েছি ক্রন্দনে!
হইতে চেয়েছি মোরা রূপে সুরে প্রেমে সুগভীর
বন্ধু যেন পরম কবির!

আমারে আমার মাঝে করিতে প্রকাশ
আমাদের ব্যাকুল তিয়াষ—
অনাদি কালের সেই আত্মার কামনা
বেদনার অনন্ত সাধনা—
আজি হেরি তোমার স্বরূপে
ফলিয়াছে যেন!
বন্ধু, পরিপূর্ণ রূপে
কখন ফুটেচ চুপে চুপে!

তাই আজ কহি সবে, আর নাই ভয়,
তোমার মাঝারে হল আমাদের জয়!
তোমার প্রদীপে আজ জ্বলিয়াছে আলো,—
তোমার আত্মার দীপ্ত শিখা
দেবে সবে আগুনের টীকা—
একটি না-জ্বলা দীপ থাকিবে কি কালও?
তুমি যবে পূর্ণ হ'লে, আমি হব তবে;
এ ভুবনে বাকি কেবা রবে?

অমৃত এনেছ তুমি আত্মার পরম বিত্ত তাই,
আজিকে ঘোষণা করি,
মৃত্যু নাই, আর মৃত্যু নাই!
মৃত্যু নাই তোমার আমার—
নাই মৃত্যু পরিপূর্ণতার!
অমৃত ক'রিল পান মনে,
জীবন লভিল সবে তোমার জীবনে,
মৃত্যু নাই, মিথ্যা নাই, নাই অন্ধকার,
রবির আলোক হ'ল ভুবনে উদার!
হে কবি, হে নবীন তপন,
স্বপ্ন যে তোমার সত্য,
সত্য তাই তোমার স্বপন!
———　　শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

হাফেজ

—•—

(১)

তোমায় পেলে কিছু না চাই ওগো আমার হৃদয়-স্বামী,
ভাগ্য হবে উচ্চ আমার চুমলে চরণ দিবস-যামী।
এক মুহূর্ত্তে তোমায় পেলে দুই দুনিয়া তুচ্ছ গণি,
সেই মুহূর্ত্ত সবার সেরা সে যে আমার মাথার মণি।
প্রেমিকদিগের চেঁচাচেচী তোমার দোরে নয়তো আজব,
মধু যেথা পড়ে থাকে মাছির সেথা হয় কলরব।
প্রেম-সাগরে মগ্ন আছি মুক্তি পাব কেমন করে,
দুদিক হ'তে ঢেউগুলি যে টান্‌ছে মোরে বিষম জোরে।
তোমার কাছে বারে বারে করি আমি আসা যাওয়া,
তবু কেন পুছো স্বামী কেবা তুমি কিবা চাওয়া।
হস্ত দুটী ক্ষুদ্র আমার ধরব তোমায় কেমন করে,
উচ্চ তুমি মহান্ তুমি আসবে কাছে আমার তরে।
লাল পেয়ালা বঁধুর সাথে কিবা মজা ওরে হাফেজ,
সারা জীবন করে আছি এই আশাটী বড় সতেজ।
———　　মুজাম্মেল হোসেন চৌধুরী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—:০:—

১

সুচটুল ছন্দ-লীলা গীতি-কবিতার,
হাস্নুহানার কুঞ্জে খঞ্জনের নাচ ;
অপরূপ উপন্যাস শেফালীর ঝাড়
লাগে না আমার ভাল লাগেনাক আজ।

২

চুত মুকুলের বাস মধুর কেমন,
বসন্ত-বর্ণনা যেন 'কুমারসম্ভবে' ;
মালতীর 'মেঘদূতে' ভোলেনাক মন
বিরক্ত লাগিছে 'চম্পু' কনক-চম্পকে।

৩

ভুলালো আজিকে মন ভুলালো গো মোর
'চৈতন্যচরিতামৃত' তুলসীমঞ্জরী ;
কি অমৃত আস্বাদিয়া ভ্রমর বিভোর
অনন্ত আনন্দে আজ ভ্রমিছে গুঞ্জরি।

৪

বসন্তে ভুলালো হরি-রসের বাদর
'গুণ্ডিচা' হইল, মোর বাগিচা সখের
গৈরিকে ছোপালে মম জরীর চাদর
ভাণ্ডারী কে দিল আজি ভাণ্ডারে খকের।

৫

পিয়ানো সরায়ে দিল একতারা আনি
দগ্ধ ভালে করে দিল তিলক অঙ্কন
রঙের আসর ভাসি কেমনে না জানি
অজ্ঞাতে রচিয়া দিল শ্রীবাস-অঙ্গন।

৬

একি পুঁথি ! এনে দিলে বুকের মাঝার
নদীয়ার গঙ্গা আর কালিন্দী ব্রজের,
ভাণ্ডীর বনের মাঝে ভাণ্ডার রাজার
ধুসর ধুলায় দিলে মহিমা রজের।

৭

পিনাকীর জটা, না এ পুঁথির মলাট
মন্দাকিনী কুলুকুলু শব্দ শুনি ভাই ;
পুঁথি না এ অপরাধভঞ্জনের পাঠ
যুগে যুগে কাঁদে হেথা জগাই মাধাই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভারতীর বর্ত্তমান সম্পাদিকা

শ্রীমতী সরলা দেবী

যাত্রা

মনরে দোসর মন-সখিরে, হোস্‌নেকো চঞ্চল !
সাম্‌লে নে তোর উতল-করা উদ্দাম অঞ্চল !
রুণ্‌ ঝুণু ঝুন্‌ নূপুর যে তোর কানের মাথা খায়,
আর কারো ডাক্‌ শুন্‌তে না পাই, বিশাল বসুধায় ।
আল্‌গা হাসির বল্‌গা শিথিল, একরোখো তোর ঝোঁক,
হস্কা মারে বুকের পরে পটল-চেরা চোখ্‌ !
সকল কাজেই ব্যথা হানে তোর বাসরের ছল,
সাম্‌লে নে সই আজ হতে তোর উদ্দাম অঞ্চল !

২

সাম্‌লে চলিস—এবার হতে প্রেমের প্রসাধন,
কোমল রূপের বঙ্কে যেন পিছ্‌লে না যায় মন !
চল্‌তে পথে কেবলি তুই, দিস্‌ যে পিছন ডাক্‌,
চম্‌কে ফিরি থম্‌কে দাঁড়াই আঁক্‌ড়ে পথের বাঁক ।
লাভ লোক্‌সান নেই কিছু তোর, নেইতো মানের ভয়,
কেবল হাসিস্‌ চপল সুরে, সময়-অসময় ।
দিনের আলো দেয় ঢেকে তোর এলানো কুন্তল,
তাই বলি সই, সাম্‌লা এবার উদ্দাম অঞ্চল ।

৩

জীবনটা যে শেষ হয়ে যায়, হবি নে গম্ভীর ।
একটি দিনের সজল চোখে ঝর্‌বে না কি নীর ?
হিসেব করে দেখ না, মোদের অনেক কিছুই নেই,
হাত বাড়ালে সকল দিকেই হারিয়ে ফেলি খেই !
জনম ভরে' হাস্‌লি যত বাষ্প হলো সব,
শূন্য অসীম আকাশে তোর মিশ্‌লো গানের রব !
কি নিয়ে আজ বাঁচবি তবে, কি আছে সম্বল !
তাই বলি সই, সামলে চলিস্‌ উদ্দাম অঞ্চল !

৪

যতই সহজ ভাবিস্ জীবন, সহজ তত নয়,
রঙ-তামাসায় বুক ভরে না মন খুসী না হয়!
মানুষ শুধু নয়কো খেলা,—কেবল হাসির গান!
ভাবিস্ নি কি কিসের ক্ষুধায় বেদন-ভরা প্রাণ?
সময় হলো, ছাড় তবে আজ দেহের আলিঙ্গন!
মন বুঝে দেখ কার লাগি তোর চরম আকিঞ্চন!
দেখিস কি সই? চক্ষে এ মোর সর্ব্বনাশের জল!
তাই বলি আজ সাম্‌লে নে তোর উদ্দাম অঞ্চল!

৫

গানের আসর যাক্ চুকে আজ, ভাঙুক সাধের বীণ,
বনের পথে চলতে হবে মৌন বিলাপ-হীন!
প্রাণের ধ্বনি কেবল দেবে চলার পরিচয়;—
শুদ্ধ আঁধার গভীর স্বনে গাইবে শেষের জয়!
দেহের ক্ষুধা নেই যেন আর, কেবল আছে প্রাণ,
আকাশ ছেয়ে বাজবে সে কোন হারিয়ে-যাওয়া গান!
বাতাস শুধু উঠবে শ্বসি, কাঁদবে বনস্থল,
অন্ধকারে সাম্‌লাবি তুই উদ্দাম অঞ্চল!

৬

দীর্ঘ পথের নেই কোন শেষ, নেই কোন তার দিক্,
আকাশ প'রে একটি তারাও কর্ব্বে না ঝিক্‌মিক্!
মৃত্যু-ছায়ায় প্রহেলিকায় মিলিয়ে যাবে রূপ,
মিলিয়ে যাবে পথের কাঁটা, অচল ধূলি-স্তূপ!
তাহার মাঝেই দু'জন মোরা চিন্‌বো মোদের পথ,
পায়ের তলায় হয়তো পাবো অরূপ-লোকের রথ,
হয়ত কিছুই পাবোনা লো, ফেলবো নয়ন-জল,
চলতে হবে আজকে তবু, সাম্‌লে নে অঞ্চল!

শ্রীশৈলেন মল্লিক।

মিহিন্‌তলে পাহাড়ের গাত্রস্থিত শিলালিপি

—:*:—

[আমাদের ১৯০৯ সালে সিংহলদ্বীপে অবস্থান কালে সিংহলদ্বীপের জনসাধারণ ৺পিতৃদেবের (মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) অভ্যর্থনার্থ বিরাট সভা আহুত করে এবং ঐ সভায় ৺পিতৃদেবের বক্তৃতা শেষ হইলে সার পি অরুণাচলম্ ৺পিতৃদেবকে নিকটস্থিত মিহিনতলে পাহাড়ে লইয়া গিয়া একটী প্রস্তরলিপি দেখাইয়া বলেন যে ইহার অর্থ কেহই বুঝিতে পারে নাই। ৺পিতৃদেব দেখিয়া বলেন যে ঐ প্রস্তরলিপি পুরাতন ব্রাহ্মি-অক্ষরে ক্ষোদিত এবং উহার ভাষা একপ্রকার বিকৃত পালিভাষা, যাহা বহুদিন হইল অপ্রচলিত হইয়াছে। বিদ্যোদয় কলেজের অধ্যক্ষ ও সিংহলের High Priest এচ শ্রীসুমঙ্গল এম্ সি বি, আর এ এস্ অনুরোধ করায় ৺পিতৃদেব ইহার ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া নিম্নে দিলাম।

শ্রীস্বগচ্চন্দ্র আচার্য্য]

প্রতিলিপি

ন র চ হ উ প খ

র (ন) ঢ গ উ প উ ক ব বি য প উ দ পে খ ক ত

হ ত ক র হ ক দা র জে (জ) ত ক ক ব র ধ র ণ ব স হ

ত ত দ ন প ব হ র দি

অগ্রে আক্ষরিক বিশ্লেষণ করা যাউক :—

ন র—মানুষ; চ হ উ—'চতুর' (যাহার অর্থ 'চার') শব্দের বিকৃতি; প খ—'পক্ষ' (অর্থাৎ শিষ্য, অনুচর) শব্দের ভ্রষ্ট-আকার। র ঢ—'রাধ্য' (অর্থাৎ আরাধ্য, শ্রদ্ধেয়, পূজনীয়) শব্দের বিকৃতি; গ উ—পালি ভাষায় 'গরু' (অর্থাৎ গুরু, আচার্য্য) শব্দের সমান; প উ ক—'প্রযুক্ত' (অর্থাৎ আদিষ্ট শব্দের জীর্ণ-আকৃতি। ব বি য—'ভূয়' এবং অধিকতর বিশুদ্ধভাবে বলিতে গেলে 'এভূজ্য' (অর্থাৎ, পুনঃপুন, বারংবার হইয়া) শব্দের বিকৃতি; প উ দ—'পিতৃত বা 'পিত্রা' (পিতার দ্বারা) শব্দের বিকৃতি

পে থ—'প্রেশ' (অর্থাৎ প্রেরণ করা) এর শাব্দিক আকৃতি ; ক ত—'কৃত' (অর্থাৎ done) শব্দের পালি আকৃতি। হ ত—'হিত' (অর্থাৎ, উপকার) শব্দের সরল আকৃতি ; ক র হ ক—'কুর্ব্বাণক' (অর্থাৎ, doing) শব্দের এক গঠন ; দা র—দারক (অর্থাৎ, পুত্র) শব্দের সহিত এবং জে ত ক—'জ্যেষ্ঠক' (অর্থাৎ, জ্যেষ্ঠ) শব্দের বিকৃতি ; ক...এবং 'কু' (অর্থাৎ, ভূমি, স্থল) এক কথা ; ব র—'ভর' (অর্থাৎ আনত হওয়া) শব্দের বিকৃতি ; ধ র ণ—'দণ্ডন' (অর্থাৎ, দাঁড়ান) শব্দের বিকৃতি ; ব স—অর্থে 'বসা' ; হ—একটী করণ প্রত্যয় যাহার অর্থ 'দ্বারা'। ত ত—'তাবৎ' (সকল) শব্দের বিকৃতি ; দ ন—পুরাতন ভারতীয় ও সিংহলীয় ভাষার মানে 'জন' (=লোক) ; প ব—'পাপ' (sin) শব্দের বিকৃতি ; হ র দি—ও 'হরতি' (অর্থাৎ হরণ করে) একই কথা।

বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

জ্যেষ্ঠপুত্র আরাধ্য গুরুর দ্বারা বারংবার আদিষ্ট ও পিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া চারিজন শিষ্য (সহ আসেন) এবং (এই) স্থলে আনত, দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট হইয়া উপকার করিয়া সকল লোকের পাপ হরণ করেন।

এই ব্যাখ্যার প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদত্ত হইল—

১। জ্যেষ্ঠপুত্রঃ—মহাবংশ-নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৪৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে মহিন্দ দেবী-নাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভজাত অশোকের **জ্যেষ্ঠপুত্র**।

২। আরাধ্য গুরুর দ্বারা বারংবার আদিষ্ট :—

গুরু মোগ্‌গলিপুত্ত-তিস্য মহিন্দকে সিংহলে আগমন করিতে আদেশ করেন এবং তাহাকে পাঠাইবার জন্য অশোককে প্রবর্ত্তিত করেন। "সেই সময়ে সুবিজ্ঞ মহান্ মহিন্দ দ্বাদশবৎসরের থের ছিলেন। লঙ্কাদেশকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য **তাঁহার গুরুর** (মোগ্‌গলির পুত্র) ও ভিক্ষুদিগের **দ্বারা আদিষ্ট** হইয়া তিনি যখন ভাবিতেছিলেন যে (এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার) ইহাই অনুকূল সময়, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—'রাজা মুটসিবের যথেষ্ট বয়স হইয়াছে ; তাঁহার পুত্র রাজ্য গ্রহণ করুন'।"

—মহাবংশ ত্রয়োদশ অধ্যায় ৪৯ পৃষ্ঠা *

---

* "At that period the profoundly sapient great Mahinda was a thera of twelve years' standing. *Having been enjoined by his preceptor* (the son of Moggali) and by the priesthood to convert the land Lanka; while meditating as to its being a propitious period (to undertake the mission) he came to this conclusion; 'The monarch Mutasiva is far advanced in years. Let his son succeed to the kingdom.'"

—Mahavamsa, Chap. XIII, p. 49.

৩। পিতার দ্বারা প্রেরিত :—

"রাজারও (তাঁহার **পিতা** ধম্মাশোকের) অনুমতি পাইয়া, সঙ্গে চারিটী থের লইয়া, **ইত্যাদি**।"

—মহাবংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৪৯ পৃষ্ঠা †

"ধর্ম্মবিষয়ের সমর্থনকারী থের (মোগ্‌গলি পুত্ত) রাজার পুত্র মহিন্দের ও কন্যা সঙ্ঘমিত্তার ধর্ম্মপরায়ণতার উৎকর্ষ দেখিয়া এবং ইহা হইতে ধর্ম্ম **প্রচার** হইবে ইহাও অগ্রে জানিতে পারিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—নরপতি! ধর্ম্ম বিষয়ে আপনা অপেক্ষা অধিক দাতা ও হিতকারীকে শুধু হিতকারীই বলা হইবে; কিন্তু যিনি নিজ পুত্র কিংবা কন্যাকে আমাদের ধর্ম্মের পুরোহিত করান তিনি শুধু হিতকারীই হইবেন না. তিনি ধর্ম্মের কুটুম্বও হইবেন।' ইহা শুনিয়া রাজা ধর্ম্মের জ্ঞাতি হইতে ইচ্ছুক হইয়া উপস্থিত মহিন্দকে ও সঙ্ঘমিত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসরা! প্রকাশ এই যে ধর্ম্মের যাজক হওয়া অত্যন্ত গুণের কাজ। তোমরা কি ঠিক করিতেছ, তোমরা কি যাজক হইবে?' পিতার এই আহ্বানে তাঁহারা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আপনার যদি ইহা ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আজই আমরা যাজক হইব! যাজক হওয়া আপনার ও আমাদের উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর!"

—মহাবংশ পঞ্চম অধ্যায় ২৫ পৃষ্ঠা *

৪। চারিজন শিষ্যসহ :—

তিনি (মোগ্‌গলিপুত্ত) মহামহিন্দকে তাঁহার (**চারিজন শিষ্য** ইটঠিয়, উত্তিয়, সম্বল, ভদ্দশাল) **সহ** (প্রতিনিধি-স্বরূপ) এই দ্বীপে প্রেরণ করিলেন এবং পঞ্চ থেরকে বলিলেন—মনোহর লঙ্কাদ্বীপে জেতার এই মনোরম ধর্ম্ম স্থাপন কর'।"

—মহাবংশ, দ্বাদশ অধ্যায় ৪৬ পৃষ্ঠা ¶

† "Having also obtained the consent of the King (his fath Dhammasoka), taking with him four theras etc."
—Mahavamsa, Chap. XIII. p 49

* "He (Moggaliputta) deputed the thera Maha-Mahinda together with his (four) disciples. Itthiya, Uttiya, Sambala, Bhaddasala, to this island, saying into these five theras—'Establish ye in the delightful land of Lanka the delightful religion of the vanquisher'"
—Mahavamsa, chap, XII, p, 46

¶ "The thera (Moggaliputta) perceiving the perfection in piety, of Mahinda the son and of Sanghamitta the daughter of the king, and foreseeing also that it would be a circumstance tending to the advancement of the faith, this supporter of the cause of religion thereupon thus addressed the monarch, Ruler of men! a greater donor and benifactor to the faith even than thou art can be called only a benefactor; but he who causes a son or daughter to be ordained a minister of our religion, that person will become not only a benefactor but a relation of the faith also.' Thereupon the

৫। উপকার করিয়া :–

"থের (মহিন্দ) তাঁহার মিত্র ধম্মাশোকের পুত্র ইহা নিরূপণ করিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং ভাবিলেন ইহা বাস্তবিক আমার প্রতি **উপকার করা**'।" -মহাবংশ চতুর্দ্দশ অধ্যায় ৫২ পৃষ্ঠা। *

৬। সকল লোকের পাপ হরণ করেন :—

মহিন্দের ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সিংহলের **অধিবাসীগণ** আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী **পূত** হইতে লাগিল (যথা সোতাপত্তি, সকদাগামি, অনাগামি, অর্হৎ ইত্যাদি পবিত্রতার বিবিধ অবস্থা)।

৭। এই স্থলে আনত, দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট হইয়া :—

মহিন্দের সিংহল-প্রবাসের কথা, নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের কথা বলিতে গেলে সাধারণতঃ তাঁহাদের চারিটি আচরণ বা অঙ্গবিন্যাসের উল্লেখ করাই রীতি। পালি-ভাষায় ইহাকে বলে 'ইরিযাপথ', অর্থাৎ ভ্রমণ, দণ্ডায়মান হওন, উপবেশন ও শয়ন। কতকগুলি মহাযান পুস্তকে 'ভ্রমণের' পরিবর্ত্তে 'আনত হওন' আছে। Fansbolts edition of Dhammapadam, verse III এবং Turnour's of Mahavamsa, p. 24 etc. দ্রষ্টব্য।

—৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

—*—

---

sovereign desirous of becoming the relation of the faith, thus enquired of Mahinda and Sanghamitta who were present :—'My children, it is declared that admission into the priesthood is an act of great merit. What do ye decide, will ye be ordained?' Hearing this appeal of their father, they thus addressed their parent ; 'Lord, if thou desirest it, this very day will we be ordained. The act of ordination is one profitable equally to us and to thee.' "

—Mahavamsa, Chap V, p. 25.

* "Having ascertained that the thera (Mahinda) was the son of his ally Dhammasoka, he became exceedingly rejoined, and thus thought, 'This is indeed a benefit conferred on me.' "

—Mahavamsa, Chap XIV p. 52.

ভক্তের ভগবান

(রূপক)

—*—

সুন্দর একটী দ্বীপ। তাহার চারিদিক সীমাহীন সাগরের নীল জলে ঘেরা। সেই দিক্‌হারা সাগরের বুকে দিবা-রাত্রি অনবরত কত যে ঢেউ উঠিতেছে, আবার গভীর গর্জ্জনে চারিদিকে চন্দ্রের হাসির ন্যায় শুভ্র ফেন-পুষ্পরাশি ছড়াইয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন দ্বীপটিকে দেখিলে মনে হয় যেন, কোন রাজকুমারী তাঁহার প্রিয়তমের পথ চাহিয়া শকুন্তলার মতই একান্ত আত্মহারা হইয়া বসিয়া আছেন,—কবে কোন শুভক্ষণে প্রিয়তম তাঁর পক্ষী-রাজ ঘোড়ায় চড়িয়া, ফাল্গুনের প্রভাতী হাওয়ায় ভাসিয়া ভাসিয়া এক ঝলক গোলাপী গন্ধের মতই আসিয়া তাঁহাকে আনন্দিত—তৃপ্ত করিয়া তুলিবে। আর ঐ যত সব সখি সাগর-কন্যার দল যেন ঢেউ হইয়া তাঁহার এই বিরহ-বেদনার ভার লাঘব করিবার আশায় অবিরত আসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া তাঁহারি গায়ে—চারিপার্শ্বে ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে কত শঙ্খের—কত চিত্র-বিচিত্র ঝিনুকের, কড়ির উপহার সখির শুভ্র-চরণপ্রান্তে ঢালিয়া দিতেছে।

দ্বীপটির সমস্ত অঙ্গ একখানি তাজা তক্‌তকে সবুজ ঘাসের সাড়িতে আবৃত। সেই সবুজ সাড়ির জমিতে কোথাও শেফালি বকুল চাঁপা গন্ধরাজ, কোথাও লতাপাতা, কোথাও আলোছায়াময় পদ্মশোভাযুক্ত জলাশয়, পাহাড়, কোথাও রাজপথের নক্সা চিত্রিত রহিয়াছে।

দ্বীপখানির মুকুলিত লতাকুঞ্জের আশে পাশে সজ্জিত রহিয়াছে শান্তিপ্রিয়, আড়ম্বরশূন্য, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, সরল, সুন্দর পরিচ্ছন্ন যত অধিবাসীদের রমণীয় গৃহাবলী। সে গৃহের পরিচ্ছন্নতা—সুচারু গঠনপ্রণালী এবং যাবতীয় সাজসজ্জা—সেও যেন ছবির ন্যায় মনে হয়।

প্রতি সকাল সন্ধ্যায় চন্দ্র সূর্য্য বোধ হয় একবার সে মর্ত্ত্যের নন্দন শোভা দর্শন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই উষায়

ও প্রদোষে তাঁহারা যখন ঐ আকাশ-ছোঁয়া সীমান্ত হইতে নীল সাগরে ভাসিয়া উঠেন, —তখন ঐ দ্বীপের শোভায় এবং সাগর-শিশু যত লহরমালার অপূর্ব্ব নৃত্যগীতে তাঁহাদের মন প্রাণ বুঝি বা পরমানন্দে পূর্ণ হয়। তাঁহাদের জ্যোতি-ভরা হাসির আভা যখন আবার চঞ্চল নীল জলধির বুকে ঝরিয়া পড়ে,—যখন সমস্ত সাগর-বক্ষে হাজার রংএর হাজার আলোর দীপালীর ঝিলিমিলি খেলা চলিতে থাকে, —তখন মনে হয়—মানুষ শুধু এই দুঃখ শোকে—ব্যথায় অন্ধকারে ভরা ধরণীর অধিবাসীই নয়। মানুষ সত্যই দেবতার সন্তান,—মানুষ যথার্থই পবিত্র শান্তির, অমৃতময় আলোক-লোকেরও অধিকারী!

[২]

গাছে গাছে যখন পাখীরা ডাকিয়া উঠে, শাখায় শাখায় লতায় পাতায় যখন নূতন সূর্য্যের সোনালী হাসির ছোঁয়ায় ফুলদল ফুটে, তখন সে দ্বীপের কুটীরে কুটীরে, পথে পথে প্রভাতী পুষ্পসুরভিত মন্দমধুর বাতাস কম্পিত করিয়া নর-নারী, বালক বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে,...

"জাগ সকলে এবে অমৃতের অধিকারী;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান,
পাপতাপহারী,
পূরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে,—
বিহগ যশ গাহে তাঁহারি।"

* * *

ক্রমে দিনের আলো প্রকাশিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা দামামা, জাগরণের গভীর শঙ্খ নূতন রবে ধ্বনিত হইতে থাকে। মনোহর বেশে বিভূষিত পরম সুন্দর প্রাণের ঠাকুর তাঁর সুন্দর মূর্ত্তিতে—বঙ্কিম ঠামে—ঈষৎ হসিত আননে ভক্তসন্নিধানে প্রকাশিত হন। চতুর্দ্দিক সুমধুর ধূপ ধুনা চন্দন ও পুষ্প সৌরভে সুরভিত হইয়া উঠে। দলে দলে ভক্ত দ্বীপবাসী শুদ্ধ স্নাত বেশে পুষ্প চন্দনের ও বিশুদ্ধ ভোগের অর্ঘ্যসম্ভারসহ দেবতার চরণপ্রান্তে সমবেত হয়। কুমারী কন্যার বীণার তানে—বালকের মধুর কণ্ঠে—প্রৌঢ়ের করুণ নিবেদনে—বৃদ্ধের ভক্তি-অশ্রুতে গদগদ ভাষে -অতি গভীরে, করুণে মধুরে বাজিয়া উঠে ভগবানের চিরবন্দনা-গীতি,—

"তুমি সুন্দর সুন্দর মধুর মধুর—
চির নূতন তুমি হে।
তুমি ভকত-জীবন, বিশ্ব-বিনোদন
সুরনরবন্দন হে!"

* * *

ক্রমে সে ভক্তিসুধামাখা সঙ্গীত সকল দিক্ মুখরিত করিয়া—ভক্তের দেহমন পবিত্র করিয়া শান্তিরসে আপ্লুত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশে বাতাসে মিলাইয়া যায়। একে একে সকলে আবার দেবতার চরণে প্রণত হইয়া, দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। প্রত্যেকে আপন আপন

দিনের কাজে—ভগবানের নির্দ্দিষ্ট এ জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে আপনাকে একান্ত মনে সঁপিয়া দেয়!

সমস্ত দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহে তাহারা আবার যখন শান্তিপূর্ণ গৃহের—স্নেহ মমতা সহানুভূতিতে ভরা নিজ নিজ পরিবারের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর পানে ফিরিয়া যাইতে থাকে, —তখন আবার গোধূলির ম্লান ছায়ায় তাহাদের শ্রান্ত কণ্ঠে মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠে,—

"আর নাইরে বেলা, নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে,
এখন চলবে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে, সন্ধ্যাগগন আকুল করে
ওরে, ডাকে আমায় পথের ধারে সেই
ধ্বনিতে।"

* * *

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। আকাশ-রাণীর নীল আঁচল ভরিয়া জ্বলিয়া উঠে চাঁদের উজ্জ্বল হীরা—যত ঝিকি মিকি তারার মাণিক। আর মৃদুল মলয় হাওয়া সিন্ধুর বক্ষ দোলাইয়া—সন্ধ্যার ফুটন্ত ফুলের পরিমল গায়ে মাখিয়া—যুবকের কাণে, যুবতীর বুকে কত আশার রঙ্গিন বাঁশী বাজাইয়া দিয়া—ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, লতায় পাতায় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে থাকে। মানুষের কর্ম্ম-কোলাহল দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হইয়া যায়। আর সন্ধ্যার শ্যামল শান্তিময় আকাশ বাহিয়া নামিয়া আসে দেবতার নীরব সাধনার সাথী—গম্ভীরা,—অতি অপরূপ বিস্ময়ে ভরা,—চির-রহস্যময়ী রজনী—শ্রান্ত জীবনের বিরাম-দায়িনী শর্ব্বরী!

[৩]

সে সুন্দর দ্বীপের দেশে বিশ্বপালক নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন রাজা নাই। সে দেশের ছোট বড়-য় দ্বেষ, হিংসা বা অপ্রেম নাই।

সর্ব্বতোভাবে যিনি প্রাজ্ঞ তিনি ভগবানের নামে শপথ করিয়া দেশকে সুখী করিতে—উন্নত করিতে দেশের সকল অভাব অভিযোগ মোচন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ছোট বড়—জ্ঞানী-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতানুরূপ কাজের ভার গ্রহণ করিয়া পরস্পরে ঈর্ষাবিরহিত ও নির্লোভচিত্তে এবং ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম যত্নে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যত্নবান থাকে।

তাহারা সকলেই মিলিয়া মিশিয়া, পরামর্শ করিয়া সকল কাজ নির্দ্ধারণ করে কিন্তু একবার যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় —তাহাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সকলেই সম আগ্রহে, সম উৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকে। এবং সে কার্য্য সে অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কখন পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায় না, কোন দ্বিধার সৃষ্টি করে না। আত্ম-মত ও আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লোভে কেহ কখন স্বদেশ বা স্বজাতির অনিষ্ট-কারী বিরোধীরূপে দণ্ডায়মান হয় না।

মরণকে পণ [illegible] দেশের শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম, ও স্বাধীনতাকে নিয়

রক্ষা করে বর্ম্ম অস্ত্রে সুসজ্জিত যত বলিষ্ঠ ও উদার-হৃদয় নির্ভীক যুবকবৃন্দ।

[৪]

এমনি শৃঙ্খলায়, একতায়, এমনি সুখে প্রেমে ভক্তিতে উপাসনায় সে দ্বীপের দেশ এক অপার্থিব শান্তির স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিল। সহসা সে সুখের শশাঙ্কে মেঘের কাল ছায়াপাত হইল; উজ্জ্বল আনন্দের হাসি ম্লান হইয়া আসিল। ভগবদ্ভক্ত একনিষ্ঠ স্বাধীন সন্তানদের চরম পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল।

একদিন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল দূরে—অতি দূরে নীল সাগরের সাদা সাদা ঢেউ ভাঙ্গিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক নৌবহর তাহাদের দ্বীপের দিকে তীরে বেগে ভাসিযা আসিতেছে।

সেদিন ছিল সে দেশের মস্ত বড় একটা উৎসবের দিন। নীল সিন্ধুর বক্ষে ভগবানের অনন্তশয্যার অভিনয় চলিয়াছে। সমগ্র দেশের নর-নারী, বালক, বৃদ্ধ সাগর-সৈকতে সমবেত হইয়াছে। আজ তাহাদের সকল কর্ম্মে, বচনে, প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সঙ্গীতে, বাদ্যে, আনন্দ-কলরোলে চারিদিক মুখরিত।

সহসা সে আনন্দ-কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া আকাশ বাতাস আলোড়িত করিয়া ধ্বনিত হইল "গুড়ুম্!" মুহূর্ত্ত মধ্যে সে অনন্ত-শয্যার লীলাভিনয় স্তম্ভিত হইল। সহস্র সহস্র নর-নারী, যুগপৎ একটা সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই সব নীরব নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল,—সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

সকলেই চাহিয়া দেখিল কালবৈশাখীর কালো মেঘের মত সেই নৌবহর ইতিমধ্যে তাহাদের দ্বীপটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সে সব নৌকারোহিদের অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত পরিচ্ছদ, বিপরীত আচরণ। তাহাদের চক্ষে সর্পের হিংসা, মুখাবয়বে বীভৎস নিষ্ঠুরতা, কর্কশ দাম্ভিকতা এবং অসহিষ্ণুতার ভাব অতি পরিষ্কাররূপেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

তখন দ্বীপের প্রবীণ নায়ক গম্ভীরস্বরে এবং সংযতভাবে নৌকারোহিদের দল-পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কা'রা? কেন এমন অন্যায়ভাবে এবং অকারণে আমাদের আক্রমণ করছ?"

দলপতি অতি কর্কশস্বরে দম্ভভরে উত্তর দিল, "আমরা বিদেশী। একমাত্র অচিন্তনীয় নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসক আমরা। সেই শ্রেষ্ঠধর্ম্মকে জগতে প্রতিষ্ঠা এবং এর বিপরীত ধর্ম্মের ধ্বংস করবার জন্তই আমাদের এই বিজয়-যাত্রা।"

দেশ-নায়ক—"একটা দেশের—একটা ধর্ম্মের দলপতির বা প্রতিনিধির মুখে একথা শোভা পায় কি? যদি ধর্ম্মকে বুঝে থাক, যদি ভগবানকে বুঝবার চেষ্টা করে থাক,—তবে কেমন করে বলছ যে, ভগবানকে লাভ করবার—সত্যকে উপলব্ধি করবার একমাত্র পন্থাই বিদ্যমান?—একটি মাত্র সাধন-প্রণালীই প্রশস্ত?—আর সব অলীক?

বিশ্ববিধাতার সৃষ্টি যেমন বৈচিত্র্যময়—এঁর সাধনার—চরম সত্যের উপলব্ধির পন্থাও তেমনি বিভিন্ন, বৈচিত্র্যময়! নয় কি বিদেশী ?"

দলপতি—"আমরা অত প্যাঁচাল কথা বুঝিনে,—বুঝতেও চাইনে। আমরা চাই শুধু স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে, আর পৃথিবীর যেখানে ধর্ম্মের নামে পুতুল খেলা চলেছে তার উচ্ছেদসাধন করতে।"

দেশনায়ক—"কেন বার বার এমন কথা বলচ বিদেশী ? ভগবান মানুষমাত্রকেই পৃথক মন বিভিন্ন বুদ্ধি এবং স্থির বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেচেন। মানুষ নিজ বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারেই মনে মনে আদর্শের কল্পনা করে থাকে। আপনারি জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ উপাদানে সেই আদর্শ কল্পনাকে মূর্ত্ত করে তোলে। আপনারি প্রাণে সেই আদর্শ মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে'—অসীম বিশ্ববিধানের সসীম জাগ্রত অধিষ্ঠানের পরিকল্পনা করে' মানুষ সাশ্রুনেত্রে, পবিত্র পুষ্পচন্দনে তাঁর পূজা করে। আপনারি প্রাণের নিবেদন জানিয়ে—ধন্য হয়। অচিন্তনীয়কে দুর্ব্বোধ্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার—ধ্যানে ধারণা করবার পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে এটা একটা সহজতর উপায় নয় কি ? তোমাদের ঐ কল্পনায় যদি ভগবান প্রসন্ন হতে পারেন,—তবে সেই অসীম করুণাময়ের পক্ষে আমাদের এই প্রাণের নিবেদনে আমাদের প্রতি তেমনি প্রসন্ন হওয়া কি এমনি অসম্ভব ? তবে কি বুঝতে হবে, তিনি তোমাদেরকেই জগতের ধর্ম্মতরণীর একমাত্র কাণ্ডারী করে পাঠিয়েছেন, বিদেশী ?"

দলপতি—"শুন বৃদ্ধ, আমরা তর্কযুদ্ধের প্রয়াসী হয়ে এত দূরে ছুটে আসিনি। বলি, শান্তিতে—স্বেচ্ছায় এ মত গ্রহণ করবে তোমরা ?—না তার আগে একবার এই অস্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করতে চাও ? এখনও সময় আছে বৃদ্ধ; ভাল মত বিবেচনা করে উত্তর দাও দ্বীপবাসী !"

দেশনায়ক—"উত্তম, আমি আমার স্বজাতির পক্ষ থেকে উপযুক্ত পরামর্শের এবং সঠিক উত্তর জানাবার জন্য এই রাত্রিটুকুর অবসর চাচ্ছি বিদেশী। কথা দাও,—এ সময়টুকুর জন্য আমরা তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি ?

দলপতি—"বেশ তাই হবে। কিন্তু মনে রেখো, কাল প্রহরেকের মধ্যে উপযুক্ত উত্তর না পেলে এই বিদেশী বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হবে না।"

(৫)

এই আকস্মিক এবং মর্ম্মান্তিক বিপদের সূচনায় সকল দ্বীপবাসীদের প্রাণ মন একটা সুনিবিড় বিমর্ষতায় পরিপূর্ণ হইল। সকলেই শঙ্কাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইল। আজ অতি অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র দ্বীপবাসীদের সান্ধ্যকৃত্য এবং আহারাদি নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়া গেল। গৃহ-দীপ নির্ব্বাণ করিয়া যত শিশু বৃদ্ধ ও নারীর দল অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিন্তু, আজ যুবকদিগের এবং প্রৌঢ়দের বিশ্রামলাভ হইল না,—চক্ষে নিদ্রা আসিল না। রজনী প্রহরাতীত হইতে না হইতেই সকলে দলে দলে আসিয়া দ্বীপের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত—দরবারমণ্ডপে মিলিত হইতে লাগিল। যখন মণ্ডপের চারিদিক্ জনতায় পূর্ণ হইল, তখন, প্রবীণ দেশ-নায়ক অতি চিন্তাকুলচিত্তে আসিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন। মুহূর্ত্তে জনমণ্ডলী নিঃস্তব্ধ হইয়া গেল। যেন কাল-বৈশাখীর স্তব্ধ আকাশে এখনি প্রলয়ের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে।

সহসা দেশ-নায়ক আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে—গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "জয় জগদীশ হরে!"

অমনি সমগ্র জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তাহাদের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় জগদীশ হরে!"

সকলে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। আবার সকলে নীরব নিঃস্তব্ধ হইল। তখন দেশ-নায়ক সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বদেশ, স্বধর্ম্ম এবং সমাজের উপরে কত বড় বিপদ এসে পড়েচে তা' বোধ হয় কাউকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। আজ শুধু আমি এক কথায় জানতে চাই যে, আপনারা আপনাদের দেশকে ধর্ম্মকে ও সমাজকে কতটা ভালবাসেন?—আজ শুধু বুঝতে চাই যে আপনারা আপনাদের দেশ—ধর্ম্ম—ও সমাজকে রক্ষা করবার জন্য মরণকেও তুচ্ছ করতে প্রস্তুত কি না?"

সমগ্র জনতা হইতে অতি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমরা মরণকেও বরণ করতে প্রস্তুত।"

(৬)

সভাভঙ্গের পর সকলেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পর দিবসের জন্য প্রস্তুত হইতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে; সকলেই নীরব, চিন্তাকুল। সহসা ও কি? গ্রাম-প্রান্তে আকাশ এত রক্তবর্ণ কেন? সাগর-সৈকতে এত কোলাহল কিসের?

তখন আর কাহারই ভাবনার অবসর রহিল না। যে যাহা হাতের সম্মুখে পাইল তাহাই লইয়া ধাবিত হইল। সাগরের উপকূলে আসিয়া দেখিল, বৈদেশিকের বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে সাগরের উপকূল-স্থিত গ্রাম-প্রান্ত জ্বলিয়া উঠিছে। তাহাদের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে অসহায় নর-নারী সকরুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে বীভৎস লজ্জাকর নিষ্ঠুরতা দর্শনে অন্ধকার রজনীর শ্যামল মুখাবয়বও যেন শঙ্কায় ও সঙ্কোচে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বীপবাসীরা সে দৃশ্য দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তেই সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল,—নিমেষে যেন শত শত বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল,—সহস্র যোদ্ধার বলিষ্ঠ মুষ্টিতে সহস্র শুভ্র অসির ফলক

ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সে শক্তি শত্রুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

[৭]

রজনী ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছে। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! দ্বীপবাসীরা যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের স্বধর্ম্মকে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের সতত্যকে জয়যুক্ত রাখিবার জন্য জীবনকে পণ করিয়া;—আর দাম্ভিক বৈদেশিকেরা যুদ্ধ করিতেছে জেদ্‌কে—নিজেদের প্রলোভনকে শঠতার কুটিল অস্ত্রসংঘাতে, শরীরের বলে বিজয়ী করিবার অদম্য আশায়;—যেমন করিয়াছিল রাজা আর্থারের বিশ্বাসঘাতক নাইটের দল তাহাদের সেই শেষ কুয়াসাচ্ছন্ন নৈশ-মহাযুদ্ধে।

সহসা প্রবীণ দ্বীপনায়কের স্মরণ হইল, হয়ত ইহা ঠিক হইতেছে না। রজনীর অন্ধকারে এই অনিশ্চিত অন্ধযুদ্ধে হয় ত আত্মবলেরই অপচয় হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে আক্রমণ না করিয়া, কেবল শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিয়া এবং উপযুক্ত আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়া দিনের অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। তিনি অবিলম্বে সর্দ্দারদিগকে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিলেন।

[৮]

যুদ্ধস্থলের অতি নিকটেই দুইটি পাহাড় ছিল। তাহাদের মধ্য দিয়াই সঙ্কীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচে গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড় দুইটির উপরিভাগে কেহ কখন কিছু জন্মাইতে দেখে নাই। তবে মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে হঠাৎ বড় বড় অগ্নিশিখা সকল উহাদের উপরে কিছুক্ষণ জ্বলিয়া আবার নিবিয়া যাইতে দেখিয়াছে। সুতরাং সাধারণ গ্রাম্যেরা উহাদিগকে অপদেবতাদের পীঠস্থান মনে করিয়াই উহাদের উপরিভাগে গতায়াত নিতান্ত আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করিয়া দূরে দূরে থাকিত।

দ্বীপবাসী যোদ্ধদল অন্ধকারে, সকলের অলক্ষ্যে, অতি ধীরে ধীরে ঐ পার্ব্বত্য পথে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সম্মুখের যোদ্ধার দল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। বৈদেশিকেরা মনে করিল, নিশ্চয়ই দ্বীপবাসীদের সংখ্যা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং জয়লাভ অতি নিকটবর্ত্তী। তাহারা ভীষণ উৎসাহে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইল। সম্মুখস্থ মুষ্টিমেয় দ্বীপবাসী ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোথায় অন্ধকারে সরিয়া পড়িল।

বৈদেশিকেরা পশ্চাদ্ধাবনের প্রথম উৎসাহে কথঞ্চিৎ মন্দা পড়িলে সহসা দেখিল তাহারা সেই পার্ব্বত্য পথের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ মনে হইল হয়ত এই পশ্চাদ্ধাবন তাহাদের ঠিক হয় নাই। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। রাত্রি শেষের অস্পষ্টালোকে তাহারা দেখিতে পাইল, পথের দুই মুখ দ্বীপবাসীরা বৃহৎ প্রস্তর ও কাষ্ঠখণ্ডে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

একটা বিস্ময়ে ও আতঙ্কে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। সে বিপদে একবার বুঝি সত্য সত্যই ভগবানকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু অপরাধীর কণ্ঠে সে নাম উচ্চারিত হইল না। একবার শূন্য দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিল। কিন্তু সেখানেও বোধ হয় ভগবানের রোষরক্ত ভ্রূভঙ্গ দর্শনে তাহাদের দৃষ্টি আনত হইয়া পড়িল।

তাহাদের মাথার উপরে সহসা আকাশ একটা অস্বাভাবিক রক্তদীপ্তিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে রক্তপ্রভা ক্রমে গভীরতা লাভ করিল। যুগপৎ শত শত কামান গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলে সভয়ে দেখিল, বৈদেশিকদের মাথার উপরে ঐ পাহাড়ের শীর্ষ ভেদ করিয়া এক বিরাট অগ্নিশিখা সশব্দে যেন রোষভরে সমস্তই গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে।

ক্রমশঃ সে রক্তশিখা ম্লান হইয়া আসিল। অপরিমিত দুর্গন্ধপূর্ণ ও অতি কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশিতে সহসা চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া গেল। গলিত, অতি উষ্ণ, কর্দ্দমাক্ত প্রস্তর সকল বৃষ্টিধারার ন্যায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই আকস্মিক অত্যুগ্র উষ্ণতায় সমুদ্রোপকূলে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হইল। সাগর-বক্ষ যেন প্রচণ্ড দৈত্য-তাণ্ডবে ভীষণভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

উঃ কি ভীষণ অন্ধকার—অসহ্য উষ্ণতা—কি ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা!

[৯]

ক্রমে সে দুর্য্যোগের রজনী ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ক্রমে সে প্রবল ঝঞ্ঝা—অনল বৃষ্টি থামিয়া গেল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পাহাড়ের উপরে নীচে কোথাও প্রাণীমাত্রের চিহ্ন নাই। সাগর বক্ষে একখানি তরণীরও অস্তিত্ব নাই। দাম্ভিকের জতুগৃহ ভগবানের রোষাগ্নিদাহে নিমেষেই ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যেন একটা মহা দুঃস্বপ্নের ঘোর দিবালোকস্পর্শে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

আবার আকাশে অরুণ আলোর সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়িল। গাছে গাছে শান্ত বিহঙ্গের কণ্ঠে মুক্তির মোহন সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। কুঞ্জে কুঞ্জে হাস্যময়ী ফুলবালাদের নিমিত্ত মত্ত অলিকুল মধুময় চুম্বনের উপহার লইয়া ছুটিয়া আসিল। প্রফুল্ল কমলদল তাহাদের সুকোমল সুবাসিত পীত পরাগরেণু সোহাগে ভ্রমরের কৃষ্ণ অঙ্গে মাখাইয়া দিল। তরঙ্গিনীর কাণে কাণে মলয় আসিয়া নতুন আলোর নতুন গানের সুর বাজাইয়া দিল। নব জাগরণে নব দিবসের সুনীল অম্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—

"জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত,
চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড় নন্দিত, প্রেম কম্পিত,
হৃদয়-কুঞ্জ-বিতানে।

মুক্ত বন্ধন সপ্তসুর—তব—
করুক বিশ্ব বিহার ;
সূর্য্য-শশি নক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ প্রচার ;
তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথ নন্দন হার।
পূর্ণ কর গগন অঙ্গন—
তাঁর বন্দন-গানে।"

আবার একে একে সকল দ্বীপবাসী সাগর-সৈকতে সমবেত হইল। স্বদেশ সেবায় আত্মত্যাগী বীরবৃন্দের শেষ সৎকার অতি সমারোহে সম্পন্ন করিল। তাহাদের নিপুণ সুদক্ষ হস্তকৌশলে স্বধর্ম্মপ্রিয় ত্যক্ত-জীবন বীর কেশরীদের এই মহাগৌরবময় স্মৃতির রমণীয় সৌধ অতি অল্পকাল মধ্যে গঠিত হইল। সমবেত কৃতজ্ঞ দেশবাসীর শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলিতে বিজয়-মাল্যে সে সৌধ সুশোভিত হইল। তাহার সুচারু অঙ্গে শুভ্র-প্রস্তর-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিল—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।
জয় স্বদেশের জয়। জয় স্বাধীনতার জয়।

উচ্ছ্বসিত সুনীল জলধি ও নীলাম্বরের সঙ্গমস্থলে—ঐ সুদূরের দিগন্তে নূতন রক্তিম সূর্য্য ভাস্বর হইয়া উঠিল। দোদুল সাগরের বুকে লহরে লহরে,—শ্যামল স্নিগ্ধ লতায় পাতায় লক্ষ আলোর লক্ষ মালা নাচিয়া উঠিল,—হাজার মাণিক ঝলসিয়া উঠিল। সমগ্র দ্বীপবাসী তখন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইল। শোকে—হর্ষে—আনন্দে ও অশ্রুপ্লুত নয়নে করজোড়ে সকলে আবার ঊর্দ্ধনেত্রে ঐ কিরণোজ্জ্বল গগনতলে অতি গভীর করুণ-স্বরে গাহিল,—

"নূতন যুগ সূর্য্য উঠিল,
ছুটিল তিমির রাত্রি ;
তব মন্দির অঙ্গন ভরি—
মিলিল সকল যাত্রি।

*　　*

প্রাণ দাও, প্রাণ দাও,
দাও দাও প্রাণ হে ;—
জাগ্রত ভগবান হে,
জাগ্রত ভগবান্ ! !"

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী

ভেক্‌মঙ্গল *

—:o:—

বড়লোকের গুণগানে সকলেই পঞ্চমুখ। কিন্তু গরীব অনন্তগুণশালী হইলেও তার কথায় সকলেই মূক। এদেশে মহারাজ পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশনে, এবং ধনীযুবক লখিন্দরের লোহার খাঁচায় সর্পাঘাতে মৃত্যু শ্রবণে ভয়ভীত মনসাভক্ত কবিকুল কত কত 'মনসা মঙ্গল' রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ মনসার প্রাণ ভেক জাতির মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবিবার অবসর তাঁহারা কেহই পান নাই। তাই আজ আমি নিরীহ বাঙ্গালা জাতির নিরুপদ্রব বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের উৎসবে নিরীহ ভেক জাতির সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বোধ হয়, সেটা নিতান্ত অশোভন হইবে না। ঋতু-মঙ্গল কোকিলের ন্যায় বর্ষামঙ্গল এই উভচর (amphibious) ত্রিশঙ্কুপন্থী ভেকজাতি ভারতবাসীর প্রাচীন প্রতিবেশী। স্মরণাতীত কালের গ্রন্থ ঋক্‌বেদে এই জাতি দেবতার ন্যায় স্তূয়মান হইয়াছে। প্রকৃতির অপার মহিমায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ শিশুহৃদয় প্রাচীন আর্য্যঋষি গান্ধারধৈবতস্বরে জগৎপ্রাণ অন্নোৎপত্তির মূল বৃষ্টির অগ্রদূত এই ভেক-জাতির গুণগানে আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিলেন। আমি আর্য্যজাতির অতিমান্য ঋগ্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্ত হইতে ভেক সম্পর্কে দু' এক কথা লিখিয়া পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যের ভেক্ বাঙ্গালা সাহিত্যে কিরূপে ব্যাঙ্গ বা ব্যাঙ-এ নামি-য়াছে, উহার পরিচয় দিতেছি। ঐ সূক্তে "সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ। বাচং পর্জ্জন্যজিন্বিতাং প্রমণ্ডুকা অবাদিষুঃ॥" এই প্রথম ঋক্ এবং!—

"গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাত্ফ্বরিতো ন বসুনি। গবাং মণ্ডুকাঃ দদতঃ শতানি সহস্রসাবেপ্র তিরন্ত আয়ু॥' এই অন্তিম বা দশম ঋক্‌টীতে "ব্রতাচরণশীল ব্রাহ্মণের মত সংবৎসর মৌন-ভাবে অবস্থান করিয়া পর্জ্জন্য (ইন্দ্র) দেবের আহ্বানে উৎসাহিত ভেকগণ উচ্চস্বরে গান ধরিয়াছে। শব্দায়মান গাভী এবং ছাগ সকল বিচিত্র ও হরিদ্বর্ণ (পেয়ালা) গাভীগণের সহিত আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিয়াছে। ভেকগণ, আমাদিগকে শত শত গোধন

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৭শ অধিবেশনে পঠিত।

দান করুন। উহারা আমাদের সহস্র সোম যাগ নিষ্পত্তির কাল পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী হউক" এইরূপ বর্ণনা আছে। প্রথম ঋকে ইন্দ্র-দেবের প্রেরণায়, পূর্ণ একবৎসর কাল নিশ্চেষ্ট ভেককুলের বৃষ্টির জন্য ব্যাকুল আহ্বান, এবং দশমটীতে সোমযাজী ঋষিবৃন্দের যজ্ঞ সাধনের উপায়ভূত দীর্ঘজীবী প্রভৃত গোধন প্রার্থনা। অনুক্ত মধ্যবর্ত্তী আটটী ঋকে বৎসরব্যাপী নিদ্রাভঙ্গের পর নানাজাতীয় বিভিন্নাকৃতি ভেক সমূহের পরস্পর-সম্মিলন ও আনন্দ-কোলাহল, স্বরবৈষম্যসম্পন্ন ভেক-কুলের একত্র একযোগে বারিপাতের জন্য সমস্বরে প্রার্থনা-গান। এই সকল ভেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ থাকিলেও উহারা এক সাধারণ(common)নামে 'ভেক' উক্ত হইয়া, নিজস্ব স্বরের বৈষম্য ভুলিয়া সমস্বার্থে মানব-জগতের কল্যাণ-নিদান বৃষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে। সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ যেমন যজ্ঞবেদির চারিপাশে বসিয়া তারস্বরে বেদগান সহকারে পুনঃ পুনঃ আহুতি দান করেন; অধ্বর্য্যু ঋত্বিককুল প্রতপ্ত যজ্ঞপাত্র হস্তে যেমন যজ্ঞদর্শনার্থিগণের নিকট উপস্থিত হন; তেমনি দেশান্তর হইতে সমাগত ভেকের দল ধার্ম্মিক উৎসবের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া হর্ষোৎফুল্লস্বরে গান করিয়া থাকে; এইরূপ ভাববহুল বহু কথা আছে। ঋগ্‌বেদোক্ত ভেকের গানগুলি বৃষ্টিপাতের রহস্যগর্ভ মন্ত্ররূপে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। উহাতে অনাবৃষ্টির পর নব-বারিপাতে প্রফুল্ল ছাত্রগণের মধুর বেদগানের সহিত বর্ষপরে বৃষ্টিপাতদর্শনে ভেকগণের আনন্দধ্বনি তুলিত হইয়াছে, দেখা যায়। এই নিগূঢ়ার্থ ঋক্‌মন্ত্রগুলির ভিতর আমরা একটী সুগভীর তত্ত্বের অস্পষ্ট আভাস পাই, সেটী এই:—দীর্ঘ এক বৎসর কাল অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট ভেকগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া নিজ নিজ স্থানে ম্রিয়মানভাবে অবস্থিত ছিল। উহাদের সকলের বাসস্থান একস্থানে নহে! উহাদের সকলের গায়ের রং ও গঠন বিভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু পৃথিবীর কল্যাণ-কামনায় উহারা আপন আপন জন্মভূমির পার্থক্য, জাতিগত জন্মগত, বর্ণগত ও স্বার্থগত তুচ্ছ ভেদ বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বপিতা ভগবানের নিকট অনাবৃষ্টির শান্তি ও সুবৃষ্টির আশায় সমস্বরে প্রার্থনা করিতেছে। ইহার ভিতর যোগসিদ্ধ ত্রিকালদর্শী বৈদিক ঋষির, ঘৃণ্য ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের প্রতি কোন কল্যাণ-কটাক্ষের সঙ্কেত আছে কিনা কে বলিতে পারে? বেদের কাল হইতে নামিয়া খৃঃ-পূর্ব্ব চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে রচিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও আমরা ভেকের সাক্ষাৎ পাই! ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পাদ, ৮৪ সংখ্যক "বর্ষাভ্বশ্চ' সূত্রে বর্ষাভূ শব্দে ভেক বুঝায়। সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধানে, "ভেক, মণ্ডুক, বর্ষাভূ, শালুর, প্লব, দর্দ্দুর, ভেকের এই কয়টী পর্য্যায়-শব্দ (synonyms) পাওয়া যায়। উহার টীকায় "বৃষ্টিভূ" নামটীও আছে। পাণিনির পরবর্ত্তী ভট্টোজী দীক্ষিতও তাঁহার সিদ্ধান্তকৌমুদীতে "ক্রিয়াগ্রহণং

মণ্ডুকপ্লুত্যানুবর্ত্ততে" এই বাক্যে মণ্ডুক-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। শুকবেদের ভেক এ দেশের ন্যায় পাশ্চাত্য দেশেও সুপরিচিত। ইংরাজীর Frog, ফরাসীর ইতর ভাষায় Frogy, Frogeater প্রভৃতি শব্দ গালিদান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখন এই ভেক বা মণ্ডুক কিরূপে ভেক (বেশ) বদলাইয়া বাঙ্গালাভাষায় বেঙ্গ বা ব্যাং সাজিলেন তাহার সন্ধান লওয়া উচিত। ত্রিকাণ্ড শেষ ও মেদিনী অভিধানে ভেকের পর্য্যায়ে ব্যাঙ্গ শব্দ আছে। সুতরাং তদ্ভব ও তৎসম এই উভয় রীতিতেই ব্যাঙ্গ হইতে বেঙ্গ এবং কালক্রমে উচ্চারণ-বৈষম্যে ব্যাঙ্ ও বেঙ্ হওয়া অসম্ভব নহে। অর্থের দিক দিয়া দেখিলেও ব্যাঙ্গ বি (লেজ আদি খসিয়া বিকল) অঙ্গ যাহার এই বাক্যে ব্যঙ্গ (de formed) এইরূপ গৌণলক্ষণায় (metaphorically used in a secondary sense) বিদ্রূপের পাত্র (langhingt stock) বুঝায়। বাল্যে বেঙ্গ লইয়া রঙ্গরস করার কথা লেখকের ন্যায় অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতধুরন্ধরদের মতে বেঙ্গ নিজবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ ব ও শ স্থানে ক্রমশঃ ভ ও খ হওয়ায় যেমন ভেখ হইয়াছে, তেমনি ভেক অর্থাৎ বেশ পরিবর্ত্তনের অজুহাতে ভেক হইতে বেঙএর উৎপত্তি বিচিত্র নহে। ভেকধারী বৈরাগী "ভেক লইলে ভিখ মিলে না"ইত্যাদি প্রবাদেও ভেক শব্দে বেশ বুঝায়। স্মরণাতীত কালের প্রামাণিক গ্রন্থ মহাভারতের বনপর্ব্ব ১৯২ অধ্যায়ে একটী মণ্ডুকদলপতিকে "তাপস-বেশধারী" হইয়া ইক্ষাকুবংশসম্ভূত মহারাজ পরীক্ষিতের সহিত আলাপ করিতে শুনি। ইহাতে ভেকজাতির বেশ-বদলানর অভ্যাসটা মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল জানা যায়। বৈদেশিক কবি ই ফানার, (E. Fanner) তাঁহার বর্ষাসঙ্গীত নামক (Songs of Rain) কবিতায় এ কথায় সাক্ষ্য দিয়াছেন;—

"The frog has changed his
yellow vest,
And in a russet coat is dressed,

বর্ষাকালে ভেকগণ তাহাদের জরদা রংএর ফতুয়া ছাড়িয়া গেরুয়া রংএর জামা পরিয়াছে। বস্তুতঃ যারা ইচ্ছামত দেহের গঠন ও গায়ের রং বদলাইতে পারে, নামের বর্ণ (ব্যাঙ্গ হইতে বেঙ্গ) বদলান তাহাদের নিকট অতি সহজ কার্য্য।

ভেকের গঠন সম্পর্কে বলা যায় যে, ভেক জাতি অণ্ডজ (oviparous) পর্য্যায়-ভুক্ত। ভেকের ডিমের কথা প্রায় সকলেরই কিছুনা কিছু জানা আছে। রাই সরিষার মত কাল কাল ক্ষুদ্র ডিমগুলি চটচটে খোসার (glutinous sheath) ভিতর পরিষ্কার জলে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এইরূপে ডিম পাড়ার দশ দিন পরে উহাতে মাথা, কান্‌কা (gill), দেহ, লেজ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে ব্যাঙাচি

ব্যাঙাচি (ব্যাঙের ছোট ছানা—ছি ক্ষুদ্রার্থে tadpole) হইয়া উঠে। পরে উহার কান্‌কা ও সাঁতারের প্রধান সহায় লেজটী খসিয়া পড়ে। এ যাবৎ চামড়ার তলে অবস্থিত চক্ষুগুলি এতদিন পরে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত অভিধানে ভেকের একটী "অজিহ্ব" নাম দেখা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদের ভক্ষক সর্পজাতিকে দুইটী জিহ্বা "দ্বিজিহ্ব" দিয়া আর ইহাদের অজিহ্ব করিয়া এই নিরীহ জীবগুলির প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছেন কিনা সে বিচারের ভার এ কালের পশুক্লেশ-নিবারিণী সমিতির পাণ্ডাদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলাম। ফলতঃ ভেকজাতি অজিহ্ব কি সজিহ্ব এ বিষয়ে একতরফা ডিক্রী দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য মনীষিদের মত :—

The tongue previously small, increases considerably in size" Encyclopoedia Britanicaর frog শব্দ দ্রষ্টব্য। ইঁহারা বলেন, প্রথম অবস্থায় অতিক্ষুদ্র জিহ্বা কালক্রমে বেশ বড় হইয়া থাকে। এখন প্রাচ্য পণ্ডিতের "অজিহ্বে"র সহিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের "সজিহ্বে"র বিবাদভঞ্জনের উপায় কি? এখানে প্রাচ্য শব্দাচার্য্যেরা বলিবেন, অজিহ্বের অ (নঞ্‌) টার অর্থ অল্প, অর্থাৎ অভিধানকার অজিহ্বশব্দে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদের উক্ত "previously small" "পূর্ব্বে অতিক্ষুদ্র" বিশেষণটী লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচ্য পণ্ডিতদের অদূরদর্শিতা বা দৃষ্টিদোষের সম্ভাবনা আছে কিনা, বিচক্ষণ সুধীবৃন্দ তাহার মীমাংসা করিবেন। এই ভেক-জাতি আজকালকার মৃত্যুদেহ বাঙ্গালী বাবুর মত মেরুদণ্ডহীন নহে। ইহাদের মেরুদণ্ড (spinal cord) আছে। উহারা ধড়, মাথা, ঘাড় সমভাবে উঁচু করিয়া রাখিয়া বসিতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের অতি-প্রাচীন গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রে "ন গঙ্গদত্তঃ পুনরেতি কূপং। নিপানমিব মণ্ডূকাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্যাঙের প্রসঙ্গ আছে। রাজকবি শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নামক নাটকের সুগম্ভীর বর্ষা-বর্ণনায় "ধারাহতাঃ দর্দ্দুরাঃ"র উল্লেখ আছে। সংস্কৃত আভাণকে (Proverb) "দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং" বেঙের বক্তৃতা সভায় চুপ থাকাই ভাল। "পঙ্কে নিমগ্নে করিণি ভেকো ভবতিমূর্দ্ধগঃ" 'পাঁকেতে পড়িলে হাতী, বেঙে মারে লাথী।' এই সকল প্রসিদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়। শিবায়নে ;— "জাতি বেঙ্গ ধরে বলে ধর ধর সয়া।" কবি-কঙ্কণে "জনমিআ মণ্ডূকদলে লাফালফি জাএ", প্রবাদে "বেঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চোকে।" 'লাভে ব্যাঙ্‌ অপচে ঠ্যাং" এই সকল প্রয়োগ সুপ্রচলিত।

এখন বর্ত্তমান কালে কোন কোন ব্যাঙ্‌ এদেশে বর্ষার সময় পর্জ্জন্য বা জলদেবতার আহ্বানের গীতে আমাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়, তাহার একটু বিবরণ

করিতেছি। যে সকল ব্যাঙ্ সচরাচর উৎকট কটুকটু শব্দে কর্ণকঠোরতা জন্মায়, উহাদিগকে কটুকটে ব্যাঙ্ কহে। যে সকল ব্যাঙ্ ঘরের কোণে ফাটলে থাকিয়া কটকট শব্দ করে উহারা কুণো ব্যাঙ্, এটী বোধ হয় কূপমণ্ডুকের বংশধর। বড় জাতীয় ব্যাঙ্‌কে কোলাব্যাঙ্ কহে। ইহারা পুকুরের ধারে ও মাঠে ঘ্যাঁঘো করিয়া বিকট চীৎকার করে। যে সকল বেঙ্ অধিকাংশ সময় গাছে থাকে, উহারা গেছো ব্যাঙ্ বা Tree frog. লম্বাকৃতি যে বেঙের পিঠে সোণার রংএর ডোরা ডোরা দাগ থাকে উহাদের সোণাব্যাঙ্ কহে। ব্যাঙ্ টুমটুমি, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি বেঙ্‌ঘটিত-শব্দ বঙ্গভাষায় বহুল প্রচলিত। "সঘনে চিকুরে পড়ে ব্যাঙতরকা বাজ" কষ্টিকঃ। বাল্যকালের মেলার কেনা ব্যাঙ্‌টুমটুমি বাজানর আমোদ মনে হ'লে এ বয়সেও বালক হ'তে সাধ হয়। বেঙের ছাতার ইংরাজী নাম Mush room, ইহার বোধ-হয় সকল দেশে অবাধ গতি। এদেশের ভূঁইফোড় পাশ্চাত্যদেশে Mush room নামে পরিচিত। সকল দেশের লোকই ইহার রসাস্বাদে অল্পবিস্তর অভ্যস্ত। ইহার সংস্কৃত নাম ছত্রাক। হিন্দুর বিধিকর্ত্তা প্রবীণ মনুযাজ্ঞবল্ক্যের "ছত্রাকং বিড়্‌বরাহঞ্চ" ইত্যাদি স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও বহুভোজন-বিলাসীর নিকট ছত্রাকের আদর কমে নাই। ছত্রাক ফরাসীদেশের বিলাসিনীদের বড় প্রিয় বলিয়া শুনা যায়। কবিকুল-তিলক কালিদাসও এই বেঙের ছাতার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার বিখ্যাত মেঘদূতের পূর্ব্বভাগের ১১শ শ্লোকে লিখিয়াছেন;—"কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং।" (যাত্রাকালে তোমার ধরাতলে কোঁড়ক হবে।) এই নামজাদা ছত্রাক ভগবান্ ব্যাসদেবের লেখনী স্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্দে ২৫ অঃ ১৯ শ্লোকে 'দধার লীলয়া কৃষ্ণঃ ছত্রাকমিব বালকঃ।' 'বালক শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলির অগ্রভাগে সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটীকে একটী ক্ষুদ্র বেঙের ছাতার মত অবলীলাক্রমে ধরিয়া রাখিলেন। এমন ছেলে না হ'লে কি কালে কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরে দিগ্‌বিজয়ী অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথের সারথি হইতে পারিতেন। নিরামিষ হিসাবে ভক্তিশাস্ত্রে ছত্রাকভক্তির (ভুক্তির না?) কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলে। বৈদ্যরাজ রাজনির্ঘণ্টকার দেখিয়াছেন, বেঙের মাংস খাইলে শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও সন্ধি নাশ হয়। এত কথা জানিনা তবে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী পরামাণিক মাখন খুড়া কোলা ব্যাঙের ঝোল খাইয়া উন্মাদ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, কৈশোরের এ ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে। অনুরূপ প্রয়োজনে এখনও ঐরূপ মুষ্টিযোগের প্রয়োগ অন্ততঃ রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলে বিরল নহে।

এই গল্পের যুগে গ্রিমস্ পপুলার ষ্টোরিস্ (Popular Stories of Grimm)

নামক পুস্তকের বর্ণিত যুবরাজ ভেকের মনোমদ গল্পটীর সারাংশ সঙ্কলিত হইল। একদা কোন এক রাজকুমারী সুন্দরী সন্ধ্যাকালে একটী কূপের নিকট সানন্দে বল খেলিতেছিলেন। দৈবাৎ বলটী নিকটবর্ত্তী গভীর কূপে পড়িয়া যাওয়ায়, নিরুপায় রাজকন্যা তথায় অত্যন্ত রোদন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী বেঙ্ জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বালিকার খেদের কারণ জানিয়া বলিল সুন্দরি, যদি তুমি আমাকে তোমার গৃহে আশ্রয়, তোমার খাদ্যের অংশ এবং তোমার শয্যায় একটু স্থান দান কর, তাহা হইলে আমি তোমার বলটী তুলিয়া দিতে পারি। রাজকুমারী অনন্যোপায়বশতঃ ভেকের প্রস্তাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে ভেক তৎক্ষণাৎ গভীর কূপতল হইতে বলটী তুলিয়া দিল। রাজকুমারী বল লইয়া ক্ষিপ্র পদে স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনুগামী ভেকের প্রতিশ্রুতি-রক্ষার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কর্ণপাত করা দূরে থাক, তিনি অবজ্ঞাভরে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও উচিত মনে করিলেন না। অতঃপর ভেকরাজ একদিন রাত্রিযোগে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার শয়ন-কক্ষের দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"খোল দ্বার প্রিয়তমে রাজেন্দ্রনন্দিনি,
অনুগত প্রিয়জন ডাকে বার বার ;
বন-মাঝে কূপ-পাশে অঙ্গীকার-বাণী—
স্মরণ করিয়া ত্বরা খুলে দাও দ্বার ॥"

এই কথায় রাজকন্যা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া তথায় পূর্ব্বদৃষ্ট ভেককে দেখিবা মাত্র পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়বিহ্বল ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা কন্যার তাদৃশ ভাবান্তরের কারণ ও প্রতিশ্রুতির বিষয় অবগত হইয়া কন্যাকে দ্বার খুলিবার আদেশ দিলেন। কন্যা পিতার আদেশ পালন করিলে, ভেকরাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত ত্রিরাত্র রাজকন্যার সহিত একত্র অবস্থান ভোজন ও শয়নে কাটাইলেন। চতুর্থ রাত্রিতে পুনরাগত অতিথিকে দ্বার খুলিয়া দিবামাত্র রাজপুত্রী একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজকুমারকে সহসা সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া যুগপৎ চকিত, বিস্মিত, মুগ্ধ ও আহ্লাদিত হইলেন। যুবরাজের প্রত্যুত্তরে জানিলেন, তিনি সত্য সত্যই ভেক নহেন। কোন পরীর অভিশাপে তাঁহাকে ভেক হইতে হইয়াছিল। পরীর নির্দ্দেশ মত উপর্য্যুপরি ত্রিরাত্র রাজপুত্রীর সহাবস্থিতির ফলে আজ তাঁহার শাপান্ত হইয়াছে। এখন আর তাঁহার অন্য কোনও অভিলাষ নাই। রাজকন্যার সম্মতি পাইলে উভয়ে রাজধানীতে যাইয়া পিতার অনুমতি লইয়া যথাবিধি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সানন্দে কালাতিপাত করিতে বাসনা করেন। রাজকন্যা আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতে পক্ষিপালক ও সুবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত অষ্ট-ঘোটকে বাহিত সুখযান অশ্বযানে

আরোহণ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকুমারের বিশ্বস্ত প্রিয়ভৃত্য হেন্‌রী শ্রদ্ধাস্পদ যুবরাজের পুনঃ সঙ্গলাভে হর্ষোল্লাসভরে ঐ অশ্ব-শকট চালনা করায় অল্পকাল মধ্যেই উঁহারা নিজ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। অনন্তর মহা সমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইলে নবদম্পতি দীর্ঘকাল সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

এই গল্পের আখ্যানভাগে আমরা অভিশপ্ত ভেকরূপী রাজপুত্রের পরোপ-চিকীর্ষা, বিনয়, শিষ্টাচার, আশ্রিতবাৎসল্য ও প্রেমপ্রবণতার যথেষ্ট নিদর্শন পাই। অভিশাপে রূপান্তরিত হওয়ার রূপকথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহাতে রুচিবিকারের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

মহাত্মা থিয়োডার পার্কার বাল্যে একদিন সরোবরে পদ্মপত্রে উপবিষ্ট অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র একটী নিরীহ ভেককে লগুড়াঘাত করিতে যাইয়া হঠাৎ ভাবান্তর ঘটায় ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া সদাশয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'মা, আমি ত বালসুলভ খেয়ালের বশে বেঙ্‌টীকে লাঠি মারিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কেন যে ঐ কার্য্য হইতে সহসা নিবৃত্ত হইলাম, বুঝিতে পারিতেছি না।' মহামতি জননী শিখাইলেন, "বৎস, অকারণ নিরপরাধ বেঙ্‌টীকে আঘাত করিলে বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের হৃদয়ে ব্যথা লাগিত, তাই তিনি তোমায় সুমতি দেওয়ায় তুমি ঐ কার্য্য করিতে পার নাই। বৎস, জীব বলীয়সী প্রকৃতির দাস। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য আদেশে বহু অকর্ত্তব্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু দুরন্ত প্রকৃতি মায়াধীশ মহেশ্বরের শাসনে যখন জীবের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন আর সে কোন অকার্য্য করেনা। ইহাকে দেশান্তরবাসী বিশ্বাসী মানবেরা অন্তর্য্যামী ঈশ্বর প্রদত্ত "বুদ্ধিযোগ" বলেন। আমরা ইহাকে মানবাত্মার অন্তর্নিহিত বিবেক বলিয়া থাকি।" বেঙের গল্পপ্রসঙ্গে এরূপ অমূল্য নীতি উপদেশ চিরস্মরণীয়। বেঙের একটী নাম হরি। এখন হরিস্মরণ করিয়া শ্রীহরি করাই লেখকের একান্ত কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"হরি শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন"
চৈতন্যচরিতামৃত।

সঙ্কেতে, পরিহাসে, হেলায়, খেলায়, শ্রীহরির নাম গ্রহণে জীবের সর্ব্বদুঃখ নাশ ও ভগবানে পর প্রেমের উদয় হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীল ব্যাসদেবের উপদেশ। আমি ভেকের নামান্তর শ্রীহরির নাম গুণানুবাদে সমবেত সাহিত্যিক-মণ্ডলীর যে সময়টুকুর অপচয় করিলাম, আশাকরি নাম-মাহাত্ম্য মহিমায়, লোকের স্বাভাবিক প্রীতির পাত্র ভেকজাতির ন্যায়, শ্রীভগবৎ প্রেমের কণামাত্র অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের ক্ষতির সমূহ পূরণ হইবে। ইতি—

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

শক্তি তত্ত্ব

—:•:—

"নমামি নাথং সুরকল্প বৃক্ষং
গুরুং চিদানন্দ মহাবতারং।
নিত্যং হি বিজ্ঞানমানন্দরূপং
পরাৎপরং ব্রহ্মশিবস্বরূপম্ ॥"

"সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসৎ স্বরূপং
শক্ত্যাস্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতিবিশ্বং।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥"

সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব-রজ-তমাদি ত্রিগুণের আধার এবং নিরাকার হইয়াও স্বীয় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। • কৈবল্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "তথাদিমধ্যান্ত বিহীনমেকং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং" তথায় আবার উক্ত হইয়াছে "এ সব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং।" শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ তিনি আদি মধ্যান্তবিহীন হইয়াও এই সাদিমধ্যান্ত-জগতের আদিভূত নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এজন্য আগম ও নিগমাদিশাস্ত্রে একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে আদিনাথ মহাকাল, পরমশিব ও পরমাত্মা, নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এই অনবচ্ছিন্ন, আদ্যন্তরহিত মহাকালই চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদির গতিদ্বারা কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, যাম, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর ও কল্পাদিনামে পরিচ্ছিন্নবৎ কল্পিত ও আখ্যাত হইয়া থাকেন। উক্ত কলাকাষ্ঠাদি ইহার ব্যষ্টিরূপ, এবং যখন কলা কাষ্ঠাদি কল্পান্ত পর্য্যন্ত কালবিভাগ, কোটি কোটি প্রপঞ্চ-জগতের উৎপত্তি-স্থিতি ও লয়কার্য্য সমাধা করিয়া স্বস্ব নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমষ্টিভূত অনবচ্ছিন্ন, অনাদ্যন্ত পরম মহানরূপে বিদ্যমান্ থাকেন তখনই তিনি পরব্রহ্ম,

---

• যোগিনীতন্ত্রে ঈশ্বর প্রতি দেবীবাক্যং।

মম মায়াময়মিদং বিশ্বং দেবচরাচরং। বিক্ষেপাবরণে মাসারম্ভো মে পরমেশ্বর ॥

কালঃ কার্য্য প্রপঞ্চস্ত পরিণামেক কারণম্ ॥ শিবপুরাণ ক সং ॥

পরমশিব ও মহাকালাদি নামে অভিহিত হন। * এই মহাকাল নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তথাপি তাহার স্বশক্তি প্রভাবেই চন্দ্র সূর্য্যাদির উদয়, স্থিতি ও অস্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"অনাদি-র্ভগবান্ কালোনান্তোঽস্য দ্বিজ বর্ত্ততে। অবিচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গ স্থিত্যন্ত-সংযমাঃ॥" তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ঈশবাক্য "অহমেবকালো নাহং কালস্য" অথর্ব্ববেদেও উক্ত আছে "কালো ভূমিমসৃজত কালেতপতি সূর্য্যঃ। কালঃপ্রজা অসৃজত কালোঽগ্রে প্রজাপতেঃ। স্বয়ম্ভু কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত॥" এই আদিনাথ মহাকাল অনাদি, অনন্ত, অজেয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বতন্ত্র ও সকলের আত্মাস্বরূপ, এইহেতু কালই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। কূর্ম্মপুরাণে ভগবান্ কূর্ম্ম বলিতেছেন "অনাদিরেব ভগবান্ কালো কালো নন্তো নন্তো জরঃ পরঃ। সর্ব্বগশ্চ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বান্মহেশ্বরঃ॥ পরং ব্রহ্মচ ভূতানি বাসুদেবোঽপি শঙ্করঃ। কালেনৈবচ সৃজ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ। তস্মাৎ কালাত্মকং বিশ্বং সএব পরমেশ্বর॥" সমষ্টি মান্নুরব্যক্তং ব্যষ্টিং ব্যক্তং তথৈক।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে উক্ত আছে "কলনাৎ সর্ব্বভূতাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অনাদি নিধনত্বেন স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ॥" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "অহমেবাক্ষরঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতো মুখঃ" অর্থাৎ অবিনশ্বর সর্ব্বব্যাপী কালই জগৎ পালনাদি কার্য্য করিতেছেন। †

ফলতঃ আদিনাথ মহাকালই স্বীয় অনন্ত শক্তি প্রভাবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাঁহারই অচিন্ত্য অব্যক্তশক্তি প্রভাবে মনুষ্যগণ মাতৃগর্ভে দশমাস স্থিতি তৎপরে জন্ম এবং ক্রমশঃ শৈশব, বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যাদি দশবিধা দশা প্রাপ্ত হয় এবং দেহাবসানে স্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ, নরক ও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভাঃ নায়ান্তকালে শিশিরোষ্ণ বর্ষাঃ। না কালতো জায়তে ম্রিয়তেক না কালতো ব্যাহরতেচ কালঃ॥ নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তম্॥" এই কালশক্তি প্রভাবেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদিরও উৎপত্তি স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, ইঁহাকে লঙ্ঘণ করা কাহারও সামর্থ্য নাই। বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে "যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি সংহার কারকাঃ

* মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেবীংপ্রতি শিববাক্যং। তবরূপং মহাকালো জগৎসংহার কারকঃ। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

† কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। সর্ব্বেকালস্য বশগাঃ নকালঃ কস্যচিদ্বশে॥ ঈশ্বর গীতা। কূ-পূ॥

ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা —

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ।"

এই মহাকাল তাঁহার অনন্ত শক্তির অভেদে মহাকালী নামে অভিহিত হন। এই পরমা শক্তিই মহাবিদ্যা ও মহামায়া নামে সর্ব্বশাস্ত্রে আখ্যাতা। যোগিনী-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "শৈব কালী জগন্মাতা মহাকালতুল্যাতুলা। ভুত্বার্দ্ধে ঈশ্বরীরূপা মহাকালঞ্চ বিভ্রতী॥ শূন্যরূপং হি ক্রীড়ার্থং ভর্ত্তারং পর্যাকল্পয়ৎ॥ ফলতঃ দাহিকাশক্তি ও অগ্নিতে যেমন কোন প্রভেদ নাই তদ্রূপ পরব্রহ্ম মহাকালে ও তৎশক্তি ব্রহ্মরূপিনী মহাকালীতেও অণুমাত্র পার্থক্য নাই অতএব মহাকালী বলিলে একমাত্র শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীভগবতী গীতাতে মহাদেবী স্বয়ং বলিয়াছেন "জানীহিমাং পরাংশক্তিং মহেশ্বর কৃতাশ্রয়াং। শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান-মূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাং॥" আবার বলিয়াছেন "শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিণস্তত্ত্বদর্শিনঃ। বদন্তি মাং মহারাজ অতএব পরাৎপরং॥"

এই মহাকালশক্তি করুণাময়ী মহাবিদ্যা মহাকালীই সময়ে সময়ে আবির্ভূতা হইয়া গুরুরূপে তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া তাঁহার সৃষ্টজীবগণের মুক্তিসাধন করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মবিদ্যাই (১) কল্পারম্ভে কারণ-বারিতে ভাসমান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নিকট অশরীরী আকাশ-বাণীরূপে আবির্ভূতা হইয়া সৃষ্ট্যাদি শক্তিপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত আছে। সেই অনিরুদ্ধ সরস্বতীই আবার সত্যযুগে মদগর্ব্বিত ইন্দ্রাদি দেবগণের মোহ দূর করিবার জন্য তাঁহাদের সমক্ষে তেজোময় যক্ষরূপে (২) আকাশমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়া অগ্নি ও বায়ুদেবের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া পরে বহুশোভমান উমারূপে দর্শন দিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহাবিদ্যাই, যুগে যুগে ব্রহ্মাদিদেবগণ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-গণের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি প্রচার করিয়া লোকদিগের চতুর্ব্বর্গলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার এই পরিমেষ্ঠি গুরুরূপিনী কৈবল্য-দায়িনী কালীই ঘোর কলিকালের অজিতেন্দ্রিয় অল্পায়ু জীবগণের প্রতি কৃপাবশবর্ত্তিনী হইয়া দেবীশ্বর সংবাদচ্ছলে ত্রিযুগে কুলবধুর ন্যায় গুপ্তা শাম্ভবীবিদ্যা ত্রিচতুঃষষ্টি আগমরূপে প্রকাশ করিয়া অধম নরগণের অনায়াসে ভোগ-মোক্ষের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সচ্চিদানন্দরূপিনী নিত্যা হইয়াও যেমন সময়ে সময়ে সাধকদিগের প্রতি কৃপা করিয়া তৎকালোচিত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াসাধনো-পযোগী স্থূলরূপ ধারণ করিয়া সাধকগণের কার্য্যসিদ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শব্দ-ব্রহ্মরূপিনীর অঙ্গভূত বেদাগমাদি বিদ্যাও,

(১) দেবীভাগবত।৩।২।১৮॥ (২) কেনোপনিষৎ।২৬।১।

নিত্যা ও অব্যক্তা, ইহা যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৎকালোপযোগী হইয়া দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় মাত্র।*

কল্পারম্ভে (১) কারণ-সলিলোপরি ভাসমান্ রুদ্রদেবের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া চিন্ময়ী মহাদেবী যখন বিরাটরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন, সেই সময় রুদ্রদেব মহাদেবীর আদেশে সুষুম্নাপথে গমন করিতে করিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাতে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া মহাদেবীর হৃদ্‌পদ্মে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আগমনিগমাদি শাস্ত্রময় শব্দ-ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। দেখিলেন আগম, ঐ মূর্ত্তির পরমাত্মা, সাঙ্গবেদ চতুষ্টয় উঁহার জীবাত্মা, ষড়্‌দর্শন উঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়, মহাপুরাণ ও উপপুরাণসমূহ উঁহার স্থূলদেহ, স্মৃতি উঁহার হস্তাদি অবয়ব এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ উঁহার লোমনিচয়। আবার তাঁহার হৃদপদ্মের পত্রাগ্রে ও পত্রমধ্যে তেজোময়ী পঞ্চাশন্মাতৃকা দেখিতে পাইলেন। তথায় বিরাটরূপিনীর হৃদ্‌পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, সর্ব্বধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান-ময়, সর্ব্বমায়া-নিকৃন্তনকারী, সর্ব্বসিদ্ধি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণময় মূর্ত্তিমান্ আগমশাস্ত্র দর্শন করিয়া মহাকালীর অনুগ্রহে উঁহা সম্যক্ অভ্যাস করিলেন এবং ক্রমশঃ বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্রাদিও আয়ত্ত করিলেন। পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার নিকট হইতে এই আগম-নিগমময় জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

সত্যযুগারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেবর্ষিদিগের নিকট বেদচতুষ্টয়, ও স্মৃতি-পুরাণাদি প্রকাশ করেন, পরে দেবর্ষি নারদাদির নিকট হইতে নৈমিষারণ্যবাসী নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় উহা প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষিদেব ব্যাসকে তাহা শিক্ষা দেন এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তাঁহার প্রিয়শিষ্যদিগকে ঐ বিদ্যা উপদেশ দেন, এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিতা হইয়াছে। উক্ত প্রমাণে জানা যাইতেছে ব্রহ্ম যেমন নিত্য, ব্রহ্ম-প্রতি-পাদক আগমনিগমও তদ্রূপ নিত্য। তন্ত্রে আগম শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে যে "আগতং শিববক্ত্রেভ্যঃ গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম-মুচ্যতে॥"

সত্যাদিযুগে যেরূপ উপনীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই কেবল বেদমতে উপাসনা করিবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু শূদ্রাদি হীন জাতির উহাতে কোনরূপ অধিকার ছিলনা; সেইরূপ সত্যাদি যুগত্রয়ে জিতেন্দ্রিয়, অদ্বৈত-

* চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মস্বরূপকং। বর্ণরূপেণ তদ্ব্যক্তং মন্ত্রবিদ্যাবিভেদতঃ।
গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

(১) যোগিনীতন্ত্র। ১। পটল।

ভাবাপন্ন, ব্রহ্মজ্ঞ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি-গণেরই কেবল এই সর্ব্ববিধ-অজ্ঞানজনিত-ভেদাভেদনাশক, অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞানদায়ক আগমশাস্ত্রে অধিকার ছিল। তাঁহারাই কেবল তন্ত্রমতে ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করিতেন এবং এই বিদ্যা শিবশাসনানুসারে "মাতৃজারবৎ" গোপনে রাখিয়া, সাধনা-করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া পরে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে কর্ম্মীসাধক-দিগের নিকট এই আগমোক্ত উপাসনা সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, তজ্জন্য আজকাল তন্ত্রশাস্ত্রকে আধুনিক মনে করেন।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে সত্যাদি-যুগত্রয়ে দ্বিজবালকগণ উপনয়নান্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদের কর্ম্মকাণ্ড (সংহিতা) ও জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষৎ) মুখে মুখে অভ্যাস করিতেন। তখন বেদের কোন বিভাগ ছিল না বা উহা তখন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধও হয় নাই। কিন্তু দ্বাপরযুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস ঐ বেদ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, ইহা হইতে বেদের আধুনিকা কখনই প্রমাণিত হইতে পারে না। আগমোক্তা পরাবিদ্যাও সত্যাদিযুগত্রয়ে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল এবং এখনও আসিতেছে। দ্বাপরযুগের শেষভাগে ও কলিযুগের প্রারম্ভে পরমকারুণিক হরপার্ব্বতী সুরম্য কৈলাস-শিখরে আসীন হইয়া অজ্ঞানান্ধ নরগণের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীভৈরব-ভৈরবী-সংবাদরূপে অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ আগম-শাস্ত্রকে ত্রিচতুঃষষ্টি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পার্ব্বতীর প্রিয় পুত্রদ্বয় গণপতি ও কার্ত্তি-কেয়কে উহা বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণকে উহা শিক্ষা দেন এবং ঋষিগণও তাঁহাদের স্বস্ব শিষ্যগণকে এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ শিখাইয়াছিলেন।

আগমজ্ঞ ঋষিগণের মধ্যে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার মহাত্মা দত্তাত্রেয়ই প্রধান। আগ-মোক্তা পুরাতনী ব্রহ্মবিদ্যা, কল্পারম্ভ সময়ে মহাযোগী রুদ্রদেব প্রথমে মহাবিদ্যা-মহা-কালীর নিকট প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে তিনি বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ গুপ্তবিদ্যা দান করেন এইজন্য মহাদেবীই জগতের আদিগুরু। যোগিনী তন্ত্রের নবম পটলে এবং গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রের উনচত্বারিংশ ও চত্বারিংশত্তম পটলে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। যোগিনীতন্ত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন "দৃষ্ট্বাগমমিমং তত্র মম-জ্ঞানাম্বুসাগরে। অভ্যস্তং হি ময়াসর্ব্বং মহা-কালী প্রসাদতঃ। অত আদিগুরুঃ হি বর্ত্ততে মম সর্ব্বদা"॥ এই পরমাবিদ্যা চিতিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে বর্ত্তমান্ আছেন, তবে সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে যথাবিধি ইহাঁর সাধনা করিলে ইনি জ্ঞানীহৃদয়ে প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া প্রকাশিতা হন মাত্র।

সত্যযুগে বেদমতে উপাসনার প্রাধান্য ছিল, তখন কর্ম্মী দ্বিজগণ ধনৈশ্বর্য্যপুত্রাদি-কামনায় ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম, বরুণ ও উষা প্রভৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ পর-মেশ্বরের বিশেষ শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবগণের আরাধনা করিতেন; নিষ্কাম ব্রহ্মর্ষি ও

মহর্ষিগণ সর্ব্বশক্তিমানের পূর্ণশক্তি ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা করিতেন। চণ্ডীতে আছে "যা-মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয় তত্ত্বসারৈঃ। মোক্ষার্থিভি মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি'॥ আমরা ঋগ্‌বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই মহাত্মা অম্ভৃণ ঋষির ব্রহ্মবিদুষী কন্যার হৃদয়ে মহাদেবী আবির্ভূতা হইয়া ঋষিগণের নিকটে ব্রহ্ম-বিদ্যার স্বরূপ-বর্ণনা করিয়াছিলেন। উহা অদ্বৈতবাদপূর্ণ দেবীসূক্ত নামে অভিহিত "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈরিত্যাদি"। ইহাই মহাদেবীর বৈদিক স্বরূপাখ্য স্তোত্র।

আবার ত্রেতাযুগে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের মতে কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ (১), রাজর্ষি বিশ্বামিত্র (২), বিদেহরাজ জনক জমদগ্নিতনয় ভৃগুরাম (৩), এবং শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ পূর্ণশক্তি ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক ছিলেন।

দ্বাপরযুগে বেদ ও স্মৃতিমত প্রচলিত থাকিলেও পুরাণমতেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইত; কিন্তু বসুদেবতনয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ (৪) যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব (৫) মহামতি ভীষ্মপ্রভৃতি রাজর্ষিগণ, মহামুনি বেদব্যাস, মহাত্মা শুকদেব, আসিতদেবল এবং দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ যে পূর্ণশক্তি মহাবিদ্যার উপাসক ছিলেন, মহাভারতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই বর্ত্তমান কলিযুগে এখনও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিবাহাদি দশবিধসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বেদমতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; চান্দ্রায়ণাদি আশ্রমাচার ও দায়-ভাগাদি ব্যবস্থা স্মৃতিমতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং শারদীয়া দুর্গোৎসব ও নানাবিধ ব্রতাদি পুরাণ মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দীক্ষা ও সশক্তি ব্রহ্মোপাসনা এবং নানাবিধ যোগ সাধনা আগমমতেই হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে বহুকাল হইতেই তন্ত্রমতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়া আসিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এজন্য উক্ত আছে যে "আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ"॥

আগমশাস্ত্র সত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ, তন্ত্র, যামল ও ডামর। ইহার সংখ্যা অশ্ব-ক্রান্তের জন্য চতুঃষষ্টি, রথক্রান্তার জন্য চতুঃষষ্টি ও বিষ্ণুক্রান্তার জন্য চতুঃষষ্টি নিরূপিত; সুতরাং এই হিসাবে মোট একশতদ্বিনবতি-সংখ্যক আগমশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমানগণের রাজত্ব সময়ে অনেকগুলি তন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে; এখন অল্পসংখ্যক গ্রন্থ যাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধকদিগের নিকট আছে তাহা ইঁহাদের স্বশিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখিতে দেন না সুতরাং তাহাও লুপ্তপ্রায়। তবে ৺রসিক

(১) চীনাচারতন্ত্র। (২) গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র।
(৩) কালীকুলসর্ব্বস্ব ও মহাভারত। (৪) রাধাতন্ত্র। (৫) মহাভারত।

মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কয়েকখানি তন্ত্রের কয়েক পটল মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইংলণ্ড-নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত আর্থার এবেলেন মহোদয়ের চেষ্টায় অনেক দুর্লভ তন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উদ্ধৃত হইবে আমরা আশা করিতেছি।

যোগিনী তন্ত্রে ঈশ্বর দেবীকে বলিয়াছেন "জীবাত্মনোর্যথা ভেদস্তথা বেদাগমেষ্বপি॥" অর্থাৎ অবিদ্যাবৃত জীবের সহিত বিদ্যাময় ঈশ্বরের যেমন ভেদ দৃষ্ট হয় বেদ ও আগম শাস্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ সংহিতা ভাগে যজ্ঞকালে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথক ঈশ্বরভাবে পূজিত হইতেন তাঁহারাই তন্ত্র-মতে সর্ব্বশক্তিরূপিনীর দিক্‌পালিনী শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। বেদ ও বেদস্থানীয় পুরাণাদির ব্রহ্মাবিষ্ণু-রুদ্ররূপী ঈশ্বরত্রয়, তন্ত্রে সর্ব্বশক্তিময়ীর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা; সুতরাং তাঁহারা মহাদেবীর আসনের খুরারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। দেবীগীতাতে মহা-দেবী বলিতেছেন "ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চমহাপ্রেতাঃ পাদমূলে মমস্থিতাঃ। পঞ্চভূতাত্মকাহ্যেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি। অহন্ত্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতাস্মি সর্ব্বথা। ততো বিষ্টরতাং যাতাঃ শক্তিতন্ত্রেষু সর্ব্বদা"॥

আবার বেদে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি জাতিভেদ স্ত্রীপুরুষাদির অধিকার-ভেদ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রাদিতে অধিকারী, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নী বেদমন্ত্রোচ্চারণে অধিকারিণী নহেন; ইহা গঙ্গোদক, ইহা কূপোদক ইত্যাদি দ্রব্যভেদ, এরূপ বিবিধ ভেদবাদ দৃষ্ট হয় সুতরাং এইরূপ শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান উক্ত মহাবাক্যের জ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকস্বরূপ তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু তন্ত্র উদারতার সহিত বলিতেছেন 'একমেব পরংব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং" তান্ত্রিক সাধকেরা এই মহাবাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া বেদের "অগ্রাহ্যমপেয়ম্" মদ্যকে শোধন করিয়া সুধাসম পবিত্র মনে করিয়া স্বদেহস্থ চিদ্রূপিনা কুলকুণ্ডলি-নীর মুখে আহুতি দিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধকেরা আবার "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই বৈদিক মহামন্ত্রের তত্ত্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়া অন্নের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া "অন্নব্রহ্ম" বোধে উহা মহাদেবীকে নিবেদন করিতে বলিতেছেন এবং আরও বলিতেছেন ঐ নিবেদিত অন্ন "মহাপ্রসাদ"ও অতি পবিত্র। উহা 'আনীতং শ্বপচেনৈব শ্বমুখাদ-পিনিঃসৃতং। তদন্নং পাবনং দেবি দেবানা-মপি দুর্লভং" অর্থাৎ মহামন্ত্রে নিবেদিত অন্ন যদি কুকুরের মুখ হইতে নির্গত হয় এবং চণ্ডালাদি হীনজাতিদ্বারাও আনীত হয় তাহা হইলেও উহা অতি পবিত্র ও দুর্লভ বলিয়া জানিবে। আবার বেদ ও

স্মৃতি বলিতেছেন যে চণ্ডালাদি হীন জাতি অস্পৃশ্য; উহাকে স্পর্শ করিলে অবগাহন স্নান ও অঘমর্ষণাদি করা উচিত। কিন্তু তন্ত্র বলিতেছেন "কুলজ্ঞানী শ্বপচোঽপি ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী চণ্ডালও ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তন্ত্র আরও বলিতেছেন "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণাদ্বিজোত্তমাঃ।" অর্থাৎ সকলেই যখন এক জগন্মাতার সন্তান তখন অন্য সময়ে ভাবান্তর থাকিলেও তাঁহার উপাসনার সময় অন্ততঃ জাতিভেদ কল্পনা করা উচিত নহে। এই তান্ত্রিক উপদেশের বলেই পুরীধামে শ্রীশ্রীবিমলা দেবীর বিমলাক্ষেত্রে সর্ব্বজাতীয় লোকের একত্র আহারাদির সময়ে জাতিভেদ রহিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে মহোৎসবাদিতে ঐ আচার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

বেদ বলিতেছেন "ভুক্তাকিঞ্চিন্নচাচরেৎ' অর্থাৎ আহারাদি করিয়া যাগযজ্ঞাদি উপাসনা কিছুই করিবে না। কিন্তু তন্ত্র বলিতেছেন "তৃষ্ণার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কালিকাং নৈব পূজয়েৎ। পূজয়েৎ যদি দেবেশি ক্ষুধার্ত্তবতি কালিকা॥" অর্থাৎ শিব ও জীব যখন বস্তুতঃ অভেদ তখন জীবাত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট দিয়া পরমাত্মার উদ্দেশ্যে "নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি" বলিয়া পূজা করা অতীব নিষ্ফল ও অজ্ঞানতার কার্য্য সন্দেহ নাই। আবার বেদার্থ স্মৃতি বলিতেছেন নারায়ণরূপী শালগ্রাম শিলা কেবল কৃতস্নান উপনীত ব্রাহ্মণদিগেরই স্পৃশ্য ও অর্চ্চনীয়। কিন্তু তন্ত্র বলিতেছেন ব্রহ্মের অনন্তত্বসূচক বাণলিঙ্গ এবং অন্যান্য শিবলিঙ্গ ও শক্তিমূর্ত্তি সকল কি ব্রাহ্মণ কি স্ত্রী, শূদ্র চণ্ডালাদি সকলেরই স্পৃশ্য ও পূজ্য। ফলতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এইরূপ বহুতর ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিবন্ধক বিধিবাক্য দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জ্জুন।' অর্থাৎ হে অর্জ্জুন বেদ কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিতেছেন, অতএব তুমি যখন গুণাতীত ব্রহ্মপদ প্রার্থনা করিতেছ তখন ত্রিগুণাত্মক বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রানুসারে সাধনা কর।

যাহা হউক আচার ও উপাসনা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যে কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না, এ বিষয়ে বেদ ও তন্ত্র উভয়েরই এক মত। নির্ব্বাণতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন, "তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি তথা মুক্তির্ন জায়তে"। বেদান্ত বলিতেছেন সাধক যখন "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক" অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করে এবং "ইহামুত্রার্থ ফলভোগবিরাগ" অর্থাৎ ঐহিক পার্থিবসুখ এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগে অনাস্থা, "শমদমাদি ষট্‌কসম্পত্তি" এবং "মুমুক্ষত্ব" এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বিচারপূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সোঽহং জ্ঞানলাভ

করেন তখনই তিনি নির্ব্বাণ-পদবীর যোগ্য হন। কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনায় কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মিশ্রিত রহিয়াছে।

আগমশাস্ত্র দ্বৈতভাবাপন্নপশুদিগকে দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত বীরভাবের সাধনার উপদেশ দিয়া অদ্বৈতাচারসম্পন্ন জীবন্মুক্ত দিব্যপদে লইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করেন। মনু বলিয়াছেন "দ্বৈতান্ পশূন্ বিজানীয়োদদ্বৈতান্ ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ।" রুদ্রযামল বলিয়াছেন "তেষাং জ্ঞান প্রকাশায় বীরভাব প্রকাশিতঃ। বীরভাবে জ্ঞানদৃষ্টিং ব্রহ্মসিদ্ধি সমাপ্যচ। দেবতা ভবতিক্ষিপ্রং সত্যে নির্ম্মলভাবকে ॥'

বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বৈত ভাব বুঝিবার জন্ত অনেক যুক্তিপূর্ণ উপদেশ আছে, কিন্তু কিরূপে অদ্বৈতভাবাপন্ন হওয়া যায় তাহার বিশেষ কোনরূপ পন্থা নির্দ্দেশ করা নাই। তজ্জন্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ শূদ্রাদি নীচ জাতিকে স্পর্শ করা অপবিত্র মনে করেন এবং খাদ্যাখাদ্য ও মেধ্যামেধ্য বিচার তাঁহাদেরই মধ্যে যথেষ্ট। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ যমন "ভাবাদ্বৈত" তেমনই আবার "ক্রিয়াদ্বৈত।" যোগবাশিষ্ট রামায়ণে উক্ত আছে "ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং-তথাত্মনং। বর্জয়ন্নাত্মভূত্বেহ ত্রান্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ ॥" তান্ত্রিক উপদেশানুসারে সাধক প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সুপ্তোত্থিত হইয়া শয্যাতে বসিয়াই এইরূপ আত্মধ্যান করিতে উপদেশ পান "অহংদেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥" তৎপরে মধ্যাহ্নে পূজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভূতশুদ্ধি সময়ে ক্ষিত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পরমাত্মাতে লীন চিন্তা করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদজ্ঞানকরতঃ সাধক "সোঽহং" এরূপ ধ্যান করিয়া মানস পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে বলিয়াছেন "গুরুরত্না বিধানেন সোঽহমিতি পুরোধসঃ। ঐক্যং সম্ভাবয়েদ্ধীমান্ জীবস্য ব্রহ্মণোঽপিচ" ॥ নিত্যপূজাঙ্গভূত মহা-বিদ্যার প্রত্যেক স্থূলধ্যানেও স্বীয় আত্মার অভেদে মহাদেবীকে চিন্তা করার উপদেশ তন্ত্রের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন "এবং ধ্যাত্বা ততোদেবীং সোঽহমাত্মনমর্চ্চয়েৎ" ॥ কুব্জিকাতন্ত্রে বলিয়াছেন "তয়াসহিতমাত্মানমেকীকৃতং বিচিন্তয়েৎ" ॥ নীলতন্ত্রে মহাদেবী তারার ধ্যানে লিখিত আছে "এবং ভূতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ং" ॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে মহা-দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যানের শেষভাগে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন "নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধং স্বাত্মানং ত্রিপুরাময়ং। স্বাত্মাভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ। সাহং ইত্যস্য সততং চিন্তনাত্তন্ময়োভবেৎ ॥" আবার কালীকুলসর্ব্বস্বে শিব বলিয়াছেন "আত্মানং কালিকাত্মানং ভাবয়ন্ স্তৌতি যঃ শিবাং। শিবোপমং গুরুং ধ্যাত্বা স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥" এইরূপ কুলার্ণব তন্ত্রে

বলিয়াছেন "দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবোদেবঃ সদাশিবঃ। ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোহহংভাবেন পূজয়েৎ॥" এই-রূপভাবে পরমাত্মরূপিনীকে স্বীয় আত্মার অভেদে চিন্তা করা যে কেবল পূজাদি সময়ে করিতে হইবে তাহা নহে, আহার বিহারাদি সর্ব্বকার্যাই অদ্বৈতভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ইহাই শিবের আদেশ। তাই তিনি গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন "অহং দেবোহথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। দেবাধারোহহং দেবো ন দেবোমৎপরঃক্কচিৎ। দেবমেব যজে চাহং দেবদেবোহহমেবচ॥" আবার কারণাদি গহন সময়ে এইরূপ নিয়ম বলিয়াছেন "আজিহ্বান্তাং কুলকুণ্ডলিনীং বিভাব্য—ওঁআর্দ্রংজ্বলন্তি জ্যোতিরেবাহং ব্রহ্মাহমস্মি সাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা—এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়স্থ চিদগ্নিতে আহুতি দিবে"। এইরূপে অদ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া বীরাচারে মহাবিদ্যার সাধনা করিলে তাঁহার কৃপায় সাধকের যখন দিব্যভাব উপস্থিত হয়, তখন তিনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ধ্যাননিরত হইয়া জীবন্মুক্ত হন ও দেহান্তে মহাদেবীর পরমপদে লীন হয়েন। দেবী গীতায় শ্রীশ্রীদেবী বলিয়াছেন "মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতাবিদঃ"। আবার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দ্রব্য স্বীকারের মন্ত্রে ঐরূপ অদ্বৈত ভাবের উপদেশ আছে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"।

এইরূপ অদ্বৈতভাবে একমাত্র সচ্চিদানন্দময়ী মহাবিদ্যাই শিবশক্তির অভেদে উপাস্যা। যদিও তান্ত্রিক উপাসকগণ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত তথাপি 'শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। যতস্তেহপি-উপাসন্তে গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং"॥ অর্থাৎ বেদমাতাগায়ত্রী দেবীর উপাসক মাত্রেই শাক্তসম্প্রদায়ভুক্ত। অন্য চারি সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরাও ইঁহাদের স্ব স্ব পুংদেবতার নামে শক্তিনাম যুক্ত করিয়া জপ-পূজাদি করিয়া থাকেন। শৈবেরা উমামহেশ্বর, শিবদুর্গা, হরগৌরী, কালীশঙ্কর ও অর্দ্ধনারীশ্বর ইত্যাদি নামে শ্রীশিবের পূজাদি করেন। কৈবল্যোপনিষদে উক্ত আছে "হৃদাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতং। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং। ধ্যাত্বা-মুনির্গচ্ছতিভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ"॥ বৈষ্ণব সাধকেরা রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, শ্রীহরি ও শ্রীগৌর ইত্যাদি নামে শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি করেন। নির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আদৌ-রাধা ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ। তেষাঞ্চসদ্গতিঞ্চাত্র দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ'।*

* বৈষ্ণবগণ প্রণবের শিবশক্ত্যাত্মক অর্থ করিয়া থাকেন। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক নায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ পদ্মসংহিতা।

শ্রীরাম-ভক্তগণ "রাম" নামের পূর্ব্বে "সীতা" নাম যুক্ত করিয়া জপপূজাদি করেন। ঐ যুগল নাম জপে মহাদেবীর "তারা" নাম জপ হইয়া থাকে, এজন্য ইহাকে "তারকব্রহ্ম" নাম বলে। এইরূপ সৌরেরা "প্রকাশ শক্তি সহিতায় শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া পূজাজপাদি করেন। এতদ্ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের স্বস্ব মূলমন্ত্রে দেবী-প্রণব "হ্রী" বীজ যুক্ত আছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত পঞ্চ-সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সগুণ-নির্গুণভেদে "শিবশক্ত্যাত্মক" ব্রহ্মের উপাসক, তজ্জন্য শিবতন্ত্রে বলিয়াছেন "শিবশক্ত্যাত্মকং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্যকারণম্ তয়োর্যোগময়ং মন্ত্রং তয়োর্যোগেন সংজপেৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মকে পিতৃ-মাতৃভাবে উপাসনা করিলেই সাধকের মুক্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। মন্ত্রসকল শিবশক্ত্যাত্মক অতএব শিবশক্তিকে অভেদেই চিন্তা করিবে। তন্ত্রে শিব আবার বলিয়াছেন "অবিনাভাবসম্বন্ধং তয়োরেব পরস্পরং"। অর্থাৎ শিবশক্তির কোন পার্থক্য নাই, যিনি শিব তিনিই শক্তি! পিতৃভাব ও মাতৃভাব কেবল শব্দতঃ পৃথক্, স্বরূপতঃ একই পদার্থ; তাই আবার তন্ত্র বলিতেছেন "শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ। স্ত্রী পুংনপুংসকাভেদাঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ"॥ অর্থাৎ শক্তি মহেশ্বর ও ব্রহ্ম এই তিন শব্দই একমাত্র অদ্বিতীয়া নিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী মহা-বিদ্যাকে লক্ষ্য করিতেছে।

মহাবিদ্যা বস্তুতঃ নির্গুণা ও নিত্যা হইলেও সাধকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য গুণক্রিয়ানুসারে নানাবিধ মায়াত্মক রূপধারণ করেন। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে" দেব্যাগমে উক্ত হইয়াছে "চিতিরূপা মহামায়া পরংব্রহ্মস্বরূপিণী। সেবকানু-গ্রহর্থায় নানারূপং দধার সা"॥ অর্থাৎ চৈতন্যরূপিণী পরংব্রহ্মময়ী মহাদেবী সাধকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাদেবীকে স্ত্রীরূপিণী বা পুংরূপিণী ধ্যান করা যাইতে পারে; কারণ স্থূলদেহীরই স্ত্রী-পুরুষ কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু মহাদেবী সচ্চিদানন্দময়ী তাঁহার পুং-স্ত্রী কল্পনা অসম্ভব তথাপি শক্তি-সাধকেরা ব্রহ্মকে মাতৃভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ এই প্রপঞ্চময় জগতে ব্রহ্মস্বরূপিণীর মাতৃভাবেরই পূর্ণ বিকাশ একমাত্র সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যামলে শিব বলিয়াছেন "স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং স্মরেৎ প্রিয়ে। স্মরে দ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীং। নেয়ং যোষিন্ন পুমাচ ন ষণ্ডোন জড়ঃ স্মৃতঃ। তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে"। ফলতঃ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৎস্যাদির জন্ম ও স্থিতির প্রধান কারণ তাহাদের স্ব স্ব জননী, তাহাদের জনক কেবল মাতার সহকারী মাত্র। জীবনমাত্রেই তাহাদের জননী-জঠর হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় মাতার স্তন্যপান

করিয়া জীবিত থাকে এবং জন্মিয়াই "ম" মন্ত্রে প্রথম স্বভাবতঃই দীক্ষিত হয়, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই আদিগুরু স্বীয় জননী এবং নিজ মাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ; কারণ মনুষ্যমাত্রেরই স্বীয় স্বীয় জননীর নিকট হইতে সর্ব্ববিষয়ের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রসবধর্ম্মিণী পৃথিবী জীবভোজ্য নানাবিধ ফলশস্য উৎপাদন করিয়া সমস্ত জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া আহার ও পানীয়-দানে মাতৃভাবে নিয়ত পালন করিতেছে অতএব এই জগৎ যে মাতৃময় তাহার আর সন্দেহ নাই। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন "পিতৃভ্যোপি গুরুর্মাতা নাস্তি মাতৃসমো গুরু। গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী"॥

গণিত শাস্ত্রের (০) শূন্য যখন অন্য কোন সংখ্যার সহিত যুক্ত না থাকে তখন কোন অর্থই থাকে না কেবল অনন্তত্বসূচক নিরাকার সৎপদার্থমাত্র, কিন্তু উহা একের (১) সহিত যুক্ত হইলে এই এককে দশে (১০) পরিণত করে, সেইরূপ নির্গুণা নিরাকার ব্রহ্মরূপিণী যখন অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণ শুক্লং শ্রুত্যুক্তা স্বীয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত যুক্ত হন তখনই তিনি শিব-শক্তিময়ীদশমহাবিদ্যা ও দশাবতারাদি রূপ ধারণ করিয়া সাধকদিগের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ক্রিয়াবিশেষেও ত্রিগুণের তারতম্যানুসারে "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তাচবিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা" প্রভৃতি দশবিধমূর্ত্তি ও সময় অন্যান্য দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। কোন কোন তন্ত্রে অষ্টাদশমহাবিদ্যায় উল্লেখ আছে, সেই সকল মূর্ত্তিও এই দশমহাবিদ্যার কোন না কোন মূর্ত্তির রূপান্তর মাত্র। *

এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে কালিকামূর্ত্তি শুদ্ধসত্বগুণপ্রধান নির্ব্বিকারা এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ-প্রকাশিকা এবং এই আদ্যামূর্ত্তিই একমাত্র প্রত্যক্ষভাবে কৈবল্যদায়িনী যোগিনী তন্ত্রে শিবের প্রতি দেবীবাক্য "ইদানীং পঞ্চমত্রূপং ব্রহ্মানন্দং পরাৎপরং। তদ্রূপং পরংধাম কালীরূপমিতি শৃণু। ইতঃপরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রাচিৎ"॥ আমরা চণ্ডীতেও দেখিতে পাই শুম্ভদৈত্য-বিনাশ-কামনায় ইন্দ্রাদিদেবগণ যখন একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর আরাধনা করিতেছিলেন তখন তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া বরদানে উদ্‌যুক্তা হইলেন, এমন সময় তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে তমঃপ্রধানারজগুণময়ী কৌষিকী দেবী দানব-বিনাশের জন্য বহির্গতা হইলে শুদ্ধসত্বগুণময়ী যে মূর্ত্তি সাক্ষীস্বরূপিণীভাবে হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন উহাই আদ্যাকালিকা নামে আখ্যাতা হইলেন, "কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া", কামধেনু তন্ত্রে শিব বলিয়াছিল "শূন্যেষু

* দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে—
একো ভূত্বা যথা মেঘঃ পৃথক্‌ত্বে নাবতিষ্ঠতে। বর্ণতো রূপতশ্চৈব তথাগুণ বশাদ্ভুবা॥

সংস্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী”, অর্থাৎ নিরাকারা নির্ব্বাণমোক্ষদায়িনী কালিকা এই প্রপঞ্চজগতের মধ্যে ও বাহিরে মহাশূন্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। মহাকাল-সংহিতায় উক্ত আছে “পঞ্চশূন্যে স্থিতাতারা সর্ব্বান্তে কালিকাস্থিতা” লিঙ্গ পুরাণে শিব বলিতেছেন “মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালীযুত সদা। দেহ মধ্যে মহেশানি লিঙ্গাকারেণ বেষ্টিতঃ।”

(আগামীবারে সমাপ্য)।

শ্রীবিমলানন্দ স্বামী।

বাক্যালাপ

—০—

" What would you not give to have an hour's frank talk with Shakespere—if Shakespere were now living? You cannot think of yourself so poorly as not to feel sure that, at the end of the hour, you would have got something out of him which fifty years' study would not suffice to let you get out of his play.

*　　*　　*

If the whole be greater than a part, a whole man must be greater than that part of him which is found in a book.

Lord Lytton in "Caxtoviana."

সত্য, মানুষের সঙ্গে একবার প্রাণ খুলে আলাপ করে যা পাওয়া যায়, তা তার বই পড়ে কিম্বা তার সঙ্গে পত্রালাপ করে কখনও পাওয়া যায় না। মানুষের অন্তর যেমন তার মুখের ভঙ্গিমায়, তার স্বরের তারতম্যে, তার চোখের আভায় প্রকাশ পায়, তেমন আর কিছুতে প্রকাশ পায় না। কেতাবে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানুষের ভাগ-করা, পৃথক করা একটা অংশ মাত্র। বাক্যালাপে কিন্তু গোটা সেই মানুষটাকেই পাই; আর সে মানুষ তার পুস্তকে প্রকাশিত অংশের চেয়ে অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক রহস্যময়।

মানুষের মত মানুষের সঙ্গে বিরলে প্রাণ

খুলে আলাপ করার মত বিমল আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। এই আলাপ যদি দুটী kindred spirits (একভাবাপন্ন প্রাণ) এর মধ্যে হয়, তাহলে উভয়েই তাতে সমান আনন্দ পেয়ে থাকে, আর এই আলাপে উভয়েই এমন সব সমুজ্জ্বল সত্যের সন্ধান পায়, যা তারা হয়তো কখনো কল্পনাও করে নি!

আমাদের এই এলোমেলো দেশে বাক্যালাপও একটা এলোমেলো, আকার-প্রকারহীন জিনিষের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। বাক্যালাপ যে একটা অতিসূক্ষ্ম, অতি সুন্দর এবং অতি delicate আর্ট, তা আমরা এখনও ভাল করে বুঝতে শিখি নি। তাই আমাদের বাক্যালাপের মধ্যে কোনো শিল্প, কোনো সৌন্দর্য্য, বা কোন বিশেষত্ব নাই। খানা-ডোবায়-পড়া বর্ষার জলের মত সেটা পঙ্কিল উচ্ছ্বাসে, কদর্য্য গতিতে ঠাঁই-বেঠাঁই-এর বিচার না করে তার ছন্দ-হীন বর্ষার গান গেয়ে চলে যায়। সুর এবং সৌন্দর্য্য তাতে মাঝে মাঝে দেখা দেয় বটে, কিন্তু তারা কোন শিল্প-নিয়মের অনুবর্ত্তন করে না। সেই সুরের সঙ্গে discord (বেসুর), সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কদর্য্যতা মেশানো থাকে। সে সুরকে এসরাজের ঝঙ্কারও বলা চলে না, আর সে সৌন্দর্য্যকে শিল্পীর সৃষ্টিও বলতে পারি না।

বাক্যালাপের আর্টটা কিন্তু একেবারেই এ-রকমের নয়। পার্ব্বত্য উপবনের মধুর-ভাষিণী নির্ঝরিণীর মতই সে কুল-কুল তানে নাচতে নাচতে চলে যায়। কখনও সে ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবার কখনো-বা স্নিগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মিষ্টালাপ করতে করতে ধীর মন্থর গতিতে চলতে থাকে। উভয়েরই গতির মধ্যে একটা আবেগ, একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা উদ্দেশ্য, একটা উত্তেজনা তীব্র অথচ সংযত ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে থাকে।

প্রকৃত বাক্যালাপে দুই আলাপীর প্রাণের মধ্যে গভীর একটা মিল থাকা চাই, অথচ তাদের চিন্তার ধারা হবে বিভিন্ন প্রকৃতির। মূলগত মিল না থাকলে আলাপ কলহে পর্য্যবসিত হবে, আর চিন্তার ধারা একেবারে অভিন্ন হলে সে এক-মতেরই পুনরাবৃত্তি হবে, আলাপ হবে না। আলাপীদের মনের unity in diversity আর diversity in unityই হচ্ছে আলাপের প্রধান উপকরণ। দুই বন্ধু যখন একই গন্তব্যে মিলিত হবার জন্য দুই বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রতিযোগিতা করে চলতে থাকে, তখন তাদের মনে যে আনন্দ, যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেইটেই হচ্ছে বাক্যালাপের প্রকৃত রস।

ইচ্ছা করলেই কিন্তু প্রকৃত বাক্যালাপী হওয়া যায় না। তার জন্য প্রতিভা আর সাধনা দুয়েরই দরকার। আলাপীর প্রাণে ভাবের একটা স্বচ্ছন্দ খেলা চলা চাই, আর সেই খেলাকে মূর্ত্তি দেবার ক্ষমতাও আলাপীর ভাষায় থাকা চাই। মোট কথা, যে-গুণে কারও লেখা রচনা পড়বার যোগ্য

হয়, ঠিক সেই গুণেই তার কথাও শোনবার যোগ্য হয়। দুয়েরই মধ্যে কৌতুকের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য, আনন্দের সঙ্গে বিষাদ, তুচ্ছের সঙ্গে মহান ভাব এক অপূর্ব্ব শৈল্পিক অনুক্রমে প্রকাশ পায়, আর রসিকের মনকে অপূর্ব্ব রসে সিক্ত করে।

বাঙলার চেয়ে আমি ইংরাজিতেই বাক্যালাপ পছন্দ করি। তার কারণ, সাহিত্যিক এবং কথিত ভাষার বিচ্ছেদ আমাদের প্রকৃতই মস্ত একটা দুর্ভাগ্য। আমাদের সাহিত্যিক ভাষা মুখে বেখাপ্পা শোনায়; অথচ কথিত ভাষায় মনের সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক ভাবগুলিকে প্রকাশ করা দুরূহ হয়।

প্রকৃত বাক্যালাপ দু'জনের মধ্যেই সম্ভব। তৃতীয় ব্যক্তি আলাপে যোগ দিলে মনের গতি ব্যাহত হয়, আলাপ তার logical পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়, এবং ভাবের তরঙ্গ পূর্ণতা লাভ না করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

অনেকে আরামে ঘরে বসে আলাপ করতে ভালোবাসেন, আবার কেউ কেউ পাদচরণের সঙ্গে আলাপ করাটাই বেশী পছন্দ করেন। এটা মানুষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমি এই শেষোক্ত ধরণের বাক্যালাপই বেশী উপভোগ করি। যতগুলি বাক্যালাপের রেখা আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা আছে, তাদের অধিকাংশ এই পাদচারণের সঙ্গেই ঘটেছে। প্রকৃতির সুন্দর বিজন পথে চলতে চলতে মনের কথা যেমন অনায়াসে খুলে বলেছি, ঘরে বসে তেমন কখনও পারিনি। শরীরের গতি আর নিসর্গের পরিবর্ত্তন-শীল দৃশ্য আমার চিন্তা আর কল্পনাকে যেমন উত্তেজিত করেছে ঘরের সুস্থির গতিহীন (stationary) আব-হাওয়ার তেমন করেনি। অনেকের পক্ষে কিন্তু এই শরীরের গতি আবার কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে অবশ্য ঘরের বাহিরে আলাপের চেষ্টা করা ভুল।

আলাপে অন্তরের গভীরতম অনুভূতিগুলি তখনই প্রকাশ পায়, যখন তার প্রবাহ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে চলতে জীবনের কোনো গুরুতর সমস্যার তীরে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। সেই প্রবাহের মধ্যে আমাদের অন্তরের ভাবগুলি নদী-বক্ষে কমল-দলের মতই অনায়াসে ফুটে ওঠে। আগে থেকে তোয়ের হয়ে বাক্যালাপ সুরু করলে কিন্তু এমন হয় না; দায়িত্বজ্ঞান তখন আত্ম-প্রকাশের পথে বিষম অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। আলাপের সফলতা সেই জন্য অনেকটা chanceএর উপর নির্ভর করে। তবে দুজনের মনই যদি ভাবে ভরপুর থাকে, আর দুশ্চিন্তার কীট যদি সেই মনকে দংশন না করে, এবং ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাবার প্রয়োজনীয়তা যদি না ঘটে, তাহলে আলাপ ছোট-খাট জিনিষ থেকে সুরু হলেও অবাধে ভাবের এবং কল্পনার সমুচ্চ শিখরে উঠে পড়ে। তখন বড় বড় সমস্যা আপনা থেকেই আসতে

থাকে, আর তাদের সুচারু সমাধানও বেশ আপনা আপনি হয়ে যায়।

আলাপ একবার একটা বিশেষ পথ নিলে তাকে সেই পথেই চালাতে হয়; তা না হলে মন তার স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে ফেলে। সেই জন্য অবান্তর কথা যাতে আলাপের কোনো ফাঁকে না প্রবেশ করতে পারে, সে বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া দরকার।

সত্য-শিব-সুন্দরের অনুসন্ধানে দুই ভাবুক প্রাণের একত্রাভিযানের নামই হচ্ছে বাক্যালাপ। তার সাফল্যের জন্য দরকার—ত্যাগ ধৈর্য্য, সংযম এবং সহানুভূতি। এমন অনেক লোক আছে, যারা পরের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনতে constitutionally অক্ষম; নিজেদের মত ব্যক্ত করবার জন্য তারা সর্ব্বক্ষণ ছটফট করতে থাকে, তোমার কথা তোমার মুখে থাকতে থাকতেই তারা তাদের দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করে দেয়, আর তুমি বেচারা কিছু বলচো কি না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না!

আবার এক রকম লোক আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ একান্ত উৎসুক। তোমার মতটুকু যে ভ্রান্ত আর যথার্থ সত্যটি যে তারই অধিগত, এর প্রমাণের জন্য তারা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করতে ছাড়ে না। এ সব লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে কোন লাভ নেই! তাদের সামনে চুপ করে থাকাই সুবুদ্ধির কাজ; নচেৎ আলাপ প্রলাপে পরিণত হবে।

দরদ আর সহানুভূতিই হচ্ছে বাক্যালাপের প্রাণ। এই দরদ আর সহানুভূতির সোনার ডোরেই বাক্যালাপের রঙীন্ ঘুড়ি স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাবের আকাশে উড়তে থাকে। Appreciationএর দখিণা বাতাস দিয়ে সেই ঘুড়িকে নাচাতে হয়। যদি তা করতে পারো, তাহলে তুমি সেই ঘুড়ির বিচিত্র গতি আর প্রাণ-মাতানো নাচ দেখে মুগ্ধ হবে, আর মনে মনে বলবে, "এমন ঘুড়ি যদি রোজ ওড়াতে পারি, তা' হলে কি মজাই হয়!"

আলাপ তাদেরই শোনবার মত হয় যাদের মনে ভাবের অবিরাম একটা খেলা চলতে থাকে। Eloquence তাদের কথায় আপনা থেকেই এসে পড়ে, আর তাদের earnestness (নিষ্ঠা) তাদের কথার মধ্যে এমন প্রাণের সঞ্চার করে যে তাতে আর অলঙ্কারের কোনো দরকার হয় না। তাদের আলাপে আমরা এমন সব সত্যের সন্ধান পাই, যা কোন নীরস শুকনো ছাপার কেতাবে পাওয়া যায় না। আলাপীর মুখের কথার সঙ্গে তাঁর ছাপানো কেতাবের তুলনা করে তাঁর মনের তুলনায় পুস্তকের দৈন্য দেখে অবাক হয়ে যাই। তখন মনে হয়, মানুষ যত বড় জিনিষই সৃষ্টি করুক না কেন, সে তার সে-সৃষ্টির চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক গভীর, অনেক বেশী ধনে ধনী।

Bulwar Lytton তাঁর এইরূপ একটী অনুভূতির বড় সুন্দর বর্ণনা

দিয়েছেন। এখানে সেটুকু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলুম না। তিনি বলছেন—"I remember being told by a personage who was both a very popular writer and a very brilliant conversor, that the poet Campbell reminded him of Goldsmith – his conversation was so inferior to his fame. I cannot deny it, for I had often met Campbell in general society, and his talk had disappointed me. Three days afterwards Campbell asked me to come and sup with him tete a-tete. I did so. I went at ten o'clock, stayed till dawn; and all my recollections of the most sparkling talk I have ever heard in drawing-rooms afforded nothing to equal the riotous affluence of wit, of humour, of fancy, of genius, that the great lyrist poured forth in his wonderous monologue—monologue it was: he had it all to himself.

Lytton জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাই Campbellকে কথার স্রোতে তাঁর প্রাণটাকে ঢালতে দিয়েছিলেন। আর কেউ হলে হয়তো তর্ক যুড়ে দিত এবং কবিও তাহলে শামুকের মত তাঁর অন্তরের মধ্যে ঢুকে চুপটী করে বসে থাকতেন!

আলাপের ধর্ম্মই হচ্ছে পরকে বলতে দেওয়া, এবং সময় ও সুযোগ পেলে তবে আত্ম-প্রকাশ করা। নিজের চেয়ে বড়-লোকের সঙ্গে আলাপের সময় শ্রোতা হওয়াই ভালো। সেখানে বক্তা হবার চেষ্টা করলে জীবনের একটা অমূল্য সুযোগ হারাতে হয়। অবশ্য সময় বুঝে আত্মপ্রকাশও করতে হয়; তবে সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করা দরকার, আর সে সময় না আসা পর্য্যন্ত অপরকে বলতে দেওয়াই হচ্ছে আলাপীর প্রকৃত ধর্ম্ম।

প্রকৃত একজন ভাবুকের সঙ্গে প্রাণ খুলে একবার আলাপ করলে মনটা যেমন ঝরঝরে হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতে হয় না। ভ্রান্তির কুজ্ঝটিকা দূরে সরে যায়, মুখ থেকে মিথ্যার মুখোস খসে পড়ে, এবং তখন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাই।

এস্, ওয়াজেদ আলি।

ভারতী-আরতি

বর্ষ-মঙ্গল

অয়ি বাণি ভারতের মনস্বিনী রাণি
নমস্তে কমলাসনা দেবী বীণাপাণি!
অপরূপ-রূপা তুমি কল্যাণ কল্পনা,
কালে কালে সু নবীনা ত্রিকালমহিমা!
ঝঙ্কৃত করিয়া বীণা নূতন বরষে
নব সুরতানে গাও পুরাতন গান
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল বরষণ করি।
দূরে যাক দ্বন্দ্ব মোহ বিরোধ তিমির
পূণ্য মিলনে ধন্য হোক্ সুপ্রভাত।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

শুভেচ্ছা

সবিনয় নিবেদন—

ভারতীর পঞ্চাশত্তম বর্ষ প্রবেশ-উপলক্ষে আপনার অনুগ্রহ-লিপি পাইয়াছি। তাহার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। ভারতীর সহিত বাংলা দেশের ও বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী অনেক মনীষীর নাম জড়িত। ইহা স্থায়ী হইলে তাঁহাদের ও আপনার কীর্ত্তি অমর হইবে। এইজন্য পুনর্ব্বার ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করিতেছি।

অনুগৃহীত—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতী-স্মৃতি

আমার বয়স তখন বছর চৌদ্দর অনধিক। বিবাহের পর সেই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুই মাস বাস করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষের মত নয় যে, এত শীঘ্র বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাই! তাঁরা বলিতেছেন, এই তো মোটে দুটীমাস আসিয়াছে, এত শীঘ্র বাপের বাড়ী গেলে আমাদের পোষ মানিবে কেন?' একেই তো আমার দাদাবাবুর সর্ত্তমত বিবাহের পর তিনটী বৎসর ফাঁকি দিয়া কাটানো গিয়াছিল। তার উপর গত বৎসর শ্বশুরবাড়ী আসার সাতটী দিন পরেই বাপের বাড়ী যাওয়ার চিঠি আসাতে,

এ-বাড়ীর কর্তৃপক্ষ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকগুলি কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তার মধ্যে একটী এই যে ও-সব বড়-মানুষের মেয়েদের তোলা-বৌ করে রেখে আমরা না-হয় এবার গরীবের-মেয়ে দেখে বারোমেসে ঘর-করা একটি বৌ নিয়ে আসবো। না হলে তো চলবে না।

কথাটা শুনিয়া আনন্দ হইয়াছিল। মনে মনে বলিয়া ছিলাম, তাই আনো বাপু, আমিও তাহলে মা-বাপের মেয়ে, মা-বাপের কাছে গিয়া বর্ত্তাইয়া যাই!

কিন্তু সেবার আমার স্বামীই, তাঁর এম, এ একজামিনের বছর, এই ওজোর তুলিয়া আমায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। ফলে আর একটী আটপৌরে-স্ত্রী তাঁর লাভ হয় নাই! মাত্র সেই সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে একটু কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ লাভ করিয়াই তাঁকে সুখী থাকিতে হইয়া ছিল। অবশ্য সে যুগে এ-জিনিষটা তাঁর পক্ষে দুর্লভ বস্তুরই সামিল ছিল কি না, তাই ঐটুকুতেই নিজের পক্ষে খুব বেশী লোকসান বোধ করেন নাই!

কিন্তু এবার আর সে সুযোগ ছিল না। প্রেমর্চাদ-রায়চাঁদ পরীক্ষার মাসখানেক আগে শারীরিক বিশেষ অসুস্থতাহেতু পরীক্ষা না দিয়াই তাঁকে 'চেঞ্জে' যাইতে হয়। বহুকাল পরে ফিরিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা পাওয়ার লোভ হয়তো আর তেমন বেশী প্রবলও নাই! অগত্যা উপায়ান্তরের চেষ্টা করিতে হইল।

বাবা তখন শ্রীরামপুরের সব-ডিবিশনাল অফিসার। চিঠি লিখিলাম, অনেকদিন দেখি নাই, একদিন আসিতে হইবে।

বাবা আসিলেন; আমারই ফরমাস-মত আমার দুই বৎসরের ছোট বোনটীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বলিলাম, বাবা, আমি আপনার সঙ্গে যাব!

বাবা বলিলেন, চৈত্র মাসে তোকে এঁরা পাঠাবেন কি?

আমি বলিলাম, আপনি বল্‌লে কি না বলতে পারবেন? আপনি বলুন না।

বাবা হাসিয়া বলিলেন, সেই জন্যই তো বলতে ভরসা হচ্ছেনা। যদিই না বলে ফেলেন! এ-মাসটা থাক্, তোর দাদাশ্বশুর এ-সব বড্ড বেশী মানেন, কাজ কি! বৈশাখ মাসের দোসরা তোকে নিতে পাঠাবো। কেমন?

আমি সজোরে মাথা নাড়িলাম— না। চোখে জল আসিল, বাবা বিপদে পড়িলেন। বলিলেন, ঐ জন্যেই তো আসতে চাইনা রে! এক তো নিজের মেয়েকে পরের বাড়ী পরের মতন দেখতে ভাল লাগে না; তারপর তুই যদি কাঁদিস্ তা'হলে আমি তোকে কেমন করে রেখে যাব?

আমি কাঁদিয়া বলিলাম, নিয়ে চলুন, তাহলে—

দাদাশ্বশুরকে বাবা সে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি এসব খুঁটিনাটী অত্যন্ত খুঁটিয়া জানিতেন, রাজী হইলেন না; বলিলেন,

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা, ঘরের লক্ষ্মী বউ, তাকে কি পাঠাতে পারি? সেদিন যে আবার বৃহস্পতিবার, তাও মনে ছিল না! তথাপি যথাসাধ্য কান্নাকাটী করিয়া দেখিলাম। কিন্তু তিনি কাহারও খাতিরে নিজের মত ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ! সেজন্য, আমার বাবাও তাঁকে বেশী খাতির করিতেন।

শেষটা আমার ও বাবার খাতিরে এই পর্য্যন্ত হইল যে পরদিন প্রাতে আমি বাপের বাড়ী যাইতে পাইব; কিন্তু চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে যেন নিশ্চিতরূপে ফিরিয়া পাঠানো হয়, এ কথাও বলিয়া দিলেন।

প্রতিশ্রুতি দিয়া বাবা চলিয়া গেলেন। পাছে এঁদের মত বদল হয়, সেই ভয়ে নিজের ছোট বোনটীকে সে রাত্রে আটকাইয়া রাখিলাম। কিছুতেই যাইতে দিলাম না।

এত কাণ্ড করিয়া মাত্র দিন দশেকের জন্ম যাওয়া ঘটিল। তখন অবশ্য জানিতে পারি নাই যে এই যাওয়ার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কত বড় একটা যোগসূত্র গ্রথিত রহিয়াছিল! বহুকাল পরে সে কথা মনে হইয়াছে।

তখন আমরা চুঁচুড়ার ভূদেব ভবনেই বাস করি। দাদাবাবু জ্যেঠামহাশয় ও বড়মার মৃত্যু প্রায় তেরো মাসের মধ্যেই উপর্য্যুপরি ঘটিয়া গিয়া সংসারে মহা-বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে তার প্রথম ধাক্কাটা মাত্র এ দুই বৎসরে সামলাইয়া আসিতেছে। বড় বড় দুইটা বাড়ীর আর দরকার হয় না; গঙ্গার ধারের বাড়ীতে আমরা থাকি। রাস্তা-পারের বাড়ীতে কখনো কোন সবজজ বা সিনিয়র ডেপুটী ভাড়া আসেন, নতুবা সে বাড়ী পড়িয়া থাকে। প্রকাণ্ড তিন-মহল বাড়ী, ভাড়া লওয়ার মত লোকও সব সময় মেলে না।

এক আত্মীয়া-সম্পর্কের মেয়ের শ্বশুর অল্প দিনের জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, পরে উঠিয়া আমাদের বাড়ীর খানকয়েক বাড়ী পরে মিষ্টার পি মুখার্জ্জির (ফণী মুখার্জ্জির) বাড়ীর পাশের বাড়ীতে উঠিয়া যান। একদিন তাঁরা আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া নিজের পুত্রবধূ সম্বন্ধে অনেক নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সকল আলোচনার মধ্য হইতে আবিষ্কার করা গেল, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী সে সময়ে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে আমার মা বাবার কাছে বলিলেন, ..র শাশুড়ীর কাছে শুনলুম, স্বর্ণকুমারী দেবীরা পি মুখুজ্জের বাড়ী এসেছেন, কাল তাঁদের আসতে বলবো?

বাবা বলিলেন, বল।

সকালে লোক পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল।

এইখানে পূর্ব্বের একটু ইতিহাস

জানাইয়া রাখা আবশ্যক। আমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের বাড়ীর ঠিক ডানহাতি বাড়ীখানিতে এক সময়ে মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিয়াছিলেন। সে অবশ্য অনেক দিনের কথা। আমরা সে-সময় নিতান্ত শিশু। সে-সময়কার কোন স্মৃতিই আমার মনে আসে না, তবে মায়েদের মুখে অনেক গল্প শুনিয়াছি। একেবারে পাশাপাশি বাড়ী! দু'বাড়ীতে আসা-যাওয়া খুবই ঘটিয়াছিল। ঠাকুর পরিবারের সহিত সেই হইতে আমাদের বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা। সে-সময় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ৺সুশীলা দেবীই প্রধানতঃ সেখানে বাস করিতেন। তাঁর সঙ্গে আমার মায়ের খুব স্নেহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যহ দু'জনে দু'জনের কাছে যাতায়াত ও বিদ্যা-বিনিময় করিতেন। মা তাঁর কাছে বাংলা শিখিতেন, তিনি মায়ের কাছে শিল্প শিক্ষা করিতেন। সকল প্রকার শিল্প-বিদ্যায় মায়ের পারদর্শিতা নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নলিনী দেবী আমাদের ক্রীড়া-সঙ্গী ছিলেন।

ওই কয় বৎসরের মধ্যে মহর্ষির পরিবার-বর্গ যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, সবার সঙ্গেই অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটিয়াছিল। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আসিলেই আমার পিতামহ-দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন, তাই তাঁর সঙ্গেও পরিচয় ছিল।

যেদিন তাঁদের আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইল, সেদিন আমার নিজেরও অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণ আমার দিদির শ্বশুর-বাড়ীতে। আমার দিদির শ্বশুর স্বনামধন্য ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে আমাদের সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া চলিত; তবে এ'দিন শুধু মহিলাদের নিমন্ত্রণ নয়, সেই সময়ে দেশে 'সই' পাতানোর একটা হুজুগ লাগিয়াছিল। বিস্তর মেয়ে সই পাতাইতেছিল দেখিয়া আমাদেরও সাধ হইল। দিদির সেজ ননদ নীল-নলিনী দেবীর সহিত সেদিন আমার সই পাতানোর বন্দোবস্ত ছিল, কাজেই যাইতে হইল। কিন্তু দুর্লভ-দর্শনদের দেখিবার জন্য মন উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া রহিল। সখীত্বের সখ্যরস কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা গেল না! যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিলাম, সঙ্গে আসিলেন সখী। দেশ-বিখ্যাত সরলা দেবী বি, এ'কে কাছে হইতে না জানি কেমন দেখাইবে, এই সন্দেহে ও ভাবনায় আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। আবার যাঁর অতগুলি বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, চুরি করিয়া খানকয়েক পড়িয়াও শেষ করিয়াছি, সেই মানুষই বা আমাদের দেখিয়া কি মনে করিবেন!

আসিয়া দেখিলাম, মার ঘরের খাটে তাঁরা তিনজনে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, গল্প-সল্প হাসিখুসী বেশ সহজ-

ভাবেই চলিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলাম। তবে বি-এ পাশ করিলে মেয়েরা একটা অদ্ভুত কিছু হয় না! বই লিখিয়া তা' ছাপাইলেও না! (এখানে বলা ভাল, বই অর্থাৎ উপন্যাস আমার দিদি তখনই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও তাঁর দেখাদেখি দু'একটা গল্প লিখিয়া খুব লুকাইয়া বাক্সর টানার ভিতর রাখিয়া দি,—আমার স্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও সে-গুলাকে বাহির করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু ভরসা করিয়া বই ছাপানো আর তেমন করিয়া খাতায় লেখা, সে যে ঢের তফাৎ!)

যাহোক ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া ভরসা বাড়িল। শেষে দু'একটা গানের ফরমাসও করিয়া বসিলাম। তার মধ্যে দু'একটার সুরের রেশ আজও কানে লাগিয়া আছে। "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী—"এ গানটি তো আর কাহারও গলায় আমার ভালই লাগে নাই…যেমন সেদিন সরলা দিদির মুখে শুনিয়াছিলাম!

এই-আলাপ-পরিচয়ের পর কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি চলিয়াছিল। তারপর সেবার আশ্বিন মাসে—বাবা তখন হাবড়ায় বদলি হইয়াছেন, পূজার বন্ধের ঠিক পূর্ব্বে কলিকাতায় মার সেজকাকা কর্ণেল এইচ্‌ সি, ব্যানার্জ্জী (৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সুদীর্ঘকাল পরে সীলেট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য বাবার হাবড়ার বাসায় আমাদের সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আসিয়াই তিনি সেই রাত্রে ঘোর অসুস্থ হইয়া পড়ায় কয়েক দিন ক্রমশঃ কয়েক মাসে পরিণত হইয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে একটু ভালো থাকার সময় কার্ত্তিকের শেষে দিন-কয়েকের জন্য ভবানীপুরে দিদিমার বাড়ী আসা গেল। রাস-পূর্ণিমায় দিদিমার সেবার রাস হইতেছে। বেশ একটু সমারোহ করিয়াই করিলেন। আমরা দিন পাঁচ-ছয় রহিয়া গেলাম।

হঠাৎ একদিন একটা মতলব স্থির করিয়া ফেলিলাম। আমার মাসিমা খুব অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া দিদিমার কাছে থাকিতেন, আমরা তাঁকে মার মতই ভালবাসিতাম। তিনিও ঠিক মায়ের মতই মাসি ছিলেন। রোগে-ভোগে কত রকমেই সেবা-যত্ন করিয়াছেন। আবার বন্ধুর মত তাঁকে সব কথা বলাও চলিত। মা বা মাসিমাকে আমরা তো কোনদিনই ভয় করিতাম না। মাসিমাকে গিয়া বলিলাম, বালিগঞ্জ তো এই দিকেই! একদিন সরলা দেবীর বাড়ী গেলে হয় না? চলো না মাসিমা, যাই!

মাসিমার মত হইল, মার দিদিমারও আপত্তি ছিল না। এখন ভাবনা হইল, সঙ্গে লওয়া যায় কাকে? বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক তো তেমন কেহ নাই! এক সৌরীন! সে এই বছর বারো পূর্ণ হইয়া তেরোয় পা দিয়াছে। তা কি আর হইবে?

তাকেই সঙ্গী করা গেল। সে কি যাইতে রাজী হয়! কিছুতেই তার মত হয় না, বোধ হয় ভয় করিতেছিল! শেষটা কোন গতিকে বুঝাইয়া সমজাইয়া তাকে রাজী করা গেল। সকলে বালিগঞ্জে গেলাম।

গিয়া কিন্তু মনটা কিছু দমিয়া গেল। চুঁচুড়ায় থাকিয়া হিরণ্ময়ী দেবীর ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, তারই জের চলিতেছে; খুব জ্বর আসিয়াছে। সরলা দেবীর কোথায় একটা নিমন্ত্রণ আছে, তিনি কাপড় পরিতেছিলেন, ঘরে আসিয়া একটু বসিতে না বসিতেই বিবি-দিদি অর্থাৎ (তখনকার কেবলমাত্র) শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আসিয়া ডাক দিলেন এবং তিনি আমাদের কাছে বিদায় লইলেন। যাহোক তাহা হইলেও গৃহকর্ত্রী মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটিই ঘটিতে দিলেন না।

গাড়ীতে উঠিয়া সৌরীন বলিল, এঁরা তো চমৎকার লোক! এমন জান্‌লে আমি কি আস্‌তে চাইতুম না! স্বর্ণকুমারী দেবী আমায় আদর করে একরাশ বই পড়তে দিলেন। বললেন, তুমি বাংলা লিখতে চেষ্টা কর—একদিন ভারতীতে তোমার লেখা ছাপা হবে!

ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সেই বৎসরই আমার মায়ের অসুখের সময় হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে তাঁরা বার কয়েক আসিয়াছিলেন, সরলা দি'র গান শুনিতে রাস্তায় লোকের ভিড় জমিয়া যাইত, এ-সব গল্প দিদির মুখে শুনিতাম, কিন্তু সে সময়ে আমার শ্বশুর-বাড়ী দুটী দুর্ঘটনা ঘটায় আমি সেখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে সময়ে আমার একটী ননদ বাল-বিধবা হইয়া আসিয়াছিলেন।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর-চক্র ঘুরিয়া গেল। জীবনের প্রথম প্রভাতে জীবন-বৃক্ষে যে মুকুলগুলি দেখা দিয়াছিল, ক্রমে মধ্যাহ্নের দিক ঘেঁষিয়া তাহা উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেই ছোট গল্প দু-একটা, তারপর একখানা বৃহদায়তন উপন্যাস, নাম মিবারেশ্বর, (সেখানা টডের রাজস্থানেরই একটা দ্বিতীয় সংস্করণ বিশেষ) পাঁচখানা চার পয়সা দামের এক্সার-সাইজ বুক জুড়িয়া লেখা হইয়াছিল। সে উপন্যাসের সম্বন্ধে এখন আর কিছু বড় বেশী মনে নাই, শুধু কতকগুলি নাম মনে আছে। বিজলী সিংহ, লাবণ্য সিংহ, অনুপম সিংহ, রেবা, দীপ্তি, আশা, শুভ্রা, শুক্লা ইত্যাদি—খুব পছন্দসই নামগুলি ঐতিহাসিক স্ত্রী-পুরুষদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাদের মনের মত করিয়া লওয়া গিয়াছিল। একদিন আমার স্বামী সে খাতা দেখিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় রাগ করিয়া তাদের জলে ভাসাইয়া দিই। আমাদের নীচের বারান্দা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেই যে-কোন বস্তুকে গঙ্গার জলে ফেলা চলিত। কাজেই ফেলিবার সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তনেরও অবসর পাওয়া

যায় নাই। শেষকালে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এম্‌নি করিয়া দিন চলিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়খানা উপন্যাস লিখিয়াছি। 'সুহার', 'লীলা' 'প্রতিশোধ', 'ঋণশোধ', 'বনফুল' ইত্যাদি। এই রচনাগুলি আমার জীবন-পথের চির-আদর্শ, চির স্নেহময়ী জীবন-সঙ্গিনী দিদি ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ইহাদের ভিতর হইতে উত্তর কালেও বড় একটা সারোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এম্‌নি তাদের অদ্ভুত রকম প্লট! তবে ঠিক এইগুলির পরেই লেখা একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস—তখনও তার নামকরণ হয় নাই, সেইখানির মাল-মসলায় রামগড় উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছিল।

তারপর বছর দুই চুপচাপ কাটিল। এই সময় ভাগলপুরে আসিলাম এবং আমার মেয়ে কল্পনার জন্মের পরেই আমি সূতিকা গৃহ হইতে কঠিন রোগে শয্যা লইলাম। মাস কয়েক পরে বাড়ার ভাগটা গেল বটে, তথাপি একটা ঘুষঘুষে অসুখ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া লাগিয়াই রহিল। এই অবস্থার সুযোগে পড়াশুনায় খুব মন দেওয়া গেল। বন্ধু নিরুপমা দেবীও এই সময়ে ভাগলপুরে তাঁর পিতার নিকট বাস করিতেছিলেন। বালবৈধব্যের অসহ্য দুঃখ সাহিত্যের ভাব-গঙ্গায় নিমজ্জিত করিয়া সেও পদ্য-গদ্য লিখিতেছিল, পড়াশুনা লইয়াই দিন কাটাইতেছিল।

এই অবস্থায় আমি টিলাকুঠি ও সাজঙ্গী লিখি।

টিলাকুঠি পড়িয়া আমার পাঠকরা আমায় বেশ ভাল রকম সার্টিফিকেট দিলেন। পাঠক মানে, দিদি, নিরুপমা আর সৌরীন। মনের উচ্ছ্বাসে দিদি একটা এবং সৌরীন দুইটা বড় বড় পদ্যই লিখিয়া ফেলিল, ইহার নায়ক নায়িকার উদ্দেশে। তাদের নাম ছিল, অগষ্টস ক্লিবল্যাণ্ড ও এঞ্জাবেলা। ভাগলপুরের বিখ্যাত ক্লিবল্যাণ্ড মেমোরিয়াল, টিলাকুঠি নামক অট্টালিকাই এ উপন্যাসের উপাদান। এই উপন্যাসখানি বৎসর কয়েক পরে নবনূর কাগজে বাহির হইতে হইতে কাগজখানি উঠিয়া যাওয়ায় তাহার সহিত পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হইয়া অসমাপ্ত থাকে। তার অনেক পরে ইহার সমস্ত নাম-ধাম বদলাইয়া ইহাকেই সোনার খনিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই সময় একদিন সৌরীনের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, আরও একটা কিছু লিখুন না, আপনার টিলাকুঠি তো খুব ভাল হইয়াছে।

আমি বলিলাম তুমিও গল্প লিখিতে আরম্ভ করো—শুধু পদ্য লিখে কি হবে? গল্প লেখো।

সৌরীন বলিল—ইচ্ছে ত করে, কিন্তু হয় কৈ? আচ্ছা, কি করে প্লট ঠিক করে নেন, বলুন তো?

ঠিক কি বলিয়াছিলাম, মনে পড়ে না। তবে দু'একদিন পরেই সৌরীন 'টিনের পুতুলের আত্ম-কথা' নাম দিয়া একটা গল্প লিখিয়া আমায় দেখাইল। গল্পটা মন্দ হয় নাই।

একখানা বাঁধানো খাতা কি নিয়া

নবোৎসাহে একখানা উপন্যাস ধরিলাম। নাম দিলাম তার টিউটর। তখন সৌরীন বাঁকিপুরে আসিয়াছিল খানিকটা পড়িয়া পড়িয়া সে বলিল,—বা! সুন্দর লেখা হচ্ছে! আর এমন ভাল খাতা! এ'তে আর লেখা ভালো হবে না!

এই সময় আমার ছোট পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের দলের একজন। যেমন পড়িতে, তেমনি পড়াইতে ও লেখাইতে। নিজেও কতক-গুলি ইংরাজীর অনুবাদ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। চারিদিকে উৎসাহ পাইয়া উপন্যাসখানি শেষ হইয়া "উল্কা"র পত্তন পড়িল। এই টিউটরই কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে হারানো খাতার মূর্ত্তিতে স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রমাপ্রসাদের অনুরোধে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে।

পোষ্যপুত্র উপন্যাস, কন্যাহারা হইয়া আমার ছোট পিশিমা যখন বাবার বাঁকি-পুরের বাসায় আসেন, তখন তাঁরই ইচ্ছায় লিখিতে আরম্ভ করি। এর ভিতর অনেক-গুলা ছোট গল্প লেখা হইয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে দু'তিনটা দিয়া কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছিলাম, কিন্তু ৫৲ টাকার বেশী উঁচুতে তারা উঠিতে পারে নাই।

মজঃফরপুরে ফিরিতেছি, ছোট পিসিমা বলিলেন,—এবার যখন আস্‌বি, একখানা বড় উপন্যাস লিখে নিয়ে আসবি, কেমন? কি সব ছোট-খাটো লিখিস্, পড়তে না পড়তেই ফুরিয়ে যায়। দু'তিন দিন ধরে পড়বো, তবে না!

আমি কথা দিলাম,—আচ্ছা, সেই রকমই হবে।

ভারতী তখন কর্ণধার-বিহীন তরণীর মত হাবুডুবু খাইতেছিল। সৌরীন ভারতী দেখে। সে লিখিল - আপনার একটা ছোট গল্প দেবেন, ভারতীতে ছাপব।

পরাজয় গল্পটা তখন বামাবোধিনীকে দিয়া উত্তর-প্রত্যাশায় হতাশ হইয়া-ছিলাম। তখন অবশ্য কাপি রাখিয়া লেখা পাঠাইতাম। তাড়াতাড়ি রেজেষ্ট্রী ডাকে সৌরীনকে সেটা পাঠাইয়া দিলাম।

গল্পটী বড়; ভারতীর দুই সংখ্যায় বাহির হইল। এক সংখ্যা বাহির হওয়ার পর ভবানীপুরে গিয়াছি, সৌরীন বলিল,—স্বর্ণকুমারী দেবী আপনার লেখার খুব সুখ্যাতি করে বললেন, 'অনুপমা' নাম কেন দেয়? আমি অনুরূপা নামেই ছাপবো। কেন লেখাটা কি মন্দ কাজ যে নাম লুকিয়ে রাখতে হয়! আপনাদের একদিন যেতে বলেছেন চলুন।

দিদি আমি আর সৌরীন তিনজনে গেলাম।

তিনি ঐ কথাই বলিলেন, আরও বলিলেন যে এমন শক্তি রয়েছে, নষ্ট করছো কেন? বেশী করে লেখো, আমার হাতেই তো আবার ভারতীর ভার পড়লো—এর প্রতি সংখ্যাতেই কিছু কিছু লেখা দাও।

দিদি বলিল,—ওর অনেক গল্প লেখা

আছে। উপন্যাসও একখানা আছে। বেশ হয়েছে।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—সে কি ভারতীতে দেবার যোগ্য ?

মাননীয়া সম্পাদিকা দেবী কহিলেন,—তুমি নিজেই যে নিজের লেখার সমালোচক হলে, দেখচি। যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের ভারটা আমায় দিয়ে লেখাগুলো সব পাঠিয়ো দেখি!

আদেশ পালন করিলাম। কিন্তু মনে একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিল, পাছে লেখাটা ফেরৎ আসে! কিন্তু তা আসিল না। তার পরিবর্ত্তে উত্তর আসিল —

"স্নেহের অনুরূপা,

তোমার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। তোমার উপন্যাস আমার ভাল লাগিতেছে। যতটা দিয়াছ, তাহা হইতেই জিনিষটাকে জানা যাইতেছে। এই একখানা উপন্যাসেই তুমি নাম করিতে পারিবে, দেখিও!"

এই ঘটনা হইতেই সর্ব্বদা চিঠিপত্র লেখা চলে। প্রথম বৎসর গোটাকতক ছোট ছোট গল্প ও পরে দুবৎসর ধরিয়া পোষ্যপুত্র ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে বাহির হইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় গেলেই বালিগঞ্জে বারকতক করিয়া না গেলে মনস্তৃপ্তি ঘটে না। তিনিও পটলডাঙ্গায় ও ভবানীপুরে নিজে আসিয়া দেখা করিয়াছেন, আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু-বেলার সম্পর্কে তখন হইতে আমি তাঁহাকে পিশিমা-ই বলি। যখন গিয়াছি, কত স্নেহ আদর উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। তাঁর কাছে অত উৎসাহ না পাইলে হয়ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন সাহসের সহিত নামিতে পারিতাম না।

পোষ্যপুত্র নামটিও তাঁহারই দেওয়া।

পোষ্যপুত্র শেষ হইলে আমায় আবার একটা উপন্যাস দিতে বলিলেন। আমি আমার প্রিয়বন্ধু নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির" লইতে বলিয়া লিখিলাম,—পাঠকদের এক লেখকের লেখা ক্রমান্বয়ে পড়া তেমন আরামের হবে কি ?

বৎসরখানেক পরে "অন্নপূর্ণার মন্দির' শেষ হইলে আবার আমায় লিখিবার জন্য তাগিদ দিলেন। এবার অপরের লেখা খুব প্রসিদ্ধ (উত্তরকালে) উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াও নিস্তার পাইলাম না। ফেরৎ দিয়া লিখিলেন,

"ও-সব ফাঁকি চলিবে না। আমি তোমার লেখা ভালবাসি। পোষ্যপুত্রের মত আর একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করো। আমায় মাসে মাসে পাঠাইলেই চলিবে। বেশ ঘরকন্নার কথা লইয়াই ওই ভাবে লিখিবে।"

এমন করিয়া কয়জন সম্পাদক নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে জানে? এই সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া "বাগ্‌দত্তা" আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে মাসে মাসে লিখিয়া দেওয়ার রীতিটা আমার কায়েমী হইয়া গেল। এখন অনেকেই

এই পথে চলিতেছেন, শুনিয়াছি। এই শিক্ষাটুকু না পাইলে হয়তো আর একখানা উপন্যাসও লিখিয়া উঠিতে পারিতাম না।

"বাগ্‌দত্তা" প্রকাশ-কালেও কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। গেলেই এ লইয়া এবং আরও নানা বিষয়ে কথা হইত। একবার বলিলেন—

অনুরূপা, তুমি অমন করালীচরণটীকে কোথায় পেলে? আমি বোধ হয় ও-চিত্র আঁকিতে পারিতাম না। বাস্তবিক চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে তোমার শক্তিটা খুব সামান্য নয়। এত কম বয়সে তুমি কিন্তু অনেক দেখেছ ও বুঝেছ তো!

লেখার সম্বন্ধে এত বড় একটা মত পাইলে সে বয়সে সে কি কম আনন্দ, কম উৎসাহ পাওয়া যায়! বিশেষ উপযুক্ত স্থান হইতে! নতুবা এমনি তো অনেকেই বাহবা দিতে পারে এবং দিয়াও থাকে, তার দাম কতটুকু?

সরলা দিদির সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎ ঘটে নাই, কিন্তু যখনই তাঁর পরিচিত কাহারও সঙ্গে দেখা হইয়াছে, খবর লইয়াছি। তাঁদের সঙ্গে আমার কেমন যেন একটা প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল। অথচ আমি যখন কলিকাতায় গিয়াছি, বালিগঞ্জ গেলেই শুনিয়াছি, এই সেদিন মাত্র তিনি লাহোরে ফিরিয়া গিয়াছেন, দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবলভাবেই ছিল, কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই। আবার এতদিন পরে তাঁহাকে তাঁর নূতন অবস্থায় ও নূতন মূর্ত্তিতে সেদিন দেখিয়া আসিলাম। একটা যুগান্তরের পর এ দেখা! দুজনে হঠাৎ কোনখানে দেখা হইলে হয়ত কেহ কাহাকে চিনিতে পারিতাম না। অথচ দুজনেই দুজনের সব খবর রাখিয়া আসিয়াছি দেখিলাম, আমার মত তিনিও আমার সহিত সাক্ষাতে সমুৎসুক রহিয়াছেন।

দেখা হইতেই বলিলেন,—আবার তো ভারতীকে হাতে নিয়েছি। তার পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। লেখা দাও।

লিখিবার অক্ষমতা ইত্যাদি কোন ওজোরই তিনি শুনিতে রাজী নহেন। সে দিন একটা ক্ষুদ্র নাটিকা মাননীয়া মিসেস্ পি কে রায়ের অনুরোধে তাঁর স্কুলের মেয়েদের অভিনয়ের জন্য লিখিয়াছিলাম। সে লেখাটা হাতেই ছিল। বলিলেন—ওটা দিয়ে যাও, ছাপা হলে তো আর অভিনয়ের ব্যাঘাত হবে না। আর কিছু থাকে তো পাঠিয়ে দিও। লোক পাঠাবো কাল। কখন পাঠাবো, বলো দেখি।

জুলুম দেখিয়া হাসিলাম। অথচ ভারতীর কাছে ঋণও তো কম নয়! কাজেই হাতড়াইয়া পাতড়াইয়া একটা অর্দ্ধ-পরিত্যক্ত নাটকের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'কালিদাস' সম্বন্ধে একখানা বড় নাটক লেখার সাধ ছিল। তার জন্য প্রথম অংশটা প্রায় দশ-এগারো বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, তারপর আর লেখা ঘটিয়া উঠে নাই। তা ভিন্ন আমার 'বিদ্যারত্ন' 'কুমারিল ভট্ট'

নাটক দুখানার প্রতি থিয়েটারের অগ্রাহ্য দেখিয়া নাটক লেখার সাধও কমিয়া গিয়াছিল, সেইখানাকে "বিদ্যোত্তমা" নাম দিয়া ভারতীর জন্য পাঠাইয়া দিলাম।

আবার এই নববর্ষে নূতন অনুরোধ আসিয়াছে।

ভারতী, স্বর্ণকুমারী পিশিমা, হিরণদিদি, সরলাদিদি—এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কতখানিই যে জড়াইয়া রহিয়াছে! এঁদের কথায় কত অতীত গল্পই যে মনে পড়িয়া যায়! কত সুখের স্মৃতিই মনে জাগে! আমার দিদিকে হারাইয়া আমার জীবন কি যে শূন্য, কি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে তার খানিকটা যেন এই আলোয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে! আর একটীকেও মনে পড়ে, সে সেই সব দিনের বালিগঞ্জে যাওয়া-আসার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত, সে সৌরীনের স্ত্রী—আমার বড় স্নেহের তরু! তারপর বেলা! তার যে-স্মৃতি আজ কালের হাতে ম্লান হইয়া আসিতেছে, সেও হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়! এ সব কি ভুলিবার! না, ভারতী সম্পাদিকারা আমার জীবনে শুধু সাহিত্যের আত্মীয়তার নিকটতম সূত্রেই তাঁরা যে চিরসম্বন্ধ গাঁথা হইয়া রহিয়াছেন! এ বন্ধন কখনো ছিন্ন হইবার নয়!

ভারতীর পুনরুজ্জীবন অন্তরের সহিত কামনা করি। আমরা যখন বালক-বালিকা, তখন হইতেই ভারতী ও বালকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। গল্প পড়িয়া মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝিতাম না, তবু 'স্নেহলতা' পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিয়াছি, ঘরের কথা লইয়াও এমন বই লেখা যায়! ইয়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী পড়িয়া কতই না বিস্মিত হইয়াছি! আবার পুরাতন ভারতী হইতে মেঘদূতের অনুবাদ মুখস্থ করিতাম।

ভারতী আমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ, আমার পরেও তাঁর দীর্ঘজীবন অন্তরের সহিত কামনা করি!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভারতী

লিখেছিল চোর কবি গীতি পঞ্চাশৎ
কনক-চম্পক গৌরী কণ প্রভা বিস্তারে স্মরিয়া।
কুন্দেন্দু-ধবলা দেবী, তোমার শাশ্বত
রত্নপীঠে একপানে কোন্ রত্ন দেব আহরিয়া?
পরাবিদ্যা তুমি দেবী; মনের মন্দিরে
অমল কমলদলে বিরাজিত তোমার আসন;
অমর বীণায় বাজে তমসার তীরে
উদয় বন্দনা, নাই, বিদায়ের বিষণ্ণ ভাষণ!
চিরদিন থাক তব সেই অভ্যুদয়,
বাজুক বীণার তারে অমৃতের অনন্ত বারতা,
ভক্ত-জনে বরদাত্রী প্রসন্ন সদয়
মধুছন্দে মূর্ত্ত হোক অবিরত যত মর্ম্ম-কথা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"ভারতীর" কথা

কিশোর বয়সে আমার কবিতা 'ভারতীতে' ছাপা হোয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় সেই প্রথম আমার কবিতা স্থান পেয়েছিল। সে আজ তিরিশ বছর আগেকার কথা। সেই সময়ে 'ভারতীর' শ্রীযুক্তা সরলা দেবীই সম্পাদিকা ছিলেন। সে গর্ব্ব আমার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক আছে—সেদিন ছাপার অক্ষরে 'ভারতীর' মতো কাগজে নিজের নাম দেখে যে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছিলুম তার অনুরূপ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে আর কোনোদিন তরঙ্গিত হয়নি।

তাই যখন আমার পরম প্রিয় বন্ধুদ্বয়—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩০ সালের শেষে 'ভারতীর' সম্পাদন-ভার ত্যাগ ক'র্‌লেন আর শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তা' গ্রহণ ক'র্‌লেও সংসারিক কার্য্য-জটিলতার জালে জড়িত হ'য়ে তাঁকে লাহোরে থাক্‌তে হোলো বোলে তিনি আমাদের ডেকে 'ভারতীর' চক্রের আবর্ত্তন স্থগিত না হ'য়ে যায় এমন অনুরোধ ক'র্‌লেন, তখন তাঁর আহ্বানে আর কেউ সাড়া না দিলেও আমি নির্লিপ্ত থাক্‌তে পার্‌লুম না। শ্রদ্ধার সঙ্গে এ দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলুম।

'ভারতীর' সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য গ্রহণ করা যে-কোনো মানুষের পক্ষেই অপরিসীম গৌরবের ব্যাপার। তার কারণ, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর নেতৃত্বের ছাপে 'ভারতী' দীপ্তিময়ী, বাঙ্‌লার তাবৎ নাম ক'র্‌বার মতো সাহিত্যিক 'ভারতীর' সেবকদের মধ্যে গণ্য ও 'ভারতীর' সেবায় ধন্য। তা ছাড়া পঞ্চাশ বছর অস্তিত্ব বজায় রাখা বাঙ্‌লা দেশের মাসিক পত্রিকার পক্ষে কত বড় কথা, কী বিপুল মহিমার পরিচয়, কী ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন, সে কথা বাঙলার সাহিত্য-সেবারত প্রত্যেক পাঠক, পাঠিকা, লেখক, লেখিকা, প্রকাশক, বিজ্ঞাপনদাতা, ক্রেতা-বিক্রেতাই বিশেষ ভাবে জানেন।

'ভারতীর' সেবাব্রত গ্রহণ ক'র্‌বার অন্য প্রবল কারণও আমার ছিল। সে কারণ আমার ব্যক্তিগত মনোভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত, তাই তা' অপ্রকাশিতই রইলো। সম্পাদিকা মহাশয়ার কাছে এ কারণটি গোপন নেই।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সঙ্গে এতদিন আর এখনো কাজ ক'রে তাঁর কর্ত্তৃত্বের যে শক্তি, তার বিষয়ে বারবার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি লাহোর থেকে প্রতি ডাকেই আমার সঙ্গে পত্রব্যবহার ক'রেছেন। তাতে কার্য্যপ্রণালী, ছাপা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর যে সব উপদেশ থাক্‌তো তা প'ড়ে আমি চমৎকৃত হোতুম্। তাঁর সংগঠনী শক্তির যে নিদর্শন তার মধ্য দিয়ে আমি পেয়েছি তাতে আমি উপকৃত

ও ভক্তিনত হোয়েছি। কত বিষয়ে কত মতভেদ তাঁর সঙ্গে আমার হোয়েছে, কত তিরস্কার পেয়েছি, কত পুরস্কার পেয়েছি, তিনি শাসন ও স্নেহ যথাযোগ্য বিতরণ ক'রেছেন, একটি দিনের জন্যও তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতি-বিনিময়ের মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর Administrative ও organising capacity অসাধারণ, তাঁর সৌজন্য ও স্নেহেরও তুলনা নেই। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে. যে বিষয়ে যার উপর তাঁর আস্থা আছে, সেই সেই বিষয় ও তার অন্তর্গত বিভাগসমূহের ভার তিনি তার উপর মুক্তপ্রাণে অর্পণ ক'রতেন। অযথা তাঁর বিশ্বস্ত পাত্রের কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রে তাদের অতিষ্ঠ ও নিজের কর্তৃত্ব প্রচার তিনি কখনোই করেন্ নি।

ম্যানেজারের ও ছাপাখানার কাজ দেখার, আদায় ও পত্রিকার গ্রাহক-সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থা করার, গদ্যপদ্য বিচার করার ভার তিনি সমস্তই আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সে সব কাজ আমি সাধ্য ও সামর্থ্যমত নির্ব্বাহ করবার প্রয়াস ক'রেছি। আমার বিশ্বাস আছে যে তাঁর দেওয়া দায়িত্ব, আমি এমন ভাবে কোনোদিন ক্ষুণ্ণ করিনি যাতে তাঁর ক্ষোভ হ'য়ে থাকৃতে পারে। আমি যা কিছু ক'রেছি, সব বিষয়েই তাঁর যুক্তি ও বিবেচনার নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে ছিল।

আজ 'ভারতী'র পঞ্চাশ বছরে পড়্বার উৎসবে আমার যে আমন্ত্রণ হ'য়েছে, এতে অহঙ্কৃত হোয়েছি। অনেকের মুখেই শুনছি যে 'ভারতী' আমাদের হাতে প'ড়ে তার মর্য্যাদার হানি হ'য়েছে। এ কথা হয়তো ঠিক্ই, কিন্তু শুধু আমাদের এ জন্যে দায়ী ক'রে নিষ্কৃতি পাবার উপায় তাঁদের নেই, যাঁরা আজ 'ভারতী'কে তাঁদের সোহাগ থেকে বঞ্চিত করেন। 'ভারতী'কে জ্যোতির্ম্ময়ী করবার ভার তো তাঁদেরই। তাঁরা আসুন, আমাদের লেখা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সাহায্য করুন। আমাদের ছোটো ক'রে দেখে, দূরে ব'সে থাক্লে, আমাদের কোন্ দুঃখ ঘুচ্বে, কি লাভ হবে?

'ভারতী' চিরদিনই আমাদের মনো-রাজ্যের রাণী—তাঁর রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখ্বার গুরুভার আমাদেরই নিতে হবে। ভালো হোক্, মন্দ হোক্ আমাদের রাণীর সম্মান আমাদেরই অক্ষয় রাখ্তে হবে।

শুচি হোক্, অশুচি হোক্, বাধা-নিষেধকে লঙ্ঘন ক'রে সেই 'ভারতীর' চরণে সাহিত্যব্রত আমাদের আপন আপন প্রাণকে নিবেদন ক'র্তেই হবে। আমার কবি ও গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-রচনায় যশো-মণ্ডিত ভাইবোন্দের এই মনোভাব সম্বন্ধে কি অভিমত তা জানিনা; আমার নিজের কামনা এই যে, আমার হৃদয়ের রাণীকে উদ্দেশ ক'রে আমি কবির ভাষায় যেন জন্মজন্মান্তরে ব'ল্তে পারি :—

"আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াবোনা বিধান মেনে
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।"

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

সেবা স্মৃতি

তখন ন' ক্লাশে পড়ি। কটী বন্ধুতে মিলে ভবানীপুরে সাহিত্য-সমিতির পত্তন করেছি, প্রতি-পক্ষান্তর রবিবারে সমিতির অধিবেশন হয় আমরা প্রবন্ধ লিখে পড়ি, কোনো অধিবেশনে বা সভাপতি হই। তাছাড়া সমিতি থেকে হাতে লেখা একখানি মাসিকপত্র বার করা হয়। তার নাম তরণী। তরণী ছাপা হয় না; সমিতিতে যে সব প্রবন্ধ পড়া হয়, তার মধ্য থেকে বাছাই করে, আর সেই সঙ্গে সভ্যদের লেখা কবিতা, ছোট গল্প, সমালোচনা, এই তরণীর পৃষ্ঠায় হাতে লেখা হয়। এই ভাবে তরণী লেখা আর তার সম্পাদনের ভার আমার উপর ছিল। ছোট গল্প সমিতির কোনো অধিবেশনে পড়া হয় না। ছোট গল্প লিখি প্রধানতঃ আমি; বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথও (শশিনাথ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) কচিৎ কখনো দু-একটা ছোট গল্প লেখেন। এমনিভাবে আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু হয়।

সেবারে কুন্তলীনের গল্প-প্রতিযোগিতায় আমার গল্প প্রথম পুরস্কার পেতে সাহিত্য-সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। নূতন লেখকদের উৎসাহ দেওয়া ছিল তাঁর মস্ত বিশেষত্ব। সমাজপতি মহাশয় আমার গৃহে এসে তরণীর পৃষ্ঠায় লেখা আমার কটি ছোট গল্প পছন্দ করে তাঁর সাহিত্যে ছাপান। সাহিত্যের মাসিক-সমালোচনা তখন একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল! অমনি ভাষা শানিয়ে কাকেও আক্রমণ করতে পারলে আমরাও দিগ্‌গজ সাহিত্যিক বনে উঠি—এমনি তখন মনের ধারণা! সেই 'সাহিত্য' পত্রে লেখা পাঠাবো ছাপাবার জন্য—এমন কল্পনাও মনে কোনোদিনই জাগেনি, কারণ একালের নূতন লেখকদের মত অতটা forward আমরা ছিলুম না। সভয় সঙ্কোচ আর কুণ্ঠাই মনকে ও দুর্গম পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল। মনের এ অবস্থায় সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নিজে বেছে গল্প নিয়ে ছাপাবেন, এতে গর্ব্বও বোধ করেছিলুম অনেকখানি। সাহিত্যে আমার কটা ছোট গল্প ছাপা হয়ে গেল। কিন্তু এর আগে আমার গল্প লেখার ইতিহাসটুকু বললে বোধ হয় কথাটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ছোটদি (শ্রীমতী অনুরূপা দেবী) অল্প বয়স থেকেই গল্প লিখতেন খুব। লাবণ্য সিং, অনুপম সিং, শুক্লা, শুভ্রা, এমনি সব নামের নায়ক-নায়িকা, রাজপুতানার দুর্গম গিরিশৃঙ্গে সুদৃশ্য প্রাসাদ হ্রদ বা এমনি পারিপার্শ্বিকতার মাঝে বিচিত্র

রোমান্স ফুটিয়ে তুলতেন। আমি ছিলুম ছোটদির সেকালের একজন গুণগ্রাহী পাঠক। আমি তখন কবিতা লিখতুম। ছোটদির বড় বড় গল্পের নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য আমার মনকে খুব দুলিয়ে তুলতো! কেবলি মনে হতো, এমনি সব প্রাণীর সুখ-দুঃখের রহস্যের সন্ধান নিয়ে তুলির লেখায় যদি সে সব ব্যাপার আমিও ফুটিয়ে তুলতে পারতুম! কিন্তু কলম ছিল এমনি অবাধ্য যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও গদ্য লেখা তার মুখে বেরুতো না। ছোটদিকে প্রায়ই বলতুম, কি করে প্লট গড়েন, বলুন তো? ছোটদি নানা আইডিয়া দিতেন। সে আইডিয়াকে বার করতে গেলেই গদ্যর লাইনগুলো কেবলি লুকিয়ে কোথায় মিলিয়ে যেতো! মাথা-কোটাকুট করেও তাদের কাগজের উপর বসাতে পারতুম না।

একবার ছোটদি এলেন ভবানীপুরে আমাদের বাড়ী। তাঁর উৎসাহে একটা ছোট গল্প লিখলুম—টিনের পুতুলের কাহিনী। সে একটা রোমান্সের ব্যাপার। তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল—শুধু এইটুকু মনে আছে টিনের পুতুলটা এক সাহেবের দোকানের শেল্‌ফে নানা মেম-পুতুলের পাশে পড়ে থাকতো; তার পর এক বাঙ্গালী বাবু সেটা কিনে এনে ছেলেদের উপহার দেন। ছেলেরা সেটাকে কখনো পড়ার টেবিলে, কখনো খেলার ঘরে ধুলো-বালির মাঝখানে ফেলে রাখতো। ছেলেরা স্কুলে গেলে তাদের ছোট বোন সেই ফাঁকে সেটাকে তার মাটির পুতুলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খেলা করতো, এমনি নানা জায়গায় পড়ে তার মনে যত যা-কিছু ভাব জাগতো সেইগুলোই ছিল গল্পের প্রাণ! লেখাটার ছোটদি খুব তারিফ করেছিলেন—এবং ওরি কোথাও কোনো ফাঁকে কুন্তলীন তেল আর দেলখোস এসেন্সের নাম ঢুকিয়ে কুন্তলীনের গল্প-প্রতিযোগিতায় পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু কৈশোরের সেই স্বাভাবিক কুণ্ঠা আর সংকোচের জন্যই সে-লেখাটা কুন্তলীন অফিসে পাঠান হলো না। তার দু'তিন বৎসর পরে চুপিচুপি "বৌদির কাণ্ড" বলে একটা গল্প লিখে কুন্তলীনে পাঠাই—পাঠিয়ে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাই। এই সময়েই সাহিত্য-সমিতি আর তরণীর জন্ম হয়। তরণীর জন্য আমারি হাতে গল্প লেখার ভার পড়ে এবং তা থেকেই গল্প পাঠিয়ে উপরি-উপরি দু বৎসর কুন্তলীনের দ্বিতীয় আর প্রথম পুরস্কার পাবার পরে সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহের মাঝে পড়ি। তাঁর তাগিদ আর তারিফ ছোট গল্পের পথে আমার সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে তোলে!

সাহিত্যে আমার গল্প ছাপা হচ্ছিল, এমন সময়, ১৩১৪ সালের কথা—বেশ মনে আছে, শ্রাবণ মাস, একদিন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় (তখন রায়-বাহাদুর হননি, এবং কোনো উপাধির ভার তাঁর মাথায় নামেনি) আমার কাছে এসে আমার

বললেন, ভারতী এখনো বৈশাখ সংখ্যা বার হয়নি! নানা বিঘ্নে—শ্রীমতী সরলা দেবী লাহোর থেকে এসেছেন। ভারতীর ভার কোনো তরুণ লেখকের হাতে দিয়ে তিনি শীঘ্রই লাহোর ফিরতে চান্‌। আমার ইচ্ছা, আপনি এ ভার নেন।

ভারতীর ভার! দীনেশবাবু এ বলেন কি! আমি একজন amateur গল্প-লেখক মাত্র! মর্জ্জি হলো, ঘরে বসে কিছু লিখলুম। সে লেখা নিজে থেকে ছাপতে নিলেন তো ছাপা হলো!—আমার পক্ষে মাসের পর মাস নিয়ম করে ব্যবসার দিকে নজর রেখে সাহিত্যের কারবার করা, এ কি পোষাবে! তিনি ছাড়লেন না! আমায় ধরে বালিগঞ্জে শ্রীমতী সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গেলেন।

ছেলেবেলায় আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী ও ছোটদির সঙ্গে ক'বার বালিগঞ্জে গেছলুম। ছোটদির সঙ্গে ওঁদের বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। গিয়ে দেখা হতে সে-সব কথা উঠলো। শ্রীমতী সরলা দেবী (ছোটদির সম্পর্ক ধরে আমিও ওঁকে সরলাদিদি বলতুম) পরম স্নেহে ভারতীর সেবার ভার আমায় নিতে বললেন। বৈশাখের কাপিও তৈরী করতে বললেন! আমার কোনো আপত্তি তুলতে দিলেন না। আমার অক্ষমতা প্রভৃতির ওজর এমন দীপ্ত উৎসাহে উড়িয়ে দিলেন, বললেন—এ ভার তোমায় নিতেই হবে। ভারতী তোমায় ডাকছেন তাঁর সেবার জন্য—এ ডাক ফিরিয়ো না। তাঁর সেই জলদমন্দ্র বাণী—আমার মনে হলো, ভারতীরই বাণী যেন! আমি বললুম,—বেশ, আমায় দীক্ষা দিন্‌।

সরলা দেবী বললেন—দেবো। তুমি প্রথমেই একটি মাঙ্গলিক কবিতা লেখো। ছোট গল্প একটা দাও। তাছাড়া কতকগুলি বাংলা বই দিলেন সমালোচনার জন্য! ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞের ইংরাজীতে লেখা একটা প্রবন্ধ দিয়ে বললেন, এটা ভারতীর জন্যেই লেখানো। এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে।

আমি স্বপ্নাভিভূতের মত তাঁর কথা শুনলুম—আমার কেমন আবেশ এসেছিল! আমি কবিতা লিখলুম, মাঙ্গলিক কবিতা লিখেছিলুম—

কুঞ্জে তোমার শত সঙ্গীত
　　বেজেছে শতেক ছন্দে,
কত কবি কত ফুটায়েছে ফুল
　　অনুপম রূপে গন্ধে!
বরষে বরষে মধু ঝঙ্কার
　　মন্দির গভীর তানে।
ফুলপরিমলে বিভোর হৃদয়—
　　চেয়েছি কুঞ্জ-পানে!
লুব্ধ হৃদয়ে এসেছি আজিকে,
　　নহে মা কুসুম ফুটাতে—
এনেছি আমার ভক্ত হৃদয়
　　তোমার চরণে লুটাতে!
শুধু সঁপিবারে বাসনা-কামনা—
　　সকলি তোমার চরণে!
তোমারি সাধনা—আমার সে সুখ
　　শ্রেষ্ঠ জীবনে মরণে!

কবিতা পড়ে শ্রীমতী সরলা দেবী বললেন,—মনে রেখো সৌরীন, তোমার এ অন্তরের কথা। এই মন্ত্রই তোমার ভারতীর সেবার মন্ত্র হোক্!

আমি বললুম—ল' পড়ছি, উদরান্নের সংস্থান করতে হবে বলে। তবে মস্ত আইনজ্ঞ বলে যশ বা অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করবো, এ আমার লক্ষ্য নয়। ভারতীর সেবাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য।

তিনি বললেন—আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তোমার সেবা সার্থক হোক!

আমার জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ! জীবন-সাগরের তীরে দু'খানি সজ্জিত তরী আমার সামনে! একখানি তরী যাবে কর্ম্মকোলাহল ভেদ করে দূরে ঐ যে কনক-মন্দির দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর, ঐধারে, আর একখানি বাণীর শ্যামল ছায়ানিবিড় কমল-বনের অভিমুখে! এ পথে মণিমাণিক্যের চিহ্নও নাই! এই কমল-বনের পথই আমি আমার পথ বলে গ্রহণ করলুম।

তারপর তিনি কাজের plan বাৎলে দিলেন; দিয়ে লাহোর চলে গেলেন। ভারতীকে up-to date করতে হলে দুটী ছাপাখানার বন্দোবস্ত করতে হলো! কিন্তু প্রসিদ্ধ লেখকদের দ্বারে দাঁড়াতে তাঁরা বললেন, আগে regular হোক, তারপর লেখা দেবো। বিপদে পড়লুম। উপায়? তখন নিজেদের দল থেকে লেখক নিয়ে ভারতী চালাতে সুরু করলুম।

তখন স্বদেশীর মরশুম। লাহোর থেকে সম্পাদিকা ফরমাশ পাঠালেন, স্বদেশী কবিতা একটী তুমি লিখে ফেলো। কবিতা লিখলুম—'প্রতিষ্ঠা'। নারীকে সম্বোধন করে লিখলুম,—

নায়িকা নও আজ তো তুমি
আজ তো তুমি নও গো প্রিয়া—
যাবে শুধু কবির চিত্ত
প্রেমের স্বপ্নে বিহ্বলিয়া!

তখন নারীর প্রেম নিয়েই তরুণ কবি-দের কাব্যের বেসাতি চলছিল। 'প্রতিষ্ঠা' কবিতায় লিখলুম,—

ভগ্নী তুমি লক্ষ ভ্রাতার
জন্মভূমির কন্যা অয়ি!
বিলাসবেশে চন্দ্রালোকে
সাজবেনা আর রঙ্গময়ী!
দিবসের এই দীপ্ত আলো
জ্বালো, তোমার চিত্তে জ্বালো,
লক্ষ ভ্রাতায় জাগিয়ে তোলো,
সাজিয়ে তোলো বিলাসলক্ষ্মী।
ভগ্নী তুমি লক্ষ ভ্রাতার,
জন্মভূমির কন্যা অয়ি।

এই সময়ই তাগাদার চোটে বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ (বৈরাগযোগ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), গোলোক বিহারী মুখোপাধ্যায় (critical studies লেখায় ইনি এক নূতন ধারা এনেছিলেন; এঁর ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ ছিল। সরকারী চাকরি এবং আলস্য এই দুই ভূতে এঁর হাতের কলম কেড়ে নিয়েছে।) ভারতীতে লিখতে সুরু করেন।

ছুটী ছাপাখানা তার সঙ্গে বিস্তর লড়ালড়ি দৌড়োদৌড়ি করেও ফাল্গুন মাসে আশ্বিন সংখ্যার ভারতী কোন মতে বার করা হলো আমি একা যুঝছি হাজার বিঘ্নের মুখে! ওদিকে লেখাপড়ার তাগিদও আছে, পাশ করতে হবে! কাজেই শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর শরণাপন্ন হওয়া গেল। সম্পাদক বা সম্পাদিকা দূরে থাকলে কাগজ চলে না! তাছাড়া ভারতের রাজনীতিক জগতে তখন ঝড় উঠেছে, শ্রীমতী সরলা দেবী তার ঘূর্ণীপাকে পড়েছেন! রীতিমত বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেবার তাঁর সময় নেই! ভারতী উঠে যাবে? বন্ধুবর মণিলালকেও পাকড়ানো গেল। মণিলাল নূতন প্রেস খুলে ব্যবসা সুরু করেছিল। তিনি রাজী হলেন ভারতীর সেবায় যোগ দিতে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন ১৩১৫ সালের বৈশাখ থেকে তাঁর অবসর কোণ ছেড়ে ভারতীর বীণায় সুর সংযোগ করলেন। তাঁর হাতে পড়ে ভারতীর আবার শ্রী ফিরলো। ঠিক ১লা তারিখে কাগজ বার হওয়া, - আর শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকার সেবার যোগে ভারতী তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনলে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আর সরলা দেবী—এদের কাছেই সম্পাদকী কাজে আমার হাতে খড়ি—এঁদের সঙ্গে থেকে ভারতীর সেবা করে আমার নিজের জীবন কৃতার্থ করতে পেরেছি—এই আমার দীন সেবার চরম সার্থকতা! ভারতীর সেবার সুযোগ না পেলে আমার জীবন কোন্ পথে যেতো, জানি না!

১৩২২ সালে প্রচণ্ড শোকে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কাতর হয়ে পড়লেন—মাসিক পত্রের কাজ চালানোর মধ্যে ব্যবসাদারী বুদ্ধিও কতক দরকার। মনের অমন কাতর দশায় তিনি ভারতীর ভার বন্ধুবর মণিলাল আর আমার হাতে দিয়ে অবসর নিলেন। ১৩২২ সাল থেকে ১৩৩০ সাল অবধি ভারতীর সেবার ভার ছিল, আমাদের হাতে। এ কাজে দায়িত্ব কতখানি,—তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলুম। ক্রমে আমরাও ঐ ব্যবসাদারী বিদ্যাবুদ্ধিটিকে আয়ত্ত করতে না পারার দরুণ মনে অবসাদ এলো। তাছাড়া যে বৃত্তি উদরান্নের জন্য গ্রহণ করেছি, তার দায়িত্বও অল্প নয়। দোটানায় পড়ে ভারতীর সেবার কাজ ঢিলাও হয়ে পড়ছিল ইদানীং। কাজেই শ্রীমতী সরলা দেবীকে আবার মিনতি জানিয়ে ভারতীর ভার নিতে বললুম। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে তাঁর দিবার অনেক আছে। সেদিকে তিনি কার্পণ্য করেছেন অনেকখানি! জাতীয় জাগরণের কাজে তাঁর প্রেরণা বড় অল্প ছিল না। সেই বীরাষ্টমী উৎসব—সেই নির্ভীক মনুষ্যত্বের সাধনা—এর মূলে তাঁর যোগ ছিল কতখানি, তা তখনকার লোকমাত্রেই জানেন! কিন্তু সাহিত্যও যে তাঁর কাছে অনেক দাবী রাখে!

তিনি এ কথায় 'না' বলতে পারলেন না।

বাংলার মেয়ে পঞ্জাবে গেছলেন সীমন্তিনী রক্তবসনা, দিব্যভূষণা,শক্তির সাধনায়—ফিরে এলেন রিক্তভূষা শুভ্র শুচি-বেশা—বাংলায় এসে বাংলার ভারতীর বীণা হাতে তুলে নিলেন সেদিন তাঁর কাছেও আবার সেই প্রাণের কথা জানালুম—

জীবনে অপরাহ্নের ম্লান ছায়া এসে পড়েছে। জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় এক একবার যখন দ্বিধা জাগে, সেই যে তরীখানি লক্ষ্মী-দেবীর কনক-মন্দিরের পথে নিয়ে যাবে বলে আশা জাগিয়েছিল, সে পথ ছেড়ে এ পথে এসে একি ভুল করেছ! মন পরক্ষণেই বলে,—না, না—ও তো ক্ষণিকের মোহ! কিন্তু এই কমলরাজির স্নিগ্ধরূপ-গন্ধ, লতাপাতার এই সবুজ শ্রী—এ সুষমার যে তুলনা নেই! মাঝে মাঝে বিষয়ী বন্ধুর দল বলেন, এ মূর্খ! অন্ধ!—মন হেসে জবাব দেয়, বন্ধু, কি বুঝিবে হায়, আমি যে পেয়েছি কত!—এ পাওয়া বোঝাবার নয়! এ সুধা যে পান করেছে, পান করে যে বিভোর হয়েছে, সেই বুঝেছে, এ সুধার দাম কতখানি! জীবনে মানের কাঙাল বা ধনের কাঙাল কোনদিনই হইনি! শুধু বাণীর পূজায় দুটী ফুল তাঁর চরণে অর্ঘ্য দিতে চেয়ে ছিলুম! সে সুযোগ পেয়েছিলুম, তৃপ্ত হয়েছি এ তৃপ্তিতে কি শান্তি, তা মনই জানে!

আজ ভারতীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। ভারতী আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। জ্ঞান হতে ভারতীর বীণাই কাণে শুনেছি —আরো দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ভারতীর কুঞ্জে এমনি বীণা বাজতে থাকুক—যুগ-যুগের পূজারী ভারতীর চরণ-পূজায় জীবন-মন অর্পণ করুক, এই বীণার ধ্বনি শুনতে শুনতে যেন অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, এর চেয়ে বড় কামনা আমার কোনো দিনই নেই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"ভারতী স্মৃতি"

মাননীয়া শ্রীযুক্তা 'ভারতী' সম্পাদিকা মহাশয়া 'ভারতীর' জুবিলি উপলক্ষে একটু অসময়েই আমাদের স্মরণ করিয়াছেন। তথাপি এই আনন্দ-নিবেদনের নিমন্ত্রণে আমাদের যোগ দিতেই হইবে, নহিলে অকৃতজ্ঞতার দোষস্পর্শে, তবে পথের এই বিলম্বটুকুর ভরও সহিবে কিনা ইহাই সন্দেহ কেননা উৎসব দিনের আর দেরী নাই। তবুও নিজের অন্তরের জবাবদিহির নিকট খালাস পাইবার নিমিত্ত আমাদের এই চেষ্টাটুকু ভারতী অফিসে পৌছিলেও অনেক শান্তি পাওয়া যাইবে!

"ভারতীর জুবিলি"—দেশের সাহিত্যিক জীবনের জুবিলি একথা যে আমাদের মত বাংলার স্বল্পপ্রাণ গল্পলেখকের নিজেদের অস্থি মজ্জায় স্বীকার করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তরুণ সাহিত্য-সেবীদের উৎসাহ দিয়া তাহাদের রচনা প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের নবীন প্রাণের শত-ত্রুটী-সম্বলিত সলজ্জ সঙ্কুচিত নব কল্পনা-লতার মূলে জল সেচন করিয়া তাহাদের ফলে ফুলে

শোভিত করিতে আমাদের যুগে তখন 'ভারতী' ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমাদের সেদিনে 'ভারতীর' পালয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত এবং ভবিষ্য ত 'ভারতীতে' প্রকাশিত সেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী (তখন কাহারো জানা না থাকিলেও) যেন জীবন্তভাবে এই 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিই প্রযুজ্য ছিল।

"ওগো কমল-আসনা, রঙ্গিনী বীণাপাণি।
মোরা কাহারেও আর জানিনা ভারতী
তোমারেই শুধু জানি!
ওগো মধুর-ছন্দা হৃদয়ানন্দা
জানিনা প্রভাত না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পূজার অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
মোরা জানিনা ত তাহা ভাল কি মন্দ
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ
শুধু প্রীতি-পূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি!"

আমাদের সেই ভাল কি মন্দ সংশয়-পূরিত অন্তরের পরমান্ন তখন এই ভারতী দেবীই ভোগ করিয়া আমাদের সাফল্যের আনন্দ—প্রসাদটুকু নিঃশব্দে বিতরণ করিতেন। এখানে আমাদের দলের সম-সাহিত্য-সেবিকা কয়েক জনেরই কথা মনে হইতেছে। জ্যেষ্ঠা-ভগিনী-কন্যা ৺ইন্দিরা দেবী এবং বাল্যসখী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কথা এখনকার বাঙ্গলা উপন্যাস-পাঠকমাত্রেই জানেন, তাঁহাদের সহিত ভারতীর সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এ উৎসবে নিশ্চয়ই নিজের স্থান অধিকার করবেন কিন্তু আর একজন প্রায় অখ্যাত-নাম্নী নীরব সাহিত্য-সেবিকার কথাই একটু বলিতে ইচ্ছা করি যিনি তাঁহার অন্তরের শত কল্পনাসম্পদে ভূষিতা হইয়াও বহুকাল রোগ ও শোকে জর্জ্জরিতা থাকিয়া অকালে চলিয়া গিয়াছেন। এই 'ভারতী' এবং ইহার বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তাঁহার অন্তরে পূজার আসনই পাইতেন। 'লাইকা' ও 'তরুতীর্থে'র লেখিক ৺হেমনলিনী দেবীর কথা বলিতেছি। আমাদের তরুণ সাহিত্য সেবার সময়ে যখন নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিজের অন্তরের সে বস্তুর সন্ধান দেওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইত, সেই সময়েই তাঁহার সঙ্গে পরিচয়, এবং সে পরিচয়ের অল্পদিন পরে যখন জানিতে পারা গেল যে ১৩০৮ সালের ভারতীতে প্রকাশিত 'বেহারে বাঙ্গালিনী' শীর্ষক চিত্র-রচনাটির 'প্রবাসিনী' লেখিকা আমাদের এই অন্তরঙ্গা বান্ধবী, তখন তাঁহাকে কি সম্ভ্রমের চক্ষে যে দেখিয়াছিলাম আজও তাহা মনে পড়ে। তখন বেশীর ভাগ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ইহাদেরই নাম কেবল ভারতীর লেখিকাশ্রেণীতে দেখিতে পাইতাম। ইন্দিরা ও অনুরূপা দেবী তখনো সাহিত্য-সভায় নামেন নাই, আমাদের তো কথাই নাই! অথচ তখন আমাদেরই মত একজন ভারতীর লেখিকা-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন এ যেন

কল্প-লোকের বার্ত্তার মতই সেদিন আমাদের মনে মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। (ইনি পরে অনেকগুলি গল্প এবং 'লাইকা' নামে কাব্যোপন্যাসখানি ভারতীতেই প্রকাশ করেন।)

ইহার বহুদিন পরে ১৩১৫ সালে যখন অনুরূপা অনুপমা নামে ভারতীতে কয়েকটি গল্প প্রকাশ করিলেন, তখন দেখাদেখি আমরাও দুই একটী রচনা ভারতীকে দিতে সাহসী হইলাম। বলা বাহুল্য 'ভারতী' তখন দেবী ভারতীর মতই তাঁহার গোপন-সাধকদের সে ব্যক্ত পূজার অঞ্জলী সাদরেই গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই ইনি চিত্র-সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতে আমাদের বহু পূজাই চিরদিন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। সে সব ভাল কি মন্দ, বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ তাহার বিচার ভারতীই করিয়াছেন, আমরা কেবল প্রীতি-পূরিত পরমানন্দ তাঁহার চরণে দান করিয়া আসিয়াছি। আজ সেই ভারতী পঞ্চাশৎ-বর্ষে পদার্পণ করিল, এ আনন্দে যোগ দিবার আমাদেরও যেন অধিকার আছে, এমনি মনে হইতেছে। ভারতী মাত্র আমাদেরই বয়োজ্যেষ্ঠা নন প্রায় সমস্ত বাংলা মাসিকেরই ইনি জ্যেষ্ঠা ভগিনী! "জ্যেষ্ঠা সুতরাং শ্রেষ্ঠা" এই কবি-বাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা আছে! ভারতীর জ্ঞান-গবেষণা বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী-দের দ্বারা লিখিত হইয়া বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহার অন্যান্য প্রবন্ধ-সমৃদ্ধির আলোচনা করিবার মত যোগ্যতাও আমাদের নাই কেবল গল্প-উপন্যাস-বিভাগ-বিষয়ে এইটুকু বলিতে পারি যে, ভারতী একদিন এদিকেও শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। বাংলার নারী-সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর ইনি লালিত কন্যা, আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রের যোয়ান অব্‌ আর্ক শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও মাননীয়া হিরণ্ময়ী দেবীর ইনি আদরের ভগ্নী, ইহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমাদের সাজে না, তবে প্রার্থনা করি, ভারতী যেন পূর্ব্ব গৌরবে অচলা থাকিয়া বাংলা মাসিকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী রূপেই শত-জীবিনী হইয়া থাকেন। পঞ্চশত বর্ষের উৎসবে আজ সম্মিলিত হইলাম—শতাব্দীর উৎসবে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সেবীরাও এইরূপ অথবা ইহাপেক্ষাও আনন্দ লাভ করেন। ভারতী সম্বন্ধে এ আশা শতাব্দী হইতে যেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে 'চির' শব্দের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়,—সাহিত্যসেবীদের জননী বীণাপাণি দেবী ভারতীর শ্রীচরণে আমাদের আজ এটুকুও প্রার্থনা রহিল। ইতি

শ্রীনিরুপমা দেবী।

ভারতী

বিগত চৈত্র মাসে 'ভারতী'র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে, 'ভারতী' আজ পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করলেন। এতে বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ

করবেন, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নেই। যাঁরা এত কাল 'ভারতী'র সেবা ক'রে এসেছেন, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। আমিও এক সময়ে 'ভারতী'র যৎকিঞ্চিৎ সেবা করে ধন্য হয়েছিলাম—সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা, তখন 'ভারতী'র দ্বিতীয় কি তৃতীয় যুগ চলছিল। তাই আজ আমি 'ভারতী'র পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করছি।

যখন যোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী থেকে প্রথম 'ভারতী' প্রকাশিত হয়, তখন আমরা কলেজের ছাত্র ছিলাম। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা 'ভারতী'কে সমান শ্রদ্ধা করে আসছি, 'ভারতী' যেন আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছেন। সে সময় ঠাকুর-বাড়ীর অপরিমেয় জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে প্রতি মাসে 'ভারতী'র মারফৎ যে প্রসাদ বিতরিত হোতো, আমাদের যুবক-হৃদয় তাতে পরিতৃপ্ত হয়ে যেত, আমরা মাসের পর মাস 'ভারতী'র জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম।

তারপর এক সময় এল, যখন আমার ন্যায় অপরিচিত লেখককেও 'ভারতী' বাণী-পূজার অধিকার দান করেছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী মহোদয়া তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী পরলোকগতা হিরন্ময়ী দেবীর সহযোগিতায় 'ভারতী' সম্পাদন করতেন। আমার হিমালয়-ভ্রমণ এই সম্পাদিকাদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে 'ভারতী'তে ছাপিয়ে আমাকে প্রশ্রয় দান করেন। তাঁরা যদি সে সময় আমাকে এমন করে প্রশ্রয় না দিতেন, তা হ'লে হয়ত আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশই করতেম না। তাই আজ এতকাল পরে 'ভারতী'র এই উৎসবের দিনে আমি পরলোকগতা হিরন্ময়ী দেবীর উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং বহুকাল পরে প্রত্যাগতা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়াকেও অভিনন্দিত করেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই বিংশ শতাব্দীর এতদিন পর্য্যন্ত 'ভারতী' বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে কি দান করেছেন, সে কথা আর বলতে হবে না। আমার ত মনে হয় 'ভারতী' বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা land-mark. 'ভারতী'র দরবারে যাঁরা জয়মাল্য পেয়েছেন, তাঁদের অনেকে এখন স্বর্গে গিয়েছেন, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, তাঁরা 'ভারতী'র দরবার থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন; যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী যে সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান ছিল, এবং এখনও আছে। বঙ্কিম-যুগের শেষ সময়ে 'ভারতী'ই যে সাহিত্যের সেই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রেখেছিলেন।

আমরা যখন প্রথম এ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম এই কলিকাতা সহরে দুইটা বৈঠক। একটা 'ভারতী'র বৈঠক, আর একটা সমাজপতির 'সাহিত্যে'র বৈঠক। এই দুই বৈঠকেই তখন বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকদিগের

আনাগোনা চলত। কিন্তু, এঁদের মধ্যে মনান্তর বা মতান্তর দেখা যেতো না; 'ভারতী' ও 'সাহিত্য'কে কেন্দ্র করে বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যিকগণ বাণী-পূজা করতেন।

তারপর ধীরে ধীরে এই দুই বৈঠকই ভেঙ্গে যেতে লাগল; সঙ্ঘবদ্ধ ভাব যেন অন্তর্হিত হ'তে লাগল। তাতে ভাল হোলো কি মন্দ হলো, সে কথার বিচার আজ আর করব না; তবে এ কথা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলতে পারি, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতাই এই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যেন দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা সেই সময় এসে পড়ল। কিন্তু, এই যে ভাবের স্রোত এল, এর মধ্যে থেকে'ভারতী' তাঁর বিশিষ্টতা ভোলেন নাই।

তারপর এল সাময়িক-পত্রিকা-ক্ষেত্রে আরএকটা ভাব, আর একটা ঢং। সে কথা নিয়ে আলোচনা করা, বা তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। তবে এইমাত্র বলতে পারি যে, 'ভারতী' এই ভাবের স্রোতে বা এই ঢংয়ে গা ভাসিয়ে দিলেন না, সুতরাং মনস্বী ও কৃতী সেবকগণের চেষ্টা সত্ত্বেও 'ভারতী' পিছিয়ে পড়ল, দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে তাল রেখে এগুতে পারল না। শেষে এমন কথাও অনেক শুভানুধ্যায়ীর (?) মুখে শুনতে পাওয়া যেতে লাগল যে, এইবার এতকালের 'ভারতী' উঠে যাবে। আমার ন্যায় 'ভারতী'র বৃদ্ধ সেবকদের কাছে এই সংবাদ যে কেমন দুঃখের হয়েছিল, তা আর বলতে পারিনে।

তখন—এই দুর্দ্দিনে সংবাদ পাওয়া গেল যে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁর বড় আদরের 'ভারতী'কে আবার কোলে তুলে নিচ্ছেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম—'ভারতী' উঠে যাবে না, বেঁচে থাকবে, আবার নববলে বলীয়ান হয়ে আগের মত বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করবে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি 'ভারতী' দীর্ঘজীবন লাভ করুক, আমরা যেন মরবার সময় দেখে যাই, 'ভারতী' বেঁচে আছে—বাঁচার মত বেঁচে আছে।

শ্রীজলধর সেন।

আমার হাতেখড়ি

ভারতীর জুবিলি উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে কিঞ্চিৎ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি আর কি লিখিব, আমি লিখিব ভারতীর সংস্রবে আসিয়া আমার কি প্রকারে সাহিত্য রচনায় হাতেখড়ি হইয়াছিল।

সে আজ সিকি শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা। আমি তখন উড়িষ্যা হইতে বদলী হইয়া আসিয়া নোয়াখালিতে অবস্থান করিতেছি। তাহার প্রায় দুই বৎসর

পূর্ব্বে আমার "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার" বাহির হইয়াছে, এবং তাহা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র পত্রিকাদিতে অনেক লেখালেখি চলিতেছে। ভারতীর কর্ণধর ছিলেন তখন স্বয়ং কবিবর রবীন্দ্রনাথ। তিনি "সাকার ও নিরাকার" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমার পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ তীব্র অথচ সুসংযত সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। * আমি নোয়াখালী পৌছিয়া ভারতীর সেই সংখ্যাটি পাইবার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট এক চিঠি লিখিলাম। অল্প কয়েক দিন পরে খামের মধ্যে একখানা চিঠি আসিল—তাহার শিরোনামা মেয়েলি ছাঁদে লেখা। আমি চিঠি খুলিয়া পড়িয়া একটি ভাবে অভিভূত হইলাম, ইংরেজীতে যাহাকে বলে pleasant surprise.

চিঠি লিখিয়াছেন শ্রীমতী সরলা দেবী, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উড়িষ্যা সম্বন্ধে আমার নিকট একটি সরস লেখা চাহিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে যেমন একটি লেখা কোহিনুর কাগজে বাহির হইয়াছিল। অর্থাৎ আমি উড়িষ্যা ত্যাগ করার পূর্ব্বে "মফস্বলের কাছারি" নাম দিয়া Settlement Camp এর একটি সুবস্থ চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রথমে নব্যভারতে পাঠাই; কিন্তু নব্যভারত সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তাঁহার গুরুগম্ভীর কাগজে এই হালকা রচনাটি না ছাপাইয়া ফেরত দেন। পরে উহা কুষ্টিয়ার কোহিনুর কাগজে আর কি একটা নামে বাহির হয়। শ্রীমতী সরলা সেটা দেখিয়াছিলেন এবং ভারতীর জন্য ঐ রকম humorous sketches আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

চিঠি পড়িয়া প্রথমেই মনে প্রশ্ন উঠিল, শ্রীমতী সরলা দেবী কে? একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইঁহাকে চেনেন না? ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা।" বটে—বটে—ইনি তবে সেই সরলা ঘোষাল, যিনি আমাদের সঙ্গে বি.এ পাশ করিয়া ইংরেজীতে honours পাইয়াছিলেন এবং গেজেটে আমার নামের খুব কাছাকাছি তাঁহার নাম ছিল। বন্ধুটি আরও বুঝাইয়া দিলেন, সরলা দেবী নিজ হস্তে ভারতীর জন্য লেখা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন এটা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া বাস্তবিকই আমার বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। যাহা হউক, চিঠির ত একটা উত্তর দেওয়া চাই। আমি উচ্চশিক্ষিত মহিলার কাছে পূর্ব্বে কখনও চিঠি লিখি নাই, কি লিখিতে

---

* এই প্রবন্ধটি তাঁহার "আধুনিক সাহিত্য" পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমি আমার সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব বিচার পুস্তকের পুনর্মুদ্রিত নূতন সংস্করণে তাহা সম্পূর্ণ তুলিয়া তাহার জবাব দিয়াছি।

কি লিখিয়া ফেলিব মহা ভাবনা হইল। পরে অনেক মাথা ঘামাইয়া তাঁহাকে ইংরেজী কায়দায় বারংবার ধন্যবাদ দিয়া এক চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শিরোনামায় কি লিখিব সে আবার এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল—অর্থাৎ Srimati Sarala Devi B.A. লিখিব, না Miss Sarala Ghosal B.A. লিখিব? অবশেষে যত দূর মনে পড়ে, মিস্ সরলা ঘোষালেরই জয় হইল।

উড়িষ্যায় থাকিতে আমি সে দেশের সম্বন্ধে একটা কিছু লিখিবার জন্য আমার নোটবুক পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তর মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। শ্রীমতী সরলার প্ররোচনায় সেইগুলি অবলম্বনে উড়িষ্যার জীবন্ত লোকচিত্র অঙ্কন করিয়া ভারতীতে দিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার এক একটি চিত্র লিখিয়া শ্রীমতী সরলার অপেক্ষায় থাকিতাম, তাহা তাঁহার মঞ্জুর হইলে তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। ভারতীতে ইহার কয়েকটি বাহির হইলে চারিদিক হইতে আমার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ সাহিত্য-রথিগণ আমাকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়া লিখিলেন। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিলেন—"আপনি ভারতীকে যে সুন্দর আলেখ্যমালায় সুশোভিত করিতেছেন, বঙ্গসাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ নূতন" ইত্যাদি। আমি শ্রীমতী সরলাকে এক চিঠিতে কথায় কথায় লিখিলাম—নব্যভারতের প্রবীণ সম্পাদক আমার লেখা wast paper basket এ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আপনি তাহার কদর বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমার এই উড়িষ্যা-চিত্রাবলী এতদূর আদরলাভ করিতেছে। তিনি ইহার উত্তরে লিখিলেন—"আমি আপনাকে কোহিনুরের খনি হইতে বাহির করিয়াছিলাম।"

এতদিন পরে আমায় এ সকল কথা লেখার উদ্দেশ্য self-advertisement (নিজ প্রশংসা জাহির) করা নহে। আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যদি কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তবে সে জন্য আমি তাৎকালিক ভারতী ও তাহার সুযোগ্য সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর নিকট কতদূর ঋণী তাহা দেখাইবার জন্য। আমার এখন সংসারের দেনা-পাওনা মিটাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এ সুযোগ আমি ছাড়িব কেন?

যাহা হউক উড়িষ্যার চিত্রাবলী প্রায় দুই বৎসর ভারতীতে বাহির হইল। সে-গুলি শেষ হইলে পুস্তকাকারে ছাপান হইল, এবং সেই পুস্তকের নাম হইল "উড়িষ্যার চিত্র"। শ্রীমতী সরলা দেবীই এই নামকরণ করিলেন, তাঁহার এক মাতুলের "বোম্বাই চিত্রের" নামের অনুকরণে। তবে এ নামটি যে আমার পুস্তকের উপযোগী হয় নাই, তাহা এখন বুঝিতেছি। এখনকার বাঙ্গালী পাঠক এই নাম শুনিয়া মনে করেন, হয় ত

ইহা একখানি উড়িষ্যার ভূগোল বিবরণ, বড় জোর ভ্রমণকাহিনী Dickens-এর সমাজ-চিত্রের ন্যায় ইহাতে যে উপন্যাসের রস আছে তাহা এই নাম দ্বারা বুঝা যায় না। আমার পাব্লিশার এবারকার তৃতীয় সংস্করণে ইহার নাম বদলাইতে চাহিয়াছিলেন, কারণ বিগত ২০ বৎসরে ইহার তিনটী সংস্করণের বেশী হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এখন বঙ্গদেশ "গণিকাতন্ত্র সাহিত্যে" প্লাবিত; সুতরাং ইহার বেশী আর কি আশা করা যায়? যাহা হউক আমি নাম বদলাইতে দিই নাই।

ভারতীতে এই উড়িষ্যার চিত্র ভিন্ন মধ্যে মধ্যে আমার আরও লেখা বাহির হইত। কিছুদিন পরে শ্রীমতী সরলা আমার নিকট কয়েকখানা বই পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন সেগুলি সমালোচনা করিতে হইবে। সমালোচনা কিরূপে করিতে হয় আমি তখন তাহা ভাল বুঝিতাম না। তিনিই আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে কোন একখানা পুস্তককে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বিবৃত করাই সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি একজন শিক্ষানবিসের মত দুই একখানা পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলাম, কিন্তু যতক্ষণ সে জিনিষটী প্রথম শ্রেণীর (first class) না হইত ততক্ষণ তিনি ছাড়িতেন না। এইরূপে সমালোচনা সম্বন্ধেও আমার হাতে-খড়ি হইল ভারতীর পৃষ্ঠায়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকত্ব ছাড়িয়া দিলেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার চিরকুমার সভা প্রভৃতি উপন্যাস ভারতীতে বাহির করিয়াছিলেন। ভারতী এই সময় উৎকর্ষের চরম সীমায় উঠিয়াছিল। কি অঙ্গসৌষ্ঠবে কি রচনাগৌরবে, কি সময়ানুবর্ত্তিতায় ভারতী তখন বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইত। আর আমার বোধ হয় ভারতীর ইতিহাসে ইহাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। কোন কারণে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত মিলিত হইয়া নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন বাহির করিলেন। ইহা লইয়া শ্রীমতী সরলার সঙ্গে তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। শ্রীমতী সরলা তাঁহার উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "বঙ্কিমের ভুত নামান" নামক একটি ব্যঙ্গপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা দেখিবার জন্য আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলাম এবং ক্রোধের বেগ উপশম হইলে তিনি সেজন্য আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিলেন। ইহার পরে ভারতী আর রবীন্দ্রনাথের নেকনজর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহা হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া শ্রীমতী সরলা তাহাকে চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়

শ্রীমতী সরলা যখন রাজনৈতিক ব্যাপার ও লাঠিখেলা প্রবর্ত্তন লইয়া মাতিয়া উঠিলেন, তখন আমি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কোন কোন মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। তখন ভারতীর সহিত আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীমতী সরলাও পাঞ্জাবে বিবাহ করিয়া বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন।

বহুবৎসরের পরে আমার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তক বাহির হইলে তাহার একখণ্ড আমি শ্রীমতী সরলাকে তাঁহার মতামতের জন্য পাঠাইয়াছিলাম। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন দেখি তিনি সেই পুস্তক হস্তে "সিংহের বিবরে" প্রবেশ করিয়া তাহার ঝুঁটি ধরিয়া টানিতেছেন। তাহা দেখিয়া "সিংহ" অট্টহাস্য করিয়া উঠিল এবং return visit দেওয়ার জন্য আর একদিন "দেবী চৌধুরাণীর মঠে" প্রবেশ করিল। শ্রীমতী সরলা তাহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আবার ভারতীর সেবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং তিনি নিজেও "দেবী চৌধুরাণী" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আবার বাঙ্গলার মেয়ে বাঙ্গালীর ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবী নাম গ্রহণে বঙ্গভূমির সেবায় লাগিয়া গেলেন। তিনি ১৩২৯ সালের প্রারম্ভে ঢাকঢোল বাজাইয়া আবার ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার হাতে আসিয়াই ভারতী টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইল এবং প্রায় দেড় বৎসর কাল মুমূর্ষু দশায় অসার নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তিনি মধ্যে মধ্যে এক এক ঝিনুক জল বার্লি এবং কখন কখন একটু বেদানার রস দিয়া তাহাকে কোন ক্রমে বাঁচাইয়া রাখিলেন। এতদিন পরে তাহার crisis (সঙ্কটকাল) পার হইয়াছে, সে এতদিনে পঞ্চাশ বর্ষে উপনীত হইয়া আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। এখন আশা করি তাহার ধাত্রী তাহার জন্যে বলকারক পথ্য সংগ্রহ করিয়া আবার তাহাকে পূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবেন। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া জয়ধ্বনি করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বর্ষ-প্রবেশ

চৈত্র গেল চিত্রার সকাশ,
বিশাখায় বৈশাখ প্রকাশ,
পাপিয়ার কল তান, কোকিলের কুহু গান
হৃদে বাজে বন্দনা-সঙ্গীত
আগমনী, বিসর্জ্জন-গীত,
মুকুলের সুধাগন্ধে প্রকৃতি হরিত ছন্দে
রচে প্রেম পল্লব লিখন,
তরু গাত্রে অপূর্ব্ব মিলন,
দখিন মলয় বায়, কিশলয় পত্রিকায়
বৃক্ষশাখে ধ্বজা উড়াইয়া
বরষেরে পথ চিনাইয়া
আনে ধরণীর মাঝে বিচিত্র বরণ সাজে
পুরাতনে নবীন যৌবন,
হরিহর রূপে সম্মিলন,

স্থাবর জঙ্গম অঙ্গে,　　শ্যামল লোহিত রঙ্গে
আঁকে নব বরষের ছবি
রূপান্তর দৃশ্যপট সবি।
কাল বৈশাখের বেশে মহারুদ্র অট্ট হেসে
প্রলয়ের বিষাণ বাজায়
চরাচর আতঙ্কে কাঁপায়।
ধ্বংসপুরে সব যেন,　　পলকে দেখায় হেন,
বৈশাখের বৈশাখী সন্ধ্যায়
বর্ত্তমান অতীতে মিলায়,
নাহি ধ্বংস, নাহি ক্ষয়,　　পুরাতন পরিচয়
যায় আসে এই শুধু নব,
যাদুমন্ত্রে অন্ধ মোরা সব,
যারে হেরি ক্ষণ তরে　তারেই আপন ক'রে
রাখিবারে চাহি হিয়া-তলে
আলিঙ্গনে চিরন্তন ব'লে।
ঘুচে না হৃদয়-ভ্রান্তি,　মিটেনা দেহের শান্তি,
চির আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই,
আশা সাধ পুরাতে না পাই,
পিপাসিত রহে হিয়া,　বাঞ্ছিতে বিদায় দিয়া,
নয়ন নিমিষে যায় সরি
স্মৃতি-ছায়া রহে চিত্ত ভরি,
বর্ষান্তে বরষ যায়,　　আবার নূতন পায়
সেই একে শ্যামা বসুন্ধরা
অভিনব বেশে চিত্র করা
নবরূপে আসে পুরাতন, বর্ত্তমানে করিতে বরণ

—বৈশাখ—,　　শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

ভারতী

আমার বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর তখন বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তিখচিত কুমুদ-কহ্লার-বিকশিত পুষ্পিত আশ্রমের ছবি ভারতীর পৃষ্ঠাফলকে আমাদের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিত। ভারতীর আবির্ভাব ১২৮৪ সালের শ্রাবণে। ভূমিকায় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর এক স্থানে বলিতেছেন পুষ্পের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতিঃ, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারতভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলে তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্ব্বক এইত প্রতিষ্ঠা করিলাম, এখানে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে তাহার ব্যবস্থা করুন।"

আমরা বলি কেবল ভাই বন্ধু লইয়া ভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভাই-ভগিনী-বন্ধু লইয়া ভারতীর প্রতিষ্ঠা। ভারতী প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত দর্শনে পাকিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি উহার প্রথম ব্যাখ্যা হইতেই "তত্ত্বজ্ঞান কত দূর প্রামাণিক" লইয়া

আরম্ভ করিলেন। গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ আত্মশক্তি ইহাতে ঢালিতে লাগিলেন। পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থ প্রকাশে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিও ভারতীর সহায় হইলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা অবিরল ধারায় ভারতীতে বাহির হইতে লাগিল। গঙ্গা গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য জলস্রোতের সাহায্য আপনা হইতেই পাইয়াছিল তাই ভীম পরাক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ছুটিতে পারিয়াছিল। ভারতীও পাইয়াছিলেন মুখ্যতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কলত্র, আত্মীয় স্বজনের ও বান্ধবগণের অমোঘ সাহায্য তাই ভারতীর শ্রেষ্ঠত্ব এক সময়ে সকলকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে সাহিত্য-জগতে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন ভারতীর পত্রে পত্রে বিরাজমান। রবিবাবুর "য়ুরোপযাত্রীর পত্র" পাঠকগণ পিপাসু হইয়া পাঠ করিতেন। লিখিতে লিখিতে লেখক বা কবির হাত দিন দিন খুলিয়া যায়। ভারতীকে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনা দিন দিন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল। একভাবে বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর নিকট ঋণী। এবং ভারতীও যথেষ্ট পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব রচনার জন্য ঋণী। ঠিক এই ভাবে সাহিত্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর অপূর্ব্ব প্রতিভা তাঁহার অসংখ্য কাব্যে, সঙ্গীতে ও অন্যবিধ রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধাদির কে ইয়ত্তা করিবে?

কাব্য-সাহিত্য এমনই সামগ্রী যে যতই লিখিতে থাকিবে, অফুরন্ত নব নব ভাব আসিয়া তোমার হস্তে বিকশিত হইবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকিবে। তোমার ভিতরে জড়তা ও দীর্ঘসূত্রতা না থাকিলে তুমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া যাইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথে আলস্য স্পর্শ করিবার অবকাশ খুঁজিয়া পায় না, তাই তাঁহার লেখনী এক দিনের জন্যও স্তব্ধ নহে।

আজ কাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে' তাহাতে উদীয়মান লেখক তাঁহার রচনা প্রকাশের জন্য অনুকূল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা কাকুতি মিনতি করিয়াও প্রাপ্ত হন না! মাসিক পত্র যাঁহারা পরিচালন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের গৃহের বাহিরের লোককে সহজে স্থান দিতে সঙ্কুচিত। এই কারণে অনেকের প্রতিভা অঙ্কুর-মুখেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। ভাগ্যবশে লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়েরই কৃপা ঠাকুর-পরিবারের উপরে। তাহার উপরে তাঁহারা মার্জ্জিতরুচি ও সকলেই সুশিক্ষিত। তাই তাঁহাদের ভিতরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; ভারতী, ৺নগেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত সাধনা, শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী প্রবর্ত্তিত বালক, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবর্ত্তিত পুণ্য এতগুলি মাসিক পত্রের অভ্যুদয় হইতে পারিয়াছিল, তাই তাহারা বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশে জনসমাজের অশেষ কল্যাণবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই কর্ম্মঠ প্রকৃতি তাঁহাদিগকে এই সমস্ত পত্রিকা-পরিচালনে উৎফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল।

বয়োধিক্যে যখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকীয় ভার হইতে বিদায় লইলেন, তখন নিজ সহোদরা ভগিনী স্বর্ণকুমারীর কোমল ও যোগ্য হস্তে উহার সেবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্যাপককাল ধরিয়া স্বর্ণ-কুমারী ভারতীর নিয়ন্ত্রী থাকিয়া পরে সুযোগ্যা কন্যা ৺হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবীর সেবায় ছাড়িয়া দিলেন। উভয় সহোদরার সমূহ যত্নে ভারতী তাহার পূর্ব্ব সম্মান অক্ষত রাখিয়াছিলেন। ক্রমে হিরণ্ময়ীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। সরলা সুদূর প্রবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের জন্য ইঁহাদেরই আত্মীয় স্বজন উহার পরিচালন করেন। এক্ষণে সরলা দেবী সুযোগ্য হস্তে ভারতীর অভিভাবকত্ব আবার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সংসারের বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়া পড়িলেও তিনি তাঁহার সমস্ত অনুরাগ ভারতীর উপরে ও দেশের জনসাধারণের অভিমুখে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতে তাঁহার নিজত্বের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। তাঁহার অমূল্য জীবন ভারতীকে নব জীবন দান করুক। প্রবন্ধ-সম্পদে ইহা আরও মূল্যবান করিয়া তুলুক। ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর এক অর্থে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ভারতের সেই ভাগ্য-বিধাতা ভারতীকে সুপথে কল্যাণে পরিচালিত করুন। যাহাদের হস্তে ইহার পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহে ও অন্তরে আবার বল বিধান করুন, ইহাই আমার কামনা।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

বীরবলের পত্র

—:•:—

"ভারতী"-সম্পাদিকা

সমীপেষু

গত কয়দিন ধরে এই কলিকাতা সহরে হিন্দু-মুসলমান মিলে যে নাটকের অভিনয় করেছে আপনি আমাকে সে অভিনয় সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জানতে চেয়েছেন। এ জাতীয় নাটককে ইংরাজরা বলে Passion Play। আমি চেষ্টা করলে হয়ত "চিরকুমার সভা" সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে পারি কিন্তু যে মহা-নাটকের অভিনেতারা মহাবীর নয় মহা-মূর্খ,—সে নাটক সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলবার অধিকার নাই। আমি এ জীবনে hero-worshipper হতে পারলুম না যদিচ আমিও কার্লাইল পড়েছি। এর কারণ আমি দেখতে পাই যে, সাধারণতঃ লোকে যাকে বীরত্ব বলে তার সঙ্গে গোঁয়ার-তুমীর যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, আর গোঁয়ারতুমির সঙ্গে সুবুদ্ধির সম্পর্ক অতি কম। ইতিহাস পড়ে দেখুন—দেখতে পাবেন আমরা তাদেরই বলি মহাবীর যারা বহুলোককে বেজায় মার মারতে পারে। সম্প্রতি অবশ্য আর এক মত বেরিয়েছে যাতে বলে—তারাই হচ্ছে মহাবীর যারা দেদার মার খেতে পারে। এর ভিতর যে মতই গ্রাহ্য করুন, দেখতে পাবেন দুয়েরই এক কথা—মারামারির মূল থেকেই বীরত্বর ফুল ফোটে। যে-দিন পৃথিবীতে মারামারি থাকবে না সে-দিন মানব-সমাজে বীরত্বও থাকবে না। যদি কেউ বলেন যে, পৃথিবীতে এমন দিন কখনো আসবে না যখন মানুষে মানুষে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করবে না। তার উত্তরে আমি বলি, যে-দিন কখনো আসবে না, সেই দিনই হচ্ছে আমার ideal। আর কে না জানে, সেই বস্তুই হচ্ছে ideal যা কস্মিন কালেও real হবে না অথচ যাকে রিয়েল করবার প্রয়াস আমাদের নিত্য পেতে হবে। এত লম্বা বক্তৃতা করলুম, এই কথাটা বোঝাবার জন্য যে, কলিকাতা সহরে যে নাটকের অভিনয় হয়ে গেল তার রস আস্বাদন করবার আমি উপযুক্ত পাত্র নই।

আমি যে-বীর-রসের রসিক নই তা আপনারা সবাই জানেন। ও সত্ত্বেও

আপনি যে এ বিষয়ে কেন আমার মৌনব্রত ভঙ্গ করতে ব্রতী হয়েছেন তা আমি অনুমান করতে পারি। সে কালে যিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক করবার চেষ্টা করেছিলেন সেই আকবর সাহেবের আমি পূর্ব্বজন্মে ছিলুম একজন প্রিয় পারিষদ।

কিন্তু আকবর সাহেবের প্রিয়পাত্র হলেও আমি যে তার স্বধর্মীদের প্রিয়পাত্র হতে পারিনি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ "তারিখ-ই-বাদায়নী" নামক পারসী গ্রন্থের পাতায় পাতায় আছে। সে গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ আছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পরিচয় পাবেন যে গালিগালাজ কাকে বলে। আর পারস্য ভাষায় যত বাছা বাছা কটু কথা আছে সে সবই বীরবলের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে। মৌলবী বাদাউন, বহুকাল পূর্ব্বে ভবলীলা সাঙ্গ করে "হুরির" দেশে চলে গিয়েছেন অতএব এ স্থলে তাঁর জন্য দুঃখ করা ছাড়া তার সম্বন্ধে অপর কোন কথা আমার মুখে শোভা পায় না। শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে আকবর বাদশা যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটিয়েছিলেন সে সুফল যে আমার রসিকতার বলে আর ফৈজীর কবিত্বের বলে আর আবুল ফজলের পাণ্ডিত্যের বলে ঘটেছিল; মৌলবী বাদাউনের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের ব্রাহ্মস্পর্শকে মৌলবী সাহেব অকারণ ভয় করতেন আকবর সা এ কার্য্য উদ্ধার করেছিলেন নিজ বাহু-বলে ও চরিত্র-বলে। বাঘ-বক্রীকে এক ঘাটে জল খাওয়ান কবিরও কর্ম্ম নয় রসিকেরও কর্ম্ম নয়। কথার ফুঁয়ে মনের আগুন যত চটপট জ্বালিয়ে—কথার শান্তি-বারিতে তত শীগ্‌গির তা নেবান যায় না। বরং নিত্য দেখা যায় যে শান্তিবারির ছিটেফোঁটার স্পর্শে হোমের আগুন দ্বিগুণ রাগে জ্বলে ওঠে।

(২)

এই সব বিবেচনা করে বর্ত্তমানে চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করি। বিশেষতঃ সাহিত্যিকের পক্ষে এ অবস্থায় নীরব থাকা সব হিসেবে সঙ্গত। সাহিত্যিকের কারবার বর্ত্তমানের সঙ্গে নয়, তার কারবার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, এক কথায় যা চিরন্তন তাই নিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সনাতন হতে পারে কিন্তু চিরন্তন নয়। তা ছাড়া এখন কথা কইতে হলেই হয় নির্ব্বোধের মত কথা কইতে হবে, নয় অতি-বুদ্ধিমানের মত।

নির্ব্বোধের মত কথা কইলে গোল বাড়বে বই কমবে না, আর বুদ্ধিমানের মত কথা কইতে হলে দেদার চালাকি কথা কইতে হবে আর অতি-বুদ্ধিমানের মত বাহবা করতে হলে এই বিরোধের ভিতর মিলনের চেহারা দেখতে হবে।

আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টিকে অতিসূক্ষ্ম না করতে পারলে এ ব্যাপারের ভিতর সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের সূক্ষ্ম শরীরের দর্শন আমরা লাভ করতে পারব না। কিন্তু এ আড়ির অন্তরে ভাবের সূক্ষ্মশরীর দেখবার প্রবৃত্তি আমার

থাকলেও অপরকে তা দেখাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক—তা তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক,—বেজায় স্থূলদর্শী। বিপদের কথা এই যে - এই সব স্থূলদর্শীরা হয়ত আমাদের অতি-নির্ব্বোধ মনে করবে। অতিবুদ্ধি ও অতি-নির্ব্বুদ্ধিতার ভিতর যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে—তা স্থূলবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে না। এই সব ভেবেচিন্তে আমি উক্ত ব্যাপারের কাব্যাংশের বিচার না করে তার দার্শনিক অংশের বিচার করাটাই সুযুক্তির কাজ মনে করি। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করব।

(৩)

হিন্দু-মুসলমানে সমস্যা বলে যে একটা সমস্যা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গত পাঁচ বৎসর ধরে এই সমস্যা নিয়ে আমাদের দেশের পলিটিক্স্ এমন মুখরিত হয়ে উঠেছে—যে এ সমস্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব।

আমি সমস্যার নাম শুনলেই ভয় পাই। কেননা দেখতে পাই যে, সমস্যার কথা পাড়লেই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তার হাতে হাতে মীমাংসা ক'রতে বসে যায়। এ ত হবারই কথা। মীমাংসা করবার জন্যই ত সমস্যার সৃষ্টি। তবে সমস্যা এক হতে পারে কিন্তু তার মীমাংসা হয় অসংখ্য। কারণ সমস্যা যদি থাকে ত সে বস্তু real আর মীমাংসা জিনিষটে যত unreal হয় ততই সুন্দর হয়। আর মীমাংসা যে বহু হতে বাধ্য তার কারণ unrealityর অসীম ক্ষেত্রে প্রতি লোক অবাধে তার বুদ্ধি খেলাতে পারে। সকলেই জানে ইতিমধ্যে এক প্রকার মীমাংসাকরা কত প্রকার "হিতং মনোহারী চ" বাক্য আমাদের শুনিয়েছেন। সুতরাং সে সকল পূর্ব্ব-মীমাংসার টীকা-ভাষ্য করবার আর প্রয়োজন নেই। তবে দোসরা এপ্রিল যে পূর্ব্ব-মীমাংসকদের সব April Fool বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। এ স্থলে এ সমস্যার একটি উত্তর-মীমাংসার পরিচয় দিই।—

মাদ্রাজের জনৈক মহা-অব্রাহ্মণ পলিটি-সিয়ান বলছেন যে যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে কন্যা সম্প্রদান করেন তা'হলেও উভয় জাতির আন্তরিক মিলন ঘটে। দেহান্তর থেকেই যে মনান্তর ঘটে এ কথা সুধু কবি-প্রসিদ্ধি নয়—বৈজ্ঞানিক সত্যও বটে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার এর চাইতে সহজ মীমাংসা আর কি হতে পারে?

এই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব হলেই ষোল কলায় পূর্ণ হত। আমাদের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে স্বরাজ-সমস্যা। এখন ইণ্ডিয়ানরা যদি ইংরাজদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তার মানে ত্রিশ কোটি Indian যদি Anglo Indian হয়ে যায় আর ইংরাজরা যদি সব

Eurasian হয়ে যায় তাহলে অতি সহজেই স্বরাজের মামলার আপনা হতেই আপোষে মীমাংসা হয়ে যায়।

অদ্যাবধি হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার যত মীমাংসা হয়েছে সবই এই জাতীয়। কারও logic বেশী দূর যায়, কারও কম—মীমাংসকে মীমাংসকে এই যা প্রভেদ। প্যাক্ট্ নামক মীমাংসার ভিতর খুব tact থাকতে পারে—কিন্তু fact নেই। এখন fact যে কি সে বিষয়ে গত কয়দিনের ঘটনা, আশা করি, সহজ মানুষকে সচেতন করে দিয়েছে। আমার শেষ কথা এই যে, এই সব মীমাংসাই উক্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নিত্য নূতন মীমাংসার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেই আমাদের কাছ থেকে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যাটাও হয়ত উপে যাবে। কারণ সমস্যা যেমন মীমাংসার সৃষ্টি করে, আবার মীমাংসাও তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে আমাদের কি কর্ত্তব্য? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়—ফরাসী-বিপ্লবের সময় terrorএর সময় তিনি কি করেছিলেন, তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে ছিলুম। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর যাতে করে আমরা ঐ উত্তর দিতে পারি তাই আমাদের কর্ত্তব্য।

১৮।৪।২৬

বীরবল

স্বরলিপি।*

[কথা, সুর ও স্বরলিপি — শ্রীমতী সরলা দেবী]

—•:*:•—

গা রা | গা মা পা ধা | পা মা গা রা | গা মা
তু মি সু — ন্দ র সু — ন্দ র ধ র

পা ধা | পা মা গা রা | গা মা গা রসা | গা রা
ক — ল্যা — ণী — তু মি ক — ল্যা —

সা ণ্ | সা -া -া -া | -া — া -া -া ‖
ণ ক র — — — — — — —

গা মা পা ধা | ধা -া ধা ধা | পা ধা পা
প্রা — ণে র প্রা — ণ হে জী — ব

র্সণা | ধা পা মা গা ‖ গা মা পা -া । পা পা
ন আ — ক র বা — ণী — তু মি

পা -া । ধা ণধা পা ধা । র্সণা ধা পা -া ‖
শ্রী — কী — র্ত্তি অ ম — র —

না না না -া । না -া পা না । না র্সনা ধা না ।
জ য় তো — মা — — র জ য় তো —

র্সা -া সরগা মপধা

ধা ধা -া ধা । ধা -া ধা ধা । ধা ধা ধা -া ।
তো মা — র আ — শী ষ ব হি যা —
কা — ক লী আ — মা র উ ঠে — ত
স ব ই — প্রি — — য় প্র ব শে তে
সু র ম য়ী তু মি হে স র — — স্ব

এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মাঙ্গলিক" গানের স্বরলিপি।

সা মা গা মা
ধা -া ধা পধা | পা ণা ধা পা । মগা মা পা -া ।
আ — জি কে | ন ভ হ ল ন ত শি —
ত — পা নে পা খী র গা নে — র স
নী — — ন হ উ ক ঘু চা — য়ে —
তী — — — তো মা রি সু রে — র —

পা -া -া -া । { -া -া সরা গমপধা ॥ } -া -া -া ।
· · · · · · · র · · · ব ॥
ম · · · · · · · · · · ·
বা · · · · · · দ · · · দ
তা · · · · · · র · · · র

মা মা -া া । মা মা মা -া মা ধা -া ধা । পা ধা পা মা ॥
প্র ভা · ত তু লি কা · শু · · ভ্র মূ · র তি
শ ক তি বি চা - র ক রে - - না ক - তা র
ম র মে - ম র মে - ক ক্ষ ক প্র বে - শ -
ব চ নে - তে - ম নে কা · য়ে - তে - র চুক

গরা সা সা -া । সরা গা রা গরা । সা -া -া -া । (৪)
গরা সা রা গা (৩)
গা মা গা গা । গা গরা সা রগা । সা -া -া -া । -া -া -া -া ।
আঁ - কি ল প টে - নি শি - - - - - - র ॥
ভ ক ত বি হ - - ঙ্গ ম - - - - - - -
ত ব অ না - - হ ত না - - - - - - দ
সু র ম য় - - সং - সা - - - - - - র

পা পা না না না নধা পা পধা । পর্সা র্সা
পা না না না । -া না না -া । না না নধা পা । পধা পর্সা
পু - ষ্প আ - নি ল - ত ব নি - শ্বা -
চি দা - কা - শ ধ্যা নে বি ভো র যে - -
বী - ণা কা - দি নী র বী - ণা র ধ্ব -
হো · ক ম ম - প্রা ণ এ · ক খ - নি

র্সা ধা || ণা ণা ণা ণা । ধা ধা ধা পা । পধা পা মা -া ।
স — অ রু ণ কি — র ণ — স্প — র্শ —
ত ন ঘো — ষী — জি নি এ ক নি — ষ্ঠ —
ক ন অ বি রা — ম ম নো — হ র — —
গা ন মা — নে ল য়ে — অ বি কা — — র

-া -া -া -া ||
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —

মা — া মা মা। মা মা মা -া। মা ধা ধা ধা। পা ধা
দু — রি ত হ ই ল — মো — হ ত মো —
চি — — ত্ত ক ম লে — তো মা — র চ —
শু নি অ — ন্ত রে — — বা — হি রে তে —
জী — ব ন হ উ ক — ছ — — ন্দো ব —

পা মা || গা মা গা গা। গা -া মা সা। রগা রা সা -া।
ভ র || হৃ দ য় ভ রি — ল — হ — র্ষ
র ণ রা — খ হে দে — বী ব বি — ষ্ট
যে ন হে — প্রি য় — প রা — ৎ প র —
দ্ধ — সু ল লি ত — — ঝ ঙ্ কা — — র

-া -া -া -া ||
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —

সা সন্ সা মা। মা -া -া -া। মা মগা মা ধা। ধা পধা
জ য় তো — মা — — র জ য় তো — মা —

পা -া || না না না না। না সনা ধা না। র্সা -া -া -া। -া -া -া -া
— র জ য় জ য় জ য় তো মা - - - - - র।

লীলা

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়,
ছন্দের লীলা ধীর গম্ভীর মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোণা রূপের রেখায় রেখায়,
অতলের লীলা তুমুল তরল তরঙ্গে॥
আপনারে পাওয়া, আপন ত্যাগের গভীর লীলায়,
মুক্তিরে পাই নম্রতাহীন কঠিন শিলায়,
শান্তের লীলা প্রলয় দারুণ ভ্রূভঙ্গে॥

অচলের লীলা নির্ঝর জল কল কল্লোলে,
অমলের লীলা কতনা রঙ্গ বিরঙ্গে।
অটল ধরার লীলা শস্যের শ্যাম-হিল্লোলে,
গগনের লীলা উধাও-ডানার বিহঙ্গে।
স্বর্গ খেলায় মর্ত্ত্যের ম্লান ধূলায় হেলায়,
দুঃখেরে বহি আনন্দ খেলে দোলন খেলায়,
সাধুর খেলা যে পাপী তাপিতের আসঙ্গে॥

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

খেয়াল খাতা

হুজুগ-পঞ্চক-স্তোত্র

(জীবন-তন্ত্র হইতে ভাষান্তরিত)

——:০:——

১

হে ভবিষ্যৎ ভাবনাভঞ্জনকারী, মনুজমন-মহোদধি-মন্থনকারী, মহামহিম মহিমান্বিত মহামহোপাধ্যায়, ত্রিজগদ্বরেণ্য হুজুগ! তোমাকে প্রণাম করি।

২

হে হুজুগ! শৈশবে তোমার মোহন-মদিরায় মুগ্ধ চপল শিশুর চিরাচরিত চাঞ্চল্যের ফলে শিশু-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া যখনই জননী-হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছি তখনই জানিয়াছি তুমি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং তোমাকে প্রণাম করি।

৩

হে হুজুগ! কৈশোরের ক্রীড়াভূমি ইস্কুলে শিক্ষকের কঠোর কবল হইতে কায়ক্লেশে তোমারি উত্তেজনায় উন্মুক্ত হইয়া উদগ্র উৎসাহে পথপ্রান্তবর্ত্তী পরের গাছের পাকাকুল পাড়িয়া পরমানন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কদাচিৎ কোন অরসিকের কর্কশ কণ্ঠোচ্চারিত সরস ভৎ‍র্সনার ভয়ে ভীত না হইলেও সেই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের দৃঢ়হস্তধৃত সুদীর্ঘ বংশদণ্ডের দুর্দ্দমনীয় আন্দোলন দেখিয়া প্রাণপণে পলায়নপরায়ণ না হইয়া পারি নাই। তথাপি পশ্চাত্তাপ হইতে অব্যাহতি পাই নাই। কোন্ নিঠুর নরাধমের নারকীয় প্ররোচনায় সেই পাপমতি পাষণ্ড, মাষ্টার মহাশয়ের ধর্ম্মাধিকরণে মোকদ্দমা করিয়া পরিণামে আমাদিগকে কাণমলা খাওয়াইয়াছে। এখনও শিহরিয়া ওঠে কর্ণ স্মরিয়া সে ব্যথা! এ সকলি তোমার কৃপা-কটাক্ষের ক্রিয়া। সুতরাং তোমাকে প্রণাম করি।

৪

তার পরে যৌবন-সমাগমে তোমার প্রসাদে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুবর্ণ-সুযোগ সমুপস্থিত হইল। জনাকীর্ণ নগরে কলেজের ছাত্রাবাসবাসী হইয়া বল্গাবিহীন জীবন-যাপন তখনকার দিনে সাক্ষাৎ স্বর্গবাসের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিল।—সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রভুত্বও আমাদের উপর অপ্রমেয় হইয়া উঠিল। উল্লম্ফন, প্রলম্ফন, ঝম্পন, অনুরণন্ প্রভৃতির সঙ্গে ঘন ঘন বাহ্বাস্ফোট

সহ বিকট বক্তৃতার উৎকট গর্জ্জনে সত্যসত্যই যে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইত সে বিষয়ে সন্দেহাশঙ্কা ছিলনা। সভা, সমিতি, সম্মিলন, সঙ্ঘ, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানেই আমাদের সদলবলে অধিষ্ঠান হইত। তোমার অপ্রতিহত প্রভাপের বলে পরোপকার পরার্থপরতা পতিত জাতির পাতিত্যের প্রতিষেধ প্রচেষ্টা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন মত প্রতিদিন ন্যূনকল্পে পঞ্চাশৎ বার প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না। অভাগিনী ভারতভূমির ভার-হরণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রায় সকলেই ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল রূপে অভিহিত হইতে লাগিলাম। সহসা পড়িয়া গেল আমাদের উপর বাহিরে পুলিশের কুলিশ-কঠোর দৃষ্টি এবং চলিতে লাগিল কলেজে প্রিন্সিপাল সাহেবের ভ্রুকুটি-কুটীল ভয়ঙ্কর ভঙ্গিসহকারে বিভীষণ ভীতি-প্রদর্শন! সুতরাং—"অমন অবস্থায় পড়লে সবারি মত বদ্‌লায়।" তাই কিছুদিন পরে আবার তোমারি উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কেরাণী-কুল-কুঞ্জর হইবার প্রমত্ত আশায় উন্মত্ত-উদ্যমে পরীক্ষা পাশের পাঠে সুপ্রচুর মনঃসংযোগ করিলাম। তৎকালে সেই মধুময় জীবন সুধাময় করিবার জন্য তোমার দ্বিধাবিহীন সহায়তার স্মৃতি— এখনো অন্তরে জাগে কেরাণী কুলের। শুভদিন আসিল; শুভক্ষণে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া সুখের সংসার-সাগরে সন্তরণ করিতে করিতেই কেরাণী হইলাম। ক্রমে কল্পবৃক্ষে ফল ফলিতে লাগিল তৎপরবর্ত্তী অবস্থা বাংলার বাবুদের প্রায় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। সুতরাং সকলে পরস্পর সহানুভূতিতে সমপ্রাণ হইয়া হে অপরিণামদর্শী-প্রস্তত-কারী হুজুগ! তোমাকে প্রণাম করি।

৫

হে হুজুগ! আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রথম প্রান্তে পদার্পণ করিয়াও দেখিতেছি তোমার প্রচ্ছন্ন প্রেমে বঞ্চিত হই নাই। এখনও সেই সভা আছে—সমিতি আছে—সঙ্ঘ, সমাজ, সম্প্রদায়, সম্মিলন সকলি আছে। আবার ধর্ম্মসভা হরিসভা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সভাও আছে। তবে এখানে তুমি শুধু সমষ্টিসহায়ক নও, ব্যষ্টিরূপেও ঘটে ঘটে বিরাজমান। তাই বুঝি ধর্ম্মঘটে তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ সমধিক প্রকটিত! এই জন্য এই জরাভীতিগ্রস্ত জীবনের তোমার প্রভাবে পরোপকারের প্রত্যক্ষ পরিণামে অপযশ-প্রাপ্তি এবং পরোপকারের অপ্রত্যক্ষ পরিণামে প্রতিপত্তি-লাভ দেখিয়া বিস্মিত হইতে বাধ্য হইতেছি।

এখন দেখিতেছি, তোমার সহায়তায় সংস্থাপিত সভায় 'ভা' থাকে না—সম্প্রদায়ে 'দায়' থাকেনা—সমাজে 'মাজ' থাকেনা— সমিতিতে 'মিতি' থাকেনা—এবং সম্মিলনে 'মিলন' থাকেনা। তোমার স্বর্গের কীর্ত্তি পুরাণে পাঠ করিয়া পবিত্র হই। মর্ত্ত্যের কীর্ত্তি প্রত্যক্ষই প্রতিভাত। আবার

দেখিতেছি তুমি—অন্যের অগোচরে অন্তরে প্রবেশ করিয়া তুচ্ছ কেরোসিনের সঙ্গেও সখ্যতা স্থাপন করিয়াছ। তাহার সাহায্যে তোমাতে অনুরক্তা কামিনীকুলের কুসুম-কোমল কমনীয় দেহযষ্টিগুলি দগ্ধ হইয়া দেশে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং হে অঘটন-সংঘটন-কারণ কারণোত্তম হুজুগ! তোমাকে প্রণাম করি।

ইতি শ্রীশ্রীবন-হস্তে হুজুগপঞ্চক স্তবরাজ সমাপ্ত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

রায়তের কথা

—:•:—

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা ঊর্দ্ধমূল অবাকশাখ। উপরের দিক থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে, অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলচে। শ্রীমান্ প্রমথর "রায়তের কথা" প'ড়ে আমার মনে হ'লো যে আমাদের পলিটিক্‌সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিষটি শিকড় মেলেছে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে, কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্দ্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটীক্‌স। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা, কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে হাসচে, আর মাথার উপর অপমানের মূষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বলচে, "অদৃষ্ট!" দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বলচে "কালোমেঘে আর হেরব না গো দূতী।" তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চলচে মান

এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই" আজ তেমনি জোরেই বলচি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বলবার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি তার আওয়াজ বড় মিহী। যে আছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারী জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তারপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পাকটিক্সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেচি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা, আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রভাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন, কী শব্দ-সম্বলে কী অর্থসম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চলত, তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মরবার জন্যে, আর যাদের অন্ন-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে ম'ঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া ক'রে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক্ সিংহাসন, গড়া হোক্ মুকুট, খাড়া হোক্ রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্‌নি, তারপরে সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্স আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্সের সাজ করমাসের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদলে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেন না আমাদের কারখানা ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেন্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্য মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই

নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব তারপরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্সো, আর আছে ওকালতীর দংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্সে প্রমথর "রায়তের কথা" স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। সে ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছে না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চায় সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। প্রমথর মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তাকে বলতে পারে, আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই, তারপরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে, যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। প্রমথর জানা উচিত ছিল হাল-আমলের পলিটিক্সে টাইম্‌টেব্‌ল তৈরী, তোড়জোড় গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্ত্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম টেব্‌লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। প্রমথ তার্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চায়, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। সে সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চায়। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা খসচে;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। প্রমথর "রায়তের কথা" সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্চে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েচেন। আমাদের মন

যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মাল মসলার গায়ে ছাপ মারা আছে Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম কম্যুনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি নানা-প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি-ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা, সব ছোটো ছোটো এক একটী রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো, অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবর-দস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠী মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলচে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে বাইরের থেকে আত্ম-হত্যা করে ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স নিয়ে পার্লা-মেণ্টীয় রাজনীতির পুতুল খেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ-গোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে তার মধ্যে মাটসিনি গারিবাল্ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাটোর পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়; রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল-শেভিজম্ ফাসিজ্ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্য্য-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডা তন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপর

তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠীর ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্ত্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসমাঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ-মোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায় তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথার বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টীরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম, সাহিত্যে ইসারা চলচে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদেরও যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়ত শিকারের বিষয়-পরিবর্ত্তন হবে কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে, কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্চে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটীতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েচে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয় তাহলে তা'কে দ'লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জ নি...

জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জ্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো মাপের রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, "রায়তের কথা"র পুরাতন দফতর ঘেঁটে প্রমথ সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধিতে বসেচে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্চি, রায়তদের বলচি "প্রজা", তারা আমাদের বলচে "রাজা", মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাঁকেই গছিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। প্রমথ বলছে, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে। এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয় বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে, তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ আছে বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কি করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ

করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সম্ব হবেই, কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এম্‌নি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়ৎকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েচে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কিনা সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়ৎকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাক্‌ত, তা হ'লে নীলের বন্যার রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই, রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন স্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেল-

খানায় যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটী সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার যুযুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতী-বুদ্ধির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুন্‌তেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে যোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে মূঢ় রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে? প্রমথর লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

আমি জানি জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে

মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোক্‌সান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয় এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহের জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা, সুতরাং কেবল চাষী নয় সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ-কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্র-ভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যেই, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে, যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে তত কাল পর্য্যন্ত টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিগ্রোর শিক্ষা

—:•:—

নিগ্রোর অবস্থা আমেরিকায় এব-প্রকার! সে তৎদেশে সামাজিক অস্পৃশ্য। রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই; সমাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে সে পারিয়া; আর্থনীতিকক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনের বেশীর ভাগ রাস্তার দ্বার তাহার জন্য অর্গলবদ্ধ; শিক্ষাক্ষেত্রে, দক্ষিণে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা তাহার জন্য নাই; উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যদিচ তাহার জন্য রং-ব্যবধান নাই, তদাপি অর্থাভাবে কয়জন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়? আর উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াই সে কি করিবে? তাহার দ্বারা নিজের অন্নসমস্যা দূর করিতে সে অক্ষম। এই সব কারণে শিক্ষিত নিগ্রোর জীবন-সংগ্রাম-সমস্যা অতি ভয়াবহ। এই জন্যই অনেক নিগ্রোনেতা জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ কুজ্ঝটিকাময় দেখিয়া বড়ই নিরুৎসাহ হন এবং কেহ কেহ অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পরামর্শ করেন। এ বিষয়ে দুই একবার চেষ্টাও হইয়াছিল। আমেরিকান আন্তর্জাতিক (civil war) যুদ্ধের অবসানে নিগ্রোদের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী ছিল। সেই জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় লাইবেরিয়া (Liberia) নামক উপনিবেশ স্থাপন করা হয়; উদ্যোগীদের আশা ছিল যে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া আমেরিকান ঔপনিবেশিক নিগ্রোরা তথায় নিজেদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে ও ভবিষ্যতে আফ্রিকাস্থিত কৃষ্ণকায় জাতির আশাস্থল হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে আশায় ছাই পড়িল; আমেরিকার ঔপনিবেশিক নিগ্রোর দল তথায় যাইয়া তথাকার বর্ব্বর নিগ্রোদের উন্নত করিবার সোপানস্বরূপ হইতে পারে নাই। প্রথমে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অনেকে নূতন স্থানের দেশী নিগ্রোদের সহিত একত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই, বর্ব্বরদের রীতিনীতি দেখিয়া বলে "উহারা ত bush niggers (জঙ্গলি নিগ্রো) আর আমরা সভ্য নিগ্রো!" এই প্রকারে ঔপনিবেশিকেরা দেশীয়দের রক্তসম্পর্কীয় জাতিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিতে অস্বীকার করে। তৎপরে অতি অল্পসংখ্যক নিগ্রোই আমেরিকা হইতে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন যদিচ গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ হইতে অনেকে এই উদ্দেশ্যে অনেক প্রকারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কারণ, যে, একটি জনসমষ্টি যতই উৎপীড়িত হউক না কেন তাহা স্বদেশ ও স্ববাসভূমি ছাড়িয়া অজ্ঞাত ও অনুন্নত ভূমিতে গিয়া বাস স্থাপন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। আমেরিকান নিগ্রো তৎদেশে ৪০০ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতেছে। আমেরিকান রীতিনীতি ভাষা সভ্যতা মানসিক অবস্থা ও চিন্তা দ্বারা সে অভিভূত হইয়াছে, আমেরিকার সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেও বর্দ্ধিত হইয়াছে যদিচ তাহার ফলভোগে সে বঞ্চিত। এই দেশ বহুপ্রকারে উৎপীড়িত হইলেও মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে সে চলিয়া যাইয়া বিদেশের মায়া-মরীচিকার জন্য ধাবিত হয় না। এইসব কারণে আফ্রিকায় সমগ্র আমেরিকান নিগ্রোজাতির প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। তৎপরে একদল নিগ্রো মেক্সিকোতে গিয়া উপনিবেশ-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল, কারণ তথায় সর্ব্বপ্রকারের বর্ণসঙ্করের বাস ও বেশীর ভাগ মেক্সিকানেরা (যাহারা আদিম অধিবাসীদের বংশসম্ভূত) "রঙীন" লোক, সেইহেতু তথায় নিগ্রোদের রং-বিদ্বেষের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু এই দলের মুখপাত্রেরা নাকি মেক্সিকোতে গিয়া প্রত্যক্ষ করে যে তথায় শ্বেতচর্ম্মীদেরই (স্পেনের ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের) প্রভাব প্রবল; তথায় যাইয়া নিগ্রোর ভাগ্য খুলিবে না। এই কারণে এই প্রস্তাব অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

এই প্রকার অবস্থায় ইহজগতে নিজেকে উন্নত করিবার জন্য নিগ্রো নিজের জন্য কি করিতে পারে? উত্তরে ইহা বলা যায় যে, সে যাহা করিয়াছে তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। নিগ্রো অতি নির্ভরশীল হইতেছে, নিজে নানা প্রকারের শিক্ষালাভ করিতেছে ও স্বজাতি-হিতকর নানা প্রকারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে। ষাট বৎসর পূর্ব্বে গোলামীর অবস্থায় যে শ্রমের পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত, সে আজ নিজের চেষ্টায় স্বীয় সমাজের শতকরা ৪৫ ভাগ নিরক্ষরতা দূর করিয়াছে, কতকগুলি বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ গঠন করিয়া তুলিয়াছে, নিজের ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে, নিজে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এবং আজ সর্ব্ববিষয়ে শ্বেতচর্ম্মীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে। নিগ্রো যতই শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইতেছে, শ্বেতচর্ম্মীদের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং বিরোধও ঘনীভূত হইতেছে। আজ নিগ্রো জগতের কার্য্যের সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত অগ্রণী লোক হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শ্বেতচর্ম্মীদের ঘোর আপত্তি। নিগ্রো স্বীয় গুণানুসারে সমানাধিকার ও ন্যায্য স্থান-প্রাপ্তির দাবী করিতেছে। কিন্তু ইহাতে শ্বেত পুরুষ প্রতিবাদী; রং-বিদ্বেষের বেড়া দিয়া নিগ্রোকে গণ্ডীর [illegible] হয়াছে। উচ্চশিক্ষা-স্কুল, আইন,

আদালত ও অন্যান্য উচ্চ-জীবিকার কর্ম্ম-স্থলে নিগ্রো উপযুক্ত হইলেও স্থান পায় না যদিচ একবার একজন Deputy Attorney-General হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি প্রায় শ্বেতবর্ণের লোক (ইনি octoroon অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ নিগ্রো-শোণিত ইহার ধমনীতে বহমান হইতেছে) এবং হার্ভবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক মুরুব্বির সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্বেতসমাজ ইহা চায়না যে, নিগ্রো জগতের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও শ্বেতপুরুষের সহিত সমকক্ষতা করে। শ্বেতচর্ম্মী পুরুষ নিগ্রো-চাকর বাড়ীতে রাখিতে চায় কিন্তু নিগ্রো-ভদ্রলোককে নিজের বৈঠকখানায় দেখিতে চায় না।

এই প্রকারে জীবনের উপজীবিকার উচ্চস্থলে উভয় জাতিতে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত এবং নিঃসহায় নিগ্রো নিজের উন্নতির কোন রাস্তা নির্ব্বিবাদে পাইতেছে না।

ফলে একদল হতাশ হইয়া হা হুতাশ করিতেছেন। কিন্তু এ প্রকার মানসিক অবস্থায় মনস্তত্ত্বের রীতি অনুসারে যে পরিণাম হয় নিগ্রোদের মধ্যে তাহাই হইতেছে, নিগ্রোদের মধ্যে ধর্ম্মের বাতিক বড়ই বাড়িতেছে। কোন গোলামজাতির লোকদের যখন জগতে উন্নতি করিবার সর্ব্বপ্রকারের পথের দ্বার বন্ধ হয়, তখন তাহার প্রতিরুদ্ধ মনের গতি বাহিরে লীলা করিতে না পাইয়া অন্তঃসলিলারূপে বহিতে থাকে এবং তাহার ফলে, কল্পনারাজ্যে সে নিজের মুক্তি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহার মন বহির্জ্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত বা বিতাড়িত হইয়া 'ধর্ম্মরাজ্যে" লীলা করিবার চেষ্টা করে এবং সেই রাজত্বে একজন "হোমরা চোমরা" হইবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করে। এই ধর্ম্মবাতিকেরই ফলে তৎসমাজের লোকেরা নানা প্রকার hallucination প্রত্যক্ষ করে, ও নানা প্রকার Illusion এর মধ্যে নিজেরা থাকে। আর এবম্প্রকার অবস্থায় সেই সমাজে অবতার ও পয়গম্বরদের প্রাদুর্ভাব বড়ই বেশী হয়। ইহা ইতিহাসের আর্থনৈতিক ব্যাখ্যানুসারেই সংঘটিত হয়, এই লোকগুলি সমাজে "হোমরা চোমরা" হইয়া আধিপত্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। নিগ্রোদেরও অবস্থা সেই প্রকার হইয়াছে। অশিক্ষিত নিগ্রোরা খৃষ্টান ধর্ম্মের বাহ্যিক খোলসটা গ্রহণ করিয়াছে আর বাইবেলের অনৈসর্গিক ও অমানুষিক গল্পগুলিতে মজিয়া নানা প্রকারের hallucination দেখে! তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান খৃষ্টধর্ম্মের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক লইয়াই তাহারা মারামারি করে! বাইবেল-কথিত জিহোবা কর্ত্তৃক ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টির গল্পে সন্দিহান হওয়া একটা ঘোর অধর্ম্ম ও বিভ্রাট বলিয়া গণিত হয়।

বাইবেল-বর্ণিত পয়গম্বরদের গল্পগুলি সত্য কিনা এই সব লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলী

(church) ও সমাজে তুমুল দলাদলি হয় আর ধর্ম্মযাজকেরা এই কলহে ইন্ধন প্রদান করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন! যাঁহারা উপরোক্ত গল্পসমূহে অবিশ্বাসী তাঁহারা Campbellite দলের পুষ্টিসাধন করেন। এই দল নবীন শিক্ষিত নিগ্রোর ধর্ম্মসম্প্রদায়, অবশ্য ইঁহারা নৈষ্ঠিক পাদরী ও লোকদের নিকট হেয় হন। উপস্থিত জনরব যে, যুদ্ধের পর আমেরিকায় একজন "কৃষ্ণকায় পয়গম্বর" আবির্ভাব করিয়াছেন। তিনি নিগ্রোদের খুব মাতাইয়া তুলিতেছেন এবং নানাপ্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। তিনি নাকি আমেরিকার কৃষ্ণকায় ও আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের সহিত একতা স্থাপনে (solidarity of the black race) প্রয়াসী।

ডাক্তার ডুবোয়া বলেন যে আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে church হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা strong organization, যখন নিগ্রোর সাধারণের জন্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সুবিধা নাই,তখন স্বাভাবিক যে, ধর্ম্মক্ষেত্রেই তাহার কর্ম্মকুশলতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু সাধারণ নিগ্রোর মন শিক্ষায় অতি নিম্নস্তরে অবস্থিতি করায় তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ও চর্চ্চাও অতি নিম্নস্তরের। সাধারণ নিগ্রো অতি গোঁড়া হয়; আমি যে কতিপয় নিগ্রো নামধেয় পাদরীদের সহিত মিলিত হইয়াছি, তাঁহাদের fanaticismই প্রত্যক্ষ করিয়াছি আর ইঁহারা স্বজাতিকে ইহা-বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, বাবা আদম একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন আর যীশু খৃষ্ট যে একজন "রঙ্গীন" ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রকার অবস্থায় জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যে ঘটনা হয়, নিগ্রোদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। সাধারণতঃ অনেক শিক্ষিত নিগ্রো, ধর্ম্ম ও বিশ্বপ্রেমিকতার (cosmopolitanism) আবরণে নিজেদের জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিগ্রো গির্জ্জার পাদরি মানব জাতির একত্ব ও তজ্জনিত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব তাঁহার pulpit হইতে ক্রমাগত প্রচার করেন; উদ্দেশ্য—স্বীয় মণ্ডলীকে সান্ত্বনা দেওয়া যে কৃষ্ণকায় জাতি ও শ্বেতকায় জাতির এক উৎপত্তি এবং সেইহেতু প্রথমোক্তদের জগতে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। অনেক শিক্ষিত নিগ্রো শ্বেতচর্ম্মীদের ধর্ম্ম ও বিশ্বজনীন সভা ও সঙ্ঘেতে যোগদান করেন, মানস্তত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে ইহার কারণ ইহাই নিরূপিত করা যাইতে পারে যে, এবম্প্রকারের সমিতির সভ্য হইতে পারিলে শ্বেত-সমাজের ছায়ায় দাঁড়ান যায়, শ্বেতচর্ম্মীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বজাতির মধ্যে দরবৃদ্ধি করা যায় ও নিজের মনও আত্মপ্রসাদ লাভ করে! তৎপর এই মনস্তত্ত্বের বশীভূত হইয়া অগ্রে উত্তরের অনেক বর্দ্ধিষ্ণু নিগ্রো (অবশ্য বর্ণসঙ্করেরা) গরীব শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতেন, কিন্তু আজকাল নিগ্রোর জাতীয় শ্লাঘা বৃদ্ধি-

প্রাপ্ত হওয়াতে এ ভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

এই প্রকারে পূর্ব্বে নিগ্রো শ্বেত-সমাজকে আদর্শ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অথবা সাম্য না পাইয়া নিজের নৈরাশ্য-অনলে পুড়িয়া মরিত। অগ্রে সে যে-illusion এর মধ্যে ছিল এক্ষণে তাহা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। অগ্রেই বলিয়াছি যে, আজকাল তাহার একটা জাতীয় শ্লাঘা বর্দ্ধিত হইতেছে যদিচ তাহা সর্ব্বজনীন বলিয়া বোধ হয় না। এই নব ভাবের ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমেরিকায় Community within a community (সমাজের মধ্যে সমাজ) গড়িতেছে। নিগ্রো নিজের জন্য বিদ্যার ও আর্থনৈতিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন ত করিতেছেই, তাহা ব্যতীত সে নিজের আমোদের স্থলও স্থাপন করিতেছে যথা; থিয়েটার ও অপেরা, যথায় স্বীয়-রচিত নিগ্রোজাতির অবস্থা-সম্পর্কীয় নাটকসমূহ, গীতি ইত্যাদি নিগ্রো-অভিনেতৃবর্গ দ্বারা অভিনীত হয়। অনেকস্থলে তাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশে বিশ্রামের জন্য summer resorts স্থাপন করিতেছেন, তথায় হোটেলাদিও সৃষ্টি হইতেছে ইত্যাদি। তৎপরে নিজেদের নানাপ্রকারের ক্লাব স্থাপিত হইতেছে। ডুবোয়া মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্বেত-সমাজে সাম্য-প্রাপ্তির প্রয়াসী নহেন কিন্তু আমোদ ও আহারের স্থলসমূহে প্রবেশ ও সাম্য-প্রাপ্তির প্রয়াসী, কারণ এই সব অনুষ্ঠান মনুষ্যজীবনে অনিবার্য্য আবশ্যকীয় বস্তু। কিন্তু এই সব নেতার প্রচেষ্টা ও তাহার ফলের অপেক্ষায় সমাজ বসিয়া থাকিতে পারে না, সেই জন্যই নিগ্রোসমাজ-মধ্যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানাদি (institutions) গড়িয়া উঠিতেছে! আর অগ্রেই বলিয়াছি যে ওয়াশিংটন মহোদয়ের এবম্প্রকারই আদর্শ ছিল।

এই প্রকারে শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে নিগ্রো নিজে আত্মনির্ভরশীল হইতেছে কিন্তু এক কোটি নিগ্রোর জীবন-সংগ্রাম-সমস্যা ইহাতে মিটেনা। এই সমস্যাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে গোলামী হইতে মুক্ত হইয়া ভৃত্যরূপে শ্বেতকায় ব্যক্তির বাড়ী থাকিত এবং নিজের গ্রাস ও অঙ্গাচ্ছাদনের যৎকিঞ্চিৎ পাইত, তৎকালে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত এবং সেই সময়ে এবম্প্রকারের জীবন-সমস্যার উদয় হয় নাই। তৎকালে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অপ্রাচুর্য্য-বশতঃ নিগ্রো রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেলের ভৃত্য (waiter) হইতে পারিত, কোন ব্যক্তির বাড়ীতে ভৃত্যরূপে স্থান পাইত, দক্ষিণে কৃষাণ ও নানাপ্রকারের জনমজুররূপে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু বিগত ২০।৩০ বৎসর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের বেগ বিশেষ-রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎদেশীয় শ্রমজীবিরা

সর্ব্বপ্রকারের শ্রমের কর্ম্ম একচেটিয়া করিয়া লইতেছে। এক্ষণে নিগ্রোরা তাহাদের পূর্ব্বের নানাবিধ কর্ম্মস্থল হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। উত্তরে বেশীর ভাগ রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেল প্রভৃতি সাধারণাগারে কর্ম্মের জন্য তাহার স্থান নাই; কারখানা প্রভৃতিতে তাহার একেবারেই প্রবেশ-নিষেধ, যদিচ রেলে কুলি বা ভৃত্যরূপে কতিপয় লোক স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু দক্ষিণে নিগ্রো ভৃত্যরূপে কর্ম্ম পায় কারণ তথায় শ্বেতকায় লোককে কেহ চাকররূপে নিযুক্ত করেনা! অন্যপক্ষে এবম্প্রকারের নিগ্রো কুলি শ্রমজীবিসঙ্ঘে (Trade Union) প্রবেশ করিতে পারেনা, তথায়ও তাহার পক্ষে বর্ণের গণ্ডী টানা হয়।

কিন্তু উত্তরের Public School সমূহের নিম্নশ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে নিগ্রোশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের পড়াইতে পারেন, কারণ উত্তরে public school এ সর্ব্ববর্ণের ছাত্রেরা পড়িতে পারে। আবার অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত নিগ্রো ভদ্র-যুবকদের উচ্চশিক্ষাস্থলে নিযুক্ত হইবার কোন সুবিধা নাই, তজ্জন্য উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোদের সমস্যা অতি জটিল। এ সব বিষয়ে তাহাদের সমস্যা ঠিক ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত যুবকদের ন্যায় অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত লোক কুলিগিরি করিতে পারে না অথচ শিক্ষানুযায়ী পেশার রাস্তার দ্বারও মুক্ত নয়। এই জন্যই ওয়াশিংটন মহোদয় বলিতেন, নিগ্রোর আর উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন নাই, সে industrial education গ্রহণ করুক তাহাতে সে technical লোকরূপে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারিবে। এই দৃষ্টান্তস্বরূপ একবার তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, একদা এক নিগ্রো যুবক Gale বিশ্ববিদ্যালয়ে M,A পড়িতেন, তৎকালে সেই বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মাসিক পত্রিকায় তিনি "The political mistake of Mr. B. T. Washington" বলিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে উপরোক্ত ব্যক্তির মত যে "নিগ্রোর রাজনীতি-চর্চ্চা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; সে technical শিক্ষাদ্বারা নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহনে ব্যাপৃত থাকুক" তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। কিন্তু এই সমালোচকই পরে M. A. ডিপ্লোমা লইয়া নিজের জীবিকার্জ্জনের কোন পথ না পাইয়া কোন মুরুব্বির দ্বারা ওয়াশিংটন মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। শেষোক্ত ব্যক্তি বলেন যে ঐ যুবকের জন্য তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের বা তাহার শিক্ষানুযায়ী কোন কর্ম্মের সন্ধান করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি লোকমুখে শ্রবণ করেন যে, ঐ যুবক পুস্তকবিক্রেতার (salesman) কর্ম্ম করিতেছে! এই দৃষ্টান্তের নীতিস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, যে-শিক্ষায় নিগ্রো তাহার গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ, বর্ত্তমান অবস্থায় সে-বিদ্যায় তাঁহার কি লাভ? সে বরং technical কার্য্য শিক্ষা করিয়া

জীবিকান্বেষণ করুক। পূর্ব্বেই উক্ত করিয়াছি যে, ইহা লইয়া দুইটা দল সৃষ্ট হইয়াছে। ওয়াশিংটনের দল সাম্যান্বেষণ না করাতে শ্বেত-সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত-জগত-হিতৈষী ব্যক্তিরা নিগ্রোর "vocational" শিক্ষার জন্য সাহায্য করিতেছেন। দক্ষিণের শ্বেতসমাজ উত্তরের সমাজের উপর বিশেষ-ভাবে বিরক্ত কারণ উত্তর নিগ্রোকে মুক্ত করিয়াছে, রাজনীতিক সাম্য দিয়াছে, উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় নয় এবং অনেক স্থলে তাহার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণ বলে, ইহার ফলে নিগ্রোরা "স্ফীতমস্তিষ্ক" হইয়াছে। দক্ষিণের এই মতের সহিত সেই সব জগত-হিতৈষীদের মিল আছে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার ফলে বাস্তব জগত হইতে বিচ্ছিন্ন "mere theorists"দের উপর আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা এ প্রকারের শিক্ষা চান যাহা দ্বারা শ্রমজীবিরা কর্ম্মকুশল হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে, যে-বিদ্যাতে জাতির ধনবৃদ্ধির পথ প্রসারিত হয় সেই বিদ্যারই তাঁহারা পক্ষপাতী। সেই জন্যই নিগ্রোকে "স্ফীত-মস্তিষ্ক" না করিয়া কর্ম্মকুশল শ্রমজীবিরূপে বর্দ্ধিত হইতে দেখিতে চান; এই জন্যই নিগ্রোর একপ্রকার হিতৈষীরা তাহাকে "vocational training" দাও বলিয়া রব তুলিয়াছেন। কিন্তু একজন নিগ্রোনেতা Dean Miller বলেন ইহাতে নিগ্রোর সভ্যতার রাস্তায় অগ্রগামী হইবার প্রতিবন্ধকতা হইতেছে; যে স্থলে নিগ্রোর উচ্চশিক্ষার প্রস্তাব করা যায়, তথায়ই ইহার প্রতিযোগিতারূপে vocational trainingএর কথা উল্লেখ করা হয়। উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী দল বলেন যে, অন্ত পন্থাটি নিগ্রোকে দাবিয়া রাখিবার জন্যই প্রস্তাব করা হয়। নিগ্রোর উচ্চ শিক্ষা অর্থে ইহারা বুঝেন যে, সে একজন কর্ম্মপটু চাকর অথবা পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান কারিকর বা সূত্রধর বা রাজমিস্ত্রি হইবে। ইঁহারা নিগ্রোকে ভাবুক, লেখক বা উচ্চস্তরের পেশার স্থলে যে সব দ্বারা সে রাজনীতিক বা নেতারূপে অভিব্যক্ত হয়, সেই সব স্থানে তাহাকে বিরাজ করিতে দেখিতে চান না। ইঁহারা নিগ্রোকে ততটুকু শিক্ষা দিতে প্রস্তুত যাহা দ্বারা সে কিঞ্চিৎ জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারে এবং কর্ম্মকুশলরূপে আর্থনীতিক ক্ষেত্রের অতি নিম্নস্তরে থাকিতে পারে। ইঁহারা নিগ্রোকে সেরূপ প্রকারের উচ্চ শিক্ষিত হইতে দেখিতে চান না যাহা দ্বারা সে শ্বেতকায় ব্যক্তির সহিত রাজনীতিক ভাবরাজ্যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, নৈতিক ও আর্থ-নীতিক জীবনে সাম্যের দাবী করিবে। উচ্চদরের মানসিক শিক্ষার ফলে যে সব স্পৃহার উদয় হয়, তাহা শাসকশ্রেণীর পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর। সেই জন্যই তাঁহারা সে স্পৃহার মূলই উৎপাটন করিতে চান। উপরোক্ত নিগ্রো-নেতা মহাশয় বলেন যে,

নিগ্রো শিক্ষা বিষয়ে এবম্প্রকারের মতবাদে তাহার উচ্চশিক্ষার সুবিধার পথ সব বন্ধ হইয়া যাইতেছে, উত্তরের জগত-প্রেমিকেরা নিগ্রোর উচ্চশিক্ষার জন্য যে সব বিদ্যা-পীঠ ছিল তাহা হইতে নিজেদের সহানুভূতি সরাইয়া লইতেছেন ও অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিতেছেন। এই সব কারণে নিগ্রোনেতারা ভীত হইয়াছেন; মিলার ডুবোয়া প্রভৃতি ওয়াশিংটন মহাশয় প্রবুদ্ধিত industrial trainingরূপ রবকে সুবিধা-বাদীর মতবাদ বলিয়া প্রতিবাদ করিতে-ছেন। ইহারা বলেন, সমাজে যে রকম কারীকরও প্রয়োজন, সেই প্রকার উচ্চ চিন্তা, নীতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ভাবুকের প্রয়োজন, বস্তুত সমাজে দুই প্রকারের লোক —শ্রমিকও ভাবুক—উভয়েরই প্রয়োজন।

কিন্তু প্রতিপক্ষ আর একটি সমস্যা তুলিতেছেন! ইহাঁরা বলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নিগ্রো denationalize হয় অর্থাৎ সে তাহার জাতি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মিলার মহাশয় বলেন যে, সহস্র সহস্র শিক্ষিত নিগ্রো স্ত্রীলোক ও পুরুষের জীবনী ও কর্ম্ম এই অপবাদের প্রতিবাদ করিতেছে। যদি কেহ জাতি ছাড়িয়া পলাই-বার চেষ্টা করে, ভীষণ জাতি ও রং-বিদ্বেষ তাহাকে সে দুরাশার পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করায়! কথাটা সত্য, অনেক শ্বেতপ্রায় নিগ্রো (quadroons octoroons) রঙ্গের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া নিজেকে স্পানিস বা ফ্রেঞ্চ-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্বেত-সমাজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমেরিকায় জাতিভেদের বন্ধন অতি কঠোর, তাহা ছেদ করা অতি শক্ত। অনেক নিগ্রো ধাক্কা খাইয়া স্ব-সমাজে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে নিগ্রোর জাতীয় গৌরব উদ্ভূত হইয়াছে এবং নিগ্রোরূপে স্বজাতির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন।

নিগ্রোর এই শিক্ষা সম্বন্ধের সমস্যার সহিত ভারতীয় যুবকের শিক্ষা-সমস্যার অনেক সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে ভারত-বর্ষীয়দেরও অনেক ভাবিবার বস্তু আছে;— বর্ণ ও জাতিসমস্যা হইতেই এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সত্য-মিথ্যা

(উপন্যাস)

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রম করিয়াছে, রাত্রির অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল উমাশঙ্কর বাবু সদর ঘাট রোডের পথ ধরিয়া মোটর-আরোহণে গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। গেণ্ডেরিয়ায় দোলাইগঞ্জ ষ্টেসন রোডের উপর তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহুদিন হইতে তাঁহার সহকর্মী আইন-ব্যবসায়ী-দিগের একটা ঈর্ষার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই একদিন পূর্ব্বে সহরে এক প্রবল ঝড়ের উপদ্রব হওয়ায় গেণ্ডেরিয়া যাইবার পথের লৌহ-সেতুটি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেইজন্য বাহির হইবার সময়ে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অনেকবার বলিয়া দিয়াছিলেন যদি তাঁহার বাটী ফিরিতে রাত্রি অধিক হয় তাহা হইলে যেন পূর্ব্বাহ্লে চাকরকে পাঠাইয়া সেতুর নিকট আলো রাখিবার বন্দোবস্ত করার জন্য বলিয়া পাঠান হয়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইলেও উমাশঙ্কর বাবু উহার কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। আজ তাঁহার মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন। এক বৈকালের মধ্যে উপরি-উপরি কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার মন এত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, পত্নীর সনির্ব্বন্ধ নির্দ্দেশের কথা তাঁহার আদৌ মনে পড়ে নাই। পথে আসিতে আসিতে যখন সে কথা মনে পড়িল, তখন তিনি এই ভাবিয়া মনকে নিরস্ত করিলেন যে, সেতুর উপর দিয়া অন্ধকারে অনেকেই যখন যাইতেছে তখন মিথ্যা আলো আনাইবার প্রয়োজন কি।

আজ উপর্য্যুপরি এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। একটা বেদনার স্থলে আর একটা পড়িলে যেরূপ সেস্থানে বেদনার অনুভূতি অতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনাবিপর্য্যয়ে উমাশঙ্কর বাবুর হৃদয়ের ক্ষতটা ক্রমেই অসহ হইয়া উঠিতেছিল আজ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি-নির্ব্বাচনে উমাশঙ্কর বাবু আশা করিতে পারেন নাই যে তাঁহার পরাজয় হইবে, গতকল্য রাত্রিতে পর্য্যন্ত তাঁহার দলের লোকদের গোপন-সভায় তাঁহার অবশ্যম্ভাবী

জয় ঘোষিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজ কিনা হঠাৎ তাহাদের মধ্যেই দুইজন বিপক্ষ দলে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট দিয়া মাঝ-দরিয়ায় তাঁহার নির্ব্বাচন-তরী ডুবাইয়া দিল! প্রথমে উমাশঙ্কর বাবু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর মর্ম্মে মর্ম্মে চটিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ক্রোধের অপব্যয় হইতেছে ভাবিয়া এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বগৃহে অধিক অন্ন উদরস্থ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া সমস্ত ক্রোধ আপাততঃ সম্বরণ করিয়া লইলেন। ইহার পরই যখন মিউনিসিপ্যাল গৃহ হইতে বাহির হইবার মুখে উমশঙ্করবাবু শুনিলেন যে, রমানাথ দাস কোম্পানীর পাটের ব্যবসায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কারণ এই ব্যবসায়ের জন্ত তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার জামীন ছিলেন। এবং যদি ব্যবসায়ের পাওনাদারগণ তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকাটা আদায় করিয়া লয়, তাহা হইলে, তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত অর্থের অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে।

ধীরে ধীরে মোটরখানি অন্ধকারে গেঞ্জেরিয়ার লৌহ-সেতুর উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু উমাশঙ্কর বাবুর কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আত্মচিন্তায় এতই নিমগ্ন ছিলেন যে বাহিরের কোনও ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, লোকে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ এইরূপভাবে ফাঁকি দিয়া লইবে বলিয়াই কি অতি কষ্টে তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন? আচ্ছা, তাঁহার পত্নী শুনিতে পাইলে কি বলিবেন? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই ত উমাশঙ্কর বাবু রমানাথ দাস কোম্পানির জামিন হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি রমানাথ দাস কোম্পানীর বাজারে সুনাম বৰ্দ্ধিত করিবার জন্তই জামিন হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই বার বার তিনবার এইরূপ জামিন ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্নীর বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কাহারও জামিন হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর দুর্নিবার ক্রোধাগ্নি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন! তাই এক্ষণে একথা তাঁহার পত্নীর কর্ণগোচর হইলে তাঁহার অবস্থা কি হইবে এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং রমানাথ দাসের উপর তিনি মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন! নিজে মরিবি ত মর, পরকে জড়াইয়া মরিস কেন? রমানাথ কেন তাঁহাকে জামিন দাঁড়াইবার জন্ত চুক্তি পত্র সহি করাইয়া লইল? তাঁহার মনের এক কোণ হইতে কে যেন বলিল, তিনিই বা চুক্তিপত্র সহি করিলেন কেন? এই চিন্তায় তিনি আরও চাহিয়া উঠিলেন এবং মনকে শাসাইয়া বলিলেন, কেন আমার কি দোষ, মানুষের জীবনে কি দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত থাকিতে নাই? সেই বা কেন আমাকে কলিকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে খানা খাওয়াইতে লইয়া গেল, সেখানেই ত অধিক মাত্রায় মদ্যপানে

অভিভূত হইয়া সরলমনে তিনি চুক্তিপত্র সহি করিয়া দিলেন। তবে তাঁহার এমন দোষ কি!"

কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার পত্নীর ক্রোধরক্তিম আনন এবং তৎপার্শ্বে তাঁহার নিজের অপরাধী মুখের চিত্র তাঁহার নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেই তিনি দমিয়া গেলেন। যত অনিষ্টের গোড়া এই রমানাথ। সে কেন তাঁহাকে গ্রাণ্ড হোটেলে লইয়া গিয়া তাঁহার দুর্ব্বলতার আশ্রয় লইল। তবেই ত, রমানাথের প্রথম হইতেই অভিপ্রায় ভাল ছিল না। এই কথা মনে হইতেই রমানাথের অর্থসংক্রান্ত অপকর্ম্ম যেন উমাশঙ্কর বাবুর স্মরণে আসিল। তাহা হইলে ত তাঁহার কিছু দোষ নাই, পূর্ব্ব হইতেই রমানাথ কুমতলবে ফিরিতেছিল। যাহা হউক, এই কথা ভাবিতেও উমাশঙ্কর বাবুর মনে কতকটা স্বস্তির ভাব জাগিল।

রাত্রির অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। কেবল আকাশের গায়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই একটী তারা চিক্ চিক্ করিতেছিল। হঠাৎ অদূরে মেঘ-গর্জ্জন হইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। উমাশঙ্কর বাবুর চিন্তাজাল ছিন্ন হইল এবং তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, লৌহ-সেতুর নিম্নে নদীর জল টল্ টল্ করিয়া ঢেউ খেলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদিক অন্ধকার, উপরে বা নীচে জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেবল দূরে একটি নৌকা হইতে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা যাইতেছিল এবং সেই নৌকারোহী মাঝির ভাটিয়াল সুরে গান ঝড়ের তালে তালে ভাসিয়া আসিতেছিল।

উমাশঙ্কর বাবু ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এই পরাজয়ে ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন বাবুর নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দ লাভ হইবে। উমাশঙ্কর বাবুর প্রকৃতিগত একটা দুর্ব্বলতা ছিল যে তিনি সকল সময়েই ভাবিতেন যে, লোকে তাঁহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্যই ব্যস্ত। কখনও কোন একটা বড় মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে তিনি প্রথমেই এই ভাবিয়া তৃপ্তি-লাভ করিতেন যে তাঁহার সহকর্ম্মী আইন-ব্যবসায়িগণ তাঁহার জয়লাভে কিরূপ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে এবং কোনও মোক-দ্দমায় যদি তাঁহার পরাজয় হইত তাহা হইলে এই পরাজয়ের ফলে তাঁহার মক্কেলের কত ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিয়া তিনি এতটা দুঃখিত হইতেন না যতটা তিনি মনে ব্যথা পাইতেন এই ভাবিয়া যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ-গণ তাঁহার উপর বেশ একহাত লইবার সুযোগ পাইবে।

ক্রমে উমাশঙ্কর বাবু লৌহ-সেতু পার হইয়া বাহির দিকের বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন এবং পথে কোনও বিপদ-আপদ না হওয়ায় ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। ভগবানের কথা মনে উঠিতেই তাঁহার হাসি পাইল, তাঁহার পিতার সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল তাহাই তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার পিতা রাম-

শঙ্কর বাবু সেকালে ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃপণ বলিয়া একটা অখ্যাতি ছিল। একবার মুন্সীগঞ্জে একজন ধনী মক্কেলের পক্ষে মোকদ্দমা জয়লাভ করিয়া প্রচুর পারিতোষিক সামগ্রী লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথে প্রবল ঝড় উঠিয়া নৌকাডুবি হইবার উপক্রম হইল। মাঝি মাল্লারা কিছু কিছু দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিয়া নৌকার ভার লাঘব করিবার জন্য রামশঙ্কর বাবুকে করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে পূজা মানত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঝড় থামিয়া গেল এবং নদী শান্তভাব ধারণ করিলে তিনি নিরাপদে গৃহ-প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে ফিরিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার নিজের অদৃষ্টগুণেই তিনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারিয়াছেন, সুতরাং দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা না দিয়া শুষ্ক কদলী প্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত এবং লোকের কাছে এই কথা বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

আসন্ন বিপদের আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া উমাশঙ্কর বাবু যখন আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, বাটী হইতে বাহির হইবার সময়ে তাঁহার পত্নী কি তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আদালত হইতে বাহির হইবার সময়ে উৎকণ্ঠার আতিশয্যে তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন এ কথা মনে পড়ায় তাঁহার সমস্ত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণস্বরূপ একটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়া তিনি একটু তৃপ্তিলাভ করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার ভিতরের শিক্ষাভিমানী অহমিকা আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার এই দুর্ব্বলতাকে বেশ এক হাত শাসাইয়া লইল এবং ভর্ৎসনা-বাক্যে বলিয়া দিল যে, তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তিও যদি এই সমস্ত কুসংস্কারে আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

উমাশঙ্কর বাবুর মধ্যে দুইটী ভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ হইয়াছিল। কৈশোরে ও যৌবনে ছাত্রজীবনে রাজনীতি ও সমাজনীতির গ্রন্থপাঠে এবং তৎকালীন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত থাকায় উমাশঙ্কর বাবুর প্রকৃতি অনেকটা উদার ও বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে প্রবেশ-লাভ করিয়া ও পিতার অবিচ্ছেদ্য সাহচর্য্যের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহার অন্য এক প্রকৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তিনি ক্রমে নিরীশ্বরবাদিতা, শিক্ষাভিমান, কার্পণ্য ও অবিশ্বাসের জালে জড়াইয়া পড়িলেন। যতই আইন-ব্যবসায়ে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ততই যেন পিতার প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া বসিতে

লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহার মনে হইত যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার চক্ষু তাঁহার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং কোনও ব্যাপারে দয়াপরবশ হইয়া মক্কেলের দু পয়সা ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলে তিনি, তাঁহার পিতার রোষকষায়িত চক্ষু তাঁহাকে ভৎ'সনা করিতেছে, দেখিতে পাইতেন। সুতরাং ভাল হউক মন্দ হউক উমাশঙ্কর বাবু পিতার প্রকৃতির এমন উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিলেন যে, অনেক সময়েই মনে হইত, তাঁহার পিতাই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রকে দিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। পিতার বিবেক-বুদ্ধি পুত্রে পুনরাবির্ভাবের এমন নিদর্শন দেখিয়া প্রতিবাসীরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও সদনুষ্ঠানে অর্থের সাহায্য ব্যাপারে তাঁহারা উমাশঙ্কর বাবুকে খরচের খাতায় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু উমাশঙ্কর সেনের ছাত্রজীবনের প্রকৃতি যে অধীত পুস্তকাবলীর সহিত একেবারে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, সে কথাও একেবারে সত্য নহে ; সেই পরদুঃখ-কাতর ও দেশ-সেবাকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি মাঝে মাঝে আইনব্যবসায়ী উমাশঙ্করকে পরাজিত করিয়া জাগিয়া উঠিত এবং তখন লোকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দেখিত যে উমাশঙ্কর বাবু দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ সাহায্য দিয়াছেন কিংবা বারোয়ারী দুর্গাপূজার খরচের অনেকটা নিজেই দিয়া ফেলিয়াছেন। তাই আজ হঠাৎ উমাশঙ্কর বাবুর মনে হইল, হয়ত কালীবাড়ীতে পূজাটা দিয়া আসিলে ভাল ফল হইতে পারিত, অন্ততঃ কতকটা তৃপ্তি অনুভব করা যাইত সন্দেহ নাই, একেবারে অবিশ্বাস জিনিষটা বুঝি ভাল নয় এবং ইহা নিশ্চিত যে বিশ্বাসের ফলে অনেককে বিপদ আপদের সময়ে শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং অন্যকার ত্রুটীর জন্য তাঁহার মনে যে একটা অনুশোচনার কাঁটা বিঁধিতেছিল না, এ কথা স্বয়ং উমাশঙ্কর বাবুও জোর করিয়া বলিতে পারিতেন না।

ক্রমে উমাশঙ্কর বাবুর মোটরখানি দোলাইগঞ্জ ষ্টেসন রোডের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। আকাশের মেঘ তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে এবং পথের দুই-ধারের বড় বড় ঝাউগাছের ফাঁক দিয়া তখন নির্ম্মেঘ আকাশের তারাগুলি চিক্ চিক্ করিয়া উঁকি মারিতেছিল।

দোলাইগঞ্জ ষ্টেসন রোডে ঢুকিবার মুখেই যতীন্দ্র বাবুর বিশাল প্রাসাদ। এই প্রাসাদের পানে দৃষ্টি পড়িলেই উমাশঙ্কর বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিত, কারণ প্রতিবেশীরা বলিত যে উমাশঙ্কর বাবুর অট্টালিকা হইতে এই বাড়ীখানি দেখিতে সুন্দর ও বৃহৎ এবং উমাশঙ্কর বাবু এই কথা শুনিয়া তেলে বেগুণে চটীয়া যাইতেন বলিয়া তাঁহার বিপক্ষদল আরও বেশী করিয়া তাঁহাকে শোনাইয়া শোনাইয়া এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন। উমাশঙ্কর বাবুর

বাটীর ত্রিতলের কক্ষের বাতায়ন খুলিলেই যতীন্দ্রবাবুর প্রাসাদচূড়া দেখা যাইত, সুতরাং উমাশঙ্কর বাবুর পক্ষে সেই বাতায়ন উন্মুক্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং ক্রমে এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল যে উমাশঙ্কর বাবু ত্রিতলে উঠা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! এই ব্যাপারে তাঁহার মন এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে যতীন্দ্র বাবুর কথা উঠিলেই তিনি মানস-নেত্রে তাঁহার বিশাল অট্টালিকার চূড়া দেখিতে পাইতেন এবং তাঁহার মনে হইত লোকে তাঁহাকে যতীন্দ্র বাবুর কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। এইজন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে অকারণে লজ্জা পাইতে হইত।

আজ এই প্রাসাদখানি দৃষ্টিগোচর হইতেই উমাশঙ্কর বাবুর মনে হইল রমানাথ দাস কোম্পানির ব্যাপারে তাহার আর্থিক ক্ষতির কথা শুনিলে যতীন্দ্রবাবু কত আমোদ অনুভব করিবেন। এতক্ষণ তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের যে কথা তাঁহার মন হইতে অনেকটা সরিয়া গিয়াছিল, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তারা আসিয়া আবার দেখা দিল। তাঁহার আবার রমানাথের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিল। তাঁহার মনে হইল যেন রমানাথকে তিনি অনেকবার চূড়ান্ত মাতাল অবস্থায় সহরে দেখিয়াছেন এবং এইরূপ লোকের কিরূপে তিনি জামিন হইলেন তাহা ভাবিয়া তিনি নিজেই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

উমাশঙ্কর বাবুর মোটর আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, সমগ্র অট্টালিকা প্রায় অন্ধকার, কেবল দুই তিনটী কক্ষ হইতে বিজলী বাতির আলোক বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে মোটরের শব্দ হইতেই একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর বাহির হইয়া আসিয়া উমাশঙ্কর বাবুর কোলে লাফাইয়া উঠিল এবং বাতি লইয়া দ্বারবান আসিয়া মোটরের দ্বার খুলিয়া দিল। উমাশঙ্কর বাবু সোফারকে মোটর সংক্রান্ত কয়েকটা আদেশ দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন।

দ্বারের একপার্শ্বে মোটরের ঘর এবং অপর পার্শ্বে পুরাতন বৃদ্ধ অথর্ব্ব ও অক্ষম চাকর সহিসের আবাস-কক্ষ। উমাশঙ্কর বাবুর চাকর দাসী বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বৃত্তি দিয়া নিজের বাটীতেই এই অংশে রাখিয়া দিতেন। কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তিনি ইহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

দ্বারবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া উমাশঙ্কর বাবু বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদায়িকতা

—— —:*:——

সম্প্রতি কলকাতায় বসে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আশা করি বাক্যবীরদের পেশা চিরতরে ফুরোল। ভারতবর্ষের সম্মুখে চিরন্তন গুটিকতক সমস্যা উপস্থিত রয়েছে এবং তার নানাভাবে সমাধানের চেষ্টাও যুগে যুগে চলেছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যাটী হচ্ছে ভারতের আকাশে বাতাসে পুষ্ট বিভিন্নমতাবলম্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ প্রীতির বন্ধন-স্থাপন। পুরাণো ইতিহাস আঁচড়ে বেশী কোন লাভ আছে বলে আমার মনে হয় না—কারণ পুরাতন ও নবীনে সত্যিকার যোগ যা আছে বলে পেশাদার ঐতিহাসিক বা তথ্য-উদ্‌ঘাটক বলে বেড়ান, সে বিষয়ে আমার নিজের অনেক সন্দেহ আছে। মহম্মদ বিন্ কাসিম বা মহম্মদ ঘোরীর আমলের ভারত এবং এমন কি গৌড়ের হোসেন সা বাদসার আমলের বাংলা থেকে বর্ত্তমান এই ১৯২৬এর ভারত ও বাংলা এত তফাৎ যে অতীতের ক্ষীণ বর্ত্তিকার সাহায্যে বর্ত্তমানের ঝড়ো হাওয়ায় পথ-প্রদর্শনের চেষ্টা নিরর্থক বলেই আমার মনে হয়।

মোটের উপর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এই তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায় এ দেশে নীড় বেঁধেছে—তারা নানা দিগ্দেশ হতে এসেছে এবং তাদের অতীত নানারূপ ধোঁয়ায় আবৃত। এটা ঠিক যে, আজকালের বাঙ্গালী হিন্দু এবং পঞ্চনদের যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন বেদীতে উপবিষ্ট বেদমন্ত্রের উচ্চারক আর্য্য এ দুটী সমধর্ম্মী সমদোষগুণান্বিত জীব নয়। এটা ঠিক যে বাংলার মুসলমানের সঙ্গে বোগদাদ, কাবুল, মিশর বা আঙ্গোরার নব্য মুসলমানের মনের, আত্মার, ভাবের মিল অতিশয় ক্ষীণ। এটা স্থির যে ভারতে যারা নিকেতন বেঁধে বসেছে, সেই সব খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বা রমণীর সঙ্গে পাকা ইয়ুরোপীয় বা আমেরিকান সমাজের নর-নারীর অন্তরের যোগসূত্র সুদৃঢ় নয়। অথচ একদল হিন্দু বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সুসঙ্গতির পন্থা-কাঠা মনে করে থাকেন; একদল মুসলমান সর্ব্বদাই নিজেদের আরব, তাতার, তুর্কী মনে করে বিচিত্র ভ্রান্তি-বিলাসে চিত্ত-বিনোদন করে দেশের ও সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন; এবং

দেশীয় কৃষ্ণচর্ম্ম ও বিদেশীয় শ্বেতচর্ম্মে খৃষ্টান একদল নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাকে কলম, বাক্য ও মেসিনগানের জোরে চালাতে প্রয়াস করে থাকেন।

আমার প্রতীতি দৃঢ় যে এই ধর্ম্ম-সমাজের এ সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের নামে যে ভেদনীতি আজ ভারতময় ছড়িয়ে পড়ছে তা সবলে সংহার বা প্রত্যাহার না করতে পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত হবে। হিন্দু যে হিন্দু তা ভোলা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। বেদ, বেদান্ত উপনিষদ্, গীতা, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির উপরে যে কালচার সভ্যতার যে বিশিষ্ট আকার গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস হবে না; শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী—এঁদের মুছে ফেলা মানবেতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অসম্ভব। হজরত মহম্মদের আরবের মরুপ্রান্তরে উৎক্ষিপ্ত যে বীরধর্ম্ম যাতে সকলকে ঈশ্বরের পূজা এবং সামাজিক উৎসবে সমান অধিকার দিয়েছে—এবং যা এত বড় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং এত বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তুলেছিল এবং আজও যার পতাকাবাহকেরা মনুষ্যের অধিকার দুঃখের রক্তমাখা অভিসারকে স্বীকার করে লুফে নিচ্ছে—সেই ইস্‌লামের বিশিষ্ট আকার মানবের সভ্যতার ক্রম-বিকাশের এক বৃহৎ অধ্যায়—তা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। আর যীশুর প্রেমধর্ম্ম। হিন্দুমাত্রেই ইহার সজিত এবং পরার্থপর আধ্যাত্মিকতাকে অন্তর দিয়ে 'ছানিয়া' দিতে জানে—কারণ হিন্দুর সেই সমগ্র, সেই ব্যাপক দৃষ্টি আছে যাতে আবর্জ্জনার কলুষ-স্তূপ থেকে সে মণি যাচাই করে নিতে পারে—সেই খৃষ্ট ধর্ম্মের উপাসক যারা তারা নূতন পৃথিবী নিজেদের শৌর্য্য দ্বারায় অর্জ্জন করেছে এবং অর্দ্ধপৃথিবী আজ সেই স্পর্দ্ধিত বিজয়ী জাতিসমূহের পদতলে এই সম্প্রদায় ও সভ্যতাকে অস্বীকার করে লাভ নাই।

ভারতে এই তিনটী বিশিষ্ট সভ্যতা বাসা নিয়েছে। এদের মন্থনে বিষ ও অমৃত উভয়ই উঠবে। হিন্দুতার বিষ হচ্ছে সত্ব-বুদ্ধির ওজরে ঘোর তামসিকতার প্রাদুর্ভাব, ইসলামের বিষোদগার হয়েছে রজোবুদ্ধির আবরণে পশুবৃত্তির স্বৈরাচারের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খলতা; খৃষ্টধর্ম্মে বিষ-বটী হচ্ছে তমোবুদ্ধিকে সত্ববুদ্ধি বলে ব্যাখ্যা করা—জীবনের উপকরণসমূহকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে জীবনকে প্রাণের শুদ্ধ লীলার থেকে দূরে সরিয়ে শুষ্ক করে দেওয়া। এই বিষের ঔষধ আরো বিষ-বড়ীর ব্যবস্থা নয়, অমৃতের ধারায় এদের বিষকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে।

আজ ভারতীয় "নেশন" বলে একটা জিনিস যার উপর আমরা কংগ্রেসওয়ালারা এত জোর দিয়ে থাকি এবং যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এত তারস্বরে চীৎকার করি এবং এমন কি দুঃখবরণেও আনন্দ পাই—সে নেশন গড়ে নাই—কেবল

তার ভাবটা উঠেছে মাত্র। এদেশের আবহাওয়ার ইউরোপীয় সভ্যতার পরাকাষ্ঠা যে নেশন্‌-আইডিয়া (nation-idea) ব্যূহবদ্ধ, হাতিয়ারযুক্ত, পরনিপেষী, নির্দয়, ক্রূর যে জাতি—তা হুবহু গড়বে বলে আমার মনে হয় না। এখানে একদল আর আর ছোট দলকে দলিত, মর্দ্দিত করে পশুবলে একটা বিশেষ মত, (ধর্ম্ম, সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে) চালাতে পারবেন এমন দুরাশা আমি পোষণ করি না।

যে তিন বৃহৎ সম্প্রদায় এদেশে আছে, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া করে তিন সম্প্রদায়কে বৈশিষ্ট্যে ধর্ম্ম ও সমাজ হিসাবে বজায় রেখে একটা রাষ্ট্র - political machine—মোটামুটি শান্তি শৃঙ্খলার জন্ম গঠন করা যে-কোন-দিন সম্ভব এবং এই আশায়ই বাঁচিয়া আছি।

(ক) এই করতে হলে—প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজ সমাজের অপনীত দূর করে সবল হতে হবে!

(খ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজকে পরস্পর বোঝার জন্ম অবহিত হয়ে শ্রদ্ধার সহিত একে অন্যের শাস্ত্র ও সমাজবিধি অধ্যয়ন করে হৃদয়ের নিকটে আনতে হবে।

(গ) স্ত্রীজাতির ধর্ষিত লুপ্ত শক্তিকে সর্ব্বথা স্বাধীন ভাবে সংহত হয়ে উঠ্‌তে দিতে হবে।

(ঘ) দৈহিক শক্তি বিশেষভাবে অর্জ্জন করতে হবে এবং আততায়ী দস্যু বা পশুভাবাপন্ন নরনারীকে দমন করতেই হবে; পরার্থপর কার্য্যে রক্তমোক্ষণ হিংসা নহে—এ আমাদের শাস্ত্রের শেষ শিক্ষা।

(ঙ) ছুঁৎমার্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করতে হবে এবং ভগবানের মূর্ত্ত বিগ্রহ যে মানবদেহ তাহা সর্ব্বথা শুচি এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

(চ) ধর্ম্মব্যবসায়ী ভণ্ডদের এবং রাজনীতি-ব্যবসায়ী বাক্যবীরদের নিরস্ত করতে হবে।

(ছ) দেশের দারিদ্র্য দূর করবার নিমিত্ত—বহু নরনারীকে নিজে স্বপ্নে সুখে ও চিত্তে সন্তোষলাভ করে দরিদ্রের সেবায় অবহিত হতে হবে। এই স্থানেই মহাত্মা গান্ধীর চরকার এবং খদ্দরের বৈশিষ্ট্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সেবা-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। আজকের এই সমাজদ্রোহীর রক্তের খেলার মধ্যে এই দূর আলোকের ছটা আমার অন্তর দেখতছে। সত্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জয় সুনিশ্চিত।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র-সাহিত্য

—:•:—

সাহিত্য কথাটার প্রকাণ্ড অর্থ লইয়া পণ্ডিতদের যুক্তি-তর্ক বোধ হয় এখনো থামে নাই। তবে মোটামুট আমরা তার যে অর্থ বুঝি, তা এক কথায় ব্যক্ত করা যায়।

"Over the Hill"-চিত্রে টো মা'র ভূমিকায় মেরি কার

একজনের মনের ভাব অপরের মনকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে লিখিত ভাষায় যে-মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গীকে আমরা মোটামুট সাহিত্য বলিতে পারি। তবে এই ভাব ব্যক্তিগত হইতে পারে এবং ব্যক্তির সমষ্টি বা জাতি-গতও হইতে পারে। সাহিত্যের ভাগ-বিভাগ আছে; যেমন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, ঐতিহাসিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, কাব্য-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য, ধর্ম্ম সাহিত্য প্রভৃতি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির নর-নারীর বাস। তাদের ভাষা বিভিন্ন; তাদের মনের ভাবও কাজেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হয়। এক জাতির ভাব যদি অপর জাতি বুঝিতে চায়, তাহা হইলে তাকে সে-জাতির ভাষা শিখিতে হইবে; নচেৎ বুঝা চলে না।

কোনো দেশের কোনো সাহিত্য এক-দিনেই গড়িয়া ওঠে নাই। সকল সাহিত্যেরই গড়ন চারিদিক হইতে ক্রমে ক্রমে সুরু হইয়াছিল। জগতের আদি দিনে নর-নারী শুধু দেহ-রক্ষার উপযোগী আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত ছিল। ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা, খাদ্যা-খাদ্যের নির্দ্দেশ—এইগুলা লইয়াই ছিল তার যা-কিছু কাজ। ক্রমে সংসারের সৃষ্টি হইল। সংসারের পর সমাজের সৃষ্টি হইল এবং এই সমাজ আপনাকে প্রসারিত করিয়া রাজ্য গড়িল এবং রাজ্য পরিচালনার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া একদিন যত কিছু উপদ্রব-অশান্তির উচ্ছেদ করিয়া মানুষ বিরাট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য গড়িবার প্রকাণ্ড উদ্যোগে মাতিয়া উঠিল। এমনি করিয়া নানা রাজ্য-সাম্রাজ্য গড়া হইল। গড়িতে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিল, কত সন্ধি-সর্ত্ত হইল। ক্রমে বাহিরটার

সঙ্গে মানুষ একটা সামঞ্জস্য বানাইয়া ফেলিল।

এই কাজকর্ম্মের ভিড়ের মধ্যে মন যখন শ্রান্ত হইত, তখন সে শ্রান্তি ঘুচাইতে নানা দিক হইতে আরামের আয়োজনেও মানুষ ঝোঁক দিল। অমনি মনের খোঁজ পড়িল। মানুষ দেখিল, তার সবল পেশী এবং গায়ের শক্তির অন্তরালের মন বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তার শক্তি সামান্য নয়। শরীর যা পারে না, এমন অসাধ্য কাজ এই মনের কাছে অত্যন্ত সহজ-সিদ্ধ। ছেলের অসুখ হইয়াছে, শরীরের সেবা দিয়া,

White Rose"-চিত্রনাট্যে নায়ক নায়িকা।

ঔষধ দিয়াও কোনো উপায় হইতেছে না, হাত-পা কাঁপিতেছে, সেবার বল নাই, মন অমনি আশা গড়িয়া শরীরে শক্তি সঞ্চার করিল। কাজেই মানুষ দেখিল, শরীর যেখানে শক্তি দিতে পারে না, মন সেখানে শক্তি দেয়। মনের শক্তি অনেক বেশী।

ক্রমে মনের নানা চিন্তা নানা ভাব মানুষ ভাষার মুখে ফুটাইতে সুরু করিল। বাহিরের ঐ মুক্ত প্রকৃতির নানা শক্তির সম্পর্কে আসিয়া সে মনকে চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া দিল; সেদিক হইতে সংগৃহীত চিন্তার ফুলে-ফলে ভাষার ডালি সাজাইয়া সমাজের সামনে ধরিয়া দিল। পরস্পরের চিন্তার এমনি আদান-প্রদান হইতে বিজ্ঞান আসিল, ইতিহাস আসিল, ধর্ম্ম-কথা আসিল, পুরাণ আসিল, গল্প কাহিনী আসিল, কাব্য আসিল।

বড় বড় চিন্তাশীল, বড় বড় কবি, নাট্যকারও ক্রমে দেখা দিলেন। এমনিভাবে জগতের সর্ব্বত্র নানা জাতির নানা চিন্তা নানা ভাষার আকারে ফুটিয়া নানা সাহিত্যের সৃষ্টি করিল —সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, পারস্থ-সাহিত্যের খুব সংক্ষিপ্ত জন্ম ইতিহাস এই।

মনের ভাব-চিন্তাই এই সাহিত্যের প্রাণ। যে-সাহিত্য মনের বিরাট প্রসার যতখানি দেখাইয়াছে, সে সাহিত্যের দামও তত বেশী। তোমার মনের ভাব যদি আমার মনে সাড়া তুলিতে পারে, তবেই তোমার ঐ ভাবটুকু সার্থক। সেইরূপ যার মনের ভাব যত সুদূর-প্রসারী, তার ভাবের দামও তেমনি সব চেয়ে বেশী। এই জন্যই সেক্স্

"Thief of Baghdad"-চিত্র-নাট্য একটি দৃশ্য।

পীয়র, কালিদাস, হোমার, গ্যটে, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে খুব উঁচু দরের দরবারী ওমরাও। বিশ্বের জনসাধারণ তাঁদের না মানিয়া পারিবে না—তাঁদের পায়ে শ্রদ্ধা-ভক্তির অঞ্জলি দিতেই হইবে। আগমনীর কবি উমার গানে বিশ্বের বিরহী পিতার প্রাণে করুণ সাড়া তুলিয়াছেন, তাই তাঁর ভাবের দাম আছে। কিন্তু আমরা এই কাব্য-সাহিত্য, নাট্যসাহিত্য বা ঐতিহাসিক সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে আসি নাই। আমরা আজ ঐ ছবির লেখার মধ্য দিয়া যে নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে—যে বিরাট বিপুল শক্তিমান চিত্র সাহিত্য, তারি কথা বলিব।

"Southern Love" চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য।

ভাষা-সাহিত্যের একটা অসুবিধা আছে এই যে, সে যে-মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া ওঠে, তা বিশ্বের শিক্ষিত প্রাণীগুলিকেই শুধু স্পর্শ করিতে পারে—নিরক্ষরদের সঙ্গে তার

কোনো সম্পর্কই নাই। এ দোষ অবশ্য ভাষা-সাহিত্যের নয়, দোষ নিরক্ষরদের। বেচারারা কতখানি সম্পদের পরিচয় না পাইয়াই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন কাটাইয়া

"Woman of Paris"-
চিত্রনাট্যের নায়িকা।

দিতেছে! সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় করাইতে হইলে অন্য পথ ধরিতে হইবে। এই সমস্ত নিরক্ষরকে চট্ করিয়া ভাষার সাহায্যে সাহিত্য-পরিচয় দেওয়ার আশা দুরাশামাত্র। কয়টা ভাষা শিখাইবে? কোন্‌টা ছাড়িয়া কোনটাই বা শিখাইবে? সমস্ত জাতির ভাষাও একটা লোকের পক্ষে জীবনে শিখিয়া ওঠা দুঃসাধ্য। এ অবস্থায় অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করে; কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের কথাও আজ বলিতে আসি নাই।

অনুবাদ ছাড়া আরো একটি উপায়ে এক জাতির সাহিত্যের পরিচয় সে-ভাষায়-অনভিজ্ঞ অপর জাতিকে দেওয়া চলে। সে উপায় সম্ভব হয় শুধু ছবির সাহায্যে। ছবির লেখায় কোনো জাতির সুখ-দুঃখ হর্ষ-বেদনার সব পরিচয়ই অপর জাতিকে দেওয়া সহজ। এবং বিভিন্ন জাতির বিচিত্র আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেদ করিয়াও তাদের যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে,—প্রেম, স্নেহ, মমত্ব, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এগুলা খুব সহজেই এই ছবির মারফৎ সকলকে বুঝানো চলে। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন।

আনন্দ ও প্রীতি—এ দুইটা ছাড়া সাহিত্যে শিক্ষারও একটা দিক আছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে।

ইবসেনের Doll's House নাটকের কথা ধরি। আর্ট হিসাবে নাটকখানি নিখুঁৎ, এ কথা সকলেই বলেন। তবে কেহ কেহ বলেন, শুধু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই ছিল ইবসেনের উদ্দেশ্য। নাটক লিখিতে লিখিতে তিনি গুরুমহাশয়-গিরির কথা মনেও আনেন

নাই! তার উত্তরে দামু ঘোষ যদি বলে, কেন মশায়, এ নাটকে শিক্ষাও তো বহুৎ দেখিতেছি! ধরুন, যে-সব স্বামী স্ত্রীকে প্রচুর ভালোবাসিয়াও স্বামিত্বের গর্ব্বে অন্ধ—নিজের সুখ দুঃখকে স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই চিরকাল ধরিয়া আসিয়াছেন, এ নাটক পড়িয়া তাঁদের একটা চেতনা এই হইতে পারে যে সত্যই তো, স্বামিত্বের অহঙ্কারটাকে না ভাঙ্গিলে, স্ত্রীর সত্বাও ঠিক নিজের মত না মানিয়া লইলে, স্বামী স্ত্রীর মনের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারে না—তা হইলে দোষ কি? Doll's House এদিকটায়

"Virgin Queen"-চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

যে বেশ দৃষ্টি পাড়াইয়া দেয়। নাটক পড়ার আনন্দের সঙ্গে এ কি কম শিক্ষা! দামু ঘোষের এ কথার প্রতিবাদ করিতে বেশ বেগ পাইতে হয় না কি?

তারপর রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়। এ উপন্যাসখানিকে একশ্রেণীর সমালোচক আতে ঠেলা করিতে উদ্যত! তাঁদের দিক দিয়াই দামু ঘোষ বুঝাইতে পারে, এ উপন্যাসের মধ্যে যে শিক্ষা প্রচ্ছন্ন আছে, তা সনাতন। শিখিয়া যাও, বাপু, অনেক কাজে লাগিবে। ভূপতি তার কাগজের নেশায় মশ্‌গুল হইয়া তরুণী স্ত্রীর মনের পানে ফিরিয়া চাহে নাই—তার

সেই চঞ্চল যৌবনের প্রদীপ্ত মুহূর্ত্ত-গুলা সে অমলের সঙ্গে কৌতুকে গল্পে দিব্য কাটাইয়া দিতেছিল! স্বামীর ঔদাসীন্যে বুক তার কোথা দিয়া খালি হইয়া যাইতেছে, স্বামীর তার খোঁজ ছিল না; স্ত্রীও তা জানিত না। তরুণ প্রাণ যখন

"Two little Vagabonds"-চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য
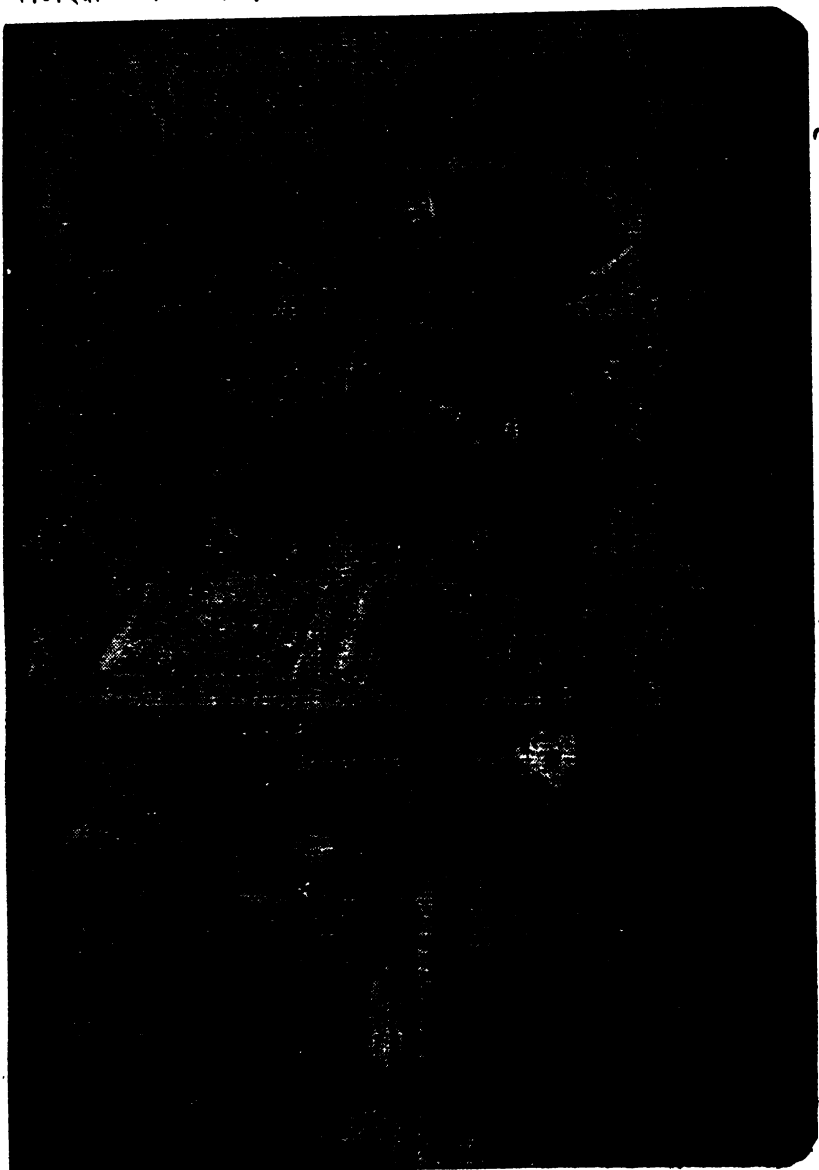
একটু দরদী চিত্তের সাহচর্য্য চায়, তখন সে এই সাহচর্য্য পাইয়াছিল অমলের কাছে। তার মধ্যে এতটুকু পঙ্কিলতা নাই, এতটুকু কলুষতা নাই, গোপনতারও বিন্দু নাই! অথচ মনের দিক দিয়া কত বড় সত্য—এই একটি উন্মুখ চিত্তের আর-

একটি চিত্তের সাহচর্য্য কামনা করা—এ সত্য নেহাৎ অন্ধ বিমূঢ় জন ছাড়া অপরে অস্বীকার করিবে না। ক্রমে হইল কি? ছোটখাট দ্বন্দ্ব প্রভৃতি; এবং অমল যখন বিলাত যাইবে, তখন তার অদর্শন চারুর অসহ্য বোধ হইল! এর মধ্যে দোষের কি আছে, তা তো ভাবিয়া পাই না। সে তো অমলের কাছে তার নারীত্বের কোনো দাবী মিটাইতে চায় নাই বা সে কামনাও তার ঐ ব্যাকুল বেদনার সামান্য একটি ইঙ্গিতেও প্রকাশ পায় নাই! তবে ভূপতি যখন শেষে তার সঙ্গে মিলিতে আসিল, তখন চারুর দিক হইতে কোনো সাড়া মিলিল না। সঞ্চিত রুদ্ধ অভিমান, বেদনা, কতকগুলা জিনিষ তখন ভিড় করিয়া তার মনের দ্বারে আসিয়া চাপিয়া

Scene From "Quo Vadis"
"Quo Vadis"-চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

বসিয়াছে! একখানা গহনা চাহিয়া তাহা না পাইলে বহু সাধ্বী অনুগতা স্ত্রীও বিরাগ-ভরে স্বামীর মুখের পানে ফিরিয়া চান না, বাপের বাড়ী নাকি চলিয়া যান্—এমনি ছোট ঘটনা সংসারে বহু ঘটিতেছে! স্বামীর দিক হইতে একটু অবজ্ঞা বা উপেক্ষা পাইলে স্ত্রী শুধু অভিমানে স্বামীর সঙ্গে দুই-চারি দিন কথা না কহিয়াই যে নিঃশব্দে সংসারের কাজ সারিয়া সময় কাটাইয়া দেন! বেচারী চারুর বিমুখতা যদি দোষের হয় তো এও দোষের। যাক, এ লইয়া ওকালতি করিতেও আসি নাই; অবান্তর-ভাবে এটুকু বলিলাম মাত্র। তবে 'নষ্টনীড়ে' এ শিক্ষাও কি পাই না যে, ওগো স্বামী মহাশয়েরা, তরুণী স্ত্রীকে একেবারে ভুলিয়া নিজের কাজের নেশায় বিভোর থাকিয়ো

না! উপেক্ষা আর ঔদাসীন্যের ঘা লাগিয়া লাগিয়া স্ত্রীর মনে বিমুখতা ও বিরূপতা জাগিতে পারে! এদিকে অনেক কর্ম্ম-প্যাগল

"Omer the Tent-maker"-
চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য।

কিন্তু যাক্, এগুলা আমাদের আসল কথা নয়। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উদাসীন স্বামীরও তো চোখ ফুটিতে পারে! আমরা কিছুমাত্র ভাবিত হই নাই, স্যাভেঞ্জার গাড়ী ঠেলিয়া পথে বাহির হইবারও দরকার দেখিতেছি না! আসলে ঐ শিক্ষার দিক দিয়া ছবির লেখায় যে কথাগুলা ফুটিতেছে, তাহারই কথা বলিব — মানে, বায়স্কোপের ছবির লেখা।

বায়োস্কোপ ক'দিনেরই বা! এই তো সেদিন টুকি-টাকি কতকগুলো জীবন্ত ছবি দেখাইয়া আমাদের সে তাক্ লাগাইয়া দিল! তার পর দিনে দিনে একধার দিয়া ঐ যে একটি পথ সে কাটিয়া তৈয়ার করিল, সে দিকে আজ চোখ না মেলিয়া থাকাও চলে না! যখন দেখি সুন্দর ঐ পথ, প্রশস্ত, সুদৃশ্য, ও-পথে চলার লোভও তখন মনে প্রচুর জাগে। ঐ বায়োস্কোপ—এ কোন্ সুন্দর কল্পলোকের পথ তৈয়ার করিয়া চলিল, এই কয়টা মাত্র বৎসরে!

টুকিটাকি ছবি হইতে বায়োস্কোপ যখন ছোট-ছোট কাহিনী ধরিল, তখন সেগুলার মধ্যে সরস কৌতুক-কাহিনী আর রূপকথাই বেশী ছিল। তখনও সে আমাদের মনে কৌতুক আর আনন্দেরই সাড়া তুলিতেছিল। কিন্তু আজ যখন দেখি, বিশ্বের সাহিত্য-দরবার হইতে বাছিয়া মণিরত্ন বাহির করিয়া সারা বিশ্বের শিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসাধারণকে সে আজ তা দেখাইয়া বিস্মিত পুলকিত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে, তখন সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মাথা আমাদের লুটাইয়া পড়িতেছে যে!

আলাদীনের এ মায়াপ্রদীপ সে কোথায় পাইল! কোন্ পাহাড়ের তলে, না, অতল নীল সাগরের জলে এ প্রদীপ পড়িয়াছিল, তুলিয়া আনিয়া তার বলে কেবলি সে মায়ার কুহক সৃষ্টি করিতেছে,, দিব্য আনন্দ-লোক গড়িয়া চলিয়াছে, মরুর বুকে ফুল ফুটাইয়া, জলের ঝর্ণা খুলিয়া, কত অজানা রাজ্যের সবুজ তৃণগুল্ম, ফুল-ফল, নদী-নির্ঝর, লোক-জনের ঘরকন্না, সুখ-দুঃখ, চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে! বিজ্ঞানের কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে মানুষের কাছে কত আশার বার্ত্তাই আনিয়া দিতেছে, বিজ্ঞানের কত-শত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখাইতেছে! এ বিশ্বে বিধাতা কত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ গড়িয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তার শত পরিচয় এক নিমেষে সে প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে! এ পরিচয় পাইবার জন্য বিলাতের সুসভ্য লর্ড হইতে সুরু করিয়া অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ান, কোল্-ভীল্ অবধি যে আজ পাগল! বিশ্বের চারিধারে এত ঘরকন্না আছে,—বাপ মার স্নেহ, ভাই-বোনের প্রীতি, স্ত্রীর প্রেম, বন্ধুর দরদে তা বিচিত্র সমুজ্জ্বল, এ খপর তো আগে কাহারও এমন করিয়া জানা ছিল না। আজ ঐ বায়োস্কোপ সে পরিচয় আনিয়া দিয়াছে! দুনিয়ার মনের কথাটুকুই নয় শুধু, তার অতি-গোপন অতি-ক্ষুব্ধ বেদনার দীর্ঘশ্বাসটুকু অবধি আমাদের প্রাণে আজ ধ্বনিয়া তুলিতেছে! তা-ছাড়া পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্ম, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, পলিটিক্স—এ-সব তো বটেই! কি অসাধারণ অলৌকিক শক্তি এই বায়োস্কোপের।

তাই বলিতেছি, এ তো শুধু দু চারখানা ছবির কথাই নয়! এ যে মস্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে ঐ ছবির মধ্য দিয়া! ছবির লেখায় এ চিত্রসাহিত্য দুনিয়ায় আনন্দ বিলাইতেছে, শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া দিতেছে! এ সাহিত্য সে বিলাইতেছে অজস্রভাবে, ধনী-নির্ধনকে শিক্ষিত-নিরক্ষরকে,—বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সকল নর-নারীকে—অতি অল্প আয়াসে, এবং অল্প অবসরে! দুনিয়া এ চিত্র-সাহিত্যের ডাকে সাড়া দিয়াছে, কিন্তু 'ভারত তবু কই!'

এ চিত্র-সাহিত্যের কয়টা মস্ত গুণ আছে—প্রথম, যারা নিরক্ষর কিম্বা যারা ইংরাজী বা ফরাসী বা জর্ম্মান ভাষা জানে না, তারা এই ছবির লেখার সাহায্যে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী, গ্যটে, হোমার, দান্তে, ইব্‌সেন, টলষ্টয়, ভিক্টর হুগো, ইবানেজ, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির লিখিত বিবিধ চরিত্র, তাঁদের বিচিত্র আখ্যায়িকা, মনস্তত্ত্বের কত নিগূঢ় লীলার পরিচয় পাইতে পারে! হুগো, গ্যটের নাম করিলাম এইজন্য, কেন না, তাঁদের মূল ভাবসম্পদ ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ায় ইংরাজী-জানা নর-নারীর তার পরিচয় লাভের সুযোগ তো আছেই! তাছাড়া কর্ম্মবাগীশের দল, যাঁরা নাকি কাজের ভিড়ে সাহিত্যের বিচিত্র রস-সুধাপানের অবসর পান্ না বলিয়া

দুঃখ করেন, তাঁরা অনায়াসে একটু সময় করিয়া লইয়া ছবির পর্দ্দায় লা-মিজারেবল, ওথেলো প্রভৃতির পরিচয় কতক পাইবেন তো! অবশ্য চিত্র-নাট্যে মূলের রস ততটা গাঢ় পাইবার আশা করা যায় না, কারণ শিল্পীর ভাষার কেরামতি, ভাষার লীলা, তারো একটা উপভোগের দিক আছে। তবে এটা দেখিয়াছি, কতকগুলা লক্ষ্মীছাড়া অপদার্থ ও অপাঠ্য নাটক, বায়োস্কোপের এই ছবির পর্দ্দায় এমন বিশুদ্ধ সাহিত্য-রস পরিবেষণ করিয়াছে যে এই চিত্রের মারফতেই শুধু তা সাহিত্য নামের যোগ্য হইয়াছে। একখানি বই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। মূল উপন্যাসের নাম Shulamite. আমেরিকার এক আধুনিক তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের লেখা বইখানি; পড়িতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। কিন্তু ছবির পর্দ্দায় Under the Lash নামে ঐ বইখানিরই চিত্রে রূপান্তর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মশ্‌গুল হইয়াছি। কবিতার ছত্র প্রভৃতি হইতেও এমনি বহু চিত্র-নাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে— The White Rose এবং Over the Hill নাম করিতে পারি। তাছাড়া নূতন চিত্র-নাট্য Woman of Paris, Thief of Baghdad, Southern Love— এগুলির অস্তিত্ব শুধু চিত্রনাট্যেই—ভাষায় যদি ফোটে তো ভাষা-সাহিত্যও কৃতার্থ হয়। অনেক সময় অনেক বিদেশী ভালো বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না—এমন বহু বই উপভোগ করিয়াছি ঐ বায়োস্কোপের মারফৎ।

কিন্তু এ চিত্র-সাহিত্য ভবিষ্যতে শুধু আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না! চোখের সামনে দেখিতেছি, এ চিত্র-সাহিত্য জাতির সঙ্গে জাতির মনকে অটুটভাবে বাঁধিয়া দিবে। য়ুরোপ দেখিবে, এশিয়ার প্রাণ তারি মত একই ধাতুতে গড়া—আফ্রিকা, আমেরিকা, সবাই এক বিশ্বমানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত! এরাও সুখে গলে, দুঃখে বেদনায় ব্যথা পায়। ধর্ম্ম ও আচারের ভেদ বিভিন্নতা পরস্পরের সামনে যত বড় আড়াল তুলিয়াই দাঁড়াইয়া থাকুক, মূলে প্রকৃতিগত পার্থক্য কাহারো নাই—মন সকলের এক! তখন যে বিশ্বব্যাপী দরদ আর সহানুভূতি পরস্পরের মনে জাগিবে, তার সামনে এ তুচ্ছ আচার-ধর্ম্মের ভেদ ভাঙিয়া চূর্ণ হইবে, পলিটিক্স ধূলায় লুটাইবে, দুনিয়ায় বিশ্ব-মানবতার সৃষ্টি হইবে এবং দ্বন্দ্ব-হিংসা ভুলিয়া পৃথিবীর মানুষ এক অভেদ প্রীতির সূত্রে বাঁধা পড়িবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কবির স্মৃতি

—:০:—

বাঁশী যখন থামবে ঘরে,
নিব্‌বে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চ স্বরে
শোকের সমারোহ ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে-পাশায়,
নাই বা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো !
নাই বা হোলো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ ॥

আমি জানি, মনে মনে
সেঁউতি যূথী জবা
আস্‌বে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতি-সভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,

সেথায় আমার আসন পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে ॥

ওদের সুরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে,
জানি আমি সেই বারতা
রইবে অরেণ্যেতে—
ফাগুন-হাওয়ায় শ্রাবণ-ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্ব'রে দ্বারে
উঠবে হঠাৎ বাজি,
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ-আলোক লেগে,
এই বারতা উঠ্‌বে জেগে
রঙীন বেশে সাজি।
স্মরণ সভায় আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি ॥

আমি বেসেছিলাম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া-আলো
আমার এ জীবনে।

সে যে আমার ভালবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
　　আকাশ-নীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে
রইল সে যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
　　ফাগুন-চৈত্র-রাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
　　ভাবীকালের হাতে।

আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা
　　আমার গীতিমাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
　　মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলি-তলে
ক্ষণহাসির শিশির জলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
　　কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
করে কতই কাজের খেলা
যেথায় কাজের অবহেলা
　　নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
　　ভরে রূপের ডালি॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৈমনসিংহ-গীতিকা

——:০:——

বঙ্গভাষার এই অসামান্য সম্পদ্ পল্লী-কৃষকের কুটীরে এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিল। এই গীতিকাগুলির রচক নিরক্ষর চাষারা, কিন্তু ইহা কৃষকদের অশিক্ষিত হৃদয়ে শুধু একটা মর্ম্মোচ্ছ্বাস নহে,—বনফুলের মত ইহারা আপনা আপনি কুটীরের পার্শ্বে বিনা যত্নে বিনা আয়াসে ফুটিয়া উঠে নাই।

বঙ্গদেশের সমস্ত সাধনা, সমস্ত তপস্যার ফল এই গানগুলি। এ দেশের উপর ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে শিক্ষা ও সভ্যতার ঢেউ চলিয়া গিয়াছে, তাহা এ দেশ হারাইয়া ফেলে নাই। বঙ্গলক্ষ্মী সেই তপস্যার ফল আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা এই স্বভাব-কবিদিগকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। নিরক্ষর চাষারা গান রচনা করিয়াছে সত্য কিন্তু নিরক্ষর হইলেও তাহারা মূর্খ ছিল না। এই গীতিকাগুলিতে পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বর নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত শ্রী প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাতে এত বড় উচ্চ আদর্শের অনুভব এত সহজে, এত স্বাভাবিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যাহা হয়ত চাষার সরল হৃদয় ভিন্ন সম্ভবপর হইত না। বঙ্গরমণীর প্রতিভা-দীপ্তি যে খরবিদ্যুদ্দামের ন্যায় চক্ষু ঝলসিয়া দিতে পারে, তাহা এই গীতিকাগুলি পড়িয়া প্রথম বুঝিলাম। বাঙ্গালী রমণীর প্রেম যে ঝঞ্ঝা, মেঘ ও বজ্রকে উপেক্ষা করিয়া ছিন্নমস্তার ন্যায় আত্মবলিদান করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিতে পারে, তাহা এই গীতিকাগুলি পড়িয়া প্রথম বুঝিলাম। বঙ্গদেশের যত দেবী – কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী,—ইঁহারা যে বঙ্গনারীরই রূপান্তর তাহাও এই গীতিকাগুলি পড়িয়া প্রথম বুঝিলাম। নারীহৃদয়ের অপ্রমেয় শক্তি নারীচিত্তের সিন্ধুসম গভীর অতল প্রেম, নারীর বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি এই গীতিকাগুলিতে প্রতিফলিত। সমাজ-শাসন, পৌরোহিত্য সমস্ত দলন করিয়া অসুর-দলনী মহিমময়ী নারীর এ কি ক্রুর ও দর্পিত মূর্ত্তি! কোথাও ভীষণ হইতেও ভীষণ, কোথাও কোমল হইতেও কোমল, অসি হইতেও তীক্ষ্ণ, ফুল হইতেও নম্র – বিরুদ্ধ শক্তি-পুঞ্জের কেন্দ্র এই গীতিকাগুলির নারী-চরিত্র।

নিরক্ষর চাষারা যে এই পালাগানগুলি রচনা করিয়াছিল, তাহা এক হিসাবে ভালই

হইয়াছিল। তাহারা বই-পড়া বিদ্যার নীল চশমা পরিয়া বিশ্বকে বিকৃত বর্ণে চিত্রিত দেখে নাই। যে তপস্যা বঙ্গকুটীরকে নিভৃতে সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছিল তাহা চাষাদের চক্ষু এড়ায় নাই। এই দেশের খোল করতাল ও মঞ্জীর ধ্বনি জাতীয় মহা-শিক্ষাকে মধুর করিয়া গড়িয়াছিল। সেই শিক্ষা বর্ণমালাযোগে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও, নর্তন, বাদন ও গানের ঝঙ্কারে কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল। বঙ্গের দর্শন, বঙ্গের 'মহাযান' বঙ্গের সহজিয়া, বঙ্গের চিতানলে প্রদীপ্ত সতীর মূর্ত্তি,—এ সমস্ত কবিরা পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা উপলব্ধি করে নাই। এই তপস্যা অহর্নিশ তাহারা চক্ষের সামনে দেখিয়াছিল, তজ্জন্যই তাহাদের অঙ্কিত দৃশ্য-গুলি এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ।

অধিকাংশ গীতিকার গুণ এই যে তাহারা একান্তরূপে বাহুল্য-বর্জ্জিত। যে দৃশ্য, যে ঘটনা, যে চিত্র যেখানে দিলে কাব্য কথা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, স্বভাবের কবিরা ঠিক সেইরূপ দৃশ্য, ঘটনা ও চিত্র ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। অলঙ্কারের গুরুভারে, কি বাক্যপল্লবের বাহুল্যে গীতিকাগুলি প্রপীড়িত হয় নাই। তাহাদের ভাবের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। যেমন শিশুর প্রেম মুখে চোখে ও নানা ভঙ্গীতে অজস্র-ভাবে ঝরিয়া পড়ে, ভাষার ত্রুটির জন্য তাহার প্রকাশ আটকায় না, এই কবিদিগের গানও তদ্রূপ। তাহাতে অনাবশ্যক কথা একটিও নাই, এক কথায় যাহা বলা যায় তাহা বলিতে গিয়া তাহারা দুটি কথা ব্যয় করেন নাই। পৌরোহিত্য-শাসিত বাঙ্গালা-সাহিত্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রী বাক্‌ছলা-পূর্ণ বঙ্গসাহিত্য, আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য এ সমস্ত পাঠ করিলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী কথার সাধনাই করিয়াছেন। বক্তৃতা-মঞ্চে, দাম্পত্য-বাসরে, রাজনীতি-চর্চ্চায়, সর্ব্বত্রই কেবল কথার মারপেঁচ। কেবল কথা কথা কথা। কবি যে লিখিয়াছেন "কথায় হীরার ধার" তাহা বাঙ্গালীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রথম খণ্ড গীতিকায় পাঠক চন্দ্রাবতীর পালাটি পড়ুন; কি নীরব উৎকট তপস্যা! কি অদ্ভুত প্রেম! পার্থিব প্রেমের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অপার্থিব প্রেম একবার জয়ী হইয়া আবার পরাজিত হইতেছে। কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে যেন কবি সমুদ্রের ঝড় তুফান আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, অথচ চন্দ্রা কি অপূর্ব্বরূপ সহিষ্ণু ও সংযতবাক্, এ যেন সমুদ্রের মধ্যে মৈনাক—অনড়, অচল। মহুয়ার মুখেও কথা খুব অল্প। সে ব্রাহ্মণকুমারী। ব্রাহ্মণোচিত অনাবিল শুচিতা ও ত্যাগ তাহার চরিত্রে দেদীপ্যমান। অপর দিকে সে বেদীয়ার ঘরে প্রতিপালিত,—বেদীয়া রমণীর অসম সাহস, স্বাধীনতা-স্পৃহা, নির্ভীকতা, এবং ভীষণ ও ক্রূর কর্ম্মে দীক্ষা তাহার চরিত্রে জ্বলন্ত। নানারূপ বিরুদ্ধ গুণ দ্বারা একি মহীয়সী নারীমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে! এ রমণী ঝঞ্ঝা হইতেও দ্রুত চলে,

বিদ্যুৎ হইতেও ভীষণ ইহার কটাক্ষ, যখন বণিকের ডিঙ্গায় মহুয়া পান বিতরণ করিয়া হাসিয়াছিল, সেই প্রলয়ঙ্কর হাসি দেখিয়া মুগ্ধ বণিক্ অসুরদলনীর মৃত্যু-হাস্য বুঝিতে পারে নাই। অপর দিকে পুষ্পিত বনলতা হইতেও মনোরম ভঙ্গীতে মহুয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটিয়া বেড়ায়। মহুয়া কল্পলোকের অপূর্ব্ব নারী-মূর্ত্তি, মেঘের ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল একখানি পুষ্পক রথ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই চরিত্রে গৃহিণীপনাও আছে। যখন মাছ খাইতে গিয়া তাহার স্বামীর গলায় কাঁটা আটকাইয়া ছিল, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার দুয়ারে মানত করিয়াছিল। স্বামী বাজারে যাইবার সময় একদিন কানে কানে বলিয়াছিল "ওগো আমার জন্য একখানি নথ কিনিয়া আনিও।" পরমুহূর্ত্তেই আবার যখন সে আকাশস্পর্শী বাঁশের ঊর্দ্ধে দড়ি বাঁধিয়া কলসী মাথায় নৃত্য করিতে লাগিল, তখন সে অপ্সরাকে দেখিয়া কাহারও চক্ষের পলক পড়িতে পারিল না। মহুয়ার পার্শ্বে পালঙ্ক;—একজন বীরাঙ্গনা, প্রেমে আত্মহারা, বিষ খাওয়াইয়া একশত লোক হত্যা করিতে তিলার্দ্ধ দ্বিধা করে না ঝঞ্ঝার উপর আকাশকুসুম, অপূর্ব্ব খেলোয়াড়, স্বার্থ ত্যাগের চূড়া,— আনন্দের অলকানন্দা। অপরটি নীরব সার্থক, নীরব প্রেমিক, হিতৈষী বন্ধু, সখীর গৌরবে মগ্নগুল। সখী যখন মরিল, তখন তাহারও জীবনের সুখের দীপ নিবিয়া গেল। সমাধি-পার্শ্বে তরুর অজস্র কুসুমোপহারের ন্যায় সখীর কবরের পার্শ্বে বসিয়া গান গাহিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া তরুণ জীবন শেষ করিয়া দিল। প্রত্যেকটি চরিত্রই অপূর্ব্ব। কি অদ্ভুত তেজ, গরিমা ও পাতিব্রত্য লইয়া জগতের সমস্ত দুঃখ সহিবার জন্য মলুয়া মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিল। এই পাতিব্রত্য পুরোহিতের মন্ত্রপূত রাখী-বন্ধন নহে। প্রথম দিন যাহাকে দেখিয়া "লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ" তাহাকেই সে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইল। আঁচলে আঁচলে গেরো পড়িবার পূর্ব্বেই মনে মনে গেরো পড়িয়াছিল। তারপরে কত উদ্দাম নৃশংস পরীক্ষা! শেষে ত্যাগের স্বর্ণ-চূড়াকিরীটিনী মৃত্যু-মহিমা। সেরূপ দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নাই, অপর কোথায়ও আছে কিনা জানিনা। মদিনার প্রেম এ জগতের নহে। বিশ্বাসহন্তা স্বামীর প্রতি এরূপ অগাধ অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ" ছাড়া আর কাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে? যে প্রেম পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে গিয়া পাখী ধরা, আমের চারা বোনা, গাইকে ঘাস খাওয়ান প্রভৃতি কৈশোরের ছোট ছোট দৈনিক কাজের ভিতর মধুর রস পুষ্ট হইয়া দুইটি তরুণ মনকে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছিল, বিবাহের পরে সেই প্রেম কৃষি সম্বন্ধে শত শত কাজে পরস্পরের সাহায্য লাভ করিয়া ধন্য ও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সত্যই তাহারা পরস্পরকে ছাড়া বাঁচাইতে পারিত না। স্বামী কিন্তু ভাবিয়া

ছিলেন ধন-দৌলত ও নূতন স্ত্রী পাইয়া তিনি মদিনাকে ভুলিতে পারিবেন কিন্তু তাহার অন্তরের ঠাকুর অন্তরে বসিয়া তখন ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিল, "এ কর্ম্ম কোরো না; তোমাদের ভিতর দাম্পত্য যে কত নীচে শিকড় নামাইয়াছে তাহা তুমি জান না। তোমার ভিতরে যে জিনিষ আছে তাহা যে কতবড় তাহার ধারণা তোমার নাই।" কিন্তু রাজার ছেলের কৃষক বধু ভ্রাতার প্ররোচনায় অরুচিকর হইয়া উঠিল। স্বভাবের নিয়ম অমান্য করিয়া তাহার যে দুর্গতি হইল তাহা পড়িতে গেলে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।

প্রত্যেকটি নারী-চরিত্র এরূপ মহৎ, এরূপ বাস্তব, এরূপ দেবলোক ও নরলোকের সন্ধিস্থলে অভিব্যক্ত স্বর্গমাধুরী যে তাহার তুলনা কোথায়ও কোন সাহিত্যে আছে কি না জানি না।

দ্বিতীয় খণ্ডে 'ধোপার পাঠ," "মহিষাল বন্ধু' "রাণী কমলা,' "কাঞ্চনমালা," মাণিক-তারা" বাহির হইবে। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির রাধা কোন্ অমর জগতের প্রেম লইয়া মূর্ত্ত হইয়াছেন, এই কাব্যগুলি পড়িলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ রাধা-কৃষ্ণের লীলামঞ্চ যে বাঙ্গালার ঘরে, বাঙ্গালার মাঠে, বাঙ্গালার নদী-তটে তৈরী হইতেছিল তাহা আমরা জানিতাম না। বাঁশের বাঁশী যে বাঙ্গালীর নিকট কত মধুর, তাহা "মহিষাল বন্ধু" পড়িয়া প্রথম বুঝিলাম। "মহিষাল-বন্ধুর" কম্পিত অধর-স্পর্শে ছোট বাঁশীটি কিরূপ বাতাহত পুষ্প-কোরকের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিত,—সেই বাঁশীর সুর অফুরন্ত মর্ম্ম-বেদনা বহন করিয়া কিরূপে সাজুতি কুমারীর হৃদয়-তটে লুটাইয়া পড়িয়া তাহা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিত,—এই বাঁশের বাঁশী বাঙ্গালার মুক্ত প্রান্তরে তরঙ্গবহুল নদীর স্রোতে দুইটি হৃদয়ের মধ্যে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত বহন করিয়া আনিত, তাহা মহিষাল বঁধুর গীতিকায় পূর্ণ মাত্রায় ব্যক্ত হইয়া রাধা কৃষ্ণ লীলার পূর্ব্ব সংবাদটি স্তোতনা করিতেছে। এই বাঁশের বাঁশী এক সময়ে রাধা নামে সাধা হইয়া মন্ত্রপূত হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক প্রেমরাজ্যের যাদুকাঠি স্বরূপ মানুষের হৃদয়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবির সুর ও পালাগানের সুর এখানে মিশিয়া গিয়াছে। একটি অপার্থিব প্রেমরাজ্যের সুর, তাহা ভগবৎ-প্রেমে ভরপুর; অপরটি বাস্তব জগতের সুর হইলেও আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে বহুদূর-বর্ত্তী নহে। আকাশের নীলিমাভূষিত প্রান্তরেখা যেরূপ দূরপল্লীর নীল রেখায় মিশিয়া যায়, এই দুই প্রেমজগতের সুর একটা যায়গায় তেমনি মিশিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব-জগত একটু নীচে নামিয়া, পল্লী-গীতিকা একটু ঊর্দ্ধে হাত বাড়াইয়া পরস্পরকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। যাঁহারা এই পালাগানগুলি পড়েন নাই, তাঁহারা বৈষ্ণব গীতির মর্ম্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হইবেন না। বীণা, সেতার, তানপুরা,—বাঙ্গালার

গীতিরাজ্যের বাহিরের সরঞ্জাম মাত্র। এ রাজ্যটা বাঁশের বাঁশীর অধিকৃত। এই দেশ গোষ্ঠের দেশ, ও রাখালের নিভৃত বাঁশীর প্রেমালাপের দেশ। ইহার বিপুল প্রান্তরে, বিশাল নদী-তরঙ্গে ও জ্যোৎস্না-ধবলিত শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যখন বাঁশীর সুর চলিয়া যায় তখন মনে হয়, এদেশে বাঁশীই খাঁটী সত্য ও দেশের একমাত্র মন্ত্রের সুর। এই প্রাণ মাতানো করুণ সুরটি "মহিষাল বন্ধু" ও "ধোপার পাঠে" যেরূপ বুঝিয়াছি, সেরূপ আর কিছুতে নহে।

"কাঞ্চন মালা" ও "সখিনা" এবার প্রকাশিত হইবে। বঙ্গরমণী স্বীয় হৃদয়ের উৎকট পরীক্ষা দিতে যাইয়া কি ভাবে বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আনে 'কাঞ্চন-মালায়' তাহা পাইলাম। অগ্নি-পরীক্ষা বিষ-পরীক্ষার কথা আপনারা শুনিয়াছেন কিন্তু সে সকল পরীক্ষা ইহার কাছে লাগে না। পরীক্ষান্তে বিজয়ী সম্রাজ্ঞীর মূর্ত্তি একবার দেখুন, ইহাঁর কিরীট-কুণ্ডলে যে প্রভা ঝলসিত হইতেছে, তাহাতে বিশ্বের অনেক খ্যাতনাম্মী প্রেমিকারা ম্লান হইয়া যাইবেন। যোদ্ধৃবেশিনী সখিনাকে রণক্ষেত্রে দেখিলে মুহূর্ত্তকাল মনে হইবে, ইহার মত বীরাঙ্গনা জগতে আর হয় নাই। কিন্তু সহসা স্বামীর একখানি পত্র পাইয়া তন্মুহূর্ত্তে তাহার প্রফুল্ল বদন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লুটাইয়া পড়িয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন। বজ্রসম কঠিন, ফুলসম কোমল এই নারীরই বা তুলনা কোথায়?

এই কাব্যগুলি পড়িলে পাঠকেরা বুঝিবেন, বঙ্গদেশে যদিও গোলকুণ্ডা নাই তথাপি এই পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার প্রত্যেকটিই কৌস্তভ কোহিনুর হইতে দামী। এই গীতিকার বহুল প্রচারে বাঙ্গালী নর-নারীর আত্মবোধ জন্মিবে। তাহাদের ভিতরে যে কি দুর্জ্জয় শক্তি ও অজেয় তপস্যা আছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। মাকড়ার জালে সিংহ বাঁধা পড়িয়াছে। পৌরোহিত্যের বন্ধনে বাঙ্গালী সমাজের আজ এই দুর্দ্দশা। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বাঙ্গালী জাগ্রত হইবে তখনই সে বুঝিতে পারিবে এই জাল ছেঁড়া তাহার পক্ষে কত সহজ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বন্দিনী

(গল্প)

—:০:—

ওরা খাঁচায় একটি কোকিল-ছানা বন্দী করে' রেখেচে।

এক দুর্য্যোগের রাতে ঝড়ো হাওয়ায় নীড়হারা এই কোকিল-শাবকটি ওদের বাড়ীর ছাতে উড়ে এসে লুটিয়ে পড়েছিল করুণ আর্ত্তস্বরে। ওরা দয়াপরবশ হয়ে ঘরছাড়া পাখীটিকে খাঁচায় জীইয়ে রেখেচে, কোকিলটা বর্ষা বসন্ত মানেনা, আকাশের নীলিমা তার চোখের পানে তাকায়, পথভোলা বাতাস এসে খাঁচাটায় একটু দোলা দ্যায় আর পাখীটা নিদারুণ বেদনায় হাহাকার করে, খাঁচার লৌহ-প্রাচীরে মাথা খোঁড়ে আর সজল নয়নে চেয়ে থাকে!

ওরা ওকে বন্দী করে' রেখেচে ইট-পাথরের সংস্কার-শাসনের দুর্ভেদ্য কারাগারে।

মনে আছে ফাল্গুনের এক তন্দ্রাহত অলস মধ্যাহ্নে কলকাতার রুদ্র আকাশে পথহারা কোন কোকিল ডেকে চলেছিল সমস্ত কোলাহলের ওপর একটি সুষুপ্তির মায়া রচনা করে'। মনে আছে তাকে বলেছিলাম—বল ত শোভা, কোকিলটা কুহু বলচে না উহু? সে ভিজে চোখে আমার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে চোখ্ নীচু করে' বলেছিল—উহু। সে কতদিনের কথা।...

তারপর যতদিন ওদের বাড়ী গেছি কোকিলটা ব্যথাভরা নীরব আকুতিতে আমার পানে চেয়ে করুণ কণ্ঠে কেঁদে-কেঁদে উঠেচে, খালি বলেচে—ওগো, আমি এ অবরোধ সইতে পারি না, আমাকে নীল আকাশ ডাকে, চাঁপা করবীর উতল পাতা আমার জন্য নীড় রচনা করে' রেখেচে, দখিনা আকাশ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েচে, আমাকে তোমরা কেউ মুক্তি দাও, এরা বড় নিষ্ঠুর!

...পাখীটা তার বড় বড় ঠোঁট দুটি নিস্ফল আক্রোশে লোহার শিকে ঠোকর মারে, গভীর অভিমানে পা দিয়ে সমস্ত খাবার জল ঠেলে ফেলে তার।

আকাশে সেদিন মেঘের মিছিল চলেছিল সারা দুপুর ধরে'। বিকেলে ঠাণ্ডা দমকা বইতেই বেরিয়ে পড়ি ওদের বাড়ীর মুখে। গিয়ে দেখি তার ঘরের নিরালা অন্ধকার কোণটিতে চুপ করে'

বসে' হাতের ওপর মাথাটি নীচু করে' রেখে শোভা কাঁদ্‌চে! খোলা জান্‌লা দিয়ে দুরন্ত বাতাস তার রুক্ষ আবাঁধা চুল ও ময়লা ধুলোয়-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা কাঁপছিল। আমি তার দিকে আর একটু এগিয়ে কান্না'র সুরে ডাক্‌লাম শোভা!...শোভা মুখখানি তুলে আমার পানে তাকালে, আনন্দে কালো চোখ আজ ডাগর হোলনা, তাতে আজ বর্ষা-আকাশের মেঘের স্বপ্ন ভরা, সুকোমল একটি ব্যথা তাতে কুয়াসার মতন কাঁপ্‌চে। আমার চোকে তার দৃষ্টিটি একটু ছুঁইয়ে নামিয়ে নিলে গভীর অভিমানে। বল্লাম—'কাঁদ্‌চ কেন?' সে তার কোন জবাব না-দিয়ে ঘনিয়ে-ওঠা নিকষমণির মতো কালো মেঘের পানে চেয়ে রইল। তারপর খানিক বাদে মুখটি নীচু করে' পরম বেদনার সুরে বল্লে 'তুমি আর আমার কাছে এসোনা।' বিদ্যুতের স্বপ্ন একটু ঝিকিমিকিতে দেখ্‌লাম, তার গাল বেয়ে ঝর্ণার মতো অশ্রু ঝরে' পড়্‌চে। সে মাথা নীচু করে' বসে' রইল দু'হাতের অঞ্জলিতে মুখ লুকিয়ে। বল্লাম—'এই তোমার শেষ কথা?' সে মুখ না তুলেই বল্লে—'কিন্তু ওরা যে আমাকে বেঁধে রেখেচে, সারাদিন আজ কিছু খাইনি, আমি এত যন্ত্রণা সইতে পারিনা। তুমি শুধু-শুধু এসে নিজেও অপমানিত হও, আমারো কষ্ট বাড়াও। তুমি ফিরে যাও।'

সারা আকাশ ভেঙে বাদলের মাৎমাতি সুরু হোল। নীচে নেমে এলে কোকিলটা আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—'আমি এত কান্না সইতে পারি না, এত অন্ধকার। আমাকে বসন্ত ডাক দিয়েচে কোন্ নূতন সবুজের দেশে, সেখানে রাঙা দিনের আলো, কচি পাতার মেলা, দখিন হাওয়ার দোল,...আমার এ লোহার দুয়ার খুলে দাও, আমি পাখা মেলে সেই চাঁদ্‌নী-আলোর দেশে উড়ে যাই..."

বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এসে দেখি, সেই অন্ধকার ঘরটির খোলা জান্‌লার শিক ধরে' কে দাঁড়িয়ে। তার নিবিড় কালো চুল অন্ধকারকে গাঢ়তর করে' ঝড়ের বাতাসে পাগল হয়ে উড়্‌চে, লাল শাড়ীটা লেলিহান বহ্নিশিখার মতন কাঁপ্‌চে, তার আর কিছুই বোঝা যাচ্চেনা, আর বর্ষার উতল কোলাহল ভেদ করে' কোকিলটার খিন্ন আর্ত্তকণ্ঠ চীৎকার দিয়ে উঠ্‌চে কু উ উ, কু-উ-উ!...

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

একের সাধনা *

—:০:—

১

আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন কর্ম্ম থেকে আমার ছুটি নেওয়া দরকার। কিন্তু ছুটি নেওয়ার পূর্ব্বে কর্ম্ম সমাধা করে যাওয়া চাইত। সেই জন্য আমি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আজ এই পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারে উপস্থিত। আমার বিশ্বাস, দেশের জন্য যে কর্ম্ম করবার সঙ্কল্প আমার মনে মনে আছে তা বলে যাবার এটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। তার কারণ এই, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা নিষ্ঠাবান্, দৃঢ়সঙ্কল্প সরলচিত্ত। এরা বুদ্ধির অভিমানে বিদ্রূপের দ্বারা বড় কথাকে ছোট করে দেয় না। এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গ দেশের একটি বড় কর্ম্মস্থান বলে আমি বিশ্বাস করি। আজ এই যে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি এখানে কর্ম্মের একটি সত্য রূপ দেখতে পেয়েছি। একটি মহতী আশা এখানে অঙ্কুরিত হয়েছে।

আমাদের এই যে দেহ এর মধ্যে প্রাণশক্তি কতকগুলি ঐক্যের ক্ষেত্র স্থাপিত করেছে। যেমন হৃদয় দেহের একটি মর্ম্মস্থান, এখান থেকে দেহের সমস্ত অংশে প্রাণরস সঞ্চারিত হয়। দেহে এইরূপ মর্ম্মস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে তবে দেহ উৎকর্ষ লাভ করে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠানটি দেশের পক্ষে সেইরূপ একটি মর্ম্মস্থান। এখানে থেকে পল্লীতে পল্লীতে প্রাণশক্তি বিস্তৃত হয়ে একটি সমাজদেহ রচনা করবে। এইটিই এর পরিপূর্ণ সার্থকতা। আমাদের প্রাণের স্বরাজ এই দেহ। প্রতি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে একটি ঐক্যের জাল প্রাণের তাপ সঞ্চারিত করে, তাতেই দেহের স্বরাজ রক্ষিত হয়। তেমনি দেশের স্থানে স্থানে মর্ম্মস্থান সৃষ্ট হয়ে উঠলে, সেখান থেকে প্রাণধারা পল্লীতে পল্লীতে প্রবাহিত হবে, আবার পল্লীর প্রাণ ফিরে আসবে ঐক্য-কেন্দ্রে; তা হলেই আমাদের দেশপ্রাণের স্বরাজ দেহবদ্ধ হবে। এখানে তারই একটি সূত্রপাত হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

অনেক কাল পূর্ব্বে একদিন বলেছিলাম

* কুমিল্লার অভয়াশ্রমে প্রদত্ত অভিভাষণ "ভারতী"তে প্রকাশের জন্য কবিকর্তৃক প্রেরিত।

আভ্যন্তরিক প্রাণময় চৈতন্যের ঐক্যেই দেহ এক হয়। কোনো বাহিরের প্রক্রিয়ায় নয়, দড়ির বন্ধনে নয়। সেদিন কবির কথাকে কাজের কথা বলে কেউ গ্রহণ করে নি। তারপর নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সেইরূপ কাজের প্রবর্ত্তনাও করেছিলাম। তাই যেখানেই দেখি কর্ম্মীরা প্রাণের ঐক্য দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে—কোনো বাহ্য আচারের প্রচার দ্বারায় নয়,—সেখানেই আনন্দিত হই। দেশের মধ্যে একটা হৃদয় আছে, দেশবাসীরা এটা যদি নানা রূপে অনুভব না করে তবে সমস্ত দেশের একটি অখণ্ড প্রাণময় সত্তার অস্তিত্ব তাদের কাছে বাস্তব হতে পারে না। প্রীতির দ্বারা, সেবা দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মীয়তা প্রসারিত করে তবে সেই হৃদয়কে সত্য করে তুলতে হয়। একদিন ছিল যখন পল্লীতে পল্লীতে সেই হৃদয় স্পন্দিত ছিল, যখন আত্মীয়তার যোগে পল্লী নিজেকে নিবিড়ভাবে এক বলে জানত। আজ সেই হৃদয়ের স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থান বিচ্ছিন্ন হয়েছে; তাই যত দুঃখ, তাই যত দুর্দ্দশা। আজ দেখতে পাচ্ছি এই অভয়াশ্রমে একটি হৃদয়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক জন ত্যাগী সন্ন্যাসী শুভক্ষণে এখানে মিলেছেন, তাঁরা আপন ধ্যানের মধ্যে বড় করে একটি একেক দেখতে পাচ্ছেন এবং আপন কর্ম্মের মধ্যে সত্য করে সেই একের সাধনা করচেন। এই বিরাট একেক অন্তরে ও বাহিরে, ভাবে ও রূপে, সম্বন্ধে ও কাজে উপলব্ধি করাই আমাদের শাস্ত্রে বলে অমৃতকে লাভ করা। দেশ যখন আপনার মধ্যে সেই বড়কে সেই একেক দেখতে পায় না তখনি সে মৃত্যুকে পায়।

এই আশ্রমে অমৃত-উৎসের সন্ধান চলেচে। এখানকার সাধকেরা জানুন যে, কোনো বাহ্য কর্ম্মে দেশের পরিত্রাণ নেই, পরিপূর্ণ জীবনের উদ্বোধনেই বিশ্লিষ্ট যা তা সংশ্লিষ্ট হয়, বিক্ষিপ্ত যা তা দেহবদ্ধ হয়। আমার শেষ কথা এই—আমি বাল্যকাল থেকে মনে সমগ্রতার রূপকে বরাবর পূজা করেছি। সত্যের আদর্শ পরিপূর্ণতার আদর্শ বিষয়ী লোকের স্বার্থবুদ্ধির আংশিকতাকে বাহ্যিকতাকে আশ্রয় করে। সমগ্রতাকে দেখাই পরমার্থকে দেখা। মানুষের চৈতন্যকে বিরাটের মধ্যে প্রসারিত করাই মুক্তি। সঙ্কীর্ণ আচারে বদ্ধ যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্মই নয়। কারণ সে ধর্ম্মের মত বন্ধন বিষয়-বুদ্ধিতেও আনে না।

আমাদের দেশে মানুষের চিত্তকে শতদল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে, সেই চিত্তকমল সে ছোট নয়, দলা-বিরল নয়, বহু দলা তার, অনেক পাপড়ি নিয়ে আন্তরিক প্রাণের প্রভাবে একবৃন্তে সে বিরাজিত। তার সেই বহু অংশকে সঙ্কীর্ণ করতে গেলে তার প্রাণের ঐক্যকেই পীড়িত করা হয়। যে এক প্রাণ আপনাকে স্বতই বহু বিচিত্রে বিকশিত করতে চায় তাকে যেন আমরা প্রণতিপূর্ব্বক

স্বীকার করি। সেই প্রাণশক্তিকে অবজ্ঞা করে বিশেষ একটি সঙ্কীর্ণ যন্ত্র-প্রক্রিয়াকে প্রধান করে তুললে কারখানাজাত পণ্য সামগ্রীর মত বিশেষ একটি পদার্থের প্রভূত আমদানী হতেও পারে। কিন্তু এই জড়ত্বের আর্থিক ফল আপাতত যাই হোক এর মত বন্ধন মানুষের আর কিছুই নেই। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বতোমুখী শক্তিকে উদ্বোধিত করতে হবে। এই আশ্রমে যদি পল্লীসমাজের প্রাণময় হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে এখান থেকে সেই সৃষ্টির তেজ চারিদিকে সঞ্চারিত হোক যা নানারূপে বহু কর্ম্মে আপনাকে নিরন্তর সার্থক করে।

বারংবার এই কথাটি বলব যখন সমস্ত আত্মা জাগে, বিচিত্র শক্তি নিয়ে জাগে, তখনই মানুষ যথার্থ জাগে। "য একঃ," যিনি এক "বহুধাশক্তি যোগাৎ" যিনি বহুধারা প্রবাহিত শক্তিযোগে নানালোকের "নিহিতার্থো দধাতি" অন্তর্নিহিত নানা প্রয়োজন বিধান করেন তাঁকেই দেশের চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যে সব দেশে দেশাত্মবোধের সাধনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেখানে দেখি জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানের, কর্ম্মপন্থী কর্ম্মের, ভাবতপস্বী ভাবের রূপতপস্বী রূপের তপস্যা করছে। আমাদের দেশেও তপস্যা বিস্তৃত হউক, বহুধা হউক। সঙ্কীর্ণ সীমায় চৈতন্যকে বদ্ধ করলে সিদ্ধি হবে না। মানব ধর্ম্মের মধ্যে বৈচিত্র্য, বহুধা শক্তির স্থান আছে। একথা অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বের মূলে আঘাত করা হবে।

২

আমার যে কথা মনে এসেচে তা বলতে হবে কিন্তু পাছে সেটা উপদেশের মত শুনতে হয় মনে সেই আশঙ্কা আছে। বাইরে থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে উপদেশ দিয়ে বিশেষ কিছু ফল হয় বলে আমি মনে করিনে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন যে তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ তাঁর যে ক্রিয়া জ্ঞানক্রিয়া,বলক্রিয়া, তা স্বাভাবিক। তেমনি বিশুদ্ধ কর্ম্মী যিনি তিনি আপনার প্রকৃতিগত প্রবর্ত্তনা থেকেই কাজ করেন। এইজন্যে নিজের কর্ম্মে তাঁর আনন্দ আছে, অহঙ্কার নেই। অহংকারের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেকে নিজে ঘুষ দিই, বাহ্য ফললাভও ঘুষ। যাঁর কাজ স্বাভাবিক শক্তিরই প্রকাশ, অন্তরে বাহিরে তাঁর কোনো ঘুষের প্রয়োজন নেই। ঘুষের তাগিদে যে কাজ চলে তাতে বিকার ঘটতে বাধ্য। কর্ম্মের পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতাকে যিনি নিজের প্রতিপত্তির চেয়ে বড় বলে জানেন, তিনি এই বিকার সহ্য করতে পারেন না। পরের হিত করচি এই কল্পনায় আমরা যখন কাজ করি তখন সেই কাজের মাঝখানে অহং এসে পড়ে, কর্ম্মকে আবিল করে, যা বিশ্ব-কর্ম্ম নয়, যা বিশ্বকর্ম্ম, অহমিকা তার প্রকৃতি-

পরিবর্ত্তন করে দেয়, সত্যের জায়গায় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রিয় লোক ব্যক্তিগত নিজেকেই বড় করে দেখতে চায়। তখন সে নিজের কর্ত্তৃত্বের বিরোধীকে সত্যের বিরোধীর মতই দণ্ড দিতে চায়। তখন সে আপন সহায়দের অনুচর করবার চেষ্টা করে এবং যেখানে তার বাধা ঘটে সেখানে সহযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগীর মত ব্যবহার করে। এমন অবস্থায় ভাল কর্ম্মও সত্যকে পীড়া দেয়। সব চেয়ে গুরুভার এই নিজের ভার। আমরা যখন কর্ম্মকে অহমিকা দ্বারা ভারাক্রান্ত করি তখনই যত বিরোধ, যত বাধা।

গাছের প্রাণশক্তি পল্লবে ফুলে ফলে আপনার প্রাচুর্য্যে আপনার আনন্দে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্যে এই সৃষ্টির মধ্যে কেবল সৌন্দর্য্যের নয় কল্যাণেরও আবির্ভাব। ফল ফুলের মধ্যে আত্মত্যাগের দ্বারা বিশ্বের কাছে আত্মনিবেদন। তেমনি আমাদের কর্ম্মেও যেন প্রাণের পূর্ণতা নিজের অহৈতুক আনন্দে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশেই বিশ্ব ব্যাপারের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটে, তখন আমরা সৃষ্টির উৎসাহে কর্ম্ম করি, প্রেমের প্রাচুর্য্যে আত্মপ্রকাশ করি। দয়া করে পরের উপকার করছি কিনা সে কথা তখন ছোট হয়ে যায়, আড়ালে পড়ে। সাধারণতঃ আমরা সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় কর্ম্মের বাহ্যিক বাধা বিপত্তি দূর করবার জন্যেই প্রয়াস পেয়ে থাকি। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর সাধনা নিজের অন্তরের বাধাকে দূর করা, কর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে নিজেকেই আসন পেতে দেবার যে প্রবৃত্তি তাকে ভুলতে পারা। বড় কাজের কর্ম্মী যিনি তিনি আপনার চেয়ে আপন কর্ম্মকেই বড় করেন। আত্মা যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখন সে বিশ্বাত্মাকে প্রকাশ করে; প্রদীপ যেমন বিশ্বের জ্যোতিকেই প্রকাশ করে, নিজের তৈল-সঞ্চয়কে নয়।

আমরা অনেক সময় যখন ইচ্ছা করি না তখনো অগোচরে আমাদের অহমিকা সকল নৈবেদ্যে নিজের প্রধান ভাগ বসায়, সত্যের নামে নিজের নামটা চালিয়ে দিতে চায়।

ফুলের ভিতরকার কীটের মত এই প্রচ্ছন্ন অহমিকা সকল বড় কাজের প্রাণক্ষয়কর। কর্ম্মকে বাহ্যসিদ্ধির উপায় বলে না মনে করে যদি তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ বলে জানি তবেই এই রিপুটাকে দূর করবার জন্যে আমাদের চেষ্টা হয়, নইলে একে প্রশ্রয় দিই। আমাদের এই কামনা এই সাধনা হোক্, যে বিশুদ্ধ আনন্দ দ্বারা আমরা আত্মাকে মুক্ত করব। সেই কর্ম্মে স্বভাবতই সকলের কর্ম্ম করা হবে। দেশ যেখানে আত্মাকে প্রকাশ করতে পারছে না সেখানেই সে বন্দী। যাঁরা নিজেদের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছেন তাঁরাই দেশকে মুক্তি দিতে পারেন। বাহিরে সিদ্ধি না পেলেও যিনি অন্তরের মধ্যে মুক্তিকে পেয়েছেন তিনি সেই আনন্দে কর্ম্মকে

সুপ্রতিষ্ঠ করেন। তিনি বুঝেন আপাত-প্রতীয়মান সিদ্ধি আসল সিদ্ধি নয়। সত্য সাধনার মধ্যেই সিদ্ধি নিহিত আছে। অনেক সময় বাহির থেকে তা দেখা যায় না। অনেক সময় বাহ্যত তা পরাস্ত হতে পারে। বীজ মাটির মধ্যে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা হয়ত মনে করি তার ধ্বংস হল, কিন্তু বৃষ্টি পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়। আমি পদার্থটি নগদ-বিদায় না পেলে খুসী হয় না। কিন্তু আত্মা আপনার সত্যে আপনি আনন্দিত। সত্যকে উপলব্ধি করেছি, নিজের মধ্যে অমৃতকে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এত হাজার লোক আমার দলে আছে, এমন কোন বাহিরের প্রমাণের তার প্রয়োজন নেই। কর্ম্মের মধ্যেও আত্মার সাধনা করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে বলাতে হবে এই নামরূপওয়ালা যে আমি এ সত্য নয়। আপনাকে এর থেকে তফাৎ করে দেখতে হবে—যেমন জগতের সব জিনিষকে বাইরে দেখছি। আমি পদার্থ বহির্ব্যাপারের অঙ্গ, বুদ্বুদের মত উৎপন্ন হয়ে আবার লীন হয়। আত্মার মধ্যে চিরজ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপকে অত্যন্ত নিকট করে জানতে হবে। তা হলেই আমি আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়—যেমন করে সূর্য্যের আলোকে অন্ধকার যায়। আত্মাকে যারা দেখেছেন সেই ঋষিরা বলেছেন—এষাস্য পরমা গতিঃ—ইনিই ইহার পরমা গতি। ইনি আর এই; আত্মায় পরমাত্মায় এতই কাছাকাছি। পরমাত্মার সঙ্গে এমনতর সম্বন্ধকে অনুভব করলে সব সহজ হয়ে ওঠে। ইনি আর এই—এর সম্বন্ধ তাঁদের ভালো করে বোঝা দরকার যাঁরা বিশ্বকর্ম্ম করবেন। বিষয়-কর্ম্মে যারা নিমগ্ন তাঁরা ঐ ইনিকে বাদ দিয়ে বসেন।

বিশ্বকর্ম্মের ব্রতী যারা তাঁদের এই কথা বলতে হবে য আত্মদা বলদা, আত্মদানেই যার সৃষ্টি, যিনি বলদা, আত্মদানেই যাঁর বল, আমার কর্ম্মে তাঁকেই উপলব্ধি করি। এই বলে' আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে জাগ্রত রাখলে কর্ম্ম করা সহজ হবে।

ভারতবর্ষের একটি স্বভাবসিদ্ধ শক্তি আছে যার দ্বারা সমস্ত বড় কাজকে সমাজের সহজ প্রাণক্রিয়ার অঙ্গ করে তুলতে সে পারে। তার শিক্ষাদীক্ষা আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সবই এই রকম সহজ। শান্তি-নিকেতন থেকে কিছু দূরে কেঁদুলীতে বছর বছর জয়দেবের মেলা হয়। কবিকে স্মরণ করার এমন সহজ উপায় আর কোনো দেশে নেই। আমরা কোন মহৎ লোক মরলে তাকে কি করে স্মৃতিপথে রাখা যায় এইজন্য বক্তৃতা করি, চাঁদা তুলি। এ সব আমরা পশ্চিমের কাছে শিখেছি। আমাদের দেশের যে প্রণালী তাতে প্রেসিডেন্ট নেই, সেক্রেটারী নেই, ধন-ভাণ্ডার নেই। বৎসরের পর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এসে তাঁকে স্মরণ করছে গান করছে, আনন্দ করছে এই যে বৃহৎ আকারে লোকশিক্ষা এটা সমাজ-শরীরের স্বাভাবিক

ক্রিয়া। এতে স্কুল নেই, ক্লাস নেই, কর্ম্ম যন্ত্র নেই। এই শিক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকমনকে যেমন উর্ব্বর করেছে, তেমন শিক্ষা আর কোন দেশে নেই। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ। ওদের slavesএর লোক একেবারে পশু-প্রকৃতি। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের মধ্যেও একটা শিক্ষার ধারা বর্ষণ হয়েছে; তাতে তাদের চিত্তকে সফল, কোমল, সরস করেছে। আমাদের দেশের চাষারা সারাদিন চাষ করে ঘরে ফিরে এসে রাত ১১টা পর্য্যন্ত আঙিনায় কীর্ত্তন করছে, এ আমি দেখেছি। অন্যদেশে এ সময়ে তারা মদের দোকানে যায়, উন্মত্ততার মধ্যে মুক্তিকে খোঁজে। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের উপর যে শিক্ষার ধারা বর্ষণ হয়েছে তাতে সহজেই তারা কর্ম্মের গ্লানি থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। আমাদের দেশে যে নিরক্ষর সেও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। চাষীকেও যদি তত্ত্বকথা বলি তবে সে ধৈর্য্যের সঙ্গে শোনে। আমি এক জায়গায় দেখেছি চাষীরা রাতদুপুর পর্য্যন্ত যোগিগানের পালা বসে বসে শুনেচে। তার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। মুসলমান চাষী প্রজাও রাত দুপুর পর্য্যন্ত সেই গান শুনলে। এই ধৈর্য্য, ভালো জিনিষ পাবার জন্যে এই রকম মনকে প্রস্তুত করা, এ সহজ নয়। অন্য দেশে সাধারণ লোকের কাছে এই সব কথা বলতে গেলে লাঠি মেরে তাড়িয়ে দেবে। সমস্ত সমাজের স্বাভাবিক প্রাণক্রিয়া দ্বারা আমাদের দেশে এই শিক্ষা সহজ হয়েছিল।

যেমন সহস্র বৎসর ধরে এই শক্তি স্বাভাবিক প্রাণের ক্রিয়া দ্বারা গ্রামে অন্ন বিদ্যা ধর্ম্ম দিয়েছে তেমনি আজও করুক। সেই পদ্ধতিকে বাধা-মুক্ত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। আমাদের দেশে যাত্রাগান একটা স্বাভাবিক আনন্দের উপায়। য়ুরোপে সবই গুরুভার; Theatre, stage piano এসব ভারি জিনিষ, যেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায় না। আমাদের সারেঙ্গী একতারা একেবারে লোকের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এই ভারবিহীন আত্মপ্রকাশকে প্রাণবান্ করে তুলতে হবে, আজকের এই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তার স্বাভাবিক আকারে বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন প্রাণ জাগ্রত করে তুলতে হবে, এই কথা বলে আজকে আপনাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উনপঞ্চাশী

—:০:—

শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি, রামমাণিক্য হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। দাঙ্গার সময় তার যে মাথাটা ফেটেছিল, সেটা জোড়া লেগেছে, কিন্তু ভাঙ্গা মনটা তার আর জোড়া লাগতে চাইছে না! দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলুম—"কি রামমাণিক্য, আছ কেমন?" রামমাণিক্য একটু ম্লান হেসে বল্লে—"বেঁচে আছি। কিন্তু কি ভয়ানক লোক ওরা! হাঁসপাতালে যা দেখে এলুম তাতে আমার অ'ক্কেল হয়ে গেছে। ওদের নিয়ে অহিংস অসহযোগ করতে যাওয়া যে কত বড় পাগলামি, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। ওদের খলিফাকে সিংহাসনে বসাতে হবে, লেগে গেলুম চাঁদা তুলতে; ঘুরতে ঘুরতে পায়ের গোছা ফুলে গেল। ওদের বাড়ী ঘর দোর রাজসাহীতে ডুবে গেছে। না খেয়ে না দেয়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তাদের সেবা করেছি; ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। মাদারিপুরে ওদের বাড়ী ঝড়ে উড়ে গেল, কোন খিলাফতী স্যাঙ্গাৎ টুঁ শব্দটি করলে না; আমরা গিয়ে তাদের বাড়ীর চাল ছাড়িয়ে দিয়ে এলুম। কিন্তু আজ যেই ভিতর থেকে কে কল টিপে দিলে, অমনি লাঠি এসে পড়লো আগে আমার ঘাড়ে। আমি ওদের কখন ত কোন অনিষ্ট চিন্তা করিনি! উঃ—কি ভয়ানক লোক ওরা!"

আমি বল্লুম—"রামমাণিক্য হে! ক্ষমাই মহতের ধর্ম্ম। হিংসাকে অহিংসা দিয়ে, ক্রোধকে প্রেম দিয়ে জয় করাই হচ্ছে অসহযোগের বিধি। অতএব তুমি লাঠির ঘায়ের উপর প্রেমের প্রলেপ দিয়ে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে ফেলো।"

রামমাণিক্য বল্লে—"না, দাদা, তুমি ঠাট্টা কোরো না। আমার মনটা সত্যিই ভারি খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখ, কাল বাড়ী থেকে কি চিঠি পেয়েছি। কলকাতা থেকে জনকতক কাঠমোল্লা গিয়ে ফতোয়া দিয়েছে যে কাফেরের সঙ্গে লড়াই করতে হবে; আর তিন দিনের মধ্যেই আমাদের কালীবাড়ীর ঠাকুর কে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এখন উপায় কি বল ত? এ রকম ভাবে ত আর এ দেশে বাস করা চলে না! একটা বোঝাপড়া হওয়াই চাই।"

আমি বল্লুম—"সাধু প্রস্তাব। কিন্তু

যাবেই বা কোথা আর বোঝাপড়ার রূপটাই বা কি রকম হবে?"

রামমাণিক্য বল্লে—"সেই কথাই ত ভাবছি। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে নেতারা কেউ হালে পানি পাচ্ছেন না। কেউ বলছেন, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, কেউ বলছেন, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো যে এ রকম করলে দেশের ক্ষতি হবে। কেউ বলছেন, চাঁদা তুলে একটা Defence Fund খুলে ফেলো। কিন্তু বুঝিয়ে বলবারও ব্যবস্থা দেখছি নে, আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা দেখছি নে। তা হলে কি পড়ে' পড়ে' মারই খেতে হবে?"

আমার ইচ্ছা হলো বলি যে, মহাত্মাজীকে লিখে পাঠাও যেন তিনি এসে তাঁর আলি-ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে মসজিদে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। তাহলে হয়ত চরকার আধ্যাত্মিক প্রভাবে সব ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার পর মনে হোলো কথাটা বলা ভাল হবে না। কাজেই বল্লুম—"তাই ত, রামমাণিক্য, এ যে বিষম সমস্যায় পড়া গেলো। চল দেখি, একবার গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।"

গোঁসাইজীর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একখানা খপরের কাগজ মুখে চাপা দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। আমরা গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বল্লেন—"এই যে এসেছ! তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। মোহম্মদ আলি আর তস্য দাদা ভীমসেন সৌকত আলির বক্তৃতাটা পড়েছ? কাফের-বধ মহাকাব্যের তাঁরা যে ভূমিকা লিখেছেন, তা অতি 'ফাষ্টো কেলাস' হয়েছে। খালিপেট-কোম্পানীর এখন যে রকম অর্থাভাব তাতে একটা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গদা ঘুরিয়ে এই রকম দু চারটে গরম গরম বক্তৃতা ঝাড়লে খালিপেট ভরে যেত। আহা বেচারাদের বরাৎটা একবার দেখ! এতদিন ধরে যা-কিছু সংগ্রহ হলো, তা গেলো শেঠ ছোটানির গর্ভে। এখন খালিপেট ভরে কি করে? তাই ছোট ভাই ছাহেব নুটীস দিয়েছেন যে, মুসলমানেরা যদি চাঁদা করে' তাঁর হাতে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ড তুলে দেন তা হলে তিনি মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট ত ঘুচিয়ে দেবেনই; অধিকন্তু স্বরাজের একটা উর্দ্দু সংস্করণ গড়ে তুলতে পারবেন। আর দেখ, কামাল পাশাটার কি দুষ্ট বুদ্ধি! এতগুলো ভদ্র-সন্তান যা হোক একটা খালিপেট-উদ্ধারের ব্যবসা চালিয়ে নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাচ্ছিল, তা সে ব্যবসা ফেল করিয়ে দিলে! এখন একটা যাহোক ছোটখাট স্বদেশী খালিপেট-কোম্পানী খাড়া না করতে পারলে বেচারারা দাঁড়ায় কোথায়? এখন দুচারটা কাফের ঠেঙাবার প্রস্তাব করে আসর জমিয়ে না নিলে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি হয় কি করে?"

রামমাণিক্য হাঁ করে গোঁসাইজীর

মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আমি বললুম—"আলিভাই-ছাহেবদের কথা ছেড়ে দিন। এখন রামমাণিক্যের ভাঙা মাথা যদি জোড়া লাগলো, ত ওদের পৈতৃক কালী ঠাকরুণের মাথা খসে পড়লো। কে রাতারাতি এসে ঠাকুর ভেঙে দিয়ে গেছে। এর ব্যবস্থা কি তাই জানবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি।"

গোঁসাইজী প্রচণ্ড একটা হাই তুলে বললেন—"যাক্‌, কালী ঠাকরুণের জন্যে আমার তত ভাবনা নেই। তিনি যখন নিজের মাথা নিজে কেটে ছিন্নমস্তা হন তখন অপরের আর দোষ কি? কিন্তু খালিপেট কোম্পানীর পেট ভরাবার জন্যে রামমাণিক্যের মত অনেকগুলি গো-বেচারার রক্তপাত হচ্ছে, এইটা অবশ্য ভাববার কথা। কিন্তু মাথা কেটেও যদি চোক ফোটে ত তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।"

রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা করলে—"ত: হলে আপনি কি করতে বলেন?" গোঁসাইজী বল্লেন—'এর ত কোন পেটেন্ট দাওয়াই দেখতে পাচ্ছি নে—যা খাবামাত্র এতদিনের রোগটা সেরে যাবে। রোগটা হতেও অনেক দিন লেগেছে, আর সারতেও হয়ত অনেকদিন লাগবে। তবে ঠিক মতো ওষুধ পড়লে বাড়াবাড়িটা আপাততঃ কিছু কমতে পারে।"

আমরা গোঁসাইজীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম। তিনি খপরের কাগজখানা ভাঁজ করতে করতে বললেন—"আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি জান—আমাদেরও যে দুর্গতি, ওদেরও তাই। ইংরেজী লেখা-পড়া যারা শিখেছে তাদের ত ওকালতী, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারী, ডাক্তারী আর কেরাণীগিরি ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা ব্যবসা করতে জানে না, চাষ করতেও পারবে না। এখন তারা খায় কি? হিন্দুদের ঘরেও হাজার হাজার ছেলে পাশ করে' ফ্যা ফ্যা করে' বেড়াচ্ছে, মুসলমানদেরও তাই হতে আরম্ভ করেছে। এত কষ্ট করে' পাশটাশ করছে, অথচ পয়সার বেলা অষ্টরম্ভা। এতে মানুষের রাগ হয় বৈ কি! তাই এদের ইংরেজীওয়ালা পণ্ডিতেরা ঠিক করেছেন যে যদি চাকরী-বাকরীগুলো হিন্দুদের সঙ্গে অন্ততঃ আধা-আধি বখরা করে নিতে পারা যায় তা হলে কিছুদিন হয় ত এক রকম চলে যাবে। হিন্দুদের মধ্যেও ইংরেজীওয়ালা পণ্ডিতদের চাকরী ছাড়া গতি নেই। তাঁরা মুখের গ্রাসটা পরের হাতে তুলে দিতে নারাজ। কাজেই দু'দল চাকরীর উমেদারে ঠোকা-ঠুকি লাগছে। এই দু'দলই হচ্ছেন ইংরেজী পড়ার ফলে politically-minded. কাজেই পেটের জ্বালাটা politics এর রূপ নিয়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে' উঠছে। আমাদের দেশবন্ধু সেই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন তাই তাঁর প্যাক্টের আসল কথা হচ্ছে—বেচারাদের গোটাকতক চাকরী দাও; পেট ঠাণ্ডা হলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

রামমাণিক্য বল্লে—"তা যেন হলো কিন্তু আবদার যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে!"

গোঁসাইজী বল্লেন—"অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই তা হয়। এত লোকের পেটের জ্বালা ত শুধু চাকরীতে মেটে না, কাজে কাজেই চীৎকারের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আর চেঁচামেচিটা ক্রমে লাঠালাঠিতে দাঁড়াচ্চে।"

আমি বল্লুম—"আপনার থিওরীটা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। পেটের জ্বালা ধরলো ইংরেজী-ওয়ালাদের, কিন্তু লাঠালাঠিটা চলছে মূর্খ গরীবদের ভিতর। তা কি রকম করে' হয়?"

গোঁসাইজী হেসে বল্লেন—"আরে ভাই, ওটুকুই হচ্চে রাজনীতির প্যাঁচ। লোকের কাছে ত আর বলা চলে না যে যেহেতু আমাদের পেট ভরছে না, অতএব তোমরা মাথা-কাটাকাটি করে' আমাদের একটু সুবিধা করে' দাও। তাদের বল্তে গেলে আরও গোটাকতক ভাল ভাল কথা বানিয়ে বল্তে হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় একজন মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা শুনেছিলুম! তিনি আগে ছিলেন পুলিশের দারোগা। ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তাঁর চাকরী যাবার পর তিনি স্থির করলেন যে ইংরেজের চাকরী একদম হারাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর অহিংস অসহযোগী হয়ে উঠলেন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও তাঁর বাড়তে লাগলো, আগে ছিলেন মোল্লা তিন মাসের মধ্যেই হয়ে উঠলেন মৌলভী; আর আজকাল শুনছি প্রোমোশন পেয়ে হয়েছেন মৌলানা। খলিফার রাজ্য গিয়ে মুসলমানদের যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে একদিন তিনি নিরক্ষর চাষাদের সেই কথা বোঝাচ্ছিলেন। মৌলভী সাহেব বল্লেন—"দেখ ভাইছাহেবসকল, আপনারা যে পাঁচ রকৃত নেমাজ করেন, সেগুলো খোদার দরবারে পৌঁছে দেয় কে?" চাষারা এই গভীর প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মৌলবী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মৌলবী সাহেব তখন অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"হদিশে লেখা আছে যে পরম্পরের হুকুম মতো রুমের যিনি সোলতান, আর মুসলমানদের যিনি খলিফা তিনি মোসলমানদের নেমাজগুলি মুঠোর মধ্যে করে' খোদার দরবারে পৌঁছে দেন। এখন বুঝুন কি সর্ব্বনাশ হলো! রুমের বাদশা গেছেন চলে, কাজেই মুসলমানদের আর খলিফা নাই। এখন নেমাজগুলি সব হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এই ভীষণ আধ্যাত্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনে মুসলমানদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। খিলাফতের জন্যে লড়াই যে চালাতেই হবে, এ বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইল না দু'আনা চারআনা করে ১০।১২ টাকা চাঁদা ত তারা দিলেই; অধিকন্তু পাঁচ সাত জন জোয়ান লাঠি নিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এখনি তারা কাফেরের মাথা ভেঙ্গে দেবে। মৌলবী চাঁদার টাকাগুলি পকেটস্থ করে

সেখান থেকে সরে পড়লেন। খলিফার জন্যে যে লাঠি উঠেছিল তা যে কার মাথায় পড়লো তা তিনি দেখে যান নি, কিন্তু আমরা এখন তা দেখতে পাচ্ছি। এখন ইংরেজীওয়ালা মুসলমান বাবুরা নাচাচ্ছেন মৌলভীদের, আর মৌলভীরা নাচাচ্ছে গরীব মূর্খদের। তার ফল চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।"

রামমাণিক্য বল্লে—"দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর প্রতিকার কি ?"

গোঁসাইজী বললেন,—"বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখতে পার, কিন্তু যেখানে ভীষ্ম দ্রোণ হালে পানি পাচ্ছেন না, সেখানে শল্য বাবাজী যে বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারবেন বলে ত মনে হয় না। যেখানে মহাত্মা গান্ধী হার মেনে মৌন নিয়েছেন সেখানে আমার কথা-বলা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কি জান, ব্রাহ্মণের ছেলে আমি, শাস্ত্রটা একটু মানি। আমার মনে হয় গান্ধীজী শাস্ত্রটা না মেনে একটু ভুল করে' ফেলেছেন। নূতন পন্থা আবিষ্কার করতে না গিয়ে সনাতন শাস্ত্রে আমাদের মূর্খ বাবাজীদের জন্য যে ব্যবস্থা করে গেছেন, তা সোজাসুজি মেনে নিলে হয়ত এতদিন একটা কিছু হয়ে যেত।

রামমাণিক্য মাথা চুলকুতে চুলকুতে বল্লে—"তাই ত, তাই ত!"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

— ——

পরাজিতা

(উপন্যাস)

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

"যথা বাঁধ, যথা।

"যথা আবার কি?

"যথা জাননা? যাকে সাধুভাষায় বলে 'যূথ' বা 'যৌথ'। এই যে তোমাদের কবিরা আজন্ম 'যূথভ্রষ্টা' হরিণীর উপমা দিয়ে আসছেন, ব্যবসায়িক লেখকেরা আজকাল সংস্কৃত অভিধান খুঁজে খুঁজে 'যৌথ' কারবারের দোহাই মাচিয়ে তুলেছেন, পাঞ্জাবে তাকেই আপামর-সাধারণে বলে থাকে 'যথা'। 'যূথ' আর 'যৌথ'র চেয়ে 'যথা'র ভিতর একটা জোর আছে। সেই জোরটা আমি বাঙলায় আর বাঙ্গালীর ভিতর ঢোকাতে চাই। আমি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায়, সভামঞ্চে বাঙ্গলা বক্তৃতা দেবার সময়, মাসিকে দৈনিকে সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখতে বসে—সব জায়গাতেই 'যথা' কথাটা চালাব স্থির করেছি। এমনি করে করে এর মর্ম্মগত ভাবটা বাঙ্গালীর রক্তে ও কাজে ফুটে উঠবে।"

"তা যেন হল, এখন এস্থলে করা কি যায়? বিনোদকে এখন শত্রুদের চক্রান্ত থেকে বাঁচান যায় কেমন করে?"

"বিনোদকে বাঁচাবার জন্যেই ত বলছি। দলের বিরুদ্ধে একা কেউ কখন লড়ে জেতেনি, দলের বিরুদ্ধে দল বেঁধে লড়াই চাই। অর্গ্যানিজেশনের বিরুদ্ধে অর্গ্যানিজেশন চাই, সঙ্ঘের বিরুদ্ধে চাই সঙ্ঘ। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজকে আমি এই জন্যে বড় ভক্তি করি—ওরা যথাবাদী। 'সত্যার্থপ্রকাশ' আমি প্রায়ই পড়ি। দয়ানন্দ স্বামী দেখিয়েছেন, সত্য অহিংসাদি উপদেশকে আর্য্যরা গৌণ উপদেশ বলে জানতেন, তাঁরা আপনাদের সমাজরক্ষার পক্ষে—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' একেই মুখ্য উপদেশ মুখ্য ধর্ম্ম বলে চিনেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন। আজকালকার আর্য্যসমাজীরাও তাই করছে। আমাদেরও এস্থলে তাই করতে হবে।"

জমিদার বিনোদেন্দু রায়ের বৈঠকখানায় চারিবন্ধুর কথোপকথন হইতেছিল। প্রধান বক্তা বেঙ্গল কৌন্সিলের মেম্বর ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র নিয়োগী। এবার

তাঁর মেম্বরসিপ লইয়া কিছু গোল বাধিয়াছিল। একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হইয়াছিলেন। এ সঙ্কটে বিনোদেন্দুর সাহায্যের তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বিনোদেন্দু মনোহরগঞ্জের মস্ত বড় জমিদার। বছর কুড়িক হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। মিষ্টভাষে সদালাপে ও সদাচারে সর্ব্বলোকপ্রিয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিনোদেন্দু রায়ের প্রতিপত্তি নরেশের পাব্লিক জীবনে অনেক সময় অনেক কাজ দিয়াছে। কিন্তু সে সম্বাদ সর্ব্বজনবিদিত ছিলনা। এবার কৌন্সিলের মেম্বরশিপের ঝগড়ায় বিনোদেন্দু যে নরেশ নিয়োগীর পক্ষপাতী ও পৃষ্ঠপোষক এ কথা সম্পূর্ণ সাব্যস্ত ও লোকগোচর হইয়া গেল।

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী যে সে লোক নহেন, তিনি বিনোদেন্দুর ভগ্নীপতি, কালীচকের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা।

রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে বিনোদের বালবন্ধু, হাইকোর্টের উকীল। নরেশের কথার জবাবে তিনি বলিলেন—"সত্যার্থপ্রকাশ ত আমিও পড়েছি, কিন্তু আমি ত তার ভিতর এ তত্ত্ব পাইনি। যাহোক্ দল কি আমাদের নেই! বিনোদের বন্ধু-সংখ্যা কি কম? দল বেঁধে লড়তে বিনোদ কি পারেনা? কিন্তু বিনোদের বন্ধুদের অসুবিধে এই যে তারা ভদ্রলোক, মহেন্দ্র নারায়ণের লোকদের মত বিবেকহীন নয়, কোন নীচতার আশ্রয় নিতে পারে না তারা। এদিকে রাজার লোকেরা শত্রুর সর্ব্বনাশের জন্যে এমন জঘন্য উপায় নেই, এমন কোন মিথ্যে নেই, যা অবলম্বন করতে ছেড়েছে বা ছাড়বে।"

"রতিকান্ত বাবু! এ অকর্ম্মণ্য লোকের জবাব, দুর্ব্বল ব্যক্তির দোহাই, অক্ষমের আত্মোক্তি।"

"সে কি রকম?"

" 'বিবেক' শব্দটা যথাবাদীর অভিধান থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে। যথা পালন আমাদের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্যে সত্যদলন মিথ্যাপোষণ যখন যেটা দরকার পড়বে তাই করতে হবে। আজ জার্ম্মানীর কাছে বাকী সব য়ুরোপ হার মানছে কেন? জার্ম্মানী এই যথাধর্ম্ম চূড়ান্তরূপে আয়ত্ত করেছে. য়ুরোপের বাকী জাতিরা এখনও তাতে ঢের কাঁচা আছে। নিজের অস্তিত্বের জন্যে যথার অস্তিত্ব চাই, যথার অস্তিত্বের জন্যে সত্যমিথ্যা দুটোকেই গোলামীতে বাহাল রাখা চাই। আপনি দেখছি অ্যাটর্নি-উকীলের যৌথ কারবারের ব্যূহে এখনও প্রবেশাধিকার পাননি—নয়ত আমার কথাটা বুঝতে এত বেগ পেতে হত না।"

রতিকান্ত বাবু গরম হইয়া কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়া উদীয়মান্ কবি সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত হোহো করিয়া হাসিয়া, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ভরা মাথা হেলাইয়া বলিল —"বেশ যাহোক্। রতিকান্ত বাবু আপনি দেখছেন না, নরেশ বাবু মনের দুঃখে ব্যঙ্গ করে সব কথাগুলো

বলছেন, এ কি আর সত্যি, ওঁর সত্যিকার মনের ভাব যে আপনি রীতিমত খণ্ডন করতে উদ্যত হচ্ছেন।"

নরেশ বলিল—"সুধীন্দ্র তোমার নিতান্ত ভুল, আমি মোটেই ব্যঙ্গ করছিনে, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলছি। কথাগুলো একেবারে নিছক সত্য বলে জেনো। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পুরোণ সংস্কার উল্টে পাল্টে বদলে দেখতে হবে আমাদের।"

নৃপেন দত্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া একপাশে বসিয়া শুনিতেছিল। বিনোদেন্দু রায়ের অতিবড় ভক্ত। মুখে বেশী কথা নাই, কিন্তু বিনোদেন্দুর বিপদে অন্তর্দাহে জলিতেছে। নরেশ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন—নৃপেন গা ঝাঁকা দিয়া উঠিল, নরেশের সামনে আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"নরেশ বাবু, যথেষ্ট। যে পড়াটা পড়ালেন এতক্ষণ, মাথায় বেশ ভাল করে প্রবেশ করেছে। আমি আপনার ছাত্রত্ব স্বীকার করলুম! এখন কি করতে হবে বলুন। যথার চারজন ত আমরা এখানেই উপস্থিত। এখন সত্য মিথ্যা, নীচতা, উচ্চতার ভাগ করে দিন, সুধীন্দ্রকে সত্য ও উচ্চতা দেবেন।"

সুধীন্দ্র মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"আর নরেশ বাবু নিজে কি নেবেন?"

নৃপেন উত্তর করিল—"উনি আমাদের নেতা, মিথ্যার রাজা অংশ উনি গ্রহণ করবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রনারায়ণের প্রকৃতির সঙ্গে বিনোদেন্দুর প্রকৃতির একেবারে মিল ছিল না। প্রকৃতিগত প্রভেদ উভয়ের মধ্যে মনান্তরের বীজ বপন করিয়াছিল। রাজনৈতিক মতভেদে তাহা স্পষ্ট শক্রতার আকার ধারণ করিল। দেওয়ান রমাকান্ত রাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে বুঝাইল—শক্রতা চরিতার্থতার এমন মাহেন্দ্রক্ষণ দুশো বছরে আর জুটিবে কি না সন্দেহ। য়ুরোপে কুরুক্ষেত্র, ব্রিটিশ-রাজ্যে হুলস্থুল, সাম্রাজ্য-রক্ষাকারীদের চিত্তবিপ্লবে বুদ্ধি-বিভ্রাট, স্পেশাল ট্রিবিউনাল, ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, তার উপর কতকগুলো হতভাগা ছোঁড়ার অবিরাম পাপাচার—ডাকাতি ও গুপ্ত খুন,—এই সব কটা উপকরণ মিলাইয়া শক্রর সর্ব্বনাশসাধনের একটা অব্যর্থ টোট্‌কাও যদি গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে বৃথাই রমাকান্তের দেওয়ান-জন্ম-ধারণ।

শুধু যে প্রভুভক্তিবশতঃই রমাকান্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইল তাহা নহে। পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতঘ্নতার প্রবল কামনা তাহাকে বৎসরাবধি দগ্ধ করিতেছিল। মনোহরগঞ্জের জমিদারী কাছারীতে দশ বৎসর নায়েবীর কালে তিনবার তহবিল তছরূপের অপরাধে রমাকান্ত ধরা পড়ে। কিন্তু রমাকান্ত গ্রামের পুরোহিতের ছেলে, শৈশবে গ্রামস্কুলে বিনোদেন্দুর সঙ্গে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছে। বাল্য সহপাঠী

চাকর হইলেও এবং অপরাধী হইলেও বিনোদ তাহাকে চাকরের স্থায় দেখিতে পারিলেন না এবং অপরাধীর ন্যায় শাস্তি দিতে পারিলেন না। তাহার চাকরী বহাল রহিল এবং তহবিল ভাঙ্গার কথাটাও ঢাকা রহিল। শেষে গত বৎসর একটা জুগুপ্সাজনক ব্যাপারে গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার বিরূপ হওয়ায় তাহাকে আর রাখিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া বিদায় দিলেন। গ্রামের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাকে তাড়াইল, কিন্তু রমাকান্তের রাগের লক্ষ্য বিনোদেন্দু একাই হইলেন।

মনোহরগঞ্জের কাছারী হইতে বরখাস্ত হইয়া রমাকান্ত মহেন্দ্রনারায়ণের কাছে গিয়া জুটিল। এ পর্য্যন্ত বিনোদেন্দুর প্রতি মহেন্দ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ সম্পর্কে কোন অপ্রিয় ব্যবহার ছিল না। কিন্তু রমাকান্ত সেখানে দাখিল হওয়ার পর হইতেই ছোট ছোট উৎপাত আরম্ভ হইল।

তারপরে আসিল অকস্মাৎ য়ুরোপের যুদ্ধ-বিপ্লব, এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল বিনোদেন্দুর স্ত্রীর যক্ষ্মারোগ। ডাক্তারের আদেশে বিনোদ উর্ম্মিলাকে লইয়া করাচী গেলেন। করাচীর হাওয়া বন্দরে একটা প্রকাণ্ড বাঙ্গলায় ছয়মাস যাপন করিলেন। সমুদ্রে স্নান, সারাদিন খোলা হাওয়ায় যাপন, নিক্তির ওজনে পথ্য-সেবন—সবই চলিল। কিন্তু উর্ম্মিলার ওজন দিন দিন কমিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় উর্ম্মিলা প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। বিনোদ বুঝিলেন, এ চাঁদ অনন্তে লীন হইয়া যাইবে, একে ধরিয়া রাখিবার কোন আশা নাই—আর প্রবাসে থাকিয়া কি হইবে? কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সপ্তাহান্তে উর্ম্মিলা বিনোদেন্দুর গৃহ শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৌন্সিল-নির্ব্বাচনের দিন প্রায় সমাগত। নরেশ নিয়োগী দিন পনেরো ধরিয়া বিনোদেন্দুকে লইয়া তাঁর মোটরে সারাদিন সহর ও সহরতলীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই লোকের বাড়ী ভোট ভিক্ষা করিতে উপস্থিত। কোন কোন স্থলে নরেশ নিজেও যান না বিনোদেন্দুকেই একা পাঠাইয়া দেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ ও নরেশ নিয়োগীতে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, কার তীর লাগিয়া যায় এখনও বলা যায় না; দুজনেই সমান ক্ষিপ্রহস্ত, দুইজনেই মহারথী। কিন্তু নরেশই জিতিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণের তীর কানের কাছ দিয়া গেল, লক্ষ্য বিঁধিল না। নরেশ বিনোদেন্দুকে কৃষ্ণসারথি করিয়া জয়ী হইলেন।

তখন রমাকান্তের পরামর্শে মহেন্দ্র-নারায়ণ আর এক লক্ষ্যবেধের জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

নরেশের নির্ব্বাচনের জন্য সুপারিশের উত্তেজনা যখন থামিয়া গেল, বিনোদ দেহমনে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। উর্ম্মিলাকে হারাণর ক্ষত এতদিনে টাটাইয়া উঠিল। নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে যে এক শূন্যতা তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করে তার কেন্দ্রস্থলে একটা গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা কিরীচের মত কি যেন ঝকমক করিয়া ওঠে, —এই যেন তার বুকের উপর পড়ে-পড়ে।

বিনোদের একা ঘরে শুইতে ভয় করে। চাকর ঘরের বাহিরে বারান্দায় শোয়। ইচ্ছা করে তাকে বলেন ভিতরে মাদুর পাতিয়া শুক; কিন্তু লজ্জা করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরলা দেবী।

রবি-রশ্মি

—:•:—

দোল-পূর্ণিমা

দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা
হৃদয় আকাশে।
দোলফাগুনের চাঁদের আলোর
সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে,
বচনহারা ধ্যানের পারে,
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
ছিল ঢাকা সে।
দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
গোপন রেণুকা,
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে,
লাগ্‌ল যে রঙ্ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের তানে তানে
রইল আঁকা সে॥

(২)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বনবীথি
পাখীর কাকলি-গীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙার দিগন্ত।
বাণী মম নিলো তুলি'
পলাশের কুল-ধুলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমন্ত॥

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র, চৈত্র, ১৩৩২।

দীপালি-সঙ্ঘ

ঢাকা নারী-সভা

আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি—যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা' আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরীশোধের কথা নেই।

সংসারের আনন্দভাণ্ডারের ভার তা মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্য্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধস্পর্শে জীবনযাত্রার কঠোরতা ক্ষয় হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসন্তাপে শান্তি আনে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয় নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য্য আছে। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান। মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তাকে পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানাপ্রকার উদ্যম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে। যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যেবীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্য দূতগুলি অলক্ষ্য আকারে অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণনা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে।

আমাদের সংহিতাকাররা বলেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন

ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্ম-মূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তখন স্বাভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছে, গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। সেই সীমা আজ ভেঙে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান। আজ আমাদের আশ্রয় একান্ত-ভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়। আজ সমস্ত পুরাতন বাঁধ ভেঙে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে নূতন ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার ভার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে নিরন্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্ব্বে কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্ব্ব-মানবের মুক্তিদানব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এসিয়ার মরুবালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রীদূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণসাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহ-কর্ম্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করচি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি। এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র
চৈত্র, ১৩৩২।

মা

(গল্প)

—:০:—

বাঙ্গলায় হাহাকার উঠেচে। নির্দ্দয় সরকার বঙ্গজননীকে নির্ম্মমভাবে দু'খানা করে চিরতে উদ্যত হয়েছে। দেশে হুলস্থুল ব্যাপার। বঙ্গে একটা নূতন জাগরণ এল। নিদ্রিতদের যখন ঘুম ভাঙ্গল তারা জননীকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়াল, বড় বড় সভা সমিতি হতে আরম্ভ হ'ল, রকম বেরকমের গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হ'ল। তখন সরকারের রাগ জাগ্রত জাতির উপরেই পড়ল। শহরে শহরে, জিলায় জিলায়, গ্রামে গ্রামে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দেশের ছেলের বুকে সাড়া পড়ল। যুবক-সম্প্রদায়ে নব জীবনের প্রবাহ ছুটল। মায়ের বন্ধন মুক্ত করবার জন্য তারা প্রাণ ঢেলে দিল।

সে এক অপূর্ব্ব সাড়া পড়ে গেল। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক বাসায় বাসায় একটি, দুটি, তিনটী করে যুবক নীরবে ও অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করল।

সেই সময়ে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে একটি গৃহস্থের পরিবারেও সে সাড়ার প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্ল।

(২)

এই পরিবারে শুধু চারটী প্রাণী। মা সাবিত্রী ও তাঁর তিনটী সন্তান, চিত্তরঞ্জন, প্রমোদরঞ্জন ও হৃদিরঞ্জন। চিত্ত সে-বার I. Sc. দিয়েছে এবং সরকারী বৃত্তিও পাবার আশা আছে। প্রমোদ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করে' উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ করেছে।

হৃদি এখনও নিতান্ত শিশু, পড়াশুনার বেশী ধার ধারে না, শুধু মায়ের হৃদিরঞ্জন করে।

এই কটি প্রাণীর দিন খুব সুখেই কাটছিল, হঠাৎ শান্তিরক্ষক গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি এই গ্রামের উপর পড়ল, অনেক ঘর দুয়ারে খানাতল্লাসি হ'ল, অনেক ধরপাকড় হ'ল অনেকের হাতে হাতকড়ি দিয়ে কলকাতায় চালান করা হ'ল। চিত্তও তাদের মধ্যে একজন।

এই শান্ত পরিবারের সব সুখ ঝড়ের মত কোথায় উড়ে গেল। বিনা মেঘে

বজ্রপাতে সাবিত্রী মুহূর্ত্তের জন্যে পীড়িত হলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মসম্বরণ করে' ছেলেকে হাসিমুখেই বিদায় দিলেন এবং বললেন "আমার সৌভাগ্য—আমার ছেলে তার দেশ-জননী, তার জনক-জননীর জননী বঙ্গ-জননীর জন্য পরদেশীয় সরকারের হাতে বন্দী হয়ে হয়ত মৃত্যু-পথেই অগ্রসর হয়েছে"—আর বলতে পারলেন না।

* * *

বিচার শেষ হলো, চিত্তর কালাপানির হুকুম হ'ল, তবুও বীরপুত্রের বীর জননী বীর রমণীর ন্যায় ব্যবহার করলেন। সেই হৃদয়-বিদারী সংবাদ হাসিমুখে শ্রবণ করলেন।

(৩)

মহাযুদ্ধ বেধেছে, জার্ম্মাণী ও তুর্কী একদিকে এবং সমস্ত পৃথিবী অন্যদিকে। খুব জোরে যুদ্ধ চলেছে ভারতবর্ষ টাকা, অন্ন-বস্ত্র সৈনিক সব যোগাড় করে দিচ্ছে। পাঞ্জাবের যোদ্ধা প্রায় সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। গুরখারা তাদের অদ্ভুত পরাক্রমের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করে তুলেছে। চারিদিকে রণডঙ্কা বেজেছে, 'সাজ সাজ' রব উঠেছে। যে বাঙ্গালীর উপর অত জুলুম হ'ল তারাও বিপদের সময় সেই গভর্ণমেণ্টকে প্রাণপণে সাহায্য করতে আরম্ভ করল। To forgive is divine—বাঙ্গালীর কাপুরুষ অপবাদ ঘুচল, ডবল কম্পানী তৈরী হ'ল, তারা যুদ্ধ করতে যাবে।

আগেই মা এক ছেলেকে হারিয়েছেন, আবার বুঝি আর একজনকে হারান! হায় বিধি! এই কি তোমার বিধান! কাঁচা ঘাতেই আবার আঘাত কর! প্রমোদও সৈনিক-দলভুক্ত হ'য়ে যুদ্ধ-যাত্রা করল।

"আহা কোন্ জননীর কোলের ধনরে
কাদের বুকের ভাতি
সবার মাথা উচ্চ হ'ল
তোরা পাতলি ছাতি"—

তার জননীর বুক গর্ব্বে ভরে উঠল, কিন্তু এবার তিনি আর ততটা ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। দুই বৎসরের বেশী হয়ে গেল চিত্তর কোন সংবাদ আসেনি। তাঁর শরীর ভেঙ্গে এসেছিল, আরও ভেঙ্গে গেল।

এখন কেবল একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্র হৃদি তাঁর কাছে রইল। সে এখন বড় হয়েছে, কিন্তু তার বয়সের পক্ষে সে এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কে জানে বিধি এর জন্যে অদৃষ্টর ভাণ্ডারে কি সম্পদ রেখেছেন।

(৪)

'বোলো মহাত্মা গান্ধী কি জয়," এই রবে সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছে। দেশ গত যুদ্ধে যে সাহায্য করেছিল তার পুরস্কারস্বরূপ ডায়ার ও ওডায়ারে মিলে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিনা ব্যয়ে তিন হাজার নিরীহ বালক-বৃদ্ধ-যুবাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

অসহযোগ খুব জোরে চলেছে, গভর্ণমেণ্ট রীতিমত ভয় পেয়েছে, এবার বুঝি তাদের হাটপাট তুলতে হয়। রাজকুমার

ভারতবর্ষে বেড়াতে আসছেন। সরকারী মহলে ধুমধাম পড়ে গেছে, কিন্তু দেশের লোক একেবারে উদাসীন।

"হরতাল! হরতাল! ২৪ তারিখে হরতাল"! এই বলে কলকাতা সহরময় স্বেচ্ছাসেবকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের ঘুরে বেশী কষ্ট পেতে না হয় বলে নিজেদের অতিথিশালায় তাদের নিয়ে গিয়ে মহা সমারোহে রাখছে।

মায়ের কোলের ছেলে, বুকের সন্তান হৃদিরও এইবার ডাক পড়ল। সেও দেশের এই মহা আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চিত্ত আন্দামানে জীবন্মৃত; প্রমোদের শেষ খবর এই—ভুলক্রমে শত্রু-সীমানায় পদার্পণ করায় তুর্কী কারাগারে বন্দী। যুদ্ধ-শেষে শান্তি-স্থাপন হল, কিন্তু প্রমোদ ফিরে এল না জীবিত কি মৃত কেউ বলতে পারলে না।

গোধূলির সময় মা তাঁর রোগ-শয্যায় শয়ান ছিলেন। ঝড়ের মত দৌড়ে এসে হৃদিরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"মা আর সহ্য করতে পারিনে, এত অপমান এত অত্যাচার-কাহিনী রোজ পড়ে পড়ে আর চুপ করে নিজের স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারিনে। কত ছেলে যাচ্ছে আজ। মা তোমার সেবার জন্ম আটকে থাকাও আজ আমার যেন স্বার্থপরতা মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছিনে মা কি করা উচিৎ! তুমিই বল তোমায় ছেড়ে দেশ-জননীর অপমান ঘোচাতে যাই কিনা; সোনাপিসি তোমার সেবা করতে পারবে কি? ভুলোদাদাকে বলে যাব, সে রোজ একবার করে খবর নেবে, ওষুধ পত্র এনে দেবে, যাব কি মা?"

মা তাকে অনুমতি দিতে দ্বিধা বোধ করলেন না, নিজের জন্যে আটকিয়ে রাখলেন না। স্নেহের চেয়ে কর্ত্তব্যকে বড় বলে জানলেন। দেশের জন্ম সব বিসর্জ্জন দিলেন। এই শেষ-ছেলেটিকে কাছ ছাড়া করতে বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখে হেসে হৃদির কপালে চুমো খেয়ে বল্লেন—"যাও বাবা যাও, যাও আমার প্রাণ, আমার ধন, আমার গৌরব—দেশ-মায়ের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ কর, আমার জন্যে ভেবোনা। ভগবান আমার জন্যে যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন"!

হৃদির ছয় মাসের কারাদণ্ড হ'ল। অতি কষ্টে তিনটী মাস মা জীবিত রইলেন। প্রতি হাওয়ার দমকায়, গাছের পাতায় সরসরানিতে, দোর জানালার নড়া-চড়ায়, কখনো বা চিত্ত কখনো হৃদির পায়ের শব্দ পেয়ে মা চমকে চমকে উঠতেন। এমনি করে তিনটি মাসের শেষে তাঁর প্রাণ-বায়ু নিঃশেষিত হ'ল। পুত্র-বিরহ-তাপের অতীত হ'য়ে তিনি বৈকুণ্ঠে প্রয়ান করলেন।

আলোক।

উপন্যাসের প্লট

(উপন্যাস)

—:•••:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালিকাবিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত বোর্ডিং বাড়ীর একটী ত্রিতলস্থ কক্ষে দুইটী পরীক্ষার্থিনী বালিকা একমনে খাতা পেন্সিল লইয়া অঙ্ক কষিতেছিল। একজন উহারই ভিতর দু'একবার অসহিষ্ণু হইয়া লেখা বন্ধ করিয়া বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া উঠিল, এবং অঙ্কটীর আগাগোড়া ভুল হইয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ সংশোধিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, একবার বিরক্ত হইয়া পেন্সিলটা ছুঁড়িয়া ফেলিল, এবং মুখখানা অন্ধকার করিয়া কুঞ্চিত চক্ষে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকিল, তারপর আবার পেন্সিল কুড়াইয়া লইয়া অঙ্কটীর প্রতি পুনঃ মনোনিবেশ করিল। অপর বালিকাটী সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য সহ নিজ কার্য্যেই রত ছিল; সঙ্গিনীর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলেও সে যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমনি ভাবেই যথাকার্য্যে নিরত থাকিল।

প্রথমা বালিকা দু'একটা অঙ্ক কষা বাকি রাখিয়াই উঠিয়া পড়িল, সখীটীর দিকে ফিরিয়া দেখিল, সে আবার একটা নূতন অঙ্কের পত্তন করিতেছে, ক্ষিপ্র চরণে আসিয়া তার হাত হইতে খাতাখানা ফস্ করিয়া টানিয়া লইল, "বাঃ রে? আরও এখনও বুঝি পারা যায়? আয় ভাই, একটু গল্প করি! কবে যে এ ছায়ের এগ্‌জামিন শেষ হবে! বাপ্‌রে বাপ! হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়। শেষ করে' উঠবি? ই! তা' আর নয়! তা'হলে আমাদেরও শেষ হয়ে যা'বে। আয় আয়, একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়া যাক্, আয়!"

"তোমার সঙ্গে পারা যাবে না তো রবি! তুমি যেন একটা জীবন্ত ঝড়!" প্রথমা মেয়েটী এই মন্তব্যে মৃদু হাসিয়া—দ্বিতীয়ার গাল টিপিয়া ধরিল, "তাই তো মলয়াটুকুকে যখন তখন উড়িয়ে নিই! ওরে বেঁচে গেলি, হা বুঝ্‌তে পারলিনে, নিশ্চয়ই তোর আঙ্গুল ব্যথা আর ঘাড় টন্ টন্ করছিল, বল্ করছিল কি না?"

সঙ্গিনীর জবরদস্তিতে মলয়া হাসিয়া ফেলিয়া ইহা স্বীকার করিয়া লইল। তারপর একখানা খাটেই দুজনে পাশাপাশি শুইয়া পড়িয়া কহিল "করলেই বা কি? পাশটা কোন রকমে করে ওঠা চাই!

আরতো বেশী দেরীও নেই ভাই, বেশী করে না পরিশ্রম কর্‌লে হবে কেন ?"

রবির আসল নাম করবী। করবী তার সূক্ষ্ম ও সুললিত ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে টানিয়া তার বিশাল ও ঘন তারক চোখ দুইটাকে বিস্তৃত করিয়া অবজ্ঞাসূচক স্বরে উত্তর করিল "তা বলে' তো আর পড়ে পড়ে মারা যেতে পারিনে !"

মলয়া হাসিল, "মেয়েতো বড়ই পড়েন তাই পড়ে পড়ে মারা যাচ্ছেন ! ভাগ্যিস্ ভগবান মাথাটা অমন শক্তরে দিয়েছিলেন, তাই, নইলে তোর যে কি দশা হতো ! যা তুই চঞ্চল !"

করবী ঠোঁট ফুলাইয়া উত্তর করিল "কি আর মন্দ দশাটা হতো ! যা, হাজার হাজার বাঙ্গালী মেয়েদের হয়, না হয় তাই হতো আর কি ? এতদিনে একটা বর জুটে যেত, শ্বশুরবাড়ী যেতুম, একরাশ গয়না হতো, ভাল ভাল বেনারসী পার্শী ঢাকাই কাশ্মিরী বোম্বাই সাড়ীর গাদা, এবেলা একখানা তো ওবেলা এক খানা ভেঙে ভেঙে পরতুম—"

বাধা দিয়া সরলা সলজ্জ তিরস্কারে বলিয়া উঠিল—"যাঃ, যাঃ, ভারীতো লাভ দেখাচ্ছেন ! আর শ্বশুরবাড়ীতে যে ঘোমটা টেনে বড়াই বুড়ি হ'য়ে বেড়াতে হতো। গাদা গাদা থালামাজা, শুপুরী কাটা, কুটনো কোটা, হয়ত ভাত রান্না সখড়ী পাড়া, না পারলে শাশুড়ীর হাতের ঠোনা ঠানা !"

"হুঁ, আর ওর ভালর দিক্‌টা বুঝি বাদ পড়ে যাবে ? সেটা যে একবারও বল্লিনে বড় ?" মলয়া ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল "যা ভালই নয়, তার আবার ভাল ! কি ভাল টা শুনি ?" করবী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল "কেন বর ! বরটার কথা বেমালুম চেপে গেলি যে বড় ?" বরের মতন ভাল আর জগতে কি আছে ?"

মলয়া আঁৎকাইয়া উঠার অভিনয় করিয়া সত্রাসে কহিল "ও বাবা ! ওই জিনিসটার কথা মনে হলেই আমার তো হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় ! কেমন করেই মেয়েরা ভাই ওটাকে সহ্য করে, আমিতো তার কোন কিনারাই খুঁজে পাইনে।"

এই কথা শুনিয়া করবী একেবারে উচ্চ মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া মলয়ার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং হাসির ধমকে বেদম হইয়া পড়িয়াও কহিতে লাগিল "আমি কিন্তু ভাই, বর জিনিসটাকে বড্ডই পছন্দ করি, সত্যি করে বল্‌ছি তোকে, মনের মতন পেলে একটাকে এখুনি আমি নিতে রাজী আছি।"

মলয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া সবেগে উহাকে ঠেলিয়া দিল, সকোপে কহিল—"ধেৎ !"

করবী উহাকে জড়াইয়া থাকিয়া ক্রমাগতই হাসিতে লাগিল—কহিল "কেন, মন্দটা কি ? একটা জলজ্যান্ত জোয়ান্ পুরুষ মানুষ আবার দিকে অবিশ্যেয়ে

চোখে চেয়ে থাকবে, আমার কথায় উঠ্‌বোস্‌ করবে, তার চিরদিনের সকল প্রাণ সকল চেষ্টায় উপার্জিত যথাসর্বস্ব আমারই এই পায়ের তলায় সমর্পণ করে রেখে। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি এর চেয়ে আর কি সুখের আছে? মজার আছে?"

মলয়া একটুখানি নীরব থাকিয়া কহিল "আমি তো ভাই ওকথা ভাব্‌তেও পারলুম না। আমার ঐজন্যে নভেল পড়তেই ভাল লাগে না। প্রত্যেকখানা নভেলের মধ্যেই দেখতে পাই যে সেখানে এক একটা নায়িকার প্রায়ই দু দুটো করে নায়ক জুটেছে। আর তাদের মধ্যে একটা না একটা হয় 'ডুয়েলে' প্রাণ দিচ্ছে, না হয় বিবাগী হয়ে চলে গেল, না হয় 'সুইসাইড্‌' করলে কিছু না কিছু একটা বিভ্রাট না ঘটিয়ে ছাড়লো অথচ মেয়েটা দিব্যি ফূর্ত্তি করে অপরটাকে বিয়ে করে নিয়ে বেড়াতে লাগল। বাপ্‌রে বাপ! আমি ওসব ভালবাসিনে বাপু, পুরুষ মানুষের মধ্যে বাবা কাকা আর ঠাকুর্দা দাদাইই যা ভাল। তাও ঠাকুর্দা যা ঠাট্টা করে সে কিন্তু ভাই মোটেই ভাল নয়, বাইরের পুরুষদের আমি দু'চক্ষে পড়ে দেখতে পারি নে। একটা মেয়ে দেখলে তারা যেন হাঁ করে গিলতে আসে। কেন রে বাবা! আমরা কি সন্দেশ?"

কমলী কহিল "কে তোর নাম মলয়া রেখেছিল। তোর নাম রাখা উচিত ছিল, [illegible] না হয় তো [illegible]। আমার জন্ম যদি কেউ 'ডুয়েল' লড়ে মরে, আমি তো মনে করবো আমার মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মানোটাই সফল হলো। যে নভেল-গুলোয় ঐ রকম সব নায়কদের কথা থাকে আমি সেগুলো বেছে বেছে নিয়ে পড়ি। যতই বল বাপু, এটা কিন্তু সবাইকেই স্বীকার করতে হবে যে, যখন থেকে জগতে নর এবং নারীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই সুন্দরী নারীর রূপের জন্য পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে একটা মহা সংঘাত বরাবরই চলে আসচে, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় বড় যুদ্ধগুলো, অবশ্য পুরাতন কালের সমস্তই নারী-সৌন্দর্য্যের অধিকার নিয়েই ঘটেছিল। ট্রয়ের যুদ্ধ, রামায়ণের, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর, রুক্মিণী, সুভদ্রা আর সেদিনও ওই পদ্মিনী নিয়ে এ সবই দেখ রূপসীর রূপের জন্য! আহা আমি যদি সেই সব সুবর্ণ-যুগে জন্মাতুম, আর তেমনি রূপসী হতুম! অন্ততঃ পদ্মিনী বা নূরজাহানের মতনও—যদি কোন আলাউদ্দিন বা জাহাঙ্গীর আমার জন্য কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়ে মারকাট ধ্বংস করে আমায় পেতে চাইতো। তা' না কি ছায়ের দিন বল দেখি?" মলয়া এবার বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিল—"তুই কি ভাই? নানা ওসব কথা নিয়ে হাসি করাও ভাল না, থাম। বাবা আমার জন্যে—এই চ্যাপসা কালো চেহারার জন্যে—কেউ অবশ্য কোন দিনই কাটাকাটি মারামারি করে মরেওনি, আর কোনও দিনই মরবেও না' জানি, তবু এমনি কথায় কথায় বলছি যদি তা' মরতো, তাহলে

আমিতো কোন মতে একটা দিনও আর বাঁচতে পারতুম না। উঃ মনে হলেও যেন গা কেঁপে যায়। না রব্‌, তুই ভাই, তখন সবটাতেই কল্পনা মনে আনিস্‌নে যতই হোক আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে।"

করবী তার পাতলা রাঙা ঠোঁট গভীর ভাবে উল্টাইয়া ক্রোধাভিনয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিল "এ মেয়েটাকে কেউ শূলে চড়ায় না। দেখ মলি! ঐ করে করেই তোরা এই জাতটাকে উঠ্‌তে দিবিনে। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, আর ওরা সব বাঙ্গালীর ছেলে অতএব আমাদের এক একখানি ফুলের বিছানা বা সান্ন্যাতিক রোগীর মতন হাওয়ার গদী পেতে শুয়ে থাকাই শ্রেয়, আর চারটী চারটী পোরের ভাত বা সাবুদানা চুক্‌ চুক্‌ করে খেতুম, ভাজা মাছখানিকে যদি কেউ উল্টে খেয়েছি ত অমনি গেছি! এমন করে জীবনপাত করলে সমাজের চিরবদ্ধ ডিসিপ্লিন নষ্ট না হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাতে করে কখন কারু জীবন গড়ে না। যাদের প্রাণধারণ করবার জন্যই আহার, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্যই পুত্র, চাকরী করবার জন্যই শুধু বিদ্যালাভ, তাদের সমস্ত শক্তি সকল কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাই তো ছেলেবেলা থেকে বাড়ীর মধ্যে ঘেরা হয়ে গেছে, তার বাইরে ইহলোকে তাদের কোন বড় কাজ করবার অধিকারই বা কোথায়? আর পরলোকে? তা'ও আমার সন্দেহ হয় যে, কচিবেলা থেকে যারা শুধু নিক্তির ওজনে মেপে মেপে চলেছে, ফিরেছে, খেয়েছে, পড়েছে চিরদিন সেই খাপের মধ্যে থাকিয়েই চাকরী করা আর সংসার-ধর্ম পালন করা যাদের অভ্যাস হয়েছে, সেই জন্যেই যদি তারা পরকালের চিন্তাটাতেও অভ্যস্ত থাকে, তবে সেটাও ইহকালের মতই খুব বেশী দূর এগোয় না। পরলোকের সুখটা যদি অতই সহজ সত্য হোত যে, যথানিয়মে একবার কেউ চোখ বুজে নিরাকারকে চিন্তা করলেন বা ডাকলেন, কেউ বা কোনমতে অবসর করে নিয়ে দুটো শুকনো বেলপাতা আর তাজা ফুল ঝুপ ঝাপ করে সাকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাজ সারলেন, তাতেই সে দিকের পথটা সাফা হয়ে রইলো, তাহলে এ পৃথিবীটায় এতদিনে মানুষের বদলে কেবল গোটাকতক ফড়িং চরে বেড়াতে দেখা যেত, মানুষগুলো সব ভগবানের ঘরের মধ্যে জটলা পাকিয়ে তাঁরই মূর্ত্তি ধরে ধরে বসে যেত। তা' নয় গো ভাই—গোপালের মতন ভাল ছেলে হলে বাঙালী মা বাপদের সুবিধা হয় বটে কিন্তু তাতে জাতির ইহকালের বিশেষ সুবিধা হয় না।"

"তাহলেই বেণীর মত দুরন্ত বালকেরাই তোমার মতে জাতির উদ্ধার-কর্ত্তা?" মলয়ার মুখখানি গভীর গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আসিল।

করবী বলিল "তা আমার মতে হয় কতকটা তাই বটে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি মিলিয়ে নে, ধরো; তৈমুরলঙ্গ, নাদিরশা, শেরশাহ; আর দেখ লর্ড ক্লাইব যার দুরন্তপনায় বাপমায় অস্থির হয়ে যাকে সাতসমুদ্র তের নদী পারে

তার আত্মীয়রা মিলে ঠেলে দিলে যে মরে মরুক, বাঁচে বাঁচুক, যাহোক একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যায়, যাক সেই অশান্ত দুরন্ত ছেলে এসে এতবড় সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করলে।"

"তাহোক ভাই ওই শোন তো চারুদির জুতোর শব্দ না? এক্ষনি এসে কতকগুলো বকুনি দেবেন, তোর ভরসা থাকে তুই শুয়ে থাক আমি উঠে পড়লুম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বীরভূম অধিবেশনে একটি বিষয়ে তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণপ্রমুখ কতিপয় সদস্যের উৎসাহে একটি প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল যে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি যেমন কয়েক বর্ষ হইতে সম্মিলনের দ্বারাই মনোনীত হন, সেইরূপ বাকী তিন শাখার সভাপতিও উপস্থিত সম্মিলনে মনোনীত হউন, তাঁহাদের মনোনয়ন পরবর্তী সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির অধিকারভুক্ত না থাকুক। ইহাতে ঘোরতর গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।

প্রস্তাবের পক্ষীয় লোকেরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন যে এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মনোনীত হওয়ায় বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। সভাপতি বাছা বাছা বিশেষজ্ঞকে সম্বৎসর-ব্যাপী তাগাদার অবসর প্রাপ্ত হওয়ায় বিজ্ঞান শাখায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ হইয়াছে। আপত্তিকারীগণ প্রকারান্তরে বলেন, এ কেবল সম্মিলনের মফস্বলবাসী উদ্যোগীদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদের একটি ক্ষুদ্র দলের হাতে ক্ষমতা রাখার চক্রান্ত। যে জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সে জেলার সাহিত্যিকেরা সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যিকগণকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিবেন, অতিথিগণের

অভ্যর্থনা ও সংকারের জন্য ধনব্যয় করিবেন, তাঁহাদের নিজ মনোমত সভাপতিবৃন্দ নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে না, সে অধিকার ন্যস্ত হইবে খোলা সম্মিলনের উপর যাহা পরিষদের দলে ভারি—ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা নহে।

কার্য্যসৌকর্য্যের যুক্তির উত্তরে তাঁহারা বলেন—অধিকাংশ লোকেই জানে না বিজ্ঞানশাখায় কিরূপ প্রবন্ধাদি আসিয়াছে এবং তাহা এক বৎসরের তাগাদা-প্রসূত কি না, কারণ বিজ্ঞানশাখার বৈঠক সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে স্বতন্ত্রভাবে বসিয়াছে এবং সেখানে শ্রোতৃবৃন্দ মুষ্টিমেয় মাত্র ছিল।

* * *

প্রতি শাখায় পঠিত প্রবন্ধাবলী কাহার জিম্মায় যাওয়া উচিত ইহা লইয়াও মতভেদ হয়। সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষরা দাবী করেন পঠিত প্রবন্ধে তাঁহাদের অধিকার, অভ্যর্থনা-সমিতি দাবী করেন উহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির অধিকার। এ সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম যদি কিছু থাকে তাহা সকলের জানা উচিত, না থাকিলে নিয়মাবলী প্রস্তুত হওয়া উচিত, নতুবা কোনো দিনও ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইবে না।

* * *

সাহিত্য পরিষদের সহিত সাহিত্য সম্মিলনের সম্বন্ধটাও স্পষ্টীকৃত করার প্রয়োজন। সাহিত্যপরিষদ সাহিত্যসম্মিলনকে তাঁহাদের মোতায়েন মনে করেন, কিন্তু সম্মিলনের কর্তৃপক্ষরা তাহা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে সাহিত্যপরিষদের নিকট লেখা-পড়ায় যদি কোন দাবী থাকে তবে তাহা বাহির করা উচিত, নতুবা দাবী ছাড়িয়া দেওয়াই শোভন হইবে।

বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা

এবারকার কলিকাতার দাঙ্গা ও বাঙ্গলার মফস্বলের দাঙ্গায় রূপভেদ আছে। কলিকাতার দাঙ্গায় হিন্দু যেমন উৎপীড়িত হইয়াছে তেমনি উৎপীড়নও করিয়াছে, মূসার আইন অবলম্বন করিয়াছে, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়াইয়াছে। 'মাইল্ড' বা মোলায়েম হিন্দুর ভিতর এত নৃশংসতা থাকিতে পারে তাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু যে হিন্দু এরূপ পাশবিকতা দেখাইয়াছে সে গুণ্ডা, গুণ্ডার হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ নাই—গুণ্ডার একই জাতি, সে গুণ্ডা।

আর একদল হিন্দু এবার জগতের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সে নির্ভীক হিন্দু, বীর হিন্দু—যে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, পররক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্র সুর যে দলের প্রতিনিধি।

যে সকল যুবকেরা দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি কালীতলায় পাহারা দিয়াছে, নিজেদের পাড়ায় পাড়ায় রক্ষীর কাজ করিয়াছে, মুসলমান গুণ্ডার হাত হইতে নিরীহ হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে,—

হিন্দু অত্যাচারীর হাত হইতে নির্দ্দোষী মুসলমান ভাইকে বাঁচাইয়াছে,—তাহারা ধন্য। বঙ্গমাতা এতদিনে আবার বীর-মাতা আখ্যার যোগ্যা হইলেন।

* * *

কলিকাতায় মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবি ও বাঙ্গালী এই কয়বিধ হিন্দুর সংযোগে হিন্দু বলপুষ্ট হইয়াছিল এবং পরস্পরে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছিল। কলিকাতায় বিভিন্ন হিন্দুগণ স্বতঃই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 'হিন্দুসঙ্ঘ' এই শব্দটি এতদিনে বাঙ্গলার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করাইয়াছে।

মফস্বলে তাহা হয় নাই। মফস্বলে শুধু বাঙ্গালী হিন্দুই নির্য্যাতিত হইয়াছে—এবং কোন কোন স্থলে—যেমন ঢাকায়—বাঙ্গালী হিন্দু নির্লজ্জভাবে কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের প্রধান নাড়ী রাজধানী কলিকাতা বাহিয়া উহার প্রতি ছোট ছোট নাড়ী ও শিরা উপশিরায় বীরত্বের প্রবাহ সঞ্চারণ করান আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। আজ সেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের নাম ডুবাইয়াছে। এ কলঙ্কের দাগ শীঘ্র মুছিবার নয়।

* * *

অপ্রতা সৌজন্য প্রভৃতি রক্ষার চেষ্টায় ঢাক ঢাক গুড় গুড় সত্বেও এই দাঙ্গার পিছনে দুইটী মুসলমান নেতার নাম বাহির হইয়া আসিয়াছে—সে দুটী শ্বশুর ও জামাতা আবদুর রহিম ও সৈয়দ সুহরবর্দি। সুহরবর্দি কর্পোরেসনের ডেপুটি মেয়র, মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্থলে দাঙ্গা-নিবারণ-কল্পে ক্ষমতা অনেক। উদারহৃদয় হিন্দু মেয়র তাঁর ক্ষমতা হিন্দু-রক্ষা-কল্পে কতদূর ব্যবহার করিয়াছেন জানা নাই. কিন্তু মুসলমান ডেপুটি মেয়র যে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে অপক্ষপাত দেখান নাই, মস্লিম গোঁড়ামী-উত্তেজনা ও অবাধ-হিন্দু-পীড়নের সুযোগ নিজ হস্তে খুলিয়া দিয়াছেন, তৎকল্পে ডেপুটীমেয়রী ক্ষমতা নির্ভীক ও নিপুণ হস্তে পরিচালন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে।

* * *

কলিকাতায় একটি বঙ্গীয় যুবক-সম্মিলনী আছে—তার সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী ও অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেন। ইহার সভাপতি সৈয়দ সুহরবর্দি। যতদূর জানা আছে ইহার সভ্যগণ সকলেই হিন্দু যুবক। মেম্বরের খাতায় যদি বা কোন মুসলমান যুবকের নাম থাকে, কার্য্যকালে তাঁহাদের কোন দিন দেখা গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

সৈয়দ সুহরবর্দি যতদিন দেশপ্রীতির মুখোস পরিয়া ছিলেন ততদিন বাঙ্গলার যুবকসম্প্রদায় তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তাঁর অধুনাতন কার্য্য কলাপ যদি তাঁহার দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা হয় তবে মনে হয়, সুহরবর্দি সাহেব নিজে যাহাই মনে করুন না কেন বাঙ্গলার

[আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

হিন্দুগৌরব চন্দ্রকান্ত দেব

গত ১৪ই বৈশাখ মঙ্গলবারে মুসলমান-আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন। বয়স ২৪ বৎসর। নিবাস—ত্রিপুরার অন্তর্গত নবিনগর। সংসারে বৃদ্ধা মাতা এবং দশ বৎসরের একটি ভাই আছেন। সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

যুবক-সম্প্রদায় কখনই তাহা সমর্থন করিবেনা। আমরা জানি বাঙ্গলার তরুণ নেতার আদেশে প্রয়োজন হইলে হাসিতে হাসিতে ফাঁসী পরিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কখনই সমর্থন করিতে পারে না, নামকেবাস্তেই হোক যে কারণেই হোক সুহ্‌রবর্দি সাহেব এতদিন বাঙ্গলার যুবকদের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাহাদের প্রাণে যে বিষম আঘাত দিয়াছেন তাহার ফলে তাঁর নেতৃত্বের ব্যবসা আর চলিবে না।

মসজিদ ও মন্দির

মুসলমানরা মন্দির চিরকালই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাহার বিধি আছে কি না জানি না, কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মুসলমান ধর্ম্মধ্বজীরা পরধর্ম্মের অবমাননা অকাতরে করিয়া আসিতেছে। হিন্দু সচরাচর কাহারও ধর্ম্মে আঘাত করে না, কারো ধর্ম্মস্থানের অবমাননা করে না। এক পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং মসজিদের জায়গায় মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন, আর এই এবারকার দাঙ্গায় কোথাও কোথাও প্রতিশোধরূপে হিন্দুরা মসজিদ ভাঙ্গিয়াছে শুনা যায়, এবং পীরের আসনে শিবমূর্ত্তি বসাইয়াছে। হিন্দুদের এই মনোবিকার কেন হইল? অতি-লাঞ্ছনার ফলে।

ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, মন্দিরেও আছেন, মসজিদেও আছেন; ঘটেও আছেন, পটেও আছেন, আকাশেও আছেন, আবার হৃদয়-কন্দরেও আছেন; মসজিদ ভাঙ্গিলে বা মন্দির ভাঙ্গিলে তাঁকে ভাঙ্গা হয় না, বা তাঁর অবমাননা হয় না—বুকে ঘা দেওয়া হয় ও অবমাননা করা হয় বিশ্বাসীর,—মন্দিরের বেলায় যে হিন্দু বিশ্বাস করে ঐ মন্দির আশ্রয় করিয়া সর্ব্বশক্তিমান তার ভক্তির আবেদন শ্রবণ করেন, তার; এবং মসজিদের বেলায় যে মুসলমান বিশ্বাস করে ঐ ইমারতের মধ্য হইতে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর তার চিত্তে আবির্ভূত হন,—তার।

যদি কোন মুসলমান একা একা বা দল বাঁধিয়া বারবার কোন হিন্দুকে তার বিশ্বাসের স্থলে আঘাত করে, তবে কোন-না কোন দিন তার প্রতি-আঘাতের বৃত্তি উদ্রিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলমানকে পরলাঞ্ছনা-বৃত্তি ত্যাগ দিতে হইবে, নয়ত প্রতিলাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রকৃতির আদালতে একতরফা ডিক্রী চিরকাল থাকিবে না, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনেও নয়।

টেগার্ট ও পূর্ণ লাহিড়ী

বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে, মানুষ চিনিবার ক্ষমতায় ও গুণগ্রাহিতায় হীন নহে। পুলিস কর্ম্মচারীদের প্রতি বিশেষতঃ টেগার্ট সাহেব এবং তাঁর ডিপার্টমেণ্টের প্রতি অত্যধিক প্রণয়বান্ না হইলেও আজ

[আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

হিন্দুগৌরব যতীন্দ্রনাথ সুর

মেছুয়াবাজার দাঙ্গায় অন্যতম বীরযুবক যতীন্দ্রনাথ একাকী অগণিত মুসলমান দাঙ্গাকারীর সম্মুখীন হইয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। পুলিশের গুলিতে ইহাঁরও প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলশী। সংসারে, বিধবা স্ত্রী বিধবা ভগ্নী ও দুইটি ছোট ভাই বর্ত্তমান।

সকলেই এক বাক্যে টেগার্টের ও পূর্ণ লাহিড়ীর গুণানুবাদ করিতেছে। সকলেই বলিতেছে এই দুই সুদক্ষ অভিজ্ঞ পুলিস-কর্তার হাতে গুণ্ডাদমন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুসিদ্ধ হইত, যদি টেগার্ট এই সময় কলিকাতায় থাকিতেন এবং যদি পূর্ণ লাহিড়ীকে দ্বিতীয় দাঙ্গার সুবিধাকল্পে ষড়যন্ত্র করিয়া সরান না হইত।

রেস্পন্সিভিষ্ট ও স্বরাজী

তেলে জলে মিলিল না। সাবরমতি চুক্তি দুই দলের দুইরূপ ব্যাখ্যায় আপনা আপনি নাকচাবুদ হইল। ভিন্ন ভিন্ন দল যে ভিন্নার্থ করিবেন তাহা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কানপুর অভিভাষণেই প্রকট হইয়াছিল। পণ্ডিতজীর শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ছিল যদি নিজের মতে ভিড়াইতে পারেন, তাই আহমদাবাদে সকলকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। ধামাটা উঠাইলেই কেউটে বাহির হইয়া পড়িবে এবং তার দংশনে ধরা দিবেন না, রেস্পন্সিভিষ্টরা ইহা আপোষের মিটিংয়ে ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। কেহই সূচ্যগ্র-ভূমি অপরকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না, সুতরাং মহারথী-বর্গের আহমদাবাদে মিলন-প্রচেষ্টা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইল।

* * *

ইহাতে দেশের মঙ্গল হইল কি অমঙ্গল হইল তাহা বিচার্য্য। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, সকল বাঙ্গালী যদি একমত হইয়া ঠিক করে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরিবে তাতেও উপকার আছে। যেদিন কোন এক বিষয়ে ঐক্যমত্য হইবে, সেদিন বঙ্গোপ-সাগরে ঝাঁপ দিবার প্রয়োজন হইবে না; ঐক্যবল কোন ভাল কাজেই লাগাইবার বুদ্ধি হইবে।

যদি সকলেই রেস্পন্সিভিষ্ট হয়, বা অব্‌ষ্ট্রাকশানিষ্ট হয় তবে ঘরে ঘরে কৌন্সিলে ফল একই। ঐক্যবলে গবর্ণমেণ্টকে হার দেওয়া প্রজার চক্ষে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। দেশবন্ধু যে-উপায়েই হউক মুসলমানের ভোট যোগাড় করিয়া যেদিন গবর্ণমেণ্টকে হারাইয়াছিলেন সেদিনই তিনি সর্ব্ব-সাধারণের চক্ষে অসাধারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধি যেদিন গবর্ণমেণ্টের আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রিন্স-অব্‌-ওয়েলসের অভ্যর্থনায় বাধা প্রদানে সক্ষম হন, সেই দিন তিনি রাজনীতিতে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্তপ্ত প্রজা রাজশক্তির বিরুদ্ধে আত্মশক্তি কোন একটা কাজে মূর্ত্তিমান দেখিতে চায়—তাতেই তাদের আত্মভরসা ও আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়া যায়।

যদি ন্যাশনালিষ্ট পার্টির ভোট ব্যতীত শুধু স্বরাজী ভোটে কোন গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবকে বাতিল করা অসম্ভব হয় তবে স্বরাজীরা একা একা কি দেখাইবেন?

কিন্তু কথা এই যে ন্যাশনালিষ্টরা সব কিছু বাতিল করিতে সম্মত নহেন, গ্রহণ

যোগ্যকে গ্রহণ করিবেন, বর্জ্জনযোগ্যকে বর্জ্জন করিবেন, এই বলেন। তাহাতেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা নির্ব্বিচারে মন্ত্রীপদ-গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রাখায়, কারণ, পদের মর্য্যাদা ও মাহিনা দুটিই যে মুনি চিত্তেও বিভ্রম উৎপত্তি করিতে না পারে তাহা নহে।

পরীক্ষাস্বরূপ এবারটা জয়াকর ও মুঞ্জে প্রভৃতিকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়া তাঁহারা লোভের কাছে পরাভূত হন কিম্বা লোভজয়ী হইয়া স্বদেশ-সেবায় তেমনি তন্ময় থাকেন তাহা দেখিয়া তদনুসারে আগের প্রোগ্রাম নির্দ্ধারণ করিলে একটা সমাধান হইতে পারিত। স্বরাজীরা নিজেরা মিনিষ্ট্রী নাই লইতেন। যেমন কংগ্রেসে নো-চেঞ্জার ও স্বরাজী দুই দলই সামিল হইয়াছেন, একদল কৌন্সিল প্রবেশ করেন না, একদলের কৌন্সিল-প্রবেশই মুখ্য কর্ম্ম। তেমনি স্বরাজীদের মধ্যেও দুইদল কংগ্রেসভুক্ত থাকিতে পারেন, একদল মিনিষ্ট্রী-গ্রহণে বিরত থাকিবেন, আর একদলের মিনিষ্ট্রী-গ্রহণই প্রধান লক্ষ্য হইবে।

পঞ্চাশ বর্ষ

ভারতী পঞ্চাশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মীমত হইয়াও লক্ষ্মীর-প্রতি-বিমুখ আজীবন সরস্বতী-সেবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে দিন সম্বন্ধে ৪০শ বৎসরের 'ভারতী'তে লিখিয়াছেন—

"এই সাময়িক পত্রের নৌকা-খানি সময়ের স্রোতে যেদিন প্রথম ভাসানো হইল, সেদিন আমার বয়স ছিল ষোলো। * * * মানুষের পক্ষে চল্লিশটা (এখন পঞ্চাশটা) বছর বড় কম নয়। * * সেই চল্লিশ বছর পূর্ব্বে দেশের মনটা ছিল অনেক বেশি কাঁচা। লেখক কাঁচা, পাঠক কাঁচা, সাহিত্য কাঁচা, * * * দৈবক্রমে চল্লিশ (পঞ্চাশ) বছর আগে আমি ষোলোয় পড়িয়া-ছিলাম। * * * যাহা কিছু লিখিয়া-ছিলাম তাহা ষোল বছরেরই যোগ্য; তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল! দক্ষিণ হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন অজস্র আমের বোল ধরে তেমনি অজস্র লিখিয়াছি। তবু হাজার প্রশ্রয় পাইলেও যাহা ঝরিবার তাহা ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে। কিন্তু সেই অপ্রতিহত প্রাণের উদ্যমটা রহিয়া গেছে।"

এই পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া ভারতীর সেই চিরন্তন ধারা চলিয়া আসিয়াছে। উদীয়মান প্রতিভাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, বাঙ্গলার সাহিত্যকাননে নব নব লেখকপ্রসূন ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলায় অতি অল্প প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আছেন—বোধ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যাঁহারা ভারতীর নিকট এ বিষয়ে ঋণী নহেন।

আর একটি রীতিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু কেহই অর্থলিপ্সায় ভারতীর সেবা করেন নাই। সরস্বতীর কমলবনে তাঁর চরণমধুলোলুপ হইয়াই তাঁহারা আত্মনিবেদন করিয়াছেন। লক্ষ্মীর কোপগ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি নিজেকে বিকান নাই, কবির সেই "উষামরী দেবী"র প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি স্থির রাখিয়াছেন। 'ভারতী'র সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।

আমার ন্যায় অকিঞ্চন সেবিকা ফিরিয়া ফিরিয়া বাণীর পদতল লুণ্ঠিতা হইয়া,—বাঙ্গলার এই পঞ্চাশৎ বর্ষের জাতীয়-জীবন-চিহ্ন-বক্ষে-ধারিণী 'ভারতী' পত্রিকার চরণ সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া, মার্গদর্শীর গুরুগণের আদর্শে প্রলুব্ধ-কারিণী লক্ষ্মীকে আজও গাহিতেছে --

"যে বীণা শুনেছি কাণে
মন প্রাণ আছে ভোর
আর কিছু চাহিনা, চাহিনা।"

লক্ষ্মীর প্রত্যাখান

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িল। পূজনীয় মাতুল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সহরে সঙ্গীতপ্রিয় ধনী লোকদের জন্য সঙ্গীত-সমাজ নামে একটি ক্লাব খুলিয়াছিলেন। সেখানে একবার বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় হইতেছিল। বাল্মীকির ভূমিকা লইয়াছিলেন বহু-বাজার মল্লিক-পরিবারের চারুমল্লিক মহাশয়! ড্রেস রিহার্সাল চলিতেছে, খুব জমিয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মী আসিয়াছেন বাল্মীকিকে ভুলাইতে, এবার বাল্মীকি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। "যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায় এ বনে এসোনা এসোনা এসোনা এ দীনজন কুটীরে" বলিয়া হঠাৎ চারু মল্লিকমহাশয় বাল্মীকির দাড়ী-গোঁফ খুলিয়া ফেলিয়া—দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার দ্বারা এ কাজ হবে না, এ মুখ দিয়ে এ কথা কিছুতেই বেরোবে না, লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে তাড়াতে পারব না, ও মা-লক্ষ্মী জন্ম জন্ম আমার ঘরে আসুন তাই বলব।" সেবার লক্ষ্মীমন্তগণের সঙ্গীত-সমাজে বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় বন্ধ রহিল।

পঁচিশ বর্ষ

বাঙ্গলা সাহিত্যসেবারও সেই আর একটা দিক আছে। লক্ষ্মীমন্ত হওয়ার কামনা নিন্দনীয় নহে। ঘটে বুদ্ধি থাকিলে লক্ষ্মীকে সারস্বত মন্দিরেই আবাহন ও প্রতিষ্ঠিত কেন

না করিবে? 'প্রবাসী' পত্রিকার ২৪ বর্ষের জীবন প্রমাণ করিয়াছে বাঙ্গালী কেবলই ভাবপ্রবণ জাতি নহে। যে বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্ম্মিষ্ঠতা থাকিলে সৎসাহিত্য-ক্ষেত্রও অর্থোদ্গমী করা যাইতে পারে বাঙ্গালীতে তাহারও সম্ভাব আছে। এক সময় বটতলার পুস্তকবিক্রয় বাঙ্গালীর একমাত্র অর্থকরী সাহিত্যসেবা ছিল। ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতী পন্থায় তাঁহার সংস্কার করিয়া নূতন ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শী হন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক-পত্র-জগতে সেই ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে 'বামুনে বুদ্ধি' লইয়া বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যরসিকেরা সাহিত্য-চর্চ্চা করিত। ঘরের পয়সা দিয়া বনের মহিষ তাড়াইত। এক একটি খেয়ালী মানুষ এক একটা খেয়াল পুষিত। সুতরাং মাসিকপত্র টিকিত না। বিষয়বুদ্ধির সংযোগে বাঙ্গলা মাসিক-পত্রকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘায়ু করার কুশলতা প্রবাসী সম্পাদকই প্রথমে প্রদর্শন করিয়াছেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্য-শালায় বন্দী করিয়াছেন। এখন অনেকে রামানন্দের গতানুগতিক। বহু মাসিকপত্র এখনও উঠিতেছে ও পড়িতেছে। অভ্যস্ত-রীন সাহিত্যিক অযোগ্যতা তাহাদের পতনের কারণ নয়। অর্থনীতিজ্ঞতার অভাবই তাহাদের ব্যর্থতায় অভিশপ্ত করিতেছে। ভাবের ধোঁয়ায় দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দিক্‌নির্দ্দেশকারী লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদভঞ্জক ব্যবসায়িক বুদ্ধিচালিত পত্রেরও প্রয়োজন আছে।

আমাদের নিবেদন—

বৈশাখের "ভারতী"র জন্য আমরা আশাতীত সারবান প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কবিতা পাইয়াছি। 'ভারতী'র আকার দ্বিগুণ করিয়াও সমস্ত রচনা এবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য লেখকগণের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

'ভারতী' এখন হইতে প্রতিমাসে শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে। এবারে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য ব্যাসঙ্গত সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বৈশাখের শেষেই 'ভারতী' তাহার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবৃন্দের নিকটে উপস্থিত হইল।

রাজায়-প্রজায়

—:•:—

হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বরূপ কার্য্যের ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও তুরীয়। হাল হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার পশ্চাতেও তিনটি কারণ অনুমিত হয়; ব্যক্তকারণ মসজিদের সামনে আর্য্যসমাজীর সবাজ শোভাযাত্রা; অব্যক্তকারণ আব্দুর রহিম, এবং তুরীয় কারণ গভর্ণমেণ্ট।

* * *

আমাদের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট বলিতে কি বুঝায়? গবর্ণরই কি গবর্ণমেণ্ট? লর্ড লীটন কি আমাদের শাসক, না একটি শোষকসম্প্রদায়, যাঁরা আমাদের ভূমিজাত সমস্ত দ্রব্য মাটির দরে লইয়া, তাঁহাদের দেশ হইতে গিল্টি করিয়া পাঠান এবং আমাদের সোনার দরে ক্রয় করিতে বাধ্য করেন?

* * *

আমাদের রাজা কে? পঞ্চম জর্জ—না হাতিয়ারবান্ধা বিলাতী বণিককুল? এই দুর্লোভ বণিকদের সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ শ্রমিক-দের সংঘর্ষ স্বদেশেই পঞ্চম জর্জ বা তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী থামাইতে অপারগ—পরদেশে তাহারা যে একেবারেই নিরঙ্কুশ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

* * *

কায়দাই এমন যে বাঙ্গলার গভর্ণর তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতের কাষ্ঠপুত্তলি। আবার মন্ত্রীমণ্ডলী বেসরকারী ইংরেজ বণিকযূথের স্বার্থবুদ্ধি-চালিত অন্ধ যন্ত্র, ভারতীয় প্রজার রক্ষা তাহার সাধ্যাতীত। কোন বিশেষ ব্যক্তির সদিচ্ছা থাকিলেও সমূহের ইচ্ছা দ্বারা তিনি পরাস্ত হইতে বাধ্য।

* * *

ভুলভাঙ্গা দিবালোকে অবস্থাটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া প্রজাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আত্মরক্ষার আয়োজন আপনাকেই করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি এক কাণাকড়ির নির্ভর রাখিলে চলিবে না।

* * *

কলিকাতানগরীর বুকের উপর, ব্রিটা-নিয়ার রাজচ্ছত্রতলে যে দাঙ্গা ও খুনেখুনি একমাস যাবৎ অবাধে চলিল—গবর্ণমেণ্ট

যাহাতে তুরীয় অবস্থায় রহিলেন—তাহার ফল মঙ্গল, সুমঙ্গল।

প্রলয়ঙ্করী শঙ্করীর বিদ্যুতের মত ক্ষণিক দর্শন পাওয়া গেল। ইহাতে তাঁহার পূর্ণ দর্শনের তেজসহন-ক্ষমতায় আমরা দীক্ষিত হইলাম। উপলব্ধি হইল বিপদের পথ ব্যতীত মুক্তি নাই। কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত আরাম বরণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করে নাই। এই দাঙ্গার, এই প্রজা-হত্যার, এই নারীনির্য্যাতনের মূল কারণ যদি তুরীয় রাজপ্রতিনিধিরাই হন, তবে রাজার প্রজার যুদ্ধের যে রক্ত-পতাকা আজ ভারতগগনে উড্ডীন হইল, তাহা শীঘ্র অপসৃত হইবে না।

মাসিক সাহিত্য

—:•:—

বসুমতী,—ফাল্গুন, ১৩৩২

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ "রসশাস্ত্র" প্রবন্ধে সংস্কৃত কাব্য-নাটকের দৃষ্টান্ত তুলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপকাঠিতে 'ভাব' কাহাকে বলে, তাহারি অর্থ বুঝাইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের গুরুগম্ভীর ভাষার চাপে 'রসশাস্ত্রে'র রসটুকু খাবি খাইয়া মরিয়াছে, শুধু শাস্ত্র দানা পাকাইয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত নাটক হইতে সরস কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তার অর্থ দিয়াই পণ্ডিত মহাশয় ক্ষান্ত থাকেন নাই; তাঁর পাঠকবর্গ বিমূঢ়াত্মা, বেচারা—ধারণা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনীও কাটিয়াছেন, চমৎকার! যথা—"এই শ্লোক-টীতে সুধার প্রিয়তমের প্রতি গাঢ় অনুরাগ বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশ্বাস" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বসাহিত্যের কল্যাণে বাংলার সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠক-পাঠিকার হৃদয় ঢের বেশী আগাইয়া গিয়াছে—এরূপ 'স্কুলমাষ্টারী' ঢংয়ে রসশাস্ত্র বুঝানো মাসিক-পত্রের মারফৎ আজকাল আর চলে না। বিশবৎসর পূর্ব্বে হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের এ প্রবন্ধ পড়িয়া কতক পাঠক-পাঠিকার দল পণ্ডিত মহাশয়ের তারিফ হয়তো করিতেন! তার উপর পণ্ডিত মহাশয় 'রসশাস্ত্রের' আলোচনায় ভাষার দিক দিয়াও একটু সরলতা আনুন, রসশাস্ত্রের আলোচনাও একটু সরস হউক—নচেৎ এ 'বিপুল গবেষণার বোঝা' বসুমতী মাথায় বহিয়াই সারা হইবে; এ

বোঝা কাহারো কোনো কাজেও লাগিবার আশা দেখি না। "কলিকাতা ও সহরতলী ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে" শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিন্তাশীল প্রবন্ধ। বাঙালীর দুর্ভাগ্যের মর্ম্মান্তিক কাহিনী প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে। পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার কারণ দেখাইয়া আচার্য্য রায় মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইতেছেন— কলিকাতার "হরিশ মুখার্জ্জির রোডে অথবা রসা রোডে এখন অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি হইয়াছে। বাঙ্গালী বাসিন্দার মধ্যে অনেক ইংরাজ, ভাটীয়া, মাড়োয়ারীও আসিয়া বসবাস করিতেছে। ...বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ব্যবসাদার; প্রতিনিয়ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আর বাঙ্গালীদের যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে উকীল, ব্যারিষ্টার ও দুই চারিজন জজ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে সমস্ত জমীদার মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছেন, তাঁহাদের অর্থ এই সমস্ত উকীল-ব্যারিষ্টার-দের পকেট পূর্ণ করিতেছে। ইহাতে দেশে নূতন ধনাগম হইতেছে না। মাত্র দেশের একস্থানের অর্থ অন্য স্থানে শোষিত হইতেছে।" রেল ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে পল্লীতে দুগ্ধ তরী-তরকারী দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাছাড়া "টিকিটের মূল্যের চৌদ্দআনা বিদেশের তহবিলে চলিয়া যায়। যে দুই-আনা আন্দাজ এই দেশে রহিল, তাহা ষ্টেশনমাষ্টার, খালাশী ভাগ করিয়া লয়। বৈদ্যুতিক শক্তি বিদেশীর হাতে।" বাংলা এমনি করিয়াই লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে— ধনাগমের কোনো উপায় না বাহির করিলে আর বিশ বৎসর পরে বাঙালীর চলিবে কি করিয়া, ইহাই বাঙালীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। ভোগবিলাস ছাড়িয়া এদিকে বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটাইবার জন্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত রায়ের এই যে প্রয়াস, তাহা কি নিষ্ফল হইবে! এদিকে মনোযোগী না হইলে ক্ষতি কার, বাঙালী এ কথা কবে বুঝিবেন? এ প্রবন্ধটি সকল বাঙালীর ভালো করিয়া পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। 'স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত কলিঙ্গনাথ ঘোষ বলিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত উপনিষদের এই শক্তিমন্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিহীন, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, চিরপরাধীন হিন্দুজাতিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।" তাঁর মন্ত্রই ছিল অগ্নি। তিনি বলিয়াছেন, "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্যপ্রকাশ কর, সামদানভেদ দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।" * * "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও—সম্মুখে, সম্মুখে।" * * * "মানুষকে ভালবাসো" * * * "বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। * * * বল

ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।...হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও।" বেলুড়ে বিবেকানন্দ উৎসবে বাঙালী দলে দলে যায় শুধু হুজুগ করিতে, হুজুগ দেখিতে—বিবেকানন্দের এই যে অগ্নিমন্ত্র—বাঙালী তার ধার দিয়াও চলিতে জানে না! "ইতিহাস ও পুরাণ" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কালে যে ইতিহাস লিখিত হইত, প্রাচীনকালের সাহিত্য হইতে তাহার দুই-চারিটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এ সকল আলোচনা আরো সরল করিয়া লেখা প্রয়োজন—মাসিকপত্রের মারফৎ ছাপাইয়া নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাকেই তাহা পড়াইলে চলিবে না—দেশের সকল পাঠক-পাঠিকার হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা চাই—নহিলে মাসে মাসে এ প্রবন্ধ লেখায় মাসিকপত্রের পাতা পোরোণোই সার হয়। আসলে তা তো লেখকের উদ্দেশ্য নয়! কিন্তু তেমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া এসব কথা লেখার শক্তি কয়জনের আছে! 'গজুর ভজন' রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-রচিত—ধারাবাহিক বাহির হইতেছে। 'সূচী'তে লেখা আছে এটি নক্সা। কিন্তু নক্সা বলিলে এ রচনাকে খেলো করা হয়। 'গজুর ভজনে' বাঙলার ইতিহাস আছে, সমাজতত্ত্ব আছে, ভাবিবার কথা আছে, বাঙ্গালীর প্রহসন আছে, আর আছে বাঙালীর হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস আর পুঞ্জিত অশ্রুর বাষ্প! এমন রচনা সমাজের ও সাহিত্যের কল্যাণকর। আরো আধ ফর্ম্মা করিয়া বাড়াইয়া দিলে 'গজুর ভজন' পাঠক-পাঠিকার প্রাণে শুধু হাসি ও কৌতুকই যোগাইবে না, বাঙালীর চিন্তার রুদ্ধ ধারা খুলিয়া বাইবে। রসরাজ আমাদের এ কথাটুকু একবার ভাবিয়া দেখিবেন। "কবিতার কাতরতা" রসরাজ অমৃতলালের ব্যঙ্গ-কবিতা—বিশেষ করিয়া আরো উপভোগ্য হইয়াছে এই সংখ্যা 'বসুমতী'তে প্রকাশিত "বসন্তের কবি-কুঞ্জে"র একগাদা কবিত্বহীন কবিতার সম্পর্কে! 'উলা' ধারাবাহিক প্রবন্ধ; উলার ভূগোল, ইতিহাস, প্রাচীন সমাজের মনোজ্ঞ বিবরণী। এ সংখ্যায় গল্পও অনেকগুলি আছে—তার মধ্যে এক "ভাদুড়ী মশাই" ছাড়া আর কোনোটী গল্প-নামেরও যোগ্য নয়। কবিতা? বসুমতীতে তার আর "নাহি লেখাজোখা!" 'মাহ ফাগুন' কি না, তাই ভাবেরও একেবারে আগুন ছুটিয়াছে!

সবুজ পত্র, চৈত্র, ১৩৩২

"পেনাঙের পথে"—শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ-কাহিনী। ভাষা অত্যন্ত এলোমেলো, তার উপর নূতন ধরণের বিস্তর বানানের সৃষ্টি! তার উপর জ্ঞাতব্য বস্তুর একান্ত অভাব—লেখকের নিজের কথাই ষোল আনা! "বাঙ্গালীর কবিত্ব" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত বলিতে চান—"বাঙালীর যতটুকু খাঁটি কবিত্ব তাহা ফুটিয়াছে   বৈষ্ণব

কবিতায় ও বৈষ্ণব ভাবের কবিতায়। বাঙালী কবি তাহার এই সঙ্কীর্ণ রসাল চিত্তকে যখনই উদার ও বহুমুখী করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে, অথবা তাহাতে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে, চিন্তা-জগতের বৈচিত্র্য, তখনই তাহার কাব্য দেখি, বেশীর-ভাগ হইয়া পড়িয়াছে পদ্য—তরল বা উচ্ছল বিবৃতি। নাই তাহাতে ইন্দ্রজাল, নাই তাহাতে কবি-জীবনের সেই magic casements এর কোন আভাস! লেখকের বক্তব্য এমন ঘোঁয়াটে ধরণের যে এ বিপুল সত্য তাঁর লেখা হইতে ভালো বুঝিতে পারিলাম না। "বাঁশ" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক রচিত—সরস; তবে মৌচাক কিম্বা সন্দেশে ছাপা হইলেই মানাইত ভালো। "কাগজ" শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখিত; আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে লিখিত। প্রবন্ধটি চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ—আর বক্তব্য এমন সহজে পরিস্ফুট যে এত কাজের কথা এত অল্প পরিসরে এমন ফুটিয়াছে দেখিয়া তারিফ না করিয়া পারা যায় না! সংবাদপত্র-পরিচালকদের এ প্রবন্ধটি বিশেষ করিয়া পড়িয়া দেখা উচিত। কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'দোলপূর্ণিমা'—অধীর ব্যাকুল পিপাসিত চিত্তকে সত্যই যেন 'বকুলের গন্ধে' 'ভরিয়া দিল! মাধবীর মধুময় মন্ত্র' 'দখিণ হাওয়ায়' ছড়াইয়া পড়িল। দীপালি সংঘ—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঢাকার নারীসভার কাছে যে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন, তারই উত্তর। কবিবরের কথাগুলি বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এবং পুরুষ-পরিষদগুলির দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় হরফে লিখিয়া রাখা উচিত। কবিবর বলিয়াছেন,—"যে কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানাপ্রকার উদ্যম দেখতে পাই সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারী-চিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে।...যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যবীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। এই কারণেই ভারতবর্ষে স্ত্রী প্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে।"

বঙ্গবাণী—চৈত্র ১৩৩২

'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজধানীর পরিচয় দিয়াছেন। বগুড়ার ৭।৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন মহাস্থান-গড়ই সেকালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এ পরিচয় তিনি নজীর-পত্র সমেত হাজির করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় দেখিতেছি ভাষার দস্তুরমত কসরৎ লাগাইয়া দিয়াছেন। "আবার ভ্রাম্যমান" প্রবন্ধে যেখানে তাঁর ভাব-সঞ্চার হইয়াছে, সেখানেই এমনি ধুন্ধধড়কা বাধিয়াছে যে সেটা mysticism' না: ভাবুকতা না কি যে, ভাবিয়া পাঠক দিশাহারা হয়। তারপর এমনি যে ভাষার নমুনা

দিতেছেন, তা অপূর্ব্ব! দু'একটা ছোটখাট নমুনা তুলিয়া দিতেছি—"এইখানে বিধাতার বিধানের একটা পরম মঙ্গলস্পর্শ মেলে না কি? কারণ ভূত গরিমাকে কি আমরা কল্পনার স্ফটিকচ্ছটায় এমন এক ঔজ্জ্বল্য ও রক্তিমায় স্নাত করে দেখবার ক্ষমতা ধরিনা—ঠিক যেমনতর লালিমা হয়ত বস্তুতঃ অতীতের ছিল না?' আর্য্য ও অনার্য্য শিল্প"—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব্ব রচনা। কাব্যের মধ্য দিয়া শিল্পের এমন ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝাইয়া দেওয়া, আর এমন সরল করিয়া—এ শক্তি এক অবনীন্দ্রনাথেরই আছে। আর্টসম্বন্ধে এই যে প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইতেছে, এর মর্ম্ম বুঝিবার লোক বাংলায় ক'জন আছে! আজ পাশ্চাত্য দেশে এ প্রবন্ধগুলি লইয়া সাহিত্য ও শিল্পজগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত! অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রথম ছবি আঁকার ধারায় সৌন্দর্য্য শ্রী ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন, তখন আমাদের দিক হইতে এমনি ঔদাসীন্য পাইয়াছিলেন। তিনি আর্টিষ্ট; সে ঔদাসীন্যে প্রত্যাহত হন নাই। আজ এসব প্রবন্ধে আমাদের যে আর্ট সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন, তার প্রতিও আমরা তেমনি উদাসীন! "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার বিষময় ফল" আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈশিষ্ট্যে ও চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। আচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন—বংশগত প্রাধান্যই আমাদের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ—কৌলীন্য বংশগত হওয়া ইস্তক সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে দেখি ফ্যারাডে ছিলেন এক কর্ম্মকারের পুত্র; শ্রমিক দলের নেতা রামসে ম্যাকডোনাল্ডও খুব গরীবের ঘরের ছেলে। সমাজ সেখানে গুণের মর্য্যাদা করিতে জানে, গুণী নীচ-বংশ-জাত হইলেও "তাঁহাকে সেখানে কেহ পায়ের নীচে চাপিয়া রাখিতে পারে না।" আচার্য্য বলিয়াছেন,"মেদিনীপুর জিলায় শতকরা ৮০ জন মাহিষ্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক শিক্ষিত উচ্চদরের লোক আছেন,—কিন্তু তাঁরা যত শিক্ষিতই হৌন, বিবাহ করিতে হইবে ঐ মাহিষ্য-সম্প্রদায়ের কোনো অশিক্ষিত মেয়েকে! কারণ হিন্দু সমাজের ইহাই বিধি।" আচার্য্য আরো বলেন, "জাতিভেদের এই কঠোর নিগড়ের চাপে জাতীয় উন্নতির পথে আমরা যে দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? মুসলমানের মধ্যে এ ছুঁৎমার্গও নাই, জাতিভেদের অনাচারও নাই। ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন ভাটিয়া মাড়োয়ারী ও দিল্লীওয়ালা বাঙালীদের অপসারিত করিতেছে কি করিয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি চাকুরী মুসলমানের একচেটিয়া। খানসামা, বাবুর্চ্চি, চামড়ার ব্যবসায়, দপ্তরী গিরি প্রভৃতি মুসলমানের একচেটিয়া—এ সমস্ত ব্যবসায়ে হিন্দু নাই। * * ধর্ম্ম হিসাবে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সহিত মোটেই

পৃথক নয়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে তেমন কোন নিয়ম নাই! স্বরাজলাভের পথে জাতীয় সাম্প্রদায়িক একতার প্রয়োজন খুব বেশী...একই ধর্ম্মের মধ্যে উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সাম্য ভাব স্থাপনের চেষ্টা করা কি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নয়? হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক বিভিন্নতা ও অন্যান্য ভেদনীতি আছে, তাহা দূর না করিলে কি জাতীয় উন্নতি কোন দিন সম্ভব হইবে?" আচার্য্য রায়ের প্রত্যেক কথাটী ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য! কিন্তু শুধু ভাবিলেই তো কাজ হয় না। আমাদের গোঁড়ামি এমনি বদ্ধমূল আর আন্তরিকতা এত কম যে, বক্তৃতা-মঞ্চে এ সম্বন্ধে উদার কথা পাড়িয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিলেও কাজে সেই গোঁড়ামির পায়েই পড়িয়া থাকি! একবার কমল পাশার দিকে চাহিয়া দেখুন—তিনি বলিয়াছিলেন, হাজার বছর পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-সূত্রে মানুষকে বাঁধা হইল, সেই বাঁধনের চাপ এখন কাটিতেই হইবে। চারিদিকের আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন কানুনের সৃষ্টি কর নচেৎ ধরাপৃষ্ঠ হইতে উবিয়া যাইবে! বাঙালী আরো কত দিন এমনি নিশ্চেষ্ট জড় নিশ্চিন্ত থাকিবে! অর্থ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা—জীবন রাখিলে তবে তো কাজ করিব। না খাইয়া না পরিয়া দুর্ভাবনায় যদি চব্বিশ ঘণ্টা কাটে, তাহা হইলে অপর দিকে তাকাইবার অবসর মিলিবে কেন?

সত্যসুন্দর।

কলিকাতা ১৫নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্ মেট্‌কাফ প্রেসে শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫০শ বর্ষ } ১৩৩৩ } জ্যৈষ্ঠ

লীলাধারী

—:*:—

তোমারই কান্না, তোমারই হাসি,
তোমারই সুখ, তোমারই দুখ।
তোমারি পাপেতে মলিন মুখানি,
তোমারই ভুল, তোমারই চুক।

অগণিত জীবেতে জীবনধারী
ধরার লীলায় পড়িয়াছ ধরা,
বহু নামরূপে প্রসারিয়ে নিজে,
কোথাও বা পুণ্য-কোথা পাপে ভরা।

যাতনা, ভাবনা, সুখের বেদনা,
অশুদ্ধি, শুদ্ধি, সকলি তোমার!
কোন্ সুচরিতে পূজিব তোমায়
চুমিয়া চরণ বঁধুয়া আমার।

বাছনি:র মোর! কোথা ধুয়ে দেব
ব্যথা, ক্ষত, গ্লানি শ্রীহীন মলিন!
কোলে টেনে নেব, যতনে জিয়াব
ঘটে ঘটে তাঁহে হইয়ে লীন!

শ্রীমতী সরলা দেবী।

"ভিক্ষা"

—:০:—

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটীর-নির্ম্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন—সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত—এবং দুই চারিটী অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে—তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল—কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে—মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের—তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবী নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলা দেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত: ৫৫ বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলা দেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এই জন্য বাংলা দেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবী আছে—বাংলা দেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয় তাহ'লে অভিমান করে' আমি বল্‌তে পারি যে, আমার কাছে বাংলা দেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর যে প্রীতি লাভ করি, তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবী নাই। এই জন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহঙ্কার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার আনার পয়সা নিয়েও গর্ব্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোন কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি কিন্তু গর্ব্ব করতে পারিনে। পরের দত্ত সমাদরও সেই রকম অমূল্য—সেই দান আমি নম্র শিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধত শিরে

নয়। এই সমাদরে আমি বাংলা দেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করিনি। বাংলা দেশের ছোট ঘরে আমার গর্ব্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড় ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়ীতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি—শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটী দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, "ওরে পুত্র এতদিন তুই ত কোন কাজেই লাগ্‌লি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কটা দিন বাকী আছে, এই শিশুদের সেবা কর।"

কাজ সুরু করে দিলুম। সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক জন বাঙালীর ছেলেকে নিয়ে মাষ্টারী সুরু করে দিলুম। মনে অহঙ্কার হ'ল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হ'ল আমি বাংলা দেশের হিতসাধন করচি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এযে প্রভুরই আদেশ—যে-প্রভু কেবল বাংলা দেশের নন্, সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্র-পার হতে এলেন বন্ধু এণ্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবী আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনই আমার অহঙ্কার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জান্‌তে পারি।

আমার মনে গর্ব্ব জন্মেছিল যে আমি স্বদেশের জন্য অনেক করচি—আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করচি। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে—তখনই বুঝলুম এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়-স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেম, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্ব্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণশোধ করবার মত অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উর্দ্ধ বেতন তাঁদের আহ্বান করচে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেচেন—অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীয় সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হ'য়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের

তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হ'লেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড় করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড় করলেন, প্রেমকে বড় করলেন, কাজকে বড় করে তুললেন।

এই ত আমার পরে ভগবানের দয়া—তিনি আমার গর্ব্বকে ছোট করে দিতেই আমার সাধনা বড় করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোট বাংলা দেশের সীমার মধ্যে আর ধরে? বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগ্‌ল। আমি তাদের ডাক দিইনি। ডাকলেও আমার ডাক এতদূরে পৌছত না। যিনি সমুদ্র পার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকে-ছেন, তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশজন গুজরাটের ছেলে এসে বসেচে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্ব্ব প্রকারে যত আনুকূল্য করেচেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাইনি, অনেক দিন আমি বাঙালীর ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেচি—কিন্তু বাংলা দেশে আমার সহায় নাই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবী বেশী সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে ত খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেন না সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায় ওয়াশিল নয়। বাংলা দেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম সে আনুকূল্য পেয়েচে, সেই ত আশীর্ব্বাদ—সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েচে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করে, বাংলাদেশাভিমান বর্জ্জন করে বাইরে আশ্রম-জননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েচি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্ব-লোকেই অমৃত-লোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডীর, আমাদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্ত্তী। যা সকল মানুষের, তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক—সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা—তাঁর সেবকেরা পবিত্র হই—আমাদের অহঙ্কার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্ম্মল হোক এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেচি—সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য, মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণ সৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বীরভূমের কথা*

—:•:—

বীরভূমের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই, যাহাকে বলে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস—সে ইতিহাস বীরভূমে কখনও গড়িয়া উঠিবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমার অগ্রজপ্রতিম হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের আপ্রাণ যত্নে বীরভূমের যে দুইখানি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বীরভূমিকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় যে উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ বীরভূমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তির আলোকচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে, যে সমস্ত ধ্বংসস্তূপের সন্ধান মিলিয়াছে, বীরভূমির সমৃদ্ধ অতীতের পরিচয়-গৌরব হিসাবে তাহা বড় কম মূল্যবান নহে। বীরভূম বিবরণ হইতে বীরভূমে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী অবগত হইয়াছি। বীরভূমে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপ প্রবল ছিল, ধর্ম্মরাজের পূজা ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের পূজার বহুল প্রচার তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের অন্যতম সম্প্রদায় সরোয়াগী জাতি বীরভূমের নানা স্থানে অধুনা সরাক্ পরিচয়ে পরিচিত। শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের পীঠ-তীর্থনিচয় বক্রেশ্বর, নলহাটী, লাভপুর, কঙ্কালী, সাঁইথিয়া, রাখড়েশ্বর প্রভৃতি স্থান আজিও তীর্থযাত্রিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অর্চ্চিত হয়। নাথপন্থীগণের অতুল কীর্ত্তি—তারা পীঠ—চীনাচার তন্ত্রোক্ত সিদ্ধাচার্য্য বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থল, বীরভূমের অতীত গৌরবের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের বীরভূমের একচক্রা-বীরচন্দ্রপুর, "অভিন্ন গৌরাঙ্গতনু" অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি। বীরভূমির কেন্দুবিল্ব, ভাণ্ডীরবন, মঙ্গলডিহি, খয়রাশোল প্রভৃতি স্থান বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের সার মর্ম্ম।

ভদ্রপুরের মহারাজা নন্দকুমারকে বা ঢেকা-বাড়ীর রাজা রামজীবনকে লইয়া গর্ব্ব করিবারও, বীরভূমের যথেষ্ট কারণ আছে।

বীরভূমের কুটীর-শিল্প এক সময় দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আবস-বেলে ও নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের লৌহের কারখানায় কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইত। ইলামবাজারের গালা, কুথুটিয়ার চিনি, সুরুল গনুটিয়া প্রভৃতি স্থানের রেশম এই সেদিনও লোকে আদর করিয়া গ্রহণ করিত। কুটীর শিল্প প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়াছে। কেবল করিধ্যা, তাঁতিপাড়া, প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী তসর এবং বলোয়া বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী আজিও রেশমের কারবার বেশ লাভজনকরূপেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরভূমের বর্ত্তমান অবস্থা যারপরনাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। একেতো শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, তাহার উপর কৃষকগণের অবস্থাও নিরতিশয় শোচনীয়। বীরভূমে নিত্য আধিব্যাধি লাগিয়াই আছে, গত কয়েক বৎসরে বীরভূমের জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে এ সম্মিলনের আবাহন কেন? যত দীনভাবেই হউক শ্মশানে বাসরের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? আমার মনে হয়, আছে—এমনি শ্মশানেই এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বসাহিত্যের গতি কোন্ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, ভারতের চিন্তাধারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রচেষ্টার গতি কোন লক্ষ্যের অভিমুখী হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান—প্রত্যেক বিভাগেই অবশ্যকর্ত্তব্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য, যে জেলায় সেই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই জেলার আবহাওয়া বুঝিয়া দেশের অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন জাতি-গঠন প্রায় অসম্ভব। বাঙ্গলার সাহিত্য যতদিন বাঙ্গালী জনসাধারণের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত না হইবে, ততদিন বাঙ্গলার জাতি-গঠনের আশা সুদূর-পরাহত বলিয়া মনে হয়। আমি অবশ্য বাঙ্গলাকে পিছাইয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ঘনরাম, বিপ্র পরশুরাম প্রভৃতির আমলে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহি না। রাম-প্রসাদ, দাশুরায়, ও নীলকণ্ঠের দিন আর ফিরিবে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রসার কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও আর চলিবে না। বাঙ্গলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, জনসাধারণকে তদুপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কার্য্য নিরতিশয় আয়াসসাধ্য—অতি বিরাট, কিন্তু তথাপি

বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান—পরিষদকেই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাদের সম্মিলন হইতেই তাহার পরিচালনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এক এক বৎসর এক এক জেলায় এইরূপ অনুষ্ঠানের সূচনা হইলে, ইহা ক্রমশঃ অনায়াস-সাধ্য হইয়া আসিতে পারে। জাতিকে আত্ম-নির্দ্ধারণ সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে, দেশব্যাপী সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও ঈর্ষাদ্বেষ ভেদবন্ধের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক ভাবোন্মাদনার উদ্বেলিত তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রাচীনকালের প্রচার পদ্ধতি-গ্রহণ ভিন্ন ইহার দ্বিতীয় কোন সহজতর পন্থা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই প্রচার-পদ্ধতি বলিতে আমি কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতির বর্ত্তমান কালোপযোগী সুসংস্কৃত পর্য্যায়কে নির্দ্দেশ করিতেছি, সম্মিলনের অধিবেশন-স্থানে প্রতি বৎসরেই গ্রাম্যগাথা ও প্রবচন সংগ্রহ, প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতির ইতিহাস ও পূর্ব্বতন উপকরণ সংগ্রহ, উৎসব পর্ব্বাদির বিবরণ সংগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রস্তাব সম্মিলন হইতে অনুমোদিত হইয়া যায় শুনিতে পাই; কিন্তু তাহার পর সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেখানে কি কি কার্য্য হয়, আদৌ কোন কার্য্য হয় কি না, স্থানীয় বিবরণীর উপর নির্ভর না করিয়া প্রচারক পাঠাইয়া এই সমস্ত কার্য্য সংসাধন ও সম্পাদনে সাধ্যমত যত্ন লওয়া উচিত। তাহা হইলে সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয় না। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায় জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাহিত্যের উদারতর ক্ষেত্রই সে সাধনার একমাত্র আশ্রয়-কেন্দ্র স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। পল্লীর সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করিয়া দিতে পারে শুধু বাঙ্গলা সাহিত্য এবং এইরূপ সম্মিলনই তাহার সম্ভাবনা-সৃষ্টির প্রথম সোপান। এত কথা বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে—বাঙ্গলার সাহিত্য আজ যতই সমৃদ্ধ হউক, বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপুল কলরব, আজিও তাহার স্রোতোবেগে তেমন উত্তাল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু একদিন তাহা সম্ভব হইয়াছিল এবং এই বীরভূমির পীযূষ-স্তন্যই তাহার উৎস জোগাইয়াছিল। সেই পুণ্য-কাহিনীর—বীরভূমের অতীত সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস আছে। প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে, অজয়ের তীরে, কেন্দুবিল্বের ললিত কুঞ্জে মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, নান্নুরের মাঠে নিরঞ্জন পাত্রের কুটীরে সেই সুরে সুর মিলাইয়া কবি চণ্ডীদাস একদিন সমগ্র বাঙ্গলাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কবি জয়দেবকে লইয়া অনেকে অনেক রকমের আলোচনা করিয়াছেন—কেহ বলিয়াছেন অশ্লীল, কেহ বলিয়াছেন—আর কিছু—আমরা নীরবে শুনিয়াছি। প্রতি পৌষ সংক্রান্তির

আমরা কথায় কথায় য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দিই,—য়ুরোপের অভিজ্ঞতা আমার নাই; তথাপি মনে হয়, য়ুরোপে হইলে বাঙ্গলার সাধারণ পল্লীর মত নান্নুর আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীরূপে পরিচিত থাকিত না। নান্নুর আজ তীর্থ-গৌরবের অধিকারী হইত। অগণিত যাত্রীর শ্রদ্ধা-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, জাতির কবি-প্রতিভা-অর্চ্চনার নিদর্শনরূপে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীর বিজয় ঘোষণা করিত। কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—চণ্ডীদাসের গানে বাঙ্গলা মাতিয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের গান স্বাতীনক্ষত্রের বারিবিন্দুর মত জাতির অবনতশিরে পতিত হইয়া, যে দুইটী অমূল্য নিধি গড়িয়া তুলিয়াছিল, সুদীর্ঘ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরেও তাহার স্বর্গীয় দ্যুতি তেমনি সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মহিমাময় রহিয়াছে। যতকাল বাঙ্গালী বাঁচিবে, যতকাল বাঙ্গলা ভাষায় প্রবাহ বহিবে, নিতাই চৈতন্যের পুণ্যাবদান জাতীয় জয়যাত্রার পথে অটল আলোক-স্তম্ভের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

চণ্ডীদাসের পদানুসরণ করিয়া যে সমস্ত কবি ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাঁদরার কবি জ্ঞানদাস, জোঁকলাইয়ের কবি জগদানন্দ, মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দ এবং পরিচয়হীনা মহিলা-কবি স্বর্ণলালীর নাম উল্লেখযোগ্য। বীরভূমি মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জন্মভূমি। কাঁদরার শিষ্য, ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ আজিও দিন আমরা বহু বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সঙ্গে মিলিয়া—হই না কেন আমরা অশিক্ষিত, হই না কেন আমরা কথিত ইতর জনসাধারণ, তবুওতো আমরা বাঙ্গলার মানুষ, তবুওতো আমরা সংখ্যায় বিপুল! আমরা তো এই কবির উদ্দেশেই শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি নিবেদন করিতে কেন্দুবিল্বে যাই। বাঙ্গলার এক সুবৃহৎ সম্প্রদায়—যে সম্প্রদায়ে দার্শনিক ভাবুক পণ্ডিত কবির অভাব নাই, যে গীতগোবিন্দকে তাঁহারা পূজা করিয়া থাকেন, তাহার উপর অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিতে এই সমস্ত সমালোচকগণের মনে কি তিলার্দ্ধের জন্যও সঙ্কোচের উদয় হয় না? এই প্রায় বাঙ্গলা ছাড়া দেশে, সাঁওতাল পরগণার প্রান্তে, যে যক্ষের নিধি বক্ষে আঁকড়িয়া পড়িয়া আছি, কেহ তাহার আদর করিলে যেন কৃতার্থতা লাভ করি। কচিৎ কোন পথভোলা পথিক এই পথে আসিয়া পড়িলে প্রাণে বড় আনন্দ হয়, মনে আপনা আপনি গুঞ্জন ধ্বনি উঠে—'তোমরা মোদের ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।' চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিতে পারা যায়। চণ্ডীদাসের নামে অনেকেই কাঁদিয়াছেন, সমালোচনা লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন; কিন্তু নান্নুরে পদার্পণের শুভাবসর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজিও করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

এই কীর্ত্তনের ধারা যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তনের প্রবল প্লাবন মন্দীভূত হইয়া আসিল, মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, জনসাধারণ নূতন কিছুর জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, তাহার কারণও ছিল। সমাজ-বক্ষে কোন নব-ভাবের তরঙ্গ উঠিলে, প্রাকৃতিক বিধানে পরিমিতকালের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধভাবের প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়; কিছুদিন দুইটি ভাব পাশাপাশি চলিতে চলিতে, পরে একটা সামঞ্জস্য আসিয়া মিলিয়া যায়—ইহাই জগতের নিয়ম। মহাপ্রভুর ভাব-বন্যায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অপর কারণ মনোহরশাহী কীর্ত্তনে নানা রাগরাগিনী জুড়িয়া যখন গরাণহাটীর সৃষ্টি হইল, পরে রেনেটী ও অপরাপর নানা শাখা প্রশাখার ঘূর্ণাবর্ত্তে রসের স্থানে কর্ত্তব এবং ভাবের স্থানে ঢং আসিয়া আসন পাতিল—এদিকে নাম-কীর্ত্তন পুরাতন হইয়া আসিল, তখন জনসাধারণের রসপিপাসু চিত্ত কবির গানকে আসরে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাঢ় দেশে বৌদ্ধাচার্য্য নাড়ি পণ্ডিতের সমসময়ে যোগীপাল মহীপাল গীতের অনুরূপ যে ঝুমুর গান প্রচলিত ছিল, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের মৃদঙ্গ-মন্ত্র যে সঙ্গীতকে কিছুদিনের জন্য লুপ্ত রাখিয়াছিল, পরিবর্দ্ধ-প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যে গীতি কথঞ্চিত ভদ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছে, সেই ঝুমুর গানকে ভাঙ্গিয়া কবির গানের সৃষ্টি হইল। প্রথম প্রথম ইহা কতকটা ঝুমুরেরই অবিকল নকলের মত ছিল! সেই দল বাঁধিয়া নৃত্য, সকলে মিলিয়া গান—তাই লোকে তাহাদের নাম দিয়াছেন 'দাঁড়া কবি'। বীরভূমে লালু নন্দলাল, রামজী দাস, রঘুনাথ দাস ও ইহাদের সমসাময়িক কালুপাল ও ভরত প্রভৃতি কবিওয়ালার অনেকগুলি গান আবিষ্কৃত হইয়াছে। লালু নন্দলালের বহুগানে বীরভূমের এমন কয়েকটী অখ্যাত গ্রামের নাম আছে, যাহাতে তাহাকে বীরভূমের অধিবাসী বলিয়া অনুমান হয়। এই কয়জন কবিওয়ালার এতগুলি গান, আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বীরভূমের মল্লারপুর অঞ্চল ঝুমুর গানের জন্য প্রসিদ্ধ। লালু নন্দলালের শিষ্য বলহরি রায়, কৈলাস চন্দ্র ঘটক, শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি বীরভূমবাসী বহু কবিওয়ালার নাম পাওয়া গিয়াছে। লালু নন্দলালের পরবর্ত্তী সময়ে পরমানন্দ অধিকারী নামক একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন রামযাত্রার অনুকরণে কালীয়-দমন যাত্রার সৃষ্টি করেন। অনেকের মত পরমানন্দ অধিকারী বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারই শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী। আমাদের নীলকণ্ঠ এই গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র। যাত্রাওয়ালাগণও ঝুমুরের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কালীয়দমন যাত্রার

বাসুদেব কতকটা নাটকের সূত্রধারের কার্য্য করিলেও, ইহাকে ঝুমুরের অন্যতম সংস্করণ বলা যাইতে পারে। পরমানন্দ অধিকারীর দুইটী গান. বীরভূমেই পাওয়া গিয়াছে।

বীরভূমে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়, অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া পাশাপাশি অবস্থান করিছেছে। তাই দেখিতে পাই, এদিকে নয়নানন্দ ঠাকুর যখন 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস কদম্ব' গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, অন্যদিকে কবি বিষ্ণুপাল সেই সময়ে 'মনসামঙ্গল" ও কবি গঙ্গানারায়ণ 'ভবানী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বেও কবি বিনোদরাম সেন ও ব্রজমোহন সেন, তাঁহাদের কবিবন্ধু পণ্ডিত বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুর অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া আপনাদের কবিপ্রাণের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে স্বর্গীয় বলরাম দাস গুপ্ত বি, এ, অকালে পরলোকগত দরিদ্র মুসলমান কবি—মহম্মদ আজিও উস্‌-শোভান, বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, ও স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম উচ্চারণে শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বীরভূমে সম্প্রতি প্রায় বিশজন নূতন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা এবং বহু বিবিধ সঙ্গীত-রচয়িতার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বীরভূমে অধুনা চারিখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং একখানি মাসিক পত্র পরিচালিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিবাকর নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিবাকর এক সপ্তাহ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। দিবাকরের পরে প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, তখন প্রবাসী—এখন অধিবাসী—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় বীরভূম-বার্ত্তা সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রচারিত হয়। মধ্যে বীরভূম-বাসী ও বীরভূম-হিতৈষীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বীরভূম-বার্ত্তা আজিও সমান উদ্যমে ভাল ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। আর তিন খানি সাপ্তাহিক পত্রের নাম বীরভূম-বাণী, রাঢ়-দীপিকা ও পল্লী-মঙ্গল। বাণীর সম্পাদক —যদুনাথ রায় এল, এ, বি, এল মহাশয় অকালে পরলোকগত না হইলে বাণী মফঃস্বলের একখানি আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিচিত হইতে পারিত। বর্ত্তমান সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে বাণী ক্রমে আশানুরূপ অবস্থায় উন্নত হইতেছে। রাঢ়-দীপিকা রামপুরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। দীপিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পরিচালন-দক্ষতা প্রশংসনীয়, পল্লী-মঙ্গল দুবরাজপুর হইতে আজ কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনী

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বীরভূমি মাসিক পত্রের পরিচয় অনেকেই অবগত থাকা সম্ভব। কারণ ইহার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত-রত্ন বি, এ, মহাশয় সুপরিচিত ব্যক্তি। বীরভূমি একদিন কীর্ণাহারের সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান বীরভূমি তাহারই নব-পর্য্যায়।

বীরভূমে বর্ত্তমান সাহিত্য-চর্চ্চার উল্লেখ করিতে হইলে এমন অনেকের নাম করিতে হয়, যাঁহারা আমার অন্তরঙ্গের মধ্যে গণ্য। অন্তরঙ্গের প্রশংসা আমি আত্ম-প্রশংসার নামান্তর বলিয়া মনে করি। সুতরাং সে আলোচনায় বিরত রহিলাম। তথাপি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বহু পরিশ্রমে তিনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় চারি হাজার স্বর্গীয় সাহিত্য-সেবীর জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি আজিও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমানে গৌরব করিবার কিছু নাই। অতীতের যে অবদান-পরম্পরার উল্লেখ করিলাম, তাহারও উত্তরাধিকারিত্বের দাবী আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হৃত-সর্ব্বস্ব বীরভূমি সম্প্রতি এমন কিছু লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, যাহা সমগ্র বিশ্ববাসীর বিস্ময়-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত পুণ্যাশ্রম শান্তিনিকেতনের উল্লেখে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বে এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধন-কুঞ্জরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা অধুনা বিশ্ব-পণ্ডিতগণের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের আরণ্যক শাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক, জ্ঞানোপাসক ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ এই স্থানে জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম তাঁহার পুণ্য অধিষ্ঠানে ধন্য হইয়াছিল, শেষদিনের তাঁহার চিতাভস্ম বক্ষে ধরিয়া তীর্থ-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বিশ্ব-বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রমেরই অধিবাসী। অতীতের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়া আমরা গৌরব করি কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে একদিন বাঙ্গলার সম্রাট লক্ষ্মণসেনের শুভাগমন হইয়াছিল। পাচশত বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন দ্বারবঙ্গেশ্বর শিবংসিংহ স্বীয় সভাকবি বিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া নান্নুরের কুটীরে আগমন করিয়া কবি-প্রতিভার মৃণ্ময়-ঘটে হৃদয়ের প্রীতি-চন্দন নিবেদনে ধন্য হইয়াছিলেন। আর আজ আমরা চক্ষে দেখিতেছি দেশের রাজন্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জ্ঞানী গুণী বঙ্গবাণীকে বন্দনা করিতে বীরভূমে শুভাগমন করিতেছেন। বোলপুর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা, নালন্দার

স্মৃতিকে কালোপযোগী মূর্ত্তিদানের চেষ্টায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। "East is east, west is west twain shall never meet" Rudyard Kippling এর এই বাণী আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দের বিষয় শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীগণ পল্লীসংগঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীরে ধীরে এদেশের জনসাধারণের হৃদয় জয় করিতেছেন। শান্তিনিকেতনের বিপুলতর জ্ঞানভাণ্ডার শঙ্কিত-বীরভূমবাসী একদিন বিস্মিত-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত মাত্র। আমাদের আয়ত্তের অসামর্থ্য ও নিকেতন-সংসদের তাহা সাধারণে বিলাইবার চেষ্টা-হীনতা এই দুইয়ে মিলিয়া স্থানটীকে বীরভূমের চক্ষে রূপকথার রাজপুরীর আকার দান করিয়াছিল। এতদিনে দেশকালপাত্রানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কবি যে আমোদের জন্য নিকেতনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন তাহাতে বীরভূমবাসী কৃতার্থ হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কবির উদ্দেশ্য সফল হউক, শ্রীনিকেতনের চেষ্টা জয়যুক্ত হউক, আমাদের জয়দেব চণ্ডীদাস নাই কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ এই বীরভূমে অবস্থিতি করেন।

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিহির

—:•:—

হে মিহির, শুনেছিনু তোমার বারতা
জগতের প্রথম প্রভাতে; তামসিনী
প্রকৃতির বুকে ছিল স্তব্ধ নিশীথিনী
বিরাট ভৃঙ্গের মত মধুপানরতা।
অজাত নক্ষত্র নভে নাহি ছিল জ্যোতিঃ
নাহি ছিল নীহারিকা শুভ্র উজ্জ্বলতা,
অসীমের সিংহাসনে শুধু নীরবতা
ব'সে ছিল ধ্যানমৌন পাষাণ-মূরতি।
সহসা উদিলে তুমি দিগন্ত উদ্ভাসি,—
অসীম সাগর-তটে সৃষ্টির কমল—
প্রকৃতির প্রথম সন্তান। রাশি রাশি
অন্ধকার—গর্ভিনীর দুঃস্বপ্ন সকল—
টুটে গেল তোমার সহাস নেত্রপাতে;
জাগিল ঘুমন্ত বিশ্ব প্রথম প্রভাতে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শক্তিতত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:•:—

এইরূপ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারামূর্ত্তি সত্ত্বগুণাত্মিকা, ইঁহার অন্যতম নাম নীল-সরস্বতী। ইনি সাধককে তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা বিদ্যা দান করিয়া সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করেন। ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "মহাপ্রলয়-কালাদৌ নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে। হাহাকারং সমাকর্ণ্য কৃপয়া সংস্তুত' স্তনৌ। নাম্নাতেন মহাতারা খ্যাতা সা ব্রহ্মরূপিণী॥"

আবার ষোড়শী (মহাত্রিপুরসুন্দরী) ভুবনেশ্বরী ও ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি রজপ্রধান'-সত্ত্বগুণাত্মিকা রক্তবর্ণা সুতরাং ইঁহারা স্বর্গৈশ্বর্য্যাদি সুখভোগ ও ক্রমমুক্তিদায়িনী। ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাত্মিকা মূর্ত্তি তমঃপ্রধানারজগুণাত্মিকা, এইজন্য মারণ-স্তম্ভন-বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম্ম-সাধনের জন্যই ইঁহাদের সাধনা সচরাচর দেখা যায়। ফলতঃ শ্রীশ্রীমহাদেবীর সর্ব্ববিধ মূর্ত্তিই মুখ্য বা গৌণভাবে ভুক্তি ও মুক্তি দানে সমর্থা।

মহাবিদ্যার মূর্ত্তিসকল কালীকুল ও শ্রীকুলভেদে দুইভাগে বিভক্ত। যথা নিরুত্তর তন্ত্র "কালী তারা রক্তকালী ভুবনা মর্দ্দিনা তথা। ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা। কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরং। সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপিচ। ধূমাবতীচ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে। মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতং। সর্ব্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দ্দক্ষিণা প্রিয়ে॥"

ইহার মধ্যে কালীকুল, কেবল দিব্য ও বীরভাবে জ্ঞানী সাধকদিগের উপাস্য এবং শ্রীকুল, দিব্য বীর ও পশুভাবের কর্ম্মী সাধকদিগের উপাস্য।

তন্ত্রে দশমহাবিদ্যা ও অষ্টাদশ মহাবিদ্যার মন্ত্র, যন্ত্র ও পূজাদির বিবরণ সমস্তই আছে, কিন্তু প্রায় সকল তন্ত্রেই আদি মহাবিদ্যা—কালিকার মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ অন্যান্য মহাবিদ্যা ও বিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী কালিকারই মূর্ত্তি-ভেদ মাত্র। মাতৃকাভেদ তন্ত্রে বলিয়াছেন "কালীদেহস্বেদজাতা সাবিত্রী বেদমাতৃকা। ত্রিবর্গদাত্রী সা দেবী ব্রহ্মণঃ শক্তিরেবচ॥" পিচ্ছিলাতন্ত্রে বলিয়াছেন "সর্ব্বেষাং দেব মন্ত্রাণাং শ্রেষ্ঠোহি কালিকা মনুঃ। অস্য গ্রহণমাত্রেন জীবন্মুক্তোহধমোহপিচ॥"

নিগমকল্পতরু তন্ত্রে "বর্ণেষু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ সাধকেষু শাক্তকঃ। শাক্তেষু কালী মন্ত্রং যো জপত্যেব সমুখ্যকঃ॥" যোগিনী তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন "মহা মহা ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মাতা। যা মাসাদ্য নির্ব্বাণ মুক্তি মেতি নরাধমঃ। অন্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। যা কালী পরমা বিদ্যা সৈ তারা ন সংশয়ঃ। এতয়ো ভেদর্ভাবেন নানা মন্ত্রা ভবন্তি হি॥" আবার কামাখ্যা-তন্ত্রে আছে। "সপ্তলক্ষ মহাবিদ্যা গোপিতাঃ পরমেশ্বরি। সারাৎসারোত্তমা দেবী সর্ব্বাসাং ষোড়শী মতা। তস্যাপি কারণং দেবী কালিকা জগদম্বিকা॥" নিরুত্তর তন্ত্রে আবার বলিয়াছেন "শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে। সা শক্তির্দ্দক্ষিণা কালী সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী।" আবার যামলে বলিয়াছেন—"যথা কালী তথা তারা তথা ছিন্নাচ কুল্লুকা। একমূর্ত্তিশ্চতুর্ভি দেবিতং কালিকা পরা॥" ইত্যাদি অনেক প্রমাণ নানা তন্ত্রে আছে। আবার বেদেও সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা "কালী, করালী" ইত্যাদি নামে অগ্নির সপ্ত জিহ্বাতে আহুতি প্রদান করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা যথা "কালী করালীচ মনোজবাচ, সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীচ দেবী লোলায়মানাঃ ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥" মণ্ডুক উপনিষৎ।

তন্ত্র সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা বক্তব্য এই যে, তন্ত্রশাস্ত্র আচার ও উপাসনা বিষয়ে উদার এবং সাধনা বিষয়ে জাতি-ভেদাদিও মানেন না কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্র ও আচারাদি অদীক্ষিত অজ্ঞান পশুদিগের নিকট গোপন করিবার জন্য সাধকদিগকে পুনঃ পুনঃ দিব্য দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "অন্তঃ শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।" আবার বলিয়াছেন "গোপয়ে-ন্মাতৃজারবৎ।" অন্যস্থানে বলিয়াছেন "প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ" এইরূপ বহু-বিধ নিষেধ-বাক্য দৃষ্ট হয়। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন যে, এই তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বৈত-হীন জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিরই এক-মাত্র অধিকার, "অস্তি কোহপ শুচির্দ্দান্তো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্ম-বাদীচ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ। সর্ব্বহিংসা-বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতঃ। সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাত্তদন্যোভ্রনসাধকঃ। ন-বক্তব্যং পশোরগ্রে কুটিলে চুল্লুকে তথা।" এই কারণেই শ্রীশিব সমস্ত দেব দেবীর ধ্যান মন্ত্র, যন্ত্র ও সাধনাদি সংকেতে বলিয়াছেন। ঐ সমস্ত সংকেত আগমতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন, সুতরাং সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপাভিন্ন ঐ সকল গুপ্তরহস্য তত্ত্বজ্ঞানহীন পণ্ডিতদিগেরও দুর্ব্বোধ্য। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন "গুরবোবহবঃ সন্তি বেদ-শাস্ত্রাদি পারগাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি পরতত্ত্বার্থ পারগাঃ॥" সুতরাং মন্ত্রার্থ ও ধ্যানাদির স্বরূপতত্ত্ব জানিবার জন্য "সর্ব্বা-গমার্থতত্ত্বজ্ঞ" গুরুর আশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দেবতার স্বরূপজ্ঞানের অভাবে অতীন্দ্রিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা চিন্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা,

"যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসাসহ" এখন স্থূলা মৃণ্ময়ী, দারুময়ী ও ধাতুপাষাণ-ময়ীরূপে পরিণতা হইয়াছেন। এমন কি সেই পূর্ণকাম ব্রহ্মময়ীকে রক্তমাংসাদি নানা-বিধ বলিপ্রিয়া বলিতে পণ্ডিতেরা কুণ্ঠিত হন নাই। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন "অগ্নির্দ্দেব দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতং। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাং॥" অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মী দ্বিজাতিগণ অগ্নিকেই ঈশ্বর বোধে পূজা করেন, যোগিগণ স্বীয় হৃদয়ে দেবতা দর্শন করেন, অজ্ঞান ব্যক্তিগণ প্রতিমাকেই দেবতা মনে করেন; কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ফলতঃ প্রথমাধিকারী সাধকদিগের ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধি ও চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য প্রতিমার প্রয়োজন আছে। যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অল্পবুদ্ধি বালক ছাত্রগণকে অতিবৃহৎ ভূমণ্ডলের স্বরূপ বুঝাই-বার জন্য ক্ষুদ্র গোলক ও মানচিত্র দেখাইয়া থাকেন; তদ্রূপ গুরুগণ প্রথমাধিকারী অজ্ঞ শিষ্যদিগকে তাহাদের মনঃস্থির ও ব্রহ্মের স্বরূপবোধের নিমিত্ত প্রতিমা ও চিত্রপটে স্থূলমূর্ত্তি-ধ্যানের উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু মূর্খেরা দুর্ভাগ্যবশতঃ দেবতার স্থূল-মূর্ত্তিকেই তাঁহার স্বরূপ রূপ মনে করে। কুলার্ণব তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন "স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে। স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং॥" সাকার মূর্ত্তির কোন্ কোন্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি কি গুণ ও ক্রিয়ানুসারে কল্পিত হইয়াছে তাহা গুরুর নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে সূক্ষ্মধ্যানে অধিকার জন্মিবে, নচেৎ চিন্ময় দেবতা মৃত্তিকা ও পাষাণে পরিণত হইবে। তজ্জন্য কুব্জিকাতন্ত্রে বলিয়াছেন, "সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ অভ্যাসেন সদা দেবি নিরাকারং প্রপশ্যতি॥"

অতএব মুমুক্ষু সাধকমাত্রেরই সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যা কালিকার স্বরূপতত্ত্বের বিচার-পূর্ব্বক ধ্যান করা উচিত। এই স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাভাগবতে শ্রীশ্রীদেবী বলিয়াছেন "রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং। নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেক কারণং। নির্ব্বিকল্পং নিরা-রম্ভং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্। ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে॥" ইহাই মহাদেবীর স্বরূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে "নিষ্কলা নির্গুণানন্তা মহামায়াব্যয়ামুনে। অধ্যায়া রূপরহিতা নিত্যানিত্য-স্বরূপিণী॥" অর্থাৎ সেই মহামায়া কালিকা কলা (মায়া) রহিতা নির্গুণা অনন্তা অব্যয়া সুতরাং নিত্যা কিন্তু জগদ্রূপে অনিত্যা এবং রহিতা অতএব ধ্যানের অগম্যা। আবার কূর্ম্ম পুরাণে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু বলিয়াছেন "শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দ্বৈতবর্জ্জিতং। আত্মোপলব্ধি বিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদং"। জ্ঞানৈনৈকেন তল্লভ্যমক্লেশেন পরং পদম্।" অর্থাৎ মহাদেবীর তৎপদবাচ্য গুণাতীত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় পরম পদ, এক-

মাত্র অদ্বৈতভাবে স্বীয় হৃদয়ে, উপলব্ধ হইয়া থাকে ও একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবেই উহা লাভ করা যায়। কামদ তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন "একৈব সা পরং ব্রহ্মরূপা কালী সনাতনী। ন দ্বিতীয়াস্তি তদ্‌ভিন্না তস্তিংন্না নাস্তিকশ্চন। নিরাধারা নিরাকারা নিরুপাধি নিরঞ্জনা। অব্যয়া সচ্চিদানন্দা মহাব্রহ্মস্বরূপিণী।" অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপা কালিকা একা স্বজাতীয় ভেদরহিতা, তিনি প্রপঞ্চ-জগতের আধারশক্তিরূপিণী কিন্তু তাঁহার আধার কিছুই নাই, তিনি মায়াদি উপাধি-রহিত-নিরাকার-নিত্যশুদ্ধ-চৈতন্যরূপা এবং উদয়াস্ত-রহিতা; ফলতঃ মহাদেবী তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তিপ্রভাবে চরাচর জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্টা থাকিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা আছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণের ন্যায় কোন বিশেষ লোকালোকবাসিনী নহেন; মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, "পরমানন্দরূপং যৎ জগতাং কারণং মহৎ। তস্মাদেব্যাস্ত তদ্রূপং উদয়াস্তবিবর্জ্জিতং॥" কুলার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন "নোদেতি নাস্তমভ্যেতি নবৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্। স্বয়ং বিভাত্যথান্যানি ভাসয়েৎ সাধনং বিনা। অনবস্থং তদ্রূপং সত্তামাত্রমগোচরম্।" অর্থাৎ পরমানন্দরূপিণী মহাদেবীর স্বরূপ রূপ, যাহা এই ত্রিগুণাত্মক জগতের মূলীভূত কারণ, উহা আবির্ভাব, তিরোভাব ও ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, স্বপ্রকাশ ও অন্যান্য বস্তুজগতের প্রকাশক, এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অতীত, অবাঙ্‌মনসোগোচর ও সৎস্বরূপ মাত্র।

অগ্নি সর্ব্ববিধ পদার্থে বিদ্যমান থাকিলেও দ্রব্যান্তর দ্বারা বিশেষরূপ ঘর্ষিত না হইলে যেমন ঐ বস্তুসমূহে অগ্নির দাহিকা-শক্তি ও প্রকাশ-শক্তির উপলব্ধি করিতে পারা যায় না এবং অন্ধকার নাশ কিম্বা রন্ধনাদি কার্য্যের উপযোগী হয় না; আবার গাভীদুগ্ধ যেমন গাভীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত থাকিয়াও তাহার অঙ্গপোষণ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ দুগ্ধ দোহন করিয়া গাভীকে পান করাইলে তখন তাহার অবয়বের পুষ্টিসাধন করে; তদ্রূপ চিন্ময়ীর সত্তা, সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও সদ্‌গুরুর উপদেশে যথাশাস্ত্রসাধনারূপ ঘর্ষণ ব্যতীত, প্রত্যক্ষ বা অভীষ্টদায়িকা হয় না।*

সহস্রাংশু তিমিরারি সূর্য্য, অনন্তগগন-মণ্ডলে সুদূরে নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ তাঁহার উদয়াস্তের কিম্বা জগতের অন্ধকারনাশাদির ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি যেমন তাঁহার স্বীয় স্বপ্রকাশ ও আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট রশ্মি-দ্বারা জগতের অন্ধকার-নাশ এবং পৃথিবীর গতি ও রসাকর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন; সেইরূপ সর্ব্বশক্তির আধার-

* আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥
ব্রহ্মোপনিষৎ।

ভূতা মহাদেবী, নির্ব্বিকারভাবে বর্ত্তমানা থাকিয়াই স্বীয় সৃষ্টিস্থিতিনাশাদি শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী প্রভৃতি অষ্টশক্তি দ্বারা জগতের সৃজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

এইজন্য মহাদেবী কালিকার ত্রিপঞ্চার যন্ত্ররাজের পঞ্চদশ কোণে কাল্যাদি পঞ্চদশ শক্তি, পদ্মাষ্টদলে ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তি, ও দলাগ্রে অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব, অষ্টবটুক এবং যন্ত্রের চতুষ্কোণে বিষ্ণুপ্রভৃতি চারিদেবতা ও দ্বারাদি দশদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, চিদ্‌ঘন কালিকার রশ্মিবৃন্দ দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। স্বয়ং মহাদেবী ঐ যন্ত্রের কেন্দ্রস্থিত বিন্দুতে শিবশক্তি-মূর্ত্তিতে অর্চ্চিতা হন।

পরম কারুণিক শ্রীশ্রীভৈরবভৈরবী কর্ত্তৃক এই অদ্বৈত-ভাবপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশক আগমশাস্ত্র জগতে প্রকাশিত হইলেও জনসাধারণের নিকট উহা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, তান্ত্রিক সাধকগণ উহা স্বশিষ্য ব্যতীত অন্য কাহাকে প্রাণান্তেও বলিতে চান না এবং বলেন না। দ্বিতীয়তঃ এই তন্ত্রশাস্ত্রে বীরাচার বা কুলাচারের কথা বর্ণিত আছে। আগমশাস্ত্রে বীরাচারে ঈশ্বরোপাসনার বিধি আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে ঘৃণা করেন, এমন কি কেহ কেহ ইহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; কিন্তু তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ বিচারপূর্ব্বক তন্ত্রশাস্ত্র কখনও অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রকৃত তন্ত্রজ্ঞসাধকের নিকট তন্ত্রের রহস্য ও আবশ্যকত্ব সবিশেষ অবগত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের ধারণা কতদূর ভ্রমাত্মক; তখন ঘৃণা করা দূরে থাকুক, অনেক পাশ্চাত্য উদার মহাত্মাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইত যে, তন্ত্র ও তান্ত্রিক উপাসনাই সর্ব্বযুগের বিশেষতঃ "ঘোর কলিযুগে"র অজিতেন্দ্রিয়, দৈহিক ও মানসিক বলহীন, স্বল্পায়ুঃ মানবগণের একমাত্র নিস্তারের উপায়। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চিরকালই সুসভ্য মনুষ্য সমাজে স্বীয় স্ত্রীর সহিত মৈথুন সন্তানোৎপাদন, পরিমিত মদ্যপান ও মাংস, মৎস্য মুদ্রাদি ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বৈদিক সৌত্রামণিযজ্ঞে, বিশেষতঃ তান্ত্রিক উপাসনায় বীরাচারের কথা শুনিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠেন কেন, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শিব স্বয়ং তন্ত্রে বলিয়াছেন "যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব স্বর্গমাপ্নুয়াৎ" অর্থাৎ বিধিমত যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে লোকের স্বর্গসুখ লাভ হয়, সেই কার্য্যই আবার অবিধিমত অনুষ্ঠিত হইলে তাহার নরক-যন্ত্রণাপ্রদ হয়।

ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, ঘৃত, শরীরের পুষ্টিকর ও আয়ুর্বর্দ্ধক হইলেও উহা অপরিমিত ভক্ষণে অতিসারাদি উৎকট রোগ উৎপন্ন করিয়া ঘৃত ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন করে, আবার

কালকূট বিষ, সর্ব্বজীবের প্রাণনাশক হইলেও ঘোর বিকার-গ্রস্ত মুমূর্ষু রোগীকে যথোক্ত অনুপানে-র সহিত পরিমিত মাত্রায় যথাশাস্ত্র বিশোধনকরতঃ উপযুক্ত সময়ে সেবন করাইয়া তাহার মস্তকে শীতল জল-ধারা দান ও তক্রাদি পথ্যের ব্যবস্থা করিলে উক্ত মুমূর্ষু রোগীর সম্বন্ধে ঐ কালকূট বিষ মৃতসঞ্জীবনীর কার্য্য করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘজীবী করে; সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে নানাবিধ বিকারগ্রস্ত লোকদিগের ভবরোগ নিবারণ করিয়া নিত্যানন্দময়, জরামরণাতীত, পরমপদ দিবার জন্যই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শ্রীশ্রীকালিকামন্ত্র ও তৎসাধনোপযোগী তেজোবর্দ্ধক মকার পঞ্চকের ব্যবস্থা স্বয়ং মহেশ্বর বৈদ্যনাথই করিয়াছেন, উহা কৈবল্যমুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই। সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরাই অতিকৃশ জীবনী-শক্তিহীন রোগীদিগকে সত্বর সবল ও সতেজ করিবার জন্য নিরূপিত মাত্রায় মদ্য ও মৎস্য মাংস সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন; এবং সত্যসত্যই ঐ ব্যবস্থামত চলিয়া রোগী শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্র ঘৃণাস্পদ হইতে পারে না। সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত জীবদিগের আশুমুক্তি-লাভের জন্য জগদ্গুরু শ্রীশিব তন্ত্রসারে পঞ্চ-মকারের সাহায্যে মহাশক্তি-সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র নিন্দনীয় হইতে পারে না। ফলতঃ আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি যে, আমাদের শরীর রোগগ্রস্ত হইলে আমাদের মনও বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, আবার মন কোনরূপ ক্লেশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরও কৃশ হইয়া পড়ে; কিন্তু শরীর কোনরূপ জৈবিক আহার ভিন্ন পুষ্ট হইতে পারে না, ঐ জৈবিক খাদ্যই মৎস্য, মাংস ও গোদুগ্ধাদি; ইহার মধ্যে মৎস্য ও মাংস আহার করিতে হইলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জীব-হিংসা করিতে হয় নিশ্চয়, কিন্তু গব্যদুগ্ধ বা ঘৃতাদিও নিরীহ গোবৎসকে জোরপূর্ব্বক তাহার নিজস্ব মাতৃধনে বঞ্চিত করিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত হইতে পারে না, ইহা কি একটী গুরুতর পাপকার্য্য নহে? "অহিংসাপরমোধর্ম্ম" মতাবলম্বী বৌদ্ধেরাও মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্বহস্তে পশু হিংসা করেন না। বস্তুতঃ শরীর ও মনকে সবল ও সতেজঃ রাখিতে না পারিলে ব্রহ্মধ্যান ধারণা কিছুই হইতে পারে না, তজ্জন্যই শক্তি-সাধকের বিধিপূর্ব্বক পঞ্চ-মকার সেবনের ব্যবস্থা তন্ত্রে রহিয়াছে। তন্ত্রের কোন স্থানে শিব এরূপ বলেন নাই যে, হে শক্তিসাধকগণ! তোমরা সর্ব্বদাই স্বেচ্ছা-মত মদ্য পান করিও, পশু বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিও, এবং সর্ব্বদাই অবৈধ মৈথুনে নিরত থাকিও, তাহা হইলে অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে; পরন্তু তিনি এই সকল পাশব অত্যাচার ক্রমশঃ নিবারণের জন্য নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন

এবং ঐ আচারকে ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গীভূত করিয়া অমিতাচার নিবারণ করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। কতকগুলি সাধকত্বাভিমানী তান্ত্রিক নামধারী মহাপশুর আচারভ্রষ্টতাই সর্ব্বসাধারণের তন্ত্রশাস্ত্র প্রতি বিরাগ ও ঘৃণার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন "সুরাদ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাং। ইয়ন্ত্বেবারুণীদেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা। নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনং। শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেদতিপানাৎকুলেশ্বরি। পশুরেব সমস্তবাঃ কুলধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ।" কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন "অবিধানেন যোহন্যাদাত্মার্থাং প্রাণিনঃ প্রিয়ে। নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুলোমভিঃ।" এই সকল শিবোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি তন্ত্রের কোনস্থানে সর্ব্বসাধারণকে স্বেচ্ছাচারে পঞ্চমকারের সেবন ব্যবস্থা দেন নাই। তিনি কেবল নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী মুমুক্ষুসাধকদিগের জন্যই বীরাচার বা কুলাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুমুক্ষু নির্ব্বিকল্পসাধকেরা মহাদেবীর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই আনন্দ-স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্ত শিব পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কখন মিষ্ট রসস্বাদন করে নাই, তাহাকে প্রথমে যেমন গুড় কিম্বা মধু খাইতে দিয়া সহরের নানাবিধ সুস্বাদু সন্দেশাদির রস উপলব্ধি করাইতে হয়, সেইরূপ অনিত্য বিষয়ানন্দাত্মক পঞ্চমকার বিধিমত সেবন করাইয়া সাধককে ঈশ্বর ধ্যান ধারণা সহযোগে নিত্যব্রহ্মানন্দের আভাস দেওয়া হয়, তখন মুমুক্ষু সাধক নিত্যব্রহ্মানন্দের ক্ষণিক আস্বাদন পাইয়া উহা অপরিচ্ছিন্নরূপে লাভ কামনায় স্বয়ং উৎকণ্ঠিত ও যত্নবান্ হয়, এবং অদম্য উদ্যমের সাহায্যে ও বিচারগুণে সহজ ব্রহ্মানন্দ লাভের পর আর তাহার মকার পঞ্চক গ্রহণের লিপ্সা থাকে না, তখন তিনি 'দিব্যস্তদেবতাপ্রায়ঃ" হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

যথাবিধি শোধিত মদ্য পরিমিত মাত্রায় গৃহীত হইলে উহা সাধকের বহিরিন্দ্রিয়দিগকে তৎকালের জন্য শিথিল করিয়া অন্তর্মুখী করে এবং অন্তরিন্দ্রিয়মনও তখন স্থির হইয়া সূক্ষ্মধ্যানের উপযোগী হয়, এজন্য মদ্যকে কারণ বলা হয়।

কুলার্ণব তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চদেহে ব্যবস্থিতং। অস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে। তৃপ্ত্যর্থং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানং বিধায়চ। সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়াচেৎ সপাতকী।" অর্থাৎ দেবতার তৃপ্তির জন্য এবং স্বহৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণের জন্যই সাধকেরা পঞ্চমকার সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ভোগের নিমিত্ত উহা গ্রহণ করে, সে মহাপাতকী ঘোর নিরয়গামী হয়। তাই কুলার্ণব বলিয়াছেন "যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।"

পঞ্চম মকার অর্থাৎ মৈথুন, এই ভাব, জগতের সৃষ্টির মূলকারণ। কি দেবতা, কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীই স্ব স্ব পিতা-মাতার মৈথুন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ জগতে পুরুষ মাত্রেই আদি পুরুষ শিবের ব্যষ্টিভূত মূর্ত্তি; চণ্ডীতে বলিয়াছেন "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাজগৎসু" অর্থাৎ স্ত্রীজাতি মাত্রেই মহাশক্তির অংশ সম্ভূতা * এক ব্রহ্মই দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া শিবশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং শিবশক্তির মিথুনভাবই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। কূর্ম্ম পুরাণে কূর্ম্ম বলিয়াছেন, "একানেক বিভাগস্থা মায়াতীতা সুনির্ম্মলা। মহামায়েশ্বরী নিত্যা মহাদেবী নিরঞ্জনা। পুরাণী চিন্ময়ী পুংসামাদি পুরুষরূপিণী॥" আবার গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, "পুংসোরূপং স্ত্রিয়ারূপং যস্মাত্তদ্রূপ-মুত্তমম্। সর্ব্বং স্বরূপং তস্যা এব ন সংশয়।" শিবশক্তির এই আনন্দময় মিথুন ভাবই এই জগৎসৃষ্টির আদিকারণ, তজ্জন্য মনুষ্যাদি সকল প্রাণীই সর্ব্বদা আনন্দ অন্বেষণ করে, কিন্তু ঐ আনন্দ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গম সময়ে যেরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, অন্য কোনও বৈষয়িক সুখভোগে তদ্রূপ হয় না এবং সেই আনন্দময় অবস্থাতেই স্ত্রীপুরুষ দেহে জীবোৎপাদিনী শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।* এই সংযোগ সময়ে সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাজনিত সুখ-ভোগে নিরত থাকে কিন্তু কুলজ্ঞানী সাধকেরা স্ত্রীপুরুষের হৃদয়াবস্থিত শিবশক্তির যোগানন্দমূর্ত্তি চিন্তাকরতঃ স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। কালীকুলসর্ব্বস্বে শ্রীশিব বলিয়াছেন, "সুরতেষু মনুং জপ্ত্বা স্বস্বা ভগবতীং শিবাং। সর্ব্বপাপৈঃ পরিত্যক্তো মানবঃ স্যাৎশুকোপমঃ।" অন্যত্র বলিয়াছেন "শিবোভূত্বা শিবাং যজেৎ॥"

আর এক কথা এই যে "শক্তি সাধনা" অর্থ যে কেবল স্ত্রীপুরুষ-সঙ্গম তাহা নহে, শিব তন্ত্রের অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে কি বৃদ্ধা, কি যুবতী অথবা কুমারীদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বীয় অভীষ্ট দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মনে করিয়া সমর্থ হইলে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অথবা কেবল মনে ইষ্টমন্ত্র স্মরণকরতঃ মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে, ইহাতে কোন জাতিবিচারাদি করিবে না এবং কখন কোন প্রকার তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ জগন্মাতার জগন্ময়মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইবে, ইহাই প্রকৃত শক্তিসাধনা। কৌলাবলী তন্ত্রে বলিয়াছেন "কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ

---

* আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভি সংবিশন্তীতি॥

ভৃগূপনিষৎ॥

* শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ মহেশ্বরী। সর্ব্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মাৎ তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥

শিবপ্রণাম।

সমাহিতঃ। বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা। কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য জপঞ্চরেৎ। তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপিচাপ্রিয়ম্। সর্ব্বথা ন চ কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধিরোধ কৃৎ॥"

বর্ত্তমান সময়ে মদ্যমাংসাদির পরিমিত ব্যবহার এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সর্ব্ববিধ সম্মান প্রদর্শন, সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সবিশেষ দৃষ্ট হয়; তজ্জন্যই জগন্মাতা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী ঐ জাতির প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া সমগ্র জগতের রাজশক্তি সমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীসদাশিবনাথ মহাকাল প্রণীত মহাদেবীর স্বরূপাখ্য "কর্পূরাদি স্তোত্রে" পরব্রহ্মরূপিনী শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকার মন্ত্র, যন্ত্র, ধ্যান ও সাধনার স্বরূপতত্ত্ব সঙ্কেতে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে এই স্বরূপতত্ত্ব আগমতত্ত্বজ্ঞ সদগুরুর বিশেষ কৃপাব্যতীত জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। যাহা হউক আমি সদ্গুরু তান্ত্রিকচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় পরমারাধ্যতম ৺রামানন্দ স্বামীর "সিদ্ধান্ত পঞ্চাননের" উপদেশানুসারে তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই স্বরূপাখ্য কর্পূরাদি স্তোত্রের "বিমলানন্দদায়িনী" নামক স্বরূপ ব্যাখ্যা লিখিলাম। ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি না থাকায় অনেক স্থলে হৃদগতভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারি নাই, সুতরাং এই দুষ্কর কার্য্যে আমি কোনরূপ যশের আকাঙ্ক্ষা করি না। এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া যদি কোন সাধকের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, অলমতি বিস্তরেণ ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

অথ ক্ষমা প্রার্থনা।

"কালাভ্রশ্যামলাঙ্গীং বিগলিত চিকুরাং
খড়্গমুণ্ডাভিরামাং,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং
দীর্ঘদেহাং।
সংসারস্যৈকসারাং মনসিচ ন কদা
ভাবিতো ভাবনাভিঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে
কামরূপে করালে॥"
"ত্বং ভূমিস্ত্বং জলোঘস্ত্বমসিহুতবহস্ত্বং
জগৎ বায়ুরূপা,
ত্বঞ্চাকাশোমনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎ
পূর্ব্বকাঃস্কাশ্চ।
আত্মাচৈবাসি মাতঃ পরমপি ভবতী
ত্বৎপরংনৈব কিঞ্চিৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে
কামরূপে করালে॥"
'শম্ভুঃ পঞ্চমুখেনৈব গুণান্ বক্তুং
ক্ষমোনতে।
চাপল্যং যৎকৃতং সর্ব্বং ক্ষমস্ব শুভদাভব॥
প্রাণান্ রক্ষ যশোরক্ষ পুত্রদারধনং তথা।
দেহান্তে দেহিমে মুক্তিং জগন্মাত
নমোঽস্ততে॥"

শ্রীবিমলানন্দ স্বামিনঃ।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

—:০:—

কিরূপে রাজ্য সমুৎপন্ন হয়? ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভগবান্ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা—"য এষ রাজন্ রাজেতি শব্দশ্চরতি ভারত। কথমেষ সমুৎপন্নস্তন্মেব্রুহি পরন্তপ"॥ হে রাজন্ ভারত! এই যে রাজা শব্দ জগতে প্রচলিত আছে হে পরন্তপ! কি প্রকারে ইহা অর্থাৎ রাজশব্দ-বাচ্যার্থ সমুৎপন্ন হইল আমাদিগকে বলুন। নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যকর প্রশ্ন। কেবল ভারতে নয়, কেবল পুরাকালে নয়, পরন্তু পাশ্চাত্যদেশেও অদ্যাপি এই প্রশ্ন। সচেতাগণের অন্তঃকরণকে দোলায়মান করিতেছে। রাজ্যের সমুৎপত্তিও নীতি-শাস্ত্রের প্রবীণ উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারণীয় বিষয়। রাজ্যের সমুদ্দেশ্য ও স্বরূপ ইহা-দ্বারাই নিশ্চয় করিতেছে ;—

এ বিষয়ে ভারতীয় রাজশাস্ত্রপ্রণেতা-বর্গের পঞ্চবাদ প্রতীতি হইতেছে ১। সময়বাদ ২। বেদবাদ ৩। দৈবকারণ-বাদ। ৪। সজ্ঞানোৎপত্তিকবাদ। ৫। উৎক্রান্তিবাদ ইতি।

সময় অর্থাৎ শপথ, যেহেতু অমরকোষে কথিত আছে সময়ঃ শপথাচারঃ কালঃ সিদ্ধান্ত সংবিদ ইতি। মহাভারতে ভীষ্ম বলিয়াছেন যথা "অরাজকাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা বিনেশুরিতি ন শ্রুতং। পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্। সমেত্য তাস্ততশ্চক্রুঃ সময়ানিতি শ্রুনঃ। বাক্‌শূরো দণ্ড পরুষো যশ্চ স্যাৎ পারদারিকঃ"॥

জলে বলবান্ মৎস্য যেমন নিজেদের অপেক্ষা হীনবল মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে সেইরূপ পূর্ব্বে প্রজাসকল অরাজকনিবন্ধন পরস্পর-ভক্ষিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইত ইহা শুনা যায়। তদনন্তর প্রকৃতিপুঞ্জ পরস্পর সমবেত হইয়া ইনি বাক্যবীর কঠোরদণ্ড ও পারদারিক রাজা, অতএব ইহাকে রাজপদচ্যুত করিতে হইবে এইরূপ শপথ করিত ইহাও শ্রুত আছে। এই বাদকে আমরা "সময়বাদ" এই আখ্যা দিয়া থাকি।

পূর্ব্বে দেশসকল অরাজক ছিল কোন রাজ বা রাজ্য ছিল না, এই অরাজক দশায় প্রজাসকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। অরাজক দশার ভয়প্রদ বর্ণনা মহাভারতাদি নীতিগ্রন্থে সুবিস্তর দেখা

যায়। প্রজাসকল সেইরূপ দুর্বিবহ ব্যাপারে প্রপীড়িত ও কাতর হইয়া "ইনি আমাদের রাজা" (যেহেতু ইনি সর্বাপেক্ষা বলবান্ এবং আমাদের পরিরক্ষণে ও ভয়নিরাকরণে সমর্থ) এই বলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইল। এইরূপে রাজা বা রাজ্যের সমুৎপত্তি। সময়বাদীর মতে রাজার সত্তা ও রাজ্যের সংস্থান অনিবার্য্য।

"অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্ম্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে।
পরস্পরঞ্চ খাদন্তি সর্বথাধিগরাজকং॥"

রাষ্ট্র অরাজক হইলে ধর্ম স্থিতিলাভ করিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করে এজন্য সর্ব্বতোভাবে অরাজককে ধিক্। তাহা হইলে অরাজক অবস্থাতেও রাজ্যের রাজার আবশ্যকতা সময়বাদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যেহেতু রাজার নিযুক্ত বা উৎপত্তি স্বয়ং প্রজাকৃত, এজন্য রাজা দাসস্বরূপ। অতএব শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্বভাগভৃত্যা দাস্যত্বে প্রজানাঞ্চ নৃপঃকৃতঃ।
ব্রহ্মণা স্বামিরূপস্তু পালনার্থং হি সর্ব্বদা॥"

রাজ্যোৎপত্তি বিষয়ে দ্বিতীয়বাদ "খেদ-বাদ" ইহা মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

নিয়ত ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্ব্বমশেষতঃ।
যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ॥

অর্থাৎ হে নরশার্দ্দূল! সমস্ত নিয়ম সম্যক্‌রূপে শ্রবণ কর, যেরূপে সত্যযুগে প্রথমে রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ উপক্রম করিয়া আচার্য্য ভীষ্ম রাজ্যের সমুৎপত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কোন রাজা বা রাজ্য এবং দাণ্ডিক বা দণ্ড ছিল না। প্রজারা ধর্ম্মবলেই পরস্পর রক্ষিত হইত, মানবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারাই অন্যোঽন্যকে প্রতিপালন করিত; সে সময় রাজসংস্থার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু পরে সেই প্রজাসকল অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর মোহ সেই প্রজাসকলের হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর হইল। খেদ ও মোহবশতঃ প্রতিপত্তিবিমূঢ় মানবের ধর্ম্মও বিনষ্ট হইল। মানব ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইলে কাম ক্রোধ লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া ত্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহার প্রমাণ—

"তে ত্রস্তা নরশার্দ্দূল! ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ।
প্রসাদ্য ভগবন্তং তং দেবং লোকপিতামহং॥"

পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। এই খেদবাদে অরাজক দশায় সকলে ক্ষীণবল মৎস্য সদৃশ অভিভূত হইত না। সেই অরাজক আদর্শও ধর্ম্মযুক্ত ছিল। সময়বাদে অরাজক অবস্থা নিতান্ত ভয়প্রদা, ধর্ম্মবিহীনা এবং পাপসমাকুলা। তৃতীয়বাদ দৈবকারণ বাদ। এই বাদ রাজাকে পরমাত্মসম্ভূত বলিয়া থাকে। ঈশ্বরই রাষ্ট্রে রাজারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এ কথা মনু বলিয়াছেন যথা—"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষা মনুপূর্ব্বশঃ, বর্ণানামাশ্র-মানাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা"॥

"অরাজকে হি সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। রক্ষার্থমস্য লোকস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

রাজার উৎপত্তি পরমাত্মকৃতা ইহা মনুর অভিপ্রায়, আরও মনু বলিয়াছেন—
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
এই দৈবকারণবাদ কৌতূহলের সহিত দেখা উচিত। বালক হইলেও রাজা দেবাংশ, অতএব তাঁহার অবমাননা অবিধেয়। রাজা পরমাত্মা প্রেরিত। তাঁহার সহিত বিরোধ করা কোনপ্রকারে কর্ত্তব্য নহে। রাজা সকলেরই আশ্রয়নীয় ও প্রসাদনীয়। মনুর এই সিদ্ধান্ত পুরাণাদিও সমর্থন করিয়াছে। পদ্মপুরাণে কথিত আছে—'নারায়ণাংশজো রাজা মনুষ্যো ন কদাচন। অতস্তু দুর্গং ত্যক্ত্বা সর্ব্বাং নীতিং সমাচরেৎ॥" রাজা নারায়ণের অংশ সে মনুষ্য নহে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি দেবতাস্বরূপ। ভগবদস্তিত্ব অস্বীকারকারী চার্ব্বাকগণও স্বয়ং পৃথিবীশ্বরকেও ঈশ্বর বলিতেন। চার্ব্বাকগণের এই সিদ্ধান্ত। কণ্টকাদিজন্য দুঃখই নরক, লোকসিদ্ধ রাজা পরমেশ্বর, দেহোচ্ছেদ অর্থাৎ মৃত্যুই মোক্ষ। রাজ্যোৎপত্তি বিষয়ে আরও অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি রাজাকে সজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রজাগণ স্বয়ং সম্যক্ প্রকারে সুবিচারপূর্ব্বক রাজসংস্থা সম্পাদিত করিয়া থাকে। একথা অথর্ব্ববেদে কথিত আছে—"যথা ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্ববির্দস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রেঃ ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবাউপসন্নমন্তু।"

অথর্ব্ববেদের অন্তর্স্থিত উৎক্রান্তিবাদও বর্ণনা করিতেছি। সম্প্রতি পাশ্চাত্য বিদ্বানগণও রাজ্যোৎপত্তি বিষয়ে উৎক্রান্তিবাদকে প্রামাণিক স্বীকার করিয়া থাকেন। পরিবার, গ্রাম সভাদি দশাতে উপক্রম করিয়া অন্তে রাষ্ট্রদশা সম্ভব হয় ইহা তাঁহাদের মত। এই উৎক্রান্তিবাদ বেদসূক্তে স্পষ্টরূপে দেখা যায়। "বিরাট্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যাজাতায়াঃ সর্ব্বমবিভেৎ ইয়মেবেদং ভবিষ্যতি" এই বেদসূক্ত বিস্তারভয়ে সামান্যরূপে লিখিয়া তাহার সংক্ষেপ অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বে এই জগৎ বিরাট্ ছিল রাজবিহীন অরাজক ছিল সে সময় কোনও রাজা বা রাজ্য ছিলনা সেই অবস্থায় প্রজাসকল ভীত হইয়া অবস্থান্তর কামনাপূর্ব্বক উৎক্রমন বা উৎক্রান্তি (উর্দ্ধলোকে গমন) করিয়া অতঃপর প্রজা গার্হপত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইত, তখন গৃহরচনা হইত এবং গৃহনিবাসী রক্ষক গৃহপতিও হইত পুনরায় উৎক্রান্তিদ্বারা আহবনীয়াবস্থা প্রাদুর্ভূত হইত। আহবনীয়াবস্থা কাহাকে বলে? আ সমন্তাৎ হূয়ন্তে গৃহপতয়ঃ যস্যাবস্থায়াং সা আহবনীয়া। অর্থাৎ গৃহপতি সকল আহূত হয় যে অবস্থায় তাহা আহবনীয়াবস্থা। এরূপে গ্রাম বা গ্রামসংস্থার দশা সম্প্রাপ্ত হয়। পুনরায় প্রকাশিতভাবে দক্ষিণাগ্ন্যবস্থা সমাগত। দক্ষিণাগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি অগ্নি অগ্রণীকে দক্ষিণ চতুরকে বলে—"চতুরা অগ্রণ্যঃ যত্র সমবেতা ভবন্তি সা সভা দক্ষিণাগ্নিঃ।" গ্রামসংস্থার চারিটি অগ্রগণ্য

ব্যক্তি যখন মিলিত হইয়া শাসন করেন সেই দশা দক্ষিণাগ্নি। তারপর পুনরায় উৎক্রান্তিদ্বারা সভার দশা উপস্থিত হইল, প্রাদেশিক শাসন-পরিষৎকে সভা কহে। তদনন্তর সমিতিরও নির্ম্মাণ হইল। এক রাজ্যের ব্যবস্থাপিকা সভার নাম সমিতি। পশ্চাৎ আমন্ত্রণাবস্থা সমাগত। যেখানে ভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সকল বিচারার্থ আমন্ত্রিত হয় তাহাকে আমন্ত্রণ বলে। এইরূপ এই বেদসূক্তে রাজ্যসম্বন্ধি বিকাশের পূর্ণ ও অপূর্ব্ব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজ্যের বিষয় বর্ণনাকারী প্রাচীন নীতিশাস্ত্রজ্ঞাপন "প্রজার প্রত্যেক কর্ম্ম রাজ্যাধিকৃত হইবে" এই কথা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অতএব প্রাচীন নীতিজ্ঞান স্বধর্ম্মপরতা রাজ্যের সমুদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আচার্য্য চাণক্য বর্ণসমূহের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মঃ স্বর্গায় আনন্ত্যায় চ"। স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে লোক সমাজচ্যুত হয়। তাহার প্রমাণ—"তস্মাৎ স্বধর্ম্মংভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ। স্বধর্ম্মং সন্দধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি"॥ ব্যবস্থিতার্য্যমর্য্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। ত্রয্যা রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি॥ এইরূপ স্বধর্ম্মস্থাপন রাজ্যের উচ্চতম লক্ষ্য ইহা প্রাচীনগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই ভারতীয় সমাজ সংঘটনার রহস্য। প্রায় সকল নীতিবেদীগণ এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে সমাজের চারিটি বিভাগ মনে করিয়া থাকেন।

পুরাকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ দ্বারা সমাজ সংঘটিত হইয়াছিল। এবং সকল বর্ণই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপাদিত বিধি নিষেধাদি নিত্য নৈমিত্তিক পূজোপাসনা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মাচারণ দ্বারা মনের পাপ-প্রবৃত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া, পরস্পর সহানুভূতি করিয়া "পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ" এই কথাটিকে হৃদয়রাজ্যে সযত্নে রক্ষা ও পালন করতঃ নিঃশঙ্কচিত্তে বিমলানন্দে কালাতিপাত করিত। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের ভারতের—"তে হি নো দিবসাগতা" উপস্থিত হইয়াছে। সেই সমস্ত ধর্ম্মভাবগুলি কোথায় লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে।

যদি সকলে স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিত তাহা হইলে লোকযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত। এতাদৃশ অভাব অভিযোগ থাকিত না এবং হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষসমূহ স্বধর্ম্মাবলম্বী মানবহৃদয়ে স্থান-লাভের অধিকারী হইতে পারিত না। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের অভাবে সেই সমাজ-সঙ্ঘটনার শৈথিল্য আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমাদের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার প্রয়োজনীয়তা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে সমাজ সংঘটনা শৈথিল্য ও তন্নিরাকরণ বিষয়ক কথা সম্বন্ধে সংপ্রতি নিরস্ত থাকিলাম। এখন রাজা বা রাজ্যের ইহাই উচ্চতম উদ্দেশ্য যে, কেহ যেন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়। এই সিদ্ধান্ত অপর নীতিবেদিরাও

সমর্থন করিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন,—যথা—

রাজ দণ্ডভয়াল্লোকঃ স্ব স্ব ধর্ম্মপরো ভবেৎ
যো হি স্বধর্ম্মনিহতঃ স তেজস্বী ভবেদিহ।
বিনা স্বধর্ম্মান্ন সুখং স্বধর্ম্মো হি পরন্তপঃ
তপঃ স্বধর্ম্মরূপং যৎ বৰ্দ্ধিতং যেন বৈ সদা॥

মহাভারতকার ও প্রাচীন আচার্য্যগণের মত প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মস্থাপনই রাজ্যের লক্ষ্য মহাভারতে কথিত আছে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ধর্ম্মাশ্চ রক্ষিতব্যা মহীক্ষিতা
ধর্ম্মসঙ্কর রক্ষা চ রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতন॥

এতাদৃশ জনসংবিভাগ এবং তাহাদের ধর্ম্মস্থাপন আধুনিক নীতিবেদিগণ স্বীকার করিবেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু পুরাতন নীতিকারগণ এই সিদ্ধান্ত একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। পুরাণাদি গ্রন্থে এবং কামন্দকাদি নীতিশাস্ত্রে রাজসংস্থার আদর্শ এইরূপই দেখা যায়। যাহাতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সম্যক্ পালন হয় এবং কেহ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়। রাজনীতি শাস্ত্রের অন্যান্য বহু সিদ্ধান্ত প্রাচীন গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামময় কাব্যতীর্থ

অমরী

—:•:—

কে বলে সে গেছে চলে, কে বলে সে নেই?
বুকের মাঝে প্রাণের কাছে এই যে সে গো এই!
মনের কাঁটায় আছে ফুটি,
মোহন তারি অনুভূতি,
এই যে স্মৃতি,—এই ত প্রীতি! সেই ত সবি সেই;
গন্ধ আছে,—ফুল নেই? ভুল! মূল আছে গন্ধেই।

নীলাম্বরীর আঁচল তাহার নীল আকাশে দুলে,
রাত্রি হ'ল কালো—প্রিয়ার এলিয়ে-পড়া চুলে;
অলক্তেরি পরশ লাগি,
অশোক-পলাশ হচ্ছে দাগী,
চোখের চাওয়ায় জাগ্‌চে উষা, বেলা-শেষের কূলে
নাম্‌চে ছায়া—পড়্‌চে তারি চোখের-পাতা ঢুলে।

কে বলে সে গেছে চলে, কে বলে সে নেই?
ঘরে আমার বাইরে আমার এই যে সে গো এই!
দু'টি শিশু মোর দু'পাশে
এই যে আমায় ঘিরে' হাসে,
এত তারি দু'টি হাতের দু'টি পরশ সেই;
মরেও সে যে অমরী আজ আমার জীবনেই!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নূতন সাড়া

—— :•: ——

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতাগুলিতে যে নূতন ভাবের ধারা দেখা দিয়াছে বাংলার সকল কাব্য-পিয়াসীই তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবোধ একদিন 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং যাহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ দেশে ও বিদেশে কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রচারক বা বস্তুতন্ত্রের পরম বিরুদ্ধবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়া তাহার স্থানে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রস আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই মাধুর্য্য-রস নূতন নহে; তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উৎসের মাঝে ইহার প্রথম জন্ম। একদিন এই ভাব কবির অন্তরলোক সুরের বন্যায় ও নূতন নূতন আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছিল। অনেক বৎসর পরে এই ভাবের নূতন করিয়া আবির্ভাবের ফলে গত তিন বৎসরের মধ্যে বাংলা-কাব্য-সাহিত্য এমন কয়েকটি রত্ন লাভ করিয়াছে যাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানগুলির সমান আসন দাবী করিতে পারে। বিশ্বভারতী সম্প্রতি এই কবিতাগুলির কয়েকটি সঙ্কলিত করিয়া 'পূরবী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

কবির মনের যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই মানুষের এবং দ্বিতীয় যৌবন—যাহা তাঁহার প্রথম যৌবন অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক মহিম—ফিরিয়া পাওয়ার কথা বলিয়া আসিয়াছেন। "ফাল্গুনীর" মূলসূত্রটি ধরিতে পারিলেই এই কথার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। "ফাল্গুনী"র কবি দুরন্ত শীতের মধ্যে বসন্তের আভাস দেখাইয়াছেন তাঁহার মতে সাত রঙের মিশাল্ যেমন একটুকরা সাদা আলোর জন্ম দেয়, জীবনের সুখদুঃখের ছায়া-মাখানো বিভিন্ন বর্ণসমষ্টিও সেইরূপ বার্দ্ধক্যের শ্বেতাবরণের সৃষ্টি করে। যৌবনের ব্যথা ও আশীর্ব্বাদ এবং উদাত্ত ও বিশুদ্ধ 'আনন্দম্' এর মাঝে মিশিয়া যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধুনিক তারুণ্য-ভাবের কবিতাগুলি ও তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' ইত্যাদি কবিতা-গুলির মধ্যে এক অতি সূক্ষ্ম অমিল আছে। দুইয়ের মধ্যেই সুরের মিল দেখা যায় কিন্তু

মনের মিল নাই। দুইয়ের পরিকল্পনা ঠিক এক নয়। এই অমিল ঠিক কোথায় তাহা ধরা সহজ নহে। কেবল একান্ত ও গভীর অনুভূতি দিয়াই ইহার স্থান-নির্দ্দেশ হইতে পারে। এই বিশেষ রূপটি বুঝিতে হইলে প্রথমে অনেক দূর পিছাইয়া গিয়া তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের কবিতাগুলির বিষয়ে দুই এক কথা বলা দরকার।

'জীবনদেবতা' পর্য্যায়ের কবিতা—

'জীবনদেবতা'র স্বরূপ লইয়া অনেকেই অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ই, জে, টম্সন্ বলেন, "The Jibandebata is the oversoul who binds in sequence the poet's successive incarnations and phases of activity* যে পরমাত্মা কবির কার্য্যপর্য্যায় ও বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি ক্রমানুসারে গাঁথিয়া দিয়া থাকেন, তিনিই জীবন দেবতা।

এইরূপ বিশেষ কোনও সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ না করিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'-পর্য্যায়ভুক্ত দুইটি কবিতা হইতে কয়েকটী চরণ উদ্ধৃত করিব, যাহাতে কবির নিজের কথা তাঁহার মানস-প্রতিমার প্রকৃত রূপ দেখাইয়া দিবে। 'জীবনদেবতা'র প্রথম সুর—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিনী,
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিত ফুল-কাননে
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী।*

এই চরণগুলিতে 'জীবন-দেবতা'র কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'জীবনদেবতা' কবিকে নানা রূপের মাঝে ফুলের মত ফুটাইয়া তুলিতেছেন। অসংখ্য বাধা উদ্যত হইয়া উঠে, গানের ঝর্ণা শুকাইয়া যাইতে চায়, অসম্বদ্ধ ভাব ও আদর্শের আলো-আঁধারিয়ায় পথ ভুলিয়া কবি অংশের মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। তখন জীবন-দেবতা নামিয়া আসে—কবির মনে আত্ম-দর্শন (self-consciousness) জাগাইয়া দিয়া তাহাকে এক মহৎ সন্ধানে নিয়োজিত করে—সে ভূমার সন্ধান।

এই 'জীবনদেবতা'র প্রথম প্রকাশ, 'সোনার তরী' 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'তে। আরও পূর্ব্বে লিখিত 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইহার ছায়া দেখা যায়—তবে সে যেন ঘোমটার আড়ালে। 'প্রতিধ্বনি'র বাণী শতগুণ প্রতিধ্বনিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'সোনার তরী' পর্য্যায়ের কবিতাগুলির সৃষ্টি করিয়াছে।

কবির মনে সকল উচ্চ অনুভূতির

---

* Rabindranath Tagore. p. 74

* "চিত্রা।"

দুয়ার খুলিয়া দিয়া 'জীবনদেবতা'-ভাব ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

'ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।'*

সৃষ্টির মধ্যে শুধু যে একটা প্রবল উল্লাস আছে তাহাই নহে—ব্যথাও আছে। সন্তানের জন্মের সময়ে মায়ের মনে যে ভাব আসে, দুঃসহ ব্যথা ও নিবিড় আনন্দের মিশ্রণে তাহার উৎপত্তি।

ব্যথা ও আনন্দের মধ্যে কিসের পরিমাণ অধিক তাহার যথার্থ নির্দ্ধারণ মনস্তত্ত্ববিদের কার্য্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ব্যথার সুর বা আনন্দের ঝঙ্কার সমধিক ব্যক্ত হইতেছে তাহা বলা কঠিন। 'নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম'—হৃদয়ের সব রস প্রিয়তমের উদ্দেশে, জীবন-দেবতার উদ্দেশে, দেওয়ার মাঝে ব্যথা ও আনন্দ দুইই রহিয়াছে। এই সৃষ্টির বেদনা ও জন্ম 'জীবনদেবতা'র কাছে কবির সম্পূর্ণ আত্মদানের পথ খুলিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর এই ভাবের শেষ। কবির 'অহং' বা 'আমি—যাহা 'জীবনদেবতা' কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ রূপে একই—তাহা ক্রমে মিলাইয়া গেল ও 'তুমি' ভাব আসিয়া কতকগুলি নূতন ধরণের কবিতার সৃষ্টি করিল। ১৯০১এ 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়। এই ভাবের পরিবর্ত্তন 'নৈবেদ্য'তেই প্রথম উপলব্ধি করা যায়। তাহার পর ১৯০৫এ 'খেয়া'র প্রকাশ। 'খেয়া'র পরে 'গীতাঞ্জলি' কবিতাগুলির আবির্ভাব।

গীতাঞ্জলি ভাব

এই কবিতাগুলির বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী 'কাব্য-পরিক্রমা'য় সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত ইহাদের বিচার করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন।

নূতন ভাব

কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-ভাবেরও পরিবর্ত্তন আসিল। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটিতে ইহার প্রথম সূচনা।

'যৌবন বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,'

সে কতদিনের কথা তখন কবির অন্তর এক মায়াকাঠির স্পর্শে খুলিয়া গিয়াছে। যৌবন ও বসন্তের গানে তাঁহার সারা বুক ভরপুর। তখন, 'আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।'

* জীবন-দেবতা।

এই নিবিড় অনুভূতি তরুণ রবীন্দ্রনাথের শিরায় শিরায়। এতদিন পরে দখিণা হাওয়া 'গীতাঞ্জলি'র কবির মনে অকস্মাৎ সুদূর-হইতে-ভাসিয়া-আসা গন্ধের চমকের মত সেই অতীতের স্মৃতিগুলি ফিরাইয়া আনিল। কবির মনে যে ক্রমবিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছিল, তাহার ফলে তিনি জীবনের প্রথম তরুণিমার সেই সহজ, স্বচ্ছ গানের সুর হারাইয়াছিলেন। যে সুর ছিল ভোরের পাখীর উচ্ছ্বসিত কাকলির মত। একটা জটিল দর্শনবাদ তাঁহার কবিতাকে চারিদিক্ হইতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। 'গীতাঞ্জলি'র কবি 'উর্ব্বশী' বা 'মানস-সুন্দরী'র মত অপরূপ সুন্দর একটি কবিতাও লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। 'দখিণ হাওয়া' কবির মনে সেই দিনগুলিকে ফিরাইয়া আনিল যখন কবি ও বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে এতটুকুও পর্দ্দার আড়াল ছিল না। অমনি কবির বৈরাগ্যের বাঁধন খসিয়া পড়িল,—'বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান!'

ইহার পরের কবিতাটিতে আরও একটু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কবির নূতন মানসীর ছবির রূপরেখাগুলি ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে:—'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল'—এই সুন্দর গতিদোদুল ছন্দের নৌকায় দাঁড়-টানার সুরে দুলিতে দুলিতে কবি-মানসী তাহার প্রিয়ের নিকট আসিয়া দেখা দিল। তাহার প্রথম দেখাতেই কবির হাতের একতারাটি অজান্তে কখন খসিয়া পড়িল ও বসন্ত আসিয়া নিজের নানাতারের বীণাটি কবির হাতে তুলিয়া দিল।

কিন্তু যে আসিল সে কে? কবির মন আগ্রহে কম্পিত সুরে গাহিয়া উঠিল, 'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল।' 'কোকিল' 'দোয়েল', 'অশোকপাতা' 'কনক-চাঁপা' ইহাদের মনেও সেই একই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। ইহার উত্তর দিল ছোট একটি ফুল—সে বনমল্লিকা। সেই তাহার শুভ্র অন্তর দিয়া সকলের পূর্ব্বে নবাগতার স্বরূপ বুঝিয়া গাহিয়া উঠিল, কবি—'বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।'

এই কবিতাটীতে অনুপম সুন্দরভাবে এগুলি চিত্রিত হইয়াছে। কবি ও বিশ্ব-প্রকৃতি যেন একই—ফুল, পাখী, সকলেই কবির আনন্দ-সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সৃষ্টির পুলক শুধু বুঝি মানবের মনে জাগে না। জগতের সৌন্দর্য্য-পাপড়ির একটিতেও যদি নূতন রঙ্ লাগে, তাহা হইলে, বুঝি সমস্ত বিশ্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। Wordswarth-এর মত রবীন্দ্রনাথের চিত্তবীণাতেও এই সুর বঙ্কৃত—

> To me the meanest flower
> that blows can give
> Thoughts that do often lie
> too deep for tears.

ইহার পরের কবিতার এই নূতন পরি-

কল্পনা ছায়া হইতে কায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল!
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।' *

এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসে। এ কেমন করিয়া হয়? তবে কি এ সেই, যাহার উদ্দেশে তরুণ রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-দেবতা'-ভাবের সময়ে একদিন গাহিয়াছিলেন,

'বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জাগাইয়া দাও—'†

আমরা রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই দুই পরিকল্পনা ঠিক এক নয়। কবির এই আধুনিক ভাব-জাগানিয়া (Inspirer) তাঁহার নূতন সৃষ্টি 'জীবনদেবতা' নয়—'জীবনদেবতা'র একটা পরিবর্ত্তিত ও বিভিন্নভাবে কল্পিত রূপ। এখানে দুই একটা অবান্তর কথার প্রয়োজন হইতে পারে। ভাবুক (Inspirer) ভাব-জাগানিয়ার সৃষ্টি করে ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? মনস্তত্ত্বের একটা সূক্ষ্ম ধারা অনুসারে এ কথার উত্তর দেওয়া যায়। মানুষ নিজেই তাহার ভগবানের (অর্থাৎ স্রষ্টার) সৃষ্টি করে। মানুষের ভালবাসা, ভক্তি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাহার অর্দ্ধচৈতন্যবিশিষ্ট অন্তরে (subconscious self) আপন আপন ছায়াপাত করিয়া থাকে। সেখানে তাহারা পরস্পর-সম্বদ্ধ এবং এক হইয়া যায়। কাল ও বিশ্বের অসীমত্ব মানব-হৃদয়ে যে অস্পষ্ট বিস্ময়ের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে, তাহা পূর্ব্বকথিত সুসম্বদ্ধ ভাব-গুলিকে একটা অলৌকিকত্বের আলোকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। তাহার ফলে মনে একটা ছবির সৃষ্টি হয়—তাহাকেই আমরা ভগবান বলিয়া থাকি। কবিও ঠিক ইহাই করেন। কবি নিজ ভাব-জাগানিয়ার স্রষ্টা। সেকালের গ্রীক্ কবিরা ও প্রাচীন ভারতের বড় বড় কবি—বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ঠিক ইহাই করিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথও এই পথের অনুবর্ত্তী। তিনিও তাঁহার কবি-জীবনের প্রায় প্রত্যেক অবস্থাতেই নিজ ভাব-জাগানিয়ার সৃষ্টি করিতেছেন।

মূল বিষয়ে ফিরিয়া যাওয়া যাক। কবির 'জীবন-দেবতা' ও এই নূতন পরি-কল্পনার মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম প্রভেদের ধারা রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'আহ্বান' কবিতাটিতে। এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের মনের গুপ্ত দুয়ারের চাবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে—কারণ ইহার পূর্ব্বের কবিতাগুলিতে যে ভাব কোরকের মত অতি ধীরে পাপ্‌ড়ি মেলিয়া দিতেছিল 'আহ্বানে' তাহা পূর্ণবিকসিত পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। কবির আধুনিক কবিতাগুলির

---

* লীলাসঙ্গিনী
† মানস-সুন্দরী

মধ্যে 'আহ্বান'কে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে; ইহার মিষ্টিসিজম্‌এর মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব প্রাণের স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

"আহ্বান"

গোর্কি, জর্জ্জ্‌ রাসেল্ (A.E,) ও রোমা রোলাঁর মত রবীন্দ্রনাথও কবি ছাড়া আরও-কিছু। তাঁহার স্বপ্নলোক কখনও কখনও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। জীবনের উদ্দাম ঘাত-প্রতিঘাত, বিভিন্নমুখী স্বার্থের প্রবল ও উন্মত্ত সংঘাত কবির মনকে আকুল করিয়া তোলে। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে কর্ম্মীরূপে পাই। মহামানবের ডাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনার মেঘমালায় মনের রেখায় কাব্যের ইন্দ্রধনু-রচনা ছাড়িয়া প্রাত্যহিক জীবনের বিশৃঙ্খলার মাঝে নামিয়া আসেন;—তাহার ব্যথা অনুভব ও আত্মার কল্যাণ-বিধান করেন। তাঁহার অন্তরের ঋষিভাব কবি-ভাবের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। আর্টিষ্ট মহামানবের নিকট মাথা নত করে। কবির জীবনে বারবার এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ইহার এক মৃদু সূচনা। 'বিশ্বভারতীর' জন্মের মধ্যে ইহার মহান্ পরিণতি। 'বিশ্বভারতীর' আদর্শ স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে মানব-জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্টের রাজ্য ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এমন একদিন আসিতে পারে (হয়তো সহস্র সহস্র বৎসর পরে; মানুষের বয়স ছয়কোটি হইলেও এখনও তাহার শিশুত্ব যায় নাই। মানুষ দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে এবং এখনও যে অনেক বৎসর ধরিয়া বাড়িবে তাহা মনে রাখা উচিত) যখন 'বিশ্বভারতী'র কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু আর্ট মানব জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের খাদ্য। * আর্টের স্থূল আদর্শটা যে পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহা নয়—হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস—কিন্তু আর্টের মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম বস্তু আছে যাহা নিরন্তর, যাহার কোনও বিকার নাই। সেইজন্য আর্টের স্থান সমাজ বা cultureএর অনেক উপরে।

এই সত্যটা রবীন্দ্রনাথ নিজে যতটা বুঝিয়াছেন খুব কম ভাবুকই তেমন নিবিড় করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই জন্য এই সকল কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বরাবর এক ফিরিয়া-যাওয়ার ডাক শুনিয়া আসিতেছেন—সে সেই চিরন্তনীরই ডাক। অকস্মাৎ কোন অজানা মুহূর্ত্তে কবির ব্যথিত আত্মবোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দিয়া বলায়—'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' যে বাণী

* রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট হলে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে একথা সমর্থিত হইয়াছে।

শুনাইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাণীর প্রচারই তাঁহার কাজ; অন্য সমস্তই শুধু ক্ষণিকের। চিরন্তনের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

'তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি,
গান গেয়ে উঠি—
"আছি, আমি আছি!"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াসা
ফেলে টুটি
বাঁচি, আমি বাঁচি!'

এখানে কবি যার আহ্বান শুনিয়াছেন সে এই নবাগতার অর্থাৎ চিরন্তন শক্তিরই বিশেষ একটি রূপ। এই ভাব 'আমি আছি'-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া কবির প্রতি-মুহূর্ত্ত অমরত্বের আনন্দে মণ্ডিত করিয়া দিতেছে।

কিন্তু সুরের 'অভিসারিকা' এই নবাগতা শুধু পলকের জন্য দেখা দেয়; কুহেলির গুণ্ঠনের ভিতর দিয়া চকিতে তাহার মুখের এতটুকু প্রকাশ পায়, কপোলের একটা দিক অস্পষ্ট বিদ্যুতের মত দেখা যায় আর মেঘের মত অলকের রাশি দুলিয়া দুলিয়া উঠে। কবিতার পুষ্পাসনে স্থান দেওয়ার জন্য কবি তাহাকে বারবার ডাকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে আসে না; কোন অজানা আড়ালের মাঝে লুকাইয়া পড়ে অকস্মাৎ কখন বাহিরে আসিয়া কবিকে পথের সন্ধান দিয়াই চপল চরণে পলায়। কবি তাঁহার 'মানসীকে' স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবসর পান না। আকুল আগ্রহে তিনি তার আসার আশায় জাগিয়া থাকেন। গানের সুরে তাঁহার সারা হৃদয় ভরিয়া উঠে। কিন্তু সুর জমাট-বাঁধা, তাহাকে ভাষায় এলাইয়া দেওয়া যায় না। সে যেন জলভারাক্রান্ত বর্ষার মেঘ, বিদ্যুতের পরশ পাইয়া ধারারূপে নামিয়া আসিতে চায়।

'নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে
আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই,
পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে
তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে, কোথা বসে
রয়েছ রমণী
নীরব নিশীথে?

এই পরশ-প্রতীক্ষার ব্যথা কবির মনে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, এই গানগুলির সহিত তাঁহার শেষ-গান গাওয়া হইবে। ইহার পূর্ব্বের একটি কবিতায় আছে, 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণী বীণ।' শুধু তাহারই শেষ বারে স্পর্শে এই পূরবীর ছন্দে বাঁধা বীণা অপূর্ব্ব সুর বাজিয়া উঠিবে -তাহার পর নিঃশেষজ্যোতি উল্কার মত অসীমের কোলে খসিয়া পড়িতে পারে!

অবশেষে প্রতীক্ষাক্লান্ত কবি নিবিড় ভাবাতিশয্যে নিরাশার সুরে গাহিয়া উঠিতেছেন,—

জানি জানি আপনার অন্তরের
গহন বাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না
নিভৃত মন্দিরে
শেষ-পূজারিণী?

এইখানেই যেন 'আহ্বানের' প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়! কবি তাঁহার অন্তরের গহনবাসী নব মানসীকে 'শেষ-পূজারিণী' নামে ডাকিতেছেন। সত্যই সে পূজারিণী। কবির গানের অর্ঘ্য দিয়া সে তাঁহারই পূজা করে—রক্তমাংসের রবীন্দ্রনাথকে নয়—রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরদিনের কবিকে।

কিন্তু সে আর আসিল না—তাই, 'অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি নিতে হল তুলে।'

'জীবনদেবতা'-ভাবের সহিত বর্ত্তমান ভাবের প্রভেদ এইখানে। 'জীবনদেবতা' 'পূজারিণী'তে পরিণত হইয়াছে। দুইয়ের মধ্যেই যথেষ্ট ঐক্য আছে, কিন্তু তথাপি ওই সূক্ষ্ম মনস্তত্বমূলক অমিলটুকু জানাইয়া দেয় যে, এই দুই মোটেই একেরই নামান্তর নয়।

এই 'শেষ-পূজারিণী'র নূপুরের ধ্বনি রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অনেক কবিতার এক অভিনব সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। এগুলি যেন একই সূত্রে গাঁথা। এই জন্য 'সোনার তরী' 'চিত্রা' ইত্যাদির কবিতাগুলিকে যেমন 'জীবনদেবতা' কবিতা বলা হইয়া থাকে, এই অপূর্ব্ব কবিতাগুলির তেমনি 'শেষ-পূজারিণী' কবিতা নাম দেওয়া যাইতে পারে। কাব্য-রসিকরা এ কথাটা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

'শেষ-পূজারিণী' ভাব বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে অনেক সহায়তা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-জীবনীকার ইহার মধ্যে এমন অনেক ভাব ও চিন্তার ধারা পাইবেন, যাহাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত আলোচনার আবশ্যকতা আছে।*

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য।

* গত চৈত্রের 'প্রবাসী'র পুস্তক পরিচয়ে 'পূরবী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহাতে সমালোচক একটা বিষয় বাদ দিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। সমালোচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভার কয়েকটি স্তর দেখানো হইয়াছে তাহার ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু মূল সমালোচনার বিষয়ে লেখক একটা বিশিষ্ট ধারা খুঁজিয়া পান নাই। 'জীবন দেবতা'-ভাবের সহিত বর্ত্তমান ভাবের পার্থক্য কোথায় তাহা লেখক বুঝিতে পারেন নাই। 'পূরবীর' সমালোচনার সহিত 'শেষ পূজারিণী' ভাবের অখণ্ড সম্বন্ধ আছে।—লেখক।

ইরাণে নরঘাতক সম্প্রদায়

—:০:—

ঈশাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতময় এক নরঘাতক সম্প্রদায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রচলিত ভাষাতে 'ঠগ' বলিত, তাহাদের উদ্দেশ্য হত্যা ও লুণ্ঠন উভয়বিধ ছিল। এই সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিল, তাহারা নরহত্যাকে পাপ বিবেচনা করিত না; হত্যা করিয়া তাহাদের মন এত কঠোর হইয়া গিয়াছিল, যে কলঙ্ক-শূন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না, বা তাহাদের জন্য কখনও দুঃখ বোধ করিত না। ইহারা অস্ত্রদ্বারা বধ করিত না, একটি চতুষ্কোণ রুমালের এক কোণে একটি গুরুভার ছোট বস্তু বাঁধিয়া রাখিত, যাহাকে বধ করিতে চাহিত অতর্কিতভাবে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত, ও তার হইতে দূরতম কোণ ধরিয়া রুমাল ঘুরাইয়া হঠাৎ গলাতে ফাঁস দিয়া মারিত।

ইতিহাসে পাই, ঈশাব্দের একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইরাণ দেশে এক নরঘাতক সম্প্রদায় Society of Assassins প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কাহিনী কৌতূহলপ্রদ।

ইরাণের প্রসিদ্ধ সম্রাট অলপ্-অর-সলাঁর ১০৭৩ ঈশাব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মলিক শাহ রাজ্যলাভ করিলেন। সে সময়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞ নিজাম-উল-মুলক তুসী [জন্ম ১০১৭, মৃত্যু ১৪।১০।১০৯২] প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। হসন সব্বাহ নামক এক উৎসাহী যুবক অলপ্-অর সলাঁর চোবদার mace bearer শ্রেণী মধ্যে ছিলেন। তিনি মালিক শাহের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন, তখন ষড়যন্ত্র করিয়া নিজাম-উল-মুলককে তাড়াইয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। মলিকশাহ হসনকে দোষী জানিয়া রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। হসন রাজমন্ত্রী নিজামের ভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, ও মনে মনে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। হসন রাজধানী হইতে পলাইয়া জন্মস্থান র্যা নগরে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন, কিন্তু নিজামের জামাতা র্যা নগরের শাসনকর্ত্তা

তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে পলাইয়া কাহিরা Cairoতে ফাতিমীবংশীয় খলীফ মুসতনসিরের Mustansir শরণ লইলেন (১০৮৬)। প্রবাদ আছে যে তিনি একজন সাধারণ সূত্রধরের হীন বেশে কাহিরাতে গিয়াছিলেন। যদিও মুসতনসিরের রাজত্বকাল ১০৩৫ হইতে ১০৯৪ ঈশাব্দে ধরা হয়, তথাপি সে সময়ে এশিয়া ও ইরাণে খলীফদের নামমাত্র ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ইরাণের শাহের অনুমতি না লইয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। খলীফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইসলাম-জগতে, অর্থাৎ উত্তর আফরিকা ও ইউরোপে ঘোর আন্দোলন হইতেছিল। হসন পারস্য দেশে এইরূপ আন্দোলন করিবার জন্য খলীফের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। খলীফ হসনকে বিদ্বান বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ দেখিয়া আন্দোলন করিবার অনুমতি দিলেন। এই আন্দোলন মলিক শাহের ক্ষমতার বিরুদ্ধে ও খলীফ পক্ষে হইতেছিল, অতএব রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনুমতি পাইয়া হসন গোপনে খলীফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দেহান্তের পর কাহার নামে আন্দোলন করা হইবে, অর্থাৎ আপনি কাহাকে আপনার উত্তরাধিকার দান করিবেন। খলীফ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজারের নামে আন্দোলন করিতে বলিলেন, হসনও সেইরূপ করিতে স্বীকার ও প্রতিজ্ঞা করিলেন। খলীফের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্য এক পুত্র মুসতাঅলী আপনার অগ্রজ নিজারকে নিহত করিয়া স্বয়ং মিশরে খলীফ হইলেন, কিন্তু ইরাণে হসন নিহত নিজার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে খলীফ বলিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অতএব আন্দোলনকারীদের দুইটী দল হইয়া গেল। মিসর উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে মুসতা-অলী ইমাম বা খলীফ বলিয়া প্রচারিত হইলেও কাহিরা Cairoতে আপনার রাজধানী করিলেন, কিন্তু ইরাণে নিহত নিজার ও তাঁহার পুত্র ইমাম বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এখন এই দুই সম্প্রদায়েরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে গুজরাটের বোহরা সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা মুসতা-অলীর সম্প্রদায়ভুক্ত ও আধুনিক প্রসিদ্ধ হিজ্ হাইনেস আগা খাঁ নিজারী অর্থাৎ ইরাণী সম্প্রদায়ের প্রধান। এই আন্দোলনকারীরা নানা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ইস্‌মাঈলী, ফতিমী, তালিমী (doctrinaire), কিরমতী, বাতিনী (গুপ্ত-Esotoric), ইত্যাদি বলিত। পরে ইরাণের গোঁড়া মুসলমানেরা উহাদের মুলহিদ্ (Impious Heretics) বলিতে আরম্ভ করিল ও অনেকে নিজারীও বলিত।

হসন এই সময়ে ইসমাঈলী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন, ঐ সম্প্রদায়ের দায়ীরা [প্রচারক Missionary] হসনকে বুদ্ধিমান চতুর ও কর্ম্মঠ দেখিয়া আপনাদের

সম্প্রদায়ের ভাবী প্রধান বা নেতারূপে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে হসন রঈস্ অবুলফজল নামক এক জমীদার বন্ধুর কাছে কিছুদিন অতিথিরূপে ছিলেন। তিনি গোপনে মলিকশাহের রাজ্য ধ্বংস করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রাজ্যের উপযুক্ত কর্ণধার মন্ত্রী নিজাম উল-মুলককে প্রাণে মারিতে পারিলে অথবা মলিকশাহের সহিত বিরোধ ঘটাইতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইবে। সে সময়ে মলিকশাহের রাজ্য যত বিস্তৃত ছিল, তাহার পূর্ব্বে বা পরে কোনও ইরাণপতির রাজ্য তত বিস্তৃত হয় নাই। তাঁহার রাজ্য তাতার মঙ্গোলিয়া, মধ্য এসিয়া হইতে ভূমধ্য-সাগর-তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও পূর্ব্ব রূম (Constantinople)-রাজ তাঁহাকে কর দিতেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ মন্ত্রীর শাসনে এই সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। হসন বন্ধু অবুলফজলকে বলিলেন, যদি ২।৩ টী সাহসী ও বিশ্বাসী বন্ধু পাই, তাহা হইলে মলিকশাহের রাজ্য ধ্বংস করিতে পারি। অবুলফজল হসনের রাজসভা হইতে অপমানিত হইয়া তাড়িত হইবার সকল কথাই শুনিয়াছিলেন ও হসনের নিজাম-উল-মুলকের প্রতি জাতক্রোধের কথাও জানিতেন; তিনি ভাবিলেন—বন্ধু হসনের অপমান ও মনকষ্টে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, নতুবা ২।৩টি বন্ধুর সাহায্যে মলিকশাহের রাজ্য ধ্বংস করিবার কল্পনা করিতেন না। তিনি বন্ধুর মস্তিষ্ক-বিকৃতির চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। হসন আর তাঁহার কাছে মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে রঈস মুজফফর নামক আর এক পূর্ব্ব বন্ধু জমীদারের সহিত হসনের দেখা হইল। কিছু পূর্ব্বে রাজসভার কোনও প্রতিকূল আজ্ঞা পাইয়া, সভার উপর বিরক্ত হইয়া মুজফফর বিদ্রোহ চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি হসনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। হসন কতক কৌশলে কতক বাহুবলে, আপনার সামান্য কয়েকটী অনুচরের সাহায্যে অলহামুত নামক গিরি-দুর্গ অধিকার করিলেন (১০৯০ঈ) ইহার পর আপনার অনুচর সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। ঐতিহাসিকেরা হসনের দলকে ডাকাতের দল লিখিয়াছেন। অতি অল্প সময়েই হসন নিকটের অনেকগুলি ছোট ছোট গিরি-দুর্গ হস্তগত করিলেন ও চারিদিকের দেশ ও ব্যবসায়ীদের কাফলা (দল—Carvan) লুট করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিলেন। হসনের এমন মানসিক বল ছিল যে তাঁহার সেবক দাস বা অনুচরেরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইত, তাঁহার আজ্ঞা যতই ভয়াবহ বা অসম্ভব হউক না কেন, তাহারা অস্বীকার করিতে সাহস করিত না। তাঁহাকে দেশবাসী ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও ভয় করিতে লাগিল। তিনি শেখ-উল-জবল

[পার্ব্বত্য রাজা Mountain Chief] নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইউরোপের ঐতিহাসিকেরা অনুবাদে ভুল করিয়া, তাঁহাকে old man of the mountain নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়ে একবার সম্রাটের অনুগত জেরুসালেমের রাজা Titular King of Jerusalem তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি অতিথিকে আপনার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য দুইটি যুবককে ডাকিলেন, একটিকে আজ্ঞা করিলেন, আত্মহত্যা কর; সে তৎক্ষণাৎ একখানি ছুরি দিয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিল; অন্য যুবককে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠিতে বলিলেন, উঠিতে তাহাকে পাশের গভীর খাদে লাফাইতে আজ্ঞা করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িল ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হসন অতিথিকে বলিলেন, যাহা দেখিলেন আপনার সম্রাটকে বলিবেন, কখনও এইরূপ আজ্ঞাবাহী সৈনিক সৃষ্টি করিতে পারেন তবে যেন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবার সাহস করেন।

এই সময়ে একবার অবুল ফজলের সহিত হসনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বন্ধু! এখনও কি আমাকে বিকৃত-মস্তক বিবেচনা কর? এখন তোমার বিশ্বাস হইয়াছে কি, যে ২।৩টী সাহসী বন্ধু পাইলে মলিকশাহের রাজ্য ধ্বংস করা অসম্ভব নহে।" অবুল ফজল বলিলেন, "আমি জানিতাম তুমি অদ্ভুত লোক, তোমার জ্ঞান ও বল অদ্ভুত, কিন্তু তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার মত লোকের কাছে আশা করি নাই।" হসন বলিলেন:—"এখন পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি, তাহা রাজনৈতিক বলে করিয়াছি, এইবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বলে কত দূর ও কি করিতে পারি।

ইহার পর হসন এমন একটি উপত্যকা খুঁজিয়া বাহির করিলেন, যাহার চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতমালা এরূপে প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান, যে বাহির হইতে সে উপত্যকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারা যাইত না। তাহার একমাত্র প্রবেশের পথে তিনি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, ও ঐ দুর্গ মধ্যে আপনার রাজ-প্রাসাদোপম বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। উপত্যকাটি একটি মনোরম উদ্যানে পরিণত করিলেন। কোরাণে বহিশ্‌ত বা স্বর্গের যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা মত উদ্যান ও তাহার মধ্যে নানাস্থানে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত হইল, উদ্যানে নানাপ্রকার স্বাদু ফল ও বিচিত্র পুষ্প-বৃক্ষ রোপিত হইল, ও নানা-স্থানে নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য, বিশেষতঃ মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধিত করা হইল। উদ্যান মধ্যে চারটী পয়নালী প্রস্তুত করা হইল। তাঁহার আজ্ঞা হইলে এই পয়নালীতে দুগ্ধ সুরা, মধু ও নির্ম্মল জল বাহিত হইত। উদ্যানে কতকগুলি পরম, সুন্দরী চতুরা শিক্ষিতা যুবতী বিচরণ করিত। তাহারা

কোরাণে বর্ণিত স্বর্গের হুরিদের অনুকরণে অভিনয় করিত এইরূপে হসনের বহিশ্‌ত স্থাপিত হইল।

হসন বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবকদের শিক্ষা করিতেন, তাহাদের অস্ত্র-ধারণ, যুদ্ধবিদ্যা, ছদ্মবেশ-ধারণ, অভিনয়-কৌশল নানাভাষায় কথোপকথন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল যে পৃথিবীতে গুরুই, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি, অতএব গুরুকে ঈশ্বরবৎ মান্য ও ভক্তি করিবে; গুরু বিরূপ হইলে ঈশ্বরও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না; গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা কোরাণে বর্ণিত ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা-পেক্ষা বলবত্তর, অতএব অলঙ্ঘনীয়, তাহার বিচার করা মহাপাপ, তাহা নির্বিচারে পালন করিতে হয়। শিষ্যদের কাছে বহিশ্‌তের নানা বর্ণনা করিতেন, ক্রমে তাহাদের মস্তিষ্ক বহিশ্‌ত ও হুরীপূর্ণ হইলে তাহাদের মধ্যে ২।৪ জনকে হশীশ নামক ভাঙের সারাংশ দ্বারা প্রস্তুত মাদক বিশেষ খাওয়াইয়া একদিন অজ্ঞান করিতেন ও অজ্ঞানাবস্থায় এই উদ্যানের এক একটি গৃহে এক এক জনকে ছাড়িয়া দিতেন। জ্ঞান হইলে তাহারা যাহা দেখিত তাহাকে সত্য সত্যই গুরু-বর্ণিত বহিশ্‌ত বলিয়া বিশ্বাস করিত। কয়েক দিবস হুরীদের সঙ্গ ও স্বর্গভোগের পর আবার গোপনে তাহাদের হশীশ খাওয়াইয়া আপনার প্রাসাদে আনিতেন, ও তাহাদের বলিতেন আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের আপনার স্বর্গীয় দূত (angel) দ্বারা স্বর্গে পাঠাইতে পারি, ও আবার আনিতে পারি। এই যুবকেরা হসনের কথা অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত হসন অনুগ্রহ করিলেই ২।৪ দিবনের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে স্বর্গভোগ করাইতে পারেন, স্বর্গীয় দূত ও হুরীরা তাঁহার আজ্ঞাধীন, ও তিনি ঈশ্বর-নিয়োজিত ক্ষমতা-প্রাপ্ত মহাপুরুষ।

হসন এই যুবকদের দ্বারা আপনার শত্রুদের হত্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের আশা দিতেন যে "আজ্ঞাপালন করিয়া ফিরিয়া আসিলে যখন বলিবে তখনই তোমাদের স্বর্গে পাঠাইয়া দিব, ও যদি ফিরিয়া আসিতে চাহ তবে আনিব; ও আমার ফিরিশতাদের angel আজ্ঞা করিব তাহারা অলক্ষ্যে তোমাদের সঙ্গে থাকিবে, যদি নিহত হও তবে সেই মুহূর্ত্তে তোমাদের স্বর্গে লইয়া যাইবে।" হসন এই যুবকদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, ও তাঁহার প্রভাব এত বেশী ছিল, যে তাহারা হসনের অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী গুরুর আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করিত, কখনও তর্ক বা সন্দেহ করিত না। আজ্ঞাপালন এত কঠোরভাবে শিখাইতেন যে তাহাদের সম্মুখে তিনি আপনার দুই পুত্রকে অবাধ্যতার অপরাধে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। তাহারা হসনের আজ্ঞা-

মত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জনতা মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে দুঃসাহসিকভাবে হত্যা করিত, অতএব কেহই জীবিত ফিরিত না। তাহারা প্রায়ই খৃষ্টানদের রবিবারে গির্জ্জাতে, ও মুসলমানদের শুক্রবারে মসজিদে হত্যা করিত, অতএব দর্শক মধ্যে কেহ না কেহ তাহাদের নিশ্চয় মারিয়া ফেলিত। হসনের কার্য্যসিদ্ধ হইত কিন্তু ঘাতকদের আর পোষণ করিতে হইত না, তাহার গুপ্ত রহস্যও প্রকাশিত হইত না, তবে প্রত্যেক শত্রুর জন্য একটি করিয়া সাহসী যুবককে বহিশত্রুতে পাঠাইতে হইত।

হসন-প্রেরিত এইরূপ এক যুবক ঘাতক বৃদ্ধ মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলককে [১৪ অক্টোবর ১০৯৩] হত্যা করিল। ইহার একমাস মধ্যেই মন্ত্রীর উপযুক্ত শিষ্য সম্রাট মলিক-শাহের মৃত্যু হইল। মলিক শাহের মৃত্যুর পর ইরাণের ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তার কমিতে লাগিল। হসন সব্বাহের আশা ষোল আনা পূর্ণ না হইলেও অনেকটা পূর্ণ হইল। হসন নর-ঘাতকদের সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া দেশ-বাসীর ও আশে পাশের ছোট বড় রাজা ও শাসনকর্ত্তাদের ভয়ের কারণ হইলেন। সকল বারে তিনি নরহত্যা না করিয়া অবস্থা বিশেষে কেবল ভয় দেখাইয়াও কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। মলিক-শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অসমসাহসী যোদ্ধা পুত্র স্বয়ং সেনা লইয়া হসনকে দমন ও নির্ম্মূল করিতে যাত্রা করিলেন। পথে একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন তাঁহার পালঙ্কের নিকট মৃত্তিকাতে একখানি দীর্ঘ ছুরির ফলক অর্দ্ধেক পোঁতা রহিয়াছে, ছুরির গায়ে একখানি কাগজে লেখা আছে, তুমি বাল্যাবধি সাহসী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য ক্ষমা করিলাম। নতুবা পৃথিবীর প্রস্তরময় কঠিন বক্ষ অপেক্ষা তোমার কোমল মাংসল বক্ষ সহজে বিদ্ধ হয়। নবীন সম্রাট, যিনি সম্মুখ সমরে কখনও ভীত হয়েন নাই, এই অজানিত রহস্যময় শত্রুর ভয়ে ফিরিয়া গেলেন। হসন যখন রাজবাটীতে কর্ম্মচারী ছিলেন তখন রাজবাটীর এক দাসীর প্রেমাস্পদ ছিলেন, এখন তাহার সাহায্যে ছুরি ও পত্র পাঠাইয়াছিলেন; রাজ-অন্তঃপুরে তাঁহার ঘাতক চর ছিল না।

হসন ১১২৩ ঈশাব্দে আপনার পুত্র কিয়াকে রাজ্য ও গুরুর আসন দিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার বংশে আটজন রাজা ও গুরু হইয়াছিলেন, পরে মোগলেরা তাঁহার স্থাপিত রাজ্য ও সম্প্রদায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রশাখা ইরাণে কতক কতক নরঘাতক মত পোষণ করে।

পরবর্ত্তী কালে ঐ ঘাতক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কতক কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হইয়াছিল। সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে পেশওয়ার ও কাবুলের মধ্যে খ্যাবর গিরিসঙ্কটে বায়জীদ বিন-অবদুল্লা নামক অফগান রোশনিয়া

নামক একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া আপনার শিষ্যদের সাহায্যে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল। এই বায়জীদ ও তাহার পুত্র জললার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে আকবরের প্রিয়পাত্র হাস্যরসিক কবিরায় মহেশ দাস রাজা বীরবর ১৫৮৬ ঈশাব্দে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। বায়জীদের মতে "যাহাদের ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা মনুষ্য নহে, যদি তাহারা অনিষ্টকারী জীব হয়, তবে তাহাদের বাঘ, নেকড়ে, সাপ, বিছা ইত্যাদি হিংস্র জীবের পর্য্যায়ভুক্ত জানিবে, অতএব আমাদের হত্যা করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা আরব দেশীয় রসুল বলিয়াছেন, 'হিংসা করিবার পূর্ব্বে হিংস্র জীব বধ কর।' যদি তাহারা অনিষ্টকারী জীব না হয়, তবে তাহাদের গো, মেষ, ছাগ ইত্যাদির পর্য্যায়যুক্ত জানিবে, অতএব তাহাদের হত্যা করায় অপরাধ হয় না, কেননা তাহারা ভক্ষ্যশ্রেণীভুক্ত। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা মৃত বা জড়, তাহারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বা ধনরত্নের অধিকারী হইতে পারে না; তাহাদের সন্তানেরাও ঐরূপ, অতএব তাহাদের মারিয়া তাহাদের সম্পত্তি লইলে পাপ হয় না—ইত্যাদি [রোশনিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বায়জীদ-বিন-আবদুল্লা লিখিত খএর-উল-বিয়ান নামক ধর্ম্মগ্রন্থ]

শ্রী অমৃতলাল শীল

শক্তিভিক্ষা

—:•:—

শক্তিদাতা শক্তিরূপী যদি কেহ রহ,
এ সৃষ্টির এ বিশ্বের সর্ব্বভার বহ,
তৃণ, ধূলি, জীব, নর নিয়ন্তা সবার,
পার্থ সম দক্ষ ধরিবারে ক্ষিতিভার,
শক্ত কর শক্তিহীনে, বীর্য্য দাও দীনে,
সভয়ে নির্ভয় কর, দৃপ্ত কর ক্ষীণে।
ঋজু কর দুঃখন্যুব্জ ব্যথাকুব্জ দেহে,
আশা-আলো জ্বালো আশা-হত হৃদিগেহে,
ক্লিষ্ট পিষ্ট চিত্তে মোর শক্তি বিদ্যুৎ
ঝলকি খেলায়ে দাও, জাগুক অদ্ভুত
নব বেগ, নব বল, নব প্রভঞ্জন,
শূলপাণি মহেশের প্রলয় নর্ত্তন।
দুঃখ দলি, মৃত্যু দলি, দীনতা ক্ষীণতা
ভীম সম করি নাশ সকল ক্ষুদ্রতা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

স্বয়ম্বর-সভা

—•:•:•—

নাট্য

পাত্র-পাত্রীগণ

রমেশ :—প্রোফেসর। শিক্ষিত ; ধনবান। বয়স প্রায় ত্রিশ।

ভূপতি বিপিন সতীশ অক্ষয় চারু	ঐ রমেশের বন্ধু।

বিমান :—এম, এ ক্লাসের ছাত্র। অবিবাহিত।

সুনীল বিজয় অপ্রকাশ	বিমানের বন্ধু।

সরলা :—রমেশের স্ত্রী। মেট্রিক পাশ।

বীণা :—সরলার কনিষ্ঠা ভগ্নী।

লীলা সুষমা ললিতা	বীণার বন্ধু।

কাদম্বিনী :—ভূপতির স্ত্রী।

বিমানের বউদিদি ইত্যাদি।

———

স্বয়ম্বর-সভা

—:০:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা—বহুবাজার ষ্ট্রীটের উপর একটী ত্রিতল বাটীর সুসজ্জিত বৈঠকখানা

কাল—সন্ধ্যা।

[ফরাসের উপর আসীন—রমেশ এবং তাহার পাঁচ সাতজন বন্ধু। কেহ তামাক টানিতেছে—কাহারও মুখে চুরুট বা সিগারেট। বন্ধুগণ সকলেই কালো একহারা। দুই এক মিনিট স্তব্ধতার পর বন্ধুগণ সমস্বরে হার্মোনিয়াম সংযোগে গান আরম্ভ করিল।]

গান

বাঙালী কুলের কালী আমরা কেরাণী কুল—
দুনিয়ায় পাবেনাক—আমাদের সমতুল!
আমি—M.S.C. B.L.
আমি—B.S.C. M.L.
খেটে খেটে গেঁটে বাত পিঠে ব্যথা বুকে শূল!
(মোরা) কলমের কুলিগিরি
দিন ভোর করে ফিরি—
বাড়ী ফিরে পেটের বড়াই—
তাজা লড়াই হুলুস্থুল

আমাদের টিফিন্ চরম
চানাচুর গরমা-গরম।
(আবার) কাসুটী খাই বড়বাবুর
হ'লে পরে ঠিকে ভুল!
আপিসে কলম পিশে
হাড় মাস গেছে মিশে,—
(ওমা) দিন-দুপুরে চোখের ওপর
ফুটে ওঠে সর্ষে ফুল!
ছোট একটা পানের দোকান
করলে এমন যেতোনা প্রাণ—
(ওগো বেঘোরে যেতোনা প্রাণ!)
এযে জোঁকের মতন রক্ত শোষে—
হায়রে হায়, হোলো অঙ্গ কালী ঝুল!

[গানের মাঝ বরাবর আরো পাঁচ সাতজন বন্ধু উপস্থিত হইল; বুক পকেটে clip আঁটা ষ্টাইলো পেন। চেহারা মজবুত—গাঁটা গোঁটা রকমের। গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল—গান শেষ হইতেই হস্ত সঞ্চালন প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান আরম্ভ করিল।]

গান

প্রথম ২।৩ জন। আমরা কেরাণী—
কেরাণী—
মসী-যুদ্ধে শুর্থা সেনানী!

বাকী ২।৩ জন। গোলাগুলি-সাহেবের
তাড়া-গালাগাল
বুক পেতে নিই মোরা
যুদ্ধের কাল !

প্রথম ২।৩ জন। আমরা কেরাণী—
কেরাণী—
মসী-যুদ্ধে শুর্খা সেনানী !

বাকী ২।৩ জন। সেনাপতি বড় বাবু
অম্বিক রায়,—
উঠি বসি মরি বাঁচি
তাঁর ইসারায় !

প্রথম ২।৩ জন। আমরা কেরাণী—
কেরাণী—
মসী যুদ্ধে শুর্খা সেনানী।

রমেশ। ওহে সৈনিক-পুরুষ মহাশয়-গণ—এটা তো ভাই যুদ্ধক্ষেত্র নয়— এখানে অমন লড়াইয়ের ভঙ্গীতে—millitary attitudeএ দাঁড়িয়ে না থেকে হাত পা ছড়িয়ে একটু বসতে আজ্ঞা হোক। বসে স্থির হয়ে—তোমাদের সেই বিজয়-সঙ্গীতটা গাও বরং—

কর সাগর শাসন বৃটেন তুমি
(রবে) চিরক্রীতদাস ভারত-ভূমি !

বিপিন। ঠাট্টাই কর আর যাই কর, জেনে রেখো—The pen is mightier than the sword—অর্থাৎ কিনা কলম হচ্ছে তরোয়ালের চাইতেও শক্তিশালী !

রমেশ। তা আর জানিনা! It is still more শক্তিশালী than ছুরি। Therefore ছুরিই কলমকে কাটে—কলম ছুরীকে কাটে না! বাল্যকালে জিওমেট্রি চর্চ্চার ফলটা একবার দেখলে হে বিপিন! তোমার কথাটা কেমন ধাঁ করে ইউক্লিডের ছাঁচে ফেলে দিলুম !

(সকলের হাস্য)

বিপিন। খুব একহাত নিলে ভাবচো না? আমার কথাটা অলঙ্কার-শাস্ত্রের কথা—অঙ্ক শাস্ত্রের নয় যে তুমি তার উপর দিয়ে বেপরোয়া ভাবে সরাসর জিওমেট্রির রুল কম্পাস চালিয়ে দেবে! সাধে বলেচে —অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং! দেখো, কোনদিন প্রিয়ার চাঁদমুখখানা ভালো করে দেখতে গিয়ে তারও উপরে যেন টেলিস্কোপ লাগিয়ে বোস না !

রমেশ। আমার প্রিয়ার তো ভাই চাঁদমুখ নয়! হলে পরে তার ওপর দূরবীণ কসতুম বৈ কি !

আমি শুধু এইমাত্র জানিয়াছি সার,
চুম্বন-আস্পদ মুখ প্রিয়ার আমার।

সতীশ। তোমরা তা হ'লে দুজনে আপনাদের মধ্যেই তর্ক বিতর্ক করে গরম হ'য়ে উঠতে থাকো—আমরা এখন উঠি—ঠাণ্ডায় আমাদের collapse হবার দাখিল হ'য়ে এলো যে! আপিস থেকে এসে কোথা দুটো হাল্কা কথা নিয়ে আলগা বোক্‌বো—তা নয়—জিওমেট্রি, লজিক, রেটরিক, এ্যাষ্ট্রলজি! ভাখো বিপিন, রমেশের এই বৈঠকখানার ঘরটার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানতে পারবে যে পুরুষানুক্রমে এখানে আড্ডা এবং

ইয়ারকিই দেওয়া হয়ে আসচে এবং আমরাও সেই ইতিহাসের ধারা ইস্তনাগাৎ অক্ষুণ্ণ রেখে এসেচি! আজ কি তুমি চাও এখানে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খুলতে?

রমেশ। আরে অত চট কেন? মেজাজটা তোমার যে রকম টগবগ করে ফুটচে—তাতে তোমার উপস্থিত collapse-এর কোন লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না! একটু চা-টা খাও। আরে রামা…

(রামার প্রবেশ)

যা শীগ্‌গির পেয়ালা কতক চা নিয়ে আয়—আর গোটা কতক পান—আর জরদার কৌটাটা……

(রামার প্রস্থান)

চারু। আমি ভাই কখনও চা খাইনা কিন্তু আজ ভাবচি, একটু খাবো—যে শীত! এ বছর শীতটা বেশ একটু জমকালো রকমের পড়েচে না? গেল বছর মোটে দিন সাতেক লেপ গায়ে দিয়েছিলুম মনে পড়ে এ বছরে সেই যে কার্ত্তিক মাস থেকে সুরু করেচি, মাঘ মাস শেষ হতে চল্লো লেপ ছাড়বার নাম অবধি মুখে আনতে পারচি না!

অক্ষয়। শীত বেড়েচে বোলচো তো কিন্তু বয়সের উত্তাপ ক্রমেই কমে আসচে, সে খেয়াল কি রাখচো দাদা? ফাগুন হাওয়ায় এখন কি আর আগুন ছোটে হে! সে এক দিন ছিল—

চারু। আগুন না ছুক—বরফ ছিটোবে তা বলে? এক বছরে এমনি বুড়ো হয়ে গেলুম।

(চা ইত্যাদি লইয়া রামার প্রবেশ)

রামা। বউমা একবার সেই মাথা-ধরার ওষুধের শিশিটা কোথায় জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।

রমেশ। আচ্ছা, আমি গিয়ে দিচ্ছি বোল্‌গে যা……

(রামার ট্রে রাখিয়া প্রস্থান। রমেশের সকলকে চা পরিবেষন)!

(চা পান সমাপনান্তে) এইবার তো কিছু গরম হলে…এখন খানিক গান-বাজনা চলুক। কিহে ভূপতি—আজ তুমি যে মুখে একেবারে লাগাম এঁটে রয়েছ!

ভূপতি। আচ্ছা, লাগাম না হয় ছিঁড়চি।

(ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া মালিনী মাসীর অনুকরণে নৃত্য এবং গীত)

রূপ দেখে সই কুল হারালেম,
বকুলতলায় কে!
আকুল প্রাণে ধরতে এ-কূল
ও-কূল পলায় যে!
বান ডেকেছে সর্ব্বনেশে,
যা কিছু সব যায় যে ভেসে,
এক ভাঙনে দুকূল ভেঙে
গোকুল গলায় রে!

রমেশ। তোমরা ভাই তাহ'লে একটু বোসো। এঁর জন্য মাথা ধরার ওষুধটা বের করে দিয়ে আসি।

সতীশ। না ভাই, আমরাও এবার উঠি—রাত অনেক হয়ে গেছে!

রমেশ। আচ্ছা, আজ তা'হলে ছুটী।

ভূপতি, বিপিন, মনে আছে কাল বীণার জন্য সেই পাত্রটীকে দেখতে যেতে হবে? একটু বেলাবেলি এসো। সিমলে, কাঁসারিপাড়া কতখানিই বা পথ? পায়ে হেঁটেই যাওয়া যাবে?...

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রমেশের সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

[খাটের উপর শুইয়া সরলা মাসিক-পত্রের ছবি দেখিতেছে, বয়স ২২।২৩। ছিপ-ছিপে; মাঝামাঝি রং চেহারা বেশ সুশ্রী। পরণে দেশী কালাপাড় সাড়ী; এলো খোঁপা, হাতে গাছ কয়েক সোণার চুড়ি, নাকে একটা হীরের নাকছাবি। আদুরে আদুরে হাব-ভাব।]

রমেশ। এই যে দিব্যি গা ভাসিয়ে দিয়ে 'ভারতী' পড়া হচ্ছে! মাথা ধরেচে বলে অমন খাম্‌কা মিছে কথাটা বলে পাঠানোর কি দরকার ছিল?

সরলা। কে বল্লে মাথা ধরেছে? স্মেলিংসল্টের শিশিটা কোথায়—এইই তো শুধু জানতে পাঠিয়েছিলুম, এর মধ্যে মিছে কথাটা এলো কোত্থেকে? গায়ে পড়ে ঝগড়া করা কেমন তোমার স্বভাব—না?

রমেশ। আবার পায়ে ধরে মাপ চাওয়াটাও তেমনি আমার স্বভাব—কেমন, না?

সরলা। উঃ, তা আর জানি না? যাই হোক, আজ কেমন জব্দ—অকালে আড্ডা ভাঙ্‌তে হল ত?

রমেশ। আচ্ছা, ওরা যদি আমাকে ডেকে পাঠাবার অছিলের তোমার ঐ চালাকীর ফিকির বুঝতে পারতো—কি মনে করতো, তা হ'লে বল দিকিন?

সরলা। মনে আবার করবে কি? মনে কোরত,—মনিব বড় কড়া!

রমেশ। ইস! মনে কোরত—আমি একেবারে নেহাৎ অপদার্থ—নিতান্ত মেয়ে-মানুষের সামিল—ঘোরতর স্ত্রৈণ......

সরলা। তাহ'লে ঠিকই মনে করতো। স্ত্রীর একটু মাথাধরার ইঙ্গিতে যে-মানুষ বন্ধু-সভা ভেঙে দিয়ে আকুল হয়ে স্ত্রীর কাছে ছুটে আসে, সে বেহেড্‌ স্ত্রৈণ নয়ত আবার কি? দোষ হোল না তোমার? —দোষ হোলো যত তাদের মনে করবার?

রমেশ। তা তো তুমি বলবেই! যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!

সরলা। শুধু চোর বলেই ছাড়ান দেবে—তাই ভেবেছ বুঝি! এই এখন থেকে এখানে কয়েদ রাখবে—খালাস দেবে কাল সকালে, যার নাম সাড়ে সাতটা ..

রমেশ। বেশ তো! 'এযে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড়—চির বাঞ্ছিত কারা এ!

সরলা। আহা, তা আর জানি না! তাই যদি বলি কোন দিন—সে, আজ আর সন্ধ্যেবেলায় আড্ডায় না ভিড়ে আমার কাছে বসে বসে একটু গল্প কর, তা হ'লেই ভেবে একেবারে সারা হে!

রমেশ। আচ্ছা, পাহারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে, আর চোর যদি সেই অবসরে পালায়!

সরলা। চোর ঘুমিয়ে পড়ে, কি পাহারা ঘুমিয়ে পড়ে—দেখো তখন! ও কথা থাক্—বীণা যে দু-তিন মাস এখানে রইলো, এর মধ্যে একটীও তো পাত্র যোগাড় হোল না—আর যে তোমার ও বিষয়ে তেমন চাড়, তাও দেখতে পাই না। কলিকাতা সহর—চেষ্টা করলে কি ভালো ছেলে একটি এতদিনে পাওয়া যেতো না? মা বীণাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, খুব লোকের ভরসায় যা হোক! তুমি তখন বল্লে না কেন—যে, আমি ও ঝক্কি পোয়াতে পারবো না।

রমেশ। ভেতরের কথাটা কি আগে জেনে—পরে মন্তব্যটা প্রকাশ করলে হয় না? তোমার ঐ বোনটি ইতিপূর্ব্বে আমায় কি বলে রেখেছে,তার খপর রাখো? সে সেদিন দিব্যি গেলে আমায় বলেছে যে, সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। সত্যি মিথ্যে তাকে ডেকে মোকাবিলে করে নাও। এখন এর কি উপায় করা যায়, তাই ঠাওরাও—তারপর—অন্যত্র চেষ্টা। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমারও ওটাকে বেহাত করতে হাত উঠচে না। তাই বলচি, বেশ করে মনে মনে ঠাউরে দ্যাখো—বোনটিকে চিরজন্ম আইবুড়ো রেখে দেবে, না, শুভ কার্য্যটা আমার সঙ্গেই সম্পন্ন করে দেবে?

সরলা। ওর তো আর পোড়া কপাল পুড়তে যায়নি! কথার ছিরি দ্যাখোনা!

রমেশ। যত তোমারি কপাল পুড়তে গেছলো—না?

সরলা। আমি কি তাই বলছি? আশীর্ব্বাদ করো, জন্ম জন্ম যেন তোমারই গলায় মালা দিতে পারি—কিন্তু সে তপস্যা কি আমার আছে?

রমেশ। তবে শোনো, সিমলে কাঁসারি-পাড়ায় একটী ছেলের সন্ধান পেয়েছি—বি,এ, পাশ। বাপেরও বেশ দু'পয়সা আছে। শুনেছি, ছেলেটি দেখতে শুনতেও ভাল। ভূপতির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে—কাল বিকালে আমরা তাকে দেখতে যাবো।

সরলা। এই কথাটা এতক্ষণ বল্লেই তো সব গোল মিটে যেতো—তা না, খালি কথার ভটচায্যিগিরি—খালি কথার ভটচায্যিগিরি! আসচে মাসের প্রথমেই যাতে চার হাত এক হয়, একটু উঠে পড়ে লাগো দিকিন!

রমেশ। আচ্ছা, ও-মেয়ের জন্তে তোমার এত ভাবনা কিসের বলতো? তোমার বাবা হঠাৎ সে বছর মারা যাওয়াতে থার্ড-ক্লাশ অবধি পড়েই ওকে পড়া বন্ধ করতে হয়। তাই বিদ্যেতে ও তোমার চেয়ে দু কেলাশ নীচু। তা হলেও বুদ্ধিতে ও তোমার চেয়ে দু-কেলাশ উপরে। আর রূপে গুণে তোমরা দুজনেই ব্র্যাকেটে ফাষ্ট, ও স্বয়ম্বর-সভা ডাকুক,—এখনই হাজার

প্রার্থী ওর পায়ের কাছে এসে জড়ো হবে।

সরলা। স্বয়ম্বর-সভা! স্বয়ম্বর-সভা! মন্দ মতলব মাথায় দেওনি! বেশ, স্বয়ম্বর-সভা আমিই ডাকবো। কত রাজা, মহা-রাজা, রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর আমার পায়ের কাছে এসে জমে—আগে তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক্। আচ্ছা, এখন ও কথা যাক্,—খাবে চল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলার সর্টহ্যাণ্ড

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার অনেক পরিচয় সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু আমি যেটাকে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বলিয়া মনে করি সেটী তাঁহার বাংলা রেখাক্ষর। তাঁহার রেখাক্ষর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কারণ বিষয়টী তলাইয়া দেখা অভিজ্ঞ লোকের দরকার, সেরূপ অভিজ্ঞ লোক দেশে কমই আছে। যাঁহারা আছেন তাঁহারাও স্বার্থের জালে এমনভাবে জড়িত যে মুখ ফুটিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরের প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না। বাংলা সর্টহ্যাণ্ড অনতি-দূর ভবিষ্যতে আপনার যে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার সূচনা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র নাথ। শশধরের উদয়ে নক্ষত্রমালার শোভা যেমন হীনপ্রভ হইয়া পড়ে সেরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষর শীঘ্রই অন্যান্য সমস্ত রেখাক্ষর প্রণালীকে ম্লান করিয়া বাংলা দেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, এই রেখাক্ষর ইতিমধ্যেই যে ঝড় বহাইয়া দিয়াছে তাহাতে জনসাধারণ যেমন চমৎকৃত হইয়াছে, সেরূপ কাহারো কাহারো হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহারা প্রাণপণে ইহাকে বাধা দিতেছে, আবার যাহারা বাংলা দেশকে গৌরবমণ্ডিত দেখিতে চান তাঁহারা ইহাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। মোটের উপর ইহার ভিতর যে একটা শক্তি আছে, প্রাণ আছে তাহা অনুভূত হইয়াছে কিন্তু উপযুক্ত

ক্ষেত্রের অভাবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পীড়নে ইহা কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

"বাংলা ভাষাতে কি সর্টহ্যাণ্ড আছে," এ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন। সমস্ত স্বাধীনদেশেই—যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি—সর্টহ্যাণ্ডের প্রচলন আছে, ইহাতে দেশের নানা অভাব বিদূরিত হয়, একজন অনর্গল বক্তৃতা দিয়া গেল, যাহারা শ্রোতা কেবল তাহারাই সে বক্তৃতার রস গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, কিন্তু একজন সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার সাহায্যে ঐ বক্তৃতার অবিকল নকল সংবাদ-পত্রের সাহায্যে দেশের সমস্ত লোক জানিতে পারে। আদালতে মকদ্দমা হইতেছে, সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়া গেল, উকিল সওয়াল জবাব করিল, সে সকল একমাত্র সর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে দেশের লোক জানিতে পারে। অথবা যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাহাদের আফিসে রোজ অনেক চিঠি-পত্র আসে, কারবারের যিনি কর্ত্তা তাহাকে যদি ব্যবসারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয় তাহা হইলে ঐ সকল চিঠির উত্তর যে-ভাবে দিলে ব্যবসায়ে লাভ হইতে পারে তাহাতে সে ভাবে উত্তর দিতে হয়। কিন্তু কারবারের প্রধান ব্যক্তিকে কেবল চিঠির জবাব লিখিতেই যদি সমস্ত সময় ব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে ব্যবসায় সুপরি-চালিত হইতে পারে না সেজন্য মুখে মুখে তিনি চিঠির জবাব বলিয়া দেন সর্টহ্যাণ্ড-লেখক তাহা লিখিয়া লন, নিজ হাতে লিখিতে হইলে যেখানে ৬।৭ ঘণ্টা সময় লাগিত সর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে তাহা ১ ঘণ্টা বা তাহারও কম সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সাধিত হয়। যিনি ব্যবসাদার তাঁহার যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া যায় যদিও সর্টহ্যাণ্ড-লেখককে ঐ ৬।৭ ঘণ্টাই খাটিতে হয়। অর্থাৎ যাহাদিগকে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, নিজে দেখিয়া শুনিয়া সব করিতে হয়, তাহাদের সর্টহ্যাণ্ড-লেখক রাখা দরকার। এইজন্য পৃথিবীতে যত বড় বড় রাজপুরুষ, ব্যবসাদার, উচ্চ কর্ম্মচারী আছে প্রত্যেকের সঙ্গেই এক একজন সর্টহ্যাণ্ড লেখক থাকে। যখন কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়, ইহারা সঙ্গে থাকিয়া সেই সকল কথাবার্ত্তা বা তাহার সার মর্ম্ম যেমন দরকার লিখিয়া লন, চিঠি লিখিতে হইলে—তাহারা করেন। আজকালকার পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নাই, এমন কোন কথা নাই, যেখানে সর্টহ্যাণ্ড লেখকের দরকার হয় না।

যেহেতু আমাদের দেশ পরাধীন এবং ইংরাজী ভাষাতে সমস্ত কাজকর্ম্ম চলিয়া থাকে সেইজন্য বাংলা দেশে ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। সর্টহ্যাণ্ড শিখিতে হইলে ভাষাতে অধিকার থাকা দরকার, কারণ দ্রুত লিখিবার সময় কত-গুলি রেখামাত্র টানিয়া যাইতে হয়, স্বরবর্ণ

প্রয়োগ করিবার সময় থাকে না। ভাষার উপর দখল না থাকিলে তাহা সহজে পড়া যায় না। মনে করুণ তাড়াতাড়ি আমাকে "ব্যাকুল" শব্দটী লিখিতে হইবে, এখানে আমি শুধু ব, ক, ল লিখিব, তাহাতে "ব্যাকুল" শব্দ ছাড়া নিম্নলিখিত শব্দগুলি বুঝা যাইবার সম্ভাবনা আছে যথা—

বিকল,
বাকল
বকিল
বিকীল
বকুল

এইগুলি শব্দের মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া প্রয়োজনীয় শব্দটী বাহির করিয়া লইতে হইবে। যদি বলেন, সব শব্দই যদি ঐরূপ ভাবের ও বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট হয় তবে ত সর্টহ্যাণ্ড-লেখকের পক্ষে পড়াই মুস্কিল,যদি ব কোন রকমে পড়িতে পারেন লেখক ইচ্ছা করিলে বক্তার ভাবের আকাশ-পাতাল বেশ-কম করিতে পারেন অনেক স্থলে যে তাহা না হয় তাহাও নহে। যেমন প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের মকদ্দমায় প্রতাপ বাবু বলিলেন, তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন কিন্তু সর্টহ্যাণ্ড রিপো-টারেরা বলিল,—উহা রাজনীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা। বক্তা যখন অনর্গল বলিয়া যান তাহার প্রত্যেকটী শব্দ কি অধিকাংশ শব্দ এমন কি অল্প কয়েটী শব্দও পরে মনে করিয়া রাখিতে পারেন না। সুতরাং রাজ-দ্রোহের মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বক্তা বড়ই মুস্কিলে পড়েন—ধারাবাহিকভাবে কোন শব্দই তিনি মনে রাখিতে পারেন না, পারা সম্ভবও নয়। আবছায়ার মত কোন কোন শব্দ হয়ত তাহার মনে থাকে, বিচারক তাহাতে মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। অন্যদিকে বলা যাইতে পারে—আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন যায়গায় সর্টহ্যাণ্ডের নির্ভুল প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, কোন দিন হইবে কিনা তাহাও বলা যায় না। কোন একটী বাক্য ধরুন—যথা—

কাল কালা বার টিকেটের মাথা ক্রস কর। যাঁহারা ইংরেজী পিটম্যানের প্রণালী অনুসারে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড লেখেন তাঁহারা এই বাক্যটীকে অন্যরকমে পড়িতে পারেন। কারণ পিটম্যানের প্রণালীতে তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় ক ও গ, চ ও জ, প ও ঠ, ট ও ড তে কোন প্রভেদ নাই, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় স্বর-সংযোগ করা যায় না সুতরাং একজন পিটম্যান-প্রণালীর রিপোর্টার উক্ত বাক্যটীকে অনায়াসে এবং নিশ্চিন্ত মনে এইরূপ পড়িতে পারেন—যথা—

গোলাগুলি দ্বারা গেটের মাথা ক্রাশ (অর্থাৎ চূর্ণ) কর।

ভীষণ রাজদ্রোহ। বিশেষতঃ এই বাক্যটীর আশেপাশের বাক্যকে ঐভাবে বিকৃত করিয়া রাজনীতির গন্ধযুক্ত করা যায় তবে যিনি উক্ত বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহাকে বিচারপতি যে দীর্ঘকালের জন্ত শ্রীঘরে প্রেরণ

করিবেন তাহা নিঃসন্দেহ। আর সর্টহ্যাণ্ড-লেখক যদি নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত হন এবং অবসর সময়ে কালীর ফোঁটা ফেলিয়া (ডট দিয়া) ওকার আকার, উকার, ও একার করিয়া দিতে পারেন—তবে আর কথা কি, বক্তা যে টেগার্ট সাহেবকে খুন করিবার জন্য জনসংঘকে উত্তেজিত করিয়াছে তাহা সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টারের সাহায্যে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া যাইবে, বক্তা যতই বলুক—ঐরূপ করা তাহার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। সর্টহ্যাণ্ড আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জায়গায় সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয় নাই। অন্য প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে কেবল সর্টহ্যাণ্ডের উপর নির্ভর করা চলে না—এটা অনেকে ধারণা করিতে পারেন না, অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে সর্টহ্যাণ্ডে লেখা হইলেই তাহা নির্ভুল হইবে এইরূপ বিশ্বাসের কারণও আছে, দেখা গিয়াছে—কোন বিশেষ বিশেষ বিভাগে যাহারা বহুদিন ধরিয়া সর্টহ্যাণ্ডের কার্য্য করেন—যেমন আইন বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, যন্ত্র বিষয়ক বিভাগ, এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা নির্ভুলভাবে লিখিয়া যাইতে পারেন।

কারণ এই সকল আলাদা আলাদা বিভাগে কতগুলি বড় ছোট শব্দ অনবরত ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, সে সকল শব্দকে এমন সংক্ষেপ করিয়া লওয়া হয় যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ একটী রেখা লেখা যাইতে পারে, তাহার ফলে লেখকের হাতে সময় মজুত থাকে এবং তাহারা ইচ্ছামত অন্য শব্দে স্বর-সংযোগ করিতে পারে, সুতরাং তাহা নির্ভুল ভাবে পড়া যাইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঐরূপ শব্দ ফিরিয়া ফিরিয়া আসে না যেমন সাধারণ বক্তৃতাদি, সেখানে স্বর-সংযোগের সুবিধা হয় না, বিশেষতঃ বক্তা যদি তাড়াতাড়ি বলেন তাহা হইলে স্বর-সংযোগ এক রকম অসম্ভবই, সে সকল ক্ষেত্রে, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, অর্থের আকাশ-পাতাল তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে, একজন বড় রিপোর্টার যিনি হাইকোর্টের আইন সম্বন্ধীয় বিবরণ নির্ভুল ভাবে লিখিয়া থাকেন, তিনি একবার মিসেস এনি বেশান্তের একটী বক্তৃতা সর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া লইয়া বলিলেন যে, তিনি কিছুই পড়িতে পারিবেন না। অর্থাৎ যদি পড়িতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে "টিকেট'কে "টেগার্ট" করিবার মত ভুল করিবেন। এই সকল কারণে সাধারণ বক্তৃতা রিপোর্ট করা বিপজ্জনক, নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়া যায়, যে সর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে এরূপ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিতে হইবে। যাঁহারা পিটম্যানের হুবহু নকল করিয়া তাহাকে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সে কার্য্যে সফল হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষর দেখিয়া মনে হয় তিনি বাংলা ভাষার মজ্জায় প্রবেশ

করিয়াছিলেন। এখন যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারাও যৌবনকালে দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরের নাম শুনিয়াছেন। মৃত্যু-কালেও দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষর সম্বন্ধীয় একখানা বই যন্ত্রস্থ ছিল, সুতরাং রেখাক্ষর চর্চ্চা তাঁহার আজীবনের সাধনা বলিতে হইবে, বাঙালী জাতি যখন স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবে, বাংলা ভাষার স্কন্ধের উপর হইতে যখন ইংরাজী ভাষার দুর্ব্বহ ভার অপসারিত হইবে, তখন বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সর্টহ্যাণ্ড বাংলা ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকিবে তাহার সূচনা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। এখানে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন, তীক্ষ্ণধী দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, বাঙালী জাতিকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে, তাহাদের ভিতর কর্ম্ম-স্পৃহা জাগরিত করিতে হইলে সর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে সময়কে সংক্ষেপ করিয়া মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের রাজা মহারাজা জমিদারেরা অলস-ভাবে দিন যাপন করেন, কারণ জমিদারী-সংক্রান্ত লেখা-পড়ার কাজ মুহুরীরা করে, জমিদার নিজে কেরাণীর কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারেন না, রাতদিন নাই, কে কলম কানে গুঁজিয়া হিসাব নিকাশ করিবে। কিন্তু সে কাজ না জানিলে জমিদারীর কাজেও অভিজ্ঞ হওয়া যায় না, কাজেই আমাদের দেশের জমীদারেরা চিরকাল অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও অলসই হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জমিদার জানিতে পারিবে নিজ হাতে কলম না ধরিয়াও কেবল মাত্র একজন সর্টহ্যাণ্ড সেক্রেটারীর সাহায্যে সমস্ত লেখাপড়া হিসাব-নিকাশের কাজ শেষ করিয়াও তাহার শাসন-ক্ষমতা-পরিচালনের (executive work) জন্য যথেষ্ট সময় থাকিবে তখন স্বতঃই তাহার অলসতা ঘুচিয়া যাইবে, তাহার কর্ম্মস্পৃহা জাগরিত হইবে, যে অলস মন সয়তানের কর্ম্মক্ষেত্র সেই অলসতা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নানাপ্রকার দেশহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হইবেন। এখন যেমন রেল ষ্টীমার ও আকাশ-যানের সাহায্যে স্থানের দূরত্ব অপসারিত হইয়াছে, সেইরূপ সর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে বৈষয়িক ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে যে কর্ম্ম-প্রবাহ ছুটিয়াছে তাহার সঙ্গে সর্টহ্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এমন কোন কারবার নাই যেখানে সর্টহ্যাণ্ড-লেখক নিঃশব্দে কাজ না করিতেছে, এমন কোন বড় লোক নাই যাহার পিছনে ছায়ার মত সর্টহ্যাণ্ড-লেখক সর্ব্বদা না ঘুরিতেছে, এমন কোন আফিস নাই যেখানে সর্টহ্যাণ্ড-লেখক মত অবিরত কার্য্যে ব্যস্ত না আছে, সুতরাং কর্ম্ম-প্রবণতার সঙ্গে সর্টহ্যাণ্ডের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ মানস-নেত্রে দেখিয়াছিলেন এবং এই নির্জ্জীব, অলস, পরমুখাপেক্ষী... পরপদলিত জাতির

ভিতর নূতন প্রাণের সঞ্চার করিবার জন্য তিনি আজীবন রেখাক্ষরের চর্চ্চা করিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা সর্টহ্যাণ্ডকে বাংলা দেশের শিক্ষিত লোকেরা বড় প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহার কারণ দেশের মধ্যে সর্টহ্যাণ্ডের প্রচার হইবার পূর্ব্বেই কতগুলি লোক এই উদ্দেশ্য লইয়া সর্টহ্যাণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যদি কেহ রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা করেন, তবে তাহা সরকারের কানে পৌঁছাইয়া দিবে, যাহার ফল বক্তার ২।৪।১০ বৎসর কারাদণ্ড ঘটিতে পারে। ইহাতে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং সর্টহ্যাণ্ডের প্রতি ঘৃণা জন্মে, হইয়াছেও তাহাই। এই ঘৃণার ভাব দূর করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড-লিখন-প্রণালী প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার কতগুলি বিঘ্ন আছে।—যথা (১) ইংরেজী ভাষায় কাজ কারবার পরিচালনা (২) ইংরেজী কাগজওয়ালাগণ (৩) উকিল ব্যারিষ্টারগণ। যেহেতু সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে বাংলা ভাষার কোনই প্রয়োজন হয় না, সেই জন্য বাংলা সর্টহ্যাণ্ডের দরকার হয় না, যদি এই সকল কারবার বাংলা ভাষার সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইত তাহা হইলে বাংলা সর্টহ্যাণ্ডের প্রয়োজন হইত এবং প্রয়োজন অনুভূত হইলেই সে দিকে লোকের উদ্ভাবন-শক্তি খেলিত। কাজেই এখন যেখানে হাজার ইংরেজী সর্টহ্যাণ্ড-লেখক কাজ করিতেছে সেখানে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড-লেখক কাজ করিত, দ্বিতীয়তঃ অনেকেই বাংলা ভাষায় এই জন্য বক্তৃতা করিতে নারাজ যে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, নাম যশ সকলেই চায়, নিজের নামটি সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখিলে সকলেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি সমস্তই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের বহু চেষ্টায় রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে এখন কতক কতক বাংলা ভাষার প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে বাংলা সর্টহ্যাণ্ডের পথ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ফলে, ইংরেজী কাগজের গ্রাহক হাজার চেষ্টাতেও ১০।১৫ হাজারের ঊর্দ্ধে উঠিতে চায় না অথচ বিলাতে এক টাইমস পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ২।৩ লাখ। যে দিন দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইবে সে দিন হইতে বাংলা পত্রিকাসমূহের গ্রাহক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। সে কথা যাউক, বলিতেছিলাম—ইংরেজী কাগজওয়ালারা বাংলা ভাষা বিস্তারের ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড প্রচলনের অন্তরায়। তৃতীয় অন্তরায় উকিল ব্যারিষ্টারগণ, ইহারা কৈশোর বয়স হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত

জীবনের উৎকৃষ্ট সময়টী আদালতে ইংরেজী বুলি আওড়াইয়া থাকেন।

শিখিতে বিদেশী বুলি
জাতি-ভাষা গেছি ভুলি,

এই কথাটী ইহাদের সম্বন্ধে যত প্রযোজ্য অন্য কাহারো সম্বন্ধে এত নয়, কিন্তু ইহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া দেশের সমস্ত কাজে অগ্রণী হন; কাউন্সিল কার্পোরেশন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকালবোর্ড, সর্ব্বত্রই ইহাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে ইহারা যত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া থাকেন, অনেক ইংরেজও সেরূপ পারে না, তাহার ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে বাংলা ভাষা বিতাড়িত হইয়াছে। এক বাংলা কাউন্সিলের রিপোর্ট লিখিবার জন্য ১০ জন সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার আছে, ইহাদের বেতন মাসিক ১০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা। যদি কাউন্সিলের কাজ বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত, তবে ঐ বেতনে বাংলা সর্টহ্যাণ্ড লেখক রাখিতে হইত। উকিল ব্যারিষ্টারদিগকে হাজার চেষ্টা করিয়াও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করাইতে পারা যায় না। ইংরেজী ভাষা প্রচলনে ইহারা যতটা সহায়তা করেন তত আর কেহ করে না। সর্ব্বোপরি অবশ্য ইংরেজ সরকার বসিয়া আছেন, তাহার ইচ্ছা ও সম্মতিতেই অন্য সকল পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, আজ যদি ইংরেজী ভাষা রাজসিংহাসন হইতে তাড়িত হন তাহা হইলে তাহার ইঙ্গিতে যাহারা বর্দ্ধিত হইতেছে,—উকিল ব্যারিষ্টারই বলুন, ব্যবসাদারই বলুন কি ইংরেজী কাগজওয়ালাই বলুন, সকলেই নূতন ভাষারাণীকে সেবা করিবে। এবং সেই ভাষারাণী যদি বাংলা হন তাহা হইলে বাংলা সর্টহ্যাণ্ডও অশেষ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবেন।

অন্য দিকে কয়েকটী অনুকূল ঘটনা বাংলা সর্টহ্যাণ্ডকে নিরন্তর সাহায্য করিতেছে, যথা (১) দেশের রাজা মহারাজ জমিদার (২) সাহিত্যসেবী ও স্বদেশহিতৈষী (৩) জনসাধারণ প্রথমতঃ রাজা মহারাজা জমিদারদের উপর কালের প্রভাব বেশী কার্য্যকরী হয় না। ইহারা স্থিতিশীল, দেশের শিল্পকলা, নাট্যকলা, এবং যা কিছু নূতন আবিষ্কারে ইহার সহায়তা করিয়া থাকেন। মাদ্রাজের এক রাজা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যদি কেহ নূতন কবিতা তাহাকে শুনাইতে পারেন তবে তিনি কবিতা-লেখককে অত হাজার মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। রাজসভায় একদিকে পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল, তাহার আড়ালে ৩ জন সর্টহ্যাণ্ড লেখক বসিয়া থাকিত, যেই কেহ নূতন কবিতা আবৃত্তি করিত তাহারা সর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে লিখিয়া লইত, রাজা কবিতা-লেখককে বলিতেন—তিনি তাঁহার পুস্তকাগারে খোঁজ করিয়া দেখিবেন ঐরূপ কবিতা আছে কিনা। ইতিমধ্যে সর্টহেণ্ড লেখকেরা ঐ কবিতা লিখিয়া পুস্তকাগারে

রাখিয়া দিতেন, ও ভাবে সকল কবিতাই তাহার পুস্তকাগারে পড়িয়া যাইত। সুতরাং কাহাকেই পুরস্কার দেওয়া হইত না। এই আখ্যায়িকাটী কিছুদিন পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, ইহা হইতে এই বুঝা যায়, পূর্ব্বে এ দেশে সর্টহ্যাণ্ডের প্রচলন ছিল এবং রাজা মহারাজেরা তাহাদের উৎসাহ দিতেন। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যসেবী এবং স্বদেশহিতৈষী বক্তা, লেখক প্রভৃতির কার্য্যে সর্টহ্যাণ্ডের আবশ্যক, সুতরাং বাংলা প্রচারে ইহারা সর্ব্বদা সহায়তা করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতে হইলে বাংলা ভাষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাংলা দেশের মত অত বড় এক-ভাষা-ভাষী প্রদেশ ভারতবর্ষে আর নাই; যত বড় ইংরাজীনবিশ হউনা কেন জনসাধারণকে কোন বিষয় বুঝাইতে হইলে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহারা স্থাণুর মত অচল পর্ব্বতের মত বাংলা ভাষাকে নির্ব্বাকভাবে সাহায্য করিতেছে, কোন দিন এই অচল পর্ব্বত সচল হইয়া উঠে তাহা হইলে যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাতে ইংরেজী ভাবের প্রাধান্য থাকিবে না, জাতীয় ভাবে, জাতীয় ভাষায়, জাতীয় রীতিনীতিতেই তাহা গড়িয়া উঠিবে, তখন বাংলা সর্টহ্যাণ্ডের পথ প্রশস্ত হইবে।

রেখাক্ষর আর সর্টহ্যাণ্ড এক জিনিষ নহে, রেখা দ্বারা অক্ষর বুঝাইলেই তাহা সর্টহ্যাণ্ড হইবে তার কোন অর্থ নাই। সর্টহ্যাণ্ড হইতেছে শ্রুত-লিখন, বক্তার সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া সমানভাবে লিখা ও তাহা পড়িতে পারা চাই। যে রেখাক্ষরে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহার নাম সর্টহ্যাণ্ড বা শ্রুত-লিখন-পদ্ধতি। দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরকে ভিত্তি করিয়া শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী সর্টহ্যাণ্ড রচনা করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষর হইতেছে কাঠাম যাহাকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রবাবু প্রতিমা তৈয়ার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিন্তা-রাজ্যে যাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, ইন্দ্রবাবু তাহাকে বাস্তব রাজ্যে কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। কাঠাম দেখিয়া যেমন প্রতিমার কোন ধারণা করা যায় না, আবার প্রতিমার ভিতর হইতে কাঠাম সরাইয়া লইলে যেমন প্রতিমার অস্তিত্ব লোপ পায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরে ও ইন্দ্রবাবুর সর্টহ্যাণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ, দ্বিজেন্দ্রনাথের মানস-প্রতিমাকে ইন্দ্রবাবু চাক্ষুস প্রতিমা রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা মন্থন করিয়া যে শক্তি আহরণ করিয়াছেন, তাহাকে রূপ দিয়াছেন ইন্দ্রবাবু, দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই প্রাণশক্তি ইন্দ্রবাবুর সর্টহ্যাণ্ডে সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া ইহা এত সবল, সতেজ ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এক জিনিষ নহে, বক্তৃতার ভাব তরল, ভাষা আলুথালু এবং সম্মুখে

যে সকল শ্রোতা উপস্থিত থাকিল তাহাদের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বক্তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে, সুতরাং চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য বক্তা চিন্তার স্রোত বা ভাবের প্রবাহ ধরিয়া হাজার হাজার মাইল দূরে চলিয়া যান, হঠাৎ যান না, সূত্র ধরিয়া যান এবং সে সূত্র কখন কখন এত সূক্ষ্ম হয় যে সূক্ষ্মতম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র তাহাকে ধরিতে পারা যায়, সময় সময় এরূপও হয় যে বক্তা বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া না আসিয়া এক সূত্র হইতে অন্য সূত্রে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান যেখানেই যান এক ভাব, একটা আইডিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সুতরাং বক্তৃতার ভাব অনেক সময় উপরে উপরে ভাসিয়া চলে, যখন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হয়, তখনও তাহা বাহিরে চিত্তাকর্ষক হয়, বক্তৃতার ভাষা যেরূপই হউক না কেন তাহার ভিতর একটা ভাবের স্রোত আসিবেই আসিবে, যিনি সম্মুখস্থ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন, তিনি পাগলের প্রলাপের মত অর্থশূন্য বাক্য কখনও প্রয়োগ করেন না, প্রবন্ধের ভাষা মার্জ্জিত প্রবন্ধ-লেখক উপস্থিত বিষয় হইতে বহু যোজন দূরে ভ্রমণ করেন না, তিনি আপন মনে আপন ভাবে লিখিয়া যান, পাঠকবর্গের সেটা চিত্তাকর্ষক নাও হইতে পারে, চিন্তার ঘন সন্নিবিষ্টতা ও যুক্তির সারবত্তা প্রবন্ধে থাকিতে পারে, বক্তৃতা যদি চিত্তাকর্ষক না হয় তবে সেটা বক্তৃতাই নয়, অনেক সময় দেখা যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের মনের উপর কিছুমাত্র দাগ কাটিতে পারে না পক্ষান্তরে বক্তা সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া যদি শ্রোতৃবৃন্দের মনে ঔৎসুক্য জন্মাইতে পারেন, বলিবার ভঙ্গীতে অথবা জলদগম্ভীরস্বরে যদি শ্রোতার হৃদয় একবার আকর্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে অতঃপর বক্তা যাহা বলেন তাহার প্রতি বাক্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অথচ সেই বক্তৃতাই যখন রিপোর্টারের সাহায্যে লিখিত হইয়া ছাপা হয় তাহা পড়িয়া হৃদয়ে কোন উত্তেজনার ভাব আসে না, হয়ত একস্থানে সমবেত জনতার পুঞ্জীভূত হৃদয়াবেগ একটা শক্তির কাজ করে যে শক্তি এক হৃদয়ে একলা একলা সঞ্চারিত হয় না একই বিষয় সম্বন্ধে একই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একই ব্যক্তি প্রবন্ধ লেখেন ও বক্তৃতা করেন এবং সে বক্তৃতা যদি লিখিত হয় তাহা হইলে প্রথম এক লাইন কি দুই লাইন পড়িলেই ধরা পড়িবে কোনটি প্রবন্ধ, কোনটি বক্তৃতা—উভয়ের মধ্যে এতই প্রভেদ। বাংলা দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে এখন পর্য্যন্ত বক্তৃতার যথেষ্ট আমদানী হয় নাই, প্রবন্ধই চলিতেছে, তাহার কারণ সর্ট-হ্যাণ্ড রিপোর্টারের অভাব। ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতি সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা রিপোর্টারের অভাবে জন কয়েক শ্রোতাকে মাত্র মুগ্ধ করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে

শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বক্তৃতার সার মর্ম্ম, ও বক্তৃতার সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট এক কথা নহে। সার মর্ম্ম ও প্রবন্ধ একই জিনিষ, প্রভেদ বড় ছোটয়, আর সর্টহ্যাণ্ড আলাদা জিনিষ। আসল বক্তৃতা হতেছে প্রচুর তরল রস,, সার মর্ম্ম তাহার ঘন রস, বর্ষাকালের দুকূল-প্লাবিনী তরঙ্গিণী হইতেছে যেন বক্তৃতার সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট, আর গ্রীষ্মকালের শুষ্ক-তোয়া ও খরস্রোতা নদী হইতেছে যেন তাহার সার মর্ম্ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সর্টহ্যাণ্ড শিখিতে হইলে ভাষার উপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই, কেন? একমাত্র কারণ আজ পর্য্যন্ত জগতের কোন সর্টহ্যাণ্ড প্রণালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ নির্ভুলভাবে পড়া যাইতে পারে এমন কোন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা শোধরাইতে হইবে, উপায় ভাষার উপর দখল। সর্টহ্যাণ্ড যাহা করিতে পারিল না, কৃত্রিম উপায়ে তাহা করিতে হইবে, সে উপায় হইতেছে—নিজের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা - এক কথায় ভাষার উপর দখল। পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাকে লিখিতে হইবে ব্যাকুল, আমি তাড়াতাড়িতে শুধু লিখিলাম ব, ক, ল। ইহা হইতে আমি ব্যাকুল শব্দটি বাহির করিব কেমন করিয়া? অবস্থা আরও সঙ্গীন হয় যদি ব ও প, এবং ক ও গ একই রকমের রেখা হয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই আমি 'ব' কে 'প' এবং 'ক' কে 'গ' পড়িতে পারি তাহা যদি হয় আমি নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাই:—

বিকল বগল
বাকল বিগল
বকিল বগলা
বিকাল পাকিল
বকুল পাগল।

এতদ্ভিন্ন 'ল' এ আকার ইকার যোগ করিলে আরো অনেক শব্দ হয়, সেগুলি বাদ দিয়া কেবল অর্থের তারতম্য হিসাবে আমি ১১টি শব্দ পাই। এই ১১টি শব্দই যে যুগপৎ আমার মনে উদিত হয় তাহা নহে—আমাকে চিন্তা করিয়া এগুলি টানিয়া বাহির করিতে হয় এবং যে শব্দ পৌর্ব্বাপর্য্যের সঙ্গে (referring to the context) মিলিয়া যায়, অনুবাদ করিবার সময় আমি সেই শব্দই বসাইয়া দিই। ভাষার উপর দখল না থাকলে অসীমের বক্ষ হইতে এই ১টি শব্দ টানিয়া আনা সম্ভব নহে, টানিয়া আনিলেও ঠিক কোন্‌টি যথাস্থানে মানাইবে তাহা নির্ণয় করা সোজা কথা নহে। এ বিষয়ে স্মৃতি-শক্তিও সর্টহ্যাণ্ড-লেখককে কতকটা সাহায্য করে। সর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী এমন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত যে 'ব্যাকুল' লিখিলে ঐ শব্দটি ছাড়া আর কোন শব্দই বুঝাইত না তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ের অর্থাৎ ভাষার উপর দখলের কোন প্রয়োজন হইত না। ছেলেরা যেমন বড় বড় বই পড়িয়া যায় অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সর্টহ্যাণ্ড লেখকও অনায়াসে

সেরূপ পড়িয়া যাইতে পারিত, তাহা সে পারে না, কারণ চিন্তা করিয়া তাহাকে অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, সেজন্য সময় লাগে। যে সর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী যত বেশী অসম্পূর্ণ তাহাতে তত বেশী সময় লাগে কারণ তাহাকে অনেকগুলি শব্দের জন্য চিন্তা করিতে হয়। এবং ভাষার উপরও তাহার বেশী রকম দখল থাকা প্রয়োজন যে সর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী যত বেশী সম্পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহাকে কম শব্দের জন্য চিন্তা করিতে হয় সুতরাং সময়ও কম লাগে এবং ভাষার উপরও খুব বেশী দখল থাকার প্রয়োজন করে না। তবে সকল ক্ষেত্রেই সর্টহ্যাণ্ড-লেখকের এমন ধীশক্তি থাকা প্রয়োজন যেন সে, বক্তার কথার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, যে কথাটি সে একবার কানে শুনিয়াছে, যাহার অর্থ সে বুঝিয়াছে সে সম্বন্ধে কতগুলি সাঙ্কেতিক রেখা দেখিলে ঐ ভাব অতি শীঘ্র তাহার মনে উদিত হইবে এবং সর্টহ্যাণ্ড পড়িতে তাহা সাহায্য করিবে; ইহাও অবশ্য সর্টহ্যাণ্ডের অসম্পূর্ণতা-সংশোধনের আরেকটি উপায়। যতদিন সর্টহ্যাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকিবে ততদিন এরূপ উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করিতে বসিলেন তখন গণেশ তাহার সর্টহ্যাণ্ড লেখক নিযুক্ত হইলেন, বক্তৃতা করিবার সময় যত তাড়াতাড়ি শব্দ উচ্চারণ হয় থে মুখে বলিবার সময় তত তাড়াতাড়ি হয় না, আস্তে আস্তে লিখা বোধ হয় গণেশের মত একজন সুদক্ষ সর্টহ্যাণ্ড লেখকের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল সম্ভবতঃ তাহাকে বেতনও দেওয়া হইত না কারণ আজকাল ইংরেজের আফিসে দেখা যায় মনিব আস্তেই বলুক আর জোরেই বলুক বেতনভোগী সর্টহ্যাণ্ড লেখকের সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই। গণেশ কিন্তু বলিল—সে লিখিবে বটে; তাহার লেখনী যদি থামে তবে আর সে লিখিতে পারিবে না। ব্যাসদেব তাহাতে রাজী হইলেন কিন্তু বলিলেন—গণেশকে প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। বাস্তবিক দেখা গিয়াছে—বক্তার কথার অর্থ না বুঝিলে সর্টহ্যাণ্ড পড়া এক রকম অসম্ভব। এই জন্য সর্টহ্যাণ্ড-লেখকের সকল বিষয়েই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

সর্টহ্যাণ্ডে ২টি বিষয় একান্ত দরকার, (১) সহজে পড়া (২) তাড়াতাড়ি লিখা। সহজে পড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরের বিশেষত্ব, বাংলা দেশে এরূপে ২টি মাত্র সর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী প্রচলিত আছে। (১) পুলিশের প্রণালী—যাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ নামে এক ব্যক্তি পিটম্যানের অনুকরণে তৈয়ার করিয়াছেন (২) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণালী—যাহাকে ভিত্তি করিয়া ইন্দ্রবাবু কার্য্য করিতেছেন। এই ২টি প্রণালী আলোচনা করিয়া এ কথা বলিতে পারা যায় পুলিশের প্রণালী অপেক্ষা

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রণালী পড়িবার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। আমরা জানি যেখানে সর্টহ্যাণ্ডের বঙ্গানুবাদ লিখিতে ও পড়িতে পুলিশের ৫।৬ দিন লাগে সেখানে ইন্দ্রবাবু তদপেক্ষা অনেক কম সময়ে তাহা পড়িতে পারেন, এই সুবিধা হেতু তিনি কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তার পর তাড়াতাড়ি লিখা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ সমীচিন নহে। কারণ এমন অনেক শব্দ আছে যাহা পুলিশ-প্রণালীতে খুব সংক্ষেপ, অনেক শব্দ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রণালীতে সংক্ষেপ। তাহা হইলেও আমার মনে হয় অপর প্রণালী অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রণালী কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি লেখা যায়, অন্ততঃ সমানে সমানে যে চলিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মরণের ভয়

—:•:—

"মরণ যন্ত্রণা হ'তে বিরহ যন্ত্রণা বড়" কিম্বা "মরণরে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান"—এ সব উচ্চ অঙ্গের কবি-কল্পনা—এ কল্পনা সাজে ভাল কাব্যের পৃষ্ঠায়, শুনায় ভাল সুকণ্ঠ গায়কের মুখে। দার্শনিক ভাব হিসাবে কথা কয়টা একেবারে অলীক—মরণের আসল চিত্র দিয়াছেন ঈশপ, যখন কাঠুরিয়ার মুখে তিনি যমকে বলিয়াছিলেন—"বাবা যদি দয়া করে এসেছ তো আমার মাথায় কাঠের বোঝাটা তুলে দিয়ে যাও।"

এই মরণের ভয় বিদ্যমান মানুষের মনে অহরহঃ। জন্ম এই মৃত্যুভয়কে দোসর করিয়া সঙ্গে লইয়া আসে। একটু গভীর-ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, এই মরণের ভয়েরই নামান্তর আত্মরক্ষার সহজবৃত্তি Instinct of self-preservation. কবিগুরু সেক্সপীয়রের হ্যামলেট অনেক গবেষণা করিয়াও এই ভয় এড়াইতে পারে নাই কারণ—"মরণ—নিদ্রা—কিন্তু সেই নিদ্রায় কি স্বপ্ন-প্রহেলিকা আসিয়া জুটিবে কে তাহা বলিতে পারে?" যত ঝঞ্ঝাট ঐখানে। যুক্তি-তর্ক রাজপুত্রের ব্যক্তিগত—কিন্তু ভয়টা তাহার জাতিগত, সহজাত।

প্রেমের কবি, স্বাধীনতার উপাসক বায়রণ আদমের পুত্র কেইনের মুখ দিয়া বলিয়া ছিলেন—

But live to die, I live and
living, see nothing
To make death hateful, save
an innate clinging,
A loathsome yet all
invincible
Instiuct of life, which I abhor,
as I
Despised myself, yet can not
overcome—
And so I live.

আর একস্থলে সে বলিয়াছিল—

"Alas I scarcely know what
it is
And yet I fear it, fear—I know
not what."

জীবতত্ত্বের বড় পণ্ডিত সায় জন লাবক বলিয়াছিলেন—"জীবন একটা বড় দান"। রেঁনাসোঁর তো কথা নাই—তিনি জীবনকে সত্যই একটা বড় দান বলিয়া ভাবিতেন। আর নানা তত্ত্ব আলোচনা করিয়া রোসো সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—"জীবনের উল্লাসগুলা যখন কেটে যায় তখন জীবনটা আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়। নবীন অপেক্ষা প্রবীণেরাই জীবনকে দৃঢ়-ভাবে আঁকড়ে থাকে"। অপর স্থলে রোসো বলিয়াছিলেন—"যে ছল করে বলে যে মরণের সামনে যেতে তার ভয় হয় না, সে মিথ্যাবাদী। সকল লোক মরণকে ভয় করে এ মহানীতি চিন্তাশীল জগতে আধিপত্য করে আছে। এ নীতি না থাকলে সকল জীবনই নষ্ট হত। এ ভয় একটা সহজাত ভাব।"

১৮৩১ সালে বার্লিন সহরে বিসূচিকার মড়ক হয়। তাহাতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিগেল দেহত্যাগ করেন। সেই মড়কের ভয়ে সোপেনহায়ার ফ্রাঙ্কফোর্টে বায়ু পরিবর্ত্তনে যান। তিনি তাঁহার জননীকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"মানুষের যত বড়, আর সাধারণতঃ বলতে গেলে, যত অমঙ্গল-কর দুর্ভাগ্য থাকতে পারে সেটা মৃত্যু—মৃত্যুভয়ের তুল্য ভয় আর নাই।" এই অনিষ্টকর ভয়ই এই বিজ্ঞ দার্শনিকের সমস্ত দার্শনিক নীতির মূলে।

ফরাসী ঔপন্যাসিক দোদে (Daudet) বলিয়াছেন··"মরণের ভয়, আমার ঘাড়ের একটা ভূত, আমার সারাজীবনের বিষ। আমি নূতন গৃহে বাস করতে গেলেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আমার কফিন এসে কোথায় নামবে।"

জোলা—রসিক ঔপন্যাসিক বস্তুতন্ত্রের সাধক স্পষ্টবাদী জোলা—তাহারও স্কন্ধে এই ভূত ছিল। তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল যে বাড়িতে, সে বাড়ীর সিঁড়ি ছিল বড় অপ্রশস্ত। কাজেই জানালার ভিতর দিয়া দড়ি বাঁধিয়া কফিনটীকে নামাইতে হইয়াছিল। তদবধি জোলা এবং তাহার সহধর্ম্মিণী সেই গবাক্ষ দেখিলেই মনে মনে আলোচনা করিত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে

কাহার কফিন প্রথমে ঐ জানালা দিয়া নামিবে। জোলা বলিত—"মৃত্যু-ভয়টা সর্ব্বদাই আমাদের সকল চিন্তার যেন ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শয্যার উপর হয়ত বহুক্ষণ উভয়েই জাগিয়া শুইয় আছি—উভয়েই বুঝিতেছি যে পরস্পরের ঐ এক চিন্তা, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিতেছি না।"

জিন ফনো, ফরাসী দার্শনিক একটী সম্পর্কে বলিয়াছেন যে একবার ভিক্টর হিউগোর বাড়ীতে এক মজলিসে অনেক নামজাদা লোক উপস্থিত ছিলেন তখন এই প্রসঙ্গ উঠে। সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে সকল ভয়ের মধ্যে এই মৃত্যু-ভয়টাই দারুণ ভয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি গ্রে এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন "The paths of glory lead but to the grave." শিশু-কালের জুজুর ভয়, ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ কালের মহামারীর ভয় অবধি সকল আতঙ্কের মূলে আছে এই মরণের শঙ্কা। স্বদেশ-প্রেমিক জন্ম-ভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেয়—সেটা সাধারণ মনোবৃত্তির কথা নয় সেটা একটা অসাধারণ সাধনা এবং উম্মোসানের উত্তেজনায়। এক-জন মুসলমান বাক্যবীর সেদিন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান মরিতে ভয় পায় না—কাফের মরণকে ভয় করে—সেটা বাক্যের ছটা হিসাবে সুশ্রাব্য হইয়াছিল বটে কিন্তু সে বীর যে জীবন যাপন করে তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে তাহার পক্ষে জীবনটা বড় চকচকে এবং উপভোগ্য। এ ত্রাসকে হিন্দু কাফের কিরূপে পদ-দলিত করিতে পারিয়াছে সে কথা পরে বলিব।

সত্যবাদী টলষ্টয়—ধর্ম্মপ্রাণ টলষ্টয়—খৃষ্টান-কুল-রবি নিষ্ঠাবান সাধক—যৌবনে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন মৃত্যু-ভয় রুশীয় সেনাদের মধ্যে কত বেশী। প্রথম বারুদের গন্ধে সকলেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত হয়—পিছনের সঙ্গীনের খোঁচার ভয়ে সৈনিকেরা স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

টলষ্টয় তাহার Confession নামক পুস্তকে যে অশান্ত মনোবৃত্তির অনুপম বিশ্লেষণ করিয়াছে বিশ্ব-সাহিত্যে তাহা এক অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য। এই মৃত্যু ভয়—মরণের পর সকল স্পৃহা সকল উচ্চাশার সমাধির ভীমমূর্ত্তি—রুশীয় দার্শনিককে ভ্রান্ত করিয়াছিল। তৃষাতুর মৃগের মত সে অনেক মরীচিকার কুহকে পড়িয়া ছুটা-ছুটি করিয়াছিল। শেষে যখন সে বুঝিল যে জীবনের পরপারে আরও কাজ আছে—শূন্য অন্ধকারটা কেবল ইহজীবনের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার পরিণাম—তখন সে শান্তি পাইয়াছিল। তখন সে বুঝিয়াছিল খৃষ্টের উপদেশের মর্ম্ম, প্রকৃত খৃষ্টিয় ধর্ম্মের স্বরূপ। সে কথা সে What I Believe পুস্তকে বড় শ্রদ্ধা, বড় নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছে।

কিন্তু সে গ্রন্থেও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জীবন-রহস্যের আসল সন্ধান পায়

নাই টলষ্টয়, কারণ সে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, জন্মান্তর-বাদ, উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ভারতের ধর্ম্ম যাহারা মানে—ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, জিন, অর্হৎ, শিখ গুরু কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণব বা কাপালিক—তাহার নিকট মরণের ত্রাস মোটেই বিভীষিকার সৃষ্টি করে না। যে না মানে, আশৈশব প্রাণে প্রাণে এ সত্য উপলব্ধি না করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

আমি এ কথা বলিতেছি না বর্ণাশ্রমী যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ব্রাহ্ম বা আর্য্য সমাজী মানুষ মাত্রেরই সহজাত বৃত্তি, মৃত্যুভয় তিরোহিত হইয়াছে। তবে আমি একথা জোরের সহিত বলি যে ভারতবর্ষের ধর্ম্মে দীক্ষিত মানুষের সে-মৃত্যুভয় নাই, যে-মৃত্যু-ভয়ের বিভীষিকা অন্য দেশের লোককে অহরহঃ সন্ত্রাসিত করে। দেশের জন্য হয় ত য়ুরোপের খৃষ্টান, তাহার ধর্ম্ম-মন্দির রক্ষার জন্য সকল দেশের লোক অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু সে সক্ষমতার মূলে থাকে একটা অসাধারণ উত্তেজনা। যে জন্মান্তরবাদ মানে না তাহাকে চিরদিন বুঝিতে হয় এই জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ মাত্র এই জীবনে। দমবন্ধ হইলে সে বেহেস্তেই যাক্ আর জাহান্নমেই যাক্—এ সংসারে আর সে বালারুণের শোভা বা পূর্ণিমার রাত্রি দেখিতে পাইবে না, রমণীর প্রেমফাঁস বা কালিয়া-কোপ্তার আস্বাদন পাইবে না। কাজেই ভোগ-লিপ্সা ভারতের বাহিরে অতি-মাত্রায়। এক পার্থিব জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডর উপর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক নির্ভর করে—এই মতে এ জীবনের শেষে যেমন সুখ ও ভোগের আশা আছে তেমনি ভীষণ নরক-যন্ত্রণারও আশঙ্কা আছে কয়জন মানুষ বলিতে পারে যে ভুল ভ্রান্তি বা পাপ সে করে নাই? কাজেই সাধারণের মনে নরকাগ্নির লকলকে জিহ্বাটা বড় ভীতিপ্রদ, হাতের সুখ, এ জন্ম ছাড়িতে কে চায়? তাই মৃত্যু-ভয়কে সে দর্শন-শাস্ত্র দখল করিতে পারে না। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেত এই কথাটাই বেশী সুখের।

ভারতের শিশু আশৈশব শুনিতে পায়—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

যখন সে উপনিষদের কথাগুলা ঠাকুর-মা, দিদিমা, বৃদ্ধাদাসী পুরাতন ভৃত্য সকলের মুখে বোধগম্য ভাষায় শুনিতে পায় তখন সে জানে এ জীবনটা ব্যক্তমধ্য মাত্র—এর আগেও ছিল পরেও আসিবে। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি চ তবার্জ্জুন!"—এ ভাব এ নীতি বদ্ধমূল আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে। কাজেই মৃত্যুভয়ের তেতবাটুকু অনেক ঘষা মাজা হইয়া আমাদের মনের মধ্যে অনুভূত হয়।

এই মৃত্যু-ভয়-রূপ সহজ সংস্কারটাকে দমন করিবার ব্যবস্থা সকল ধর্ম্মমতেই মূলে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একমাত্র জীবনের উপর অনন্তকালের

স্বর্গ বা নরকবাস নির্ভর করিতেছে—য়িহুদী শাস্ত্রের এই দর্শনের উপর যে সকল ধর্ম্মমত স্থাপিত সে সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাস অবতারের বাণী মানিয়া ভয় এড়াইবার পরামর্শ দিয়াছে। প্রাচীন মিশর প্রত্যহ ভোজের পর একটা মড়ার মাথা লোককে দেখাইত—শেষের দিন স্মরণ করাইবার জন্য এবং জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করাইবার জন্য। ভারতবর্ষের শবদাহ ব্যবস্থায় এই নীতি প্রকটিত।

আর্য্যাবর্ত্ত আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া মৃত্যু-ভয়কে তিরোহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিত মরণের পর আবার জন্মিতে হইবে—ভয়টা সেইখানে। ভয় মরণে নয়, ভয় পুনর্জ্জন্মে। যে মরণের পরে আর জন্ম নাই সেই মরণটাকেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু করিয়া তুলিতে আর্য্য ঋষিরা শশব্যস্ত ছিলেন। বাঙ্গালী ভক্ত গাহিয়াছিলেন "জপ তপ করলে কি হয় মরতে জানলে হয়।" ভারত-জ্যোতি শাক্যমুনি বোধিদ্রুম তলে "বুদ্ধ" হইয়াই বলিয়া উঠিয়াছিলেন—অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসনং অনিব্বিসং।

গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।

গহকারক! দিট্ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসঙ্খিতং। বিসঙ্খার গতং চিত্তং তন্হানং খয়মজ্ঝগা।

দেহ-রূপ-গৃহ-কারককে সন্ধান করিতে করিতে তাহাকে তো পাইলাম না। অথচ কতবার জন্মলাভ করিলাম অনেক সংসারেই পরিভ্রমণ করিলাম পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা বড়ই দুঃখের। হে গৃহ কারক, তোমাকে এইবার দেখিয়াছি। আর গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার সকল ফাঁস টুটিয়াছে। গৃহকুট নষ্ট হইয়াছে। আমার নির্ব্বাণ গত চিত্তে সকল তৃষ্ণার ক্ষয় হইয়াছে।

তাই ভারতবর্ষ দেহ রক্ষা অপেক্ষা তনহা—ক্ষয়ের দিকে লক্ষটা চিরদিনই রাখিয়াছে অধিকমাত্রায়।

এ বিষয়ে আর মহাজনের বচন উদ্ধার করিবার প্রয়োজন দেখি না। মোটের উপর কয়টা কথা সিদ্ধ যে (১) মরণের ভয় মানুষ মাত্রেরই সাধারণ বৃত্তি (২) উচ্চ আদর্শ বা বড় কাজের উত্তেজনায় মানুষ সে সহজ বৃত্তিকে দমন করিতে পারে। (৩) সকল প্রধান ধর্ম্ম মানুষকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে শিক্ষা দেয়। পুনর্জ্জন্ম-বাদ ও মোক্ষতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আর্য্যাবর্ত্ত মৃত্যু-ভয়কে তাচ্ছিল্য করিবার প্রকৃষ্ট আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিয়াছে।

স্বদেশ-হিতৈষণা বা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে অনেক লোক আত্মবলি দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে। ঐ সকল আত্মবলির জন্য তাহারা যুদ্ধে যায়। সমর-প্রাঙ্গনে জয় বা পরাজয়ের তুল্য সম্ভাবনা আছে। স্বদেশের বা স্বজাতির বা স্বধর্ম্মের হিতের জন্য উত্তে-

জনার বশে প্রাণত্যাগ করার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয়ের আশা আছে। সে ক্ষেত্রে মৃত্যু-ভয়কে একেবারে নিরুদ্বেগ ভাবে তাচ্ছিল্য করিবার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমি স্বদেশ-প্রেমিক যোদ্ধার বীরত্বের অসম্মান করিতেছি না। মৃত্যুভয় এড়ানোর আদর্শ হিসাবে তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়—একথা বলিতেছি মাত্র।

এই সংগ্রামে প্রাণ দেওয়ার মাপকাঠি ধরিয়া এ বিষয় ইতিহাসের পাতা খুঁজিয়া দেখিতে হয়,প্রাচীন হিন্দু এ বিষয়ে কি আদর্শ মানিত। তাহার বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে মরণের ত্রাস তাহার অবশিষ্ট সকল বৃত্তি-গুলাকে ডুবাইয়া দিত না। মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের যে বহুসংখ্যক ইতিহাস বিদ্যমান আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ-গুলিই মুসলমান-রচিত। ঐ সকল ইতিবৃত্তকার একবাক্যে বলিয়াছে যে, রণে ভঙ্গ দিবে না--রণক্ষেত্রে প্রাণ দিবে—এই মস্ত ধারণাটা রাজপুতের আদর্শ বলিয়া হিন্দুদের সহিত তাতার বা পাঠানদের যুদ্ধ অতি সত্বরে শেষ হইত। যখন হিন্দু দেখিত যে উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব তখন সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রণ ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিত। টডের রাজস্থানের ইতিহাসে এই চিত্র প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত।

কিন্তু এ যে মরণের ভয়কে পদ-দলন—ইহার মূলে উত্তেজনা আছে। নিরুদ্বেগে শীতল মস্তিষ্কে মরণকে বরণ করিবার দৃষ্টান্ত হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রাণ সাধকদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টিয় বীরেরা তাহাদের অবতারের বাণীর যাথার্থ্য স-প্রমাণ করিয়াছিল আততায়ীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া—স্পেন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্ম্মের নামে, অপর সম্প্রদায়ের খৃষ্টানের কাঁচা মাথা লইতে বেশ উৎসাহ দেখাইয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা বুঝিয়াছি, যাহারা প্রাণ দিয়াছিল মহাপুরুষ তাহারা। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সকল ভূপতি বা ধর্ম্ম যাজক নিরীহ খৃষ্ট-সেবকের পবিত্র রক্তে ধরণীতল সিক্ত করিয়াছিল, তাহারা নর-রাক্ষস।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ বা মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এ নীতি ভারতের সনাতন। সে নিধন বা শরীর পতন মারিয়া মরা নয়—কাঁচা মাথা দেওয়ার আদর্শ। রাজকুমার প্রহ্লাদ দেখাইয়াছিল—সেই আদর্শ। পাহাড়ের উপর হইতে পড়িবার সময় সে নিজেকে বাঁচাইবার কোনও চেষ্টা করে নাই, হস্তীর পদ-তলে পড়িয়া বা বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া সে সমান উল্লাসে গদগদ কণ্ঠে প্রেমের ভাষায় বলিয়াছিল—হরিবোল হরিবোল। ধীরভাবে বক্ষের অস্থি দান করিয়া দধীচি মুনি যে আদর্শ ভারতে রাখিয়া গিয়াছেন সে আদর্শের কাছে এই সহজাত মৃত্যু-ভয় দীনভাবে মাথা হেঁট করিয়াছে।

এদেশে এই শ্রেণীর মৃত্যু বরণ করিত

সতী-স্ত্রীলোক। লোকাচারের উৎপীড়নে নিশ্চয়ই অনেককে স্বামীর জলন্ত চিতায় সহমরণে যাইতে হইত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ রমণী যে হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে, নিরুদ্বেগে চিতায় বহ্নিতে-প্রাণ-উৎসর্গ করিত—সে কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এ সাধনা দেশের শিক্ষা-দীক্ষার পরিণাম। ব্যাপারটা ছিল নিষ্ঠুর—কিন্তু সাধনার দ্বারা সহজ বৃত্তিকে দমন করিবার দৃষ্টান্ত হিসাবে সতী-দাহ পদ্ধতিটা উৎকৃষ্ট।

এই দারুণ কলিযুগেও সেই জাতির সন্তান বেদীর সহিতে মাথা দিয়াছিল সহাস্য বদনে। আমি চিরদিন বলিয়াছি এ যুগের বিপ্লব-বাদী বাঙ্গালী, ভ্রান্ত ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু সে মরণ-ভয়কে অনেকস্থলে যেমন অগ্রাহ্য ও তাচ্ছিল্য করিয়াছে—তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্যগ্রহ ভারতেই সম্ভব।

মানুষ সাধনার দ্বারা অনেক বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে—তাই কালচারের সাহায্যে এই সংজাত ত্রাসকে পদ-দলিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাধনা বা কালচার এ বিষয়ে খুব উচ্চ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

চৈত্রের চাঁদ

—:•:—

আজ চৈত্রের শেষ-রাতে ঐ
　　আধখানা চাঁদ দিল দেখা রে।
নীল আকাশের উদাস বুকে
　　তারার মুখে মলিন লেখা রে!

দখিণ হাওয়া ঘাসের শিরে,
ব্যথার পরশ বুলায় কি রে!—
দেয় মুছিয়ে দীঘির আঁখি
　　চাঁদার হাতে আজ সে একা রে!

বিরহ আজ ঘনিয়ে আসে
　　উষ্ণ শ্বাসে চরণ চপলে,
কোন্ ব্যথা ঐ রাঙিয়ে ওঠে
　　গোলাপ-বালার কোমল কপোলে,-

নবীন বরষ আসার আগে,
চৈত্রের চাঁদ বিদায় মাগে,
পুরাতন এই ধরার বুকে
　　ঐ বুঝি শেষ চরণ-রেখা রে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের বিভিন্ন যুগ

—:•:—

ভারতীয় ভাস্করকে আজ পাথর-কাটা শিখিতে ইটালি না কোথায় নাকি যাইতে হয়। পাথরে আজও দেশ ভরা, কিন্তু রূপ আর তাহাতে ফোটে না! বাঙ্গালী যে এক সময় পাথর কাটিয়া রূপ বাহির করিতে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল তাহা যেন আজ আমরা স্বপ্নেও ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না! আজ প্রায় বিশ বছর যাবৎ বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী শিল্পীর হাতের পাথরে ছাপা রূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—তাহাদের কতকগুলি রাজ-সাহিতে, কতকগুলি ঢাকা মিউজিয়মে ও ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে, কতকগুলি কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্র-শালায় একত্র করা হইয়াছে। এই সমস্ত গুলির কত সহস্রগুণ এখনও গ্রামে গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাচীন পুকুরের পাঁকের নীচেই বা কত লুকাইয়া আছে। এই সকল দেখিয়া কেবলি ভাবি, কাল পাথরের গায়ে যে অপূর্ব্ব রূপের আলো দেশ ভরিয়া ফুটিয়াছিল, কোন্ নিষ্ঠুর তাহা নিভাইল রে! এমন আলোকমালায় দীপালী উৎসবে যাঁরা সারা দেশের অঙ্গ এমন করিয়া সাজাইয়াছিল, নক্ষত্রতারকাখচিতা কৃষ্ণা যামিনী যাহার একমাত্র উপমাস্থল,—সেই আলোর মালার মালীগণ গেল কোথায়? বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধমানে এখনও নাকি দুই চারি ঘর ভাস্কর আছে শুনি, কিন্তু তাহাদের কারিকরী দেখিয়া আমারি মাথায় কালাপাহাড়ের ভূত চাপিয়া বসে, অন্যের তো কথাই নাই।

পরিশ্রম করিলে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের একখানি বেশ মোটা রকমের ইতিহাস এখন লেখা যায়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী ইত্যাদি প্রবীণ লেখকগণ এই কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি। বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট সহৃদয় ফ্রেঞ্চ সাহেব বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যকে বিলাতে পরিচিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য সম্বন্ধীয় তাঁহার একখানা পুস্তক বোধ হয় এইক্ষণে বিলাতে মুদ্রিত হইতেছে। বিদেশী সহৃদয়-সহৃদয়াগণ আমাদের ভাস্কর্য্যকে রসজ্ঞ সমাজে পরিচিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বঙ্গীয় লেখকগণ নীরব কেন?

ইতিহাস লিখিতে গেলে কিন্তু সব

তারিখ ঠিক রাখা বড় দরকার, গায়ের জোরে এটা এই যুগের, ওটা ঐ যুগের বলিলে চলিবে না। বঙ্গীয় ভাস্করের শিল্পের

১নং চিত্র—বিষ্ণু।

পরিচয় প্রায় আগাগোড়াই মূর্ত্তিতে, কিন্তু মূর্ত্তির গঠন-পদ্ধতি দেখিয়া কোন্‌টা কোন্ যুগের বলিয়া দেওয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রে মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত, সন তারিখ যুক্ত লিপিগুলির সাহায্য অমূল্য। ভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকখানা লিপিযুক্ত মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ লিপিতেই কিন্তু সন তারিখ নাই, মূর্ত্তিটির পরিচয় বা প্রতিষ্ঠাতার নাম মাত্র আছে। বরেন্দ্র প্রদেশে আমি এই রকম বহুতর মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। এই রকম বহু মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া অক্ষর-তত্ত্বের বিচারে তাহাদের কাল-নির্ণয় করিয়া পরে কালভেদ অনুসারে শ্রেণীভেদে তাহাদের ফটোগ্রাফগুলি সাজাইলে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যে বিভিন্ন যুগের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি ধরা পড়িতে পারে। এই কার্য্য সহরে বসিয়া অসম্ভব—ক্যামেরা লইয়া গ্রামে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে এবং সারা বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইবে। যৌবনের উদ্যম এবং প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতার সম্মিলন একক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যে বিভিন্ন যুগের কল্পনার আবশ্যকতা আছে কি? উত্তরে রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণকে কয়েকখানা মূর্ত্তির ছবি দেখাইতেছি।

প্রথম ছবিখানি একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির, বোধহয় না বলিলেও চলে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে যে সব

২নং চিত্র—বৌদ্ধ তারাদেবী।

এত বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত এই অদ্ভুত মূর্ত্তিখানার বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। পায়ের দিক হইতে দেখিতে আরম্ভ করুন। দেখুন ইহার আসনের পদ্মটির মাত্র এক সারি পাপড়ী দেখান হইয়াছে, তাও আবার যেন নীচের দিকে টানিয়া দেখান হইয়াছে। গরুড়ের মূর্ত্তিতেও সাধারণ মূর্ত্তির গরুড়ের সহিত বিভিন্নতা রহিয়াছে। দক্ষিণাধঃ হস্তের চক্রটি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের যোগ্য। সাধারণতঃ চক্রের একটি হাতল থাকে। বিষ্ণুর হাতে সেই হাতলটিই থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু চক্রের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বিষ্ণু চক্রের কিনারা ধরিয়া আছেন। একটি আতস কাচের সাহায্যে দেখিতে পাইবেন, চক্রের অভ্যন্তরে চক্রপুরুষ ঘুরপাক খাইতেছেন। বিষ্ণুর অপর আয়ুধ গদাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রকায়া গদাধারিণী গদাদেবী বিষ্ণুর বামাধঃ মুষ্টির অভ্যন্তরে স্থাপিতা হইয়াছেন। অপর দুই হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম থাকা উচিত ছিল—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই দুই হাতেই দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম ধৃত। দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তের উপর বসিয়া আছেন পদ্মাসনা গজলক্ষ্মী আর বামোর্দ্ধ হস্তের পদ্মের উপর বসিয়া আছেন অর্দ্ধপর্য্যঙ্কাসনা বীণাবাদিনী সরস্বতী। পত্নী উদ্বহনের এই practical demonstration বিষ্ণুর আর কোনও মূর্ত্তিতে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না।

তারপরে আবার লক্ষ্য করুন সরস্বতীর হাতের বীণা। এই বীণার সহিত ৩ .

৪নং মূর্ত্তির সরস্বতীর হাতের বীণা তুলনা করুন। এইরূপ স্ফীত লম্বিতোদর বীণা এক সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি।

৬নং চিত্র—বিষ্ণু।

অতঃপর লক্ষ্য করুন, বিষ্ণুর মাথার মুকুট। সাধারণ মুকুট তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া থাকে, এই মুকুটের মাথা কাটা। সাধারণ মুকুটে অনেকগুলি খোপ খালি থাকে, এই মুকুটের পার্শ্বগুলি সমতল—সামান্য লতাপাতায় অঙ্কিত মাত্র। মুকুটের সম্মুখের পার্শ্বে হস্তচতুষ্টয় সমন্বিত একটি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে, ইনি কে চিনিতে পারিলাম না, অনেকটা যোগস্বামী নামে খ্যাত বিষ্ণুমূর্ত্তির মত মনে হয়।

সর্ব্বশেষ দেখুন, প্রস্তরখানির উপরের অংশ গোলাকার, সামান্য লতাপাতায় অঙ্কিত।

এই মূর্ত্তিখানিকে আমি পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের বলিতে চাহি। বিশেষ বিচার-বিতর্কের স্থান ইহা নহে। যতগুলি বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদের সমস্ত গুলিই আমার নির্দ্দেশের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়, মায় সরস্বতীর হাতের বীণার আকার পর্য্যন্ত। মূর্ত্তিখানা বাদামী আভাযুক্ত পাথরের তৈয়ারী এবং

কাল পাথরের মূর্ত্তির মত মসৃণ নহে। বিষ্ণুর মুখশ্রী পুরুষত্ব-মণ্ডিত, অজন্তা গুহার গাত্রস্থিত মূর্ত্তিসমূহের মুখশ্রী মনে করাইয়া দেয়,—যেন একই যুগের শিল্প।

৪নং চিত্র—বিষ্ণু।

বাঙ্গালা দেশে আমি যত মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একখানি আমার নিকট প্রাচীনতম বলিয়া মনে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে এই মূর্ত্তিখানির পূজা হয়। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এক পুকুর হইতে মাটি তুলিতে এই মূর্ত্তিখানি পাওয়া যায়।

২নং মূর্ত্তিখানিও বাদামী বেলে পাথরের। বৌদ্ধ তারা মূর্ত্তি। কোমল পাথর কালের প্রবাহে ক্ষয়িয়া গিয়াছে, গাত্র অমসৃণ। মুখখানা অনেকটা realistic, একটি রহস্যময় চাপা-হাস্য ও বুদ্ধিমত্তার ভাব ক্ষয়িত প্রস্তরের মধ্য হইতেও উঁকি মারিতেছে। মাথার উপরে পাথরের কিনারায় একটি উচ্চ সীমন্ত-রেখা দেখা দিয়াছে—পাথরের মাথা এখনও গোলা-কার। এই ছন্দের মূর্ত্তি আমার নিকট পালরাজত্বের প্রথম যুগের বলিয়া মনে হয়।

৩নং মূর্ত্তিখানা বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং ইহার বয়স উহার পাদপীঠস্থ লিপিতেই প্রকাশ। প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এই মূর্ত্তিখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহীপালের রাজ্যারম্ভ কাল ঠিক জানা যায় না, কিন্তু ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছেই তাহার রাজত্বের আরম্ভ। এই হিসাবে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাছে কোন সময়ে এই মূর্ত্তিখানির প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য

করিয়া দেখুন, আধুনিকত্বের হাওয়া আসিয়া এই মূর্ত্তিখানির গায়ে লাগিয়াছে। গোলাকার শিরোভাগে চেনা যায়, এখনও একেবারে আধুনিক যুগে আসিয়া পৌঁছে নাই। বিষ্ণুর মুখশ্রীতে কোমলত্ব যথেষ্ট, পুরুষত্বের অভাব।

৪নং মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া দেখুন এইখানিও বিষ্ণু মূর্ত্তি। পাথরের মাথা চোখা করিয়া তোলা হইয়াছে নানারূপ কারুকার্য্যে পাথরখানা একেবারে ছাওয়া। আর বিষ্ণুর মুখশ্রী—আহা চক্ষু কি আর ফিরিতে চাহে?—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি বহিয়া যায়!" বস্তুতঃ এত সাত্ত্বিক লাবণ্য যে কঠিন কাল পাথর খুঁদিয়া করা যায় তাহা এই মূর্ত্তিখানা না দেখিলে ধারণাই করা যায় না। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তিখানা অবস্থিত, তাই ফটোগ্রাফ ভাল উঠে নাই। আসল মূর্ত্তিখানা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়—জয়দেবের গীতগোবিন্দ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে।

পাথরের মধ্যে রূপের আলোর এই কোমল উজ্জ্বলতা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ আলো-দান। কারণ এই ছন্দের মূর্ত্তি যে সর্ব্বশেষ যুগের অর্থাৎ সেন-যুগের সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

আবাহন

—:•:—

বীরহীন এই বীরভূমে এসো ভক্ত ভাবুক কবি
নাই গড়খাই, ভগ্ন দেউল, দেখে যাও তার ছবি।
সরল শালের বনে বনে আজ শুধু আগাছার ভিড়
দেখে যাও শুক-কোকিলের বাসা, গরুড়ের ভাঙা নীড়।
নাই 'শ্যামরূপা' নাই সে 'ইছাই' ধূলিতে মিশেছে সব,
রাজ-নগরের গরব গিয়াছে থামিয়াছে কলরব।

২

এটা বাজিকর, হাঘরে, বাউল, ক্ষেপা, পাগলের দেশ,
বাঁশরী-মাদল-গোপীযন্ত্রের একসাথে সমাবেশ।
বাতাস এবং 'বাতাসা'র ভুঁই হর্ম্ম্য মোরব্বার
বক্ষ খুঁজিয়া এমন মধুর সঙ্গ পাবে না আর।
ঢাকের কাছেই খোলের বাস্ত খড়োর কাছে ঝুলি
হেথায় মিলেছে, যতন করিয়া দেখিতে যেওনা ভুলি।

৩

গোবিন্দ গীতি-গঙ্গোত্রীর নীরে করে যাও স্নান,
চণ্ডীদাসের পায়ের ধূলায় সাদা বেশ কর ম্লান,
হের তারাপীঠ যেথা 'বামাক্ষেপা' নব যোগাসন গড়ি,
পাগলী মায়ের পাগল বালক ডাকিল পাগল করি।
ভাণ্ডীর বনে গোপালের দেখা পড়েনাক যেন বাদ,
ভুলনাক নিতে পীযূষ প্রসাদ পরমান্নের স্বাদ।

৪

শুনিতে ভুলনা 'ময়না ডালে'র মনোহরসাহী গান
বক্রেশ্বরে উৎস-সলিল করপুটে কর পান।
দেখো লাভপুর প্রণাম করিয়ো ফুল্লরা দেবী পায়,
দেখো নান্নুরে 'চণ্ডীর' ভিটা উজ্জ্বল মহিমায়।
ভুলনা 'রামী'র সন্ধান নিতে সেখানেও যেও ছুটে
নীলমণি যার চিরদিন বাঁধা নীলাম্বরীর খুঁটে।

৫

হ'ক বীরহীন তবু বীরভূম এখনো বীরের ভূমি
দেখো 'রাইপুর' শশকের নীড়ে সিংহের বাস-ভূমি।
ওই বোলপুর বিশ্বের 'রবি' বিশ্বে না পেয়ে ঠাঁই
গড়িল নূতন উদয়-অচল তুলনা যাহার নাই।
হোথায় উঠিছে নব নালন্দা নূতন তক্ষশীলা
বিশ্বের ওই নবীন প্রয়াগ বিশ্বদেবের লীলা।

৬

ক্লেশ বহু পাবে উষর ভূমির ধূসর মাটিতে এসে
তবু এসো সুধী, জয়দেব আর চণ্ডীদাসের দেশে,
সমীরে তাঁদের আদর মাখানো সলিলে তাঁদের স্নেহ।
বীরভূম নয় এযে তাঁহাদের সাধনার পূত গেহ॥
ক্ষুদ্র মোদের সব আয়োজন সার্থক কর আজ।
তোমাদের প্রেম ঢেকে দেবে জানি মোদের দৈন্য লাজ॥

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

"মন্ত্রশক্তি"

—:*:—

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি" নামক পুস্তকখানি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সমালোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার মানসে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই, সমালোচকের আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য ক্ষমতা ও জ্ঞান সম্পদ আমার নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কেমন একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছি কি যেন একটা নূতন ভাব হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। সেই আনন্দ যেন বিবৃতি ও প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যগ্র; সে যেন কোন বাধা মানিতে চাহে না, সফলতা-নিষ্ফলতার কথা ভাবিতে চাহে না, যোগ্যতা-অযোগ্যতার কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করে না।

সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি লইয়া কিছু দিন হইতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এক দল লোক সাহিত্যে স্বাস্থ্যের পক্ষপাতী সুতরাং যাহাতে নীতি, সমাজ এবং ধর্মের অকল্যাণ হয় এরূপ চরিত্র-সৃষ্টির বিরোধী। অপর দল সাহিত্যের সৌন্দর্য্য এবং পুষ্টির বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইয়া সাহিত্যকে বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত করিবার এবং দোষ-বার অভিলাষী। উভয় পক্ষই স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় সমধিক যত্নবান্। এই বিবাদ লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র নাকি কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে—অভিমন্যু নাকি সপ্তরথি বেষ্টিত; এক পক্ষ নাকি সম্প্রতি শান্তি ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এই আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিনা। সাধারণভাবে চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

সাহিত্যে আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি এবং বাস্তব-চরিত্র-অঙ্কন দুইই আছে। গ্রন্থকার কোন্ চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া আমাদের সামনে ধরিতে চাহেন, এবং কোন্ চিত্রটী বাস্তব বলিয়া অঙ্কিত করিতে চাহেন, তাহা আমরা অনেক স্থলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আদর্শ এবং বাস্তব দুই প্রকার চরিত্রসৃষ্টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রত্যেকটীকে তাহার নিজের মাপকাটী দিয়া বিচার করা উচিত। আদর্শ চরিত্রকে বাস্তবের মাপকাটী দিয়া বিচার করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। আবার বাস্তব চরিত্রকে আদর্শের মাপকাটী লইয়া বিচার করিলেও সঙ্গত সমালোচনা হয় না।

আজকাল এই আদর্শ এবং বাস্তবের প্রভেদটী ঘুচাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং এই দুইয়ের পার্থক্য যথার্থ উপলব্ধি না করিবার ফলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তর্ক যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছে।

অন্ততঃ সৎ সাহিত্য মাত্রই কোন উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে এ দাবীটুকু সকলেই করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয়। লোকের, সমাজের অর্থাৎ পাঠকবর্গের যাহাতে উন্নতি ও কল্যাণ হয়, এই উদ্দেশ্য প্রত্যেক গ্রন্থের এবং গ্রন্থকর্ত্তার থাকা উচিত। তবে কিসে কল্যাণ হয়, কিসে অকল্যাণ হয়, ইহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। আমার এইটুকু মনে হয় যে, মানুষকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হইলে তাহার মধ্যে যে দেবতার ভাবটুকু আছে, তাহার মধ্যে যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃটুকু লুক্কায়িত আছে, তাহার পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থা কোন আদর্শ চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহার সামনে ধরিলে তাহার ঐ পবিত্র উন্নত ভাবের দিকে একটী স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে। সে তখন তাহার নিজের বাস্তব অবস্থা এবং ঐ আদর্শের পবিত্র মহানুভাবের বৈসাদৃশ্য চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হয়; সে আদর্শকে বাস্তবে পরিণত দেখিতে পারিলে ধন্য হয় মনে করে এবং ঐ আদর্শের দিকে অজ্ঞাতসারে তাহার মন আকৃষ্ট হয়। এই আদর্শের পাশাপাশি আবার মানুষের পশুত্বটুকুও ধরিয়া দেখাইলে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পাপের চিত্রকে বেশ করিয়া তাহার সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া সামনে দেখাইলে মানুষ শিহরিয়া উঠে—সে ঐ পথে যাইতে চাহে না উহার কুহকে মজিতে চায় না। পুণ্যের আলোক ও পাপের কালিমা, দুইয়ের চিত্রই তাহাকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়।

এই গেল আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টির কথা। কিন্তু এই আদর্শ চরিত্রটী এমন ভাবে অঙ্কিত হওয়া দরকার যেন এই আদর্শ-চরিত্র সত্যকার রক্ত-মাংসের শরীর দিয়া গড়া একটা মানুষই হয়।

বাস্তবের সহিত আদর্শের পার্থক্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক নতুবা আদর্শ এবং বাস্তব এই দুইটা কথায় পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু আদর্শ বাস্তব হইতে খুব বেশী দূরে থাকিলেও চলে না। যে চরিত্রকে আমি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার অনেক পরিমাণে আমার বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য থাকা দরকার, নতুবা উহা অন্যের আদর্শ হইলেও আমার আদর্শ কখনই হইতে পারে না। বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া আদর্শের সৃষ্টি তাই বড় কঠিন।

যে জিনিষটী চোখের সামনে থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে ধরিতে বা তাহার গূঢ় তত্ত্বটী উপলব্ধি করিতে পারি না, নিপুণ শিল্পীর হস্তের বাস্তব চিত্রাঙ্কণে সেই জিনিষের তত্ত্বটী আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। বাস্তব (actual) এর

যথার্থ উপলব্ধি না হইলে আদর্শের মহত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। আদর্শ আমাদিগকে আকর্ষণও করে না। এই বাস্তব চিত্রাঙ্কণও তাই আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার সহায়। প্রত্যেক বাস্তব চরিত্রাঙ্কণের মধ্যেও এই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। নতুবা শুধু বাস্তব বর্ণন বা বাস্তব চরিত্রাঙ্কণ গ্রন্থকর্ত্তার যশঃ ও খ্যাতি বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু তাহা যেন নিতান্ত একটা ছোট গম্ভীর জিনিস হইয়া পড়ে। তাহা যেন নিজের খ্যাতি ভিন্ন অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণের কথা ভাবে না। পাপের বা সমাজের অবনতির বা কালিমার চিত্রাঙ্কণে গ্রন্থকারের তৎপ্রতি সহানুভূতি বিন্দুমাত্র লক্ষিত হইলেই ঐ গ্রন্থ হইতে উপকার অপেক্ষা অপকার বোধ হয়। পুণ্যের প্রতি সহানুভূতি এবং পাপের প্রতি ঘৃণা, ইহা যে গ্রন্থে স্পষ্টরূপে বুঝিতে দেওয়া হয় না সে গ্রন্থে বাস্তব পাপ ও পুণ্যের নিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইলেও গ্রন্থকর্ত্তার সঙ্কীর্ণতার পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। গ্রন্থের উদ্দেশ্য যেন পাঠকবর্গের অর্থাৎ দেশ ও সমাজের কল্যাণ বা উন্নতি নহে যেন শুধু নিজেকে artist বা শিল্পী বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

বাস্তব ও আদর্শের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিতে যাইয়া আজকাল দেখিতেছি নিপুন শিল্পীও একদিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। আদর্শকে ছোট করিলে তাহার আদর্শত্বই যে নষ্ট হইয়া যায় একথা যেন কেহ কেহ ভুলিয়া যাইতেছেন। সমাজে এখনও অনেক লোক সত্যের আদর্শ বুকে ধরিয়া প্রাণপণে সংসার-সংগ্রামে যুদ্ধ করিতেছেন। লোকে এখনও সত্য বলিতে বুঝে, বুকে মুখে এক ক'রে যে সত্য তাই। যে বুকের জিনিসের সহিত মুখের জিনিসের ঐক্য রাখিতে পারে না, সে নিজেকে অবনত মনে করে। লোকে তাহাকে চরিত্রের আসনে উচ্চস্থান দিতে চাহেনা, এমন অবস্থায় যদি গ্রন্থকার পূর্ণ সহানুভূতির সহিত (অন্ততঃ সাধারণ লোকে যাহাকে সহানুভূতি বলিয়া বুঝে) প্রকাশ করেন যে, বুকের সত্যই সত্য—মুখের সত্যের কোন মূল্য নাই তাহা হইলে সত্যের আদর্শকে খর্ব্ব করা হইল না? যুগ যুগান্তরের পবিত্র উন্নত আদর্শকে কি আজ নামাইতে চেষ্টা করা হইল না? বুকের সত্য যদি মুখের সত্য হইতে পৃথক হয় তবে সে কি করিয়া সত্য আখ্যা পাইতে পারে? আমরা ত ইহাকেই মিথ্যা বলিয়া জানি। দুইয়ের যেখানে পরস্পর-বিরোধ তাহাই মিথ্যা, দুইয়ের যেখানে ঐক্য সেখানেই সত্য। একজন স্ত্রীলোক প্রাণে প্রাণে একজন পরপুরুষকে ভালবাসেন—কিন্তু মুখে তিনি তাঁহার স্বামীকে ভালবাসা দেখান। এখন নূতন আইনানুসারে ত তিনি সত্য হইতে স্খলিত হন নাই। কিন্তু ইহা যদি সত্যের ব্যভিচার না হয় তবে মিথ্যা কাহাকে বলে আমি ত বুঝি না।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় ইহা নহে তাই আমরা এই আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। এখন আমরা "মন্ত্রশক্তির" চরিত্র-সমালোচনায় মনোনিবেশ করিব।

অম্বরনাথ মন্ত্রশক্তির নায়ক। এরূপ আদর্শ-চরিত্রাঙ্কণ বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল আর নাই বলিলেও চলে। আদর্শের মাপকাটী দিয়া বিচার করিলে অম্বরনাথের চরিত্রে খুঁত খুজিয়া বাহির করা অসম্ভব। অম্বরনাথ ধীর, স্থির, প্রশান্ত, প্রকৃত জ্ঞানী। বিপদে তাঁহাকে কখনও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। সুখের প্রলোভন কখনও তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অতি কঠিন পরীক্ষাতেও অম্বরনাথের সংযম-শক্তি জয়লাভ করিয়াছে। অম্বরনাথ ক্ষমাশীল, অপরের সহস্র অপরাধ তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন। কখনও প্রতিহিংসা তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। কোন প্রকার নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আম্রনাথ বা আদি ঠাকুর কত প্রকারে তাঁহাকে জব্দ এবং অবমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাকে পুরোহিতের পদ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য কত ষড়যন্ত্র, কত নীচ উপায়ের আশ্রয় লইয়াছেন, শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অধ্যাপকের নিকট অম্বরনাথের নামে নালিশ করিয়া অম্বরনাথকে অপদস্থ করিয়াছেন, কিন্তু আম্রনাথের এই অভদ্র এবং নীচ ব্যবহারের কথা সমস্ত জানিয়াও একদিনও অম্বরনাথ আম্রনাথের বিরুদ্ধে কোন প্রতিহিংসা পোষণ করেন নাই। বরং আম্রনাথ সকলের নিকট তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া সাধারণের চক্ষে অনেকটা হীন প্রতীয়মান হইতেছেন বলিয়া অম্বরনাথ সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

সুখের দিনেও অম্বরনাথকে উল্লসিত দেখা যায় নাই। অধ্যাপক তাঁহাকে পুরোহিত ও অধ্যাপকের পদে মনোনীত করিয়াছেন শুনিয়া অম্বরনাথ আনন্দে আত্মহারা হন নাই। বরং তিনি যে ঐ গুরুভার বহনে অযোগ্য তাহাই বারবার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ সম্মান গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সাংসারিক সুখ ও সম্মান স্পৃহা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। শুধু গুরুতর আদেশ বলিয়াই তিনি ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাণী অম্বরনাথের ত্রুটী ধরিতে ব্যস্ত থাকিলেও বাণীকে তিনি সচল দেবতা ভাবেই দেখিতেন। বাণীর নিষ্ঠা এবং ভক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাণীই তাঁহাকে সগুণ ঈশ্বরের বা মূর্ত্তির উপাসনার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়া ছিল ইহাই তাঁহার ধারণা। বাণী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেও তিনি বাণীর উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই বা তাঁহার বাণীর

উপর শ্রদ্ধা করিয়া যায় নাই। বরং তিনি শ্যম শ্যামার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া কি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এতবড় অপমান তিনি নীরবে সহ্য করিলেন, অথবা তাঁহার নিকট ইহা অপমান বলিয়াই বোধ হইল না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আদি ঠাকুরকে কথকতা করিতে আদেশ করা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, আস্তনাথ কথকের আসনে বসিয়াছেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। দুঃখে এরূপ অবিচলিত থাকা যথার্থ সংযম এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অম্বরনাথের চিত্ত পর-দুঃখে কাতর, পরাণ মণ্ডলের কন্যাকে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নির মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। পরাণ মণ্ডলের ভক্তির উপহার—কচি কাঁটাল প্রভৃতি ফলটা পাকড়াটা তিনি গাল খাইয়াও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ তাহাতে যে পরাণ ক্ষুব্ধ হইবে। অপরের মনে এতটুকু দুঃখ দিলেও তাঁহার কষ্ট হইত। মহেশের জবাফুলের জন্য তাঁহার পদচ্যুতি হইল, তথাপি তিনি মহেশের জবা না লইয়া পারেন নাই। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিতেও অম্বরনাথের সহৃদয়তা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভীষণ পরীক্ষার দিনে অম্বরনাথ শুধু তাঁহার কর্তব্যের কথাই ভাবিয়াছে। বড় লোকের জামাতা হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সুখের অধিকারী হইবে এ চিন্তা মুহূর্ত্তের তরেও তাঁর মনে স্থান পায় নাই। বাণী যে তাহার মন্দির এবং মন্দিরাভ্যন্তর-স্থিত দেবতার বিরহে কত ক্লেশ পাইবে ইহা অম্বরনাথ বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্নদাতাকে বিপদমুক্ত করিতে পারেন, ইহাই ভাবিতেছিলেন; তবে সর্ত্ত বড় কঠিন। তেমন করিয়া বেদমন্ত্রে স্ত্রীর আজীবন সমস্ত ভরণ পোষণের ভার লইয়া এবং তাহার সহিত একাত্মা হইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া স্ত্রী হইতে সমস্ত-সম্পর্ক-রহিত হইয়া থাকিবেন এবং তাহাতে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কিরূপে রক্ষা পাইবে ইহাই তাহার সমস্যা। শেষে যখন তিনি ভাবিলেন যে বিবাহ করিলে সমস্ত সম্পত্তি ত এক প্রকার ত হারই তাহা হইতে বাণীর ভরণ পোষণ চলিবে এবং তিনি বাণীকে যেরূপ শ্রদ্ধা করেন বুঝি বা সেরূপ ভালবাসেন!—তাহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে একাত্মা হওয়া বিশেষ কঠিন নহে। "যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব"—ইহা বলিলে বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না—এখনই তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন—আকাশস্থিত উজ্জ্বল তারকা তাঁহার হৃদয়স্থিত সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞার সহিত মিলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ নিষ্ঠুর সর্ত্তে রাজী হইয়া বিবাহ করিলেন! বিবাহ বাসরেও তাঁহার সাধারণ সংযমের আমরা পরিচয় পাই। যাহাতে অভিমান-

দুপ্তা বাণীও বিন্দুমাত্র মনকষ্ট না পান তজ্জন্য তিনি কত কৌশল এবং কত সতর্কতা অবম্বন করিলেন। ফুলসজ্জার রাত্রে রণসাজে সজ্জিতা অসামান্যা সুন্দরী বাণীর রূপ তাঁহাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলাইতে পারে নাই।

আসামের জ্বরে ভুগিয়া দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাদান করিয়া তিনি শরীর পাত করিয়াছেন। নিজের জন্য শরীর ধারণাপযোগী অর্থাতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও তিনি শ্বশুরের নিকট হইতে লন নাই। তিনি যে মহান্ উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য উদ্যম ও চেষ্টা তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বাণীর সহিত যে সর্ত্তে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, ঐ সর্ত্ত তিনি সর্ব্বথা পালন করিয়াছেন। ট্রেণে বাণীর সহিত নির্জ্জন সাক্ষাতের সময়ও অম্বর একটুও বিচলিত হন নাই—কোনও প্রলোভন, কোনও অনুরোধ তাঁহাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলাইতে পারে নাই। অম্বর পরিচিত বন্ধুর নিকট বাণীকে তাহার স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বাণীর স্বামী সত্য কিন্তু মন্দিরের শপথ, কেহ কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিবেন না। বাণী কেমন আছে একথাও অম্বরনাথ জিজ্ঞসা করেন নাই—বাণী তখন অম্বরনাথকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, অম্বরের মুখের একটি কথা শুনিবার জন্য বাণী সর্ব্বস্ব-দানে প্রস্তুত, অম্বর তাহাকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন শুনিয়াই বাণী আনন্দে অধীরা, কিন্তু বাণীর এই মনোভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই মন্দিরের শপথ বড় কঠিন সর্ত্তে বাঁধিয়াছে।

বাণীর প্রথম পত্রের উত্তর অম্বরনাথ রমাবল্লভকে লিখিয়াছিলেন। বাণী লিখিয়াছিলেন—তাঁহার পিতা অম্বরের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন—অম্বরনাথ রমাবল্লভকে তাঁহার সংবাদ পাঠাইলেন—বাণীকে কিছুই লেখেন নাই মৃত্যু-শয্যায় শায়িত অম্বরনাথ বাণীকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। তখনও অম্বর চিন্তা করিতেছেন—এই পত্র লেখায় তাহাদের সর্ত্ত ভঙ্গ হইল নাকি, পত্রখানা অতি মধুর। ঐ পত্রে বাণীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অম্বর লিখিয়াছেন আমি তোমারই কাছে মূর্ত্তিপূজার উপকারিতা অনুভব করিয়াছি, স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে ধর্ম্ম-পথে চালিত করা। অম্বরনাথ মৃত্যু-শয্যায়ও বাণীকে লিখিয়াছেন—দেবতার পূজায় আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন—ইহা সাত্ত্বিকভাবোদ্দীপনার অন্তরায়। অম্বরনাথের কোনও অতৃপ্তি নাই—তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। বড় দুঃখে অম্বরনাথ বলিতেছেন, আমার মরণে লোকে না বুঝিয়া হয়ত তোমায় বিধবা বলিবে কিন্তু আমি জানি তুমি চির বিধবা —ভগবানে যে প্রাণ সঁপিয়াছে তাহার বৈধব্য ঘটিতে পারে না।

অম্বরনাথ বাহ্যতঃ বাণীর সহিত কোনও

সম্বন্ধ না রাখিলেও অন্তরে অন্তরে বাণীকে তিনি গম্ভীর আসনে বসাইয়া যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"(হয়তঃ) অনুচিত হইলেও মনের মধ্যে তোমায় দূরে রাখিতে পারি নাই—আমার স্ত্রী, আমার রাজরাণী বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। সেই প্রথম দিনই যেদিন বিবাহের প্রস্তাব হয় তখনই বুঝিয়াছি যে, আমার মন তোমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধান্বিত তাহাতে তোমায় ভালবাসা প্রদান করা আমার পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়। বিবাহের মন্ত্রে সেই ভালবাসার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বিন্দুমাত্র জাগতিক মোহে না থাকায় তোমার প্রেম বড় উচ্চ প্রেমের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলাম।" সেই ট্রেনে সেই শেষ দেখার সময়ে বাণীর চোখের দৃষ্টিতে যে মনের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে অম্বরনাথ বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন—তিনি ভাবিতেছিলেন বাণী কি সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সে ত সংসারাতীত আত্মবিস্মৃত ভাব নয় সে যে স্নেহময়ী, প্রেমময়ী নারীর দৃষ্টি'

মরণের দিনে অম্বর বাণীর কাছেই মরিতে চান—তাই ঐ অবস্থায় তিনি আসাম হইতে রাজনগর যাত্রা করিলেন। সংজ্ঞা হইলে অম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—বাণী আমায় ভালবাস? তারপর বলিলেন—তাঁকে (অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে) সেই রকমই ভালবাস; তাঁকেও ভুলে যাও না

—অম্বরের আজ বড় আনন্দ—তিনি যাহা আশা করিতে পারেন নাই, তাহারা সকলেই যেন আজ তাহার সংযমের প্রতিদান-স্বরূপ একত্র আসিয়া তাহার আনন্দার্থে উপস্থিত।

অম্বরনাথ সত্যই আদর্শ পুরুষ—যেদিক দিয়া অম্বরনাথকে দেখা যাউক না কেন, অম্বরনাথ নিজ মহিমায় অচল অটলভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অম্বরনাথের অসীম স্নেহ, অতুলনীয় ভালবাসা, অযাচিত কৃপা, এক-নিষ্ঠ সাধনা, নিষ্কাম পরোপকার, সর্ব্বোপরি অম্বরনাথের অসাধারণ দেবতা দুর্লভ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা সব মিলিয়া অম্বরনাথকে যেন এক পবিত্রতার সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অম্বরনাথের চরিত্র-চিন্তনে হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তিনিচয় নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে—মন প্রাণ কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠে, সে যেন অম্বরনাথকে কাছে পাইতে চায়, সে যেন অম্বরনাথকে আপনার করিতে চায়, সে যেন অম্বরনাথ হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে—এই উদ্দীপনাই সদ্‌গ্রন্থের উদ্দেশ্য—আমার ধারণা এত সরল উপন্যাস বর্ণনার মধ্যে এই উদ্দীপনা এমনভাবে আধুনিক আর কোনও গ্রন্থেই জাগাইতে পারেন নাই।

গ্রন্থের নায়িকা বাণী ধনী-গৃহের সন্তান, শিশুকাল হইতে অত্যধিক আদর যত্নে প্রতিপালিতা। দাদা মহাশয়ের স্নেহের

আশ্রয়ে তাহার জীবনটী মুকুলিত। ছোট বেলা হইতে মন্দিরের সেবাই তাহার প্রধান খেলা, তাহার হৃদয় শান্তির আধার। বর জুটিতেছে না বলিয়া তাহার কোন দুশ্চিন্তা নাই। সে মনে মনে শ্যামসুন্দরকে বরণ করিয়াছে, সে ভাবিয়াছে, পার্থিব বরের তাহার প্রয়োজন নাই।

বাণী অভিমান-দীপ্তা। তাহার ইচ্ছার বিপরীত কোনও ঘটনা সে সহ্য করিতে পারে না। নূতন পুরোহিতের পূজায় তাহার তৃপ্তি হয় না। তাহার ধারণা পুরুত বড় ছেলেমানুষ—কোন্ ফুলে কোন্ পূজা করিতে হয় তাহা জানে না—কথকতার সময় ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। পূজার কিছুমাত্র ত্রুটী সে দেখিতে পারে না। জবা ফুলের পূজায় শ্যামসুন্দর তৃপ্ত হইবেন না পরন্তু অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া বাণী পুরোহিতকে বিদায় দিয়া—'আদি ঠাকুরকে' আনিয়া বসাইল!

মৃগাঙ্কের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইলে মৃগাঙ্কের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বাণীর শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা উঠিলে বাণী বলিল—আমি কোথাও যাইব না—রাজনগরের জমীদার-কন্যা পরগৃহে শ্বশুর ঘর করিতে যাইবে, ইহা যে সে ভাবিতেও পারে না। বাণী তাহার পিতাকে বড় ভালবাসে—বিবাহ না হইলে পিতা পথের ভিখারী হইবেন, ইহা ভাবিয়া সে 'বামুন ঠাকুর' অম্বরকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। বিবাহের সময় তাহার মনে বড় অশান্তি—কেমন করিয়া সে অম্বরের মত লোকের নির্দ্দেশানুসারে চলিবে—অম্বর উঠিলে উঠিতে হইবে, বসিলে বসিতে হইবে—এ অধীনতা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। বিবাহের রাত্রে অম্বরকে সুন্দর দেখাইল কিন্তু বাণী ভাবিল এমন করিয়া সাজাইলে কাহাকে না সুন্দর দেখায়?—এ পর্য্যন্ত অম্বরের কোন পরিচয়ই আমরা পাই না। ফুলশয্যার রাত্রে অম্বর সর্ত্ত রক্ষা করিয়া বাণীর দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই—তাহাতেও বাণীর অভিমান হইল—আমি কি এতই নগণ্য যে আমার দিকে আমারই স্বামী একবার চাহিয়াও দেখিল না—ভাবিতে ভাবিতে বাণীর তন্দ্রা আসিল—তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল মাল্য-ভূষিত উজ্জ্বল ভাস্কর মূর্ত্তি আর দুই কর্ণ ভরিয়া এক গভীর বেদমন্ত্র তাহার সকল শরীর অবশ করিয়া মেঘ মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল, ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু। এই মন্ত্র বেদজ্ঞ অম্বরের মুখে বাণী শুনিয়াছিল—এই মন্ত্র তাহার ভিতর ক্রিয়া করিতে লাগিল কিন্তু মন্ত্র আশু ফলপ্রদ হইল না কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না এই মন্ত্রের শক্তি হইতেই বাণী শেষে মন্ত্র-বশীভূত হইল। ক্রমে ক্রমে বাণীর অভিমান দূরে গেল, বাণীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান আসিল। বাণীর স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। বাণীর সঙ্কীর্ণতা দূরে গেল, শ্যাম-শ্যামার অভেদ

জ্ঞান জন্মিল। আজ অম্বর তাহার অবহেলার পাত্র নহে—আজ অম্বর তাহার স্বামী, তাহার সর্ব্বস্ব ধন, অম্বর তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে বাণী স্বর্গসুখ অনুভব করিল। স্বামীকে ভালবাসিয়া তাহার মধ্যেই সে তাহার চিরবাঞ্ছিত শ্যামসুন্দরের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইল। সে বুঝিল মানুষকে ভালবাসা ভগবৎ-প্রেমের সহায়, অন্তরায় নহে। আজ পূজার আড়ম্বর ভাল লাগে না, শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আজ মনঃসংযমের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হয়। বাণী অন্তরে অন্তরে অনুক্ষণ তাহার স্বামীর ধ্যান করিতেছেন।—তাঁহার দারিদ্র্য, তাঁহার কঠোর ব্রত, তাঁহার দৈহিক ও মানসিক অশান্তি, আজ বাণী নিরন্তর ভাবিতেছে। আজ বাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে যে তাহার মা যে বলিয়াছেন, স্ত্রীর সর্ব্বস্ব ধন স্বামী তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বামীর অসুখের সংবাদ শুনিয়া বাণীর প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। বাণী তাহার স্বামীকে কর্ত্তব্য-পালনে সহায়তা করিয়াছে—শুধু বাণীর আজ শত মুখে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, বাণী অম্বরকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। বাণী বলিতেছে—হাঁ তোমার বাণী, তোমারই স্ত্রী, তোমারই দাসী, তোমারই সহধর্ম্মিণী,—আমিও তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, প্রধান অলঙ্কার—আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু আমি তোমার স্ত্রী তোমার শিষ্যা, তোমার দাসী, আমায় ক্ষমা করিবে কি?” কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কোথায় সেই অভিমান-দৃপ্তা জমীদার-কন্যা বাণী, আর কোথায় এই অনুতপ্তা স্বামী সেবা-সোহাগিনী, পতিপদ-লুণ্ঠিতা সতীত্ব-লাবণ্য-মণ্ডিতা বাণী! সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রকৃত বেদজ্ঞের মুখে বেদমন্ত্র যে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠে, এই শক্তিমান মন্ত্র যে অসাধ্য সাধনক্ষম সে বিষয়ে বাণীর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্রী মন্ত্রের এই অপূর্ব্ব শক্তি দেখাইয়া মন্ত্র যে কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়াক্ষম হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। বাণী আজ নূতন জন্ম পাইয়াছে—পূর্ব্ব-জন্মের শপথ পূর্ব্ব জন্মে কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্কল্প আজ সাত্ত্বিক, অনুতাপে তাহার পূর্ণশুদ্ধি হইয়াছে। আজ তাহার সঙ্কল্প শুদ্ধি হইয়াছে, তাহার সঙ্কল্প আজ সিদ্ধ হইবেই—আজ বাণী বলিতেছে—“সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন—আর আমি পারব না কেন? আমি কি সতী স্ত্রী নই”—ঐরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে সিদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারে না—আজ বাণী মুমূর্ষু স্বামীকে কোলে করিয়া অতীত যুগের সাবিত্রীর মত স্থির সঙ্কল্পে তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া বসিয়া আছে—এ কি ভগবান পূরাইবেন না?

বাণী সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইত কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে

মনে করিয়া এই সঙ্গেই শেষ করিতে হইল।

গ্রন্থের অপর চরিত্রগুলিও মনোরম। প্রত্যেক ক্ষুদ্র চরিত্রেরও বিশিষ্টতা আছে—প্রত্যেকটীর মধ্যেই কিছু না কিছু লক্ষ্য করিবার মত আছে। রমাবল্লভের সন্তান-স্নেহ, পরাণ মণ্ডল ও মহেশের ভক্তি, তুলসীর রসিকতা, সহৃদয়তা এবং ভাল-মন্দ বিচার, আত্মনাথের ঈর্ষা, দ্বেষ, স্ত্রীলোকের নিকট প্রতিপত্তি পাইবার কৌশল, মৃগাঙ্কের দিদির ভ্রাতৃবধূ-বিদ্বেষ, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি সবই জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণপ্রিয়া আদর্শ রমণী, সতীত্ব-গগনের সমুজ্জ্বল তারকা। কৃষ্ণ-প্রিয়ার শূণ্য কোল বাণী আসিয়া পূর্ণ করিয়াছে—বাণী তাঁহার বড় আদরের বস্তু। অম্বরনাথ বাণীর স্বামী—তাই অম্বরনাথকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভাল-বাসেন, অম্বরের দুঃখ ক্লেশের কথা ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদাই কাতর। কৃষ্ণপ্রিয়া সংসারের কুটিলতার কিছুই জানেন না। তিনি কেবল জানেন স্বামীকে ভক্তি করিতে, তিনি জানেন শুধু সন্তানকে ভালবাসিতে, তিনি জানেন জগতের সমস্ত নরনারীকে স্নেহ ভালবাসা বিলাইতে। তাঁহার মুখের কথা দুই একটী কথাতেই তাঁহার সমস্ত চরিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে—'ওযে কি রত্ন তা' এখন না বুঝিস্, পরে বুঝ্‌বি—আর তা যদি নাই হয়, তবুও ও স্বামী। স্বামীর চেয়ে বড় জগতে মেয়েমানুষের আর কি আছে? দেখেছিস্ ত, আমি কখনও আজ পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মুখ তুলে একটী কথা ক'য়েছি; কি মুখের উপর একটী জবাব দিয়েছি"—এই কৃষ্ণপ্রিয়ার স্বরূপের অভিব্যক্তি—এই কয়টী কথা হইতেই কৃষ্ণপ্রিয়ার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা কৃষ্ণপ্রিয়ার স্বামী-দর্শন ভিন্ন আর কোন বাসনা নাই—কি মধুর এই কথাগুলি—"সেই দশ বছর বয়স থেকে আজ একাদিক্রমে এই ছাব্বিশ সাতাশ বছর—একদিনের জন্য কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নাই;—এসেছ, মাথায় পায়ের ধূলা দাও—আবার যেন তোমায় পাই। বড় সুখী হইয়াছিলাম—তোমায় পেলে পরলোকেও তেম্‌নি সুখীই হ'ব—বাণীকে দেখো, অম্বরকে ফিরিয়ে এনো, জেনো স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষের অন্য কোন কিছুই বড় নয়—অন্য সুখ, অন্য কামনা, এমন কি অন্য দেবতাও তার থাকৃতে নেই, এখন একটু হরিনাম শুনাও।" কি সুখের, কি নিরাবিল শান্তির এই মৃত্যু। কোনও অতৃপ্ত উদ্দাম বাসনা নাই, কোনও কষ্ট নাই। স্বামীর পদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া একমাত্র সন্তানকে কাছে রাখিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে সতীর বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইল। সতীর মৃত্যু-সময়ের অমোঘ আশীর্ব্বাদ তাঁহার কন্যাকে নব জীবন আনিয়া দিল—"আমার শেষকালের আশীর্ব্বাদ রইল—

সে তোমায় ক্ষমা ক'রবে। তুমি তাকে ডেকে ক্ষমা চেয়ো"—এই অমূল্য আশীর্ব্বাদ আর বেদমন্ত্রের অপ্রতিহতা শক্তি বাণীকে তাহার কল্যাণের পথে লইয়া চলিল। কৃষ্ণপ্রিয়া হিন্দু-রমণীর আদর্শ—তাঁহার মধ্যে হিন্দু রমণীর সমস্ত সৌন্দর্য্যই পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

মৃগাঙ্ক ও অজা অধ্যায়টী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একথা বোধ হয় স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে ঐ অধ্যায়টী গ্রন্থ হইতে বাদ দিলেও গ্রন্থের বিশেষ ক্ষতি হইত না। ঐ অধ্যায়টী যেন সম্পূর্ণ পৃথক একটী জিনিষ, গ্রন্থ-বর্ণিত মূল ঘটনার সহিত উহার যেন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। অবশ্য মৃগাঙ্কর মধ্য দিয়া একটী সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা যেন কষ্ট-কল্পিত। আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে এখানে গ্রন্থের একটু দোষ ধরিতে পারা যায়। গল্পের বা গ্রন্থ-বর্ণিত ঘটনার development বা ক্রম-পরিণতি আপনি ফুটিয়া না উঠিলে উহাকে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিতে পারা যায় না। মৃগাঙ্কের চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় অবশ্য এই অধ্যায়টী না থাকিলে আমরা পাইতাম না—কিন্তু মূল আখ্যায়িকার পরিণতি বা ক্রম-বিকাশের জন্য মৃগাঙ্ক সম্বন্ধে অতটা জানার বোধ হয় আমাদের প্রয়োজন ছিল না। মৃগাঙ্ক ও অজা সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী যেন একটী পৃথক্ গল্পের উপাদান—উহা যেন আর একখানি ছোট উপন্যাস—এই উপন্যাসখানির সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আমার এই ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু যতবার গ্রন্থখানি পড়িয়াছি ততবারই এই কথাটী মনে হইয়াছে। এই কথাটুকু বাদ দিলে মৃগাঙ্ক ও অজা সম্বন্ধীয় সমস্ত বর্ণনাই অতীব মনোরম। মৃগাঙ্ক গান-বাজনা ভালবাসে, বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ না করিলে তাহার সময় কাটে না, এইরূপ স্ফূর্ত্তি ভিন্ন সংসারের বিশেষ ধার সে ধারে না। স্ত্রীর সহিত সে "বন্ধু" পাতাইয়াছে, ভদ্র গৃহস্থকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই তাহার বিবাহ। স্ত্রীর সহিত তার সাব্যস্থ হইয়াছে যে স্ত্রী খাইবে, পরিবে, গয়না কাপড় যাহা চাহিবে তাহা পাইবে কিন্তু স্বামীকে সে চাহিবে না, স্ত্রীর সহিত সে মন্দ ব্যবহার করে না, সে স্বাধীন থাকিতে ভালবাসে, যখন যাহা খুসী তাহাই করে। ছোট বেলা হইতে কখন অভাব কাহাকে বলে জানে না, চির-কাল দিদির আদর পাইয়াই আসিয়াছে। সংসারে দিদির বিরক্তিকেই সে একটু ভয় করে ঐ দিদিই তাহার একমাত্র বন্ধন।

অজা প্রথমটা অভিমান ভরেই ফুল-শয্যার রাত্রে মৃগাঙ্কর প্রস্তাবিত বন্ধুত্বে রাজী হইয়াছিল, কিন্তু শেষে অজা বুঝিতে পারিল যে সত্যই মৃগাঙ্ক যাহা বলিয়াছে তাহাই করিতেছে, ক্রমে বন্ধুত্ব শিথিল হইল —মৃগাঙ্ক মজলিস লইয়াই থাকে অজা

গৃহকর্ম্মে হাবুডুবু খায়। স্বামীর আদর পাইল না ননন্দাও তাহাকে তেমন যত্ন করেন না। অজা কিন্তু বড় ধৈর্য্যশীলা, মর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্না। অজা কোমলতার আধার, স্নেহলেশহীন স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি ভালবাসার অভাব ছিল না। শুধু আত্মমর্য্যাদা ও সহিষ্ণুতাই অজাকে এত দিন মৃগাঙ্কের সব অবহেলা সহ্য করিতে প্রস্তুত করিয়াছে। বাণীর বিবাহের পর মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দিদির মুখে অজার আদর যত্ন শুশ্রূষার কথা শুনিতে পাইল। দুধ জ্বাল দিবার সময় স্বামী পদশব্দ-চকিত অজার ঈষৎ রক্তিম গণ্ডস্থল দেখিল, পান সাজিবার সময় অজাকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল—অজা ত বেশ! তা সেই ত বাণী। অতবড় সুন্দরী বাণীকেও ত দেখিয়া আসিলাম, তাহার চেয়েই বা অজা মন্দ কি? এবং তাহার সেই অহঙ্কারে আদুরে ধরণের কাছে ইহার নম্র সলজ্জ ভাবটুকু যেন বেশী সুন্দর।" এই সময় হইতে মৃগাঙ্কের হৃদয়-কোণে অজার একটু স্থান হইল—এই অবধি মৃগাঙ্ক অজার কথা একটু একটু ভাবিতে লাগিল। পরিবর্ত্তন যখন হয় তখন কোনও একটী অতি সামান্য ব্যাপার হইতেই সংঘটিত হয়। কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনা কিরূপে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয় তাহা কিছুই বলা যায় না। এই অজাকে মৃগাঙ্ক কতদিন কত সাজে সজ্জিত দেখিয়াছে—কিন্তু কখনও ত অজা তাহার নিকট এত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় নাই। আজ অজার দুঃখ-নিশার অবসান হইবার সময় আসিয়াছে, তাই আজ সে মৃগাঙ্কর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন—'হঠাৎ তাহার মনে হইল "অজা ত বেশ?"—সত্যই সংসারে সবই কালসাপেক্ষ। ক্রমে অজার সবই মৃগাঙ্কর ভাল লাগিতে আরম্ভ হইল। দিদিও অজার সেবা পাইয়া অজার উপর খুব প্রসন্ন হইয়াছেন—এখন তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে মৃগাঙ্ক অজাকে ভাল বাসে। সুযোগ সবই আসিয়া জুটিল। বামুন ঠাকুর আসে না। অজা নিজেই রাঁধে—আপন হাতে পরিবেশন করে। মৃগাঙ্ক ভাত খাইতে বসিলে অজা লজ্জা ত্যাগ করিয়া মৃগাঙ্কের কষ্ট নিবারণার্থে গরম ভাতে পাখার বাতাস করে। অজার রান্না মৃগাঙ্কের খুব ভাল লাগে। মৃগাঙ্ক এতদিন অজাকে একটুও আদর করে নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইতে লাগিল এবং অজাকে আদর করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সুযোগ উপস্থিত হইল। মৃগাঙ্ক আদরও দেখাইল কিন্তু অজা তাহাতে ভুলিল না। সে মনে করিল স্বামীর হয়ত তাহার প্রতি সাময়িক একটা আকর্ষণ হইয়াছে—সে তাহার লালসা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবে না—যদি কখনও প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারে তবেই স্বামীকে সে দেহ-প্রাণ দিয়া ধন্য হইবে—নতুবা নহে।

মৃগাঙ্ক সত্যই অঞ্জাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে—ক্রমেই অঞ্জার প্রতি আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। কিসে অঞ্জাকে সুখী করিবে এই চিন্তাই তাহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখিল। অঞ্জাকে বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ চুপে চুপে উপহার দিল অঞ্জার ঘর সাজাইতে আরম্ভ করিল। অঞ্জাও তাহার ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিল। মৃগাঙ্কর হৃদয়টী ছিল সরল—যেটুকু আবর্জ্জনা জুটিয়াছিল—অনুতাপে সব দগ্ধ হইয়া গেল। মৃগাঙ্ক নবজীবন লাভ করিয়া মানুষের মত মানুষ হইলেন। দিদির আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া অঞ্জা ও মৃগাঙ্ক মনের আনন্দে নূতন ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

এক একবার মনে হয় যেন অঞ্জার এই সংযম একটু অস্বাভাবিক, অঞ্জা একদিনও স্বামী-সোহাগ ভোগ করিতে পারে নাই। এখন মৃগাঙ্ক তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতেছে, আর অঞ্জা বারবার অনেকবার কেবলই অছিলা করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছে, ইহা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় যেন অঞ্জার একটু বাড়াবাড়ি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অভিমান ভরে মৃগাঙ্ক বাঁকিয়া বসিতেও ত পারিত। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মনতত্ত্ব তাঁহাদেরই ভাল জানা থাকিবার কথা—সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই—অনেকটা অনধিকার-চর্চ্চা; তবে এ কথাও ঠিক, একবার ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে উল্টাদিকে যাওয়া শক্ত, মৃগাঙ্কর ভিতর সত্যই সহসা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল—ইহাই সেখানে বোধ হয় গ্রন্থকর্ত্রীর উদ্দেশ্য।

মন্ত্রশক্তির মধ্যে উপন্যাসের আবরণে ধর্ম্ম এবং পূজাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য বলা হইয়াছে। মূর্ত্তি-পূজার উপকারিতা, মন্ত্রের কার্য্যকরী শক্তি, পূজাদিতে আড়ম্বরের নিষ্প্রয়োজনীয়তা, ভক্তি ও নিষ্ঠাই যে সর্ব্ব সাধনার মূল, ধর্ম্মজীবনে কিঞ্চিদগ্রসর হইলেই একটা সমন্বয়-ভূমি প্রাপ্তি, সেবা ভক্তিই সে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে ইহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

উপসংহারে বলিব যে গ্রন্থের সকল উদ্দেশ্যই নিপুণ শিল্পীর হস্তে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অম্বরনাথ, কৃষ্ণপ্রিয়া প্রভৃতিকে গ্রন্থকর্ত্রী আদর্শ চিত্র বলিয়া অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন—আদর্শের মাপ কাঠি দিয়া বিচার করিলে কোথায়ও ঐ সকল চরিত্রে খুঁত খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। আবার আস্তনাথ, তুলসী, মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্কের দিদি, গঙ্গারাম, মহেশ, পরাণ মণ্ডল, প্রভৃতির মধ্যে বাস্তব চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা হইয়াছে। বাস্তব চিত্র হিসাবে ঐ সকল চিত্রকেও নিখুঁত বলা যাইতে পারে। আবার গ্রন্থের নামকরণও সার্থক হইয়াছে। ওঁ মম ব্রতে তে ইত্যাদি মন্ত্রটাই গ্রন্থবর্ণিত

সমস্ত ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থানীয়। এই মন্ত্রই অভিমান-দৃপ্তা অম্বর-বিরক্তা বাণীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শেষে স্বামী-পদ-কাঙ্গালিনী অম্বরগত-প্রাণা সতী-সাবিত্রী-স্থানীয়া বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা পরিমার্জ্জিত। ভাব মনোরম। চিত্রাঙ্কণ হৃদয়স্পর্শী এবং উপদেশ অশেষ কল্যাণসাধক। গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাপরম্পরা যেমন পাঠকের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া চলে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল আনন্দ উপভোগ করায় আবার হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়ের কেমন একটা উদ্দীপনা আনিয়া দেয়। এক কথায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "মন্ত্রশক্তি বঙ্গের নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

প্রতীক্ষায়

—:•:—

পথের ধারে একেলা বসি
কাটানু দিনগুলি,
দুয়ার মম খুলি।
সমুখ দিয়া চলিছে কত
লোকের আনাগোনা;
নাহিক জানা শোনা!
তবু যে তারা চিত্তখানি
নিত্য নব গানে,
ভরিয়া দিল দানে!
শুধানু সবে "এত যে দেছ
কাহার তরে ধরি
রাখিব হিয়া ভরি?"
কহিল তারা—"আসিবে সে যে
সময় হবে যবে,
তারেই দিয়ো তবে।"

বরষা এল সরসা হিয়া
বেদনা কত লয়ে,
নয়ন-কোণে বয়ে।
কাজল-ধোয়া নিবিড় কালো
সজল দুটি আঁখি,
আমার পরে রাখি,
কহিল "তোমা আর কি দিব!
এই যে জল-ধার,
এই করেছি সার।
ও তব চোখে বাঁধন দিয়া
রাখিবে এরে ধরে,
অতি যতন করে।
আসিলে সে যে এই সে জলে.
পায়ের ধূলা তবে
ধুইয়ে দিতে হবে।"

শরৎ এল রাণীর মত—
মোহন রূপ ধরি,
ভুবন মন হরি।
ভরিয়া দিল সোনার ধানে
দু'হাত ভরি আনি,
ক্ষুদ্র হিয়া খানি!
কোমল মধু বুকের পরে
জড়ায়ে মোরে রাখি,
বদল করি আঁখি.
কহিল হাসি—"আমারি ক্ষেতে
কুড়ায়ে যাহা পেনু,
সকলি দিয়া গেনু।
আসিলে প্রিয় চরণে তারি
অর্ঘ্য নিবেদিয়া,
রিক্ত কোরো হিয়া।"

ফাগুন এল মোহন হাতে
সাজিটি ভরি তুলি
ফুটান ফুলগুলি,
ভরিয়া দিল আঁচল মম
বিছায়ে ভুমি তলে,
সকল ফুল দলে।
যতনে গাঁথা কণ্ঠ-মালা
হস্তে দিয়া শেষে,
মদির মধু হেসে,
কহিল মোরে—"তোমারে দিনু
বিত্ত সেরা আশা—
একটি ভাল বাসা।
আসিলে বঁধু চরণ তলে
সকলি দিয়ো আনি;
কণ্ঠে মালাখানি।"

যাত্রী এল যাত্রী গেল
দুয়ার দিয়া মম,
চির পথিক সম।
নিত্য নব গানের ভাষা
ছন্দে গাঁথি তুলি
গাহে যে গানগুলি,
আমারি বীণা যন্ত্র তারে
আঘাত হানি তার
কহে যে প্রতিবার,
তোমারি বঁধু তোমারি প্রিয়
আসিবে গৃহে যবে,
এ গান গেয়ো তবে।"
দুয়ার ধরি একেলা আছি
অর্থ-হারা হয়ে,
বুকের বোঝা লয়ে।

দানের ভারে শ্রান্ত হিয়া
অবশ হয়ে আসে,
বেদনা পরকাশে।
তোমার কবে লগন হবে
কও আমারে কও।
বিরূপ কেন রও?
তোমারি লাগি একেলা জাগি
প্রহর গুণি তায়
চির প্রতীক্ষায়।
পথের পানে দিখিদিকে
চাহি যে অকারণে;
ভাবনা শুধু মনে,
বুকের বোঝা চরণে কবে
নীরবে যাবে নামি!
মুক্ত হব আমি!

শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচনে জয়ী হওয়ার পর প্রায় মাসাবধি নরেশ নিয়োগী বিনোদেন্দুর গৃহে আসিবার আর অবসর পান নাই। একটা কোন নূতন প্রয়োজন পড়ায় বন্ধুর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ স্মরণ-পথে আসিল। সে ঋণ-পরিশোধের পন্থাও উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন।

একদিন অপরাহ্নে বিনোদের কাছে আসিয়া বলিলেন—"রোজ আসি আসি করে কাজের গতিকে আসতেই পারিনি অ্যাদ্দিন। শুনছি নাকি বড় মুষ্ড়ে আছ, কোথাও বেরোও টেরোও না। তা করলে কি চলে? শরীর খারাপ হয়ে যাবে। চল আজ, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসবে।"

বিনোদ ঢালা বিছানায় তাকিয়ার উপর কনুই রাখিয়া, মুখ নীচু করিয়া, অলিভার লজের 'মৃত্যুর পরে' নামক একখানি বই নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল। নরেশ লক্ষ্য করিল, একমাসে শরীর তার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধব্‌ধবে সাদা রঙ্‌ পাংশু হইয়া আরও সাদা দেখাইতেছে। নরেশের সম্ভাষণে বিনোদ বই হইতে মুখ তুলিয়া তার দিকে চাহিল, কিন্তু সে দৃষ্টিতে যেন এক সেকেণ্ডের মত অভিজ্ঞান ফিরিয়া আসিল না, যেন কতদূর হইতে প্রত্যাগত হইয়া দৃষ্টিকে পুনশ্চ পারিপার্শ্বিকে সংযুক্ত হইতে হইল, তাহাতে কিছু সময় গেল।

নরেশ আবার বলিল—"একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসবে চল।"

বিনোদ উত্তর দিল—কি হবে? বেশ ত আছি! ঘরে গরম? চল বারান্দায় বসা যাক্—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

নরেশ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া, গলাটা একটু নরম করিয়া বলিল—"Cheer up old fellow—ঘরে দোর দিয়ে পড়ে থেকে কেঁদে কাটাবে জীবনটা? সে ত মেয়ে মানুষের কাজ।"

বিনোদের সৌকুমার্য্য তার নিভৃত বেদনার স্থলে কারো অঙ্গুলির এই স্পর্শটা সহিতে পারিল না! সে সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"ও সব কিছুই না, কেমন কুঁড়েমি ঠেকছে। অনেক দিন পরে এসেছ, বাড়ীতে বসেই গল্প করা যাক, কৌন্সিলের খবর টবর শোনাও।"

নরেশ নাছোড়বান্দা। নরেশ নিয়োগী

যে সংকল্প আঁটিবে—ছোট হউক বড় হউক—তাহা এত সহজে অসিদ্ধ হইতে দিবে না। বিনোদ অগত্যা বেড়াইতে যাইতে স্বীকৃত হইয়া কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে গেল। নরেশ ডাকিয়া বলিল —"ধুতি চাদর পোরো না, ইংরিজী পোষাক পোরে এসো—হাওয়া খেয়ে ক্লাবে টাবে যাওয়া যাবে।"

ষ্ট্রাণ্ডে যখন পৌঁছিল তখনও অন্ধকার হয় নাই। সারের পর সার গাড়ী ও মোটর চলিতেছে—তখন পর্য্যন্ত জুড়ি গাড়ীই বেশী, মোটরের সংখ্যা গণনীয়। দুমুখী যানের স্রোত বহিয়াছে—একটা স্রোত তক্তা ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে চলিতেছে, আর একটা স্রোত অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ইডেন গার্ডেনের অভিমুখী হইয়া বা প্রিন্সেপ ঘাটের রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে! গাড়ীতে ও মোটরে জানা মুখের অন্ত নাই। শুধু এই পরিচিত জনতার মধ্যেও বিনোদের নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ হইল, কিছুতেই স্বাদ পাইল না। তেমনি সুশোভন সূর্য্যাস্তে গঙ্গার পশ্চিম তটাকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। সেই রঞ্জনায় আজ কোন আনন্দদায়কতা নাই। শুধু খুঁজিল তার মধ্যে প্রিয়জনের মুখ। এই মাত্র যে পড়িয়া আসিল কোথাও না কোথাও তাহা লুকাইয়া থাকিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। কোথায় সে প্রেমময় মুখখানি, সে স্নেহভরা দৃষ্টি? কতদূরে? ঊর্দ্ধের স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া আকাশের পরপারে পৌঁছিতে পারিলে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে কি? মগ্ন হইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ মোটর থামিল, নরেশ বলিল—"নামো, রেষ্টোরাঁতে একটু বসা যাক্।"

গঙ্গার উপরই একটা ফ্ল্যাট রেষ্টোরাঁতে পরিণত হইয়াছে। বেতের চৌকি পাতা, মাঝে মাঝে এক একখানা গোল টেবিল। নরেশ ও বিনোদ দুখানা চেয়ার টানিয়া বসিতেই খানসামা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"কফি লাঁউ সাব্?"

নরেশ হুকুম করিল—"দোঠো পেগ্ লাও।"

বিনোদ প্রতিবাদ করিল—"আমার জন্যে নয়।"

নরেশ শুনিবার পাত্র নয়, আবার হুকুম করিল—"দোঠো পেগ্, জল্দি করো।"

নরেশের চোখ এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কিছু দূরের একটা টেবিলের সামনে উপবিষ্ট একজন লোকের চোখে মিলিত হইল। সে লোকটা রঙীন পানীয় ভরা একটা গেলাস কপালের একপাশে ঠেকাইয়া নরেশকে অভিবাদন করিল। "Hallo Issac"—বলিয়া নরেশ উঠিয়া গিয়া মিনিট পাঁচ তাহার সহিত কথা কহিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিনোদেন্দুর টেবিলে ফিরিয়া আসিল।

"মিষ্টার আইজাক।"

"মিষ্টার রায়।"

দুই জনের প্রতি দুইবার হস্ত নির্দ্দেশ

করিয়া পরিচয়ক্রিয়া সমাপন হইলে আইজাককেও তাহার পানচক্রভুক্ত করিয়া সেইখানে বসাইল।

যে লোকটা বসিল তাহাকে দেখিলেই চিনিতে ভ্রম হয় না তিনি ইব্রাহিমের একজন সাক্ষাৎ বংশধর। টিকোল অথচ স্ফীত নাসিকা, জোয়াল জোয়াল ও রোদে পোড়া সাদা রঙ,—আর তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন দালালির একটা ছাপ মারা। তাহার জন্ত ও নরেশের আদেশে এক গ্লাস হুইস্কি সোডা আসিয়া হাজির হইল। নিজের গেলাসটি নিঃশেষ করিতে করিতে নরেশ তার সঙ্গে আগত ঘোড়দৌড়ের আলোচনা করিতে লাগিল—অনেক কিছু কথাবার্ত্তা এমন হইল যাহা বিনোদেন্দু বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। বিনোদেন্দু নিজের গেলাস হইতে এক চুমুক মাত্র পানীয় গ্রহণ করিয়া গেলাস রাখিয়া দিয়াছিল! সকলের পান সমাপনান্তে সিগারেট ও চুরোট ধরাইয়া সবাই উঠিয়া পড়িল। খানসামা একখানা প্লেটের উপর বিল আনিল। নিয়োগী তাঁর এ পকেট সে পকেট হাৎড়াইয়া নিজের পার্স টা বাহির করিবার সবিশেষ প্রযত্ন দেখাইলেন —ইতিমধ্যে বিনোদেন্দু একখানা দশ টাকার নোট প্লেটের উপর ফেলিয়া দিলেন, খুচ্‌রা ভাঙ্গাইয়া আনিবার অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, নরেশ সে বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্ত একটু বিলম্ব করিল। আইজাকও তাঁহাদের সঙ্গী হইল

গাড়ীতে চড়িয়া নরেশ বলিল—"এখনি বাড়ী ফিরে গিয়ে কি হবে? চল evening‌টা একটু pleasantly spend করা যাক্—আমার বন্ধুদের বাড়ী তোমায় নিয়ে যাই।"

বিনোদেন্দু আপত্তি করা নিরর্থক জানিয়া উচ্চবাচ্য করিল না। কোন্ বন্ধুদের বাড়ী তাহাও জিজ্ঞাসা করিল না।

মোটর লাউডন ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। আইজাক প্রথমে নামিয়া, মোটরের দরজা খুলিয়া এমন ভাবে বিনোদকে অভ্যর্থনা করিল যাতে বিনোদ বুঝিল আইজাকের বাড়ীতেই তাহারা আসিয়াছে। কিন্তু দোতালায় ড্রইংরুমে তাঁহাদের বসাইয়াই সে অন্তর্দ্ধান হইল। মিনিট দুই তিন পরে একটি যুবতী ও একটি তরুণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল, আইজাকের দুই কন্যা, বড়টির নাম রেচেল, ছোটটি রেবেকা। রেচেলের বয়স বছর পঁচিশ হইবে, রেবেকার বছর পনেরো।

"হাউ ডু ইউ ডু মিষ্টার নিয়োগী" বলিয়া তাহারা হাত বাড়াইয়া নরেশের করমর্দ্দন করিল। নরেশ করপীড়ন-শেষে বিনোদেন্দুর দিকে চাহিয়া বলিল—"Allow me to introduce to you my friend Raja Saheb of Manoharganj."

"হাউ ডু ইউ ডু রাজা সাহেব" বলিয়া মেয়ে দুটী অগ্রসর হইল। বিনোদ মুখের

মত হাত বাড়াইল, যন্ত্র-চালিতের মত হস্ত-মর্দ্দন করিল। রেবেকাকে দেখিয়া তার চোখ ঝলসিয়া গিয়াছিল। ইহুদী মেয়েদের রূপের গল্প সে অনেক শুনিয়াছিল, কিন্তু এমন রূপ সে কোন দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। সেই সূর্য্যাস্তের আকাশ-পারের সাগরে ডুব দিয়া যেন এ মেয়েটি উঠিয়া আসিয়াছে। এ রূপ পার্থিব হইতেই পারে না।

রেবেকা শেকহ্যাণ্ড করিয়া, এক মিনিট থামিয়া ইংরাজিতে বলিল—"রাজা সাহেব, তুমি কি সত্যিই রাজা সাহেব? আমি আজ পর্য্যন্ত কোন রাজার সঙ্গে কথা কইনি—দূর থেকে দেখেছি, এত কাছে কখন দেখিনি। দূর থেকে ত তাদের ভাল দেখাত না, তোমায় ত আজ wonderful দেখাচ্ছে—you are just The Prince of my dream. Tell me, are you really truly Raja?"

বিনোদ বিস্ময়ে ও লজ্জায় নিরুত্তর রহিল। নিয়োগী রেচেলের সহিত কথা কহিতেছিল, কিন্তু তার কাণ পাতা ছিল রেবেকার দিকে এবং চোখের একটা কোণ দিয়া এদিককার অভিনয়টুকু সমস্ত দেখিয়া লইতেছিল।

অবশেষে বিনোদ বলিল—"আমি সত্যি রাজা নই, লোকে অমনি বলে থাকে।"

রেবেকা বলিল—"না, না—তুমি আমায় ছলনা করতে চাও, you are my prince in disguise!"

এই ছোট্ট উত্তমপুরুষের সর্ব্বনাম-যুক্ত বাক্যটি বিনোদের বুকে একটা আলোড়ন আনিল তপ্ত লোহা যেমন গো-মেষের উপর মালিকের চিহ্ন মারিয়া দেয়, বালিকার এই কল্পনারাঙা ভাবতপ্ত শব্দটিও তেমনি বিনোদের অলক্ষ্যে তার বুকে একটা মালিকীসত্ত্ব মুদ্রিত করিল। কিন্তু তার বাক্‌শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইল না, নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বোকা বনিয়া রহিল। নরেশ নিয়োগী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল "ঠিক, ঠিক, ঠিক ধরেছ রেবা, সত্যিই ইনি ছদ্মবেশী রাজপুত্র।"

এই সময় ড্রইংরুমের পরদা আধখানা তুলিয়া বেহারা জ্ঞাপন করিল—"স্যামুয়েল সাব"।—সঙ্গে সঙ্গেএকটি লোক টুপি হাতে করিয়া "গুড্ ইভ্নিং" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আইজাকের জাতভাই তাহা চেহারাতেই বোঝা যায়। বয়স আইজাকের সমান, দোহারা শরীর, ডান পা-টা বাত-ভার-গ্রস্ত হওয়ায় একটু খোঁড়াইয়া চলে। বেশভূষায় পারিপাট্যের চেষ্টা পরিস্ফুট, খানিকটা টাকপড়া মাথায় সম্মুখের চুলগুলা পমেটমযোগে মসৃণ। চোখজোড়া ছোট, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বাঁ হাতের মুঠার ভিতর একটা রূপার নস্যর ডিবা রহিয়াছে। বিনাবাক্যব্যয়ে বিনোদেন্দুর পাশে বসিয়াই পকেট হইতে একখানা রেশমী রুমাল বাহির করিল ও নস্যর ডিবা খুলিল,

তার পর দু আঙুলে নস্য টিপিয়া নাকে ভরিয়া, রুমাল দিয়া নাক মুখ ঝাড়িয়া লইল। রেবেকা অস্ফুটস্বরে—"Beast" বলিয়া সরিয়া পিয়ানোর কাছে গেল।

বড় ভগিনী গৃহকর্ত্রী উপযোগী সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় স্যামুয়েলকে সম্ভাষণ করিল। দুচার মিনিট বাক্যালাপ ও নবাগন্তুক বিনোদেন্দুর সহিত তাহার পরিচয়-সাধনের পর নরেশ নিয়োগী প্রস্তাব করিল "তাস খেললে হয় না?" পাশের একটা টেবিলে দুজোড়া তাস ছিল। রেচেল-নিয়োগী ও স্যামুয়েল-বিনোদের জুড়ি বাঁধিয়া বৃজ্ খেলা আরম্ভ হইল। রেবেকা সেদিকে ভিড়িল না। সে একটা বেয়ালা খুলিয়া পিয়ানোর সঙ্গে সুর বাঁধিবার জন্য টুং টাং আরম্ভ করিল।

বিনোদ বৃজ্ ভাল জানেনা, কিন্তু এই সমাজে সে বিষয়ে স্বীকারোক্তি নিষ্প্রয়োজন বোধ করিল। ভাল জুড়িদারের কল্যাণে সে রাত্রি বাজী জিতিতেও থাকিল।

অদূরে রেবেকা বেয়ালা বাঁধিয়া লইয়া তাহাতে আলাপ করিতেছিল। সেই আলাপের মাধুর্য্য, আলাপকারিণীর মোহনীয়তা, বিনোদের প্রতি মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে তার মধুবর্ষী কথাপ্রপাত—সবে মিলিয়া বিনোদের মনে একটা তরঙ্গ দোদুল্য রাখিল, সে তরঙ্গে বৃজে হারজিৎ তুচ্ছ বোধ হইল। চার-পাঁচ হাত খেলার পর গৃহপতি আইজাক পুন দর্শন দিলেন। নিয়োগী ঘড়ি খুলিয়া দেখিল ৯টা বাজে, গৃহবাসীদের ডিনারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উঠি: দাঁড়াইয়া বিনোদকে ইসারা করিল—এবার যাওয়া উচিত। বিনোদ যখন মেয়েদের কাছে বিদায় লইতে নিযুক্ত, নিয়োগী তখন ঘরের এককোণে গিয়া আইজাকের সঙ্গে মিনিট দুই তিন নিম্নস্বরে কিছু কথা-বার্ত্তা কহিল। শেষ কথাটা বিনোদের কাণে পৌঁছিল—"আশ্বস্ত হও, সব ঠিক হবে।"

বহুকাল পরে সেই কথাটা বিনোদের স্মৃতিপথে তীব্র আক্ষেপের সহিত উদয় হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহারান্তে বিনোদ যখন শয়ন করিতে গেল, কক্ষের শূন্যতা আর কষ্টকর বা ভয়াবহ বোধ হইল না, বরং এই শূন্যতাকে মিত্রের মত সে বাহু বাড়াইয়া লইল। নির্জ্জনগৃহে সান্ধ্য ঘটনাগুলির স্মরণ-রসে নিমগ্ন হইল। গঙ্গার ধারে নভোনীলিমায় চিরবিরহিত প্রিয়জনের অন্বেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ইহুদিবালিকার শেষ করমর্দ্দন পর্য্যন্ত সব ঘটনাগুলি মনের মধ্যে সিনেমার চিত্রের মত ফিরিতে লাগিল। সুইচব্যাক রেলা-রোহীর মত একটা মস্ত ধাঁকানির পর পায়ের তলায় যে জমি ঠেকিল তাহা যে দ্বিধা হইয়া তাহাকে রসাতলে টানিতে পারে সে সন্দেহ মনে উদয় হইল না। সুন্দর শষ্পদ দেখিয়া তাহাতে নামিয়া বিচরণ করিতে ভাল লাগিল।

তার পরদিন সকালে উঠিয়া নূতন ঘটনাবলির মাদকতা কথঞ্চিৎ উপশম হইলেও একটা কিসের আশা প্রতীক্ষা রহিল। সেদিন কিন্তু সারাদিন সারারাত্রি গেল, নরেশ আসিল না। আজকাল বৈঠকখানায় তেমন লোকের ভিড় হয় না। শুধু নৃপেন দত্ত নিত্যনিয়মিত একবার দেখা দেয়। সেও সেদিন দুপুরে আসিয়া তাহার হাজরি ভরিয়া গিয়াছে। তারপর বড় রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হইলেই বিনোদ মনে করিতে লাগিল ঐ বুঝি নরেশ আসিতেছে। ৫টার পর হইতে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বই লইয়া বসিল, এ সেই অলিভার লজের বই নয়, একখানা ইংরেজী মাসিক পত্র। বইয়ের অক্ষরের সঙ্গে চোখের সংযোগ এক মুহূর্ত্তের জন্য হইল না, চোখ দুটি নিবদ্ধ রহিল রাস্তার প্রান্তে, বড় রাস্তা হইতে এ বাড়ীমুখো হইতে হইলে সবপ্রথম গাড়ী যেখানে মোড় নেয়। নরেশের লাল রঙের ওয়েলার জোতা একটা নিজস্ব ল্যাণ্ডো ছিল। দুখানা লালঘোড়ার পা মোড়ের মাথায় দেখা দিলেই বিনোদ মনে করিতে লাগিল—"ঐ নরেশ এল।" বারকুড়ি যখন মোড়ের মুখে পাদস্পর্শ মাত্র করিয়া লাল-পা-ঘোড়ারা অন্য রাস্তায় অদৃশ্য হইল, তখন বিনোদের মনে পড়িল একটা হিসাবে ভুল হইয়াছে, নরেশের ঘোড়ার পায়ে একজায়গায় একটু সাদা রঙ আছে। এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া লক্ষ্য করিতে থাকিল। ঐ একজোড়া লাল ঘোড়ার পা মোড়ে আসিয়াছে, তাতে খানিকটা সাদা ও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে! নিশ্চয়ই নরেশের গাড়ী! গাড়ীখানা এদিকেই আসিতেছে! এবার ঘোড়ার পূর্ণাবয়ব দৃষ্টিগোচর হইল। কেমন সুপালিত, সুপুষ্ট, সুন্দর জীবটি। এমন ঘোড়া দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, গায়ে হাত বুলাইতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা কম্পাউণ্ডে ঢুকুক, গাড়ী বারান্দায় আসুক, তখন বিনোদ নামিয়া নিজের হাতে তাকে একখণ্ড পাঁউরুটি খাওয়াইবে। কিন্তু গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢুকিল না। বিনোদের ফাটক অতিক্রম করিয়া সোজা চলিয়া গেল। গাড়ী নরেশেরও নয়, তার ত ল্যাণ্ডো, এ যে ফিটন। ঘোড়াটার দিকে আবার নজর পড়িতে তার সে অঙ্গসৌন্দর্য্যও কোথায় মিলাইয়া গেল। চোখের কি ভ্রমই হইয়াছিল। ঢ্যাপসা, পেটমোটা, যাচ্ছেতাই-দেখিতে, গুলিমারার উপযুক্ত ঘোড়া এতক্ষণ তাকে কি প্রতারণাটাই করিয়াছিল। একটা চতুষ্পদের ভিতর যে এত চালাকী থাকিতে পারে বিনোদ এই প্রথম জানিতে পারিল। হতাশ্বাসে চেয়ার আশ্রয় করিয়া এবার সত্য সত্যই বইখানা পড়িতে বসিল। যতক্ষণ না অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল ততক্ষণে দশ বারো পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলিল। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করিত কি পড়িয়াছে—এক অক্ষর বলিতে পারিত না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরলা দেবী।

শিবরুদ্র

—ঃ০ঃ—

তুমি শুধু মৃত্যু নহ, মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহাকাল,
তুমি শুধু রুদ্র নহ, শিব তুমি বিশ্বলোক-পাল।
নহ শুধু ফণিধর, চন্দ্রলেখা শোভে ভাল পরে,
নয়নে কৃশানু বটে, জটাজালে হিমগঙ্গা ঝরে।
অট্ট অট্ট হাসো বটে, হাস্য তব কুন্দেন্দু-সুন্দর
কণ্ঠে তুমি ধরো বিষ—বাণী তবু অমৃত-নির্ঝর।
শ্মশানে নিবাস তব, ইন্দ্র তবু পদ সেবা করে,
চির-নিঃস্ব ভিক্ষু তুমি, অন্নপূর্ণা পত্নী তবু ঘরে।
হে স্মরারি ত্রিপুরারি ক্ষিপ্তোদ্ধত দীপ্ত তব রোষ,
তবু তুমি ভোলানাথ দয়াময় প্রভু আশুতোষ।
বামদেব বিরূপাক্ষ রুদ্র তুমি, তবু নাহি ডরি,
রূঢ় বাহ্য চণ্ডিমায় মঙ্গলের সূত্র আছ ধরি,
ত্রিশূলে দূরিছ তুমি বিশ্ব হতে ত্রিতাপে অশুভে,
নিত্যেরে অমৃত করি, বিষ তব দহিছে অধ্রুবে।
অট্টহাস্য বীচিক্ষোভে শঙ্কা তুমি জাগাবে কতই,
মা—ভৈঃ আশ্বাস তব নাচে তায় তাথই তাথই।
তোমার চণ্ডিমা মাঝে বাৎসল্যের চন্দ্রমা যে ভায়,
খদ্যোত জীবন মম নিভে জ্বলে ভয়ে ভরসায়।
লালসার বক্ষ'পরে নিত্য তব প্রচণ্ড তাণ্ডব,
তোমার চিতাগ্নি তৃষ্ণা তৃপ্ত করে নৃ-দেহ খাণ্ডব।
তোমার পিণাক হ'তে নিত্য ছুটে বজ্র অভিশাপ,
বাষ্প হয় ভস্ম হয় বিশ্বত্রাসী বিশ্বগ্রাসী পাপ।
ত্রাণ তুমি প্রাণ তুমি, দুঃখময় এই মৃত্যুলোকে,
অসত্যের দৈত্য হ'তে নিত্য রক্ষ আত্মার দ্যুলোকে।
বাসনা-পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার সন্তানে
ক্ষিপ্র করে তাই রুদ্র আকর্ষিছ তারে বক্ষ'পানে।

শ্রীকালিদাস রায়

মরমী কবি হাসন রজা

—:•:—

দক্ষিণ রাঢ় হইতে কায়স্থ বংশীয় রাজা বিজয় সিংহ ভায়ের সহিত বিবাদ করিয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বহুলোক-জন সঙ্গে লইয়া শিলেটের সদর মহকুমার কোনও জঙ্গলে তিনি প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই গ্রামের নাম কুনউরা। তাঁহার বংশধর রাজা রঞ্জিত রায় রামপালা গ্রাম স্থাপন করিয়া সেই-খানেই তাঁহার দৌলতখানা স্থানান্তরিত করেন। ঐ বংশের দেওয়ান বাবু রায় চৌধুরী জমিদার মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাবুখাঁ নাম গ্রহণ করেন। কয় পুরুষ পর এই বংশের দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী জমিদার সুনামগঞ্জের নিকটবর্ত্তী লক্ষণশ্রী গ্রামে স্বীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান হাসন রজা চৌধুরী জমিদার ইহার দ্বিতীয় পুত্র।

১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ তারিখ লক্ষণশ্রী গ্রামে দেওয়ান হসন রজা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন—হাজার লোকের মধ্যে চোখে পড়ে এমনি একখানা চেহারা লইয়া। স্বভাব তাঁহাকে যেমন অন্তরে ঐশ্বর্য্য তেমনি দেহের ঐশ্বর্য্যও মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিল। চারি হাত উঁচু দেহ দীর্ঘ বাহু, ধারাল নাক, তীক্ষ পিঙ্গল চোখ এবং কোঁকড়া চুল প্রাচীন আর্য্যদের একখানা চেহারা সম্মুখে তুলিয়া ধরিত।

বাংলার সেই মধ্যযুগে এতদ্দেশে শিক্ষার বহুল প্রচার না হওয়ায় ইহার শিক্ষার প্রতি তখন কোন মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বনের ফুল যেমন মালীর হাতের সেবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার মত বর্ণ গন্ধে ভরিয়া উঠে, শিক্ষার অভাবের মধ্যেও তেমনি এই বাউল কবির চিত্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের আলোকে এক বস্তু সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। হীরকখণ্ড যখন ভূগর্ভ হইতে প্রথম খুঁড়িয়া তোলা হয় তখন তাহার বহিরাবরণ নিতান্তই মাটির মত। তারপর তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যখন একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া যায় তখন তাহার ভিতরের মূর্ত্তিটি বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহা লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের লোভনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের বেলাও তাহাই। শিক্ষার ছাঁটাছাঁটি দ্বারা মানব-চিত্তকে, মানুষের অভ্যাসকে সংযত করিয়া না তুলিলে সমাজে তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয় না। তাই বিকসিত হইলেও সেই বনফুলের মর্য্যাদা নগরের

রাজোত্থানে যে হয় নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। হাসন রজা সাহেব যে সমাজ যে রীতি নীতি, যে প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া উঠিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীর সমাজের সঙ্গে তাহা খুব মিলে না, কাজেই বিংশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্তের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহার বিচার করিতে গেলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হইবে। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাঁহার কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছি। কার্য্যের উপর সমাজের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তাই ভিতরকার মানুষটীর স্বরূপই হইল চিন্তা। অবশ্য চিন্তার খরস্রোত সময় সময় মানবের কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাই আমরা তাঁহার দুই একটি কার্য্যেরও উল্লেখ করিব। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের বৈশিষ্ট্যটুকুও এই যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না রাজহাঁসের মত তিনি সংসারের পঙ্ক ও ক্ষার উভয়ের মধ্যেই খেলা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুই তাহার গায়ে লাগিতে পারে নাই। তাঁহার অন্তরের শক্তি-রস তাঁহাকে উভয়ের বন্ধন হইতেই মুক্ত রাখিয়াছে।

উদারতা হাসন রজা সাহেবের একটী বিশিষ্ট গুণ ছিল। মল্লিকপুরের জমিদার গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে জমিদারী লইয়া তাঁহার বিবাদের অন্ত ছিল না। আদালতে মোকদ্দমা হইতেছে, এদিকে দুইজনে বসিয়া খোসগল্প করিতেছেন—এই প্রকার কথা আমরা শুনিয়াছি। উত্তর কালে গোবিন্দ বাবুর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে সাহায্যও করিয়াছিলেন। মহাভারতে পড়িয়াছি, দিনে যুদ্ধ হইত রাত্রে একদল গিয়া অপর দলের নিকট মন্ত্রণা চাহিতেন। এখনও আমরা সেই জাতীয় একটি জিনিষ দেখিতে পাই।

তাঁহার সম্বন্ধে অন্য যে একটি গল্প আছে তাহা আরও উদারতার পরিচায়ক। আয়াতউল্লা নামীয় জনৈক লোক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া তাহাকে বিপন্ন করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি পরে মুক্তিলাভ করেন। অবশেষে এক সময় আসে যখন আয়াতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। দিনান্তে দুইটি অন্ন মুখে দিবার সংস্থানও তাহার ছিল না। এই সংবাদ পাইয়া হাসনরজা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রচুর অর্থ দান করেন। শুধু তাহাই নহে আয়াতের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহা কোন উগ্র ব্যক্তির খেয়াল নহে, এবং এই উদারতা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া অর্জ্জিত হয় নাই। যে স্থলে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া প্রতিশোধ নিতে পারিতেন, সে স্থলে ক্ষমা প্রদর্শনই তাঁহার বাস্তবিক ক্ষমাগুণের পরিচায়ক।

তাঁহাদের বাড়ীর এক প্রাচীন কর্ম্মচারীর মুখ হইতে একটি গল্প যেরূপ শুনিলাম—লিখিয়া দিতেছি। "একদিন রাত্রে আমি বাজার হইতে ফিরিতেছি।

বর্ষাকাল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছি, এমন সময় দেখি ঘোড়ার ঘরে আলো দেখা যাইতেছে। এত রাত্রে ঘোড়ার ঘরে আলো দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কে?" উত্তর হইল, "আমি; এদিকে এসো।" বুঝিলাম হাসন রজা সাহেব। আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম; দেখি একখানা খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে এক বৃদ্ধা, এক যুবক ও দুইটী শিশু ঘাসের উপর পড়িয়া আছে। অনাহারে মর-মর হইয়া রহিয়াছে। সাহেব বলিলেন; "আলোটা তুলে ধর।" আমি আলো তুলিয়া ধরিলাম, তিনি তাহাদিগকে যত্ন সহকারে আহার করাইলেন এবং ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা ও যুবকটী মারা যায়? সেই যুবকের ছেলে দুইটী বাঁচিয়া ছিল। একটীর নাম রাখা হয় মুসলিম, অপরটীর নাম মমিন। তিনি তাহাদিগকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। মমিন মারা গিয়াছে, মুসলিম এখনও কোথায় যেন কনেষ্টবল হইয়া আছে।"

পশু পক্ষী পর্য্যন্ত যে তাহার দয়া হইতে বঞ্চিত হইত না সেই সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রামপাশা যাইতেছিলেন। রামপাশার প্রজা তখন বিদ্রোহী। মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একস্থানে কতকগুলি বিড়ালের বাচ্চা পড়িয়া আছে। অসহায় শাবকগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া এক এক করিয়া শাবকগুলি কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে পৌছিয়া এক গৃহস্থের হাতে দশটী টাকা গুজিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি, এই বাচ্ছাগুলি পালন কর, বাকী যা খরচ হয় আমার কাছ থেকে নিয়ো"। তাঁহার এই গল্প শুনিয়া রামপাশার বিদ্রোহী প্রজাদের মন গলিয়া গেল। তাহারা ভাবিল এমন যিনি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করা অনুচিত এবং সেই দিনই যাহার যাহা বাকী খাজানা পরিশোধ করিল।

তাঁহার বাড়ীর লোকের কাছ হইতে জানা গিয়াছে তিনি মাছি পিঁপড়ার প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক দয়া গুণ তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার হৃদয়ের বিপুল শক্তি কাজ করিবার স্থান পাইত না, ছুটিয়া চলিবার ধারা পাইত না, তাই ক্ষণিকের বিদ্যুতের মতই কেবল তাহা দেখা দিয়া মধ্যে মধ্যে মানুষের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইয়া দিত। কিন্তু তাঁহার মধ্যে এই দয়াগুণের কোন আকস্মিক বিকাশ ছিল না। পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে যাহা প্রাচ্য শিক্ষার গুণে ধর্ম্মপ্রাণতার ও ধর্ম্মোদারতার ভিতর

দিয়া প্রকাশ পাইত, হাসন রজাতে তাহাই অশিক্ষার ফলে প্রতিভার খেয়ালের মত ফুটিয়া উঠিত। এই বিখ্যাত জমিদার-বংশের অনেকেই মুসলমান হইয়াও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি গৌরব দেখাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। দেওয়ান আনোয়ার খাঁ চৌধুরী জমিদার ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য অনেক দেবালয় ও আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত কৌড়িয়া পরগণার রাজাগঞ্জ আখড়া আজও বর্ত্তমান আছে। দেওয়ান আলী স্থাপিত আলীপাড়ার আখড়া আজও তাঁহার উদারতার সাক্ষ্য দিতেছে। হায় একালেও যদি এমন উদারতা হিন্দু-মুসলমানকে বাঁধিয়া এক করিতে পারিত।

দেওয়ান সাহেবের বাহিরের রূপ যতদূর পারি খুলিয়া ধরিলাম। এখন তাঁহার চিন্তার দ্বারাই তাঁহার ভিতরকার ছায়া মূর্ত্তিটী দেখিতে প্রয়াস পাইব। কবির চিন্তার ধারা তাঁহার কবিতা ও গানের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া বাহির হয়। আমাদের এই প্রেমিক কবির কবিতা বা গানই তাই এখন আমাদের সমালোচ্য বিষয় হইবে।

দেওয়ান হাসন রজার গানগুলি খাঁটী গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। তিনি কিছুই লেখাপড়া জানিতেন না, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা তাঁহার বাড়ীর লোকের কাছ হইতেও জানা গিয়াছে। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি তাঁহার নিজস্ব জিনিষ। ইহাতে অন্য মনের প্রভাব অল্পই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহু কবিচিত্তের সহিত ইহার ভাব-সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তাঁহার কবিতাগুলিতে অনুভূতির তিনটী ধারা লক্ষিত হয়। (১) প্রেম (২) বৈরাগ্য ও (৩) তুরীয়ানন্দ। বাস্তবিক পক্ষে একই জীবন তিনভাবে বিকশিত হইয়াছে। যৌবনে যা' ছিল প্রেম, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহাই হইল বৈরাগ্য এবং বার্দ্ধক্যে তুরীয়ানন্দের শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিল। আমরা ক্রমান্বয়ে একটীর পর অন্যটী আলোচনা করিয়া কবির ভাবগৌরব দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

কবির প্রেমের কবিতাগুলিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেমিক সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

পীরিতের মানুষ যারা—
আউলা জাউলা হয়রে তারা

সেক্ষপীয়রও বলিয়াছেন—

The lunatic, the lover and
the poet
Are of imagination all compact.

আর কবি পাগলও হইয়াছেন; বলিতেছেন—

লাগিলরে পীরিতের নিশা
হাসন রজা হইল বেদিশা .
ছাড়িয়া দিব লক্ষণশ্রী আর রামপাশা
ছাড়িয়া দিব আরিপরি

আর ছাড়িব লক্ষণ শ্রী

বন্ধু কেবল মনে করি জঙ্গল করব বাসা

বন্ধু আমার মনে প্রেমের নিশা লাগিয়াছে, আমি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি, আমার আর ঘরে মন টিকিতেছে না, আমি আজ ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িব, বনে বাসা করিব। যেন—

"বসতি বিপিন বিতানে ত্যজতি ললিত-
মণিধাম।
লুটতি ধরণী শয়নে বহু বিলপতি
তব নাম।"

আরো যেন—

"সবাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা—
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে—
যে মত যোগিনী পারা"

বন্ধু আমি তেমনি সন্ন্যাসী হইব, যোগিনী হইয়া বনে বাস করিব।

কবির আমার নেশা লাগিয়াছে তাই বলিতেছেন,

নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা
লাগিল রে
হাসন রজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে।

* * *

ছটফট করে হাসন দেখিয়া চান্দমুখ
হাসন জানের মুখ দেখিয়া জনমের
গেল দুখ
হাসন জানের রূপ দেখিয়া ফালদি
ফালদি উঠে
চিড়া বান্না হাসন রজার বুকের মাঝে
ফুটে।

—বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিয়াছে, আমি তোমার প্রেমে মজিয়াছি, তোমার চান্দমুখ দেখিয়া আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি আমার জীবনের সকল দুঃখ দুর হইয়া গেল, কিন্তু দুর হইয়া গেল কোথায়?

তুমি যে "রতে গেলেও না যায় ধরা," তোমাকে পাইয়াও যে পাইনা, তাই তোমার চাঁদমুখ দেখিয়া আমার সকল দুঃখ গিয়াও যায় নাই, তোমাকে যে সমগ্র ভাবে পাইতেছি না সেই দুঃখে আমার বুকের মাঝে কে যেন হাতুড়ি পিটাইতেছে তোমার রূপ দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি।

"মধুর মধুর তুয়া রূপ
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ"

চান্দের লাফান মুখখান তোমার ঝলমল
ঝলমল করে,
আরে যে দেখিল একবার সে কি পাসরে?
আচানক রূপ তোমার দেখতে চমৎকার—
আরে বর্ণনা যে করে রূপের শক্তি আছে
কার?

চাঁদের মত মুখখানি তোমার ঝলমল ঝলমল করিতেছে। এই রূপ যে একবার দেখিল সে কি আর ভুলিতে পারে—তোমার এই চমৎকার রূপ! আর ইহার বর্ণনা করিবার শক্তিই বা কাহার আছে?

তার পর—

ভালা নাচিয়ে নাচিয়ে পিয়ারী যায় রে
হাসন রজার পানে চায় রে
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায়

ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
ঘেমটা তালে গান গায় রে।
পায়ের ঘুঙ্গুর বাজে
প্রাণ নিল গায়ের সাজে
দেখিয়া মম মন মজে
কি ধরাইব লাজে রে?
দেখিয়া পিয়ারীর তারা বারা
হাসন রজা হইল মারা
সুন্দর দেখিয়া ভুলিয়া যায়
হাসন রজার ধারারে।

যেন—

"কি রূপ দেখিনু মধুর মুরতি
নাগর রসের সার—
হেন মনে লয় এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার।"

তার পর—

"কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়া
সোয়াস্তি না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া সখিরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে।"

বন্ধু, তুমি নাচিয়া গাহিয়া যাইতেছ, আমার পানে চাহিতেছ, গান গাহিয়া, নূপুর বাজাইয়া তুমি চলিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আমি যে মুগ্ধ হইয়াছি, আমাকে লজ্জায় কি আর ধরিয়া রাখিতে পারে? আমার যে স্বভাব—আমি সুন্দর দেখিলে ভুলিয়া যাই।

কবি নিজেকে ভুলিলেন, আত্মহারা হইয়া, কিন্তু তাহাকে ত পাইতেছেন না; তাই বলিতেছেন;

এগো সুন্দর দিদি শুনিয়া যাগো,
প্রাণ বন্ধু মোর কোথায় আছে বলিয়া
মোরে দেগো
না হেরিয়া বন্ধু মম হইয়াছি মৃত সম
এখন কি করি করি করি গো।
করিয়া আমার মন চুরি কোথা গেল
প্রাণ হরি
ধরতে গেলে না যায় ধরা কেমনে তারে
ধরি গো?
হাসন রজা বলে দিদি মনকে আমি কত সাধি
মন হইয়াছে বিবাদী সে বিনে মানে না গো

তারপর রাধিকার মত বলিয়াছেন—

প্রেমানলে হাসন রজা জ্বলিল
জ্বলিয়া যাইতে হাসন রজা এই কথা বলিল
আমি যে জ্বলিয়া মরি এর নাই দুখ
জ্বলিয়া পুড়িয়ানি দেখিমু বন্ধুর মুখ

বন্ধু বেদনায় আমি অস্থির হইয়াছি, প্রেমানলে জ্বলিতেছি কিন্তু এই জ্বালায় আমার দুঃখ নাই যদি তোমাকে পাই। শুধু যদি তোমাকে পাই, আমার কোন দুঃখ নাই, কোন কষ্ট নাই।

কিন্তু সে যে ধরতে গেলে না যায় ধরা তাই তাহাকে ত পাইতেছেন না। যখন পাইলেন না, সে যখন আসিল না, তখন আর সহিতে পারিলেন না, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার যোগাড় তাই বলিতেছেন।

বন্ধু কেন আমায় ভালবাসে না
ছয় মাসে নয় মাসে একদিন আসে না
বন্ধু কেন আমায় ভাল বাসে না?
ছয় মাসে নয় মাসে একদিনও আসে না

কেন ? এই বাথায় কবি অস্থির হইয়াছেন। কিন্তু তবুও নিরাশ হইলেন না, সাধনা আরম্ভ করিলেন, নিজকে সমগ্র ভাবে তাঁহার প্রেমাস্পদের চরণে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

কবি সেই কথাই বলিতেছেন—

হাসন রজার এই মনে, থাকি সদা শ্রীচরণে—

অন্ত কিছু চায়না প্রাণে বলে হাসন রজা দাদা আমি কিছু চাইনা, শুধু তোমার চরণে দাস হইয়া থাকিব, আর কিছু চাইনা শুধু তোমার চরণ সেবা করিয়া সার্থক হইব।

আবার বলিতেছেন—

অন্ত কিছু চায়না মনে, কেবল চায় সে ধনে। আরো বলিতেছেন—

চাইনা আমি ভাই বন্ধু
চাইনা মুসলমান হিন্দু
কেবল চাই তোমার চরণরে—

তারপর বলিতেছেন—

হাসন রজা কুমতি ছাড়
এখন তুমি হুস কর—
পরকে ছাড়িয়া আপন ধর—
তাঁর গুণাগুণ গাও—

আমি কিছু চাই না, ভাই চাই না, বন্ধু চাই না, হিন্দু চাই না, মুসলমান চাই না, মান চাই না, ধন চাই না, কেবল তোমাকে চাই। যাহা পাইতেছি তাহা অপেক্ষা যাহা পাই নাই তাহাই আমার অধিক আপনার। আমি কেবল তাহারই কথাই চিন্তা করিব।

কবি এইভাবে ধ্যান করিতেছেন এমন সময় একদিন অতীন্দ্রিয় লোকের প্রেমপাত্র আসিয়া দেখা দিলেন। যাহাকে 'ধরতে গেলে যায় না ধরা কেমনে তারে ধরিগো' সেই কে একজন আসিয়া যেন দেখা দিলেন। কবি আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন—

আইলরে আইলরে বন্ধু আইলরে

আর আসিয়াছে, আসিয়াছে বন্ধু আসিয়াছে, আমি আর আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমি আজ তাহার রূপ দেখিব, সেই অপরূপ রূপ কেমনে দেখিব ?

আঁখি মুঞ্জিয়া রূপ দেখিরে
আর দিলের চক্ষে চেয়ে দেখ বন্ধুয়ার
স্বরূপরে।

"আর আমার নয়ন ভুলান এলে
আমি হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

বন্ধু আসিয়াছে, আমি হৃদয় মেলিয়া তাহার রূপ দেখিব। কি রূপ ?

তারা জিনি আঁখি ছুটি সূর্য্য জিনি অঙ্গ রে! তারপর অধীর কবি বলিতেছেন—

হাসন রজা প্রেমের মানুষ প্রেমের নাচন নাচতে চায়। তাই—

হাসন রজা গাইছে গান হাততালি দিয়া
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া শুনে হাসন রজার
প্রিয়া।

কিন্তু হায়! আনন্দ কোথায় ? বন্ধুকে ত চির দিন পাই না। তাই মুহূর্ত্তের স্বর্গীয় অনুভূতি আকাশে বিলীন

হইয়া গেলে কবি অস্থির হইয়া কহিতেছেন

এই দেখলাম ঐ নাই কি করি উপায় রে ?

বন্ধু ঐ আসিল, আবার ঐ চলিয়া গেল, আমি কি উপায় করি ? একবার তাহাকে পাইতেছি আবার পাইতেছি না ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছি না, আমার এখন উপায় কি ? এইভাবে কবি চলিতেছেন, এই ভাবে কবি প্রয়ান করিতেছেন। একবার মিলনের আনন্দে অধীর হইয়াছেন, আরবার বিরহে কাতর হইয়া ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এর মধ্যে কবি একবার তাহার প্রণয়-পাত্রের যেরূপ দেখিয়াছেন তাহা খাঁটি কবিত্ব—

কবি বলিতেছেন—

সোনা বন্ধু আমার জিগরের টুকবারে

আবার বলিতেছেন—

চন্দ্র সূর্য্য নহে বন্ধুর রূপের সমতুল
তাদের সঙ্গে তুলনা যে হাসন
রজার ভুল।

এই রূপ দেখিয়া, বন্ধুকে পাইয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া কবি বলিয়াছেন—এই প্রেমের কাহিনী। কবির বৈরাগ্য বিষয়ক কবিতাগুলি লইয়া আমরা অধিক আলোচনা করিব না, কারণ বৈরাগ্য প্রাচীন ভারতীয় জিনিষ, তাই ভারতের কবি—

"স্বর্গ যার হে রমণী এ ধরণী তুমি তাহারি
কিহে ?"

একথা বলিয়াও আবার বলিতেছেন,

"ঐ যে তরী দিল খুলে তোর বোঝা কে
নেবে তুলে ?"

আমাদের কবি বলিতেছেন—

মরণ কথা স্মরণ হইল না, হাসন রাজার
মরণ কথা স্মরণ হইল না।

আবার বলিতেছেন,

একদিন তোর হইবে মরণরে হাসন রজা
একদিন তোর হইবে মরণ।

কবি বুঝিলেন—মরণ তো আসিবে, আত্মার অনন্ত বৈরাগের উপর এই যে বাসন্তী রঙের ছাপ সেত মুছিয়া যাইবে। হায়! তখন ?

তাই মরণ কালে কে যাইবে তোর সঙ্গে।

তারপর আবার

দুনিয়ার লাগি কান্দিয়া ফির দুনিয়ানি
যাইব সঙ্গে।

দুনিয়া ত সঙ্গে যাইবে না। আমি অনন্ত পথের যাত্রী, পথে দুনিয়ার সঙ্গে দেখা কিন্তু দুনিয়া ত সঙ্গে যাইবার নহে।

তবে আর

কিসের বাড়ী কিসের ঘররে কিসের
জমিদারী ?
সঙ্গের সঙ্গীয়া কেউ নাই তোর কেবল
একেশ্বরী

তারপর কবি অনন্ত আত্মাকে অনুভব করিতেছেন—

কেবা আসে কেবা যায় এ দেহের মাঝার।

Birth is not a beginning,
death is not an end
Musings of a Chinese Mystic.

চিরদিন চলিয়া আসিতেছি, আমি

চিরদিন চলিব, আরম্ভ নাই,শেষ নাই, কিন্তু পৃথিবী বোধ হয় আর ভাল লাগিতেছে না, তাই বলিতেছেন—

দয়াল কানাই দয়াল কানাই রে
পার করিয়া দেও কাঙ্গালীরে—
ভবসিন্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই
দয়া করি পার করিয়া দেও বাড়ী
চলিয়া যাই।

দয়াল কানাই আমাকে পার করিয়া দাও, আমার ভবসিন্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই। এ ত বিদেশ, আমার বাড়ী ত এখানে নয়, এখানে কেউ আমার সঙ্গী নয়, তুমি আমাকে বাড়ীতে লইয়া চল, যুগে যুগে আমার যে বাড়ী, আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া চল।

কবির একটি বিখ্যাত গান আছে—

লোকে বলেরে ঘর বাড়ী ভাল নয় আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূণ্যের মাঝার
ভাল করি ঘর বানাইয়া থাকব কত দিন
আর আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকা চুল
আমার
হাসন রজা বুঝত যদি বাচব কতদিন
দালান কোঠা, বসাইত করিয়া রঙীন।

তাঁহার ঘরবাড়ী ভাল ছিল না। লোকে সেই লইয়া বলাবলি করিত। তাই কবি বলিতেছেন—বিদেশে দালান কোঠা তৈরী করিয়া কি হইবে? শূন্যের মধ্যে রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কি লাভ? হঠাৎ কোন দিন এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব কে জানে? যদি জানিতাম এখানে কয়দিন থাকিব, তবে সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করাইতাম।

কিন্তু হায়! জীবন যে অনিশ্চিত! তাসের ঘরের মত কখন সে ভূমিসাৎ হইবে কে জানে! আয়নায় চাহিয়া যে দেখি আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়াছে, আর ত দেরী নাই।

তাঁহার বাড়ী দেখানো সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। ঘটনাটী সত্য। কয়জন বিদেশী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া তাঁহার বাড়ী দেখিতে যান। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া হাসন রজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি চান?" ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে না চিনিয়া বলিলেন "আমরা হাসন রজা সাহেবের বাড়ী দেখতে এসেছি।" মরমী কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আসুন আসুন, আমি আপনাদেরে তার বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তাহাদের একটি মাঠের পাশে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার কবর তৈরী হইতেছিল, সেই চিরদিনকার বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন;—

"ঐদেখুন আমার বাড়ী।"

এই ভাবে কবি চলিয়াছেন বৈরাগী ও প্রেমিক কবি—অতীন্দ্রিয় লোকের অরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া, নাচিয়া গাহিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, তাহার মাঝে আত্মানুভূতি পরমাত্মানুভূতি।

কবি কাহাকে যেন মা বলিয়া ডাকিতেছেন কহিতেছেন—

আইস পরদা খুলিয়া মাগো
আইস পরদা খুলিয়া
হাসন রজার প্রাণ যায়
তোমার লাগি জলিয়া গো
তোমার আমার বাড়ীর মাঝে
আছে একখান টাটী
কাটিয়া কুটিয়া টাটীখানি
করিয়াছি বাটী গো
টাটীর আড়ে থাকিয়া তুমি বড় রং কর
আড় নয়নে চাও কেন বসিয়া একৈ ঘর
হাসন রজায় দেখিয়া তোরে মুস্করিয়া হাসে
অন্তরের সহিতে তোরে বড় ভালবাসে।

মা পরদা খুলিয়া আইস, তোমার জন্য আমার প্রাণে আগুন লাগিয়াছে। তোমার ও আমার বাড়ীর মধ্যে একখানি আবরণ রহিয়াছে, তুমি তাহার আড়ালে বসিয়া আছ। মা তুমি সেই আবরণ খুলিয়া বাহিরে আইস—আমি তোমাকে দেখিতে চাই।

তখন সেই অতীন্দ্রিয় লোকের মাকে যেন দেখিতেছেন। তাঁহার রূপের কথা বলিতেছেন,

এগো মা তোমা সম রূপ রঙ্ কার?
ঝিলি মিলি করে রূপ দেখি যে তোমার,
দিবাকর নাহি ধরে রূপ যে তোমার,
বলা নাহি যায় তব রূপের বাহার।

* * *

রূপেতে মিশিব তব কিছু চাইনা আর
এই মনে সাধ হইয়াছে হাসন রজার॥

মা তোমার কি অপরূপ রূপ! এমন রূপ আর কার আছে? বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য-সুধা মন্থন করিয়া এই যে তোমার রূপ এর কাছে ত দিবাকর ধরে না! মা আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার রূপ-সাগরে ডুব দিয়া যেন তোমাতে মিশিয়া যাই।

তার পর দেখিলাম নিজের রূপ—

রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ
দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল
আমারে—

* * *

আয়নার মধ্যে যেমন মুখ দেখা যায়,
সেই মতে আমার রূপ দেখা দিল আমায়,
সুরের বদনখানি জিনে কাঞ্চা সোনা,
আপনার রূপ দেখিয়া আপনি হইলাম কানা
আপনার রূপ দেখিয়া আপনি পাগল,
ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপ করে ঝলমল,
চন্দ্র সূর্য্য নাই হয় রে ঐ রূপের সমান,
সেই রূপ দেখিয়া আমার বাঁচেনা পরাণ।

মরমী আপনার রূপ দেখিলেন, দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রূপ দেখিয়াছি, চক্ষে আপনার রূপ দেখিয়াছি! আমার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আমার রূপ আমাকে দেখা দিল। আয়নাতে যেমন মুখ দেখা যায় তেমনি আমি নিজের রূপ দেখিতেছি! ত্রিভুবন জুড়িয়া এই রূপ ঝলমল করিতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহতারা এই রূপের তলে ডুবিয়া

গিয়াছে, আমার এই রূপের গৌরবে আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি—চন্দ্র সূর্য্যও যে এই রূপের সমান নয়।

নিজের আরো পরিচয় পাইয়াছেন, যে পরিচয় ছুঁইতে ধরিতে পাওয়া যায় না।

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি
সোনা যাবী সোনা যামী গো
আমারে করিলারে
বদনামী।
আমি হইতে আল্লা রসুল আমি হইতে কুল
পাগল হাসন রজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমি হইতে আসমান জমিন,
আমি হইতেই সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ আমি হইতে রব
আমি আউয়াল,আমি আখের জাহের বাতিন
না বুঝিয়া দেশের লোক মোরে ভাবে ভিন
আমা হইতে পয়দা হইছে এই ত্রিজগৎ
গউর করি চাহিয়া দেখ হে আমারয় মত
আকল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লায়
বিশ্বাসে করিলে পয়দা রছুল উল্লায়
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে মছলমানি দিন
আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত
শব্দ শাব্দ আওয়াজ ইত্যাদি যে কত
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় আর বদবয়
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রজায় কয়
মরন জিয়ন নাই রে আমার
ভাবিয়া দেখ ভাই
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই
পাগল হইয়া হাসন রজা কিসেতে কি ভয়
মরব মরব দেশের লোক
মোর কথা যদি কয়
জিহ্বায় বানাইয়া আছে মিঠা আর তিতা
জীবের মরণ নাই রে দেখ সর্ব্বদাই জিতা
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়
হাসন রজায় আপন চিনিয়া এই গান গায়॥

বিচার করিয়া চাহিয়া দেখি আমিই সব। আমি হইতে ঈশ্বর ইহাতে কোন ভুল নাই। আমি হইতে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, আমি হইতে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, আমি হইতে ধ্বনি সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সুন্দর, আমি ধ্বংস আমি ভিতর ও বাহির, চিন্তা ও বাক্য অপ্রকাশ ও প্রকাশ। আমার বুদ্ধি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ভগবান, আমার চক্ষু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে আকাশ ও পৃথিবী—এই দৃশ্যমান জগৎ, আমার কর্ণ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে—এই শব্দ, এই ধ্বনি, আমার শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে শক্ত ও নরম, ঠাণ্ডা আর গরম এই স্পর্শ, আমি নাসিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এই গন্ধ, আমি জিহ্বা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি রস, তিক্ত ও মিষ্ট। আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই অন্ত নাই। জীবের শেষ নাই, সে যে চিরকাল জীবিত। আমি বলিতেছি—আপনাকে চিনিলে তাহাকে চিনা যায়।

তখন কবি দেখিলেন, দুই রূপ যে এক। তাই বলিতেছেন—

তুমি কে আর আমি কে তাইত
বুঝিনা রে
এক বিনে দ্বিতীয় আমি
অন্য কিছু দেখিনা রে
তুমি হে জগতের কর্ত্তা আমি শব্দটাই মিথ্যা
একা তুমি বিধাতা তোমার
শরিক অন্য নাই রে
আমি আমি বলে যারা
বুঝেনা বুঝেনা তারা
লাগিয়াছে সংসারী বেরা মূর্খতা ছুটিছে না রে
মিছা মিছি বলি আমি,
সর্ব্বব্যাপী হওরে তুমি
সকলই তুমি অন্তর্য্যামী
তুমি ভিন্ন কিছু নয় রে
হাসন রজা নামটি দিয়া
রইয়া আছ ছাপাইয়া
সবই কর পর্দা দিয়া
দোষের ভাগী হওনারে
বুঝিয়া দেখি তুমি বই হাসন রজা কিছু নই
হাসন রজা থাবে কই
সেও দেখি তুমি ওইরে

তুমি কে আর আমি কে তাইত বুঝি নারে। তুমি কে আর আমি কে তাহাই ত বুঝিতেছি না। আমি ত এক ভিন্ন দুই দেখি না। তুমি এই বিশ্বের কর্ত্তা, তুমি এই বিশ্বব্যাপী, আমি শব্দটাই যে মিথ্যা! তুমি যে, এক তুমি যে সকল, তোমার ত কোন অংশীদার নাই। যাহারা আমি আমি বলিয়া পাগল, তাহারা ত কিছুই বুঝে না; সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহারা স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা বুঝিতেছে না যে তুমি আমি একদেহ, একপ্রাণ, একমন, একাত্মা, তাহারা মূর্খতায় বদ্ধ। হে অন্তর্য্যামী, তুমি ভিন্ন ত কিছুই নাই। তুমি আমাকে একটী নাম দিয়েছ, সেই নামের আড়ালে নিজেকে ছাপাইয়া রাখিয়া সকল কাজ করিতেছ। কিন্তু হায়! লোকে যে সকল দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় আমিত দেখিতেছি তুমি ছাড়া আমি কিছুই নই। যাহাকে আমি বলিতেছি সেও যে ওই তুমি, তাই তুমি কে আর আমি কে, আমিত তাহাই বুঝিতেছি না। মরমী এই ভাবে পাগল হইয়াছেন, তাই বলিতেছেন;

আমি আমার পরিচয় করিয়েছি
সবই তুমি আমিত্ব ছাড়িয়ে দিয়েছি
আমিত কিছুই নহি কিছুই নহে তুমি বহি
তুমি বিনে কিছু নয় এই বুঝিয়েছি।
আমি আমি একটী নাম দিয়া
খেলা খেল ভবে আসিয়া
কত রং ঢং কর দেখি তোমার নাচা নাচি
তুমি ঘরে তুমি বারে
তুমিই সবার অন্তরে
কে বুঝিতে পারে প্রভু
তোমারই পেছাপেছি
হাসন রজার এই উক্তি
সকলেই তুমি মা শক্তি
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই হইয়েছি।
আমি আমার পরিচয় পাইলাম, আমি

বুঝিয়াছি তুমি ভিন্ন আমি কিছু নহি, তুমি 'আমি' বলিয়া একটা নাম দিয়া ভবের খেলা খেলাইতেছ। তুমি ঘরে, তুমি বাহিরে, তুমি সকলের অন্তরে বিরাজমান। প্রভু তোমার কৌশল কে বুঝিতে পারে? তুমিই যে সকলের শক্তি, আমি তুমি ভিন্ন নাই, তুমি আমি এক হইয়া গিয়াছি এক হইয়া রহিয়াছি।

আবার বলিতেছেন—

হাসন রজায় বলে আমি কিছু নইরে
আমি কিছু নই
অন্তরে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়
প্রেমেরই বাজারে হাসন রজা হইয়া হেলয়
তুমি বিনে হাসন রজা কিছু না দেখয়
প্রেমের জ্বালায় জ্বলি মইলাম
আর নাহি সয়
যেদিকে ফিরিয়া চায় দেখি বন্ধুময়
আমি তুমি, তুমি আমি, ছাড়িয়াছি ভয়ে
উন্মাদ হইয়া হাসন রজা নাচন করয়ে।

দয়াময় আমি ত কিছুই নহি, তুমি ভিন্ন আমি ত কিছুই দেখিতেছি না। কবীর বলিয়াছিলেন; "যদি আমি বলি যে তিনি ভিতরে আছেন, তা' হলে বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে যাবে।" কবি তেমনি বলিতেছেন—

হে দয়াময় তুমি অন্তরে বাহিরে, যেদিকে ফিরিয়া চাই, কেবল তোমাময় দেখিতেছি, তুমিই আমি, আমিই তুমি। এই আনন্দে আমি আজ উন্মাদ হইয়া নাচিতেছি। তোমাময়—এ বিশ্ব কেবল তোমাময়।

এই ভাবে কবি পাগল হইয়াছেন। উন্মাদ হইয়াছেন, 'আউলা বাউলা' হইয়াছেন। চলিয়াছেন কবি এই বিশ্বের পুষ্পোদ্যানের ভিতর দিয়া—গন্ধে আকুল হইয়া। ক্ষণে কাঁদিতেছেন, ক্ষণে হাসিতেছেন, নিজকে দেখিতেছেন, অতীন্দ্রিয় লোকের তাঁহার যে প্রেমের পাত্র তাঁহাকে দেখিতেছেন, পাইতেছেন, হারাইতেছেন, আবার তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াও যাইতেছেন।

কবীরের মত আমাদের মরমী কহিতেছেন—

"প্রেমের দ্বারা তাহাকে জয় করিব"
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে
পাবে না পাবে না খোদা
নমাজ রজা করিলে।

বলিতেছেন—

হে অন্তর্যামী আমি তোমার প্রেমিক। প্রেমিকে প্রেমিকে পরিচয় হইয়াছে,—তাই—

তুমি আমি, আমি তুমি।

"হে ফকির তোমার প্রাণে আমার প্রাণ
লাগালে"—কবীর।

আর হাসন রজায় প্রভুরে কয়
হস্তের মধ্যে ধরি
তোমার আমার এমনি বন্ধন
ছাড়াইতে না পারি

এর মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, পুঁথিগত বিদ্যা নাই, আছে শুধু খাঁটি অনুভূতি—নিজস্ব জিনিষ।

তারপর একদিন—

হাসন রজার ব্যগ্র দেখিয়া দয়া লাগে
কানাইর বুকে
আইল ফুরিয়ে—কানাই ডাকে
তোমায় নিয়ে যাই

কানাইর দয়া হইল, তাই একদিন ডাক পড়িল, মরমী সে ডাক শুনিলেন ;

সাড়া দিলেন, চিরদিনের যে বাড়ী, অনন্ত মিলনের সঙ্গীতে যাহা মুখরিত, সেখানে তাঁহার স্থান হইল—দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, আত্মায় আত্মায় চির প্রেমাস্পদের সঙ্গে কবি মিশিয়া গেলেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ হঠাৎ সকলে দেখিল, কবির চিরদিনের বাসনা সফল হইয়াছে—

আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে,

আমি তাহার সঙ্গে যাইব। কবি তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন।

হাসন রজা খাটী মরমী ও কবি ছিলেন। একটা কিছু তাঁহার সম্মুখে ছিল, যাহা তিনি ধরিয়াও ধরিতে পারিতেন না। সেই অনুভূতির ব্যথায় তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন, আবার ক্ষণিকের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে নাচিতেছেন। তাঁহার এই হাসি কান্নার কাহিনী নীল আকাশের মত গভীর দূর দিগন্ত রেখার মত ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা, সন্ধ্যার অন্ধকারের মত রহস্যময় —এইখানেই তাঁহার কবিত্ব, ভাবুকতা এইখানেই তিনি মরমী।

শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা।

সত্য-মিথ্যা

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:o:—

"আজ এত রাত হল যে?" এই বলিয়া উমাশঙ্কর বাবুর পত্নী কৃপাময়ী দেবী অন্দর মহলের সোপানশ্রেণীর নিয়ে স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন। কৃপাময়ী দেবী গৌরবর্ণা ও ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এবং জমীদার-গৃহিণীর উপযোগী গম্ভীরস্বভাবা। কৃপাময়ী দেবীর একটা স্বভাব ছিল যে, তিনি সকলের নিকট দেখাইতে চাহিতেন দেশের সকল ব্যাপারে তাঁহার সমান উৎসাহ। সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে উমাশঙ্কর বাবু যখন ধীরে ধীরে তাঁহার বিলম্বের কারণ জানাইলেন, তখন কৃপাময়ী

দেবী উৎসাহের সহিত মিউনিসিপ্যাল সভার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে উমাশঙ্কর বাবু ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর দিলেন যে বালকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারই পরাজয় হইয়াছে।

উমাশঙ্কর বাবুর মনে হইল তিনি পত্নীর চোখে মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি দেখিতে পাইলেন, এই কথা ভাবিতেই তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইল। বাহিরের লোকেদের বিদ্রূপই কি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? ইহার উপর যদি আপনার জনেরা সেই বিদ্রূপে যোগদান করে তবে তাঁহার শান্তি কোথায়; কিন্তু ইহাতেই যদি তাঁহার পত্নীর তাঁহার উপর ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে রমানাথ দাস কম্পানীর সহিত তাঁহার সংস্রবের কথা শুনিলে তাঁহার পত্নীর মনের অবস্থা কি হইবে?

স্বামীর কাপড় ও চাদর আলনার উপর গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কৃপাময়ী দেবী বলিলেন, "আজকাল যেন প্রতি কাজেই তুমি পরাজিত হচ্ছ?"

"কি রকম? প্রতি কাজেই?" বলিয়া উমাশঙ্কর বাবু পত্নীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

স্বামীর এই দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কৃপাময়ী দেবী আপনাকে সামলাইয়া লইলেন এবং স্বামীর হাতখানি টানিয়া আনিয়া একটু সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "না, আমি তাই বলচি না; তবে তোমাকে ভাল মানুষ পেয়ে সকলেই তোমার উপর একহাত নিতে চেষ্টা করে। যারা তোমার কাছে কত রকমে উপকার পেয়েছে, তারাই পরে তোমায় ডুবিয়ে দিয়ে যায়। তুমি যেন তাদের কাছে কত জন্মের ঋণী, তাই তাদের অর্থ সাহায্য করা যেন তোমার শুধু কর্তব্য মাত্র, আর তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে তোমার অনিষ্ট চিন্তা করাই স্বভাব।"

এই এক কথায় উমাশঙ্কর বাবুর ক্রোধের উপশম হইল। কারণ তিনি অনেক সময়ে ভাবিতেন যে লোকে তাঁহারই অর্থে পুষ্ট হইয়া তাঁহারই অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়। এবং এক্ষণে পত্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন কৃপাময়ী দেবী রমানাথ দাসের পাটের ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা তুলিয়া উমাশঙ্কর বাবু এ কথা জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার মনটা আবার দমিয়া গেল। উমাশঙ্কর বাবুর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন তবেই ত তাঁহার পত্নী রমানাথ দাসের ব্যবসায়ের সহিত তাঁহার সংস্রবও জানিয়া ফেলিয়াছেন। টেবিলের নিকট বড় আলোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উমাশঙ্কর বাবু জামার বোতাম খুলিতেছিলেন। এক্ষণে পত্নীর কথায়, তিনি মুখ ফিরাইয়া চশমার ভিতর দিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথা নত করিলেন। আজ

বাটীতে ফিরিবার পর হইতেই উমাশঙ্কর বাবু সাহস করিয়া পত্নীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না, এক্ষণে নত মস্তকে অনেকটা জবাবদিহির সুরে বলিলেন, "আহা কে জানিত রমানাথ দাসের কপালে এই ছিল?" শুনিয়া কৃপাময়ী দেবী একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "রমানাথ দাসের কপালে যা থাকে থাকুক্, তোমার যে পরোপকারী মন, তুমি তার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে না তো?"

উমাশঙ্কর বাবু দেখিলেন, তাঁহার পত্নী সকল বিষয় অবগত নন সুতরাং নিম্নস্বরে একটী "না" শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি নীরব হইলেন। এই বিষয়ে আর অধিক বাক্যালাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না এবং এই জন্যই তিনি পত্নীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সহসা পার্শ্বের কক্ষে ক্ষুদ্র শিশুর হাস্যধ্বনি শুনিয়া তিনি তথায় সরিয়া পড়িলেন।

পার্শ্বের কক্ষে গিয়া উমাশঙ্কর বাবু দেখিলেন তাঁহার পুত্রবধূর কোলে শুইয়া তাঁহার শিশু পৌত্রটী কত রকমই না দুষ্টামি করিতেছে। রাত্রি অধিক হইলেও নিজে নিদ্রা হইতে জাগিয়া মাতাকে জাগাইয়া তুলিয়া শত প্রকারে মাতাকে জ্বালাতন করিতে করিতে দুই বৎসরের শিশু মজা দেখিতেছে এবং মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলেই শিশু নিজ মনে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধ উমাশঙ্কর বাবু দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ক্লান্ত শ্রান্ত মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। উমাশঙ্কর বাবু ধীরে ধীরে ডাকিলেন "দাদু" এবং পৌত্রের নিকট অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইলেন।

"খোকা দেখ্ কে এসেছে" বলিয়া শিশুর মাতা শিশুটীকে তাহার ঠাকুর-দাদার দিকে আগাইয়া দিলেন। শিশুটী তাহার বড় বড় গোল গোল চক্ষু মেলিয়া ঠাকুরদাদার দিকে তাকাইয়া দুষ্ট হাসি হাসিল, তারপর পুনরায় মাতার কোলে পা নাচাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাতার কোল হইতে মুখ তুলিয়া সে তাহার ঠাকুর দাদাকে শয্যার একধারে বসিতে ইঙ্গিত করিল। উমাশঙ্কর বাবু হাসিতে হাসিতে শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া শিশুর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন এবং সরিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। শিশুটী মাতার কোলে স্থির হইয়া ঠাকুরদাদার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

"কিরে খোকা, দাদামণি ডাকচেন, তাঁর কোলে যাবি না? তবে, আমি গিয়ে সব লজেঞ্চাস্ নিয়ে নিই।" এই বলিয়া শিশুর মাতা একটু অগ্রসর হইতেই শিশুটী লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে ঠাকুর-দাদার কোলে বসিয়া তাঁহার পকেটে হাত

প্রবেশ করাইয়া দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একমুষ্টি লজেঞ্জস্ বাহির করিয়া আনিল।

এই শিশুর পিতা, উমাশঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশঙ্কর সেন এক বৎসর পূর্ব্বে বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সেই হইতে উমাশঙ্কর বাবু এই পৌত্রটীকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। এই শিশুর কাছে আসিলে তিনি বাহিরের সকল ভাবনা সকল মান অপমান মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া শিশুর সাথে শিশু সাজিতেন। কিন্তু আজ এইখানেও বাহিরের চিন্তারাশি তাঁহার মনের চারিদিক হইতে উঁকি মারিতেছিল।

মানুষের মনের কোণে গোপনে যে বিপদের ছবি পুনঃ পুনঃ জাগিতে থাকে তাহাই ক্রমে বাহিরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আতঙ্কের কারণ হয়। আজ ক্লান্ত ও অসুস্থ হইয়া যখন উমাশঙ্কর বাবু শান্তিতে বিশ্রাম করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যখন পত্নীর নিকট জবাবদিহি কষ্টকর বোধ করিয়া তিনি শিশুর সাহায্য লাভের জন্য সরিয়া আসিলেন, তখনও কিন্তু রমানাথ দাসের কারবারের কথা তাঁহার মনে তোলপাড় হইতে হইতে ক্রমে বাহিরেরও রমানাথ যেন তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। সুতরাং উমাশঙ্কর বাবু যখন শিশুর নিকট বসিয়া শিশুসুলভ হাস্যে যোগদান করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার পুঞ্জীভূত দুর্ভাবনারাশি চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। মনে হইল উমাশঙ্কর বাবু এক একবার শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাহার উদ্দেশ্যে যেন বলিতেছিলেন, "এখানেও কি আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিবে না?" রমানাথ দাস কম্পানির ব্যবসায়ের কথা যেন তাঁহার চিন্তার সহচর হইয়া দাঁড়াইল এবং এইজন্য উমাশঙ্কর বাবু রমানাথ দাসের উপর আরও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, যেহেতু রমানাথ দাস তাঁহার পরিবারের মধ্যে মনান্তরের সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে এবং পতিপত্নীর মধ্যে প্রতারণার ভাব জাগাইয়া কলহের সূচনা করিয়াছে।

"আয়রে খোকা, দাদামণিকে চুমু দিয়ে শুতে আয়" বলিয়া শিশুর মাতা শিশুকে ডাকিলেন; শিশুটী কিন্তু মাতার কথা না শুনিয়া একবার মাতার দিকে একবার পিতামহের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছিল। উমাশঙ্কর বাবুও শিশুর সহিত হাসিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে কোন্ এক স্মৃতিকথা তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিল। কিন্তু সহসা আবার উমাশঙ্কর বাবুর মন নিজের চিন্তারশ্মির দ্বারা আকৃষ্ট হইল। তাঁহার মনে পড়িল গত বৎসর রমানাথ দাস পাটের কৃষকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পাট ধরিয়া রাখিতে শিক্ষা দিয়াছিল, সত্য বটে ইহা কৃষকদিগের পক্ষে লাভজনক, কিন্তু কোন্ পাটের ব্যবসায়ী বাতুলের মত কৃষকদিগকে এইরূপ শিক্ষা

দিয়া থাকে। নিজের পায়ে কুড়াল মারিয়া পরের সুবিধা করিয়া দিবার কথা উমাশঙ্কর বাবু ইহার পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল না, সুতরাং এইরূপ লোক ব্যবসায়ে সর্ব্বস্ব হারাইবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি কারণ হইতে পারে। তবেই ত রমানাথ দাস বাতুলের মত ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা শুনাইয়া ভবিষ্যৎ লাভের আকাশ-কুসুম তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া উমাশঙ্কর বাবুকে ব্যবসায়ে জামিন হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

"খোকা, তোকে দাদামণি চুমু দিলে না!" পুত্রবধুর এই কথায় উমাশঙ্কর বাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন, কাল্পনিক ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তিনি দ্বারের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহার গণ্ডে একটী চুম্বন দিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

নীচের বড় হলঘরে কৃপাময়ী দেবী স্বামীর আহার লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা নীলিমা গিয়া পিতাকে আহারে ডাকিয়া লইয়া আসিল। উমাশঙ্কর বাবু নীলিমার সহিত আহারে বসিলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে কৃপাময়ী দেবী ও আর এক পার্শ্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিমা বসিয়া উমাশঙ্কর বাবুর আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কৃপাময়ী দেবীর বদনমণ্ডল আজ কালবৈশাখীর পূর্ব্বে আকাশের আকার ধারণ করিয়াছিল, তিনি স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নীলিমা ও সেবাপরায়ণা প্রতিমা পিতাকে আহারের ত্রুটী দেখাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

উমাশঙ্কর বাবুর চারিটী সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশঙ্কর ভিন্ন তিনটী জীবিত আছে। কনিষ্ঠ পুত্র শিবশঙ্কর কলিকাতায় আইন অধ্যয়ন করিতেছে, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অতি অল্প সময়েই পিতামাতার নিকট থাকিবার সুযোগ পায়। কনিষ্ঠা কন্যা নীলিমা অবিবাহিতা, ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের ছাত্রী; জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিমা বালবিধবা। প্রতিমার স্বামী ডাক্তারি পাশ করিয়া যুদ্ধের সময়ে ডাক্তার হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তারপর তিনি আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই এবং সেই হইতে প্রতিমা পিতৃগৃহে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছে। যদিও প্রতিমার বয়স পঁচিশের উপর হয় নাই, তথাপি তাহার কেশ কিছু কিছু শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টি অনেকটা লক্ষ্যহীন, যেন কোন্ দূরবর্ত্তী স্থানের উদ্দেশে লক্ষ্য করিতে গিয়া তাহার দৃষ্টি লক্ষ্যহারা। প্রতিমার মনের চিন্তা বড় দুর্ভাবনা, পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহার কি দশা হইবে! এই দুর্ভাবনাকে মন হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্য সে

আপনাকে শত কার্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। পিতামাতার কোনও অভাব অভিযোগ তাহার দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারে না, সুতরাং পিতামাতাকে সাংসারিক কোনও অভাব ভোগ করিতে হয় না। পিতামাতা ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনীর সকল অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও বাটীর দাসদাসী প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিয়া প্রতিমা সমস্ত দিন ও মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেয়। অতি প্রত্যুষে সর্ব্বপ্রথমে রন্ধনশালায় আসিয়া প্রতিমা পদার্পণ করে, আর সকলের শেষে রাত্রি অধিক হইলে প্রতিমা শয়ন করিতে যায়। তথাপি প্রতিমার মনে হয়, সে বুঝি সংসারে একটা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, কখনও কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিল না এবং এই ভাবিয়া মাঝে মাঝে গোপনে সে অশ্রু মোচন করে।

"প্রতিমা, মা, কাল সকালে উঠেই আমি মফঃস্বলে যাব, আমার মফঃস্বলে যাবার পোষাকগুলি ঠিক করে রেখ ত মা;" এই কথা বলিয়া উমাশঙ্কর বাবু জ্যেষ্ঠা কন্যার দিকে তাকাইলেন। তারপর ছোট কন্যা নীলিমাকে রাগাইবার জন্য তাহার চুলগুলিকে ঝাঁকি দিয়া উমাশঙ্কর বাবু বলিলেন, "নীলিমা, কি বিশ্রী তোর খাওয়ার ধরণ, এমন ছড়িয়ে খেতে কোন্ শিক্ষয়িত্রী শেখালে তোকে?" এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিজের মনের দুর্ভাবনা ভুলিবার জন্য উমাশঙ্কর বাবু চেষ্টা করিতেছিলেন।

পিতার কথায় নীলিমা একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। নীলিমা খুব হাসিখুসি ও সপ্রতিভ মেয়ে হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের বালিকা-শিক্ষালয়ের ছাত্রীদিগের প্রচলিত কায়দাকানুন অনুসারে আহার সম্বন্ধে ত্রুটী নির্দ্দেশ তাহাকে বড়ই লজ্জা দিল। কিন্তু অধিকক্ষণ নীলিমার সে অপ্রতিভ ভাব রহিল না, সে তাহার স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতা লাভ করিয়া তাহার ক্লাসের শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের ধমক দিতে গেলে কিরূপ তোতলামি করিতে থাকেন তাহার অনুকরণ করিতে বসিল। "তো—তো—তোমরা আবার—গো—গো—গো গোল করছ," এই কয়টী কথা বলিতে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া কত রকম মুখ-ভঙ্গী করিতে থাকেন এবং কি প্রকারে অবশেষে তাঁহার চক্ষু হইতে জল ঝরিতে থাকে, এই সমস্ত অভিনয় করিয়া নীলিমা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। প্রতিমা নীলিমার কথায় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে যোগ দিতে বাধ্য হইল, এমন কি তাহার মাতাও অশুকার ব্যাপার সত্ত্বেও আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না। উমাশঙ্কর বাবুও সেই হাসির শব্দে একবার নীলিমার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিলেন।

আহার শেষ করিয়া উমাশঙ্কর বাবু শয়নকক্ষে গিয়া আলো নিভাইয়া দিলেন, এবং শয্যায় শুইয়া নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উমাশঙ্কর বাবু স্থির

করিলেন যে, পত্নীর পদশব্দ শুনিলেই তিনি নিদ্রার ভাণ করিবেন, কারণ এত রাত্রে পত্নীর সহিত অপ্রিয় আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল না।

উমাশঙ্কর বাবু চক্ষু বুজিয়া রমানাথ দাসের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে নীলিমা ধীরে ধীরে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সম্প্রতি অনেক কাজে নীলিমার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, গেণ্ডারিয়ার আনন্দ বাবুর মেয়ের সহিত "গঙ্গাজল" পাতাইতে তাহার প্রায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আবার সইয়ের পুতুলের সহিত নিজের পুতুলের বিবাহের জন্ম কিছু টাকার প্রয়োজন; সুতরাং পিতার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর ছিল না। মাতার নিকট আবেদনের ফলে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া নীলিমা পিতাকে কোনও-রূপে সন্তুষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করিতে পারে কি না দেখিতে আসিয়াছিল। নীলিমা পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, এমন সময়ে উমাশঙ্কর বাবু চোখ বুজিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি মনে কর আমায় যেরূপ ভাবে ইচ্ছা সেরূপ ভাবে প্রতারণা করতে পার?" পিতার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া নীলিমা স্তম্ভিত হইয়া একপদ পিছাইয়া আসিল। তারপর অনন্যোপায় হইয়া আবার আসিয়া পিতার পায়ে হাত দিতে গিয়া তাহার চঞ্চল হাতখানি পিতার পায়ে দিয়া ফেলিতেই, উমাশঙ্কর বাবু চমকাইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, নীলিমা ভয়ে ভয়ে পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উমাশঙ্কর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে নীলিমা, কি খবর?" নীলিমা তাহার আসিবার কারণ পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি বলিলেন, "কাল সকালে আমার আফিস-ঘরে যাস্, আমি বন্দোবস্ত করে দেব"। নীলিমা ভাবিতে পারে নাই তাহার পিতা এত শীঘ্র সম্মত হইবেন; সে আর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না বিবেচনা করিয়া পিতাকে একটু আদর জানাইয়াই সরিয়া পড়িল।

নীলিমার প্রস্থানের পরই আবার দ্বারদেশে পদশব্দ হইল। উমাশঙ্কর বাবু ভাবিলেন, এইবার নিশ্চয়ই তাঁহার পত্নী আসিতেছেন। এই চিন্তা হইতেই তিনি নিদ্রার ভাণ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন প্রতিমা তাহার সকালে বাহির হইবার পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া আনিয়া আলনায় রাখিয়া দিতেছে। বহির্বাটীর অঙ্গনে একটা আলো দেখিয়া তিনি প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিমা বাইরে এত রাত্রে আলো জ্বলছে কেরে?" "বোধ হয় গোয়ালঘরের ঝি, বাবা; আজ বোধ হয় একটা গরুর বাছুর হবে।" এই বলিয়া প্রতিমা আসিয়া ধীরে ধীরে পিতার পদতলে বসিল।

"একটা কথা বল্‌ব, বাবা?" "কি, মা?" "বলিয়া উমাশঙ্কর বাবু কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন। প্রতিমা বলিতে লাগিলেন' "ও পাড়ার উকিল বাবুর মেয়ে বলিয়াছিল যে রমানাথ দাস কম্পানির ব্যবসায় নষ্ট হওয়াতে তোমারও নাকি বিস্তর ক্ষতি হবে, সত্য নাকি বাবা? তোমার কাছে না জিজ্ঞাসা করে মাকে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে সাহস করি নি।" উমাশঙ্কর বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অন্ততঃ আজকের রাত্রিতে তিনি এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না। তাই তিনি বলিলেন "কত লোকে কত কথা বলে সবই কি শুনতে হয়, প্রতিমা।" "তাহলে সত্যি নয়, বাবা।" এই বলিয়া প্রতিমা পিতার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া উমাশঙ্কর বাবু দেখিলেন তাঁহার পত্নী ভূমিতে একখানি মাদুর পাতিয়া তাহার উপর নিদ্রা যাইতেছে। উমাশঙ্কর বাবু বুঝিলেন তাঁহার পত্নী তাঁহার উপর খুব বেশীই বিরক্ত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে পত্নীর মান অভিমান ভাঙ্গিতে পারা একরূপ অসম্ভব তাহা তিনি জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই সে চেষ্টা হইতে তিনি নিরত রহিলেন। পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে স্বামী-স্ত্রীতে কখনও সপ্তাহের উপর কথা বন্ধ রহিয়াছে এবং আজ এ ক্ষেত্রে তাঁহার নিজেরও মান তাহাদের অভিমানের উপর সেতু বাঁধিয়া দিয়া অপ্রিয় আলোচনায় পথ করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং নির্ব্বিকার থাকাই শ্রেয় মনে করিয়া তিনি পত্নীর নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া বাহিরের অঙ্গনে পা দিতেই পল্লীর একটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রমানাথ দাস নাকি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহি জাল করিয়াছে উমাশঙ্কর বাবু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন "অসম্ভব কি!" এবং কথাটা বলিয়াই আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের অবস্থা বাহিরে যাইবার উপযোগী কি না তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

পল্লীর আর একজন ভদ্রলোক ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে উমাশঙ্কর বাবুর কথা শুনিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন এবং উমাশঙ্কর বাবুর উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন, "শুনলাম রমানাথ আপনার সহি দেখাচ্ছে এবং বলে বেড়াচ্ছে যে আপনি যখন তার জামিন যখন তার কিছু ভয় নেই। কিন্তু এখন বুঝছি সব মিথ্যা।" উমাশঙ্কর বাবু পল্লীর সকলেই তাঁহার জন্য এত মাথাব্যথা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন এবং কিছু উত্তর না দিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া আসিলেন।

উমাশঙ্কর বাবু ভিতরে আসিয়া মোটর-

চালককে ডাকাইয়া আনিয়া মোটরে চড়িয়া বাহির হইলেন। দোলাইগঞ্জ ষ্টেসন রোডের সীমানায় উপস্থিত হইতেই গেণ্ডারিয়ার পুরাণ ইটখোলার মালিক ঘনশ্যাম বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন উমাশঙ্কর বাবু, আমি পূর্ব্বেই বলেছি ও আদৌ লোক ভাল নয়, একদিন না একদিন শ্রীধর দেখবেই। ঠিক কিনা?" শ্রীধরের কথায় উমাশঙ্কর বাবু চমকাইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বড় অশ্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

তিনি ঘনশ্যাম বাবুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া একটি নমস্কার করিয়া মোটর হাঁকাইয়া চলিলেন। পথে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যদি একথা রটিয়া যায় যে তিনিই এই জুয়াচুরির কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইলে রমানাথ দাস কি ভাবিবে এবং তাঁহারই বা নিজের বিবেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার কি থাকিবে? তাঁহার মনে হইল এখনই এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া সকল বিষয় খুলিয়া বলিলে ভাল হয়। ঠিক সেই সময়েই তিনি দেখিলেন, ঢাকা-প্রকাশের সহকারী সম্পাদক সত্যেন্দ্র বাবু আর একজন লোকের সহিত কি কথা কহিতেছেন। তবে ঘনশ্যাম বাবু সত্যেন্দ্র বাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন এবং তাহাই ঐ লোকটিকে বলিতেছেন! আশ্চর্য্য নয়, তাহার মনে হইল সত্যেন্দ্র বাবুকে তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তাহা হইলেই ত সংবাদপত্রের মারফত সংবাদটী সমস্ত সহরে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইবে না। না, এখনই সত্যেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া এই সংবাদের প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব্বের রাত্রিতে বৃষ্টি ও ঝড় হইয়া সমগ্র পথ কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার মোটর ঘুরাইয়া সত্যেন্দ্র বাবুর নিকট লইতে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং যতই বিলম্ব হইতেছিল, ততই উমাশঙ্কর বাবুর রমানাথের উপর ক্রোধ বাড়িতে চলিল। তিনি ভাবিলেন, কি কুক্ষণে তিনি রমানাথকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাইত এক্ষণে পাগলের মত তাঁহার এই ছুটাছুটি। যাহা হউক, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সত্যেন্দ্র বাবুর নিকট মোটর আনিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিয়া সত্যেন্দ্র বাবুকে আহ্বান করিলেন।

সত্যেন্দ্র বাবু মোটরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি উমাশঙ্কর বাবু? যা শুনছি, তা সত্যি নাকি? রমানাথ দাস ত বেশ লোক! আমি আগেই জানি। আমাদের কাগজে একদিন বিজ্ঞাপন দিয়েই কিনা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল।"

উমাশঙ্কর বাবু কিন্তু তখন ঐ জাল সহির প্রচারের কথা ভাবিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সত্যেন্দ্রবাবুর কথায় কাণ না দিয়া সহির কথাই বলিলেন, "কথাটা একেবারে মিথ্যা"। সত্যেন্দ্র বাবু

বলিলেন, "কি মিথ্যা? আমার বিজ্ঞাপন বন্ধ করেনি বলতে চান?" উমাশঙ্কর বাবু এই কথায় কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি কি ঐ ভদ্র লোকটীকে রমানাথের বিষয় কিছু বলেছেন না কি?" সত্যেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই বলেছি কালে কালে লোকগুলা সত্যের উপর কিরূপ আস্থা হারিয়ে বসেছে।"

সত্যের কথা শুনিয়া উমাশঙ্কর বাবুর মনটা অস্থির করিতে লাগিল, তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া ঘর্ম্ম পড়িতে লাগিল। তিনি কপাল ও গণ্ড হইতে ঘাম মুছিয়া চশমাটা ঠিক করিয়া দূরে তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যেন্দ্র বাবু যাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে বাজারের পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঐ সংবাদটীও বাজারে প্রচলিত হইতে যাইতেছে। উমাশঙ্কর বাবু অসহায় অবস্থায় তাঁহার দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর আত্মস্থ হইয়া তিনি ভাবিলেন, তবে আর সত্যেন্দ্র বাবুর নিকট মূর্খ বনিয়া লাভ কি, নির্ঘাৎ যখন সংবাদটা প্রচার করিতেই বদ্ধপরিকর, তখন তাঁহার এত চিন্তার ফল কি।

উমাশঙ্কর বাবুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সত্যেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমায় কেন ডাকছিলেন, উমাশঙ্কর বাবু? বিশেষ কোন কথা আছে কি?"

উমাশঙ্কর বাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কথা ছিল বৈকি! আপনারা আজকাল হয়েছেন কি বলুন ত, কালকের মোকদ্দমার সংবাদটা একেবারেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে কতদিন বলেছি কোর্টে ভাল ভাল মোকদ্দমা হলে কোনটা কেমন করে গুছিয়ে লিখতে হবে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যাবেন, তাত করেন না। এই জন্যই ত লোকে বাঙ্গলা কাগজকে মুদীর দোকানের কাগজ বলে ঠাট্টা করে।" এই কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষাও না করিয়া সত্যেন্দ্রবাবুকে একটি নমস্কার করিয়া মোটর চালাইয়া উমাশঙ্কর বাবু প্রস্থান করিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু কিয়ৎক্ষণ উমাশঙ্কর বাবুর মোটরের দিকে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন এবং তারপর উমাশঙ্কর বাবুকে যে তাঁহার নাম-সহি জালের সংবাদে বিকৃতমস্তিষ্ক করিয়া তুলিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নিজ গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

সঙ্গীত কি তুচ্ছ জিনিষ ?

—:•:—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন যে, এদেশে সঙ্গীত নিয়ে যে মারামারি উপস্থিত হয়েছে, সে ব্যাপারটি অতি তুচ্ছ।

(২)

কলধ্বনি নিয়ে কলরব করা, সঙ্গীত নিয়ে গণ্ডগোল করা যে সুবুদ্ধি কি সুরুচির কাজ নয়, তা বলাই বাহুল্য।

(৩)

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ নয়। কারণ কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরয় তা হলে কেঁচো-খোঁড়া ব্যাপারটাকে সেই তুচ্ছ বলতে পারে যে মাটির পৃথিবীতে বাস করে না, মেঘরাজ্যের কোনও গন্ধর্ব্ব-পুরীতে বাস করে।

(৪)

শ্রীমতী সরোজিনী নিশ্চয়ই এই বলতে চেয়েছিলেন যে, ঢাকের পিঠে কাঠি পড়লেই যখন সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মাথায় লাঠি পড়ে, তখন ঢাক না বাজালেই ত সব গোল চুকে যায়।

(৫)

কিন্তু এই সূত্রে যে সব আর্টিষ্টিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক সমস্যা এক সঙ্গে উঠে পড়েছে—সে-সবের মীমাংসা ত রাজনৈতিকরা করতে বাধ্য, কেননা তাঁদের ব্যবসাই ত হচ্ছে, চুক্তির দালালী।

(৬)

মুচিমেথ:ররা শব-যাত্রার সময় যে Band বাজিয়ে যায়, তাকে সঙ্গীত বলা যায় কি না এই হচ্ছে প্রথম সমস্যা। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নে—কারণ আমি ওস্তাদ নই। তবে দেখতে পাই যে, সভ্য দেশেও funeral march আছে এবং সেই সঙ্গীত রচনা করেই Beethoven প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্যরা জগৎবিখ্যাত হয়েছেন। আমাদের কাণে সে সঙ্গীত অবশ্য মিষ্টি লাগে না, তার কারণ আমরা তা বুঝতে পারিনে। Beethoven-এর কোন্ বাজনা বিয়ের আর কোন বাজনা গোরের আমাদের পক্ষে তা বলা অসম্ভব। কিন্তু ঐ জর্ম্মান বাদ্যি যদি আমরা লাঠি মেরে বন্ধ করতে চাই তাহলে ইংরেজরাও আমাদের কান

কেটে দেবে। ব্যাপারটাকে তারা তুচ্ছ বলে কিছুতেই উপেক্ষা করবে না।

(৭)

বাঙালীরা অবশ্য মুখে বলে—ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে, রাজপথেও বাজনা বাজাতে না পেলে তারা আহ্লাদে নাচতে সুরু করবে তাহ'লে তিনি ভুল মনে করবেন। থামাবার কথা তুললেই সবাই বলে উঠবে, "আমার ঢাক আমি পিটব, তুমি বলবার কে?" এ কথার অবশ্য জবাব নেই। কেন না এ কালে আমরা প্রত্যেকেই নিজের ঢাক নিজে পিট্‌ছি।

(৮)

কেউ পিট্‌ছেন তাঁর ধর্ম্মের ঢাক, কেউ পিটছেন তার পলিটিক্‌সের ঢাক কিন্তু কাউকে কিছু বলবার যো নেই। কেননা এ কালের যুগধর্ম্মই হচ্ছে, নিজের ঢাক বগলবলে মামারে পেটাব না। সুতরাং যাঁরা পলিটিক্সের ঢাক বাজান তাঁরা ধর্ম্মের ঢাক থামাতে পারবেন না। যদি কেউ বলেন যে, ঢাক যখন আকাশে বাজে তখন যাও সেখানে বাজাও—তার উত্তর ঢাকীরা সব রাজা হরিশ্চন্দ্র নয়। ঢাকের বাদ্যি যে থামলেই মিষ্টি লাগে, তা হয় যখন সব ঢাক এক সঙ্গে থামে। কিন্তু আর সকলে মিলে বারোমাস ধরে ড্যাং ড্যাং করে দেশের কানের মাথা খাবে,—আর বেচারা হিন্দুরাই বিয়ে করতে যাবার সময় আর চিতায় পুড়তে যাবার সময় একটু বাজা বাজাতে পারবে না। এ কি অত্যাচার! হিন্দুর জীবনে ঐ দুটো দিনই মাত্র বড় দিন। তা ত হবারই কথা। Love and death-এর চাইতে পৃথিবীতে আর কি বড় জিনিষ আছে তা বড়লোকরা জানতে পারেন কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা জানে না।

(৯)

আর ধর্ম্মোৎসবের সময় হিন্দুরা যে বাজা বাজায় তার কারণ হিন্দুর দেবতারা Band শুনতে ভালবাসেন। নারদ তুম্বুরি প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যেরা সব স্বর্গের অধিবাসী। তা ছাড়া অপ্সরা আছে কিন্তু নাচ গান নেই এহেন স্বর্গে হিন্দু যেতে চায় না। তারা যেতে চায় সেই স্বর্গে যেখানে তারা band বাজিয়ে যেতে পারে।

(১০)

আসল কথা এই যে, হিন্দুর ধর্ম্মের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মূর্ত্তি-গড়াও আর্ট, গান-বাজনাও আর্ট। যদি সঙ্গীত শুনলে কারও কর্ণপীড়া উপস্থিত হয় ত দেবমূর্ত্তি দেখলেও তার চক্ষুপীড়া হবে। তাহলে হিন্দুরা শুধু বাজনা না বাজিয়ে তাদের মনস্তুষ্টি করতে পারবে না—সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবমূর্ত্তি সব নিজ হতে ভগ্ন করতে হবে।

(১১)

কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ যারা জোর করে বাজনা থামায়, তারা

পরমুহূর্তেই আবার মন্দির ভাঙতে উদ্যত হয়।

(১২)

আর্টের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত কিনা এ হচ্ছে একটা মহা-দার্শনিক সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন শুধু মহাদার্শনিকরাই অ-দার্শনিক আমরা শুধু এই দেখতে পাই যে, হিন্দুরা এ বিষয়ে সৃষ্টিছাড়া জাত নয়। খ্রীষ্টানরাও তাদের গীর্জেতে অর্গান বাজায়, উপাসকদের মনে ধর্মভাব খুলিয়ে দেবার জন্য নয়, সে মনোভাবের ময়লা কেটে দেবার জন্য। তারপর মন্দিরের শিবলিঙ্গ যদি idol হয় তবে গীর্জের ক্রুশও idol, কারণ ও দুয়ের একটিও মানুষের মূর্ত্তি নয়। আর রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের গীর্জে ত একেবারে যাদুঘর।

(১৩)

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, পূজা-পদ্ধতি হচ্ছে ধর্মের ভাষা। এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের মূল প্রভেদ এই, ভাষার প্রভেদ। সুতরাং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে-ব্যাপারকে তুচ্ছ বলেছেন তা মোটেই তুচ্ছ নয়। হিন্দুর পূজাপদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, হিন্দু-ধর্মের মাতৃভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা। যারা মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষা অবলম্বন করছেন তাঁরা অবশ্য এই ভাষা জিনিষটিকে তুচ্ছ মনে করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এই কথাটা মনে রাখবেন যে, মাতৃভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মও রক্ষা করা করা যায় না—আর্টও রক্ষা করা যায় না।

(১৪)

আমরা ইংরাজী ভাষার মারফৎ ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, বিসমার্ক লেনিন সবই হয়ত হতে পারি কিন্তু ও-ভাষায় কবিত্ব করলে সেক্সপিয়র মিল্টন হতে পারি নে। অপর পক্ষে বাঙালী বঙ্গভাষার মারফৎ রবীন্দ্রনাথ হতে পারে।

(১৫)

এর উত্তরে অবশ্য পলিটিসিয়ানরা বলতে পারেন, যে-স্বরাজ্যের তাঁরা রাজমজুর, সে রাজ্যে ধর্মও থাকবে না, আর্টও থাকবে না,—থাকবে শুধু পেট আর পলিটিক্স।

(১৬)

এ স্বর্গের কথা শুনে অনেকের যদি জিবে জল না এসে চোখে জল আসে, তাহলে তাঁদের এই ভরসা দেওয়া যেতে পারে যে, স্বরাজ হলে কংগ্রেস একটা নতুন ধর্ম ও নতুন আর্ট বানাবে। যার তুল্য ধর্ম ও আর্ট ভূ-ভারতে কখনো হয়নি। কারণ সে ধর্ম, সে আর্ট প্রতিষ্ঠিত হবে ভোটের উপর। সে জিনিষ হবে না-হিন্দি না-মুসলমান কিন্তু বিলকুল Indian. যেমন ফ্রান্সে সেকালে Reason দেবীর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর সে দেবতা ছিল একেবারে আগ্রহ দেবতা।

(১৭)

পরে যা হবে তা হবে, ইতিমধ্যে আমার কথা যদি সত্য হয় যে, সঙ্গীত হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের ভাষা, তাহলে তার উপর হস্তক্ষেপ করার অর্থ Freedom of speechএর উপর হস্তক্ষেপ করা। এ Freedom হারাতে যদি হিন্দুরা আপত্তি করে তাহলে যারা একমাত্র Freedom of speechএর জোরেই ভারত-উদ্ধার করছেন, তাঁদের বিরক্তির কোনও কারণ নাই।

(১৮)

তার পর এ বিষয়ে যাঁরা বাদশাহি আমলের নজির খুঁজছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি কাজীর নজির অনুসারে কি ইংরেজী আদালতের বিচার চলে? ইংরেজ কি মোগলপাঠানের বেনামদার? মৌলানা মহম্মদ আলির সে ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে, কেন না কথায় বলে "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত"। কিন্তু কোনও হিন্দু পলিটিসিয়ানের যদি ঐরূপ ধারণা থাকে তাহলে তাঁর দৌড় পাগলা গারদ পর্য্যন্ত। যে জিনিষ নিয়ে সহজ মানুষে পাগলের মত কথা কয়—সে জিনিষ যে তুচ্ছ নয় তা বলাই বাহুল্য।

(১৯)

আমার শেষ কথা এই যে, বাদ্যভাণ্ডের বিরুদ্ধে যদি "জেহাদ" ঘোষণা করি, তাহলে যেদিন স্বরাজ আসবে সেদিন ঢাক-ঢোল আমরা বাজাব কি করে?

বীরবল।

উপন্যাসের প্লট

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোর্ডিং বাড়ীটার উঁচু পাচিলের ভিতর দিকে কএকটা দেবদারু ঝাউ ফলসা প্রভৃতির বড় বড় গাছ ছিল। তেতলার যে ঘরখানায় কর্ণ ও মলয়া বাস করিত তার জানালার সাম্নে একটি ঋজুদেহ দেবদারু সন্নত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া সম্মুখের অনন্ত বিস্তার নীল সমুদ্রের মত শূন্যপটে একটী সুন্দর রেখা চিত্রিত করিয়াছিল। তার সরু সরু ডাল পালার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের জ্যোৎস্নার সূর্য্যালোকের ও বৃষ্টিধারার ক্রীড়া-

গতি অনেক সময়েই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত ও তাহাদের দিকে মেয়ে দুটীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া লইত। তবে এসব শান্ত সৌন্দর্য্যের উপভোক্তা ছিল মলয়াই, করবীর চোখে তার ক্ষীণদেহের সহিত ঝড়ের তাণ্ডবের লীলাই সমধিক আকর্ষণীয়।

আজও মলয়া নিজেদের সেই ঘরখানার জানালার ধারে বসিয়াছিল। মৃদু বাতাসে দেবদারুর পাতাগুলি সির সির ঝির ঝির করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কখনও তারা বায়ুর সহিত যোগ দিয়া পুলকে নৃত্য করিতেছিল, সে সেই দৃশ্য শান্ত তৃপ্ত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল।

ঘরের সাম্‌নে টানা লম্বা দালান, সেখানে জুতার শব্দের সঙ্গে মৃদু মৃদু গানের শব্দ শুনা গেল "আমি একলা চলেছি ভেসে এ ভবে।"

করবী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তার পোষাক একটু অদ্ভুত! গলায় কানে হাতে তার ঘেঁচি কড়ি দিয়া গাঁথা মালা, পরণে একখানা চেক সাড়ী—আপন মনেই সে তার অত্যন্ত মিষ্ট মধুর গলায় গাহিতে গাহিতে আসিল—

"আমার পথের সাথী কে হবে?"

মলয়া উহাকে দেখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। করবী গান বন্ধ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। সে হাসির অর্থ মলয়া জানিত, তাই তার গাল দুইটা একটু-খানি লজ্জার লালে লাল হইয়া উঠিল। অর্থাৎ কিনা ভাবুক মানুষ ভাব-রাজ্যের ভাবনা নিয়ে বসে গেছে!

মলয়া নিজের সেই লজ্জা-বিব্রত ভাবটা চাপা দিয়া ঈষৎ বিস্ময় দেখাইয়া বলিয়া উঠিল "একি!"

করবী নিজের সেই অভূত-পূর্ব্ব বেশ-বিন্যাসের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—

"কেন চিন্‌তে পারচিস নে?"

মলয়া বলিল "অপর্ণা?"

করবী কহিল "হুঁ।"

তারপর লোহার খাটের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিল।

"আমি একলা চলেছি ভেসে এ ভবে,
আমার পথের সাথী কে' হবে?

মলয়া প্রশংসা-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—

"ভগবানের কি বিচিত্র দান এইরূপ! একে যা' করে সাজাও, তাতেই এ অপরূপ।

করবী গাহিতে গাহিতে চোখ তুলিয়া সখীর সপ্রশংসোজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতির সহিত হাসিল। তারপর গান থামাইয়া হাসিয়া বলিল

"নয়ন দিয়ে যদি আহার করা যেত সতের বছরের জ্যান্ত মেয়ে' না ভাই! 'তাহলে হতভাগী ফেলত খেয়ে' না?"

মলয়া অপ্রতিভ হাস্যে সবেগে বলিয়া উঠিল "য্যা। কিন্তু দেখ রুবি! তুই এই যে অপর্ণার পাঠ নিয়ে এক্ট্‌ করবি, এতে

আমাদের এক্‌টিংটার খুব নাম বেরিয়ে যাবে দেখিস। নাঃ কি সুন্দর যে তোকে দেখাচ্ছে আর ওই গলা!"

করবী আলতাপরা পা দোলাইতে দোলাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, কহিল—

"আচ্ছা দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ আমার সঙ্গে লভে পড়বে না? আচ্ছা ক'জন পড়বে বলতে পারিস?"

মলয়া সবেতো কহিয়া উঠিল—

করবী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল "একজন, দুজন, তিনজন? আচ্ছা তাদের মধ্যে যদি একজন হয় রাজা আর একজন হাইকোর্টের জজ, আর একজন—আচ্ছা দাঁড়াও আর একজন কি হয় খুব বড় নামজাদা ব্যারিষ্টার? মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্‌কম? কেমন?"

মলয়ার এই সুন্দর ব্যবস্থায় স্মিতমুখে করবী কহিল "আচ্ছা ধরো তাই—তাহলে আমি এদের মধ্যে কোন্ জনকে বিয়ে করবো বল্‌তো?"

মলয়া চট করিয়া জবাব দিল—

"তিন জনকেই—"

করবী ছিটকাইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল "ধেৎ পলিঅ্যাণ্ড্রী!"

মলয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল "হলোই বা, পুরুষদেরতো এক সময় শতকরা হিসাবেও হতো। নৈলে আর এদের মধ্যে কা'কে বাদ দেবে? সবাই যে লোভনীয়।"

করবী খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, তারপর যথাস্থানে আসন গ্রহণপূর্ব্বক ইহনিক্ষিপ্ত শ্বাসে উত্তর করিল—

"হলে অবশ্য মন্দ হয় না, একমাস করে পালা খাটা যায়। একমাস রাজবাড়ীতে রইলুম, ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গাবার সানাই বাজবে, তাঞ্জামে চড়ে বরকন্যা ঘিরে বাজনা বাজিয়ে মন্দিরে চল্লুম, সন্ধ্যাবেলা চৌদ্দটা সখীতে ঢোল পিটিয়ে গান হেঁকে দিলে, গোলাপের পিচকারী নিয়ে তাদের সঙ্গে হোলী খেলচি। পরের মাসে আঁচলে চাবির তাড়া বেঁধে প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ঘর দোরে ঘুরে বেড়াচ্চি, আশ্রিতে, আত্মীয়ে বাড়ী ভরে আছে, এর ছেলের অন্নপ্রাশন তার মেয়ের বিয়ে, সবাই আস্‌ছে মাঠাকুরুণের পরামর্শ নিতে, আবার ঠিক পরের মাসে ব্যারিষ্টার প্রাসাদে মিস্কট পার্টিতে লাট বেলাটের সঙ্গে কারপোর বাড়ীর ডিস নিয়ে বসে গেছি, সন্ধ্যের বেলা মটর হাঁকিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে চল্লুম, মন্দ মজা কি?"

মলয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল "মন্দ তো মোটেই নয়। খুবই চমৎকার কিন্তু।"

করবী বাধা দিয়া উঠিল "ঐ-কিন্তু! আমিও তাই বলি কিন্তু সেত আর হবে না, পুরুষদের হলে হতো, আমাদের যে তারা মেরে রেখেছে। আমাদের জন্যে কি কোন সুযোগ রেখেছে।"

মলয়া বলিল "নজীর কিন্তু এর পাওয়া যায় দ্রৌপদী যখন পাঁচজনের স্ত্রী ছিলেন, তখন তোমার তিনজনে আপত্তি কি?

তারা মন্দোদরীর নজীরে যদি বিধবা বিয়ে চলে, তবে দ্রৌপদীতে পলিঅ্যাণ্ড্রী চলবে না কেন? তোমরা চালিয়ে নিলেই চলবে।"

করবী গম্ভীর হইয়া বলিল "তা যাই হোক ভাই, এক সঙ্গে তিনজনকে অবশ্য বিয়ে করা চলে না। তবে এটা ঠিক যে আমি যদি বিধবা হই তাহলে নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবো। বিধবা হয়ে আমি থাকতে পারবো না। বাপরে আমার সে মনে হলেই ভয় হয়। থান পরেচি, হাত দুটো শুধু, মাথাটা বেটা-ছেলের মতন করে ছাঁটা, তাও সবটা আবার সমান। একবেলা নিরামিষ্য ভাত খাওয়া, খালি গা, গায়ে একটু সাবান নেই, গন্ধ তেলটুকু মাথায় দিলুম তো পড়সীতে চোখ ঠেরে একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে নিলেন! বাপ্‌ সে আমি সইতে পারবো না বাপু! পুরুষরা যদি তিনবার পাঁচবার করতে পারে তখন আমরা মোটে দু-বারই বা পারবো না কেন? আমি করবো।"

"তা করিস এখন রাম না হতে রামায়ণ বা কেন? আচ্ছা কেকি পার্ট নিলে বল? জয়সিংহ কে হলো?"

"জয়সিংহের পাট ভাই জুয়েলকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল পারলো না বলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে বিউটিকে দিলেন। বিউটি খুব সুন্দর করলে। আর তাকে মানিয়েও ছিল বড্ড!"

"তাতো মানাবেই বেশ লম্বা ছিপছিপে কি না। আচ্ছা—গুণবতী?"

"গুণবতী হলো অচলা যেমন চিপির মতন চেহারা তেমনি উপযুক্ত পাট, নক্ষত্র-রায়ের পাট জুয়েল নিলে, গোবিন্দ মাণিক্যতো সুরমা দি'র ভাগ্যেই নাচছিল, অমন জাঁকালো চেহারা আর কোথায় পাবে? তারপর ইন্দুলেখা হয়েছেন রঘুপতি।

কিন্তু ভাই, আমার কিছু ভাল লাগছে না, একি আর অ্যাক্‌টিং! ওসব জুয়েল ফুয়েলের কি এসব কর্ম্ম! যদি সত্যিকারের জয়সিংহ রঘুপতিকে আনা যেত। নাঃ আমাদের মতন একঘেয়ে বাস্তব মানুষের চাইতে কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা হওয়া ঢের ভাল! হাসিস্‌ নি, যা! তুই যেমন আদ্যিকেলে বদ্যিবুড়ি; তুই কি বুঝবি, পাছে কোন পার্ট টার্ট ঘাড়ে চেপে বসে, পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছিস, তোর কাছে দুঃখ করাও যা, আর অরণ্যে রোদন করাও তা।

"আমি একলা চলেছি ভেসে এ ভবে
আমার পথের সাথী কে হবে?"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গান

—✽—

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
নিয়োহে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা
পিয়োহে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ান বহিয়া সারা রাত্রি ধরে,
লহ তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয় ॥

বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্প সুবাস।
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

স্বরলিপি।

—•:✽:•—

না - ধনর্সা না। ধপা -া।

I না ·া না। র্সা -া। ·পা -া পধা -পা ধা। ণা -র্রা। র্র র্সা -া I র্সাণা -া ধা। পধা -পা।

বে ০ দ না ০ য়্ ● বে ● ০ দ না য়্ ভ ● রে ● গি য়ে● ●

। মগা -রা I গা-া মা। পা -া। -া -া ॥ I মা গা মা। মা-ণা। ণধা -না I না -া না।

ছে ০ ● পে ০ য়া লা ● ● ০ নি য়োঃ হে নি ০ য়ো ০ বে ০ দ

। র্সা -া। -া I {র্সা র্সর্গা র্গ। র্রা - র্গর্রা। র্রর্সা -র্সা I (র্সনা -র্সা -া। ·া ·া। -া -া)} I

না ০ ● য়্ হৃ দ য় বি ০ ০ দা ● ০ রি ● ০ ০ ● ● ০

র্স র্না -া র্সা। না -র্সা। র্স ধা -না I পধা - পা ধা। ধর্সা -া। -া -পা I পা পা ধা। ণা ·ণর্রা।

রি • হ য়ে • গে ০ ল • • ০ ঢা লা • • • পি য়ো হে পি • •

। র্সা -া I [ ] I

য়ো •

II { পা ধা ধা । ধা -া । ধা -না I না -া -া । র্সা -া । র্সা -র্রা I র্না -া না । র্সা -া ।

ভ রা সে পা • জ্ঞ • তা • • রে • বু • কে • ক রে •

। -া -া I র্সা র্গা র্গা । র্গা -া । র্গা -র্মা I র্গর্মা -র্পা র্মা । র্গা -র্রা । র্সা -র্রা

• • বে ড়া ন ব • হি • য়া • • সা রা • রা •

I র্না ধা না । র্সা -া । -া -া } না -র্সরা র্সা । র্সা -র্ণা । ণা -ধা পা ধা ধপা । মগা -রা ।

ত্রি • থ রে • • • ল • ও তু লে ০ ল ও আ জি নি শি • •

। গা -া I মা -া পা । গা -া । মা -া I -া -া পা । পা -র্সা । -পা -না II

ভো • রে ০ প্রি য় ০ হে • • • প্রি য় • • •

II { সা -া রা । গা -া গা গ I মা -া -া । -া -া । -া -া I মা পা পা । পা পা । পা -া I

বা ০ সা না র্ র • ঙ্গে • ০ • • • • ল হ রে ল হ রে •

I পা ধা পা । ধা -ণা । ণা -র্রা I র্সা ণা ণা । ণা -ধা । ধপ । ধণা I পধা ধপা পা । মা মা ।

র ঙী ন হ • লো • • ক রু ণ তো • মা ০ র্ অ • রু ণ অ ধ

। গাঃ -রগঃ I মা মধা ধপা । পমা -গা । মা -া } I { মা ধা ধা । ধা -া । ধা -না I

রে • • তো লো গো তো • লো • এ র সে মি ০ শা ক্

I না র্সা -া । র্রর্সা -না । র্সা -া I র্সা র্গা র্গা । র্গা -র্মা । র্গর্মা -র্পা I র্মপা -র্মা র্গা ।

ত ব • নি • • শ্বা স্ ন বী ন উ • ষা • র পু • ষ্ প

। র্রর্গা -র্রা । র্স -া I না -া না । না -া । র্সা -া I না নর্রা র্সা । র্সা -ণা । ণা -ধা I

স্থু • • বা স্ এ • রি প • রে ০ ত ব ০ আঁ খি র্ আ •

I পধা -পা মা । গা -া । মা -া I -া -া পা । পা -র্ম । পা -না II II

ভা • স্ দি য়ো ০ হে • • • দি য়ো ০ • •

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

আমেরিকান ধর্ম্ম

—•॥•—

পূর্ব্বে আমেরিকার জাতি ও বর্ণ-সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি, ইহা শ্রবণ করিয়া এ দেশের কেহ কেহ ভ্রূকুঞ্চণ করিয়া প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কি আমেরিকা খৃষ্টিয় ধর্ম্মের দেশ তথায় মানবের মধ্যে এবম্প্রকারের পার্থক্য কেন করা হয়? ইহা সত্য কথা যে আমেরিকা প্রবল খৃষ্টীয় দেশ এবং তথায় ধর্ম্মের হুজুগ অতি বেশী ও আমেরিকান খৃষ্টীয় মিশনারীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র খৃষ্টের পতাকা উড্ডীন করিয়া বেড়াইতেছে ও খৃষ্টের নামে মানবের ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতেছে তথাপি সেই দেশেই মানবের প্রতি এত অত্যাচার হয়! ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে কারণ খৃষ্টীয় চার্চ্চ বরাবরই গোলামীকে (slavery) বিশ্বাস করিয়াছে ও তাহা সমর্থন করিয়াছে St. Augustine বলিতেন দাসত্ব মানবের পাপের ফল ভোগ করা মাত্র।

আমেরিকা খৃষ্টিয় প্রধান দেশ। কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা নানাপ্রকারের সম্প্রদায় বিভক্ত বলিয়া constitution অনুসারে কোন সরকারী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ রাজশক্তি কোন ধর্ম্মকেই পোষণ বা পৃষ্ঠপোষকতা করে না। সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্মসম্প্রদায় constitution এর সর্ত্ত মানিয়া অবাধে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন ও আন্দোলন করিতে পারে। এই সর্ত্ত মানে হইতেছে যে সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান constitution এ মানা করা আছে যথা—পুরুষ ও স্ত্রীর বহু বিবাহ polygamy and polyandry); ধর্ম্মের আবরণে আদিরসাশ্রিত বীভৎস ব্যাপার ইত্যাদি তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক জীবনের অনুভূতি করা হইতে পারিবে না। এই বহুবিবাহ প্রচলিত করার জন্য মর্ম্মণ Mormon নামক একটি নবখৃষ্টীয় সম্প্রদায় জনপদ হইতে তাড়িত হইয়া উটরে (utah) মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ও অবশেষে রাজশক্তির তাড়নায় "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" পাইয়া সে অনুষ্ঠান রদ করিয়া দেয়! এইজন্যই প্রত্যেককেই তথায় রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ করিতে হয় ও পূর্ব্বে বহুবিবাহ প্রথা সমর্থনকারী ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচ্যদেশীয় লোকদের আমেরিকায় প্রবেশকালে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বহু বিবাহকারী নন।

আমেরিকায় খৃষ্টান ব্যতীত ইহুদি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। তৎব্যতীত আর

কাল নবভাবের নানাপ্রকারের সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতেছে। অবশ্য সংখ্যায় খৃষ্টীয়েরাই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিচ একশত মিলিয়ন (দশকোটি) বাসিন্দার মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই অখৃষ্টান এবং যাহারা আজকালের নানা প্রকারের নবভাবের আন্দোলনগুলির মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছেন তাঁহারাও সামাজিক বিষয়ে খৃষ্টীয় সমাজের অঙ্গীভূত থাকিলেও এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে কেবলমাত্র পঁচিশ মিলিয়ন খৃষ্টীয় চার্চ্চের তালিকাভুক্ত সভ্য! অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোক খৃষ্টিয় ধর্ম্ম সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া খৃষ্টান বলিয়া পরিগণিত হন কিন্তু সেই ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের আর কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, কেবল জন্ম, অনেক সময়ে বিবাহের বেলায়, ও মৃত্যুর সময়ে ধর্ম্মযাজকের শরণাগত হন! ইহার মানে, সমগ্র সুসভ্যদেশে যে প্রকারের মানসিক অভিব্যক্তি হইতেছে যে মানব তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত ব্যাপার করিয়া লইতেছে ও ধর্ম্মের আচারগুলিকে অবশ্যকর্ত্তব্যীয় সামাজিক কর্ম্মের বেলায়ই স্মরণ করে, আমেরিকায়ও সেই অভিব্যক্তির স্ফুরণ হইতেছে। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও অনুদারতা প্রত্যহ জীবনের কর্ম্ম হইতে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে ও এক জাতীয়ত্বের শক্তির পরিস্ফুরণ হইতেছে। কিন্তু এই পঁচিশ মিলিয়নই ধর্ম্মের নামে দেশে বিষউদ্গার করিতেছেন ও বহির্দ্দেশেও তাহা ছড়াইতেছেন! আমেরিকার আধুনিক আদমশুমারিতে দৃষ্ট হয় যে, লোকসংখ্যার অনুপাতে খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী; কিন্তু এই ঘটনা প্রটেষ্টান্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি-সঞ্চার করিয়াছে! শেষোক্তেরা বলেন যে, যুক্তসাম্রাজ্যের constitution প্রটেষ্টান্ট ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয় কিন্তু আজকাল রোমান ক্যাথলিকেরা সংখ্যাধিক্য জন্য শাসনবিভাগের সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতেছে ও ক্রমশঃ রাজশক্তিকে করায়ত্ত করিয়া তদ্দেশকে ক্যাথলিক ষ্টেটে (state) পরিণত করিতে চায়! অবশ্য এই ভীতির কতকটা অসত্য ও কতকটা অমূলক ভীতির উপর স্থাপিত! কারণ constitution কোন বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মের উপরে ভিত্তিস্থাপিত নহে, যাঁহারা ইহা রচিত করিয়াছিলেন তাঁহারা অতি উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা "মানবের স্বাধীনতার" কথাই বলিয়াছেন। তবে কথা এই যে, "আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতার', জন্য যে সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশিকেরা উত্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাই সংখ্যায় বেশী ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে সব ডাচ্ সুইড, জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকেরা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারাও তদ্রূপ। তৎপরে আমেরিকার "চার্চ্চ" প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই সব কারণে

দেশে এতদিন এই সম্প্রদায়েরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নির্য্যাতিত আইরিশ, দরিদ্র ইটালিয়ান, আষ্ট্রীয়ান, পোল প্রভৃতি রোমান ক্যাথলিক দেশসমূহ হইতে ঔপনিবেশিকের প্রবল বন্যা আমেরিকায় প্রবেশ করিতেছে। বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ঔপনিবেশিক সম্পর্কীয় রাজকীয় বিভাগের (Immigration Department) রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ হইতেই বিশেষভাগ ঔপনিবেশিকের বন্যা আসিতেছে এবং ইহা ক্যাথলিক-প্রধান বন্যা। এই প্রকারে আজ যুক্তসাম্রাজ্যে প্রটেষ্টাণ্ট হইতে রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা বেশী হইতেছে ও এই সম্প্রদায় তাহার ধর্ম্মযাজকদের বিশেষ অনুগত। তৎপর এই ধর্ম্মযাজকেরা বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের বিপক্ষে বাদী কারণ তাহা নাকি বাইবেলের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করে! এই জন্য নাকি ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা বর্ত্তমানের যুক্তিবাদপূর্ণ চর্চ্চা ও বিজ্ঞানের ঘোর শত্রু ও তাঁহারা আমেরিকায় এই চর্চ্চার মূলচ্ছেদ করিতে চাহেন! অন্ততঃ অনেক প্রটেষ্টাণ্টের মনে এই ভীতিই জাগরিত আছে ও তাহা লোকসমাজে সঞ্চারিত করেন। যুক্ত সাম্রাজ্যের Wisconsin ষ্টেটের কোন গ্রামে আমায় একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এই ভীতির কথা উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তৎনিকটবর্ত্তী কোন স্থানের হাই স্কুলে Biology পড়া হইত বলিয়া তথাকার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক তাহা বন্ধ করিবার জন্য আদালত দিয়া নোটিশ জারি করিয়া তাহা রদ করিয়া দেন! অবশ্য ইহার মূলে যে আসল ব্যাপারটি তাহা উক্ত ভদ্রলোকের কাছ হইতে জানিতে পারি নাই। এই ক্যাথলিক-ভীতির দৃষ্টান্ত যিনি আমায় দিলেন, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টান নন বরং কতকটা বোধহয় থিওসফিক মতাক্রান্ত। এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় উপস্থিত যুগে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাকে স্বীয় সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষতাকে লোক-কল্যাণ ও সভ্যতার অন্তরায় বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট সমাজ হইতে ডারউইনের জীবের অভিব্যক্তিবাদের শিক্ষাকে (Principle of Evolution) শিক্ষাগার হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যে বিপক্ষতাচরণ হইতেছে, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, ধর্ম্মের সংকীর্ণতা ক্যাথলিকদের একচেটিয়া নয় এবং প্রটেষ্টাণ্টেরাও এ বিষয়ে বাদ পড়েন না!

এই ক্যাথলিক ভীতি ইউরোপের "ইহুদি-ভীতির" ন্যায়! ইহা কতটা বাস্তব তাহার সত্যতার নির্দ্ধারণ করা যায় না, এবং ইহা যে কতকটা সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-বিজড়িত তাহাও একেবারে-অস্বীকার করা যায় না। যদি অতীত

যুগে ক্যাথলিকেরা অগ্রগমনশীল সভ্যতার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, প্রটেষ্টাণ্টেরাও তাহা করিতে বাদ যান নাই, তৎপরে উভয় সম্প্রদায় উভয়কে নির্য্যাতন করিয়াছে ও পুড়াইয়া মারিয়াছে। যদি রোমান-ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চ (Greek ortho-dox church) বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের সভ্যদের অজ্ঞানতার তিমিরে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চও অতীতে এ বিষয়ে কম বিপক্ষতাচরণ করে নাই কিন্তু যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই বলিয়াই এক্ষণে নতশির হইয়াছে; তথাপি আজও এই সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সমাজের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে প্রতিপদে বাধা দিতেছে এবং সমাজকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বলিতেছে—এই পর্য্যন্ত, আর বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে না; এই জন্যই সমাজ-সংস্কারক ও সমাজ-বৈপ্লবিক দলসমূহের সহিত এই সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধ ঘটিতেছে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সময় খৃষ্টীয় চার্চ্চ প্রতিপদে বিজ্ঞানের বিপক্ষতাচরণ করিয়া আসিয়াছে এবং অবশেষে একটা রফা করিয়াছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্ম্মের প্রতিকূল সমালোচনা করিবে না, বৈজ্ঞানিক নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসে স্বীয় হৃদয়-কন্দরে নিভৃতভাবে রাখিবেন আর বাহিরে ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবেন, তথায় ধর্ম্মের সমালোচনা করিবেন না। ইহার ফলে এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনের ভাব Faradayর ন্যায় হইয়াছে। যিনি বলিয়াছিলেন যে "আমি আমার ধর্ম্মবিশ্বাস জামার এক পকেটে আর বিজ্ঞান চর্চ্চা অন্য পকেটে রাখি"! অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক যদি ছাত্র মহলে প্রকাশ্যভাবে নাস্তিকতা বা প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহা হইলে তাঁহার তথায় স্থান নাই।

আমেরিকা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রধান দেশ অর্থাৎ তথায় সর্ব্বলোকে চার্চ্চের সভ্য না হইলেও তৎধর্ম্মের হুজুগ তথায় বিশেষ প্রবল। নাস্তিককে লোকে শ্রদ্ধা করে না। "Age of Reason"এর প্রণেতা বিখ্যাত Thomas Paine ইংরেজ হইয়াও আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতাসমরে সহায়তা করিলেও তিনি স্বাধীন চিন্তাবাদী বলিয়া তাঁহার নাম সেদেশে বিশেষ আদৃত হয় না। Ingersollএর দশাও তদ্রূপ। যাঁহারা খ্রীষ্টান নন তাঁহারা অন্য একটা কিছু বিশ্বাস করেন কিন্তু সমাজে চিন্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতার উপর লোকের শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু ইহাতে কেহ মনে যেন না করেন যে, আমেরিকায় নাস্তিক বা স্বাধীন ধর্ম্মমতাবলম্বী লোক বর্ত্তমান নাই, এ প্রকারের অনেক লোকই আছেন কিন্তু সে মত সমাজের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে না বরং নূতন ঢংএর

যে সব ধর্ম্মপন্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহাদের প্রভাব সমাজে অনুভূত হয়।

আমেরিকার খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ অতি আক্রমণশীল (aggressive)। গির্জ্জায় দেশ ত ছাইয়া পড়িয়াছে, তৎপরে বিদেশে সর্ব্বত্র মিশনারি পাঠাইতেছে। বিদেশে মিশনারি পাঠান বিষয়ে আমেরিকায় যত উদ্যোগ ও উৎসাহ দৃষ্ট হয় ও যত টাকা চাঁদা উঠে অন্য কোন খৃষ্টান দেশে এ প্রকার নাই। আমেরিকান চার্চ্চের বিশ্বাস যে, অন্য দেশ বিশেষতঃ অখ্রীষ্টান দেশ তাহার ধর্ম্মমত ও তৎসঙ্গে আমেরিকান সভ্যতা না গ্রহণ করিলে সে দেশের মঙ্গল নাই। অবশ্য চার্চ্চের ভিতরও দলাদলি আছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় বলে, তাহার মণ্ডলী পদ্ধতি উৎকৃষ্ট এবং বহির্জগতে তাহার অনুকরণ বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকান খ্রীষ্টান, বেশীর ভাগ লোকই Athanasian creed বিশ্বাস করে অর্থাৎ যীশুর ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক জন্ম ও মৃত্যুর পর কবর হইতে অশরীরে পুনরুত্থান ও স্বর্গে গমন বিশ্বাস করে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা দেন ও বাইবেলের অলৌকিক গল্পগুলির উপর নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস স্থাপন করেন না। আজকালকার শিক্ষিত খ্রীষ্টানেরা বাইবেলের সৃষ্টি, অনেকপ্রকার অলৌকিক ও অনৈসর্গিক গল্পগুলির সত্যতার ও যুক্তিযুক্ততার বিষয় তর্ক না করিয়া নীরব থাকেন এবং খ্রীষ্টের জীবনীকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহাঁরা খৃষ্টান ধর্ম্মকে social serviceএ পরিণত করিতে চাহেন এবং করিতেছেন। ইহাঁরা বলেন যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কর্ত্তব্য হইতেছে, লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত করা, পীড়িতদের সেবা করা, অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর করা, জনহিতকর কর্ম্ম করা এবং নৈতিক জীবনে খৃষ্টের উপদেশ মান্য করিয়া চলা। অবশ্য ইহাঁরা সাম্প্রদায়িক হিসাবে Athanasion creedএ বিশ্বাসী। হয়ত কেহ কেহ সে বিষয়কে পুরুষানুক্রমিক সামাজিক প্রথা বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ হয়ত তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেন আর কেহ বা অন্তরে তাহা মানেন না কিন্তু তাহা তাহার বংশগত সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া তাহার বিপক্ষতাচরণ করেন না। আবার এমন প্রকারের লোকও আছেন যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না কিন্তু সামাজিকতার জন্য স্বীয় বংশগত সম্প্রদায়ের গির্জ্জায় স্থান (pew) ভাড়া (reserve) রাখেন, তথায় পর্ব্বদিনে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেন কারণ পর্ব্ব দিবসে গির্জার ধর্ম্মোপাসনাও একটি সামাজিক ব্যাপার; সেদিন হয়ত অমুক স্ত্রীলোক গাহিবেন যিনি একজন বিখ্যাত Sopreno অথবা একজন Tenor গায়ক গাহিবেন। অবশ্য এই গায়কেরা ভাড়াটিয়া ওই দিনের জন্য নিয়োজিত হয়।

আমেরিকার খ্রীষ্টীয় সমাজকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ একদল অসভ্য এবং বর্ব্বর প্রকৃতির লোক-সমষ্টি যাহারা বেশীর ভাগ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুভূমির দিক বাস করে। ইহারা নামে খ্রীষ্টান কিন্তু প্রত্যহ জীবনে ধর্ম্ম ও নীতিশূন্য এবং অতি হিংস্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। Tennesse, Kentucky ষ্টেটদ্বয়ের পর্ব্বতের লোকেরা অতি বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর। তাহারা বর্ত্তমান আমেরিকান সভ্যতার বড় ধার ধারে না, যে ইংরেজি ভাষা কহে তাহাতে অনেক পুরাতন ও বর্ত্তমানে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহারা আমাদের আফগান সীমান্তের পাঠানদের ন্যায় মারকাট ও রক্তারক্তিতে সময় অতিবাহিত করে, ইহাদের অনেকে নাকি দ্বীপান্তরিত Scottish Highlanderদের বংশসম্ভূত। কোন কোন ভদ্রলোকের মুখ হইতে এমনও শ্রবণ করিয়াছি যে, খৃষ্টীয় মিশনারীদের প্রাচ্যদেশসমূহে প্রেরণ না করিয়া ইহাদের সভ্য ও খ্রীষ্টান করিবার জন্য নিযুক্ত করা বিধেয়! তৎপরে মরুভূমির কাছে যে সব লোক থাকে, তাহারা কেহ বা পশু উৎপাদন ক্ষেত্রে (Ranch) আর কেহ বা মরুভূমির canyon বা অন্যস্থানে থাকে তাহাদের জীবনও অতি ভীষণ। সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের কোমলতার ফল লাভে তাহারা বলিত, প্রয়োজন হইলে কেন নিষ্ঠুর কর্ম্মে তাহারা কুণ্ঠিত নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যাঁহারা সংখ্যায় সর্ব্বোপরি, তাঁহারা খৃষ্টান, ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে খৃষ্টীয় প্রথার সমস্ত খুটিনাটি মানিয়া চলেন। অবশ্য ইহাদের মধ্যে New Englandএর গোঁড়া puritan এবং presbyterian লোক হইতে উদার-হৃদয়ের লোক পর্য্যন্ত আছেন। এই গোঁড়ার দল ধর্ম্মসম্বন্ধে অনুদার হইলেও নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শের পতাকা ধরিয়াছেন এবং এই দলই প্রথমে আমেরিকার সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। আমেরিকান সভ্যতায় যে আজ ইংরেজি সভ্যতার স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে! যাহা দ্বারা আমেরিকান সভ্যতাকে ইংরেজি সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তজ্জন্য উভয় দেশের সভ্যতা ও চর্চ্চা একটি সাধারণ Anglo-saxon civilization বলিয়া উল্লিখিত হয় তাহা এই ইংরেজি ভাষী প্রথম যুগের Puritan, Presbyterian, Episcopalian প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। New Englandএর অনুদার ও গোঁড়া খৃষ্টানের দল যাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের নাম শ্রবণ করিতে পারে না এবং অখৃষ্টানদের নরক বাসের ব্যবস্থা করে তাহারা সেই ইংলণ্ডের fanatic (অনুদার) puritan উপনিবেশিকদেরই বংশধর। এই গোঁড়ার দলই অখৃষ্টানদের "সভ্য" করিবার জন্য মিশনারী পাঠাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে।

তৃতীয় শ্রেণী উদারমতাবলম্বী খৃষ্টানের দল। ইহাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উদ্ভূত এবং খৃষ্টানধর্ম্মে বিশ্বাসকারী। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বলিয়া বাইবেলের উদার ব্যাখ্যা দেন। ইহাদের মধ্যে নানাস্তরের উদারমত বিরাজ করে। সকলেই Athanasian creedএ বিশ্বাস করেন অন্ততঃ সেই মন্ত্র প্রার্থনার সময় আবৃত্তি করেন, কিন্তু তাহারও উদার ব্যাখ্যা করেন অখৃষ্টান দেশের মিশনারী প্রেরণের আন্দোলনটা অনেকটা ইহাদের হস্তে। ইহারা বলেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মেই জগতের মুক্তি অর্থাৎ যেহেতু খৃষ্টীয় দেশসমূহ জগতের সভ্যতার অগ্রভাগে গমন করিতেছে, তজ্জন্য খৃষ্টান social polity (সমাজ নীতি) মানবজাতির কল্যাণকর ও তৎধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ। অবশ্য খৃষ্টানধর্ম্ম অর্থে ইহারা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে বুঝেন, রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চ্চকে কুসংস্কারাপন্ন ও বিশুদ্ধ নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু ইহাঁরা মূলেই ভুল করেন যে, ইউরোপের কতিপয় দেশ ও আমেরিকার যে অংশ সভ্য ও উন্নত, তথায় যুক্তিপন্থাবলম্বী বর্ত্তমান সভ্যতা (rationalistic modern civilization) বিরাজ করিতেছে, ইহার স্ফুরণের ও প্রসারের বিপক্ষে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় কম লড়েন নাই! চার্চ্চ প্রতিপদে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নবভাবকে বাধা দিয়াছে কেবল উচ্চ শিক্ষিত লোকদের কর্ম্ম ও নির্য্যাতনের ফলে যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের *প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা*রই ফলে বর্ত্তমান সভ্যতা উপরোক্ত দেশসমূহে বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা খৃষ্টীয় সভ্যতা নহে, ইহা আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক, এই সত্যটি এই দল গোঁড়ামির জন্য দেখিতে চান না।

এইদল মিশনারীদের শিক্ষা দিবার জন্য নানাস্থানে theological seminary স্থাপন করিয়াছেন। তথা হইতে ছাত্রদের শিক্ষিত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জনসেবাকে ইহারা খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তজ্জন্য Philanthrophy Social Service কর্ম্মের উপর ইহারা বিশেষ নজর রাখেন। নিউইয়র্কের Union Theological Seminary মিশনারীদের একটি বড় কেন্দ্রস্থল। ইহাতে রোমান ও গ্রীক চার্চ্চ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের প্রটেষ্টাণ্টসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছে। এইসব Seminaryর দলই Y.M.C.A. ও মিশনারী movement চালাইতেছে। উপরোক্ত Seminaryর সভাপতি পরলোকগত Dr Cuthbert ভারতে খৃষ্টীয়নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য Hall Haskell lecturar রূপে আসিয়াছিলেন কিন্তু এদেশে আসিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ভাবে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার উপরোক্ত খৃষ্টান সেমিনারীতে স্বীয় পদ রাখা মুস্কিল হইয়াছিল, এবং ১৯১৩ খৃঃ দক্ষিণের

কোন মিশনারী কনফারেন্স ঐ সেমিনারীর বর্ত্তমান সভাপতি Dr. Brownকে heathen বলিয়া অভিশপ্ত করা হয় এবং এই সেমিনারী "Pantheism, Hinduism Vedentism প্রচার করিতেছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়! এই সেমিনারীর অনেক ছাত্রের সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে মিশনারী হইয়া আসিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহাদের মত উদার, অন্ম ধর্ম্মের বিষয় সংবাদ রাখেন, এবং আদৌ fanatic নহেন। ইহাদের মধ্যে একজনকে ইহাও বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে "আমি অন্যধর্ম্ম ও তাহার নেতাদের নিন্দা করিতে শিক্ষা করি নাই, সত্য সর্ব্বধর্ম্মেই আছে। ইহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে খৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অস্বীকার করিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ তাঁহারা Athanasion creed যাহা খৃষ্টান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র তাহাতে অবিশ্বাস করিতে শুনিয়াছি! এবম্প্রকারের একজন ভদ্রলোক Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ের Theological বিভাগে Christian Theologyর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে জাপানে মিশনারী ছিলেন। ইঁহাকে আমি প্রায়ই ঠাট্টা করিতাম, যে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পর্য্যটকেরা প্রাচ্যে ২৪ দিনের ভ্রমণান্তর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন এবং তৎদেশসমূহ সংস্কারের ব্যবস্থা করেন, তিনি তদ্রূপ কিছু লিখিয়াছেন কি না? উত্তরে তিনি লজ্জায় বলিতেন যে "আমি বৎসর কতিপয় জাপানে ছিলাম বটে কিন্তু তৎদেশ জানিনা এবং কোন পুস্তকও লিখি নাই!" ধর্ম্ম বিষয়ে ইতি প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম্ম আদৌ বিশ্বাস করেন না, যীশুকে কেবল একটি আদর্শ চরিত্রের পুরুষ বলিয়া মানেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে একজন Unitarian মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহারা সকলেই Evengelical Churchএর সভ্য অর্থাৎ তথাকথিত নৈষ্ঠিক খৃষ্টান সমাজের সভ্য। ইঁহারাই খ্রীষ্টান সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে উদার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এবম্প্রকারের লোক অতি কম সংখ্যক। আবার এই শ্রেণীর মধ্যে আর এক ছাঁচের লোক আছেন যাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার কালে আমার Alma Materএর দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক Charles Grey Shawকে গ্রহণ করিতেছি। ইনি ইঁহার "Precints of Religion নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে যদ্রূপ পুরাকালে সেমিটিক ধর্ম্ম (হিব্রুধর্ম্ম) ও আর্য্যচর্চ্চার (গ্রীক) সন্মিশ্রণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ বর্ত্তমানে ও শেষোক্ত ধর্ম্ম আর্য্যচিন্তার (হিন্দুধর্ম্ম) প্রভাবের সন্নিধানে আসিতেছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রতীচ্যেরা আর্য্যভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্ব ধর্ম্মের নীতিতেই এক কথাই ব্যক্ত হইয়াছে,

আর খৃষ্টান ধর্ম্ম সেমিটিক ধর্ম্ম ও আর্য্য-চিন্তার সমবায়ে সংসৃষ্ট অতএব বর্ত্তমানেও ইহা আর্য্যভাব গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু এই সমবায়ের ফলে খৃষ্টীয় নীতিতে ধর্ম্ম-নীতির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইনি নিজে একজন Theologician কিন্তু খৃষ্টনীতির ব্যাখ্যাকালে বাইবেলের গল্পগুলি ভুলিয়া যান কেবল মানব-জীবনের নীতির কথারই চর্চ্চা করেন।

এই সব প্রকারের লোকই খৃষ্টীয় Evangelical Churchএর মস্তক স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন ও missionary movement চালাইতেছেন কিন্তু এবম্প্রকারের লোক বোধ হয় এদেশে আসেন না। বেশীর ভাগ মিশনারী যাহারা প্রাচ্যে আসেন তাঁহারা Chauvinist. মিশনারী movement কিরূপে chauvinismএর ছায়ায় রহিয়াছে এবং উপরোক্ত উদারনৈতিক লোকেরাও কেন মিশনারী হন তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বছিরের দরগা

—:•:—

এর একটু ইতিহাস আছে।

বিশু জন্মিয়াছিল বাগ্দীর ঘরে। কিন্তু তার মা ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিশ্চিত ধারণা যে সে ছিল পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ, কোন পাপে বাগ্দীর ঘরে আসিয়া এবারে জন্ম লইয়াছে। এই ধারণার কারণও ছিল, পাঁচ বৎসরে পড়িয়াই বিশু একদিন বলিল, "আমি মাছ খাব না।" মা প্রথমে প্রহারের চোটে তাকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশু টলিল না। অগত্যা মাকেও এই জেদী ছেলের জন্য নিজের পরম প্রিয় খাদ্য মৎস্য ত্যাগ করিতে হইল। আরোও একটু বড় হইলে বিশু জেলে বাড়ী হইতে একটা ছোট ঢোলক জোগাড় করিয়া সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায়

"জয় রাধা গোবিন্দ" "ভজ গৌরাঙ্গ" গাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। মা বিরক্ত হইল; বিশুর সমবয়সী কেষ্ট ঘোষাল বাড়ী-গরু চরাইয়া মাসে নগদ এক টাকা উপার্জ্জন করে অথচ তার ছেলে মায়ের দুঃখ বোঝে না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই! ভগবানের নাম-কীর্ত্তন—তাহাতে বাধা দিলে মহাপাপ! কাজেই নিরুপদ্রবে বালক বিশ্বনাথ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পর বিশু যে কাজে হাত দিল তাহাতে সে যে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এই সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। এমন কি পাঠশালায় পণ্ডিত তারণ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন, "দেখ বাগ্দী বউ, এই জলজীয়ন্ত বামুনের কথা। তোমার ছেলে ম'রে আবার বামুন হবে।"

মা কাণে হাত দিয়া কহিল, ষাট্ ষাট্! ব্যাপার এই। বিশু রথ দেখিতে ভিন্ গাঁয়ে গিয়া এক নূতন বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের কাজ দেখিয়া আসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মাথায় তার খেয়াল গজাইয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া মাকে কহিল, "আমি হরিমন্দির গড়্‌ব, তুই পয়সা দে।" মন্দির গড়িতে কতটা পয়সার দরকার, তাহা হাতে গণিয়া ও কুড়ি হিসাবে বিশুকে বুঝাইয়া ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিরক্ত হইয়া বিশুর মা বিড়াল তাড়াইবার লাঠি দিয়া বিশুর পিঠে দু'ঘা বসাইয়া দিল।

ইহাতেও বিশুর সঙ্কল্প টলিল না। ভোর না হইতেই সে একটা ঝাঁকা মাথায় করিয়া গ্রামের বাহিরের ভাঙ্গা শিবমন্দির হইতে সুরকী সংগ্রহ আরম্ভ করিল। দেব-স্থানের মাটী পায়ে লাগিবে বলিয়া মা প্রথমে তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল; অবশেষে প্রহার। বিশু চড় চাপড় বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মন দিল। এইবার বিশুর মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরণ লইল; তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধান বাগ্দী বৌ, ভগবান্ ওকে দিয়ে তাঁর কাজ করাচ্ছেন। বাগ্‌ড়া দিস্‌নে।" ইহার পর বিশুর মা আর পুত্রের সঙ্কল্পে বাধা দিল না।

(২)

সুরকী আসিল। কিন্তু বিশুর কল্পনা যতখানি উঁচু ছিল, সুরকীর দেয়াল তত উঁচু হইয়া উঠিল না। মাটি কাদা তুষ ও সুরকীর অপূর্ব্ব মিশ্রণে দেয়াল উঠিল দুই হাত। বিশুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। কলস গাঁয়ের মন্দিরের মত হইল না তো! রাত্রে বিশু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমনি একটা মন্দির গড়ে দে মা।" মা পুত্রকে ভরসা দিয়া বলিল, ছোট জাতের ছোট মন্দিরই ভালোরে বিশু। ডাকলে ঠাকুর এখানে আসবেন।"

পরদিন বিশু প্রাণপণে ঠাকুরকে তাহার ঢোলকের বাজনার সঙ্গে আহ্বান আরম্ভ করিল। ঠাকুর আসিলেন কিনা জানি না

কিন্তু পাড়ার মাতব্বর বৃন্দাবন ঠাকুর আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, দিনরাত ঢোলক বাজাইলে তিনি বিশুর কাণ ধরিয়া চৌকিদারের নিকট লইয়া যাইবেন। চৌকিদারের ভয়ে মা বিশুর ঢোলক কাড়িয়া লইল। অগত্যা বিশু কোথা হইতে ছোট একটি আঙ্গুরের বাক্স কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতেই তাল দিয়া ঢোলকের কাজ চালাইতে লাগিল আর মনে মনে কেবলই ঠাকুরকে তাহার ছোট মন্দির-টিতে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল।

সেদিন পূর্ণিমা। বৃন্দা ঠাকুরের বাড়ীতে রাস-মহোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর আসিয়াছেন, সমস্ত দিন বিশু গান গাহিল, "একবার এস এস হে," সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা-খানেক ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিতের ভঙ্গীতে বসিয়া ঠাকুরকে তার ছোট মন্দিরে আসিবার জন্য অনেক মিনতি করিয়া বসিয়াছিল এবং রাত্রে যে ঠাকুর আসিবেন তাহাতে আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখিতে পারিল না। কারণ পূর্ণিমার রাত্রেই ঠাকুর আসেন, এ কথাটি তাকে বলিয়াছিল তার মা।

মা বাতাসী তখন [illegible] ক'রে ঘুমাইতেছিল. বিশু ঠাকুরের [illegible] মনের প্রতীক্ষায় ঘুমাইতে [illegible] উৎসব-বাড়ীতে যখন কীর্ত্তনের আরম্ভের মৃদঙ্গধ্বনি উঠিল তখন বিশু অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাইরে আসিল। পদশব্দ শুনিয়া পাছে ঠাকুর পলায়ন করেন এই ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া তাহার মন্দিরে উঁকি দিয়া দেখিল—মন্দির শূন্য। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সে শয্যা লইল এবং সকালে মাকে জানাইল যে, ছোট মন্দিরে ঠাকুর আসিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে বড় মন্দির গড়িতেই হইবে। বড় মন্দির গড়িতে হইলে যে পদার্থটির সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাও বিশু শুনিল এবং সেই বস্তুটী সংগ্রহ করিবার জন্য পরদিন বারো বছরের ছেলে বিশু মাসিক তিনটাকা মাহিনায় কলস গাঁয়ের বাবুর বাড়ীর বাগানের কাজে ভর্ত্তি হইয়া গেল। কিন্তু একক্রোশ দূরে থাকিয়াও বিশু তাহার মন্দিরের কথা ভুলিল না। প্রতি শনিবার ছিল তাহার ছুটি—সেদিন সে আসিয়া মন্দিরে দীপমালা দিয়া পাঁচ পয়সার বাতাসার লোভ দেখাইয়া পাড়ার বাগ্দী ছেলেগুলাকে জড় করিত। মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত [illegible] নামকীর্ত্তনের শব্দে পাড়ার লোকের কাহারো চোখে নিদ্রা আসিত না।

[illegible]

[illegible] তাহার মাহিনা চুকাইয়া আরো একটা মোটা রকমের দান তাহার সহিত যোগ করিয়া বাবু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

বিদায় দিলেন। বিশু মন্দির-নির্ম্মাণের পুঁজি লইয়া গ্রামে ফিরিল।

অনতিকাল মধ্যে ইট সুরকীতে বিশুর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। গ্রামের লোক প্রথমে এতটুকু সন্দেহ করে নাই কিন্তু যখন বিশুর মার মুখে আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। বাগ্দীর ছেলে মন্দির গড়িতেছে! শাস্ত্র-ধর্ম্ম সব রসাতলে গেল! দুই একজন বিশুর মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বাতাসী ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিবর্ণ মুখে গৃহে ফিরিয়া বিশুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বিশু কহিল, "কিছু হবে না। আমি কালই পণ্ডিত মশায়ের পাঁতি নিয়ে আসব।" পণ্ডিত মহাশয় কলস গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, সে অঞ্চলে তাঁহার বিধানই প্রামাণ্য ছিল।

কিন্তু বিশুকে আর পাঁতি আনিতে হইল না সেই রাত্রেই বাতাসী কলেরার আক্রমণে ও ব্রহ্মশাপের ভয়ে ইহলোক ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। ভদ্র সজ্জনেরা কহিলেন—"শাস্ত্র না মান্‌লে এমনি হয়। ঘোর কলি এখনও হয়নি তো।"

মার মৃত্যুর পর বিশু দিন দুই খুব কাহিল রহিল। তার পর দ্বিগুণ উৎসাহে তার দলবল লইয়া মন্দিরের কাজে লাগিয়া গেল। বৃন্দা ঠাকুর ছিলেন গ্রামের মাতব্বর, তার উপর বিশুর বাড়ী ছিল তাঁরই বাড়ীর পাশে; বিশুর কার্ত্তন, সঙ্গীদের হরিধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতালের শব্দ তাঁহারই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত বেশী। ইহার পর বিশুর মন্দির উঠিলে তাঁহার বিগ্রহের প্রণামী কমিয়া যাইবারো ভয় ছিল, কাজেই এই বাগ্দী ছোঁড়ার উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিশু তখন বড় হইয়াছে—কাহারও ভ্রূকুটি সে গ্রাহ্য করিল না।

(৪)

মন্দির—যখন অর্দ্ধেক দূর উঠিয়াছে তখন এক ঘটনায় গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিল। রহিম মিস্ত্রির স্ত্রীর পূর্ব্ব-স্বামীর এক কন্যা ছিল। তার বিবাহ হইয়াছিল, দূর গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে। সে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। একমাস স্বামীর ঘর করিবার পর সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। রহিম তাহাতে মোটেই দুঃখিত হইল না, তার মিস্ত্রির কাজে একজন আপনার লোক জোগানদারের প্রয়োজন ছিল। আমিনা রহিমের সহিত বিশ্বনাথের মন্দিরের কাজ করিত। হঠাৎ কেমন করিয়া এই মেয়েটিকে বিশুর বড় ভালো লাগিয়া গেল। আমিনাও এই মিষ্টভাষী সুঠাম বাগ্দী যুবাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তার কৈশোরে তখন যৌবনের রং ধরিয়াছে। মনে ক্ষুধা ছিল বিস্তর। কোন কিছু বিচার না করিয়াই এই নবীন প্রণয়ীযুগল প্রেমের অর্ঘ্য দুই হাতে ধরিল।

একজন বাগ্দী আর একজন শেখ, এ বোধ উভয়ের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাগ্দী-পাড়ার যে দুই একটি রমণীর এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল তারা এই ব্যাপার-টিকে লক্ষ্য করিল, এবং সেখের বেটীর সহিত বিশুর এই অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতায় ধিক্কার দিল।

বাহিরের লোক কিছুই জানিত না, কাজেই কিশোর-কিশোরীর এই প্রেমলীলা অব্যাহত চলিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে বাবুর বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে বিশুর ডাক পড়িল। বিশু আসিল; গ্রামের বাবুরা চণ্ডীমণ্ডপ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, পাঁচ সাতটা কলিকায় যুগপৎ তামাক পুড়িতেছিল। শিঙ্গা বালিশ হেলান দিয়া বৃন্দ ঠাকুর, লাসন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাতব্বরেরা বসিয়াছিলেন; মণ্ডপের সম্মুখের প্রাঙ্গণে যুক্তকরে আমিনার মাতা, তার পশ্চাতে জনকয়েক তারই প্রতি-বেশী আর এক কোণে দাঁড়াইয়া আমিনা মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছিল। এই বৈঠক আর সেই সঙ্গে আমিনার মাকে দেখিয়া বিশুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দা-ঠাকুর কহিলেন; "কেষ্টঠাকুর এসেছেন। বেটা ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা ছ্যাখো না। মন্দির গড়বে না। বেটার পেট-পোরা সয়তানী মৎলব।"

"সেখের বেটী তোর নালিশ।" আমিনার মা দশ মিনিট ধরিয়া নানা কথা কহিয়া গেল। বিশু তার মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করিয়াছে, সে বিচার চায়!

বিশুর মাথা ঘুরিতেছিল, আমিনা শেষে তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, এই চিন্তা তার সমস্ত মনকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল, বিশু কথা কহিল না। আমিনা এতটা মনে করে নাই। মার মনে অনেক দিন হইতেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমিনার মার মনে পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ ছিল কিন্তু সে কিছু দেখিয়াও দেখে নাই। কাল সন্ধ্যায় যখন কানাঘুষার কথাটি শুনিয়া বৃন্দাঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন সে তার সন্দেহের কথা তাঁকে জানাইল। তার পর তাঁহারই পরামর্শ মত আমিনাকে প্রশ্ন করিয়া সকল সংবাদ জানিয়া লইল। আমিনা এতখানি ঘটবে তাহা ভাবে নাই, অকপটে মার কাছে সমস্তই বলিয়াছিল। তারপর আজ দ্বিপ্রহরে যখন স্বয়ং বৃন্দা-ঠাকুর তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমিনার মার সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া গেলেন, তখন অন্তরাল হইতে শুনিয়া ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল। বছের বাড়ীতে আসিতেও সে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু মা তাকে প্রহার করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সে আমিনাকে হাজির করিবার "জবান" দিয়াছে তা ছাড়া বৃন্দাঠাকুরের দেওয়া অগ্রিম দশ টাকার নোট তখনও অঞ্চলে বাঁধা ছিল, নেমক-হারামী সে কি করিয়া করিবে?

মার অভিযোগ শেষ হইলে যখন বিশু তীব্র অথচ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমিনার দিকে চাহিল তখন সে আরো বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিশুকে জবাবদিহি করিবার আদেশ হইলে বিশু একটি কথাও কহিল না। তার ছোটলোকের স্পর্দ্ধার জন্য যে শাস্তির বিধান আছে, তাহার একটু তৎক্ষণাৎ প্রযুক্ত হইল। লালন চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশ মত তাঁহার পাইক ফেকু সর্দ্দার বিশুর কাণ ধরিয়া সমস্ত উঠান ঘুরাইতে লাগিল, বিশু আপত্তি করিল না। কিন্তু আমিনা কিছু-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একেবারে ফেকু সর্দ্দারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মামুজী মাপ্ কর! মাপ্!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

কর্ণমর্দ্দন-পর্ব্ব শেষ হইলে বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "তা যেন হলো! তার পর এ মেয়েকে বিয়ে করবে কে? কি বল চৌধুরী, শেখের বেটী যে ইজ্জত-হানির নালিশ করেছে, তার কি করবে?" চৌধুরী চুপি চুপি কহিলেন "দু দশ টাকা দিয়ে বিশে বিদেয় করে দিক্!"

বৃন্দা ঠাকুর কহিলেন, "আরে বল কি, জাত-মারা কাণ্ড! দু-দশ টাকা! দু দশ টাকায় জাত ফিরবে?" তারপর আমিনার মাতাকে কহিলেন, "কি গো শেখের বেটী দু-দশ টাকা খেসারত নেবে?"

পূর্ব্ব শিক্ষা মত আমিনার মা কাঁদিয়া কহিল, "টাকায় কি ইজ্জত ফিরবে বাবু? আমার মেয়ে নিয়ে কে ঘর করবে? বাগ্দির পো আমার বেটীকে 'নিকা' করুক!" এত বড় সৎযুক্তিটা এতক্ষণ সমস্ত পঞ্চায়েতের মাথায় খেলে নাই দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "আমরা যখন আছি গাঁয়ের মাথা তখন বিচার করতেই হবে,—কি বল চৌধুরী? শেখের বেটী যা বলে।"

আমিনার মাতার পশ্চাৎ হইতে গুটি কয়েক কণ্ঠ সমস্বরে কহিল "হুঁ বাবুজী ঠিক্ হবে বিচার!"

তখন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আদেশ জারি হইল বিশুকে কলেমা পড়িয়া আমিনাকে বিবাহ করিতে হইবে।

কলেমা পড়িবার কথা শুনিয়া বিশু কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সম্মুখ হইতে মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া গেল। বিশু সংজ্ঞা হারাইল। কিন্তু বাবুদের পঞ্চায়েতের বিচারের নড়চড় হইবার যো নাই। অচেতনা বিশুকে লইয়া যাইবার হুকুম পাইয়া আমিনার মার প্রতিবেশীরা "আল্লা হো আক্বর" ধ্বনি তুলিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বৃন্দা ঠাকুর কহিলেন, যা বেটারা, নিয়ে যা, এখানে আর গোল করিস্ নে।

বিশুর চেতনা হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই; কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিবার মত জ্ঞান হইল এক প্রহর রাত্রে। দেখিল যে আমিনার মাতার কুটীরে সে বসিয়া আছে, তার পাশে বসিয়া

আমিনা তাকে পাখার বাতাস করিতেছে। মাথার উপর একটা ভারী পদার্থের অস্তিত্ব সে বোধ করিতেছিল—তুলিয়া দেখল সেটা একটা টুপী। মুহূর্ত্তের মধ্যে টুপীটা ফেলিয়া দারুণ অন্তর্দ্দাহের আবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সোজা চলিয়া গেল।

(৫)

"তার পর?"

পরের কথা অতি অল্প। সমস্ত রাত্রি পাড়ার লোক শুনিল, বিশু তার স্বরে সুর করিয়া ডাকিতেছে "জয় রাধে গোবিন্দ", তার সমস্ত দেহ-মন যেন এই সুরের রূপ ধরিয়া অপ্রত্যক্ষ দেবলোকে কোন্ অভীষ্ট দেবের সন্ধান করিতেছিল। সুরের বিরাম নাই। রাত্রি তিন প্রহর হইয়া গেল—গান থামিল না। ভোরের সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল, সেই সঙ্গে গানের সুর থামিল। পাড়ার লোক ছুটীয়া আসিল।

নিজের হাতে শাবল দিয়া খুঁড়িয়া মন্দিরের দেয়াল ফেলিয়া তাহারই নীচে বিশু আপনার সমাধি রচনা করিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল শুধু তার রক্তাক্ত সুদীর্ঘ কেশের গুচ্ছ।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা থামিয়া ব্যবস্থা দিলেন, ভাঙ্গা দেয়ালের উপর মাটী চাপা দিয়া বিশুর কবর দেওয়া হোক। ওই মাটীর ঢিবিটা তাই!

মসজিদে বিশুর নাম হইয়াছিল বছির, তাই ইহার নাম হইয়াছে, বছিরের দরগা।

আমিনা?

এই ঘটনার পরদিন বিশুর কবরের উপর শাবল দিয়া আপনার মাথা ভাঙ্গিয়া সেও মরিয়াছে। সে নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে পাগল হইয়া গিয়াছিল!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ মৈত্র

জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-পরিষদ

(শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

—:o:—

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর জীবন একটা কৃত্রিম পারলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহাতে পারত্রিক উন্নতি সাধিত হউক আর না হউক ঐহিক অবনতিতে জাতীয় জীবন যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহলোকের প্রতি অবহেলার প্রশ্রয়ে জীবনটায় একটা অগোছাল ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। কাণের কাছে যখন অষ্ট-প্রহরই শুনা যাইতেছে

চলচ্চিত্তং, চলৎ বিত্তং,
চলজ্জীবনযৌবনং!
চলাচলং ইদং সর্ব্বং!

তখন আর কার এই দুদিনের মুসাফিরির জন্য ঘরকন্না গোছাইবার সাধ হয়?

সাহেবদের প্রকৃতি কিন্তু আর-এক ধাতুতে গঠিত। যদি দুদিনের সংসার হয় কুছ্ পরোয়া নেই—এই দুদিনকেই শ্রমের দ্বারা আরামে সৌন্দর্য্যে বাঞ্ছনীয় করিয়া জীবন-যাত্রাকে উপভোগ্য করা যাক্। সিভিল সার্ভিস বা যে-কোন বিভাগের বড় বড় চাকুরে সাহেবদের এক সহর হইতে আর এক সহরে যখন তখন বদলি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাজান ঘর ভাঙ্গিয়া, ডেরা ডাণ্ডা তুলিয়া, তল্পিতল্পা উঠাইয়া স্থানান্তরে প্রয়াণের হুকুম তাঁদের যখন তখন আসিতে পারে জানেন, তাই বলিয়া তাঁহারা বা তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরা প্রতিবার কয়েকদিনের মাত্র অসীম শ্রম-সহকারে তাঁদের নূতন গৃহটি ও ঘরকন্না খানি পারিপাট্যে, পরিচ্ছন্নতায়, আরামোপকরণে ও লক্ষ্মীশ্রীতে মণ্ডিত করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হন না। ঠিক তদবস্থায় প্রায়শঃ বাঙ্গালী কর্ত্তাগিন্নীরা কিন্তু বাংলা বাড়ীর অধিকাংশ ভাগ অব্যবহারে ফেলিয়া রাখিয়া ইঁদুর বা চামচিকার হাতে সমর্পণ করেন এবং দুই চারখানা মাত্র ঘরে কাজ চালান গোছ মাদুর তক্তাপোষ বিছাইয়া—বড় জোর এক জোড়া চেয়ার ও একখানা টেবিলের আমদানি করিয়া কাজ সারিয়া লন—শুধু গিন্নির ভাঁড়ার ঘরটি রাশীকৃত পুরাণ কেরোসিনের টিনে, চায়ের টিনে ও সিগারেটের কৌটায় সুশোভিত হয়।

সাহেবদের চেয়ে ইহাঁদের ধনপ্রীতি যে কম তাহা বলিতে পারি না, আরাম বা ভোগস্পৃহাও যে কোন অংশে ন্যূন তাহা নয়—তফাৎ কেবল ভোগের আদর্শে বা জীবনের উপর সৌন্দর্য্যের প্রভাবের, এবং ভোগের যে একটি কলা আছে তাহার অনভিজ্ঞতায়, বা তাহা চর্চ্চার জন্য যে পরিশ্রমের প্রয়োজন সেই পরিশ্রম-বিমুখতায়। জাতীয় জীবন যাপনেরও একটি আর্ট বা কলা আছে। সেই কলামত জীবন নির্ব্বাহনে এক জাতি অপর দশটা জাতির দর্শনীয় হয় বা তাহার অভাবে নগণ্য হয়।

আছি যদি ত ভালমতই থাকিব। ঘরবাসীই যদি হইলাম ত ঘরখানা সুন্দর করিয়াই সাজাইব, ঘরকন্নাটা গোছালমত করিব,—তাহা কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ আর কিছুই নয়। প্রলয় যেদিন আসিবে সে দিন আসিবে—শাস্ত্রানুসারে ধর দশ সহস্র যুগের আগে ত আর নয়? অন্ততঃ এই দশ সহস্র যুগ পর্য্যন্ত মানব-জীবনের ধারা ত চলিবে? তাই সই। এই দশসহস্র যুগের মতই ঘরকন্না গোছাও, নিজেরাও ভালমত থাক, আর আগন্তুকদের জন্যও সাজাইয়া পাতিয়া রাখো। তারপর দীর্ঘ অনন্তকালের প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জনের সময় যখন আসিবে তখন আসিবে।

যে জাতি জাতীয় ইতিহাস লেখে, সে জাতি মানব জীবনটা ক্ষণিকের বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করে না। তাহার দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষ স্বল্পায়ু হইলেও জাতির আয়ু সুদীর্ঘকাল বিস্তৃত ইহা স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান্ হয়। জাতীয় জীবনে বাঙ্গালী এতদিনে সেই দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিকাশ তাহার প্রমাণ—আরও এক প্রমাণ বাঙ্গলার জেলায় জেলায় সাহিত্যপরিষদের উৎপত্তি।

সাহিত্য-পরিষদ বলিতে বুঝায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পাঠাগার ত আছেই, পুস্তক সংগ্রহ ত হয়ই—সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদান সংগৃহীত হয়—যথা মুদ্রা, প্রস্তর ফলক, মূর্ত্তি, কারুকার্য্য হস্তলিপি এবং ইমারৎ—এক কথায় জাতীয় ইতিহাস রচনার সর্ব্ববিধ উপকরণ।

প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের অর্থ জাতির পিছনে তাকান, আধুনিক তত্ত্ব সংগ্রহের অর্থ জাতির সম্মুখে তাকান। ঐ যে একটি সংস্কৃত শ্লোকের তিনটি পদ প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি—

চলচ্চিত্তং, চলৎ বিত্তং
চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং!

তার একটি চতুর্থ পাদও আছে, তাহা এই :—

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

এতদিনে বাঙ্গালী জাতি এই চতুর্থপাদে মনোনিবেশ করিয়াছে, তাই জেলায় জেলায় সাহিত্যপরিষদ প্রতিষ্ঠায় ও

বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সংগ্রহের এত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ স্থানীয় সাহিত্যিক স্মৃতিরক্ষাই সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য, গৌণ জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন গৌরবস্মৃতি সমুদ্ধার করিয়া কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান্ রাখা। এই উদ্দেশ্য-পালনার্থেই বোধ হয় শান্তিপুর সাহিত্যপরিষদ—"স্থানীয় বাগের মসজিদ বাগাঁচড়া গ্রামের চাঁদরায়ের মন্দির ও গৌড়ের অনেকগুলি কারুকার্য্য শোভিত মূল্যবান্ ইষ্টক" সংগ্রহ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে শান্তিপুরবাসীকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শান্তিপুর বাঙ্গলার বস্ত্রবয়ন বিস্তার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। শান্তিপুরী রেশমী পাড়ের সাড়ী ও মেয়েদের সূচের কাজ সমস্ত বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ ও আদৃত ছিল। যদি শান্তিপুরের সে কীর্ত্তি অতীতের বিষয় হইয়া থাকে তবে এখনও তাহার কতিপয় প্রকৃষ্ট নমুনা সংগ্রহ করিয়া রাখা এই পরিষদের উদ্যোক্তাগণের কর্ত্তব্যের বহির্ভূত হইবে না, এবং সে শিল্পবিদ্যা পুনর্জ্জাগ্রত করা যদি সম্ভব হয় তবে পরিষদের সে বিষয়ে সহায়তা করা অনধিকার-চর্চ্চা হইবে না।

এই পরিষদের কার্য্যবিবরণীতে শান্তিপুরের আধুনিক মৃতসাহিত্যিক ও বঙ্গসার মনীষীগণের ফটো ও পুস্তকসংগ্রহের তৎপরতা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শান্তিপুর যে মহাপুরুষের নামসংযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ধন্য হইয়াছে সেই অদ্বৈত গোস্বামী এবং তাঁহার গুরু শ্রীচৈতন্য দেবের স্মরণানুকূল কোন কথাই ইহাতে ব্যক্ত নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

একটি বিষয়ে বড় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি দ্বিজেতর তন্তুবায় তিলি প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সেবার দ্বারাই এই পরিষদের প্রাণ পরিপুষ্ট দেখিতেছি। আমাদের মাতৃভাষা যে জনভাষা সেই জনসাধারণের রচিত মাতৃমন্দির এটি—কেবলমাত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নহে। পথের দুধারের শ্যামলিমায় শোভিত বাঙ্গালীর এই প্রাচীন নগরটিতে আসিতে আসিতে মনে পড়িয়াছিল, জাতীয় জীবন-তরঙ্গে একদিন ইহার জড় শান্তি একভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল—সেদিন শ্রীচৈতন্যের ভাবোদ্বেগে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ দূরিত হইয়া বিষ্ণুপ্রেমে মিলিত এক ভারতসন্তান বৈষ্ণবের হরিকীর্ত্তনে গঙ্গা-তটবর্ত্তী এই নগরীর পথঘাট কানন প্রান্তর মুখরিত হইয়াছিল। আজ যুগ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হরিভক্ত বৈষ্ণব নহে, দেশভক্ত মাতৃসেবকবৃন্দ আজ দেশের নাভিকমল হইতে উত্থিত হইয়াছে। তারা নূতন যুগের ব্রহ্মা, তারা নূতন সৃষ্টি করিবে—দেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন জাতি তৈয়ার করিবে। সাহিত্য পরিষদগুলি তাহার এক একটি কারখানা গৃহ। আমি বলিয়াছি, সাহিত্যচর্চ্চা পরিষদের উদ্দেশ্য হইলেও জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন গৌরব-দৃষ্টিই উহার প্রধান লক্ষ্য। এই নগরে সাহিত্যপরিষদের উদ্যোক্তাগণ, জন্মভূমির

কোলের সন্তান সব—তোমরা এই সাহিত্য-পরিষদকে কেন্দ্র করিয়া ইহার দ্বারা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-সৌধ গড়িয়া তোল। যে সকল সংস্কারের বন্ধন মানুষকে, জাতিকে ও দেশকে সহস্র নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া ভবিষ্যতের এক স্বাধীন জাতির কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য প্রথম ইষ্টকখানি প্রোথিত কর। যে বর্ণমালাময়ী বাগীশ্বরী মা নরেন্দ্রের হৃদয়ে ও কণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার যে সাধকগণ কর্ত্তৃক আজিকার সভায় নেতৃপদে বৃত হইয়াছি, তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সর্ব্বার্থসিদ্ধি-ময়ীর নিকট তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের ও নবযুগের ভারতবাসীর পূর্ণসিদ্ধি কামনা করিতেছি।

শ্রীসরলা দেবী।

ঊনপঞ্চাশী

—:০:—

শাস্ত্রীয় বিচার

সে দিন ছিল রবিবার। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গবার পর বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে পড়ে গেল আজ ছুটি! আঃ—বিছানা ছাড়তে আর ইচ্ছা হলো না। পাশ-বালিশটাকে খুব আদর করে জড়িয়ে চক্ষু বুজে পড়ে রইলুম, আর মনে মনে জপ করতে লাগলুম—আজ ছুটি, আজ ছুটি, আজ ছুটি! অনেক রকম উপভোগ করে দেখেছি—কিন্তু রবিবার বেলায় চক্ষু বুজে চিৎ হয়ে (এ... তারা প্রকাণ্ড ... চায়, আর তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি করে স্বর্গে যাচ্ছে। এদের একের সঙ্গে করে বলতে পারি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে বর্ণনা করেছেন—ভগবান ক্ষীর-সমুদ্রে চিৎ হয়ে চক্ষু বুজে শুয়ে আছেন এ কথা আমি হাড়ে হাড়ে বিশ্বাস করি। অন্ততঃ আমি ভগবান হলে যে তাই করতুম তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবানের বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করছি এমন সময়—"কড়াং কড়াং কড়াং কট্ কট্ কট্—দাদা, দাদা, বাড়ীতে আছ?"

লে বাবা! রবিবারে ছুটির দিন—যে এই অর্দ্ধখানি ভগবানের মহিমা ধ্যান করবো

আমি বললুম—"তা ত জানিনে ভাই। কোন্

পাষণ্ড এসে উপস্থিত ! একবার মনে হলো চুপটি করে পড়ে থাকি, বিপদ আপনা আপনি কেটে যাবে, কিন্তু তা হয়ে উঠলো না। ওদিকে আবার আরম্ভ হলো — খট্‌ খট্‌ খটাং, খট্‌ খট্‌ খটাং। ও দাদা, দাদা গো !

না :—সংসার যে অনিত্য তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই দুঃখেই বুদ্ধদেব বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিছলেন। আর এই ছোঁড়াগুলো—এইগুলোই বা কি রকম পাজি। সকাল বেলা মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়াবে, একটু দয়া নেই, মায়া নেই। গবর্ণমেণ্ট যে এদের anarchist বলে' ধোরে জেলে পুরে দেয়, তা ঠিকই করে দেখতে পাচ্ছি। ভোর বেলা যারা লোকের ঘুম ভাঙাতে পারে তারা নিশ্চয়ই খুন করতে পারে। তারা outlaw নয় ত কি ?

দরজা খুলে দেখি পণ্টু আমার দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে তার আধ ডজন ফৌজ।

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। আমি বল্লুম —"হাঁরে পণ্টু ! তোদের কি একটা পরকালের ভয় নেই ? ভোর বেলা মানুষ একটু ভগবানের নাম করবে, তোরা তাও করতে দিবি নে ?

পণ্টু তেমনি দাঁত বের করে বল্লে— "তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি ? ভগবান ত আর পালিয়ে যাচ্ছেন না, আর শুধু শুধু তাঁকে ডেকে ডেকে ব্যস্ত করবার ...

... হইয়া দেশে দেশে ধন্য হইয়াছে সেই অদ্বৈত গোস্বামী

যখন তখন ডাকাডাকি করলে তিনিও ত চোটে যেতে পারেন !"

আমি ভেবে দেখলুম—পণ্টু ছেলেটার বুদ্ধি আছে ! ভোরবেলা ডাকাডাকি করে ঘুমন্ত ভগবানকে জাগিয়ে তুলে শেষে হয়ত পস্তাতে হবে। কাজ কি, বাবা, গোলমালে ?

পণ্টু বল্লে—'গোঁসাইজীর ওখানে এখনি যেতে হবে, একটা মিটিং আছে। হিন্দু-মুসলমানে কি করে মিল হয় তার আলোচনা হবে। গোঁসাইজী বলে দিয়েছেন আপনার আসা চাই-ই চাই।'

যখন চাই-ই চাই তখন আর কথা কি ? চটি জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঠুক ঠুক করে বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় গিয়ে দেখি—রামা, শ্যামা, যদো, মধো, ক্যাবলা সবাই উপস্থিত, আর তার মাঝখানে একটা হারমোনিয়াম কোলে কোরে বসে আছে আমাদের নদের চাঁদ কাজী।

আমাকে দেখেই নদের চাঁদ তার একটা আকাশ জোড়া হাসি হেসে দিয়ে গান ধরে দিলে—

'কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ !

'হিন্দু না ওরা মুসলিম' ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন

* * *

কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পণ ? ...

... জাবনের সর্ব্বাঙ্গীন গৌরব-দৃষ্টিই উহার প্রধান লক্ষ্য। এই নগরে সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোক্তাগণ, জন্মভূমির

ইঙ্গিতটা আমি বুঝলুম। বললুম—"নদের চাঁদ, ভাই আমার, কে হিন্দু, কে মুসলমান, এ কথা আমি ত তুলিনি। যারা তুলেছে তারা তার মীমাংসা করুকগে। হিন্দু কাকে বলে তাও আমি জানিনে, মুসলমান কাকে বলে তাও আমি জানিনে। আমি মানুষ, তাই মানব ধর্ম্ম বোলে একটা জিনিস মানি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে, তাও স্বীকার করি। কিন্তু হিন্দু আর মুসলমান বোলে যে একটা কোন ধর্ম্ম বা প্রকৃতি-গত ভেদ আছে তা মোটেই জানিনে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মধ্যে আমি নেই।

ক্যাবলা বলে উঠল—'বা, বাবা, এক কথায় সব ফাঁস করে দেবার চেষ্টা! এত দিন পরে বলে কিনা হিঁদু-ধর্ম্মও নেই, মোছলমান ধর্ম্মও নেই!'

পন্টু বল্লে—'ফাঁকি দিলে চলবে না, ওস্তাদ। নেই বললেই ত আর ওগুলো উড়ে যাচ্ছে না। এই যে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওগুলো তা হলে কি?"

আমি বললুম—"ওগুলো আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, পোষাক, পরিচ্ছদ, ভাষা, অহঙ্কার, এই সব নিয়ে দলাদলি। যারা মারামারি করছে তাদের সবাইকার ধর্ম্মই এক, তারা হচ্চে মুর্খ অহঙ্কারী মানুষ। তারা প্রতিপত্তি চায়, বাহাদুরি চায়, প্রকাণ্ড দল পাকিয়ে মোড়লী করতে চায়, আর তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি করে স্বর্গে যাচ্ছে। এদের একের সঙ্গে অপরের প্রকৃতিগত তফাৎ ত দেখতে পাচ্ছিনে। কাজেই এটা ধর্ম্মের বিরোধ নয়। তবে এই মারামারির মধ্যে যদি দেখি দুর্ব্বলের উপর অন্যায় অত্যাচার হচ্চে, তা হলে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দু কথা বলি। সে সব কথা হিন্দুর বিরুদ্ধেও নয়, মুসলমানের বিরুদ্ধেও নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বুঝলে কাজী ভায়া, পথ ঠিক রাখবার জন্যেই ও-সব কথা বলতে হয়।"

নদের চাঁদ খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর নিতান্ত ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—'তা হলে হিন্দু-মুসলমানের মিল কি হবে না?'

আমি বললুম—'হবে না কেন? যাঁরা এই সব দলাদলির শিক্ষাগুরু, যাঁরা ইহকাল সম্বন্ধে নিরেট মূর্খ-হলেও মনে করেন যে, পরকাল সম্বন্ধে সব বিদ্যে তাঁরা মেরে দিয়েছেন, যাঁদের বিশ্বাস যে ভগবান সব তত্ত্বকথা একখানা পুঁথির ভিতর পুরে তাঁদের কাছে জিম্মা করে দিয়েছেন, যাঁরা অহঙ্কারের বশে মনে করেন যে, তাঁরা ছাড়া আর সবাই হয় কাফের, না হয় ম্লেচ্ছ, তাঁদের অহঙ্কারের মাত্রা একটু কমলেই আপাততঃ কাজ-চালানো-গোছের মিল হতে পারে।'

নদের চাঁদ বললে—'তা ঠিক, কিন্তু এই অহঙ্কার কমে কিসে।'

আমি বললুম—"তা ত জানিনে ভাই।

অহঙ্কার কম'বার কোন পেটেন্ট মেশিন যে বাজারে বিক্রি হয় তা দেখিনি। তবে একটা ফন্দি আমার মাথায় মাঝে মাঝে গজায় সেটা যদি কাজে লাগিয়ে নিতে পারো, তা হলে হয় ত বা কিছু হলেও হতে পারে।"

পল্টু লাফিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি ফন্দি, দাদা!"

আমি বললুম—'প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভাড়া করো, আর দেশের হাজার পাঁচ ছয় বড় বড় মৌলবী, মৌলনা আর পীর সাহেবদের সেখানে নিমন্ত্রণ করে পাঠাও। সঙ্গে সঙ্গে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ, ভটপল্লী, বিক্রমপুর থেকে বাছা বাছা স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবাগীশ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে বিদায়ের লোভ দেখিয়ে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও। আর এই দুদলকে প্রকাণ্ড সেই বাড়ীটার মধ্যে পুরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দাও। দরজার পাশে জনকতক ছেলেকে খেঁটে লাঠি হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও, আর বলে দাও যে কোন ভট্টচায্যি মশায় বা মৌলবী সাহেব হিন্দু-মুসলমান মিলনের একটা ব্যবস্থা হবার পূর্ব্বে পালাবার চেষ্টা করলেই তার মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া হবে।'

নন্দের চাঁদ হো হো করে হেসে উঠলে, বললে, 'এ ব্যবস্থায় আমি খুব রাজী। কিন্তু ভিতরে মিলনের কি ব্যবস্থা হবে তা উঁকি মেরে দেখবার কোনও উপায় থাকবে না?'

আমি বললুম—'সেটা অনুমান করে নিতে ত বেশী কষ্ট হবে না। প্রথমেই দেওবন্দের মৌলানা আবু বকর জেলালুদ্দিন খিলজী দাঁড়িয়ে উঠে কাঞ্চীর বিদ্যাবাচস্পতিকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বুঝিয়ে দিবে যে, যেহেতু বিদ্যাবাচস্পতি কলমাও পড়েন নি, সুন্নতও করেন নি, সেহেতু তিনি 'নাপাক' ও কাফের। বলা বাহুল্য বাচস্পতি-ঠাকুর তার এক বর্ণও বুঝবেন না; তিনি তাড়াতাড়ি একটিপ নস্য নিয়ে যেই প্রমাণ করতে যাবেন যে, মৌলানা সাহেবের কথা অত্যন্ত অশাস্ত্রীয়—অমনি রাগের চোটে তাঁর কাছা যাবে খুলে। তখন তিনি কাছা আঁটতে আঁটতে চীৎকার করে বলবেন—"আবুবকরেন যদুক্তং তদ্ধেয়ং, তদ্ধেয়ং!"

পল্টু বললে—"বাঃ বাঃ, তার পর?"

আমি বললুম—"তার পর আর কি? তার পর মৌলানা সাহেব লাফিয়ে গিয়ে ধরবেন বাচস্পতি ঠাকুরের টিকি, আর বাচস্পতি ঠাকুর ধরবেন মৌলানার সাহেবের দাড়ী। এ শাস্ত্রীয় যুদ্ধটা অবশ্য বেশীক্ষণ চলবে না, কেন না পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৌলানা সাহেব বাচস্পতি ঠাকুরকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর বসে 'আল্লা হো আকবর' করতে থাকবেন। তখন ভাটপাড়া, বিক্রমপুর আর কাঞ্চীর ভট্টাচায্যি মশায়রা চোঁচা লম্বা দিয়ে 'দ্বারোন্মোচনের' জন্য আর্ত্তনাদ করতে থাকবেন। বস্তু দোহাই দাদা, ও কার্য্যটা কোরো না, [illegible] দেও বলে দিও—"আজি পরীক্ষা, [illegible] অথবা জাতের করিবে ত্রাণ।"

গোঁসাইজী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি এইবার ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"ঠিক, ঠিক। 'এহ বাহ্য, রাম রায় আগে কহ আর'।"

আমি বল্‌লুম—"প্রভুপাদ! আরও আগে কিছু বলতে গেলে শেষে আইনের প্যাঁচে জড়িয়ে পড়তে হবে। তবে দেখে শুনে মনে হয়, ভাটপাড়া আর দ্রাবিড়ের পণ্ডিতেরা রণে ভঙ্গ দেবার পরেও কাশীর ভটচায্যি মশায়েরা তা করবেন না। তাঁরা বেদচর্চা যত করুন আর না করুন, ডন বৈঠক চর্চা কিঞ্চিৎ করে থাকেন। সুতরাং এই টিকি ও দাড়ীর যুদ্ধে কতক-গুলো দাড়ী যে ছিঁড়ে গিয়ে শুদ্ধি-কার্য্য এগিয়ে দেবে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু টিকি একটাও বাঁচবে না।"

পল্টু বল্‌লে—"দোহাই দাদা, আমাকে ঐ বাড়ীতে একটা ঘরের ভিতর লুকিয়ে রেখে দিও। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে যদি উপস্থিত না থাকতে পারি, তা হলে আমার জন্মই বৃথা।"

আমি বল্‌লুম—"না, পল্টু, তা হয় না। এ শাস্ত্রীয় বিচারের মধ্যে তোমার মত গোঁয়ার ছেলেদের স্থান নেই। এটা অতি সাত্ত্বিক ভাবে মৌলানা আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

নদের চাঁদ জিজ্ঞাসা করলে—"এ শাস্ত্রীয় বিচার বেশীক্ষণ চললে একটাও যে বেঁচে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।"

গোঁসাইজী বল্‌লেন—"তাই যদি হয়, ত তাঁদের বিরহে যে সারা দেশটা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে তা মনে করবার কারণ নেই। আমার মনে হয় যখন বেলা দুপুর আন্দাজ, মাথার উপর সূর্য্য আর পেটের ভিতর অগ্নি দাউ দাউ করে জলতে থাকবে, তখন উভয় পক্ষের একটা মিটমাটের সম্ভাবনা হলেও হতে পারে। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। যতক্ষণ না সবাই একটা unanimous verdict দিচ্ছে ততক্ষণ না দরজা খোলা, না খাঁটের ব্যবস্থা করা। দুই একটা ভট্টচায্যিকে হয়ত মৌলানারা শিক্‌-কাবাব করেই মেরে দেবে। কিন্তু তা দিক। এ দারুণ গ্রীষ্মে অতি বড় গাজী বা সহীদেরও নর-মাংস হজম হবে না। সুতরাং হত ও হন্তা উভয়েরই যে একই গতি হবে তাতে সন্দেহ নেই।"

আমি বল্‌লুম—"ঠিক বলেছেন, গোঁসাইজী, আমারও তাই ভাব। এই রকম ভাবে দিন দুতিন তালাবন্ধ করে রেখে দিলে উদরের অগ্নি যে সমস্ত মনের গ্লানি ভস্ম করে দেবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। দিন দুই চার পরে যাঁরা হিন্দু মুসলমান মিলনে একমত হবেন তাঁদের ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস সবাই এক-মত হবেন। যাবার সময় তাঁদের বলে দিও, যে, আবার যদি কোথাও গণ্ডগোল বাধে তা হলে আবার সাত দিন শাস্ত্রীয় বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।

কেমন নন্দের চাঁদ, এ ব্যবস্থায় রাজী আছ ?"

নন্দের চাঁদ হারমোনিয়মে প্যাঁ পোঁ করতে করতে গান ধরে দিলে—

কাণ্ডারী! তুমি ভুল নাই পথ, ভাজ নাই পথ-যাত্রা,

পশ্চাত-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ নাহি আজ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাটির নেশা

(Kavel Capek)

—:•:—

সন্ধ্যা তখন তা'র তারা-বসান আঁচল খানা পৃথিবীর গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে যখন দু'জন দূত এল সোডমে। তাঁদের দেখে লট্ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে একটি প্রণাম কল্লে। ..

সে বল্লে,—'প্রভু, চলুন, আপনারা এই দীনের কুটিরে আজ রাত্রিযাপন করবেন। এ দাসের ঘরে যা কিছু আছে তাই দিয়ে আপনাদের সেবা করে' নিজেকে সে ধন্য মনে করবে। কাল ভোরে উঠে যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে যাবেন।'

তারা বল্লে'—'না, আমরা রাস্তাতেই রাত্রি কাটিয়ে দেব।'

অনেক মিনতির পর তা'রা রাজী হ'ল কিছুক্ষণের জন্য লটের অতিথি হ'তে।

খাওয়া দাওয়ার পর স্বর্গীয় অতিথিরা লটকে বল্লে, 'আচ্ছা লট, যাঁদের এখানে দেখতে পাচ্ছি তা'রা ছাড়া তোমার কি আর কেউ আছে, তোমার জামাই, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, আর যদি কেউ থাকে, তাঁদের সবাইকে নিয়ে এই নগরী হ'তে বেরিয়ে এস। পাপে, অনাচারে, এই নগরী ভগবানের ক্রোধ-বহ্নিতে পড়েছে। আমরা একে ধ্বংস করব।'

লটের প্রাণে একটা দারুণ বেদনার ঘা লাগ্‌ল। সে বল্লে,—'কিন্তু আপনারা আমাকে সোডম্ ছেড়ে যেতে বলছেন কেন?' দূতেরা বল্লে,—'কারণ এটা ভগবানের অভিপ্রেত নয় যে যা'রা সৎ, যা'রা সাধু তা'রা এই ধ্বংসের মধ্যে থাকে।"

৫০শ বর্ষ } ১৩৩৩ { আষাঢ়

অরূপ

—ঃ০ঃ—

রূপের কুজ্ঝটিকা আজ
গুটায গুটায় গুটায় রে !
অরূপ ভানু প্রকাশ ভায়
দেব প্রকাশ ভায় ভায় রে !

সব কামনা কামকলায়
অতনু-কারণে মিলাল রে !
রূপ-বুদ্বুদ অরূপ-তলে
আপনায় আজি বিলাল রে !

সুধা-তরঙ্গ নাচি উঠিল,
কোটি সুধাকর উদয় রে !
অরূপ-চন্দ্রে রূপ-তমিস্র
হইল বিলয় বিলয় রে !

অশোক তেজ প্রাণ ভরিল
ভরিল ভরিল ভরিল রে !
অরূপ-যজ্ঞে রূপ-আহুতি
দুখ-পারাবার তরিল রে ! *

শ্রীমতী সরলা দেবী

* ইহার স্বরলিপি পৃষ্ঠান্তরে দ্রষ্টব্য।

কবি একবাল

——০:০——

১৯২৪এ প্রকাশ পেয়েছিল যে, সে বছর সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ এসিয়ার কোনো সাহিত্যিককে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে জাপানী কবি ইয়োন্ নেগুচি, ও ভারত থেকে পাঞ্জাবের কবি একবাল ও বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের নাম মুখে মুখে ঘুরছিল। কিন্তু জাপান ও ভারতকে নিরাশ হতে হল।

আয়ার্লণ্ডের মিষ্টিক্ কবি ইয়েট্স্ সেবার সম্মানিত হলেন। ইয়েট্স্-এর যোগ্যতা যে সর্ব্ব-সম্মত ও বিশ্বকাব্যের শতদলটিতে তাঁর ফোটানো পাপ্‌ড়িটি অপরূপ সৌন্দর্য্যের মহিমায় ভরপুর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের যে দুজন নোবল প্রাইজের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছিলেন, তাঁদের দাবীরও বিশেষ মূল্য আছে। তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার সম্মান আজ্ বাংলার ঘরে ঘরে হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যেও অন্ততঃ শতকরা একজন একবালের নাম পর্য্যন্ত শোনেননি। কোনও জাতি যখন তার স্বাজাত্যের বাহিরে দৃষ্টি মেলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচিত হতে চায়, তখনই তার রসানুভূতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে যদিও একবালের প্রত্যক্ষভাবে কোনও সম্পর্ক নেই, তবুও ভারতের একজন কবি যে বিশ্বসাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করেছেন, অন্ততঃ এই জন্যেও একবালের সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু পরিচয় থাকা দরকার।

একবালের জন্ম হয় পাঞ্জাবেরই কোন এক ছোট সহরে। ছেলেবেলাটা তাঁর অন্য ছোট ছেলেদের মতই কেটেছিল—কেবল তাঁর সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা ছিল সাধারণের চাইতে একটু বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি, 'জীবন-স্মৃতি'র পাতায় যা দিয়াছেন, তাতেই তাঁর সেই বাল্যাবস্থা বিচিত্র রঙে পাঠকের চোখের উপর নেমে আসে; এতে কবির শক্তির ক্রম-বিবর্ত্তন বোঝা খুব সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু একবালের বাল্য-মনের ইতিহাস জান্‌বার কোন উপায় নেই—তাই সেটা পাঠকদের কল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

১৬ বছর বয়সে একটা কবিতা লিখে একবাল হঠাৎ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠ্‌লেন। কারও বুঝতে বাকী রইল না যে এই বালক-কবি একদিন জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

এর পর তাঁকে কেম্ব্রিজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে পড়বার সময়ে 'টার্মের' শেষে ছুটিতে তিনি ইয়োরোপের দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। মিউনিকে

এসে পারস্য দর্শনবাদ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে তিনি মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে Ph. D. ডিপ্লোমা পেয়ে গেলেন।

এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর খুব কাজে লাগল। পশ্চিমের বস্তুতন্ত্রমূলক সভ্যতার আদর্শ ও যন্ত্রশক্তির রাজত্ব তাঁর মনে অনেকগুলো চিন্তার বীজ ঢুকিয়ে দিলে। রূপেয়ার রূপে মুগ্ধ ইয়োরোপ ধর্ম্ম ও নীতি-বাদ হারিয়ে কোথায় কোন্ অন্ধকারময় সুদূরে ছুটে চলেছে তাই কল্পনা ক'রে তরুণ একবাল বড়ই ব্যথা পেলেন। এই সময়ের লেখা কবিতায় তাঁর মনের ভাব খুঁজে পাওয়া যায়।

পশ্চিম্-বাসী জগৎখানা নয় লো কেনা-
বেচার মাল,
ভাবছ যারে আসল সোনা তুচ্ছ সেটা
মাটির তাল।
... ...
সভ্য-হওয়ার গর্ব্ব তোমার মারবে ছুরি
আপন বুকে
আগ্‌ডালেরই পাখীর বাসা বাঁচবে নাকো
ঝড়ের মুখে।
... ...
দলছ যারে জাগবে সে যে গোলাপ দিয়ে
বাঁধবে তরী*
ক্রুদ্ধ সাগর পেরিয়ে যাবে সেই তরীতে
নির্ভর করি।
... ...
ঘরের কোণে শুধুই ক'জন পেয়ালা ভরে
করছে পান
বদ্‌লাবে দিন—তামাম্ জগৎ চুমুক-সুখে
ভরবে প্রাণ্।

শেষের দ্বিপদীটি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়িয়ে দেয়; আসল ওমর খৈয়ামের কথা—ফিটজেরাল্ডের চিত্রিত ওমরকে নয়। ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদে মনে হয় যে এপিকিরউসের মত ওমরেরও মূলমন্ত্র ছিল—

'Eat, drink and be merry for to-morrow we die'. কিন্তু ওমর ঠিক্ তা' ভাব্‌তেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুরা, দ্রাক্ষা ইত্যাদি কথাগুলো তিনি রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন বলেই আধুনিক পারসী-জানা কাব্যপিয়াসী-দের অনেকের বিশ্বাস। একবালও ঠিক্ তাই করেছেন। তিনি কল্পনায় এক নব-যুগের আগমনীর ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছেন,যখন সারা জগৎ নূতন নূতন ভাবের সুরা প্রাণ ভরে পান করবে। উচ্চ চিন্তাধারা এখন শুধু কয়েকজন ভাবুকের মধ্যেই বাঁধা রয়েছে; একদিন এই প্রবাহের বাঁধ্ ভেঙে পড়বে—পৃথিবী তখন নূতন প্রেরণার মদিরা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করে মত্ত হয়ে উঠ্‌বে।

* 'গোলাপ দিয়ে বাঁধবে তরী' কথাটা বাংলায় একটু অদ্ভুত শোনায়। কবি এখানে বল্‌তে চান যে, আজ যাদের পথের ধূলায় স্থান, তারা তাদের গোলাপের মত কোমল, ভঙ্গুর তরীতে যাত্রা করেও বন্যার ধনও বিজ্ঞানের কৌশল অতিক্রম করে অবশেষে নিজেদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেবে।

অনেক বছর পূর্ব্বে একবাল এই যে কথা বলেছিলেন, আজ তার যথার্থ প্রকাশ পাচ্ছে। পৃথিবী এখন নূতনভাবে ভাবতে শিখছে—মুক্তির ভিতে তার চিন্তাশক্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে। দেশে দেশে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চলেছে—কত প্রাণ পথের ধূলায় প্রতিহত হচ্ছে, বিরুদ্ধ শক্তির ঝড়ে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সত্যপথের পথিকদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। নারী-জাগরণ আধুনিক পৃথিবীর একটা সেরা গৌরব। অন্তঃপুরের অন্তরাল হতে দিনের আলোয় নেমে এসে দেশের ও সমাজের প্রাণে উদ্দীপনা জোগাচ্ছেন, নারী। একবালের অনেক পূর্ব্বে বলা ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হয়েছে।

ব্যারিষ্টার হয়ে ভারতে ফিরে এসে একবাল প্রাক্‌টিস্ সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যপিপাসু মন নীরস ব্যবহার-শাস্ত্রের মধ্যে বন্দী থাকতে চাইল না। (এখানে একটা কথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না;—রবীন্দ্রনাথেরও ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলাত যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু কবির দুর্ভাগ্যই হোক্ আর সৌভাগ্যই হোক্, সেবার তাঁর সাগর-পাড়ি দেওয়া ঘটে ওঠেনি। মাদ্রাজ থেকেই কোনো কারণে ফিরে আস্‌তে হয়।) এই সময়ে লেখা তাঁর কবিতায় একটা নূতন শিহরণ দেখা দিয়েছিল—অনেকঘণ্টা ঘুমোবার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয়, তেমনি। এ কবিতাগুলি আশার বাণীতে ভরা। কবি যেন ভারতের অন্তরের রূপটি দেখতে পেলেন; তাই তারজন্য নিজেকে পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে তাঁর চিত্ত বেদনার ব্যাকুলতায় উথলে উঠতে লাগল—

ভালবাসার স্বরূপ কেমন দেখিয়ে দেবো,
হিন্দুস্থান,
আকুল আমি তোমার পদে করতে সারা
জীবন দান।

এর মধ্যে একটা আন্তরিকতার আভাস আছে জীবনের তারুণ্যের দিনগুলোয় অনেক কবিকেই স্বাদেশিকতার বন্যায় ঝাঁপ দিতে দেখা যায়।

ধিকিয়ে-ওঠা বুকের আগুন ছড়িয়ে দেবো
সবার বুকে,
অন্ধকারের অসীম কালোয় জ্বালবো আলো
সকৌতুকে।

... ...

মিলন-প্রিয়ার মুখটি হতে সরিয়ে দেবো
ঘোম্‌টাখান্
ব্যর্থবিবাদ হান্‌বে সবার মরম্ মাঝে
সরম্-বাণ।

এতেও সেই একই সুর আছে।

এই দ্বিপদীগুলির আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও ঝরণার মত সহজ, অবাধ গতি একেবারে অতুলন! পারসী ও উর্দ্দু কবিতার ছন্দের লীলা বিশেষ উপভোগ্য—বাংলা অনুবাদে তার পরিচয় দেওয়া যায় না।

সৌন্দর্য্যের কবি হিসাবে একবালের

স্থান খুবই উঁচু। পাখীর মিষ্টি সুরের সুরা, বাতাসকে ভারি-করে-তোলা যূথীর গন্ধ, শিশির-ভেজা আধফোটা গোলাপ, প্রিয়ার খেয়াল-খুসিতে রাঙিয়ে ওঠা, হাসির মায়া ও কান্নার ছায়া ভরা-মুখ—এক্‌বালের কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে। তখন তাঁর কল্পনা অবাধ আকাশে উড়ন্ত চুলের রাশি দুলিয়ে দ্রুত-তালের সেতারের সুরের মত ছুটে চলে; কবির নিপুণতা এই ভাবের কবিতাগুলিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লিরিক্ হিসাবে এইগুলি অপূর্ব্ব।

পার্থিব সম্পদ দিয়ে সৌন্দর্য্য ও ভালবাসার পরিমাণ হয় না। হৃদয়ের রাজ্যে মুহূর্ত্তের চোখের চাওয়া, এতটুকু লজ্জা-জড়ানো হাসি জগতের সব-সেরা ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বড়।

'অয়োজেরই'* পাপ্‌ড়ি-মধুর মিষ্‌টি ঠোঁটের হাসির দাম
ফুৎকারেতে দেয় উড়িয়ে মামুদ বীরের ধন তামাম্।

এক্‌বালের একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাব্য-কমলের সবক'টি পাপ্‌ড়িতেই অল্পবিস্তর ভাগ বসিয়েছেন। কখন কখন তাঁর কবিতা মিল্টনের মত মহান্ ও গম্ভীর; আবার কখনো বা তিনি শেলী বা সুইন্‌বার্ণের মত ছন্দের নৃত্যে মেতে উঠে গীতি-কবিতার সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদীগুলি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎএর চেয়ে হীন নয়। কাব্যেরবিভিন্ন রূপের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিভা ব্যক্ত হয়েছে। তবে সকল বড়কবিরই এক্‌টাবিশেষ ক'রে নিজস্ব সুর আছে যার জন্তে তাঁকে উঁচু স্থান দেওয়া হয়ে থাকে ও যাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সমধিক প্রকাশ হয়। এক্‌বালের মধ্যেও এম্‌নি একটা বিশিষ্ট সুর আছে। সে সুরের অভিব্যক্তি হয়েছে তাঁর 'আস্‌রারি-খুদি' 'রামুজি-বে-খুদি' নামের কাব্য-দুটিতে। এর প্রথমটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার পরিচয় দিলে এক্‌বাল্‌কে বুঝ্‌তে বিশেষ সুবিধা হবে।

'আস্‌রারি-খুদি'র অর্থাৎ আত্মরহস্যের (খুদি = আমিত্ব, selfhood) প্রথমেই কবি বলে রেখেছেন যে, তিনি সৌন্দর্য্য ও ভালবাসার গান গাইতে আসেননি; তিনি এসেছেন বুকে বিদ্যুৎ নিয়ে—বজ্রের গান গাইতে। উড়ে-আসা উল্কার মত তিনি; তাঁর এতটুকু রেণুকণা 'জাম্‌সিদের' † পেয়ালার চেয়ে উজ্জ্বল।

তিনি এসেছেন নিদ্রামগ্ন শতাব্দীর ঘুম

---

* আয়াজ—সুলতান মামুদের এক দাস ছিল—তার নাম আয়াজ। সৌন্দর্য্যের সে ছিল অতুলন; গ্রীক্ ভাস্করের শিল্প-কল্পনা যেন তার মধ্যে রূপ ধরেছিল। এর থেকে আয়াজের অর্থ হয়ে উঠেছে ভালবাসা।

† প্রসিদ্ধ পারস্ত সম্রাট তাঁর সম্পদ্ ছিল অজস্র। তার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পেয়ালা ছিল যাতে পৃথিবীর যে কোনও ঘটনার ছবি দেখা যেত।

ভাঙাতে। আরম্ভে অন্যান্য পারস্য কবিদের মতএ কৃবালও সাকিকে ডেকে বল্‌ছেন,

......ওগো সাকি,
পেয়ালা ভরে দাওনা সুরা নাইবা র'ল বাকি!
জেম্‌জেমেরই তরল সুধায় বক্ষ যখন ভরা
দাও গো ঢেলে চাঁদের আলো মনের
আঁধার হরা।

কিন্তু কেন? নতুন আলোয় যখন কবির তিমির-ঢাকা আবরণটা খসে যাবে তখন এক বাণী জাগিয়ে তুলবেন, যাতে।

পথহারারা দেখ্‌তে পাবে
কোথায় তাদের পথ
কাজ-না-করার বুকের মাঝে
ছুটবে কাজের রথ;
গানের সুরায় মত্ত আমি
নতুন ভাবের দূত
ভাব্‌বে জগৎ কবির বাণী
একি গো অদ্ভুত!

এই বাণী আস্‌রারি-খুদির পাতায় পাতায় ছড়ানো। সমাজ অধঃপতনের নীচু স্তর থেকে জয়গৌরবের শিখরে কি ভাবে উঠ্‌তে পারে, কবি তা জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মানুষের সমস্ত জীবন তাঁর কাব্যের বিষয়। দেশে দেশে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ ভাবুকরা জগতের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে নূতন আলোর সন্ধানে 'আলো আরো আলো' বলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরেছেন। তারপর সন্ধানের শেষে তাঁরা যে বাণী দিয়েছেন মানুষের মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে সে বাণী তাকে মহামানবতার মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এক্‌বালের বাণীও কতকটা তাই। যে দেশজোড়া অবসাদ ও জড়তা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সারা আকাশটায় ছেয়েছিল, এক্‌বাল চেয়েছিলেন তা থেকে দেশকে মুক্ত করতে।

Oh, expend thyself! Move
swiftly!
Be a cloud that shoots light-
ning and sheds a flood of rain!
Let the ocean sue for thy
storms as a begger,
Let it complain of the
straitness of thy skirts.
Let it deem itself less than
a wave
And glide along at thy feet!
(Asrari Khudi)

পৃথিবী চল্‌ছে, বিরাম-হারা চলাই জীবনের প্রকৃত লক্ষণ! গতি না থাক্‌লে সাগরে ঢেউ 'ঢেউ' থাক্‌ত না—জলের তলে মিশে গিয়ে নিজের সত্তাটুকু হারাতো। মানুষের জীবনও তেমনি গতিবিহীন হলেই মৃত্যুর সামিল হয়ে পড়ে। শক্তির সঞ্চারই মানুষকে 'মানুষ' নামের যোগ্য ক'রে তোলে। কিন্তু এ শক্তি আস্‌বে কোথা থেকে? আত্মদর্শনে এ শক্তির জন্ম। এই আত্মদর্শন বা আত্ম-রহস্যের স্বরূপ প্রকাশই আস্‌রারি-খুদির মূল কথা।

মানবজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ কি? নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেওয়া নয়—তাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তোলাই আদর্শ। সেজন্য নিজের সব স্বাতন্ত্র্যটুকু বড় করে ধ'রে তার উৎকর্ষের চেষ্টা করা প্রয়োজন। "তাখালাকু বাই আল্লা"—নিজেদের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণের সৃষ্টি কর—এ হচ্ছে মহম্মদের কথা। ব্যক্তিত্ব নিয়েই জীবন। জীবনের আসল বিকাশ 'খুদি' বা আত্মবোধের ভিতর দিয়ে। মানুষ যখন আত্মবোধের চরম সীমায় ওঠে তখন ঈশ্বরের পাশে তার স্থান। কিন্তু তারপর? তারপর সে ঐশশক্তিতে মিশে যায় না—ঐশশক্তিই তাতে মিশে যায়। মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার বিলয় হয়। 'আগে-চলার' সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে অনেক বাধা মাথা খাড়া করে ওঠে—কিন্তু এই বাধাগুলোকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়ে জীবনকে দীপকের সুরে বাঁধা বীণার মত করে নিতে হবে। জড়প্রকৃতি বাধাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়—কারণ রক্তমাংসের গড়া মানুষের ওপর তার দাবী ও অত্যাচারের অন্ত নেই। কিন্তু সেও নিছক্ মন্দ নয়; জড়প্রকৃতি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিরাশির উদ্বোধন করে—মানুষকে সংগ্রাম করতে শিখিয়ে তার মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দেয়।

'আত্মবোধ' কি করে আনতে হয়? 'ইশ্ক' বা ভালবাসা এখানে সোনার কাঠির কাজ করে। ভালবাসা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ দুজনেরই ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। এখানে ভালবাসা কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জগতের বিভিন্ন ভাব নিজের মধ্যে বিলীন করার ইচ্ছা ও নূতন নূতন মঙ্গলময় আদর্শের সৃষ্টি করে তার উপলব্ধির আনন্দ—একবালের মতে একেই ভালবাসা বলতে হবে। আমরা এ আদর্শকে বিশ্বপ্রেম বলেই জানি; 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনার এই গোড়ার কথাটার সঙ্গে একবালের অনুভূতির ঐক্য রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

'নিয়াবৎ-ই-ইলাহি'—আমি ঐশ প্রতি-নিধি—এ ভাবের মধ্যে, একবালের মতে, মানবজীবনের এক সুমহান্ আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। আত্মবোধের পক্ষে এর খুব আবশ্যকতা আছে।

আমরা এখানে আসরারি-খুদির তত্ত্বকথার পরিচয় দিলাম। এর মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসার ভাব রয়েছে উপনিষদের একটি ছোট কথায় তার অনেকখানি প্রকাশ পায়। সে হচ্ছে 'আত্মানম্ বিদ্ধি' —নিজেকে জানো।

কিন্তু পাঠক পাঠিকাদের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন আস্‌ছে,—একি রকম? কাব্যের মধ্যে এত তত্ত্বের জটিলতা? এতে কি কাব্যরস আড়ালে পড়ছে না? কথাটার প্রতিবাদ করতে চাই না, কারণ তা আংশিকভাবে সত্য। তবে আমরা এটুকু বলা প্রয়োজন মনে করি যে আস্‌রারি-খুদির মধ্যে খাঁটি কাব্যরসের

এমন বাহুল্য আছে, যাতে তার তত্ত্বকথার কর্কশতা কোমল হয়ে উঠেছে। এর অপূর্ব্ব ভাব, ছন্দ ও লিখন-ভঙ্গী সৌন্দর্য্য-পিয়াসীর চিত্ত হরণ করে নেয়, তাই তাঁর একবালকে স্কুলমাষ্টার বা ধর্ম্মপ্রচারক বলে ভ্রম হয় না—রসস্রষ্টা কবি বলেই বিশ্বাস হয়। আমরা 'খুদির' তত্ত্বের দিকটা বিশেষ করে দেখালাম একবালের মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার জন্যে।

একবালের তত্ত্বকথায় বার্গসঁ (Bergson) ও নীৎসের (Nietzsche) প্রভাব পড়েছে। জালালুদ্দিন রুমি তাঁর কবি-হৃদয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। বিদেশে এখন একবালের কাব্যের যথেষ্ট আদর। একজন আমেরিকান লেখক (হার্বার্ট রীড্) আস্রারি-খুদির সম্বন্ধে বলেছেন, এটা হচ্চে—"a poem that crystallizes in its beauty the most essential phases of modern philosophy, making a unity of faith out of a multiplicity of ideas, a universal inspiration out of eraterric logic of schools,"

একবাল বিশেষ করে সবুজদের—তরুণদের কবি। এযুগ হয়তো এখনো তাঁর বাণীর জন্যে প্রস্তুত হতে পারেনি। তাই তিনি বলছেন,

চাইনে আমি, চাইনে আমি,
চাইনে আমি আজের কাণ
বেবাক্ জগত অবাক্ হয়ে
শুন্‌বে যে কাল আমার গান।

কিন্তু বর্ত্তমানের ওপরে তাঁর কোনো শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই তা ভাব্‌লেও তাঁকে ভুল বোঝা হবে। 'আস্রারি-খুদি'তেই তিনি বলেছেন,

There sleeps amidst the
ashes of to-day
The flame of a world-
consuming morrow.

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

———

আমেরিকান ধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৎপরে আসে তৃতীয় প্রকারের দল। ইহাঁরা খৃষ্টীয় চার্চ্চ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এবং নিজেদের ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত করিয়াছেন। এই দল নানাপ্রকারের পন্থায় বিভক্ত যথা—Christian Science Church; Theosophists; Spiritualists; Vedantists; New Thought Movement; Mental Healers; Bahaists প্রভৃতি। বেহাইষ্ট দল ব্যতীত অন্যগুলি "সূত্রে মণি গণাইব" ন্যায় সকলেই হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ছায়ায় দণ্ডায়মান, যদিচ বৈদান্তিক-দল ছাড়া আর কেহই ইহা স্বীকার করিবেন না। আর বেহাইষ্টরা পারস্যের বেহাউল্লা প্রতিষ্ঠিত নবধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁদের মুসলমান বলা যায় না। ইহাঁরা বেহাউল্লাকে ঈশ্বরের অবতার বলেন এবং তিনি যে খোদার কাছ হইতে একটি নূতন পয়গম (আদেশ—revelation) পাইয়াছেন তাহাই বিশ্বাস করেন। এই বেহাই সম্প্রদায় ব্যতীত উপরোক্ত সকলেই অদ্বৈতবাদী (Monist) যদিচ হিন্দুদর্শনশাস্ত্র হইতে এই ঋণের কথা Christian Scientists. Mental Healers, New Thought প্রভৃতি দলেরা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন যে, Christian Science Church স্থাপয়িত্রী Mrs Mary Baker Eddyর বিখ্যাত পুস্তক "Science and Health" তাঁহার গুরু Mr. Quimbyর লিখিত। (শেষোক্তের মৃত্যুর পর Mrs Eddy নিজের নামে মুদ্রিত করেন।) এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে না কি লিখিত ছিল যে, এই অদ্বৈত মতবাদ গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই পন্থাও মিসেস্ এডির ধর্ম্মের মূলোৎপত্তি বিষয়ে নানা মত আছে আর মিসেস্ এডি তাঁহার ধর্ম্ম-পন্থাকে খৃষ্টীয় নামে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এইদল ডাক্তারি চিকিৎসাতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা মানসিক শক্তিদ্বারা ব্যায়রাম আরোগ্য করেন। ইহাঁদের ভজনাস্থলে প্রত্যেক বুধবারে এক মিটিং হয়। যে সময় সকলকার ব্যামোহ হইতে আরোগ্য বিষয়ে confession দিতে হয়। আমি এই প্রকার confessional meetingএ উপস্থিত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের আরোগ্য-বিষয়ক-স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিয়া ওই চিকিৎসাতে আমার বিশ্বাস উৎপাদন হয় নাই! ইহাঁরা বিশ্বপ্রেমিক ও মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তথাচ নিউইয়র্কের এই পন্থার প্রধান ভজনাগারে আমি স্বচক্ষে রংএর গণ্ডী টানিতে দেখিয়াছি!

আর New Thought প্রভৃতি যে-সব নূতন ধরণের free lance পন্থার উদ্ভব হইতেছে তাহার অনেক নেতা স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন পরে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন।

ইহাঁর ধর্ম্মযাজকত্ব অবস্থায় Chicagoতে ১৮৯৩ খৃঃ Parliament of Religionsএর অধিবেশন হয়। তৎকালে ইনি স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত সভায় এ প্রকারের এক প্রচণ্ড বক্তৃতা করিবেন, যাহাতে বিধর্ম্মীর দল বিমূঢ় হইয়া যাইবে (would confound the heathens)। কিন্তু কপালের ফেরে উল্টা সমঝলি রাম! ইনি উক্ত স্থলে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিজেই বিমূঢ় হন ও পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকতা ত্যাগ করেন। এক্ষণে ইনি উপরোক্ত পন্থার একটি বড় পাণ্ডা। এই দলও মানসিক শক্তির দ্বারা ব্যায়রাম চিকিৎসা করেন। ইহাঁরা এখনও একটা church গঠন করিতে পারেন নাই।

এই সব ব্যতীত, New Englandএ Unitarian Church বর্ত্তমান আছে যদিচ ইহা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। এই মণ্ডলী খৃষ্টের অবতারত্বে ও ভগবানের ত্রিত্বে (Trinitarianism) বিশ্বাস করে না এইজন্য ইহাঁরা এককালে নির্য্যাতিত হইতেন এবং এবং এক্ষণেও খৃষ্টানেরা ইহাঁদের খৃষ্টান বলিয়া গণ্য করে না। কিন্তু এককালে আমেরিকান রাজনীতিক, সংস্কারক ও সাহিত্যিক জীবনে ইহাঁদের প্রভাব অতি বেশী ছিল। ইহাঁরাই বষ্টনের Harvard University পরিচালনা করিতেছেন।

ইহার বাহিরে থাকেন নাস্তিক ও স্বাধীন চিন্তাবাদীর দল। কিন্তু তাঁহাদের কোন মণ্ডলী বা আন্দোলন আমার চক্ষে পতিত হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে অনেক স্বাধীন চিন্তাবাদী আছেন এবং সোসালিষ্ট প্রভৃতি দলে এই পন্থার লোক মিলে; কিন্তু সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব লক্ষিত হয় না।

আমেরিকা ধর্ম্মের হুজুগের দেশ। তজ্জন্য ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকারের প্রতারণাও হয়। এই জন্য ভারতের ন্যায় আমেরিকাকেও great faiking country বলা যাইতে পারে। তৎদেশে পুরুষের almighty dollar হইতেছে একমাত্র উপাস্য, তাহারা অর্থচিন্তায় দিবারাত্র ঘুরিতেছে আর স্ত্রীলোকেরা হুজুগ করিয়া বেড়ায়। যাহারা গোঁড়া খৃষ্টান তাহারা চার্চ্চের হুজুগ লইয়া ব্যস্ত আর যাহারা freelance হইয়াছে তাহাদের নিত্য নূতন হুজুগের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে হয়। প্রাচ্য হইতে কেহ একটা নূতন হুজুগ আমদানি করিয়াছে

অমনি একদল স্ত্রীলোক কিছুদিন তাহার পশ্চাতে উন্মত্ত রহিল। আবার কিছুদিন বাদে সেই স্ত্রীলোকেরা অন্য একটা নূতন হুজুগে যোগদান করিল। একটা season বেদান্ত সোসাইটি, অন্য বৎসর Christian Science Church, তৎপরে Bahaism বা New Thought Movementএ যোগদান করা হইতেছে ইহাঁদের রীতি। ইহাঁরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না, তবে তাঁহারা হুজুগে মাতিয়া নিজেদের social campaign (সামাজিক আলাপ পরিচয়াদি) কর্ম্ম সমাধা করিয়া লয়েন। বিভিন্ন দলে মিশিয়া সামাজিক উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আবার ধনী স্ত্রীলোকেরা এই হুজুগে মাতিয়া বিশেষ অর্থও ব্যয় করেন! অবশ্য ইহাঁরা যে হুজুগে যোগদান করুন না কেন, সামাজিক ব্যাপারে সেই বিশাল খৃষ্টান সমাজের অভ্যন্তরেই থাকেন; ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য পৃথক সমাজ ইহাঁরা গঠিত করেন না। সেই জন্যই এই সব হুজুগের স্থায়িত্ব বেশী দিন হয় না। এই হুজুগের দ্বারা খৃষ্টীয় চার্চ্চের heathen mission fundএর আয়ের ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজের ক্ষতি হয় না। সকলেই খৃষ্টীয়ান আমেরিকানই থাকেন; ধর্ম্মের বিভিন্নতা দ্বারা বিভিন্ন আচার-ব্যবহার-সম্বলিত পৃথক পৃথক community (মণ্ডলী) স্থাপিত হয় না, সকলেই জাতিত্বে আমেরিকান, আচার-ব্যবহারে আমেরিকান ও বংশ-পরম্পরায় খৃষ্টীয়ান। হুজুগ কেবল কতক দিনের তরে তাঁহাদের ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তৎপরে খৃষ্টানদের ভিতর যাঁহারা উদার-নৈতিক অর্থাৎ যাঁহারা যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বে ও তদনুগত অন্যান্য মতগুলিতে (dogmas) বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের অনেকেও বংশ-পরম্পরায় স্বীয় বংশগত চার্চ্চের সভ্য থাকেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা বংশগত চার্চ্চের মত ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি প্রতিপালন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—আমার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনকালে তথাকার Post Graduate Collegeএর Deanকে ক্লাসে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে "আমি Baptist Churchএর সভ্য, কেন আমি এই মণ্ডলীর সভ্য হইলাম ও সেই চার্চ্চের ধর্ম্মমত কি তাহা আমি কখনও অনুসন্ধান করি নাই, আমি সেই চার্চ্চের সভ্য কারণ আমার পিতা সেই মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন।" ইনি উপরোক্ত প্রকারের উদারনৈতিক লোক, এবং নিজে একটি বড় সমাজতাত্ত্বিক; তাঁহাকে ঐ চার্চ্চে যাইয়া উপাসনায় যোগদান করিতে দেখিয়াছি কারণ সামাজিক ব্যাপারে তিনি উক্ত মণ্ডলীর একজন সভ্য।

আবার আমেরিকায় ধর্ম্ম ও মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এত হুজুগ থাকা সত্ত্বেও তথাকার রংবিদ্বেষ সর্ব্বত্র কলুষিত করিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মী আমেরিকান সে যাহাই করুক, তাহার এই রং-আতঙ্ক দূর

হয় না ; সাধারণ খৃষ্টানেরা মনে করে যে, যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা শ্বেতচর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। যীশু যে ঢিলা পায়জামা পরা পাগড়ী মস্তকে শোভিত, মলিন বর্ণের "oriental" (প্রাচ্য দেশীয়) ছিলেন ইহা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তৎপর যিশু যে "ইহুদী" জাতীয় ছিলেন, ইহাও অনেকে ধারণা করিতে পারে না। এই বিষয়ে একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে বলাতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, "ইহা সত্য, আমায় একবার একটি মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মিষ্টার অমুক ইহা কি সত্য যে, যীশু এক জন 'ইহুদি' ছিলেন?" অবশ্য যাঁহারা সঠিক সংবাদ রাখেন তাঁহারা উপরোক্ত সত্য জানেন না কিন্তু তাহা একটা abstract ধারণা মাত্র। এই ইহুদি-বিদ্বেষ এবং রং ও প্রাচ্য-বিদ্বেষ-সম্বলিত জনসমষ্টির অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না যে, যীশুখৃষ্ট ঐ ঘৃণ্য জাতি ও মহাদেশের লোক ছিলেন! ১৯১২ খৃঃ বেহাই ধর্ম্ম সংস্থাপনকর্ত্তা বেহাউল্লার পুত্র আবদুল বেহা একেন্দি আমেরিকায় আছেন। প্রথমে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার পুত্র বলিয়া আমেরিকান বেহাইএর দল অতি সম্মানের সহিত সমাজে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু জনরব শুনিয়াছি যে পরে তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মলিন বর্ণ, লম্বা দাড়ী, মাথায় পাগড়ি ও ঢিলে পায়জামা ও চোগা পরা ও তৎপর দুর্ব্বোধ্য ফারসীতে কথা ও সেলাম আলেকাম বলিয়া অভিবাদন করিতে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের নাকি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনেকটা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র দূর হইতে নমস্য ও শ্রদ্ধার ভাজন কিন্তু যদি তিনি উপবোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ঘৃণ্য প্রাচ্যদেশীয় হন তবে আমেরিকান হৃদয়ে তাঁহার স্থান নাই। এই বিষয়ে পরে কোন হিন্দু-বন্ধু আমেরিকান অধ্যাপকের নিকট উল্লেখ করিয়া আমার উপরোক্ত সমাজতাত্ত্বিক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া মৃদুভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে,"মিষ্টার দত্ত তুমি আমেরিকানদের যথার্থই চিনিয়াছ!" কালিফোর্ণিয়ান্তর্গত Posadena নামক স্থানে একটি বড় Presbyterian Churchএর প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে (vesti bub) নাকি একটি কাচের বৃহৎ নীলচক্ষু মাটিতে (floor) স্থাপিত করা আছে। ইহা ঈশ্বর-চক্ষুর প্রতীকরূপে তথায় স্থাপিত করা হইয়াছে ; উদ্দেশ্য যে প্রত্যেককে ঈশ্বরাধনার পূর্ব্বে ভগবৎ চক্ষুর দৃষ্টির পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই ভগবৎ চক্ষুর প্রতীকের রং নীল। কারণ, উত্তর ইউরোপীয়দের আমেরিকান বংশধরদের চক্ষু নীল সেই জন্য ভগবানের চক্ষুও নীল বর্ণের! এই ঘটনা এই সূত্যের পোষকতা করে যে মানুষ নিজের মূর্ত্তিতেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে, ঈশ্বর মানুষকে নহে।

উপরোক্ত অবস্থাতে বোধগম্য হয় যে,

ধর্ম্ম বেশীর ভাগ স্থলেই social function (সামাজিক অনুষ্ঠান) রূপে কার্য্যকলাপে পরিণত হইয়াছে; ধর্ম্ম তাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও কর্ম্মগুলি হারাইয়া এক্ষণে অন্তঃসারশূন্য অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের functionটা চলিয়া গিয়াছে, আছে কেবল structure। যাহা পূর্ব্বে কার্য্যের সহায় ও আধার ছিল তাহা এক্ষণে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই সমাজ আর উন্নতির পথের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, আর অন্ধমানব অজ্ঞতাবশতঃ নিজের মধ্যে কাটাকাটি করিতেছে। ধর্ম্ম তাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হারাইয়া আজ পেশায় পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি আমার দুইজন আমেরিকান সমাধ্যায়ীদের জানিতাম যাঁহারা মহানাস্তিক হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পদের জন্য শিক্ষানবীশ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আমি যখন প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস নাই, তত্রাচ কিরূপে তাঁহারা এই পেশা অবলম্বন করিলেন? একজন ইহার উত্তর দান করেন নাই, এবং অন্যজন বলিলেন যে চার্চ্চের কর্ম্মে "organizing capacity develop" করা যায়, সেই জন্যই এই পেশা তিনি অবলম্বন করিতেছেন। পুনরায় যখন আমি বলিলাম যে এই পেশায় তাঁহাকে প্রতিপদে ভণ্ড হইতে হইবে, যথা:—তিনি নিজে নিরীশ্বরবাদী, তাঁহার কাছে স্বর্গ নরক কিছুই নাই; কিন্তু আমি heathen, আর তাঁহাকে প্রতিনিয়তই ধর্ম্মের বেদী হইতে প্রচার করিতে হইবে যে, heathenরা খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া নরকে যাইবে, তিনি কি আমার জীবনান্তে নরক গমনে বিশ্বাস করেন? ইহার প্রত্যুত্তর তিনি দেন নাই, কেবল অধোবদন হইয়াছিলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই; নিউ ইংলণ্ডে ইংরেজবংশীয়, আমার কোন Baptist Churchএর ধর্ম্মযাজক বন্ধু ছিলেন। ইনি আমায় বলেন যে তিনি Trinitarian Christianityতে আদৌ আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; এইজন্য ভণ্ড না সাজিয়া তাঁহাকে উক্ত চার্চ্চের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থনীতিক কারণ বশতঃ ইহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে হয়। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, যখন তাঁহার মত Unitarianদের মতন তখন কেন তিনি উক্ত সম্প্রদায়ে যোগদান করেন না, তাহা হইলে তাঁহার বিবেকের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে হইবে না। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁহার ইংরেজ-জাতি-সুলভ সামাজিক গোঁড়ামি ছিল, তিনি ইংরেজ Episcopal church ত্যাগ করিবেন না ইত্যাদি। কিন্তু পরে তাঁহার মণ্ডলীর সহিত বচসা হয়, মণ্ডলীর অনেক সভ্য চার্চ্চ ছাড়িয়া চলিয়া যান;—বলেন যে pastorএর faith (বিশ্বাস) নাই! তাঁহার

বিবেক ও অর্থনীতিক সমস্যার মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, চাকরীও পাওয়া মুস্কিল, উপবাসও করিতে পারেন না। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারী যে বিশপ্‌ তাঁহাকে সব অবগত করাইলেন। এই বিশপ্‌কেও আমি জানিতাম, ইনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মণ্ডলীর মধ্যে কোন মতানৈক্য হইতে দেন না। বিশপ্‌ আমার বন্ধুকে বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে বলেন। পরে আমার বন্ধু আমায় লিখেন যে শেষে বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁহাকে এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, সেই জন্য তিনি ভগবানের কাছে তাঁহাকে "বিশ্বাস" দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন! হায়রে ধর্ম্ম!—পেট ও বিবেকের কলহ ভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া তিনি "বিশ্বাস" দ্বারা বিবেককে মারিয়া তদ্দ্বারা পেট ভরাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন! এইস্থলে ধর্ম্মের যে function মানবকে নীতি ও ধর্ম্মধারণার উচ্চ স্তরে লইয়া যাওয়া, চার্চ্চ তাহা হারাইয়াছে; কেবল বাহিরের খোসাগুলিকে (dogmas and conventions) structure (কঠাম) বানাইয়া মানবকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না! আর বেশীর ভাগ মানব এই পুরাতন কাঠামকে আসল দ্রব্য বুঝিয়া তাহাকে ধর্ম্মের স্থলে বসাইয়াছে। এ বিষয়ে সর্ব্ব ধর্ম্মেরই এক দোষ।

আমেরিকান ধর্ম্মজীবনের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনার উদ্‌যাপন করিবার কালে একটি বিষয়ের পুনরোক্তি করিতেছি যে, তথায় ধর্ম্মের নামে অনেক প্রকারের জুয়াচুরি চলিতেছে। তথাকার লোকেরা হুজুগে বলিয়া অনেক প্রকারের প্রতারণার আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য এই সব প্রতারণা প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মসমূহের নামে হয়। তথায় নানা প্রকারের ভূত প্রেত বিশ্বাসকারীদের (spiritists and occultists) প্রচারের ফলে সাধারণে হিন্দু ধর্ম্মকে ভূত নামান, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সহিত সনাক্ত করে। তাহারা ভাবেন হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকারের Black Magic মাত্র। ইহা ব্যতীত অনেক আমেরিকান আছে যাঁহারা কেহ কেহ পারস্যদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আদিরস-মিশ্রিত এক কিম্ভূত প্রকারের ধর্ম্ম প্রচার করে। পুলিশে ইহাদের তাড়া দিলে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় পলায়ন করিয়া ব্যবসায় খুলে। হিন্দুর নাম ধারণ করিয়া অনেক আমেরিকানও এবম্প্রকার ব্যবসায় করে; তৎপর হিন্দুর নাম দিয়া অনেক প্রকারের তথাকথিত "যোগ ধর্ম্মের" পুস্তক বাহির হইতেছে। ফলতঃ অনেক প্রকারের বীভৎস ব্যাপার ও আজগুবি "হিন্দুর" নামে চলিতেছে! এক নিগ্রোকে হিন্দুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্বেতাঙ্গিণী মহলে "mindreade" করিতে দেখিয়াছি; আর এক নিগ্রো "স্বামী কু" (Swami Ku) নাম ধারণ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের জন্য গুপ্তভাবে আফিঙ্গের আড্ডা করিয়াছিল, শেষে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরষার ভরসায়

আজি—উপবাসে ক্ষীণা প্রকৃতি মলিনা বসেছে উগ্রতপে,
দারুণ দুঃখ সহিছে লক্ষ পুরশ্চরণ জপে,
যেন অপর্ণা তপোবিশীর্ণা হরের করুণা মাগি ;
অনসূয়া যেন দুঃসহব্রতা বিশ্বহিতের লাগি।
মরুপ্রান্তরে ধরা-জননীর স্তন্যের হবি দানে,
চারিটি কুণ্ডে করিছে কে যাগ চাহি সবিতার পানে ?
টানিয়া আনিবে আৰ্ত্ত ভূলোকে যাহার পূর্ণাহুতি,
বরুণের বর করুণার ধারা,—বিজয়ী হইবে শ্রুতি।
চাতকী শিখীর কাকুতি কামনা—কেতকীর বেদনায়,
নীপ-কুটজের নিভৃত মৌন সাগ্রহ সাধনায়,
বরাভয়ময় সঞ্জীবনের পড়েছে প্রবল টান,
কোটি কণ্ঠের 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে দ্যুলোক কম্পমান।
কোটী কোটী বীজ সার্থকতার আগ্রহে ধূলি-তলে,
জপে যে মন্ত্র নিশিদিন, তাই ধাতার আসন টলে।
এ কোন্ দধীচি ত্রিলোকের হিতে যোগাসনে তাজে তনু,
সমাধি ভাঙিয়া সুমেরু-শিখরে হুঙ্কারে কোন্ মনু ?
কোন্ পাণ্ডব দহি খাণ্ডবে তুষিতেছে দেবতারে,
লভি গাণ্ডীব কাঁপাবে বিশ্ব বজ্রের টঙ্কারে।
মরীচিকাগুলি কোন্ সে ঋষ্যশৃঙ্গে ভুলায় নেচে,
যাঁর পদরজে যুগতৃষার্ত্ত "অঙ্গ" যাইবে বেঁচে।
দুঃশাসনের হৃদি-বিদারণ হেরিছে যাজ্ঞসেনী,
চপলা-রক্ত-রঞ্জিত-করে রচা হবে তার বেণী।
থামিবে ঝঞ্ঝা, রুদ্রদেবের পিণাকের টঙ্কার,
ভালনেত্রের বহ্নি নিভাতে ঝরিবে অশ্রু তার।

কণ্ঠের বিষ ভেদিয়া ফুটিবে বদনে অশিস্‌-বাণী,
অমৃতে ভরিবে আবার হরের করের করোটিখানি।
মেঘ-তরঙ্গে গিরির শৃঙ্গে হইবে শৃঙ্গনাদ,
প্রাণ-গঙ্গায় ঘোষিবে ডমরু মঙ্গল পরসাদ।
কংস-কারার আর্ত্তরোদন ব্যর্থ হবেনা কভু,
অশোকবনের সতীর বেদনা স'বেনা প্রাণের প্রভু।
রবেনা মাটির ভিক্ষাভাণ্ড বেশী দিন ঘরে ঘরে,
কড়ি দিয়ে রচা সিন্দূর-ঝাঁপি ফিরিবে রমার করে।
হবে সুধা-পীন ধেনুর আপীন শষ্পে ভরিবে মরু
শ্যামলানন্দে হাসিবে ক্ষেত্র, পুষ্পে ভরিবে তরু।
চক্রগদায় আজিকে ধরার অরাতি করিয়া ক্ষয়,
শঙ্খ-সরোজে শ্যামসুন্দর বিতরিবে বরাভয়।
তপনেরে মোরা করিব আপন "সূর্য্য হৃদয়"-গানে,
অনলে তুষিব স্বাহার-মন্ত্রে সুরভি সমিধ্‌ দানে।
মোরা তপ করি জীবন আবার জাগাব ভস্মতলে,
করুণার বারি ঝরাব হরির চরণ-কমল-দলে।
শাপহতগণ লভিবে জীবন সে বারির পরশনে,
সাঁতারি ধরিবে মকরের দেহ জয়জয় গরজনে।
দেবী মহামায়া ক্রমে দশমহাবিদ্যার লীলা সারি,
কমলাত্মিকা রূপে বরষিবে করিকুম্ভের বারি।
দেবতা তুষ্টা রাজিবে ইষ্ট বরাভয় লয়ে করে,
কুশল বিতরি সলিলের পরি মরাল রাজীব 'পরে।
বরুণ তোরণ—গৃহ প্রাঙ্গণ ভরিবে লক্ষ পোতে,
করুণার ধারা ঝরিবে রাজার হাজার চক্ষু হ'তে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মজুর

(গল্প)

—•—

মজুর ;— দিন আনে, দিন খায়। বর্ত্তমানকে নিয়েই তার সুখ।

মজুরের স্ত্রী পয়সা জমাতে চেষ্টা করে— একটি, ছুটি, তিনটি ক'রে ; মাঝে মাঝে জমানো পয়সাগুলি গোণবার সময়ে পরম তৃপ্তিতে তার বুক ভরে উঠে। ছোট একটি মেয়ে তাদের—লছ্মি। তার কালো কোঁক্ড়া একমাথা চুল আর বিষাদের ছায়া-মাখানো সুন্দর ছুটি চোখ্।

একদিন লছ্মির জ্বর হলো—জ্বর ক্রমে টাইফয়েডে দাঁড়ালো।

মেয়ের কষ্ট মা আর সইতে পারলেন না ; মজুরকে ডেকে বল্লে, ডাক্তার ডাকো।

ডাক্তার এলেন ; ট্রাউজার-পরা— চোখে চশ্মা আর মাথায় কালো ফেলটের টুপি। মুখ বিষম গম্ভীর। মেয়েটিকে দেখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বল্লেন, অসুখ শক্ত।

মা কেঁদে উঠ্লো— ভালো করে দাও ডাক্তার বাবু, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি ভালো করে দাও—মজুর ছল্ছল্ চোখে মুখের দিকে চেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো ; কিছু বল্লে না।

ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার উঠলেন ; জমানো পয়সাগুলির সব কটি এক্ ক'রে মজুরণি তাঁর ছুটাকা ফী দিলে। পরম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মলিন পয়সাগুলো পকেটে ফেলে ডাক্তার চলে গেলেন!

থালা আর মজুরণির গলার হাঁসুলি বাঁধা রেখে মজুর ওষুধ কিনে আন্লো। মাটির খুরিতে ঢেলে মেয়েকে তা খাওয়া-বার সময়ে মা মনে ভাব্লে, বাছা আমার এইতেই সেরে উঠবে।

চার, পাঁচ, ছয়, সাত্ দিন কেটে গেল—কিন্তু লছ্মির ভালো হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মাঝে মাঝে সে আবোল তাবোল বক্তো কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে ক্লান্ত, পথশ্রান্ত পাখীটির মত ঝিমিয়ে থাক্তো।

মজুর এতদিন কাজে যেতে পারেনি ; সর্ব্বদাই সে আন্মনার মত মেয়ের পাশে বসে থাক্তো। এক একবার তার ওড়া চুলগুলো কপালের ধারে সাজিয়ে দিতো আর লুকিয়ে লুকিয়ে তার বিবর্ণ ঠোঁট্ ছুইটিতে চুমু খেত।

ধার করে তাদের চল্ছিল ; কিন্তু এমন একদিন এলো যখন কেউ আর ধার দিতে চাইলে না। লছ্মির হাতে রুপোর ছ'গাছি সরু চুড়ি ছিল ; অনেক ভাব্নার পরও সেছুটি খুলে নিতে মজুরণির হাত

সরলো না। 'শীতলা'র-উদ্দেশে-রাখা সিঁদুর-লেপা শেষ পয়সাটি মজুরের হাতে দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্লে, ওগো, আজ তুমি কাজে যেও—মজুরির পয়সাতেই ওষুধ কিন্‌তে হবে।

মজুর ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা। গ্রামের পথ তখন অন্ধকারে কালো হয়ে উঠেছিল। একরাশ্ মেঘ জমে আকাশের তারাদের মানুষের দৃষ্টিপথে আস্‌তে দেয়নি।

মজুর হন্‌হন্ করে চলেছিল; ঘরে পৌঁছে মজুরণির ভয়ার্ত্ত মুখ দেখে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্‌লো।

তাকে ফিরতে দেখে মজুরণি বল্লে, ওগো, মেয়ে আমার তখন থেকে কেমন যেন করে উঠ্‌ছে—যাও ছুটে একবার ডাক্তার বাবুর কাছে।

নিঃশব্দে মজুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার সময়ে চকিতের মত লছমির মুখের উপর একবার দৃষ্টি মিলিয়ে নিলে।

ডাক্তার এলেন; লছ্‌মি তখন শান্ত মেয়েটির মত চুপ্ ক'রে ঘুমোচ্ছিল। মজুরণি ভাব্‌লে, আহা এতক্ষণে বাছার একটু ঘুম এলো! ভেবে সে তার মুখের-উপর উড়ে-বসা একটা মাছি তাড়িয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দিলে।

ডাক্তার দেখে মুখ বাঁকিয়ে বল্লেন, সব শেষ হয়ে গেছে।

কি শেষ হয়ে গেছে—কি কি? মজুরণির বুক যেন হাতুড়ির ঘায়ে দুপ্‌দুপ করে উঠল।

ডাক্তার বল্লেন, প্রায় একঘণ্টা হল মারা গেছে।

মজুর পাগলের মত লছ্‌মির প্রাণহীন দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙা গলায় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। মজুরণি কিন্তু স্তব্ধ হয়ে বসেই রইলো—চোখে তার একটি ফোঁটাও জল নামলো না। ধ্যানস্থের মত নিস্পন্দ, নিথর হয়ে লছ্‌মির মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

ডাক্তার উঠে গেলেন; সেবার 'ফী' চাইবার কথা তাঁর মনে পড়েনি।—তখন বৃষ্টি নেমেছিল টিপ্ টিপ্ টিপ্।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

—

মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল?

একসময়ে বাঙ্গালীদিগের ধারণা ছিল যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস—এই তিন জন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাই বাঙ্গালী। বিদ্যাপতি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু মৈথিল কবি, অনেক দিন পূর্ব্বেই স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের প্রশংসনীয় গবেষণার ফলে উহা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামক সুপ্রাচীন গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হওয়ার পরে, চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেও আমাদিগের পূর্ব্বের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইয়াছে; কেন না চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব ও বাঙ্গালীত্ব নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও, তাঁহার নামে ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত উৎকৃষ্ট পদাবলী যে শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের রচনা, এ কথা আর বলিবার উপায় নাই। একাধিক প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব-কল্পনাও বৈষ্ণব ইতিহাস দ্বারা সমর্থন করা যায় না; সুতরাং শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী চণ্ডীদাস নামক অপর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রমাণাভাবে পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলিতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও রস-তত্ত্বের সুস্পষ্ট ছাপ এবং ভাষা ও ভাব-গত আধুনিকতার লক্ষণ দেখিতে পাইয়া আমাদিগকে অগত্যা সেগুলিকে শ্রীমহাপ্রভুর ও আন্দাজ এক শতাব্দী পরে রচিত এবং অযথা-রূপে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত কৃত্রিম পদাবলী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে। বাকি ছিলেন গোবিন্দদাস। পদাবলী-সাহিত্যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অনেক-গুলি গোবিন্দ দাসের পদ পাওয়া গেলেও 'গোবিন্দদাস' ভণিতা-যুক্ত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি পদগুলির রচয়িতা যে শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের সম-সাময়িক বুধুরী-পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজ, ইহা বাঙ্গালা 'ভক্তমাল,' 'ভক্তি-রত্নাকর,' 'প্রেম-বিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের উক্তি ও ইঙ্গিত অনুসারে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এই গোবিন্দদাসের প্রাপ্য যশোমাল্যও সম্প্রতি তাঁহার অধিকারচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলীর সুযোগ্য সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাসকে মিথিলার

কবি প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে গত ১৩৩১ সালের মাসিক "বসুমতী" পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় "মিথিলার কবি গোবিন্দ দাস" নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দদাসের কয়েকটী প্রসিদ্ধ পদও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে সারগর্ভ নহে, তাঁহার উদ্ধৃত পদাবলী যে বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজেরই রচিত, ইহাই প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব। আলোচ্য বিষয়টীর গুরুত্ব এবং পূর্ব্বোক্ত অভিনব মতের প্রচারক গুপ্ত মহাশয়ের প্রবীণতা—উভয়ের জন্যেই আমাদিগকে একটু বিস্তৃত ও বিশেষ-ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইতেছে, সুতরাং আশা করি প্রবন্ধটী খুব সংক্ষিপ্ত না হইলেও শ্রোতা ও পাঠক-দিগের ধৈর্য্য-হানির কারণ হইবে না।

সুবিধার জন্যে আমরা প্রথমেই গুপ্ত মহাশয়ের নিজ-ভাষায় তাঁহার মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি ;

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দ দাস অপর কবিদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস নামে কয়েক জন পদ-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির পরে ইনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক পদ বিদ্যাপতির অনুকরণে রচনা করেন। ইনি যে মিথিলা-বাসী তাহার প্রমাণ ইহাঁর রচিত পদ এদেশে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। ইহাঁর পদাবলী বিশুদ্ধ আকারে মিথিলায় পাওয়া যায় এবং মিথিলার কুলজীতে ইহার নাম আছে। বিদ্যাপতির যে বন্দনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই কবির রচিত। চণ্ডী-দাসের বন্দনা বাঙ্গালার কবি গোবিন্দদাস-কৃত। অনুপ্রাস-পূর্ণ অনেকগুলি পদ মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা. পদকল্প-তরুতে দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনায় কবি বৈষ্ণব দাস এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অল চাতুর্ম্মাস্য বিদ্যাপতি ঠকুরস্য বর্ণনং ততো দ্বয়-মাস গোবিন্দ কবিরাজ ঠকুরস্য, তচ্ছেষ ষণ্মাস গোবিন্দ চক্রবর্ত্তি ঠকুরস্য বর্ণনং।" কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর মিথিলার কবি। গোবিন্দদাস মিথিলার ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দ-দাস ঝা অথবা ওঝা, কবিরাজ তাঁহার উপাধি।

পুনশ্চ—

"এই গোবিন্দদাস মিথিলা-বাসী হরি-নারায়ণ মিথিলার রাজার উপাধি। অন্য পদের ভণিতায় রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ ও রায় চম্পতির নাম আছে।"

"গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল এবং শব্দের ছটাও অধিক।"

"মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের বিরচিত গৌরচন্দ্রিকার একটিও পদ নাই ;. থাকিবার কথাও নহে। গোবিন্দদাস নামধারী বাঙ্গালী কবি মিথিলার কবির ভাষার অণুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও

লীলা বর্ণন করিয়াছেনে ; কিন্তু দুই ভাষায় অনেক প্রভেদ। গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের ভাষা কঠিন ও এ দেশে তাঁহার পদাবলীর পাঠে অত্যন্ত অশুদ্ধি ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবি গোবিন্দদাস মিথিলার কবির পদ আবৃত্তি করিয়া থাকিবেন, এবং ইহাই অধিক সম্ভবপর। কারণ বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে যে বৈদ্য গোবিন্দদাস গীত রচনা করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।"

"জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদকল্পতরুর শ্রীরাম-বন্দনার পদটীর সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবিরা রামের বন্দনা করিতেন না। মিথিলায় বেহারে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে সর্ব্বত্র রামের বন্দনার নিয়ম।" এই যুক্তি অনুসারে তিনি উক্ত পদটীকেও মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অতঃপর মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বাঙ্গালায় যে বহু পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদের অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে কৌতূহল-জনক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পরে আলোচ্য পদাবলী যে, বাঙ্গালী কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের রচনা তৎসম্বন্ধে কতিপয় ভাষা ও ভাব-গত নিঃসন্দিগ্ধ অভ্যন্তরীণ যুক্তি ও কতিপয় ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করিব।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে, গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দ দাসেব ভণিতাযুক্ত কতগুলি এবং কোন্ কোন্ পদ মিথিলার কোন্ কোন্ প্রাচীন গীত-সংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই ; তবে অনুমানে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গোবিন্দ দাসের যে ১৬।১৭টী পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি মিথিলার কোন-না-কোন গীত-সংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচিত উৎকৃষ্ট পদাবলী যাহা ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদ-কল্প-তরু, পদ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত হইবে। আন্দাজ দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য উভয় দেশে পরস্পর যাতায়াত হেতু বাঙ্গালা ও মিথিলার মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল ; বর্ত্তমান সময়ের ত কথাই নাই ; এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের রচিত মৈথিলী ভাষার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত কতকগুলি ব্রজ-বুলি পদ বাঙ্গালা হইতে মিথিলায় নীত এবং প্রচারিত হওয়া খুব সম্ভবপর মনে হয়। বস্তুতঃ ভাষা ও ভাবে প্রায় একই প্রকারের অন্ততঃ ৩৪ শত ব্রজবুলির পদের মধ্যে গোবিন্দ দাসের ভণিতা-যুক্ত যদি মাত্র ২০।২৫টী পদ

মিথিলায় পাওয়া যায়, আর বাকিগুলি সেখানে মোটেই পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশই যে সেই পদগুলির জন্ম-ভূমি, এরূপ অনুমানই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মিথিলায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন; ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচিত কতকগুলি মৈথিল গীতও পাওয়া যায়; গুপ্ত-মহাশয় যে "মিথিলাগীত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানা প্রাচীন সংগ্রহ নহে। দরভঙ্গার অন্তর্গত শুভঙ্কর--পুর গ্রামের অধিবাসী ও দরভঙ্গা-রাজের জনৈক পরিষদ শ্রীযুক্ত ভোলা ঝা কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঝা মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ এখন অপ্রাপ্য; আমরা বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই; দ্বিতীয় ভাগ একখণ্ড পাইয়াছি; উহাতে গোবিন্দ ঠাকুরের "মুমু ভুবনেশ্বর নাথ" ইত্যাদি একটি মাত্র গীত উদ্ধৃত হইয়াছে; ভণিতাটী এইরূপ —"কহ গোবিন্দ কর জোরি বিনয় প্রভু মানিয়" ইত্যাদি। ইনি যে 'দাস' উপাধির ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন কিম্বা কবিত্বের জন্য 'কবিরাজ' উপাধি পাইয়াছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পরে গোবিন্দ দাস নামক যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হইয়া মৈথিল ভাষায় বহুশত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে "শিবসিংহ সরোজ" নামক হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের প্রামাণিক গবেষণা-পূর্ণ ইতিহাসে অথবা সার গ্রিয়ারসন সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "History of Hindi Literature" বা "Maithil Chrestomathy" গ্রন্থে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না; মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের গীতের সহিত 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলি পদগুলির ভাষা কিম্বা ভাব-গত কোনও সাদৃশ্য নাই। কবিত্ব হিসাবেও সেগুলি নগণ্য। এ অবস্থায় মৈথিল-পঞ্জী অর্থাৎ মৈথিল-বংশ-তালিকায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক কোনও ব্যক্তির নাম পাওয়ায়, তিনিই 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলি পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য মনে হয়। গোবিন্দ কবিরাজ যে ভণিতায় 'দাস' উপাধি দিয়াছেন, উহা বাঙ্গালার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরন্তন প্রথা বটে। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক পদ-কর্ত্তারাও বৈষ্ণবোচিত 'দাস'-অভিমান হেতু স্ব-রচিত পদের ভণিতায় স্বীয় নামের অন্তে দাস উপাধির সংযোগ করিয়াছেন। "বৈদ্য" গোবিন্দ কবিরাজ, তাঁহার অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির জন্য তৎকালীন সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শাস্ত্র-কার শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের নিকট হইতে 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরন্তন-

শিষ্টাচার অনুসারেই নামের শেষে বিনয়-সূচক 'দাস' উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন। মিথিলার গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে নামের শেষে 'দাস' উপাধি সংযোগের দৃষ্টান্ত মোটেই পাওয়া যায় না; সুতরাং অন্য প্রমাণ না থাকিলেও শুধু "গোবিন্দ দাস' ভণিতা দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'গোবিন্দ দাস' আর যিনিই হউন না কেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ-কার গোবিন্দ ঠাকুর কিম্বা মৈথিল-পঞ্জীর উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব গোবিন্দ ঠাকুর নহেন। ইহাঁদের কাহারও নামই দাসান্ত দেখা যায় না; সুতরাং 'দাস' উপাধি নহে, 'গোবিন্দ-চরণ' বা 'গোবিন্দ-প্রসাদ' ইত্যাদি নামের মত 'গোবিন্দ-দাস'ও একটা সম্পূর্ণ নাম, এরূপ তর্ক করাও খাটে না; কেন না, তাহা হইলে কোন-না-কোন স্থলে তাঁহাদের নামের পরিচয়ে সম্পূর্ণ 'গোবিন্দ দাস' নামটা অবশ্যই দুই এক বার উল্লিখিত হইত। গুপ্ত মহাশয় যে পদকল্পতরুর 'দ্বাদশ-মাসিক বিরহ-বর্ণন' পদের মধ্যে 'গোবিন্দ কবিরাজ-ঠকুরের' উল্লেখ দেখিয়াছেন, উহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে, পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কর্ত্তা বৈষ্ণব দাস মিথিলার উক্ত গোবিন্দ ঠাকুরকেই 'কবিরাজ ঠকুর' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার মতেও ঐ পদটীর 'দ্বয় মাস' মিথিলার গোবিন্দ ঠাকুরের রচনা। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেতর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহন্ত ও পদ-কর্ত্তারাও গৌরব-সূচক ঠাকুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—'ঠাকুর নরহরি' 'ঠাকুর নরোত্তম' ইত্যাদি। বৈষ্ণব দাসও এই শিষ্টাচার-মূলেই বৈদ্য গোবিন্দ কবিরাজকেও 'কবিরাজ ঠকুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নাম ও পদাবলী বাঙ্গালায় তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের অবিসংবাদিত পদাবলী হইতে অন্ততঃ দুই চারিটীও উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর ছিল।

গুপ্ত মহাশয় যে গোবিন্দ দাসের "জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদ-কল্পতরুর শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-সূচক পদ-টীতে 'হরিনারায়ণ' শব্দ পাইয়া, উহা মিথিলার রাজার উপাধি (?) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। 'হরি-নারায়ণ' কোনও রাজার উপাধি নহে। উহা শিবসিংহের পরবর্ত্তী মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহেরই নামান্তর। * উক্ত "জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদের ভণিতার কলি এইরূপ—

"ভকত-আনন্দ মরুত-নন্দন
চরণ-কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল
হরি নারায়ণ দেবা॥

* গ্রিয়ারসন সাহেব মহোদয়ের "Maithil Chrestomathy" গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে 'হরি নারায়ণ' কোনও ব্যক্তির নাম অর্থ করিলে 'গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল' এই বাক্যটা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। এই বাক্যের এক মাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে, গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ করিল যে, (বর্ণিত রামচন্দ্র) হরি ও নারায়ণ দেব অর্থাৎ রামচন্দ্র, হরি ও নারায়ণ অভিন্ন দেবতা। শাস্ত্রের মর্ম্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ধারণাও এইরূপই বটে। তবে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যুগের অবতার ইহাতেই যা কিছু পার্থক্য। "বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবিরা রামের বন্দনা করিতেন না এইরূপ একটা ব্যাপক উক্তির উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র —কেহই দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহেন। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য রামায়ণ-কারেরা প্রধানতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামের বন্দনাই করিয়াছেন। প্রত্যেক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই স্বীয় উপাস্য-দেবতার প্রতি পক্ষপাত শোভন ও স্বাভাবিক, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা যে সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাই সাধারণতঃ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! এইরূপ ব্যবহার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতা সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার সপ্তবিংশতি পল্লবটী দেব-বন্দনার তেরটী পদে পূর্ণ বটে। শ্রীগীতগোবিন্দের "প্রলয়-পয়োধি-জলে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ দশাবতার-বর্ণনার দীর্ঘ পদটীর এগারটী কলি এই পল্লবের প্রথমেই এগারটী পদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত দশাবতার বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সামান্যতঃ উল্লেখ ও গণনা থাকিলেও দশাবতারদিগের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রদর্শিত করার জন্যেই বৈষ্ণব গ্রন্থকার আগে ১২শ পদ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাত্মক "শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল" ইত্যাদি জয়দেবের প্রসিদ্ধ পদটী উদ্ধৃত করিয়া পরে ১৩শ পদ-রূপে গোবিন্দদাসের উক্ত শ্রীরাম-বন্দনার পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ বিশেষ প্রয়োজনে পদকল্পতরুতে শ্রীরাম-বন্দনার এই পদটী উদ্ধৃত না হইলে বোধ হয়, উহা এতদিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কেন না পূর্ব্বোক্ত কারণে সাধারণতঃ বৈষ্ণব কীর্ত্তণ-গায়কগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার বন্দনা গাহেন না।

পদকল্পতরুর ২৪১৬ সংখ্যক * পদের ভণিতায় আছে—

"কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দ দাস অনুমান॥"

* এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত পদকল্পতরু সংস্করণের পদ-সংখ্যা দেওয়া হইল। —লেখক

আবার পদকল্পতরুর ৫৩১ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে—

"বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥"

মিথিলার রাজ-বংশের তালিকায় পূর্ব্বোক্ত হরিনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণের পিতার নামান্তর 'নরসিংহ' দেখা যায়; গুপ্ত মহাশয় কোনও রূপ সন্দেহ না করিয়াই উদ্ধৃত ভণিতায় 'নরসিংহ' ও 'রূপনারায়ণ'কে মিথিলার রাজদ্বয় স্থির করিয়া বসিয়াছেন এবং ইহাও গোবিন্দ দাসের মৈথিলত্বের একটা ভাল প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মিথিলার রাজা উক্ত নরসিংহ ও রূপনারায়ণ ছাড়া কি আর কোনও নরসিংহ ও রূপনারায়ণ থাকিতে পারেন না? এই ভণিতাটী লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার "গৌর-পদ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'এ স্থলে তিনি (অর্থাৎ গোবিন্দদাস) পক্ক-পল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভা-পণ্ডিত রূপ নারায়ণকে স্মরণ করিতেছেন মাত্র।" বস্তুতঃ নরসিংহ বা নৃসিংহ বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। পদকল্পতরুর ১১৫৯ ও ১৩২৪ সংখ্যক তোটক-ছন্দের বিচিত্র পদদ্বয় নৃসিংহ দেবের রচিত। গোবিন্দ কবিরাজ খুব সম্ভবতঃ এই নৃসিংহেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আর যদি তর্ক-স্থলে ভণিতার নরসিংহ ও রূপ-নারায়ণকে মিথিলার সেই নরসিংহ ও রূপ-নারায়ণ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই গোবিন্দ দাসের মৈথিলত্ব সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? পরবর্ত্তী ও ভিন্নদেশীয় বাঙ্গালী কবি গোবিন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে কি বিদ্যাপতির প্রতিপালক ও সমকালীন ব্যক্তি সেই রাজা দুইজনের এ ভাবে উল্লেখ করিতে পারেন না? গুপ্ত মহাশয়ের মতেও মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুর বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী; তিনিই বা নিজের প্রতিপালক রাজার গুণ-কীর্ত্তণ না করিয়া অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা দুইজনের স্তুতি করিবেন কেন? বিশেষ প্রসিদ্ধির জন্য সেরূপ করিয়া থাকিলে, বিদ্যাপতির সংস্রবে তাঁহারা বঙ্গদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করায়, বাঙ্গালী গোবিন্দ দাসও সেইরূপ তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তণ করিতে পারেন। গুপ্ত মহাশয় কেবল তাঁহার মতের আপাত-অনুকূল বিষয়গুলিই ধরিয়াছেন, যাহা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, যে জন্যই হউক, উহার ধার দিয়াও যান নাই। ভাষা ও ভাবে সম্পূর্ণ এক-জাতীয় গোবিন্দ দাসের কতকগুলি পদে * রায় বসন্তের ২৪১৫ সংখ্যক পদে

* পদকল্পতরুর ১০৫০, ১৭২০ ও ২৪৩৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য

এবং রায় সন্তোষের ৫৩৮ সংখ্যক পদে 'প্রাত আদিত' নামক ব্যক্তিদিগের প্রশংসা-সূচক উল্লেখ আছে। 'প্রাত আদিত'কে কেহ কেহ বাঙ্গালার রাজা 'প্রতাপ-আদিত্য' নামের ছন্দোমিলনার্থে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর মনে করেন। কোন কোন পুঁথিতে আবার 'প্রাত আদিত' স্থলে 'রায় চম্পতি' পাঠও দেখা যায়। প্রকৃত পাঠ এ দুইটীর মধ্যে যেটীই হউক না কেন, প্রাত আদিত বা রায় চম্পতি কেহই মৈথিল বলিয়া জানা যায় নাই; পক্ষান্তরে রায় চম্পতি যে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের জনৈক মহাপাত্র ছিলেন, তাহা 'চম্পতি' ভণিতা যুক্ত "সখি হে কাহে কহসি কটু ভাষা" ইত্যাদি ৪৮১ সংখ্যক পদের সংস্কৃত টীকায় পদামৃত-সমুদ্র-প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। চম্পতি বা চম্পতি রায়ের রচিত কয়েকটী উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলী পদের ন্যায় তাঁহার রচিত ২।৩টী খাঁটি বাঙ্গালা পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় 'চম্পতি' বিদ্যাপতির একটা উপাধি—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে চম্পতির ব্রজ-বুলী পদগুলি সমস্তই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; * এখানে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বস্তুতঃ 'চম্পতি' এই অর্থ-শূন্য নামটী বৈয়াকরণদিগের উল্লিখিত 'ডিত্থ' 'ডবিত্থ' ইত্যাদি সংজ্ঞার মত ব্যক্তি বিশেষের নাম না হইয়া যে কিরূপে একটা বিশেষণ-বাচক উপাধি হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। 'চম্পতি' শব্দটী 'চমূপতি' (অর্থাৎ সেনানায়ক) শব্দের অপভ্রংশ-জাত, যদি কেহ কষ্ট-কল্পনা দ্বারা এরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলেও আমাদের পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর যে মিথিলার রাজবংশের সেনা-নায়ক হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সেরূপ হইলে ওরূপ অর্থে মৈথিল ভাষায় 'চম্পতি' শব্দের ব্যবহার না থাকারও কোনই কারণ দেখা যায় না। আর যদি 'চম্পতি' সেনা-নায়কই হইবেন, তবে উহার সহিত আবার অন্য আর একটা রায় উপাধি যোড়া হইয়াছে কেন? গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের স্বীকৃত বিশুদ্ধ পাঠ-যুক্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতার 'রায় চম্পতি' শব্দের স্থলে, ছন্দ বজায় রাখিয়া কোন মতেই 'কবি চম্পতি' বা আর কিছু পাঠ কল্পনা করিয়া 'রায়' শব্দটা উড়াইয়া দিতে পারেন না। আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা যদি মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা অন্য কোন মৈথিল কবি হয়েন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালার পদ-কর্ত্তা বসন্ত রায় ও বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সন্তোষ রায়ের (নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত) উল্লেখ কেন করিবেন, গুপ্ত মহাশয়

* অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী গ্রন্থের ভূমিকা ১৶০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ইহার সদুত্তর দিতে পারেন কি ? ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সকলগুলি বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে এই সকল উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের রচয়িতাকে গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় যে বৈষ্ণব-কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, নরসিংহকে পক্কপল্লীর রাজা ও রূপনারায়ণকে তাঁহার সভাপণ্ডিত ঠিক করিয়াছেন, তাহা তর্ক স্থলে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার না করিলেও, বর্ণিত বিরুদ্ধ প্রমাণগুলির সহিত সামঞ্জস্যের জন্যই পরবর্ত্তী বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বহুপূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল রাজার প্রশংসা-সূচক উল্লেখ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য মনে হয়।

এখন ভাষার কথা ধরা যাউক। গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—'গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল। দুঃখের বিষয় তিনি এই কাঠিন্য বা জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করেন নাই; কোনও সন্দিগ্ধ কবি প্রকৃত পক্ষে মৈথিল কি বাঙ্গালী, তাহা নির্ণয়ের জন্য ভাষা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এবং ভাষা ও ভাব-গত পার্থক্যের আলোচনাই যে অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের প্রাচীন মৈথিল ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মিয়াছে উহার সহিত তুলনায় তিনি গোবিন্দ দাসের ভাষাটা কঠিন ও জটিল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন; তিনি একটু নিরপেক্ষ-ভাবে প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির খুব ভক্ত এবং অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকারী হইলেও বিদ্যাপতি ও তাঁহার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতির পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী আর গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস রায়শেখর প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের ভাষা তথাকথিত 'ব্রজবুলী'। বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) সরল স্বাভাবিক; প্রাচীন মৈথিল-ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণতঃ উহা দুর্ব্বোধ্য নহে। গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত 'ব্রজবুলী' সংস্কৃতানুযায়ী দীর্ঘ-সমাসযুক্ত ও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-জাত বহু নব-কল্পিত 'তদ্ভব' শব্দ-পূর্ণ। ইঁহাদিগের বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পারদর্শী গোবিন্দ কবিরাজের রচনা অতিরিক্তরূপে অনুপ্রাস ও 'শ্লেষ' 'রূপক' সমাসোক্তি প্রভৃতি জটিল অলঙ্কার-পূর্ণ। গোবিন্দদাস তাঁহার অনেক পদেই বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ গোস্বামী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি ও রস-শাস্ত্র হইতে ভাব রসের ধারা গ্রহণ করায়, গোবিন্দদাসের পদাবলী ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্য ও রস-তত্ত্বেরও বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এরূপ

পাঠকের সংখ্যা স্বভাবতই খুব বিরল বলিয়াই বৈষ্ণব কাব্যপ্রিয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও গোবিন্দদাসের প্রতি অনুচিত অনাদর দেখা যায়। গোবিন্দদাসের ব্যবহৃত এই তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলি'— তাহার সৃষ্টি হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে; উহা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগেরই নিজস্ব; মৈথিল কবির পক্ষে বিদ্যাপতির অনুকরণে মৈথিলী ভাষায় কবিতা না লিখিয়া এই কল্পিত 'ব্রজবুলি' ভাষায় কবিতা লিখা একান্তই অসম্ভব বটে। গোবিন্দদাসের পদের ভাষা যে মৈথিলী নহে, ব্রজ-বুলি তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে নানা স্থানে ইহা বলিয়া গিয়াছেন; আমরাও নানা স্থানে নানা প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন, সুপণ্ডিত ভাষা-তত্ত্ব-বিদের সাক্ষ্যও অপ্রাপ্য নহে। গত ১৩৩০ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের ভাষা" নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, গোবিন্দদাস তাঁহার রচনায় প্রাকৃত-ভাষার প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাপতির বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিদ্যাপতিরও কিছু ভাব ও ভাষা তাঁহার পদাবলীতে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে' এইরূপ মত প্রকাশ করায়, ঐ প্রবন্ধের আলোচনা উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্ ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় বলেন—"আমি প্রবন্ধটী মনোযোগ দিয়া শুনিলাম, কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত এক-মত হইতে পারিতেছি না। * *

* * * *

বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার রচিত গান বাঙ্গালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙ্গালীদের ভাল লাগায়, তাঁহারা উহা গাহিতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ-চর্চ্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হইবার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে, বাঙ্গালীর মুখে অল্পকালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধি রহিল না; মৈথিলে বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ ঘটিল এবং এই মিশ্রভাষায় দুই চারিটী অবহট্‌ঠ ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তাহা না-মৈথিল না-বাঙ্গালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙ্গালা দেশে লোকের কাছে এই মিশ্র ভাষার একটী নামকরণ হইল; ব্রজমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া

এই পদ, এই জন্য ইহার নাম হইল "ব্রজ-বুলী"। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূলের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ-ভেদ ও মথুরা আগরা অঞ্চলে প্রচলিত 'ব্রজভাষা হইতে এই ব্রজবুলী' হিন্দী নয়, 'ব্রজ ভাষা'ই হিন্দী ; 'ব্রজবুলী' প্রাকৃত প্রভাবে জাত বাঙ্গালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি বাঙ্গালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

স্বাগত

—*—

স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা
স্বাগত প্রিয় সখি মম হৃদি হরষা
হেমন্ত নিদাঘ দিনে　　মীন যথা বারিহীনে
চেয়ে চেয়ে আশাপথে নাহি ছিল ভরসা
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা !
লইয়া কদম্ব শিখী দাদুর আর ডাহুকী
এস,　ভুবন সজল নীল তনুরুচি তমসা
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা !
ও　মৃদঙ্গ গুরু গুরু　　ববে বক্ষে দুরু দুরু
অগুরু-প্রলেপ যেন দগ্ধহৃদে সহসা
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা !
আইসহ ঘনরাণি,　　আলুম্বিত মেঘ-বেণী
নীরব শ্যামহৃদে দুলে সুখ-বিবশা
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা !
স্বাগত মায়াময়ী　　স্বাগত ছায়াময়ী
স্বাগত মম প্রিয়া সিঞ্চন সরসা
স্বাগত শ্যামাঙ্গিনী স্বাগত বরষা।

১লা আষাঢ়, ১৩২১। }

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী

স্বয়ম্বর-সভা

——:•:——

তৃতীয় দৃশ্য

রমেশের দোতলার নির্জ্জন কক্ষ।
সময়—বেলা দুটা তিনটা।

বীণা গান গাহিতেছিল।

(গান)

মম যৌবন-বন-পুষ্প-সুরভি
আকুল করে অন্তরে—
কুহরিছে শত পাপিয়া-পিক
লুব্ধ ভ্রমর গুঞ্জরে
আমি নীল বসনে আবরি কায়া
বসে আছি কার পথ চাওয়া
স্বপনে নেহারি তাহরি ছায়া·
মধুর কোমল কান্তরে।
আজি দখিনে হাওয়ায় উঠেছে ঝড়
আগুন লেগেছে মেঘের পর
চমকি বিজলী থমকি থমকি
শিরা উপশিরা সঞ্চরে;
আমি আঁচলে ধরিতে আকাশের চাঁদ
পেতেছি রূপের মোহন কাঁদ
লাজ মান আর সরমের বাঁধ
টুটে যায় কোন মন্তরে

[নীলা, সুষমা, ললিতার প্রবেশ। সকলের বয়স ১৬।১৭ ললিতার বছরখানেক বিবাহ হইয়াছে]

নীলা—কি লো বীণা! নীল কাপড় পরে কার পথ চেয়ে বসে আছিস লো?

বীণা। তোমাদেরি পথ চেয়ে বসে আছি ভাই—তোমদেরি পথ চেয়ে বসে আছি! ওমা! এর নাম বুঝি তোমাদের দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে আসা? তবু ভাল যে বিকেল ঘেঁসে তোমাদের আমাকে মনে পড়েছে কিন্তু বোসবোই বা কতক্ষণ? এই দ্যাখোনা এক্ষুনি "চুল বাঁধবি আয়" বলে ডাকে!

ললিতা। তুই ত সুষমা রকমারি খোঁপা বাঁধতে শিখেছিস, দে না কেন আজ বীণাকে "[illegible] খোঁপা" বেঁধে?

সু[illegible] আগে তোর "গ্রাজুয়ে[illegible]"।

ল[illegible]। [illegible] গ্রাজুয়েট যে আমার হবে গ্রাজুয়েট-খোঁপা।

বীণা। আমি কি ভাই আকাশে উড়চি যে আমার খোঁপা হবে এরোপ্লেন?

ললিতা। তোর যে বর হচ্চে সে যে তোর খোঁপা এরোপ্লেন হবে না ত কার হবে?

লীলা। আর তোমার যে বর হয়েছে—সেও ত দুমাস গেলেই সসম্মানে বি এ পাশ করবে। সেই বুঝে দিন থাকতে এখন থেকেই তোমার বসনে ভূষণে উপযোগী রিহার্সে'ল দেওয়া দরকার। স্বামীর মিত্তির-টুকু যদি নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পেরেছ ত তার উপাধির বাকী অংশ বাদ পড়ে যাবে কেন? তোমাকেও আমরা এর পরে ললিতা মিত্তির B,A বলে পরিচয় দেবো। বেলাবেলি আসতে পারিনি বলে বীণা তুই আমাদের উপর রাগ কচ্চিস—দোষ আসলে কার জানিস? দোষ হচ্চে,ঐ ললিতা ঠাকুরুণের। ওঁর স্বামী কাল গোধূলি-লগ্নে এসে আজ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সবাই ওঠবার আগে চলে গেছেন। তাইতে করে ললিতার মেজাজটা এমনি বিগড়ে আছে যে সে বাইরে বেরিয়ে মানুষের মুখ আর কিছুতে দেখবে না—বাড়ী বসে বসে খালি "মনোবেদনা কবে সমীরণে গগনে জানাবে জ্বালা"। ঝাড়া দুটি ঘন্টা তার বাড়ীতে হত্যে দেবার পর অবশেষে দেবী প্রসন্ন হলেন, তাই এত দেরী।

ললিতা। না লো না বীণা! শুনিস কেন ওদের ঠাটের কথা! আজ সারা দুপুর বেলা বউদিতে আমাতে ছাতে বসে বসে বড়ি দিয়েছি—তাইতে মাথাটা বড্ডো ধরে গেছলো—গাটাও ঝিম ঝিম কচ্ছিল। তাই বলেছিলুম আজ আর বেরুব না, না হয় রদ্দুর একটু মরে এলে বেরুব। এই একখানা কথাকে সাতখানা করে বল্লে সত্যের মর্য্যাদা কিছু বৃদ্ধি করা হয় না লীলা?

বীণা। যাক্ ও নিয়ে আর তর্কে কাজ নেই, তোমাদের দুজনেরই কথা আমি আধাআধি বিশ্বাস করে নিচ্চি। এখন আমার একটা কথার জবাব দে দিকিনি, এই এত রকম সব পড়া রয়েছে এম্‌এ, বিএ, ডাক্তারী, ইন্‌জিনিয়ারী—এর মধ্যে সব চেয়ে কোন্ পড়াটা ভাল?

ললিতা। এ আবার কি খেয়াল হোলো!

লীলা। আমি বলি ডাক্তারী, তুই কি বলিস লীলা?

সুষমা। আমি বলি ইন্‌জিনিয়ারী, তুই কি বলিস বীণা?

ললিতা। পড়ার আবার ভাল মন্দ কি! যার যেটা রুচি, যার যেটা পছন্দ, সে সেটা পড়বে। আমাদের সে বিচারে কাজ কি? আমরা ত আদার ব্যাপারী!

বীণা। আহা তা বলচি না, বিচার করতে যাচ্চে কে? তবু প্রাণে কোন্‌টা লাগে, তাই জিজ্ঞাসা করচি। কেন তা জানি না, আমার মনে হয়, ডাক্তার ইন-জিনিয়ার, এরা যেন কেমন ভোঁতা ভোঁতা রকমের মানুষ, এদের ভিতর লোহার কাটারির ভার আছে, ইস্পাতের ছুরির ধার শান পালিশ এই কটা জিনিষের যেন

কেমন অভাব। তাই এদের সঙ্গে তর্ক করে কথা কয়ে তেমন একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, এদের যেন কেমন-কেমন বলে মনে হয় তা যতই তারা সাহেবের ময়ুরপুচ্ছ পরে চাল-চলনে চালাক চটপটের হাবভাব দেখিয়ে বেড়াক।

সুষমা। তা ত মনে হবেই কিন্তু শ্রীমান বিমানবিহারী মিত্তির M. A. না পড়ে Medical Collegeএ পোড়তো তা হ'লে ঐ Medical Collegeকেই সরস্বতীর একমাত্র আবাস-ভূমি বলে মনে হোতো।

ললিতা। দেখলি ত বীণা। এই সব কথা শুনতে হবে আগে থাকতেই আন্দাজ করে আমি এতক্ষণ ধরা-ছোঁয়া দিয়ে কোন কথা কইনি, নইলে তোর মতেই আমার মত। বেলা পড়ে এলো, আজ ভাই উঠি।

বীণা। বা রে কথা! এরি মধ্যে উঠি বলে ছুটি চাওয়া হচ্ছে। মজা করে আড়াল থেকে আমার গান শুনে নিয়ে, দূরান্তরে পিট্টান দেবে সেটি হচ্ছে না, একটা গান না শোনালে ছাড়চি না।

ললিতা। সেথা কি গাহিব গান,
ঝঙ্কৃত যেথা আপনি বীণা
স্বর্ণ-তন্ত্রী বক্ষ-লীনা

বীণা। (বাধা দিয়া) থাম থাম—
চঞ্চলমনা ললিতা কিনা
বাড়ী যেতে আনচান্!

ললিতা। গলাটা ভাই বড় ভেঙে গেছে।

লীলা। গালটা যে বেশ রেঙে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু গলা-টাও যে ভেঙে গিয়েছে তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছি না।

সুষমা। ও গালগলা আওড়ানির দাওয়াই আমি বাতলে দিচ্চি ললিতা,—প্রাতে এবং বৈকালে এক এক পেয়ালা চা, কিঞ্চিৎ পরিমাণ আদার রস এবং অধিক পরিমাণ চিনি ও দুগ্ধ সহ।

ললিতা। তোরা তবে কথা নিয়েই থাক—আমাকে ছেড়ে দে এখন।

সকলে। আচ্ছা থামচি থামচি।

ললিতা। যে কথাটি কয়েছিল
কানে কানে,
আজি বেদনায় বেজে ওঠে
প্রাণে প্রাণে।
সরমে সাহস-হীনা,
বেসুরে বাজিল বীণা,
অবুঝ না বুঝে কি না—
চলে গেল মানে মানে।
তৃষিত মুখ তারি পড়িচে মনে
মিনতি ভরা জল নয়ন-কোণে
যদি কেহ তারে আনে ফিরে
আনে আনে!

লীলা। কাউকে আনতে যেতে হবে না লো—কাউকে আনতে যেতে হবে না—সাত দিন সবুর করো—পাখী ঘুরে ফিরে আপনিই এসে খাঁচায় ধরা দেবে।

সুষমা। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই, ফুল-চন্দন পড়ুক।

লীলা। কিন্তু তাতে ত ভাই আমার পেট ভরবে না।

বীণা। আরে! ঐ রকম ফুল-চন্দন পড়তে পড়তেই ত খবর শুনবি যে, একদিন ললিতার বাড়ী মহোৎসবে মহাসমারোহে আমাদের পাতে লুচি ব্যঞ্জন পড়বার তুমুল আয়োজন পড়ে গেছে।

ললিতা। সাধে বলি—

বীণা। (বাধা দিয়া ন্যাকামির ঢং-এ) কি বলচিস! সাদে আমাদের নেমন্তন্ন করবি না? কুচ পরোয়া নেই। মিনি নেমন্তন্নেই আমরা তদীয় ভবনে সবান্ধবে শুভাগমন করতঃ আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিব।

ললিতা। অনেক রকমারি বোল কেটেচিস এখন থাম একটু।

সুষমা। কি লো ওঠ্‌না—

লীলা। দেখচিস ত বীণা, তাগাদার ঠেলা—এখন যাওয়া যাক তা'লে।

বীণা। আচ্ছা।

চতুর্থ দৃশ্য

বিমানের পড়িবার ঘর।

কাল—সন্ধ্যার কিছু পরে।

বিমান (উদাস ভাবে)—গান।

সুনীল গগনে চাঁদের কিরণে
　উজল ভুবনে পুলক ছায়
পবনে পবনে বকুলেরি বনে
　কার কথা মনে পড়িয়া যায়,
আলো চোখে লাগে পল্লীরা জাগে
　কুঙ্কুম পরাগে মিলালো কায়
(কে সে) স্বপনেরি কূলে এলো এলোচুলে
　কোলে নিতে তুলে পরাণ চায়।

না, সন্ধ্যে বেলাটা ঘরে বন্দী থেকে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠবার দাখিল হয়েছে। বিজয়, ললিত, এরা সন্ধ্যে বেলা আসবে বলেছিল, কৈ তাদের ত দেখা নেই—সন্ধ্যে ত কোনকালে উৎরে গেছে। ভাল ছেলের মতন বই নিয়ে বসে পোড়বো নাকি? কিন্তু পাঠ্য কেতাবগুলো কি অপাঠ্যই করে তুলেছে—ও আর একদম্ ছুঁতে ইচ্ছে যায় না—ওতে জন্মের অরুচি ধরিয়ে দিয়েছে। দাদা যে-বছর পশ্চিম গেছলো,সেই বছর মেস থেকে কলেজ করি—মনে পড়ে কপির তরকারির ওপর অঘ্রাণ মাসেই ঠাকুর এমনি অরুচি ধরিয়ে দিয়েছিল। দিন কতক বাদে ফিরে এসে বউদিদি সেই কপির তরকারিই আবার রেঁধে খাইয়েছিল কিন্তু সে যেন আর এক জিনিষ। সবটা খেয়ে ফেলে বউদিকে বল্লুম 'বউদি তুমি সিমলের বাজার থেকে এ কপি আনিয়েছ, মাধব বাবুর বাজারের কপিতে কেন এমন রান্না হয় না বলদিকিনি?' বউদি হেসে বল্লে 'ও যে ভাই পটলডাঙ্গা, ওখানে কি ভাল কপি ফলে?' আমাদের কলেজের গুরুমশাইদের শিক্ষা-প্রণালী আর কলেজের মেসের ঠাকুর মশাইদের পাক-প্রণালী দুয়েরি বিশেষত্ব এই যে, জিনিষটার স্বাভাবিক রস কোন

রকম করে মেরে ফেলে অস্বাভাবিক উপায়ে সেটাকে যতদূর সম্ভব বিস্বাদ করে তোলা! কিন্তু কি বাজে বকচি আপন খেয়ালে! মিছে দোষ দিচ্চি মাষ্টার মশাইদের পড়ানোর ওপর—তাদের শিক্ষা-প্রণালীর ওপর। দোষ ত পড়ানোর নয়, দোষ পড়ার। আমরা স্বখাত-সলিলে ডুবে মরতে বসেচি। নাই বা পড়লুম? কি হবে পড়ে? একগাদা বইএর চাপে যৌবনের দম আটকে দেওয়া—এরই ত অপর নাম লেখা-পড়া। কিন্তু লেখা-পড়া ত আমাকে বেঁধে রাখেনি, আমি আপনিই আপনাকে বাঁধা দিয়েছি; সে বাঁধন ত এই মুহূর্ত্তেই কেটে দিয়ে ছাড়া পেতে পারি। তা হলেই কি সুখ পাব? তা ত মনে হচ্চে না। জীবনের কোন্‌খানটায় যেন বেকল হয়ে গেছে—চারদিক তাই বড্ড insipid ঠেকচে। যাই—বাড়ীতে সন্ধ্যে-বেলা বসে বসে মেজাজটা আরও খারাপ বে-এক্তার হয়ে উঠেছে, যাই ট্রামে একটা লম্বা পাড়ি দিয়ে আসি। নাঃ আর বেরুব না; হয়তো এখুনই বন্ধুদের কেউ এসে পড়বে। আচ্ছা, আমাকে কত লোক ত এসে হামেশা দেখে যায় কিন্তু বউবাজার থেকে সেই যে ভদ্রলোক প্রোফেসারটি এসেছিল—থেকে থেকে তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কেন। যাই বউদির কাছে; গেলেই কিন্তু ঠিক বুঝতে পারবে, আজ বৌদি রমেশ বাবুর শালীকে দেখতে গেছলো তারই খপরের সন্ধানে আমি এসেচি। উঃ বউদি কি চালাক! ভগবান মেয়েমানুষদের কি মনস্তত্ত্ববিদ করে তৈরী করেছেন? ওরা দেখতে পাই মনের কথাটি ঠিক আগে থাকতেই ধরে ফেলে! যা মনে করতে হয় করুক গে, যাই বউদির কাছেই যাই।

পঞ্চম দৃশ্য

রমেশের কক্ষ। রবিবার অপরাহ্ন।

সরলা। হ্যাঁগা দুধের হিসেবটা একবার দেখে দেবে? গোয়ালা বউ ৪।৫ দিন হলো তার ফর্দ্দ দিয়ে গেছে দিয়ে ভারি তাগাদা লাগিয়েছে।

রমেশ। জান আমি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক আর তুমি যা চাইচ তা গণিত—আমার অধিকৃত সাম্রাজ্যের বাইরে—Beyond my province.

সরলা। তোমায় অনধিকার-চর্চ্চা করতে বলেচি? কসুর হয়েছে! এখন একটু বসো দিকিনি একটা কথা আছে। সপ্তাহে একটা দিন রবিবার—তাও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে? অন্যদিন সারা দুপুর বেলাটা কি করে কাটে আমার—একবার ভেবে দেখেছ? মাইরি তুমি বড় স্বার্থপর—কেবল নিজেরই সুখের সন্ধানে ফের—একটিবার আমার দিকে চেয়েও দ্যাখোনা।

রমেশ। হুঁ।

সরলা। কিন্তু এমন দিন বরাবর ছিল না—সে একদিন ছিল যখন তুমি এক দণ্ড না দেখলে আমাকে, পলকে প্রলয় দেখ্‌তে!

রমেশ। সে তখন তোমার প্রথম যৌবন—হরিণীর মত দুটি চোখে তোমার তখন বিদ্যুৎ খেলচে—নরম নরম গাল দুটি থেকে আঙুরের রং ফেটে বেরুচ্চে—লাল লাল ঠোঁট দুটি যেন বেদানার রসে টস্ টস্ করছে।

সরলা। আঙুর! বেদানা! একেবারে মেওয়ার দোকান খুলে বসেছিলুম বল!

রমেশ। তাইত বলচি! কলেজ থেকে তখনই বেরুইনি—অনভ্যস্ত চোখের সামনে রূপের ডালি বোঝাই করে নিয়ে এসে তুমি দাঁড়ালে। তোমায় দেখে দেখে আমার আশা আর মিটতো না। ভিখিরীর হাতে এক মুঠো মোহর দিলে সে যেমন তাদের একশোবার উল্টে পাল্টে নাড়তে চাড়তে থাকে।

সরলা। বুঝেচি, বুঝেচি, তেমনি তুমিও আমাকে একশোবার নাড়তে চাড়তে আর দেখতে খানিক খানিক! এখন বুঝি আঙুরের রং ফিকে হয়ে গেছে, বেদানার রসে কস ধরেছে—তাই এত অবহেলা!

রমেশ। আরে! সে কথা বলচি না—বলচি যে এখন তুমি অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছ। তখন মনে পড়ে তোমার গালের এক এক চুমুক চুমো যেন এক এক আইস ব্র্যাণ্ডি!

সরলা। আর এখন এক এক চামচ চা—দিন কতক বাদে একেবারে ঠাণ্ডা জল—না? মনে পড়ে কি তখনকার -কত হাসি খেলা প্রমোদের মেলা, সারা দিনমান কাননে ফুল-মালা গাঁথা, কানে কানে কথা, সুখ-ভরা ব্যথা, নয়নে বাহু-ডোরে বাঁধা পায়ে ধরে কাঁদা, কত সাধাসাধি, কতদিন অভিসার-নিশা প্রণয়েরি তৃষা।

রমেশ। তুমি মনে পড়িয়ে দেবে তবে মনে পড়বে! এখনো যে চোখের সামনে জল জল করচে দেখতে পাচ্চি। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরচি আর রাস্তার ধারের জানালা আধখানা খুলে ওৎ পেতে তুমি বসে রয়েছ—যাই চারচোখ হওয়া অমনি একগাল হাসি।

সরলা। আর আমিও চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি—পান সাজচি কি লুচি বেলচি আর আচমকা অমনি পেছন থেকে এসে—কেউ দেখতে পাবে সে খেয়ালই নেই—আমিও যে মুখ ফিরিয়ে নোবো তারও জো নেই—ঘাড় ধরে জবরদস্তিসে তার ওপর—তার ওপর অমন একশোটা।

রমেশ। আমার ত জবরদস্তি! আর একটু মেঘলা হ'লে—একটু বেশী শীত পড়লে—যে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে কলেজ কামাই করবার হুকুম জারি করা হতো যে হুকুম তামিল না করলে আমার রক্ষা থাকতো না—সে ত জবদস্তি নয়—সে মৃদু অনুরোধ মাত্র—কি বল?

সরলা। মনে পড়ে কি গির্জ্জের ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যাচ্চে—চোখে ঘুম নেই, গল্পের অন্ত নেই—এমনি করে কত রাত্তিরের পর রাত্তির কেটে গিয়েছে।

রমেশ। আর এখন যাই কথা কইবার উপক্রম করেছি অমনি কিনা ঘুমে তোমার চোক জড়িয়ে এলো, কথা এড়িয়ে এলো।

সরলা। বেশ উল্টো চাপ দিতে শিখেছ ত! মনে পড়ে কি একবার আমাদের বিয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তুমি আমাকে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি রকম ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়েছিলে! সত্যি, সে দিন আমার পৃথিবীটাকে স্বর্গ বলে ভ্রম হয়েছিল।

রমেশ। আর আমাকে দেবতা বলে ভ্রম হয়েছিল—কেমন, না?

সরলা। ইস্

রমেশ। আর এক বছর মনে আছে—পান্সী ভাড়া করে রাত্তির ১২টা অবধি বেড়ানো? তুমি সে রাত্তির মাঝ-গঙ্গায় কি রকম পঞ্চমে গান ধরেছিলে—'জীবন যৌবন সঁপেছি তোমারে নাথ প্রাণনাথ হে'! আমি বল্লুম—গঙ্গার ওপর সমঝে কথা বোলো; তুমি খুব সমঝেচি বলে—সুর আরো চড়িয়ে দিলে; আমি বল্লুম—থাম থাম ঘাটের আশপাশের লোক মনে করবে কি?—তুমি আবার গান ধরলে—

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ।

সরলা। মনে আর নেই? সে বারেই ত তুমি বাড়ী ফিরে এসে আমার গায়ের ওপর এক বোতল অডিকলোন উজোড় করে দিলে! চোখে লেগে শেষে মরি আর কি! পাছে অপ্রতিভ হও তাই তোমায় সে কথা জানতে দিইনি!

রমেশ। সে ত আর-এক বছর—আমি যে-বারে নিজের হাতে খোঁপা বেঁধে দি, চোখে কাজল পরিয়ে দি, পায়ে আলতা পড়িয়ে দি! মনে নাই তুমি যে, সেই বলে উঠলে—যাঃ যাঃ সব আলতা ধুয়ে গেল বলে চেয়ারের ওপর বসে একটি পা'র ওপর আর একটি পা তুলে কত সন্তর্পণে দেখতে লাগলে! আমার সে ছবি আজো চোখে লেগে রয়েছে যে! আচ্ছা, আনাড়ি হাতে কি রকম ওস্তাদি খোঁপা বানিয়েছিলুম বল?

সরলা। তুমি খুব বাহাদুর! এখন কথা শোন—আমাদের বিয়ের Anniversary Day ১২ই ফাল্গুন ত এসে পোড়লো—এ বারে তার জন্যে কি রকম আয়োজন করবে ভেবেচ?

রমেশ। তোমার কি মতলবখানা বলেই ফেল না। তার পর কাট ছাঁট যা করতে হয় আমি কোরবো এখন।

সরলা। কাট ছাঁট করতে তুমি যে খুব মজবুত—তা আমি জানি। এখন শোন তবে—এবারে একটা মজা করতে হবে। প্রথমতঃ—মাসখানেকের জন্যে আলাদা একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ—সেই ঠিকানায় খপরের কাগজে আমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতে হবে।

রমেশ। এমন কি বিজ্ঞাপন যে, তার জন্যে অন্য একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে?

সরলা। সেই যে সেদিন স্বয়ম্বর সভা

ডাকবো বলেছিলুম—তারই বিজ্ঞাপন গো তারই বিজ্ঞাপন।

রমেশ। কথাটা পরিষ্কার করেই বলো না। তোমার হেঁয়ালিতে কথা ভাল বুঝতে পাচ্চি না।

সরলা। আচ্ছা বিজ্ঞাপনটা কি রকম হবে পড়লেই আসল জিনিষটা ধরতে পারবে।

(টয়লেট টেবিলের টানার ভিতর থেকে এক টুকরা কাগজ লইয়া পাঠ)

Situation Vacant

Wanted a candidate for the hands of the undersigned a young Hindu lady of handsome appearance. No restriction of creed, caste, colour or age. Apply sharp with copies of photos and testimonials. Free board and lodging will be supplied on doing light domestic duties in leisure hours such as sewing, marketing, preparing tea, boiling milk etc. Final selection after interviews. Apply by letters only in the first instance

Sarola Bose
—Street, Calcutta

কর্ম্মখালি

নিম্নস্বাক্ষরকারিণী একটি সুন্দরী হিন্দু যুবতীর জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ও বয়স নির্ব্বিশেষে একজন পাণিপ্রার্থী আবশ্যক। ফটো-সম্বলিত প্রশংসাপত্র সহ সত্বর আবেদন করুন। অবসর মত সেলাই, বাজার, চা-তৈয়ারী, দুধ-জ্বাল প্রভৃতি হাল্কা রকমের গৃহকার্য্য করিলে থাইবার এবং থাকিবার খরচ লাগিবে না। প্রথমতঃ পত্রের দ্বারা আবেদন করিতে হইবে। শেষ-নির্ব্বাচন দেখা শুনার পর করা হইবে।

সরলা বসু,
—ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইংরিজি আর বাংলা খপরের কাগজে এই দু রকম বিজ্ঞাপন দিতে হবে। রকম রেরকম ফটো-সম্বলিত রকম বে-রকমের দরখাস্ত ঝড়াঝড় এসে পড়বে—আর তার মধ্যে বাছাই করে ৫।৭ জনকে ঐ দিন অর্থাৎ ১২ই ফাল্গুন interview দেবার ব্যবস্থা করতে হবে—আর তাদের প্রত্যেকের মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে। কেমন, বেশ মজা হবে না? সাধে কি বলেছি—স্বয়ম্বর সভা।

রমেশ। তোমার মাথায় এতও দুষ্টুমি ফিকির খেলে!

সরলা। দুষ্টুমি আবার কি! রুদ্ধগৃহেই করি বাস বারমাস; বাইরের ত কিছু খপরই আমাদের কাছে পৌঁছোয় না—এতে করে তোমাদের পুরুষের ভেতর কত

রকমের বেকুব আছে তার একটু পরিচয় পাওয়া যাবে।

রমেশ। কিন্তু এ যে আগুন নিয়ে খেলা! আমি তোমায় ভরসা করে ছেড়ে দেবো কি করে?

সরলা। আচ্ছা; তুমি ত এখন সব উদ্যুগ কর গে তার পর ভয় কি ভরসা—বোঝা যাবে। কথায় কথায় বেলাও পড়ে এসেছে দেখচি—এখন যাই, অনেক কায কর্ম্ম পড়ে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

রূপের রূপকতা

—:০:—

Myth সৃষ্ট হল—রূপ-সৃষ্টির প্রয়োজনে ভাবজগতে তাকে ভাষা নানা উপায়ে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশের চেষ্টা করল। এই সমস্ত ভাষা কাব্যের ভাষা আর্টের ভাষা এর ভিতর সুরের ঝঙ্কার এল, এর সঙ্গে নৃত্য যুক্ত হ'ল—তবুও যেন মানুষের তৃপ্তি হল না। ভাষার নোঙর ছিঁড়ে পড়ল ভাবের টানে—প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্ত বলতে দ্বিধা করলে না—

"A thousand heads had Purusha, a thousand eyes, a thousand feet.

He covered earth on every side and spread ten finger's width beyond."

ঋকে বরুণ স্তবের একটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

"O Lord Varuna, may this song go well to thy heart.

Thou who knowest the place of birds that fly through the sky, who on the waters knowest the ships.

Thou who knowest the track of the wind of the wide, the bright, the mighty and knowest those who reside on high!"

সমস্ত ভুবনের ওতঃপ্রোত বিভূতির ভিতর এমনিভাবে ঐক্য স্থাপিত হ'ল।

চীনদেশে Shang কল্পিত হ'ল।

ইনিই আদিম চৈনিকের কল্পনার সৃষ্টি—তাঁকে এ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :— "Thou madest heaven, Thou madest earth, Thou madest man. All things got their being from thee ... ..." পরবর্ত্তী কালে কোয়াং ইন বা মাতৃ-মূর্ত্তিরও প্রসার হ'ল তা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পশ্চাতে বহু দেববাদ চীনদেশে এল! মিশরীয়েরা কল্পনা করল 'আমন'কে—তার সঙ্গে 'Ra' বা সূর্যদেবকে যুক্ত করে সৃষ্ট হল 'আমনরা'। ইজিপ্টের cot-gods, moon gods প্রভৃতি সকলের পরিচিত। এমনিভাবে মিশরে ইতর জন্তু ও মানুষের রূপ মিলে একটা বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হল। Babylonএর Anu, আকাশ Malge, পৃথিবী এবং Ea গভীর সমুদ্র দেবরূপ ধারণ করলে। এদের ভিতর Merodach বা সূর্য্য-দেবতার প্রাধান্যই বেশী—তাঁকে redeemer of mankind বলা হয়। তা ছাড়া Nebo Remman প্রভৃতি দেবতাও আছে। আধুনিক Zuluদের Vukululu আছে এবং Brazilionদের Zainoa রয়েছে, এ দেবতারা প্রত্যেক দেশের আবহাওয়ার হিসাবে কল্পিত হয়েছে ; এজন্য যখন তারা ললিত কলার বিশেষ আবেষ্টনে এসে পড়েছে, তখন বিচিত্র বিভিন্ন রূপযুক্ত হয়েছে। কল্পনার নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে এদের ভিতর সামাজিকতা, বন্ধুতা ও সংগ্রামও হয়েছে—কখন কারও জয় বা কারও পরাজয় ঘটেছে। কোন কোন জাতির বা sectএর দেবতা এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে—তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত আদিম দেবতাকে একটা hierarchyর ভিতর ফেলে একটা বিরাট Synthesis ঘটিয়ে তুলেছিল।

কথিত আছে নালন্দা-নিবাসী যোগাচার্য্য গুরু পদ্মসম্ভব এ কাজ করেন। সমস্ত তিব্বতী দেবতাকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের নববিধানে স্থান দেন। এইরূপ দেবতাদের বন্ধনের ভিতর দিয়ে মানুষের বন্ধন ঘটেছে—ভারত ও তিব্বতকে আর্ট এক করেছে।

আর্টের ধর্ম্মই হচ্ছে বহুকে এক করা। প্রত্যেক রাষ্ট্র, জাতি বা গোষ্ঠীর ভিতর ঐক্যমূলক myth অখণ্ড আদর্শ ও রূপ ধর্ম্মের সাধারণত্ব সকলকে এক ভাবের ভাবুক, এক আদর্শের উপাসক, এক ভবিষ্যতের কাল্পনিক করে তোলে।

এইরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই mythএর সৃষ্টি হয়েছে। তার ভিতর racial solidarity কাজ করেছে।

এই myth-সৃষ্টি এখন যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। নব্য আইরিশ সাহিত্য ইদানীন্তন কালে অনেকটা Folklore হ'তে এর কম একটা দেববাদ ও অতীত-পুরুষবাদ সৃষ্টি করে তার ভিতর থেকে কাব্যের খাদ্য আহরণ করতে চেষ্টা করে। কারণ ললিতকলা এই ভাবোদ্যানের ভিতর

হ'তে সুরভিত পুষ্পচয়ন করে তাকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

কবিবর Yeats, A. E প্রভৃতি রসস্রষ্টারা আয়র্লণ্ডের নব্য জাতীয়তা এ রকমের একটা দেবৃবাদের ভিতর দিয়ে জাগ্রত করেছেন।

যে সব উপকরণ হতে এরূপ দেববাদ হয়েছে, সে সব উপকরণ এখন আর নাই। দেবতাকে কেউ বিশ্বাস করে না এযুগে এজন্য আধুনিক ডিমক্রেসী সবকে ভূমিসাৎ করে গৌরবান্বিত হচ্ছে। এখনও প্রাচীন দেবের দোহাই চল্‌ছে, নূতন দেবতা আর হচ্ছে না দেবতারা অতীতের সম্পত্তি হয়ে আছেন—কেউ নূতন দেবতা কল্পনা করতে পাচ্ছে না।

তবুও নূতনের কল্পনা হচ্ছে এ যুগে অদৃশ্যশক্তির একটা গ্রহণীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, নাট্যমঞ্চে নানাভাবে এ রকমের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী লীলা দেখবার নূতন উৎসাহ সম্প্রতি হয়েছে। এ যুগের mythsএর স্থান দখল করেছে জগজ্জয়ী machine, তা' শক্তিতে দেবত্ব না হোক্ দানবত্বকেও হার মানিয়েছে। নানারকম যন্ত্রবাহুল্য আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তাতে করে নগর ও নগরের উপকণ্ঠে ধূমায়মান চিমনি-বহুল নূতন রাজ্য রচিত হচ্ছে। এ সমস্ত হচ্ছে এ যুগের নূতন ভাব-প্রকাশের উপলক্ষ্য—নূতন myths। এ সবকে কুৎসিৎ বলা এক সময় সুলভ ছিল। অতীতই ভাল—"The modern invention and the results of them are uglyeries and the aesthete। এখন সে ভাব আর নেই। রুষিয়ার রঙ্গমঞ্চে এই সমস্ত machineryকে প্রতীক স্থানীয় করার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষতঃ কোন জায়গায় machineএর সঙ্গে আধুনিক কলার যে মিল আছে তাও ধরা পড়েছে। এ দুটিই পরিচিত organic formকে তুচ্ছ করে থাকে। Machine এরূপ abstract lineএর তৈরী। আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও এই রকম abstract line দিয়ে পট তৈরী হচ্ছে—তবে তাতে এই লাইনগুলিকে শুধু তার প্রয়োজনীয় সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে একটা লীলায়িত বাহুল্য দেওয়ার চেষ্টা আছে মাত্র। দুটিতেই কেবল রেখার লীলা আছে—কোন চেহারার প্রতিরূপ নয়। এইখানেই তাদের ঐক্য।

Mythকে অনেকে চায় না। ইতালীয় Futuristরা মনে করে—অতীতের দিকে অত্যুগ্র আনুরক্তির জন্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত গড়ে উঠছে না—তারা চায়—"the utter destruction in men's memory of the past"—তারা চায়—"that the greasy leprous palaces of Venice shall be razed to the ground," যা'তে করে আবার নূতন myth, নূতন কল্পনা ও নূতন আর্ট গড়ে উঠবে।

New mythsএর আলোচনা-প্রসঙ্গে

নব্য নগরীর মরীচিকার কথা উঠে। নূতন বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত নগরের চারিধারে বিরাট কুণ্ডলায়িত অগ্নিগর্ভের আবর্ত্তে অবিশ্রাম হাতুড়ি চালাচ্ছে—যা দশবছরে তৈরী হতে পারে না—তা দশ মিনিটে তৈরী হচ্ছে, এ অস্বীকার করা যায় না। সহস্রযোজন দূরে যেতে হলে আর দেবতাদের পুষ্পক-রথের অপেক্ষা করতে হচ্ছে না—নূতন machine তা' করে তুলেছে—সহস্র-যোজন ইঙ্গিত-প্রেরণাও আধুনিক যন্ত্র সম্পন্ন কচ্ছে ! লক্ষযোজন দেখতে হলে যন্ত্রদানবের সাহায্যে সহজেই হচ্ছে। ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করতে হলে যন্ত্র-রক্ষ করে দিচ্ছে। এরূপে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সমস্ত ব্যপারই আধুনিক যন্ত্র-দানবের সাহায্যে কোন-না-কোন উপায়ে সম্পন্ন হচ্ছে। কাজেই এদের নিয়ে কোন ভাবাত্মক রচনা আর্টে জন্মলাভ করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষ পুরাতনকে ছাড়তে পাচ্ছে না বলে এই নূতন myth সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে পাচ্ছে না ; এবং এই নূতন mythএর যে ইন্দ্রপুরী—অর্থাৎ new city তাকে কবিতা বা চিত্র ভাল করে' ঠাহর করতে পারছে না ! ক্রমশঃ নূতন যুগের নূতন ভাষায় এই ইন্দ্রপুরীর জয়-গাথা ধ্বনিত করা হচ্ছে। নূতনেরা বলছেন :—The city is in progress. The country with its idylls and its old time peace and beauty must die or only exist at a slave's ra isom for it is the foe of progress. In herself the city concentrates energy, "red strength and new light' to inflame with fever and fecund fury the brains of those heroes, scholars, artists, apostles, adventurers who pierce the wall of mystery that glooms the world, discover new laws, and subdue the vast forces of life imprisoned in matter."

নব্য মিথের এই চরম চক্রের কথা বলতে হচ্ছে এজন্য যে, এ শ্রেণীর কল্পনা আদিম ইতিহাস হ'তে আরম্ভ হয়ে এখনও শেষ হয়নি, এখনও চলছে। এখন আর প্রাচীন দেববাদ চলছে না—নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে ভাবের চৈনিক প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে।

এই myth সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টিমূলক বৃত্তির বা creative instinctএর একটা বিকাশ। সে এমনি ধারাবাহিকভাবে সমস্ত জাতীয় ইতিহাসের প্রারম্ভে একটা তাজ-মহলের রূপজাল বুনেছে—তারই প্রতি রেখায় মানুষ স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে চলাফেরা করেছে বহুকাল। এবং এই হর্ম্ম্যের কোন কোন অবয়ব নিয়ে সে বিশিষ্ট-ভাবে আর্টে নয়—fine আর্টেও ক্রীড়া করেছে। ইতিহাসে সে সমস্ত সৃষ্টির

উন্নত শিখরগুলি চোখে পড়ে বলে তা'দের ভিত্তিগুলিও একবার খুঁড়ে দেখা দরকার।

সব দেবতারা Fine artএ স্থান পায় নি—মহাকাব্য, পুরাণ বা প্রাচীন myth-এর সমস্ত উপাখ্যান, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য বা কবিতায় স্থান পায় নি। ও-সব ছিল সমস্ত জাতির background বা একটা সাধারণ ভিত্তি। ও-সমস্তের ভিতর বিশিষ্ট কারণে নানা যুগের ঘটনার আবর্ত্ত ও প্রবাহে এক একটা বিশিষ্ট ব্যাপার ললিত কলায় ব্যাপ্ত করা হয়েছে। যা পুরাণে বলা চলে—তা হয়ত চিত্রের বিষয়ীভূত করা শক্ত। প্রত্যেক ললিত-কলার একটা সীমা আছে—সেটা তাকে রক্ষা করে চলতে হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

নন্দিনী

—০:০—

মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সকলের কাছে ডাক নাম মুখুয্যে মহাশয়। কলিকাতায় সওদাগরী আফিসে তিনি উচ্চ পদের কর্ম্মচারী। মনিবওয়ারী কাজে অনেক সময় মুখুয্যে মহাশয়ের বিদেশ-যাত্রা ঘটে। সেজন্য বেশ দুপয়সা প্রাপ্তি আছে। এ দিকে হাতও খুব দরাজ। পয়সার স্পর্শ মাত্রই নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি-শূন্য করে উত্তেজনার ফলে সঞ্চয়ের দিক ফাঁক আর পরিচিতমণ্ডলীর স্নেহ-মাখা আদর।

মনিবওয়ারী কাজে মুখুয্যে মহাশয় বিদেশে গিয়াছেন। সেখানে একদিন রেলের ইষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দেখেন যে, একটা যুবক মূর্চ্ছিত। রেলের ডাক্তারের যত্নে তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। কিছু পরে যখন যুবক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে চক্ষু মেলিল তখন মুখুয্যে মহাশয়ও মাথা তুলিয়া ডাক্তারের কথায় জানিলেন যে,প্রাণের ভয় নাই বটে কিন্তু কিছুদিন নিবিষ্টভাবে সেবা শুশ্রূষা ও পথ্যের প্রয়োজন। নতুবা এ যাত্রায় শেষ ফলের নিশ্চয়তা নাই, খারাপেরই কোন না কোন প্রকার সম্ভাবনা আছে। হাঁসপাতালের কথা মনে স্থানই পায় না। হাঁসপাতাল অনেকগুলো ইষ্টেশনের পরে। দারুণ গরম। এ সময় রেলে অতদূরে যাওয়া

রোগীর পক্ষে ইচ্ছায় মৃত্যু-মুখে প্রবেশ। অন্য কোন উপায় আছে কিনা তাহারই অনুসন্ধানের প্রয়োজন। অন্য উপায়ের অভাবে ব্যবস্থা দাঁড়াইল যে, রোগীকে বাসায় রাখিয়া ডাক্তারের উপদেশ মত সেবা শুশ্রূষার ভার মুখুয্যে মহাশয়ের উপর; আর ডাক্তার সুবিধামত রেলে আসিয়া রোগী দেখিবেন। কার্য্যও হইল ব্যবস্থা মত। কয়েকদিন রোগী ছিল নির্ব্বাক, জ্ঞানও ছিল দুরাশার আশার মত ক্ষীণ। শয্যাশায়ী রোগী ইশারা ইঙ্গিতে মাত্র নিজের অভাব প্রকাশে সক্ষম। এই প্রকারে তিন সপ্তাহ কাটিল। শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার উন্নতিতে ক্রমে জানা গেল যে, রোগী দুর্লভপুরের জমীদার নৃসিংহ রায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীকান্ত। বিমাতার সহিত বিবাদ-বশতঃ গৃহত্যাগী। বিবাদ যে কি তাহার উল্লেখ হয় নাই। এই সংবাদ পাইয়া নৃসিংহ বাবু অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একমাত্র পুরাতন বিশ্বাসী চাকর। পিতা-পুত্রের নির্জ্জন কথাবার্ত্তার ফলে নৃসিংহ বাবু অসুখের জন্য ব্যয়ের টাকা মুখুয্যে মহাশয়কে দিতে চাহিলেন। কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় জোড়হস্তে টাকা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় নৃসিংহ বাবু সে বিষয়ে আর জেদ করিলেন না। শ্রীকান্তের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য মুখুয্যে মহাশয়কে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া তিনি রেলে উঠিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া এক বেনামী চিঠির ভিতর মুখুয্যে মশায় দেখেন পাঁচশ টাকা। টাকার প্রকৃত তত্ত্ব সহজেই বুঝিয়া মুখুয্যে মশায় সেটা সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। নিজে ব্যবহার করিলেন না। পরবৎসর সেই টাকায় শ্রীকান্তের বিবাহের যৌতুক দান হইল।

(২)

শ্রীকান্তের কলিকাতার বাড়ীতেই সস্ত্রীক বাস। দূর সম্পর্কের বিধবা মাসীমা হরিপ্রিয়া দেবী বাড়ীর গৃহিনী। পাল-পার্ব্বণে দুর্লভপুরে গতি আর শেষ হইলেই কলিকাতায় পুনরাবৃত্তি। শ্রীকান্তের মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে গুরুশিষ্য-ভাব। এমন দিন প্রায় যায় না যে দেখা না হয়। মুখুয্যে মশায়ের ভাগ্যে কএকবার দুর্লভ-পুরে পূজা দেখা ঘটে। দুর্লভপুর নদীর উপর—ম্যালেরিয়া-মুক্ত। যাতায়াতের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই।

এদিকে মুখুয্যে মশায়ের পরামর্শে আলি-পুরের কোর্ট্‌ অভ্‌ ওয়ার্ডসের ম্যানেজারের শিক্ষায় জমীদারী কার্য্যে শ্রীকান্ত সুদক্ষ। অধিকন্তু প্রাচীন পদসংগ্রহে ও তাহার সঙ্গীতে প্রয়োগ বিষয়েও কৃতী। অনেক সাহিত্যিক সভা সমিতির সমাদৃত সভ্য। পরের কএক বৎসরের উপর বিশেষ কোন ঘটনার ছাপ পড়ে নাই। একইভাবে গতাগত। সেবার বারুণীর সময় নৃসিংহ বাবু কাশী গিয়া হঠাৎ মারা যান। খবর আসিবা মাত্র শ্রীকান্ত ও মুখুয্যে মশায়

কাশী গেলেন। বিমাতার সগর্ব্ব জেদে কাশীতেই শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন হয়। বিমাতা দেবীর প্রতিজ্ঞা যে, দেশে আর বিধবা মুখ দেখাইবেন না। বিমাতার এক ভ্রাতৃ-কন্যা কাশীর বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীকান্ত ফিরিবার সময় অপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

নৃসিংহ বাবুর সপিণ্ডীকরণ দুর্ল্লভপুরেই সম্পন্ন হয়। ধুমধাম যথেষ্ট। স্পর্শান্তে দানের জন্য শ্রীকান্ত বিমাতাকে অনেক টাকা পাঠাইলেন। কয়েক মাস পরে খোরাক-পোষাকের দাবীতে বিমাতা কর্তৃক শ্রীকান্তের নামে নালিশ দাখিল হয়। কাশীর বাড়ীর নিগূঢ় স্বত্ব ও মোটা টাকা দিয়া শ্রীকান্ত মোকর্দ্দমা রক্ষা করেন। উকিল কৌন্‌সিলির পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। সেই অবধি শ্রীকান্ত বিমাতার সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক। উভয়েই যেন উভয়ের পক্ষে পরলোক-গত। এই সকল ঘটনার সাহায্য ও সাহচর্য্য-বশতঃ মুখুয্যে মশায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গতা আরো বাড়ে। বিমাতার কালিমা-রঞ্জিত পরবর্ত্তী জীবন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

(৩)

কয়েক বৎসর পরে মুখুয্যে মশায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি একমাত্র সন্তান শিশিরকুমার ও তাঁহার গর্ভধারিণী রাসেশ্বরীকে রাখিয়া যান। দেশের জমী জমার আয়ে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট নাই। তবে মুক্তহস্ত মুখুয্যে মশায়ের নগদ টাকা সংক্ষিপ্ত-সার। পিতৃবিয়োগের সময় শিশির দেশের মাইনর স্কুলের পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া প্রবেশিকার-জন্য জেলার স্কুলে ভর্ত্তি হইল। শ্রাদ্ধাদির জন্য দূর অনাত্মীয় জ্ঞাতি-দ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন নিরুপায়। মুখুয্যে মশায়ের চালচলনের জন্য তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাতিদের অতিরঞ্জিত ধারণা স্বাভাবিক। পতির সম্মানরক্ষার্থে রাসেশ্বরী নির্ব্বাক! ফলে মনিব সাহেবদের দত্ত টাকা প্রাপ্তি সত্বেও আর্থিক অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, বৃত্তির অভাবে শিশিরের পড়া ভার হইল। প্রকৃত অবস্থা জানিলে পাছে শিশিরের মনে কষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহার ব্যবহারের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে বিষয়ে রাসেশ্বরী অবিশ্রাম যত্ন করিতেন। কিন্তু বুদ্ধিতে বয়-সের অপেক্ষা প্রবীণ শিশিরের এখন ব্যয়-সংক্ষেপের দিকে লক্ষ্য, হাঁটিবার অনুকূলে যানত্যাগ, লোক দেখান বস্ত্র ত্যাগ, সর্ব্ব বিষয়ে নিরাড়ম্বর। শিশিরের এখন চালই এই প্রকার। এই পরিবারের উপর শ্রীকান্তের মন ও দৃষ্টির বিরাম নাই। কিন্তু মুখুয্যে মশায়ও রাসেশ্বরী দেবীর চরিত্রের প্রভাবে অর্থ-সাহায্যের বিষয়ে মুখ ফুটাইতে অক্ষম।

যথাকালে শিশির সবৃত্তি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। এখন কলিকাতায় কালেজে প্রবেশের প্রয়োজন। সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য শ্রীকান্ত রাসেশ্বরীর সঙ্গে

দেখা করিলেন। শিশিরের মত শুদ্ধ, সুগঠন উচিত বয়সের ছেলের পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে বাসায় থাকা নিরাপদ নয়। এদিকে শ্রীকান্তের বাড়ীতে স্থান যথেষ্ট আর একটী ছেলের জন্য যে খরচ তা নগণ্য অথচ শ্রীকান্তের সংসারে দূর সম্পর্কীয় পিতৃমাতৃহীন একটী ছোট ভাগিনেয় আছে, শিশিরের সাহায্যে তাহার পড়া শুনার অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। রাসেশ্বরী শ্রীকান্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীকান্তের প্রতি শিশিরের সশ্রদ্ধ অনুরাগ। শিশিরের বয়স অগ্রাহ্য করিয়া তাহার সহিত শ্রীকান্তের বৈষ্ণব কবিতার আলোচনাই সে অনুরাগের একটা প্রধান কারণ। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িবে এ ব্যবস্থায় শিশির বিশেষ সন্তুষ্ট। কাজে তাহাই দাঁড়াইল। শ্রীকান্ত প্রতি সপ্তাহে রাসেশ্বরীকে শিশিরের বিষয় খবর দিবেন, বলিলেন। শিশিরের বই খরিদ ও কলেজের অন্যান্য খরচপত্রের ভার অনেক অনুনয় বিনয়ের ফলে শ্রীকান্তের মিলিল। পূর্ব্বে বলা হয় নাই যে শ্রীকান্ত সস্ত্রীক রাসেশ্বরীর সঙ্গে দেখা করিতে যান, আর পত্নী বিরজা দেবীর দক্ষ ওকালতির বলে রাসেশ্বরীর নিকট অনুকূল রায় লাভ ঘটে।

বিরজা ও রাসেশ্বরীর একই গ্রামে বাপের বাড়ী। তা'ছাড়া একটু সম্পর্ক ছোঁয়ানোও আছে। রাসেশ্বরী বিরজার অদূরস্থ পিসী। শৈশবে বাপ মরা মেয়ে বিরজার বিয়ের ঘটকালী করেন মুখুয্যে মশায়। মেয়েটীর রূপ দেখিয়াই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে নৃসিংহ বাবুর আগ্রহ হয়। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে অক্ষুণ্ন নিঃস্বার্থ-পরপ্রিয়তার জন্য বিরজা শ্বশুরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী হন। সে কথা নৃসিংহ বাবু সর্ব্বদাই মুখুয্যে মশায়কে শুনাইতেন। অনেক কৌশলে পুত্রবধুর হাত দিয়া নৃসিংহ বাবু মুখুয্যে-গিন্নিকে অনেক দামী উপহারও দিতেন। সে জন্য মুখুয্যে মশায়ও নৃসিংহ বাবুকে বৈবাহিকদিগের মধ্যে সুসঙ্গত ঠাট্টাও করিতেন। আর অন্যদিকে রাসেশ্বরীর অনেক কৃত্রিম ক্রোধোক্তি শুনিতে হইত।

(৪)

কলিকাতায় শ্রীকান্তের বসত বাড়ী দুখানি—একটী সদর আর একটী অন্দর। দুখানি রাস্তার দুধারে অথচ মুখোমুখি। সদর বাড়ী তিনতলা। পিছনে খালি জমি খানিকটা চোস্ত ঘাসে ঢাকা। সেখানে ক্রিকেট, কপাটী প্রভৃতি খেলার সুবিধা। শ্রীকান্তের খেলার সখ্ এখনও জাগ্রত। বাড়ীর সামনে বাগান। বাগানের মাঝখানে ফোয়ারা। খোলা জমীর দুপাশে সুরকী-ছড়ান রাস্তা। এক ধারে আস্তাবল ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বাসা। অন্য দিকে ঘোড়া-বাঁধা খুঁটি। বাড়ীর একতলায় লাইব্রেরী, ইংরাজি লেখা-পড়ার দপ্তর, উচ্চশ্রেণীর জমিদারী আমলাদের বাস। আর যাঁহারা খোদ

বাবুর সঙ্গে বিষয়-কার্য্য-সংক্রান্ত দেখা করিতে আসেন তাঁহাদের বসিবার ঘর। দোতলায় বাবুর খাস বৈঠকখানা, অভ্যাগত আত্মীয়ের বাসস্থান, নাচগান, আমোদ-প্রমোদের জায়গা। তিন তলায় সাহেবী ব্যবস্থা। খানা-কামরা, গোসলখানা, বসিবার ঘর আর কাপড় বদলের ঘর। সম্মুখে বড় খোলা ছাদ।

রাস্তার অপর পারে দোতলা অন্দর বাড়ী। দরোজার পরেই জমিদারী কাছারী অন্যদিকে দরোয়ানের পাহারা, মধ্যে স্ত্রী-মহলের প্রবেশের রাস্তা। নীচে ভাঁড়ার, রান্নাঘর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থান। উপরে শোবার ঘর, দালান আর মেয়ে-মজলিসের প্রকাণ্ড আবাস। দুটি বাড়ীই এমন ভাবে সাজান যে, দেখে আর চোখ ফেরান যায় না। বাড়ীগুলি শ্রীকান্তের প্রপিতামহের আমলের। তিনি ইংরেজ-রাজ্যের প্রবর্ত্তনের সময় রাজকার্য্যে উচ্চ পদস্থ হইয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান। বাসা দেখিয়া পাখী চেনা যায়। এই বাহ্যিক বর্ণনার পর শ্রীকান্তের অবস্থার বিষয়ে অধিক কথা বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

বাড়ী যত বড় বাসিন্দা তত নয়। মেয়ে মহলে রাধুনী চাকরাণী ছাড়া শ্রীকান্তের দূর সম্পর্কের মাসীমা হরিপ্রিয়া আর হরিপ্রিয়ায় নিঃসন্তান বিধবা কন্যা গিরিবালা। প্রসন্ন নামে শ্রীকান্তের দূর সম্পর্কের পিতৃ মাতৃহীন ভাগিনেয় অন্দর-মহলেই থাকিত, বয়স বছর দশেক। আজ কএক বৎসর সন্তান হরিপ্রিয়া শ্রীকান্তের বাড়ীতে বাস করিতেন এ ব্যবস্থায় উভয়পক্ষেরই সুবিধা। হরিপ্রিয়া বিরজার মুরব্বি, ঘরকন্নার কর্ত্রী। গিরিবালা বিরজার অপেক্ষা বয়সে ছোট আর সর্ব্ববিষয়ে স্নেহশীল আজ্ঞাবাহিকা,—দুজনে খুব ভাব। বিরজার সখের সমস্ত কাজ গিরিবালার হাতে। লেখা পড়া চলনসই। তবে বিরজার কাছে বাংলা বই পড়া ও শোনার ঝোঁকটাকে বাতিক বলিলে অন্যায় হয় না। সন্ধ্যার পর যতক্ষণ শ্রীকান্ত বাড়ীর ভিতরে না আসেন ততক্ষণ পড়ার ধারা অবিচ্ছিন্ন। গিরিবালার স্মরণ-শক্তি অসামান্য, গান কবিতা শোনামাত্র মুখস্থ হইয়া যায়। গিরিবালার গলা সহজ মধুর, সঙ্গীত-জ্ঞান নিন্দার নয়, সঙ্গীতও পিতার নিকট ছেলেবেলার শিক্ষা। বিরজা সঙ্গীতের সঙ্গে একেবারে অপরিচিতা নহেন। মৃদু গলায় বেশ গাইতে পারেন।

গিরিবালার প্রধান গুণ—রোগীর সেবা। সে বছর বিরজার টাইফয়েডের সময় গিরিবালার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুশ্রূষায় ডাক্তারেরা পেশাদার নার্সের দরকার মনে করেন নাই। গিরিবালার ভারি বিশ্বাস তুক্‌তাকে। বিরজার যাতে ছেলে হয় সেজন্য গিরিবালা কত যে তুক্‌তাক করে তা সংখ্যার অতীত।

হরিপ্রিয়া বাতের রোগী, হুকুম মাত্রে সক্ষম একথা বড় অত্যুক্তি নয়। প্রসন্ন স্কুলে পড়ে। শিশির এখন এই পরিবার-ভুক্ত। সদর বাড়ীর দোতলায় শোবার

আর একতালায় লাইব্রেরীতে পড়িবার স্থান, খাওয়ার ব্যবস্থা অন্দরে। সে বিষয়ে গিরিবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গিরিবালার আগ্রহে শিশিরের অভ্যস্ত মিতাহারের অনেক সময় ব্যতিক্রম ঘটে। একদিন ছুটির সময় আহারান্তে শিশিরকে পান খাওয়াইবার জন্য গিরিবালার নাছোড় অনুরোধ।

"আমি নিজের হাতে তোমার জন্য পানটি সেজেছি। খেতেই হবে। এর সব মসলাই আমার নিজের হাতে বাছা। আর এতে সব খাওয়া হজম হয়ে যাবে।"

শিশিরের সেই পান খাওয়ার সুরু।

শিশিরের এখন কালেজে তৃতীয় বৎসর। বৃত্তির সহিত প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন বিয়ে পড়ার সঙ্গে আইন পড়া। পরীক্ষার আর তেমন তাড়া নাই। এদিকে লাইব্রেরীর তামাম বই হাতে। তাইতে এই সময়ের মধ্যে বাংলা ও ইং-রেজি সাহিত্যে—বিশেষতঃ কাব্য ও ইতিহাসে—শিশির বয়সের পক্ষে বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীকান্তের বন্ধু হরিমাধব রায় এক-খানি বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। সে পত্রিকায় শ্রীকান্ত প্রায়ই সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিতেন। শিশির ছদ্মনামে সেই পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, প্রবন্ধ অপ্রকাশিত দেখিয়া শিশির নীরব, নিরন্তর ব্যথিত। দুইমাস পরে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তখন নিজের আনন্দ অপ্রকাশিত রাখা শিশিরের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হয় নাই।

এই সময়ে শ্রীকান্ত রোগ-মুক্ত কিন্তু ডাক্তারের হুকুমে ঘরে বন্দী। সদর বাড়ীর তিনতলায় বাস। বিরজা ও গিরিবালা সেবায় নিযুক্ত। সন্ধ্যার সময় শিশির আসিয়া ফরমাস মত বই পড়েন। শ্রোতা শ্রীকান্ত নিজে, বিরজা আর গিরিবালা। সুবিধা মত শ্রীকান্ত শিশিরকে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দেন। বিরজা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া দুএক কথা বুঝেন। গিরিবালা ডাগর ডাগর চোখে পাঠকের মুখে বদ্ধদৃষ্টি, যেন প্রত্যেক কথা লিখিতে সযত্ন।

সেদিন ঘটনা-সূত্রে শিশির নিজের রচনাটি পড়েন। বিষয়টী বৈষ্ণব কবিতার সখীভাব। নিজের জন্য প্রেম-যাচ্ঞা নাই। প্রেমের প্রতি প্রেম। প্রেমের পাত্রত্ব প্রার্থনার বিষয় নয়, প্রেমই প্রার্থিত। প্রেম দেখিয়া প্রেমোন্মাদ, প্রেম-প্রাপ্তির জন্য নয়। প্রেমের জন্যই প্রেমিকদের প্রতি প্রেম, নিজের জন্য নয়। ভাবটায় শ্রীকান্তের একটু চমক লাগিল। স্বাদটা নূতন। ঠিক এভাবে কথাটা পূর্ব্বে তাঁর মনকে ছোঁয় নাই কিন্তু এখন যেন বিদেশাগত প্রিয় ব্যক্তির ন্যায় মনকে আবিষ্ট করিল। যেন অন্যমনস্কতা ভাঙিয়া প্রিয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভূত হইল। তাকিয়ার উপর ভর দিয়া শ্রীকান্ত সাগ্রহে বলিলেন

"শিশির কথাটা ঠিক। এতদিন যেন আমার মনে ওটা অশরীরী স্বপ্নের মত ছিলও বলা যায়, ছিল নাও বলা যায়। আজ যেন শরীর বদ্ধ হয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে। আত্মগোপনের চেষ্টা নাই। আচ্ছা লেখকের নামটা কি বল দেখি? বৈষ্ণব কবিতায় যাদের সখ এমন কোন সাহিত্যিক যে অপরিচিত তা তো মনেই হয় না। থাক্। এখন লেখকের নামটা কি বল দেখি?"

"সাত্বত নাথ মুখোপাধ্যায়।" সা—ত্ব—ত! এ রকম নাম ত কখনো কানে আসেনি। এটা ছদ্মনাম, আসল নাম শিশিরকুমার নয়?"

নির্ব্বাক শিশিরের মুখ লাল। ঠোঁটের কম্প দেখিয়া শ্রীকান্ত নিঃসন্দেহ, শিশিরের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিশির প্রণামান্তে পদধূলি লইয়া উঠিয়া গেল।

(৬)

গিরিবালা শ্বশুর বাড়ীতে। শাশুড়ীর মরণাপন্ন ব্যারাম। তাঁহাকে সে অবস্থায় দেখিবার অপর কেহ নাই। পরিবারস্থ সকলেই নিজের নিজের সন্তানাদির জন্যই ব্যস্ত। গিরিবালা প্রাণপণ যত্নে শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত। বৃদ্ধ বয়সের রোগী মরি মরি করিয়াও মরে না। এক্ষণে তাহাই ঘটিল। রোগ সারিল বটে কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল। বিনা সাহায্যে চলা ফেরা অসাধ্য। বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশে রোগীকে পুরী পাঠাইবার প্রয়োজন। এখন সঙ্গে কে যায়, এই সমস্যা। গিরিবালা তো যাইবেই, খালি দরকার পুরুষ সঙ্গীর নির্ব্বাচন। সকলেরই হাতে একটা না একটা কাজ। ফল একই, কারণ, ভিন্ন বাড়ীর কাহারও যাইবার সুবিধা নই। অনেক তর্ক পরামর্শের পর দাঁড়াইল যে, রোগীর ছোট ভাইয়ের ছেলে, মাধব সঙ্গে যাইবে। সে নিষ্কর্ম্মা, অপর সকলের কাজ কর্ম্মের শক্ত বাঁধন দুশ্ছেদ্য। গিরিবালার স্বামীর বাল্য বন্ধু, সতীশ রায়। হাই. কোর্টের উকীল, ইষ্টারের ছুটিতে পুরী যাইবার জন্য বাড়ী ঠিক করিয়াছেন, বাড়ীটি বড় আর সতীশ বিপত্নীক নিঃসন্তান, চাকর বামুন সঙ্গে একলাই পুরী যাইবেন। গিরিবালার ভাসুর দেওরের সঙ্গেও সতীশের বিশেষ বন্ধুত্ব, সেই ছেলেবেলা হইতেই। কাজেই অবিলম্বে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হল। সতীশ আগেই পুরী গেলেন। পরের দিন শাশুড়ী ও মাধবের সঙ্গে গিরিবালার যাত্রা। সতীশের যত্নে সব দিকে সুবিধা হইল।

বাড়ীর জন্য দুমাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হইয়াছে। ঈষ্টারের পরে সতীশ ফিরিবেন কিন্তু পরেও প্রতি সপ্তাহের শেষে দু একদিন করিয়া আসিবেন, চাকর বামুন থাকিবে না। অনেক অনুরোধে সতীশ একথা স্বীকার করিলেন। চাকর সঙ্গে আসিবে যাইবে। আহারাদির ভার গিরিবালাদের হাতে। মাধব নিষ্কর্ম্মা

যেমন, অকর্ম্মাও তেমনই, সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রম-কাতর। খাওয়া শোবার সময় ছাড়া মাধবকে বাড়ীতেই পাওয়া যায় না। কি করে, কোথায় থাকে তা অন্যের অবিদিত।

সতীশ সর্ব্বদাই বৃদ্ধার জন্য ব্যস্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চৌকি শুদ্ধ বৃদ্ধাকে সমুদ্র তীরে বসাইয়া দেন। গিরিবালা ঘর কন্নার জন্য বাড়ী ফিরিলে সতীশ নানা প্রকারে বৃদ্ধার মনস্তুষ্টি করেন। সব রকমের ফাই-ফরমাস শোনেন। ছুটি ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধা গিরিবালার হাত ধরিয়া যাতায়াতে সক্ষম হইলেন আর চৌকি করিয়া যাইতে হয় না। সতীশের ফিরিবার সময় বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল। সতীশ যতদিন ছিলেন ততদিন মাধবের কোনই কাজ ছিলনা। এখন বাজার করার ভার মাধবের হাতে। সেইজন্য দুবেলা একই বুলি যে, খেটে খেটে প্রাণটা গেল। অথচ বাজারের প্রধান প্রয়োজন মাধবের নিজের জন্য মাছ-কেনা। বিধবাদের ব্যবহারের চাল ডাল তরীতরকারী আর তা রোজ কেনা হয় না। ক্রমে বৃদ্ধা যথাসম্ভব সবল হইলেন। তবে জায়গাটার উপর এমন মনের টান জন্মিয়াছে যে, ছাড়িতে মায়া করে। তিনি সর্ব্বদাই বলেন যে, জগন্নাথ যখন প্রাণটা দিয়াছেন তখন যাতে যথার্থ তীর্থ করা হয় তারির দরকার। কাজেও হইল সেই রকম। মন্দির-প্রদক্ষিণ, দেবতা-দর্শন, তীর্থস্নান করা নিয়মে সম্পন্ন করিলেন। আর কথা স্থির রহিল যে, একটা ভাল দিন দেখিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন সাধু-সেবা হইবে। সেদিন বৃদ্ধার ছেলেরা আসিবেন। বলা বাহুল্য যে এসকল বিষয়ে সতীশ বিশেষ উদ্যোগী।

গিরিবালার শাশুড়ীর নিয়ম যে, সন্ধ্যার পরেই জলযোগান্তে নিদ্রা। সমুদ্র-তীরে গিয়া নুলিয়া মেয়েদের সঙ্গে গিরিবালার কথাবার্ত্তার সেই ছিল সময়। নির্জ্জন হইলে গিরিবালা গান গাইয়া মেয়েদের মনস্তুষ্টি করিতেন। মধ্যে মধ্যে সতীশ ছিলেন গানের অলক্ষিত শ্রোতা। একদিন নুলিয়া মেয়েদের কাছে বিদায়ান্তে গিরি-বালা দেখিলেন—সতীশ উপস্থিত! ক্রমে ঐরূপ ঘটনা বাড়িতে লাগিল। আর একদিন সতীশের কাতর সাধ্যসাধনায় গিরিবালাকে গান গাহিতে হইল। ক্রমে ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি হওয়ায় গিরিবালার বাল্য বৈধব্য হেতু জীবনের বৈকল্য উল্লেখে সতীশ এমনভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে গিরিবালার চক্ষে জল আসিত।

এদিকে দেখিতে দেখিতে দেশে যাত্রার সময় সমুপস্থিত। রেলে গিরিবালা আর শাশুড়ী মেয়ে-গাড়ীতে যাইবেন, পাশের গাড়ীতে যাইবেন মাধব, এই ব্যবস্থা মত কাজ হইল। পথে গিরিবালা নিরুদ্দেশ। শ্বশুরবাড়ীর কেহ আর গিরিবালার খোঁজ লইলেন না। শুধু শ্রীকান্তের যাহা-কিছু অনুসন্ধান, তাহাও নিষ্ফল হইয়াছিল।

(৭)

শিশির তখনকার নিয়ম অনুসারে একই বৎসরে বিএ আর এম এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইল। বাকী এক বি, এল —সেজন্য আর এক বছর দেরী। শিশির এখন মানুষের মত মানুষ, সব বিষয়ে শ্রীকান্তের পরামর্শ-দাতা। সেই পরামর্শের ফলে যেমন অনেক দিকে শ্রীকান্তের আয়-বৃদ্ধি,ব্যয়-সংক্ষেপও তেমনি যথেষ্ট। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ ছুটির দিনে,সস্ত্রীক শ্রীকান্ত শিশিরের সঙ্গে ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। একদিন কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ পড়া হয়। বিরজা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিয়া শিশির বাংলা অনুবাদ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন। তিন জনই কাব্য-সৌন্দর্য্যের রসজ্ঞ। পাঠান্তে সকলেই নিজ নিজ প্রিয় ভাব প্রকাশ করিবার পর শ্রীকান্ত শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শিশির, কালিদাসের সরস্বতীর সৌন্দর্য্য ত সমানভাবে উপভোগ করা হ'ল। তুমি দেশী-বিদেশী সাহিত্য-বিনোদন রসের রসজ্ঞ। এখানে কোন বিশেষত্ব দেখলে কি ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ! এখানে একাধিক জায়গায় আবদ্ধ গতির হঠাৎ স্তম্ভন দেখা যায়।

"তচ্ছাশনাৎ কাননমেব সর্ব্বং,
চিত্রার্পিতা রম্ভমিব প্রতস্থে।"

নন্দীর ইঙ্গিতে কার্য্যে প্রকাশিত মিথুন ভাব পূর্ণ সমগ্র বন চিত্রে আরোপিত চেষ্টার ন্যায় হয়েছিল। আর সর্গের শেষের দিকে আছে—

"শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।"

হিমালয়-রাজের কন্যা উমা না গেলেন না রইলেন।

এরকম গতিস্তম্ভন এদেশের সাহিত্যে, চিত্রে বা স্থাপত্যে অবিদিত বলেই মনে হয়। তবে গ্রীক অনুগত রোমান স্থাপত্যে এরূপ বহু আদর্শ সংরক্ষিত। আপনি ত ফার্ণেজে ষাঁড়, লেও কোয়েন, কইট প্রোয়ার ছবি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, দেখিছি বটে কিন্তু আমার মনে হয় অন্য রকম। এ সর্গের গোড়ার দিকে যেমন বসন্তের অকাল প্রবৃত্তিতে সর্ব্বত্র স্থিতির হঠাৎ গতি, এখানে ঠিক তার বিপরীত। গতির হঠাৎ স্থিতি। মনেতে এই দুই প্রতিযোগী ভাবের সম্মিলনে দৃষ্টির অন্তর্মুখত্ব। বাহিরে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংযোগে যখন দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে তখন বাহিরে প্রকাশের অভাবে মনে একটা শান্তি জেগে ওঠে। এইটাই কবির খুব দামী কৃতিত্ব।"

"আপনার কথা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববার বিষয়। এ ভাবটা আদৌ আমার মনেই আসে নাই। আমি আপনার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখব।"

"আচ্ছা, ভাববার কি ফল হয় জানবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম। এখন খেতে

যাও। খাবার সময় হয়েছে।” উঠিবার সময় শিশিরের চোখে পড়িল যে, একটী অপরিচিতা কিশোরী বিরজার আড়ালে বসিয়া। ঘরের বাহিরে বিরজা আসিয়া বলিলেন,

“শিশির, আজ নন্দিনী এসেছে। দেখেছো? কেমন সুন্দর মেয়ে আইবড়। দূর সম্পর্কে আমাদের ভাগনী। ওর বাপ শ্যামপুরের জমীদার। লেখা পড়া বেশ ভাল শিখেছে। আজ তোমার কথা শুনে খুব খুসী হয়েছে আমাকে এইমাত্র বলছিল।”

“যিনি আপনার ওপাশে বসেছিলেন, তাঁর নাম নন্দিনী?”

“হ্যাঁগো, তারই নাম নন্দিনী।”

“আমি উঠে আসবার সময় তাঁকে দেখতে পেলাম।”

(৮)

নন্দিনীর সঙ্গে শিশিরের বিয়ে দিতে বিরজার একান্ত ইচ্ছা। শিশিরকে কিছু না জানাইয়া শ্রীকান্ত কালীপদ বাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি সাগ্রহে সম্মত হইলেন। ছেলের বিয়ে হবে একথা শ্রীকান্তের কাছে শুনিয়া রাসেশ্বরী ভারী খুসী। এখন শিশিরের মত মাত্র বাকী। বিরজা ঠাট্টার ছলে কথা তুলিয়া দেখিলেন—রোজগারে অসমর্থ অবস্থায় শিশির বিবাহ করিতে অসম্মত। যখন রোজকার হবে তখন বিয়ের কথা ভাবিবেন, শিশিরের এই দৃঢ় সঙ্কল্প। তবে শ্রীকান্তের জানা ছিল যে, অক্স্‌ফোর্ড বা কেম্ব্রিজে উচ্চ উপাধি লাভের জন্য শিশিরের আন্তরিক ইচ্ছা। অভাব অর্থের। কন্যার বিবাহান্তে সে বিষয়ে আর্থিক ভার গ্রহণে কালীপদ বাবু প্রসন্ন চিত্তে সম্মত। শ্রীকান্ত তখন শিশিরকে বুঝাইয়া রাজি করিলেন যে, বিবাহ করিয়াই শিশির বিলাতে যাইবেন। যখন রোজগারী হইয়া দেশে ফিরিবেন তখন গৃহস্থালী করিবেন। বিলাতে যে টাকা দরকার তাহা ঋণ-গণ্য হইয়া পরে পরিশোধ হইবে। জীবনের অনিশ্চয়তা জন্য শিশির প্রয়োজনীয় টাকার জীবন-বীমা করিয়া দিবেন। বৃত্তি হইতে জমান টাকা সেজন্য যথেষ্ট হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় শিশির বিবাহে সম্মত হইলেন। কালীপদ বাবু শ্রীকান্তের নিকট সে বিষয়ে সানন্দে স্বীকৃত। শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিশির ও নন্দিনী দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। যে বীজ অতর্কিত ভাবে হস্তচ্যুত এখন তাহাতে পুষ্পিত বৃক্ষ জন্মিল। মনের একটা বোঝা নামিল বটে কিন্তু চাপিল আর একটা। সেটা শিশিরের বিলাত-যাত্রার ব্যবস্থা।

প্রথম প্রথম শিশির শুধু জামাই-আদর ভোগ করিলেন। শ্বশুরকে সাক্ষাতে বিলাত-যাত্রার কথা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সে জন্য যে সকল কাগজ পত্রের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সংগ্রহ শেষ হইলে শ্বশুরকে প্রকারান্তরে জানাইয়া কোন কায়েমী

কথা পাইলেন না। অথচ খালি উড়ো-ভাসা হচ্ছে হবে এই রকম উত্তর! অথচ একদিকে বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়, অন্যদিকে বি, এল পরীক্ষার সময় ক্রমশঃ অগ্রসর। উদ্বেগে অধীর হইয়া শিশির একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য শ্রীকান্তের মধ্যবর্ত্তিতার প্রার্থী হইলেন। শ্রীকান্ত সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজ পত্র দেখাইয়া শেষ-মীমাংসার জন্য পেড়াপিড়ি করিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কালীপদ বাবু বলিলেন, "দেখহে শ্রীকান্ত বিলেতে যাওয়া তো চারটিখানি কথা নয়। ৮।১০ হাজার মাইল সমুদ্রের পথ। তাতে জাহাজ ডুবিও আছে আর চরিত্র ডুবিও আছে।" এই বলিয়া বিলাত ফেরৎ অনেকের দুষ্কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া কালিপদ বাবু নীরব হইলেন। শেষ সিদ্ধান্তের জন্য শ্রীকান্তের পেড়াপিড়িতে পরে বলিলেন,

"আমি লেখা পড়া করে দিচ্ছি যে ঐ বিশ হাজার টাকার সুদ নন্দিনী আমার জীবদ্দশায় পাবে আর তার পর সমুদয় টাকাটা পাবে।"

"তবে কি আপনি শিশিরকে বিলাত পাঠাতে অসম্মত এই বুঝব?"

নিরুত্তর কালীবাবু উঠিয়া গেলেন। শ্রীকান্ত নিজে শিশিরের বিলাত-বাসের খরচ দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে শিশির কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না।

(৯)

নন্দিনী বয়সের পক্ষে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। অবস্থা দেখিয়া নিঃসন্দেহ যে, শিশির আর শ্বশুর বাড়ীর মাটী মাড়াইবেন না। এখন এই এক ভাবনা যে কি উপায়ে স্বামীর সঙ্গে একটা স্থায়ী বোঝা-পড়া হয়। পরামর্শের জন্য বিরজাকে পত্র দিলেন বিরজা ও রাসেশ্বরীর সম্মিলিত চেষ্টায় নন্দিনীর শ্বশুর বাড়ী আসা ঘটিল। সেখানে দম্পতির মধ্যে নিয়ম-বন্ধন হইল এই যে, শিশির নন্দিনীকে বাপের বাড়ীর সমান অবস্থায় স্থাপনক্ষম হইবা মাত্র দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইবে। সে অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ থাকিবে, নন্দিনী ততদিন বাপের বাড়ীতেই বাস করিবেন। নন্দিনীর অশ্রুসিক্ত প্রার্থনায় শিশির রাজি হইলেন যে, নন্দিনী ইচ্ছামত শাশুড়ীর কাছে আসিবেন কিন্তু সে সময় শিশির বাড়ী আসিবেন না।

শ্রীকান্ত এইরূপ নিয়ম-স্থাপনার হেতু জিজ্ঞাসায় শিশির যে উত্তর দেন, তাহাতে তিনি শিশিরের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিশেষ সুখ্যাতি করেন। এদিকে শিশির বি, এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ব্যস্ত। অন্যদিকে নন্দিনী অধিকাংশ সময় শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্তা; দম্পতিরা যে নিয়মে বাঁধা তাহাতে পরস্পরের ভিতর পত্রের ব্যবহার ছিল না বলিলেই হয় কিন্তু বিরজা ও নন্দিনীর মধ্যে পত্রালাপ প্রায়ই ঘটে,

সে কথা শিশির বিশেষ জানিতেন না। কেবল সর্ব্বদা বিরজার নিকট বাড়ীর কুশল সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শ্বশুর বাড়ীতে নন্দিনী সকল রকমের কাজই করিতেন। ঝাঁট পাঠ রান্না বাড়া, কাচা কুচি কোন কাজেই হার মানিতেন না,—পুরুষ মানুষ হইলে কথাটা সুপ্রযুক্ত হত যে, ইস্তক জুতা সেলাই লাগাইত চণ্ডীপাঠ সর্ব্ব কার্য্যেই সমান দক্ষ। বড় মানুষের মেয়ের এমন ব্যবহার সুবাস ফুলের সুগন্ধের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শিশির যথাকালে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। শ্রীকান্তের আগ্রহে আদিম ব্যবসায় আরম্ভ হইল হুগলীতে। শ্রীকান্তের হুগলীর জমীদারী কাছারীতে শিশির বাসা পাইবেন আর জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমারও অপ্রতুল হইবে না। কালীপদ বাবুরও হুগলীতে মামলার অভাব নাই। কিন্তু তাহার সহিত শিশির সম্পর্ক-শূন্য। শ্বশুর-জামাতার মধ্যে পূজা-পার্ব্বণের তত্ত্বেরই ক্ষীণ সম্পর্ক অবশিষ্ট। শিশিরের পশার জমিতে বেশী দেরী হইল না। কয়েক মসের মধ্যেই ফৌজদারী আদালতে শিশির গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রধান কারণ যে, শিশির ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন আর অন্য কথায় সকল বিষয়ের মর্ম্ম-প্রকাশে সক্ষম।

কালীপদ বাবুর জমীদারীর একজন প্রজা তাঁহার নায়েবের নামে এক ফৌজদারী মামলা দাখিল করে। প্রজার উকিল শিশির। বিচারে নায়েবের ছয়মাস জেল হয়। হাইকোর্টে সেই রায়ই বজায় থাকে। সেই অবধি শ্বশুরও শিশিরের মক্কেল। শিশির শ্বশুর-বাড়ী যাইতেন না বটে কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র শ্বশুরের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। সে বিষয়ে কোন ত্রুটী ছিল না।

শিশির একদিন এক পত্র পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। পত্রখানি গিরিবালার। আজ প্রায় তিনবৎসর পরে গিরিবালার এই প্রথম সংবাদ শিশিরের কাছে। সে সংবাদও মানসিক বিপ্লবের হেতু। পত্রের মর্ম্ম এই যে, পুরী-প্রবাস কালে সতীশ ও গিরিবালার মধ্যে ব্যবস্থা হয় যে, কলিকাতা আসিবার পথে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে সাহেবী পোষাকধারী সতীশ গিরিবালার সঙ্গে মিলিত হইবেন। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটে। সেই অবধি সতীশের সহিত গিরিবালা অবৈধ দাম্পত্য ভাবে একত্র বাস করিয়াছে। সতীশের যত্নে গিরিবালার সাধারণ শিক্ষা ও সঙ্গীত-চর্চ্চায় কালাতিপাত ঘটিয়াছে। অনতিকাল পূর্ব্বে সতীশ পরলোকগত হইয়াছে। গিরিবালার যে বাড়ীতে বাস তাহা তাহারই নামে কেনা। এখন সতীশের ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হইয়া গিরিবালা বেনাম-দার মাত্র এই উল্লেখে বাড়ী দাবী করিয়া

মোকদ্দমা জুড়িয়াছেন। লোকমুখে শিশিরের আইন ব্যবসায়ে খ্যাতি শুনিয়া গিরিবালার প্রার্থনা যে, যদি তাহার ঘৃণিত জীবন দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক না হয় তাহা হইলে শিশির যেন সেই মোকদ্দমায় তাঁহার পক্ষসমর্থন করেন। বিপন্ন রমণীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা মহাপাপ, এই বুদ্ধিতে শিশির নিঃসঙ্কোচে সেই মোকদ্দমার ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন।

শিশিরের যত্নে ও পরিশ্রমে গিরিবালা জেলার আদালতে মোকদ্দমা জিতিলেন। বিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করিবার পূর্ব্বেই শিশির ঐ আদালতের উকীল শ্রেণীভুক্ত। সেখানে উভয় পক্ষের পরামর্শে এই সত্বে রফা হইল যে, গিরিবালা যাবজ্জীবন ঐ বাড়ী ভোগ-করিবেন আর তাহার জীবনান্তে যদি ধর্ম্মার্থে দান না করিয়া যান তবে সতীশের উত্তরাধিকারী ঐ বাড়ী পাইবেন। শিশির উভয় আদালতের খরচা পাইলেন। উকিলেরা সতীশের বন্ধু। তাঁহার নামে যেন কলঙ্ক না হয় সকলের এই উদ্দেশ্য ছিল।

শিশির মকদ্দমায় জয়ী হইয়াও গিরিবালার নিকট পরাজিত। নাম মাত্র বাসায় বাস;—প্রকৃত বাস গিরিবালার বাটীতে।

(১০)

গিরিবালা নিরুদ্দেশ হইবার পর তাহার সম্বন্ধে শ্রীকান্তের অনুসন্ধান নিস্ফল হইলেও প্রকৃত ঘটনা বেশীদিন অবিদিত রহিল না।। গিরিবালা নিজেই পত্র লিখিয়া মোটামুটি সকল কথাই জানাইয়া দেন। বিরজা ঘৃণা লজ্জা ও ক্রোধে অধীরা হইলেন। গিরিবালা ও সতীশের শাস্তির জন্য শ্রীকান্তের উপর জেদের পর জেদ। অনেক প্রকারে শ্রীকান্ত বুঝাইলেন যে, গিরিবালা নিজের কার্য্যের জন্য সমাজের কাছে দোষী হইলেও সে ত মানুষ বটে। সে যে অবস্থায় আছে তাহাতেও দূর হইতে তাহার হিতসাধন কর্ত্তব্য। অবৈধ সম্বন্ধ সাধারণতঃ অচিরস্থায়ী। এখন কৌশলে তাহার উপর মন ও দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন সে পত্রের দ্বারা বিরজার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তখন তাহাকে পরিত্যাগ ন্যায়-ধর্ম্ম-বিগর্হিত। অথচ সমাজের মুখরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আলোচনার ফলে স্বামী-স্ত্রীতে স্থির করিলেন যে, যথাসম্ভব গিরিবালার উপকার করিবেন।

সতীশ ও গিরিবালা এখন মিষ্টার ও মিসেস রায়। দাসী চাকর যথেষ্ট তবে পুরাতন চাকর বামুনের সম্পর্ক-শূন্য। বালিগঞ্জে বাসের বাড়ী যেমন নূতন, বন্দোবস্তও তেমনি সব নূতন। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ গিরিবালা নিজের অন্ন নিজেই রাঁধেন। সেই কষ্ট-নিবারণের জন্য তাঁহার অনুরোধে শ্রীকান্ত ও বিরজা তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ-অপরিচিত ও তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিবার সম্ভাবনা নাই

এমন দেখিয়া একটী স্বজাতীয় আশ্রিত প্রবীণকে গিরিবালার কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ ব্যবস্থা উভয় পক্ষেরই মনের মত হইল। দুই বাড়ীর মধ্যে প্রবীণা যেন সেতু—যাওয়া আসার দ্বারা কেহ কাহারও খবর পাইতে বিলম্ব হইত না। আলাপ ব্যবহার রক্ষায় বিশেষ সুবিধা ছিল। শ্রীকান্তের বাড়ীতে প্রবীণাই প্রথমে সতীশের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করে।

গিরিবালার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া বিরজা গিরিবালার মাতাকে বলেন যে, রেলের পথে নিরুপায় হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। মাতা বুঝিলেন মেয়ে এখন খৃষ্টিয়ান। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি কাশীবাসিনী হইলেন; সঙ্কল্প যে, সেইখানে দেহ রাখিবেন।

একদিন প্রবীণা আসিয়া গিরিবালার সঙ্গে সতীশের ভাগিনেয়ের মোকদ্দমার খবর দিলে বিরজা শ্রীকান্তের কথামত গিরিবালাকে সে বিষয়ে শিশিরের সাহায্য গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। সে পরামর্শে যে ফল জন্মে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। গিরিবালার মোকর্দ্দমা জিতিবার কিছুদিন পরে বিরজা প্রবীণার মুখে শুনিলেন যে, সে সম্ভবতঃ আর বেশী দিন বালিগঞ্জের বাটিতে থাকিতে পারিবে না। শিশিরের সহিত গিরিবালার ব্যবহার যাহাই হউক অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। একসঙ্গে গাড়ী করিয়া বেড়ান, অনেক রাত পর্য্যন্ত একসঙ্গে কথাবার্ত্তা মোকদ্দমার সময় যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন এখন তাহার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। পুরানো লোকজনের জায়গায় নূতন লোকজন ভর্ত্তি আর মাঝে মাঝে বাহিরের ঘরে শিশিরের রাত্রি-বাস। এই সব কারণে ভয় হয় যে শীঘ্রই শিশির সমাজ ছাড়িয়া গিরিবালার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে একত্রে বাস করিবেন। তাহা হইলে প্রবীণা তার সে বাড়ীর চৌকাঠ পার হইবে না।

কথাটা শুনিয়া শ্রীকান্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। শিশির ও গিরিবালার সম্বন্ধে লোকে অনেক কাণা-ঘোষা করে একথা শ্রীকান্ত জানিতেন। যার ধর্ম্ম তার কাছে. পরচর্চ্চা অধর্ম্ম। কিন্তু শিশির কর্ত্তৃক যে প্রকাশ্য একটা সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে একথা শ্রীকান্তের মনে স্থান পায় নাই। কালীপদ বাবু শিশিরের সম্বন্ধে চরিত্র-ডুবির আশঙ্কা প্রকাশ করিবার পর তাঁহার সহিত শ্রীকান্তের বাক্যালাপ বন্ধ। এখন শিশিরের নৈতিক পদস্খলন অকাট্য প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে শ্রীকান্তের প্রবৃত্তি হইল না। এই সকল কারণে আর শিশিরের আর্থিক উন্নতি দেখিয়া শ্রীকান্ত অনেক বার তাহাকে স্ত্রী লইয়া ঘর সংসার করিতে বলিয়াছেন কিন্তু শিশির একটা না একটা ওজর দেখাইয়া কথা কাটাইয়াছেন। যাহা হউক বিরজা কথাটা তুলিলে শ্রীকান্ত

মনের উদ্বেগ চাপিয়া কিছুদিন স্থির থাকিতে বলিলেন। আশ্বাস দিলেন যে, যদি শিশির সত্যই সত্যই সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করেন তাহার উপযুক্ত প্রতিকারও আছে। মাছও যেমন জালও তেমন।

বিরজার কাছে স্বামীর প্রত্যেক কথা বেদবাক্য, সন্দেহের স্পার্শাতীত। শ্রীকান্তের চক্ষের সম্মুখে শিশির মানুষ হইয়াছে। তাহার স্বাধীন দৃঢ় প্রকৃতি শ্রীকান্তের সুবিদিত। তিনি জানিতেন যে, শিশির একবার বিপথে চলিলে প্রত্যাকর্ষণ দুর্ঘট। শিশিরের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য না হইলে তাহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন অত্যন্ত দুষ্কর। শিশিরের উপর শ্রীকান্তের অলক্ষিত দৃষ্টি নিশ্চঞ্চল। তিনি জানিলেন, কিন্তু বিরজার নিকট প্রকাশ করিলেন না, যে শিশির সামাজিক বিধির গণ্ডী পার হইয়াছেন। যখন শিশিরের প্রকাশ্যভাবে বালিগঞ্জের বাটীতে স্থায়ী বাস আরম্ভ হইল তখন প্রবীণা সে বাটী পরিত্যাগের জন্য জেদ করিলেন। গিরিবালার বিশেষ অনুরোধ যে, অপর এক জনকে যেন প্রবীণা সন্ধান করিয়া দেন যথাক্রমে অনুরোধের কথা শ্রীকান্ত ও বিরজার কানে উঠিল।

(১১)

শ্রীকান্ত ও বিরজা রাসেশ্বরীর সহিত দেখা করিলেন। নন্দিনীও সেখানে উপস্থিত। পরামর্শান্তে রাসেশ্বরী শিশিরকে পত্র লিখিলেন। পত্রে জানাইলেন যে, লোকের মুখে তার অবৈধ ব্যবহারের কথা শুনিয়া রাসেশ্বরী মর্ম্মাহত। শীঘ্র আসিয়া লোকের কথা মিথ্যা এটা না বুঝাইলে তাঁহার জীবন রক্ষা দুর্ঘট। আর সত্য হউক মিথ্যা হউক একথা নন্দিনী বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করিবে। বিধবার একমাত্র সন্তান আর নব বধূর স্বামীর পক্ষে তাহাদের মুখ চাহিয়া চলা যে ধর্ম্ম একথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে আঁকিয়া রাখিবার প্রয়োজন—না ভুল হয়।

কয়েকদিনের মধ্যে শিশির মাকে লিখিলেন যে তাঁহাকে মৃত বলিয়া মনে করুন। একমাত্র সন্তান বিয়োগ বিধবার পক্ষে মর্ম্মঘাতী সত্য কিন্তু নিয়তি অখণ্ডনীয়। তাঁহার বিষয়াদি মাতার চরণে অর্পণের ব্যবস্থা হইতেছে। অভাগা নন্দিনীর উপর যেন সকলের সদয় দৃষ্টি থাকে, এই একমাত্র প্রার্থনা। নন্দিনী পত্রখানি একাধিকবার পড়িলেন। নন্দিনীর বাহ্য ব্যবহার অবিচলিত। হাসিমাখা মুখের হাসি মিলায় নাই। পত্র শ্রীকান্তকে পাঠাইয়া সস্ত্রীক তিনি যেন শীঘ্র দেখা করেন এইরূপ অনুরোধ করিতে শাশুড়ীকে বলিলেন। নন্দিনীর কথামত কার্য্যও হইল! অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই। দুই দিনের মধ্যেই শ্রীকান্ত বিরজাকে লইয়া উপস্থিত।

শিশির সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা-নৌকার মাঝি হইলেন নন্দিনী। তাঁহার স্বভাবের প্রভাবে সকলকেই তাঁহার আজ্ঞা শিরো-

ধার্য্য করিতে হইল। মাধুর্য্যের ভিতর এরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দে সকলেই অভিভূত। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে স্বামীর উদ্ধারের জন্য নন্দিনী মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়াছেন, যদিও মুখে তাহা অপ্রকাশিত। বাহিরে এই মাত্র প্রকাশ হইল যে, রাসেশ্বরী পুত্র-বধূকে লইয়া বিরজার সঙ্গে তীর্থ-দর্শনে যাইবেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তীর্থদর্শন সমাপ্ত করিয়া বিরজা ও রাসেশ্বরী কলিকাতায় শ্রীকান্তের বাটীতে উপস্থিত। নন্দিনী তাঁহাদের সহিত ফেরেন নাই। এদিকে যে প্রবীণা গিরিবালার সাহায্য করিতেন, তিনি তুলনায় অতি অল্প বয়স্ক একটা স্ত্রীলোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেশে গেলেন। যাহাকে প্রবীণা রাখিয়া গেলেন তাহার বয়স ও সৌন্দর্য্য কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া একবার গিরিবালার মনে হয়। কিন্তু সে মেয়েটীর আচার ব্যবহার, শীলতা সৌজন্য আর সর্ব্বোপরি বিরজার সার্টিফিকেটের বলে সে দ্বিধা মন হইতে অচিরে খসিয়া পড়ে। মেয়েটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিষ্প্রয়োজনে নির্ব্বাক আর আত্মগোপনে তৎপর। এরূপ সঙ্গিনীলাভে গিরিবালা যে বিশেষ খুসী তাহা পত্রের উপর পত্র দিয়া বিরজাকে জানাইলেন। নূতন সঙ্গিনীর মৃদু মিষ্ট ব্যবহারে তাহার সহিত গিরিবালার আত্মীয়তা প্রতিদিনই বাড়িতে লাগিল। মাস না ফুরাইতে গিরিবালার নিজের সংক্রান্ত প্রায় কোন কথাই তাহার নিকট অপ্রকাশিত রহিল না। অধিকন্তু কিরূপ ব্যবহারে শিশিরকে অবিচ্ছিন্ন-ভাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন, সে বিষয়ে অনেক উপাদেয় উপদেশ তিনি সঙ্গিনীর কাছে পাইতেন। সঙ্গিনীর সিঁথায় সিন্দুর ও হাতে লোহা দেখিয়া গিরিবালা একদিন বলিলেন, "তুমিতো সধবা,তোমার স্বামী কোথায় ?"

"তিনি সম্প্রতি আমার কাছে নিরুদ্দেশ।"

"তুমি তোমার স্বামীর সমস্ত বিবরণ বলে দাও, আমি তার ঠিক ঠিকানা করে দিচ্ছি।"

"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, তিনি আমার সন্ধান না করলে আমি তাঁর সন্ধান করব না।"

"আরে, তোমার আর সন্ধান করতে হবে না। আমি করব। তুমি আমার নামধাম পরিচয় বলে দিয়েই খালাস। বাকী সব আমি করব।"

"আমার দুদিকেই বিপদ। যে অবস্থায় পড়ে আপনার কাছে আছি, সেটা যদি তিনি জানেন তা হলে হয়ত আজ আমার মুখ দর্শন করবেন না।" গিরিবালা চমকিয়া উঠিলেন। নিজের অবস্থা যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অতর্কিত দীর্ঘ-শ্বাস উঠিল। তাঁহাকে অন্যমনস্ক কবিবার

জন্য তাঁহার চুল বাঁধিবার ধরণের উপর মনোযোগ টানিয়া সঙ্গিনী বলিলেন—

"চুলটা আর একটু কপালের দিকে নামিয়ে বাঁধলে ভাল হয়। তাতে আরও ছেলে মানুষ দেখাবে।"

কথার স্রোত ফিরিল।

(১২)

গিরিবালার নূতন সঙ্গিনী আসিবার পর প্রায় এক মাস অতীত। বিরজার নিকট হইতে হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কাশীতে গিরিবালার মা মুমূর্ষু! মৃত্যুর পূর্ব্বে মেয়েকে একবার দেখিতে জ্বলন্ত অভিলাষ। সেই জন্যই যেন প্রাণটা আছে। বিরজার পরামর্শ যে, গিরিবালা যেন বিধবা বেশে মার সঙ্গে দেখা করেন। গিরিবালার অন্তরে দারুণ বিপ্লব। যে কথা মনের অন্ধকার চোরা-কুঠরীতে লুকান ছিল এখন সেটা সদর বাড়ীর সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল। দুই চক্ষে জলের ধারা অবিরল গতি। সঙ্গিনীকে জড়াইয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে সমস্ত কথা বলিল। অনেক সান্ত্বনার পর সঙ্গিনীও তাঁহার সঙ্গে কাশী যাইতে প্রস্তুত। কথাটা প্রথমে গিরিবালার কানেই গেল না। কএকবার বলিবার পর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"না, না! তা হবে না। তাহলে শিশিরকে দেখবে কে? ওযে আমার জন্য সবাইকে ত্যাগ করেছে। সমাজে মুখ দেখাবার উপায় নাই। শিশির যতই বুদ্ধিমান, পণ্ডিত হক, এদিকে নিতান্ত ছেলেমানুষ। কেউ দেখবার না থাকলে আধপেটা খেয়ে থাকবে। তুমি এখানে থেকে শিশিরকে দেখ্‌বে বল। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব।" সঙ্গিনী স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে শিশির আসিয়া সেই রাত্রের মেলে কাশী যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া গিরিবালাকে রেলে তুলিয়া দিয়া আসিলেন, বাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে গিরিবালা সঙ্গিনীকে শিশিরের সম্বন্ধে সমস্ত খুটি নাটি বুঝাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, সে বিষয়ে কোনরূপ অন্যথা হইবে না।

সেদিন ছিল শনিবার। পরের দিন শিশির একটু বেলা করিয়া আহারের জন্য আসিলেন। দেখিলেন, সকলই প্রস্তুত কেবল আসনের সম্মুখে ভাতের থালার অভাব। বামুন দিদিকে ভাত দিতে বলিয়া রান্না ঘরের দিকে চাহিলেন। সেখানে দেখেন যে ভাত বাড়া। সকলই প্রস্তুত। মনে করিলেন যে, বামুন দিদি তো তাহার সম্মুখে বাহির হন না, বা, অন্তরাল হইতেও কথা কহেন না। কাজেই বুঝিলেন যে, বামুন দিদির ইচ্ছা বাবু নিজে থালা ধরিয়া লইয়া যান। সেইরূপ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বামুন দিদি কাঁদিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা মাত্র ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া উত্তর আসিল যে, গৃহিনী দিদি যাইবার সময় তাঁহাকে আহারের সঙ্গে একটা তুকের জিনিষ দিতে

বলিয়াছিলেন। সেটা দিবেন বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও এখন দেখিতেছে, সে কাজ করা অসাধ্য।

স্বরটা শুনিবামাত্র চেনা চেনা মনে করিয়া শিশিরের চমক লাগিল। কথা শেষ হইতে না হইতেই চমক ভাঙ্গিয়া বলিলেন, নন্দিনী!

নন্দিনী শিশিরের হাঁটু জড়াইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষ কথা।

বালিগঞ্জের বাড়ী কিছুকাল চাবি বন্ধ, দরোয়ানের জিম্মায় ছিল। ছিন্নকেশী গিরিবালা মাতার মৃত্যুর পর কঠোর বৈধব্য ব্রতধারিণী। গহনা পত্রাদি বিক্রয় করিয়া বালিগঞ্জের বাটীতে দুঃস্থ ভদ্রনারী-দিগের রক্ষা ও শিক্ষার জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী। সে বৎসর মাঘ মাসে শিশিরের নবকুমারের অন্নপ্রাশনে আত্ম-গোপন করিয়া গিরিবালা বিরজার দ্বারা হাজার টাকার যৌতুক দিয়াছেন।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

সমাপ্ত

চড়ুই পাখীর কথা

আমার চেম্বারের জানালায় বসে একটী চড়ুই পাখী ডাকছিল, "চির্‌র্‌, চির্‌র্‌"। ভিতরের কার্ণিসে বসে তার সঙ্গী তাকে জবাব দিলে, "চির্‌র্‌, চির্‌র্‌"। দুজনে ফুক করে খোলা বাতাসে বেরিয়ে গেল। তার পর এক পাল চড়ুয়ের আনন্দ-কোলাহল বাইরে থেকে শুনতে পেলুম "চির্ চির্, চির্"। মকদ্দমার নথী-পত্র ছেড়ে আমার মন চলে গেল আমার পল্লীর মাঠে; আর মনে পড়লো, সেই ছেলেবেলাকার আকাশ-বিহারী বন্ধুদের কথা!

কতবার সারা বেলা বনের ভিতর বসে গান শুনেছি আর তাদের খেলা দেখেছি! সে গানেরও অন্ত ছিল না, সে খেলারও অন্ত ছিল না। তাদের ব্যবহার দেখে মনে হতো, সেই গান খেলাই তাদের কাছে সত্য, আর সব মিথ্যা!

প্রকৃত কবি যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে তো সে ঐ পাখী। কেমন করে গানের মধ্যে সমস্ত প্রাণকে ঢেলে দিতে হয়, তা সেই জানে। আর তার গান যে তারই মধ্যে এক আনন্দের উন্মাদনার সৃষ্টি করে, সে তার ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়।

শৈশবে আমার পাখীর সেই গানের মর্ম্ম বুঝতে পারি, আর তার সেই উন্মাদনা নিজের মনে অনুভব করতে পারি। বড় হলে সেই তন্ময় হবার শক্তি আমাদের মধ্যে আর থাকে না। Jesus এই সত্যটী বুঝেছিলেন বলেই বলেছিলেন, "Blessed are the children for theirs is the kingdom of Heaven"।

Kingdom of Heavenই বটে, কেননা সে সম্পদের সঙ্গে কোন পার্থিব সম্পদের তুলনা হয় না। হাফেজ তাঁর শিরাজি মাশুককে উদ্দেশ করে বলেছেন, "তোমার মুখের একটি কালো তিলের জন্য আমি সমরকন্দ আর বোখারার রাজ্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি।" হাফেজের মত বুকের পাটা আমার নাই, তবু এ কথা বলবো, যদি সেই Kingdom of Heaven, সেই অনাবিল আনন্দের উছল ধারা আমার জীবনে ফিরে পাই, তাহলে তার জন্য অনেক-কিছু ছেড়ে দিতে আমি তৈরী আছি।

আমি এখানে নানা চিন্তায় নানা কাজে ব্যতিব্যস্ত; আর চড়ুইগুলো সব ভুলে "চির্ চির্ চির্," "চির্ চির্ চির্" গেয়ে যাচ্ছে। তাতেই তারা মেতে আছে। তাদের ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই। কাকেও ঠকাবার মতলব নেই আর কারুর কাছে ঠকবার মতলবও নেই। গাইতে তারাই পারে, আমাদের সে অধিকার নেই। সে অধিকার আমাদের ছিল যখন আমরা শিশু ছিলাম। এখন কিন্তু নেই। Kingdom of Heaven এখন আমরা হারিয়ে বসেছি। আমার এখন fallen, পতিত।

আমাদের কিন্তু এমনই স্বভাব যে যদিও আমরা সেই Kingdom of Heaven থেকে অনেক দূরে পড়েছি, তার কথা কিন্তু ভুলতে পারিনি। যত বড় অকবিই হোক না কেন, বাল্যের লীলাভূমি দেখলে তার মন একবার চঞ্চল হয়ে উঠবেই উঠবে; তার নিরাশ প্রাণে ভাবের অমৃত-ধারা বইবেই বইবে। আর যত কঠিনই তার প্রাণ হোক, তার মধ্যে স্নেহের একটা কোমল স্পন্দন দেখা দেবই দেবে। প্রাণদণ্ড যাদের মাতৃভূমি দর্শনের শাস্তি, তারাও শুনেছি তাদের সেই প্রাণকে তুচ্ছ করে লুকিয়ে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে দেখতে এসে শেষে প্রাণ হারিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একজন পরলোকগত দেশ-বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের কথা মনে পড়লো। তিনি একটু বেশী রকমের সাহেব হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ

বাঙলায় কথা বললে তিনি ভারি চটে যেতেন। এ রকম বাতিক আগেকার লোকদের হতো। আমাদের মুসলমান সমাজে যেমন উর্দ্দুর বাতিক আছে! ব্যারিষ্টারী করে তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। শেষে তাঁর retire করবার সময় হলো। বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার, দেশে retire করা যায় না, খুব জাঁক-জমক করে বিলাতে চলে গেলেন।

সেই সুন্দর বিদেশে কিন্তু শান্তি পেলেন না। অহরহ দেশের কথাই তাঁর মনে আসতে লাগলো। যত দিন যেতে লাগলো, দেশের মায়া আরও জোরে তাঁকে দেশের দিকেই টানতে লাগলো। বিদেশের আবহাওয়া, বিদেশের খাদ্য পথ্য বিদেশের জীবন-যাত্রা-প্রণালী সবই তাঁর অসহ্য হয়ে উঠলো। তিনি শৈশবের সেই আমের ঝোল, শিঙ্গি মাছের ঝোল আর আমড়ার টকের জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বুড়ো মানুষ, তাতে আবার মনে এই অশান্তি! হঠাৎ তাঁর একদিন ভয়ানক অসুখ হলো। খুব বিজ্ঞ একজন ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি রোগীর সমস্ত কথা শুনে, তাকে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। তাড়াতাড়ি passage বুক করা হলো। পীড়া কিন্তু আর কমলো না। রোগী প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলেন। প্রলাপে কিন্তু সেই দেশেরই কথা। ব্যারামের ঘোরে তিনি বলতে লাগলেন, "ওগো আমায় দেশে নিয়ে চলো গো, আমি এখানে বাঁচবো না। আমায় আজ কই মাছ ভাজা দেওয়া হয় যেন, কই মাছ আমার বড় ভাল লাগে। কই Passage ঠিক হয়েছে! আজকেই চলো, আজকেই চলো। এই বিদেশে আমি হাঁপিয়েই মারা যাব, একবার আমায় দেশের হাওয়া খেতে দেও।" এই রকম করুণ বিলাপ করতে করতে একদিন তাঁর heart failure হলো। দেশে যাওয়া আর ঘটলো না।

তাই বলছি, ছেলেবেলার স্মৃতি যেমন মানুষকে আঁকড়ে ধরে রাখে, আর কিছুতে তেমন পারে না। তার কারণ হচ্ছে, প্রকৃত আনন্দ, সীমাহীন, উদ্বেগহীন, সঙ্কোচহীন আনন্দ—আমরা জীবনের সেই অরুণ-রাগ রঞ্জিত, বিহঙ্গ-কলরব-মুখরিত, স্নিগ্ধ শিশির-স্নাত উজ্জ্বল প্রভাতেই পেয়ে থাকি; পরে আর কখনও পাই না। জীবনের সেই শুভ মুহূর্ত্তেই অমরাবতীর কোন্ সূর্য্য সুবর্ণ-প্রস্রবণের মত আনন্দ-গীতি আমাদের অন্তর থেকে হাসতে হাসতে নাচ্তে নাচ্তে, খেলতে খেলতে চারিদিক আলোকিত করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বয়স যেমন আমাদের বাড়তে থাকে, সেই উৎসও তেমনি শুকিয়ে আসতে থাকে আর দুঃখের কালো গরল সংসারের বিষ-পারাবার থেকে বেরিয়ে সেই স্বর্গীয় উৎসকে পঙ্কিল করে

তুলতে থাকে! তখন সে আনন্দও থাকে না, আর আনন্দের সে গানও আমাদের কণ্ঠ হতে বেরোয় না। পাখী তখন সত্যই আমাদের কাদায় ফেলে, আনন্দের স্বচ্ছ-নীলাকাশে চলে যায়। নিভৃতে যখন তাদের দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের দুঃখের কথা তখন আমাদের মনে আসে। তখন আমরা চোখের জল না ফেলে থাকতে পারি না।

"চির্, চির্, চির্"! ঐ আবার তারা গান ধরেছে। ঐ তাদের মধ্যে একজন এসে আমার জানলায় বসলো আর আমার দিকে মুখ করে নির্ভাবনায় তার "চির্ চির্ চির্র্" গাইতে লাগলো। আমার মনে হলো, এই আনন্দের জীবটী দুঃখ দয়া করে আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছে!

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম, "আচ্ছা ভাই চড়ুই পাখী, বল দেখি, তুমি তোমার প্রাণ-ভরা আনন্দ কোথা থেকে পেলে! আমায় তোমার গুপ্ত মন্ত্রটী শেখাও, আমি চিরকাল তোমায় ভাল-বাসবো।"

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে চড়ুইটী খানিকক্ষণ আমার দিকে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলো, তার পর উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলো, "ঠিক, ঠিক, চিনেছি বটে। তুমি আমাদেরই একজন। তোমার এই অদ্ভুত রং-ঢং দেখে প্রথম তোমায় চিনতে পারিনি এখন কিন্তু চিনেছি। তোমার দুঃখ দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। তোমায় একটু তত্ত্ব-কথা আজ শিখিয়ে যাই; তুমি সেই কথা-মতো কাজ করো। তোমার কষ্ট অনেক কমে যাবে। অবশ্য আমাদের মত সুখী হবার আশা করো না। সে পথ তোমাদের জন্য সেই দিনই বন্ধ হয়েছে, যেদিন তোমরা তোমাদের শিশু-জীবন ছেড়েচো। তবে আমার কথা যদি শোনো, তাহলে তোমার সেই শিশু-জীবনের সঙ্গে একটা যোগ-স্থাপন করতে পারবে, আর পরে, এই জীবন ত্যাগ করবার পরে, হয়তো সেই অনাবিল আনন্দের স্বচ্ছ স্রোতের মধ্যে ফিরে যেতেও পারবে।"

তার কথা শুনে একান্ত ব্যগ্র হয়ে আমি বললুম, "আমার সেই কথাটী শেখাও ভাই, আমি চিরকাল তোমার কেনা হয়ে থাকবো। আনন্দের এই স্পর্শমণির পরশ থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।"

আমার ব্যগ্রতা দেখে মনে মনে বেশ খুসি হয়ে চড়ুইটী বললে, "কথাটা তেমন কিছুই নয়, শুনলে বলবে, ও আমার জানা ছিল। তবে কিনা, 'জানা ছিল' বলা এক কথা, আর জানা আর এক কথা। কথাটা হচ্ছে এই:—'আল্লা যা দেন নি, আর দেবেন না, তার জন্য বৃথা বিলাপ করো না। যা তিনি দিয়েছেন আর দেবেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিও আর তাঁর দানের সদ্ব্যবহার করো। জীবনকে আল্লার শ্রেষ্ঠ দান মনে করে যত দুর সম্ভব

উপভোগ করো। আর প্রেমই যখন জীবনকে বাঞ্ছনীয় করে, তোমরা সকলে পরস্পরকে ভালোবেসে, হেসে খেলে, গান গেয়ে জীবন কাটায়ো।"

"তাহলে রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সমস্যার কি হবে" বলে একটু গম্ভীর হয়ে আমি তার দিকে চাইলুম। আমার এই ন্যায্য প্রশ্নের কোন উত্তর দেবার চেষ্টা না করেই সে ফুক করে উড়ে নিজের দলে গিয়ে মিশলো। চড়ুইরা তাদের সঙ্গীকে ফিরে পেয়ে "চির্-চির্-চির্-র্" করে মহা কলরব আরম্ভ করে দিলে।

এস্, ওয়াজেদ আলি।

পথের সাথী*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে। সুবৃহৎ স্কুলবাটী এবং তাহার সংলগ্ন অনতিবৃহৎ বোর্ডিং বাড়ী এখন জনশূন্য স্তব্ধ। গ্রীষ্মের উষ্ণশ্বাসে ঋজুদেহ দেবদারুর উন্নত শীর্ষ বারেবারেই যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে নত হইতেছিল, কিন্তু তাহার কোন পর্য্যবেক্ষণ করায়ন দ্রষ্টা সেদিনে উপস্থিত ছিল না।

মলয়া ও করবী দুজনেই গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী দুজনকারই একদেশে, খুবই কাছাকাছি। উভয় পরিবারে সেই হেতু কিছু ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বিশেষতঃ মলয়া কোন দূর সম্পর্কে করবীর মাস্তুত বোনও হইত।

করবী ও মলয়ার অন্তরের প্রকৃতিতে ও বাহিরের রূপে যেমন আগাগোড়াই মিল ছিল না, দুজনকার সাংসারিক অবস্থাতেও তাদের তেমনি অমিল। মলয়ার পিতা কালীকুমার বাবু সহরের মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা উকিল। সময়াভাব বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই; অর্থাগম তাঁর প্রচুর এবং সেই অর্থরাশির সার্থকতাও তাঁর হাতে যে না হইতেছিল তাও নয়। যেখানের যত অনুষ্ঠান প্রতি-

* "উপন্যাসের প্লট" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "পথের সাথী" নাম দেওয়া হইল।—লেখিকা।

ষ্ঠান আছে, কালীবাবু তার খবর পাইলেই সর্ব্বত্র জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অন্ন বিস্তর দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য চাঁদা, কংগ্রেস আফিসে সাহায্য, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকার্য্যে মোটা রকম দান,এ সকলই তিনি করিয়া থাকেন। আবার ছেলেমেয়েদের লালনপালনে, শিক্ষায় ও তাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সর্ব্বত্রই তাঁহার চিত্ত ও বিত্তকে তিনি নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; মলয়া তাঁর একটী মেয়ে, পাঁচ ছেলের পর সর্ব্বশেষের সন্তান, তাই মা-বাপের বড় স্নেহের; বিশেষ চরিত্রগুণেও সে নিজেকে সেই স্নেহ-প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। স্নিগ্ধ শান্ত স্বভাব, কর্ত্তব্যপরায়ণা অথচ তীক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্না এই মেয়েটীকে ঘরে পরে সকলেই ভালবাসিত।

মলয়ার পিতা স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী; তিনি তাঁর বাল্য-বিবাহের পত্নীকে নিজেই লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। পত্নী সুমতী চলনসই ইংরাজী বাংলা জানেন, ছেলে-মেয়েদের প্রথম শিক্ষাটা তিনিই দিয়া থাকেন, তবে কালধর্ম্মে এখন মেয়ের বিবাহের বয়সটা বৃদ্ধি পাইতেছে, জীবন-যাপনের পদ্ধতিও অনিশ্চিত, তাই মেয়েকে নিজের চেয়ে লেখাপড়াটা কিছু বেশী শেখান দরকার মনে করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইতেছিলেন, কিন্তু বৎসর দুই হইতে মলয়ার একান্ত ইচ্ছায় তাহাকে তাঁদের প্রতিবেশী-কন্যা করবীর সহিত কলিকাতার কোন মেয়েস্কুলের বোর্ডিংএ বোর্ডার রাখিয়া পড়ানর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

করবীর পিতা অমরেশ্বর গুপ্ত সেইখান-কার জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার। করবীরা তিন বোন, বড় সুরভি বহুদিন হইল এক রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হইয়া শ্বশুরঘরে ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। বাপের বাড়ীর আধুনিকত্বের সহিত সে বাড়ীর কিছুই খাপ খায় না বলিয়া এ বাড়ীতে সে বাড়ীর বধূটী বড় একটাই আসা যাওয়া করিতে পায় না। গুটিকয়েক পুত্রকন্যা লইয়া সে মেয়েটী সংসারে এমন জটিলভাবেই জড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, বাল্য কৈশোরের স্নেহনীড়ের বিচ্যুতির বিরহানুভব করিবার মত অবসরও তার বড় বেশী ছিল না। বরং কখন কদাচ দু' চার দিনের জন্য আসিলে তার রুগ্ন ও আবদারে ছেলে মেয়েদের লইয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া পলাইয়া যায়। ঠাকুমা দাদুর অদর্শনে তাহারা এম্নি গোলমাল লাগাইয়া বসে যে, তাদের লইয়া থাকে কার সাধ্য, বিশেষ সুরভি-দের মা নর্ম্মদা দেবী যখন নাতি নাতিনী-দের মনোরঞ্জনে সমর্থাই নহেন।

অমরেশ্বরের মেজ মেয়ে করবী আমা-দের পরিচিতা। রূপের খ্যাতিতে, বিদ্যার গৌরবে ইনি তাঁর চারিদিকে এমন একটা মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যে, চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের মতই তাঁহাকে শোভনীয় করিয়া তুলে। চিত্রে, সঙ্গীতে, বেহালা-

সাদনে রুবির প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলে তো কেহ ছিলই না, অন্যত্রও খুব সুলভ নয় ; রূপেও সে তেম্‌নি উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মতী।

গ্রীষ্মের ছুটীর আধাআধি প্রায় অতীত হইয়া গিয়াছে, গরমটা বেশ চাপিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি বিকালের দিকে গুমোটকাটা একটুখানি ফুর ফুরে হাওয়া উঠিয়া সর্ব্বজনের সমস্ত দিনের তাপদাহ জুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং সে চেষ্টাও কতকাংশে সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সুমতী ও মলয়া অমরেশ্বরের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা কিম্বা ছয়টাও হইতে পাবে। মা ও মেয়ে বাহিরের ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসিল। সেখানেও কই কাহাকেও দেখা যায় না!

না ওই যে, ও ধারের একটা কোণের ঘরে খুন্তি নাড়ার শব্দ হইতেছে না? ঐটেই তো এ বাড়ীর রান্নাঘর।

সুমতী ও মলয়া অগ্রসর হইয়া দ্বারের কাছে গিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে উনান জ্বলিতেছে একজন নেপালী পাচক সেখানে একখানা টুলে বসিয়া এলুমিনিয়মের কড়ায় ডিমের চপ ভাজিতেছে আর অদূরে বসিয়া বাড়ীর গৃহিনী ডিসে করিয়া তাই গরম গরম খাইতেছেন। সুমতী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, এবং যেন দেখিতে পান নাই এম্‌নিভাবে আর একদিকে মুখ রাখিয়া সেইখান হইতেই ডাকিয়া বলিলেন "কৈ গো, কে কোথায়? নর্ম্মদা! রাণি কোথায় রে?"

নর্ম্মদা রুবির মায়েরই নাম। নর্ম্মদা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উহাদের উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিলেন—

"ওকি দিদি! দাঁড়ালেন কেন? আসুন না? কে মলি! এস এস মা এস!"

বলিতে বলিতে নিজে উঠিয়া পড়িলেন—

"এইখানেই বসুননা, দিদি! আপনি ত থাকেন না, তা মলিকে দুখানা গরম চপ ভেজে দিক।"

সুমতীর পূর্ব্বেই মলয়া বলিয়া উঠিল—"না মাসী মা! আমি এইমাত্র বাড়ী থেকে জল খেয়ে আসছি, এক্ষণি ত আর খেতে পারবো না, রুবি কোথায় বলুন, আমি তার কাছে যাচ্চি।"

নর্ম্মদা একবার নিজের পরিত্যক্ত অর্দ্ধভুক্ত চপখানার দিকে দৃষ্টি করিলেন, তারপর বাঁ হাতে সুমতীর পায়ের ধূলা লইতে লইতে কহিলেন—

"একখানা খেলে হতো, তা না হয় যাবার সময় খেয়ে যেও, এস, রুবি বোধ হয় ওপরে শুয়ে বই পড়চে, সেখানে নিয়ে যাই।

সুমতী। "থাকনা ভাই! রোজ রোজ কি আবার পায়ের ধুলো নিতে হয় নাকি? বলিয়া একটু পিছাইয়া গিয়াছিলেন, তারপর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—

"না না, তা কি হয়—খেতে খেতে তুমি খাওয়া ফেলে উঠে যাবে, সে আবার কি রকম কথা! না ভাই, সে হবে না, আমার মাথা খাও, আবার তুমি খেতে বসো। আমরা কি পথ চিনিনে ওপরে যাবার তাই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে! না ভাই! না বসলে কিন্তু বড্ড রাগ করবো! দেখ দেখি, এমন করে এসে পড়ে তোমার খাওয়াটী নষ্ট করে দিলুম। ছি ছি বড় অন্যায় হয়ে গেছে!"

নর্ম্মদা দুচারিটা ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিয়া সুমতীর প্রবল প্রতিবাদে তাহাদের বিঘোরে মরিয়া যাইতে দেখিয়া অগত্যাই ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ফিরিয়া গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং কিছু লজ্জা-বিপন্নভাবে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া একটু ব্যস্তভাবেই কার্য্য-সমাধানের দিকে মনোযোগী হইলেন। তিনি বলিলেন—

"এ সব জিনিস ভাই, জুড়িয়ে খেলে আমার একেবারেই হজম হয় না কিনা, তাই অর্জ্জুন বাহাদুর ভাজবার সময়েই আমায় রোজ ডেকে এনে খাওয়ায়। ওঁর আর মেয়েদের এক সঙ্গে চায়ের সময়ে খাবার জন্যে রেখে দিয়ে আবার এই উনেনেই রান্না চড়াবে কিনা, অর্জ্জুন বাহাদুর মাছের পুরে ডিমের গোলা মাখাইয়া কড়ার ঘিয়ে ছাড়িয়া দিতে দিতে সদ্য ভাজা খান চারেক চপ ধপাস্ করিয়া গৃহিণীর পাতের উপর ফেলিয়া দিতেই নর্ম্মদা ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি করলে অর্জ্জুন বাহাদুর! এই আমি তুলতে পারছিনে, আবার এই এতগুলো! কি বিপদ বল দেখি—"

সুমতির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

"দেখুন তো অন্যায়! আমি উঠেই পড়ি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন—"

বাধা দিয়া সুমতী চলনোন্মুখী হইয়া কহিলেন—

"না ভাই! আর দাঁড়াচ্ছিনাতো, এই যে আমরা উপরে যাচ্চি।"

উপরে উঠিয়াই মলয়া ডাকিল—রুবি! একটা ঘরের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—"উঁ!"

"কোথায় তুই? কি করছিস?"—বলিয়া মলয়া সেই ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। তার পশ্চাদনুসরণে সুমতীও আসিলেন।

ঘরটী এ বাড়ীর সব ঘরের মতনই নাতিবৃহৎ। ঘরের মধ্যে একখানা নেয়ার ছাওয়া খাটে এলোমেলো বিছানা পাতা, তারই উপর করবী তার মেঘপুঞ্জ কেশভার এলাইয়া দিয়া শিথিলদেহে শুইয়া শুইয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল। ঘরের মধ্যে এ ছাড়া একটা পুরাতন ড্রেসিং টেবিল, একখানা চেয়ার দেওয়ালে আঁটা আলনায় রুবিরই পরা একখানা চাঁদের আলো খোলের কোঁচান শাড়ী ও সেই রকমেরই ব্লাউজটা, একটা লেশ লাগান ফ্রিল দেওয়া পেটিকোট, বডি ও আর একখানা আটপৌরে সাদা শাড়ী ছিল। রুবির বোর্ডিংএ থাকার ষ্টীল ট্রাঙ্কটা ও চামড়ার ছোট্ট রাইটিং কেসটাও এক ধারে রহিয়াছে।

রুবি নভেলের পাতায় দৃষ্টিবদ্ধ থাকিয়াই নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিয়া উঠিল—"মলয় হাওয়া হঠাৎ ঝড় বইলো যে রে ? আয় না ভাই ! এইখানে এসে বসে পড়না—"

সুমতী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন—"ভাল আছিস্ রুবি ! ক'দিন যাস্‌নি কেন মা ?"

করবী তখন খানিকটা জিব্ কাটিয়া তাড়াতাড়ি নভেলখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং একলাফে খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া আঁচল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে লঘু ত্রস্ত পদে আসিয়া সুমতীর পায়ের ধুলা লইতে লইতে অপ্রতিভের একশেষ হইয়া বলিতে লাগিল—"মাগো ! মাসীমা এয়েছেন, আমি যদি তা' একটুও বুঝতে পেরে থাকি ! মলি ! তুই কেন বল্লি না বলতো ? ইউ নটি গার্ল ! আসুন মাসিমা ! মায়ের ঘরে বসবেন আসুন, এখানে কোথায় বা বসবেন।"

নর্ম্মদার ঘরখানি আয়তনে একটু সামান্যই বড়, তবে সেখানির সাজসজ্জা একরকম চলনসই মন্দ নয়। ঘরের মাঝখানে জোড়া খাট, দুইকোণে দুইটি আলমারী তার একটীতে কাঁচ দেওয়া তাহাতে আরও নানান্ টুকিটাকির সঙ্গে একরাশি কাঁচের পুতুল, আর একটীতে কাঠের কবাট দেওয়া, ভিতরে খুবই সম্ভব নর্ম্মদা দেবীর সাড়ীগুলি সাজান আছে। একটা ছোট টিপয়, একটা মাঝারি ড্রেসিং টেবিল, আলনা আর তাছাড়া মেজেয় একখানা তিন রংয়ের ডোরা-টানা সতরঞ্চি বিছানো আছে। সুমতীরা সেইখানে আসন গ্রহণ করিলেন।

"এখনও চুল বাঁধোনি কেন মা ? গরম হচ্ছে না ?"

সুমতীর প্রশ্নে রুবি তার চামরের মত কোঁকড়া ও থোপা করা চুলের রাশি হাত দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল—"আমি বড্ড সন্ধ্যে করে চুল বাঁধি মাসিমা ! চুল খোলা থাকলে আমার গরম হয় না। হ্যাঁ মাসিমা ! মলির চুল বুঝি আপনি বেঁধে দিয়েছেন ? তাই অত চকচকে হয়েছে ! ওর দ্বারা আর অত হতে হয় না ! মলু তুই যে এমব্রয়ডারিটা মাসিমার কাছে শিখছিলি সেটা কতদূর হলো রে ? শেষ হয়ে গেছে ?"

মলয়া কহিল "কালকেই সবে শেষ হয়েছে ভাই, তুই কিছু করছিস?" শিহরিয়া উঠিবার ভাণ করিয়া রুবি জবাব দিল—

"ওরে বাবা ! আমি অত খাটতে গেলে মারাই যাব না ভাই ! আমি খানতিনেক নভেল যোগাড় করেছি, সে ক'খানা শেষ না হলে আর আমার আহার নিদ্রা নেই।"

মলয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কি কি বইরে ?"

রুবি একটু খাটো সুরে জবাব দিল "ও ভাই এ তিনখানা তিন দেশের। একখানা এখনকার বিখ্যাত লেখকদের মাথার মণি আনাতোল ফ্রাঁসের রেয়ে-লিলি, একখানা ভার্জ্জিন সয়েল, আর

একখানা চরিত্রহীন। তুই বোধ হয় এর মধ্যে একখানাও পড়িস নি?" মলয়া না পড়ার কুণ্ঠায় ঈষৎ লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িল, কিন্তু সুমতী ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিয়া উঠিলেন—

"এসব বই তোমাদের বয়সের মেয়েদের পড়তে নেই মা! সব কখানার কথা জানিনে, তবে ওর দু' একখানি জানি, ও আর পড়ো না।"

রুবি ঈষৎ আশ্চর্য্যের স্বরে কহিল—"কেন মাসি মা! আমি অনেক বড় লেখকদের সমালোচনায় তো দেখেছি তাঁরা এদের আর্ট সম্বন্ধে খুব তারিফ করেছেন ত!"

সুমতী কহিলেন "সব আর্ট তো আর সবার জন্য নয় মা! যেমনটা নাচের মধ্যে যে আর্ট আছে, তা উচ্চ শিক্ষিত ছেলেদের চেয়ে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতরাই উপভোগ করে থাকে। তোমরা এখন আর্টের চেয়ে আদর্শের অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে। তারপর রুবিকে কিছু প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিলেন।

"একটা গান গাওতো রুবি! তোমার গান আমার বড্ড মিষ্টি লাগে! হ্যাঁরে, অতসীকে দেখছিনা যে? সে কোথায় গেল?"

রুবি কহিল 'সে মাসি মা! বিমলদের বাড়ী বেড়াতে গেছে। তা' গান শুনবেন মাসিমা! তা হলেত নিচেয় যেতে হয়। অর্গানটা তো নিচেই আছে।"

সুমতী বলিলেন "আমার বাজনার চাইতে শুধু গলার গান বেশী মিষ্টি লাগে, তাই গাও।"

"তা গাচ্ছি, বলিয়া রুবি সুমতীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিল "কোন্‌টা গাইবো বলে দিন মাসি মা; কি আপনার ভাল লাগে? সুমতী তার চিক্কণ কালো চুলের রাশি আদরভরে নাড়িতে নাড়িতে হাস্যস্মিত মুখে সস্নেহে কহিলেন—

"তুই যা' গাস্‌ তাই ভাল লাগে, আপনার গানই একটা গা' না।"

করবী গাহিতে লাগিল—

"আমি একলা চলেছি ভেসে এ ভবে,
আমার পথের সাথী কে হবে?"

নর্ম্মদা রক্তমাখা ঠোঁট দুটি পানের রংয়ে রাঙ্গাইয়া তার উপর হাসির প্রলেপ মাখাইয়া পানের ডিবা হাতে, আসিয়া বলিলেন—

"উনি এলেন কি না, তাই চা-টা দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না দিদি! এই নিন্‌ পান খান। রুবি! তুই যখন তখন ঐ গানটাই বা গাস্‌ কেন? তারচেয়ে "ওরে পাগল বাতাস"টা গাইলেই হতো।"

গান থামাইয়া করবী আবদার-ভরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "বাহারে! মাসিমা যে আপনার গান গাইতে বল্লেন।"

"তা আরওতো গান ছিল আপনার. তুই যে ঐটাকেই সার করেছিস!"

সুমতী রুবির মাথার চুলগুলি নাড়িতে ছিলেন, তাহাই করিতে থাকিয়া সাগ্রহে বলিলেন—

"না মা, তুমি এই গানটাই গাও, আমার ভাল লাগে, মার কাছে তখন 'ঝড়ের হাওয়া' 'পাগল হাওয়া'র গান গেও,

"আমি একলা চলেছি ভেসে এ ভবে,
আমার পথের সাথী কে হবে ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আলোচনা

"ঘর সামলাও"

(প্রতিবাদ)

—০:০—

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধটী সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি—

১। তিনশত বৎসর পূর্ব্বের Spain ও Hollandএর সহিত বর্ত্তমান England ও ভারতবর্ষের আপেক্ষিক অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। তিন শত বৎসর পূর্ব্বের Europeএর অবস্থার সঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করাই যুক্তিসঙ্গত। আচার্য্য রায় যে Hollandএর উদাহরণ দিয়াছেন সেরূপ উদাহরণ কি ভারতের ইতিহাসে বিরল ? ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র চিতোরের মহারাণা প্রতাপ সিংহকে সমস্ত হিন্দুস্থানের সম্রাট আকবর তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীদ্বারাও পরাজিত করিতে পারে নাই; শিবাজী মুষ্টিমেয় মারাঠী সৈন্য নিয়া প্রবল পরাক্রান্ত আওরঙ্গজেবের ক্ষমতাকে পরাভূত করিয়াছিল। তখন পারিয়াছিল, এখন পারে না কেন ? তখনকার হিন্দুদের সমাজ-সংস্থা ত বিভিন্ন ছিল না! তখনও ত জাতিভেদ ইত্যাদি সবই ছিল।

২। "মানুষ মানুষের হাতে খাবে না,

তার ছায়া মাড়াবে না, হিন্দু ভারতবর্ষের বাইরের লোক তা ধারণা করতে পারে না” কথাটা সত্য কি? দক্ষিণ আফ্রিকার Colour Bar Bill ও Class Areas Bill এ দুটার অর্থ কি? আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা ত জাতিভেদবিহীন, “dignity of labour” এর কদর জানা সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি। তবে তাহাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা কেন? Australia, Canada, U. S. A. এই সব দেশের Immigration laws গুলির উদ্দেশ্য কি? Klu-Klux-Klan এবং lynching এই দুইটা জিনিষের স্বরূপ কি? ডাক্তার রায় মেঘনাদ সাহার উদাহরণ দিয়াছেন ভারতীয় হিন্দু সমাজে। আমি জিজ্ঞাসা করি ডাক্তার সুধীন্দ্র বসুর স্থান আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে কি এর চেয়ে খুব বেশী স্পৃহনীয়? তবু ত আমাদের অস্পৃশ্যেরা বাঁচিয়া আছে; আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গেরা যে সে সব দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে নির্ব্বংশ করিয়াছে।

গত ২রা জুনের Evening News of India হইতে নিম্নোক্ত খবরটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

“..The Ceylonese boxer, Christopher de Saram of Keble College, Oxford, has not been included in the Oxford University boxing team, which is to visit Africa, because his skin is not white...It was stipulated by the South African representative that Christopher de Saram, as a coloured man, was “on no account to be included in the Oxford team.”

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। ইহাই কি আচার্য্য রায়ের পাশ্চাত্য উদারতা ও সাম্যের পরাকাষ্ঠা নাকি? আমি একের দোষ প্রদর্শন করিয়া অন্যের দোষ প্রক্ষালন করিতে চাই না। আমার বক্তব্য এই: একটা, সমাজকে নিন্দা করিতে গিয়া অন্য সমাজের স্তুতিবাদ কেন?

Reading একজন সামান্য লস্কর হইতে Viceroy পর্য্যন্ত হইয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রানী দাসীর পুত্র হইয়াও কি ভারত-সম্রাট হন নাই? মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী একজন সাধারণ মারাঠা জাতির লোক ছিলেন। তবে এখন হয় না কেন? হয় নাই-ই বা বলি কি করিয়া? স্বয়ং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ই কি অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজী বলিয়া হিন্দুসমাজে কম সম্মান পান? আমি জানি তিনি মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় বংশজাত ব্রাহ্মণের গৃহে অতি সম্মানিত অতিথিরূপে পূজিত হন। (পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশ্মিরী পণ্ডিত নন; মালবদেশীয় অর্থাৎ গুজরাতী ব্রাহ্মণ। যুক্তপ্রদেশের কাশ্মিরী পণ্ডিতের মধ্যে

তেজবাহাদুর সপ্রুর নাম করা যাইতে পারে।

৩। আভিজাত্য বংশপরম্পরাগত হইলেই যে সে শ্রেণীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, ইহা সর্ব্বত্র সত্য নয়। ইংলণ্ডেও ত আভিজাত্য বংশগত—peer এর ছেলে peer হয় এবং বংশ-পরম্পরাগত সম্পত্তি এবং অন্যান্য বিশেষ অধিকার ভোগ করে—তাহাদের ত সর্ব্বনাশ হয় নাই।

৪। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন (ক) সমস্ত হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; (খ) তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ এবং অশিক্ষিত। অথচ পরক্ষণেই বলিলেন এই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণগণ সমস্ত হিন্দুসমাজকে পদদলিত, নির্য্যাতিত এবং অধঃপতিত করিয়া রাখিয়াছে। কোন সমীচীন ব্যক্তি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে কি? ডাঃ রায় বলিতেছেন, "খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউয়েন্থ সঙ্গ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন তখন তিনি ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা দেখে গেছেন!" অথচ যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা ১৩০০শত বৎসর যাবত চলিতেছে সেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, অৰ্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ কিরূপে যে ২২কোটি হিন্দুকে পদদলিত করিয়া রাখিল তাহা আমার ধারণাশক্তির অতীত। আচার্য্য রায় বুঝাইয়া দিবেন কি?

৫। আচার্য্য রায় বলিতেছেন—"মুসলমানেরা কারো উপর জোর জাবরদস্তি করে নাই।" ইহা সম্পূর্ণ অলীক এবং ভিত্তিহীন উক্তি। ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় মুসলমানদের জোর-জবরদস্তির কাহিনী লিখিত আছে।

"হিন্দুসমাজে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হয়ে থাকার চেয়ে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করা ভাল, এই বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন"—ইহা প্রমাণবিহীন উক্তি মাত্র। এরূপ উক্তির প্রমাণ কি? জিজিয়া করের কথাটাও কি রায় মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন?

"যদি অসিপ্রয়োগে তাদের মুসলমান করত তবে হিন্দুরা কখনও এই রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত না" ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। বাবর ও আকবর অসিপ্রয়োগেই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, হিন্দুদিগকে পরাভূত করিয়াছিল, তবু কেন হিন্দুরা তাঁহাদিগকে সম্মান করে?

হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য নয়, আশ্চর্য্য এই যে হিন্দুরা হিন্দু রহিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায় যেখানেই মুসলমানেরা গিয়াছে, হয় সে দেশের সমস্ত লোক মুসলমান হইয়াছে অথবা মুসলমানেরা সে দেশ হইতে সমূলে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। অথচ ৮০০বৎসর মুসলমান রাজত্বের পরও ভারতের ¼ লোক মাত্র মুসলমান, ইহা

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? পারস্যদেশে Zoroastrian ধর্ম্মের চিহ্ন নাই। অথচ এত সুদীর্ঘকাল মুসলমান সংস্পর্শে থাকিয়াও হিন্দুরা শত অত্যাচার নির্য্যাতনের মধ্যেও আপনাদের ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? আচার্য্য রায়ই বলিতেছেন যে "হিন্দু-সমাজে থাকিলে অশেষ নির্য্যাতন, মুসলমান হলে সুবিধা কত।" ইহা সত্ত্বেও ২২ কোটি লোক হিন্দু রহিল কি করিয়া? আজও ভারতে ৬কোটি অস্পৃশ্য হিন্দু রহিয়াছে। একদিকে হিন্দু সমাজে নির্য্যাতিত হইয়া, অপরদিকে হিন্দু বলিয়া মুসলমানদের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াও—এই ডবল নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া শত শত সুবিধা ভোগ করিতে তাহারা মুসলমান হয় নাই কেন? কিসের আশায় তাহারা মুসলমান রাজত্বের সময় আপনাদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে নাই?

৬। স্বাধীনদেশের কার্য্যপদ্ধতির সহিত পরাধীন দেশের কার্য্যপদ্ধতির তুলনা হইতে পারে না। যেখানে শাসিত এবং শাসকের স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে শাসিতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবেই। আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যথেচ্ছ কার্য্য করিবার অধিকার আছে কি?

আচার্য্য রায় বলিতেছেন—"কিং জনের কাছ থেকে যেদিন মেগনাকার্টা আদায় করল, দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য শ্রমজীবী, কৃষিজীবী সকলে মিলে নিজেদের অধিকার আদায় করলে, যেকলে বলেন—সেই সময় থেকে ইংলণ্ডে বিজেতা বিজিত ভাব চলে গেল। পরস্পর আদান-প্রদান চল্ল, জাতিগঠন হ'তে লাগল, তার ফলে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল।"

কিন্তু আমাদের Magna Charta কোথায়? আর সেই Magna Charta নাই বলিয়াই আজ কাটাকাটি মারামারি, মনোমালিন্য।

৭। আচার্য্য রায় ইংলণ্ডে বিজেতা বিজিতের মধ্যে আদান প্রদানের কথা বলিয়াছেন। তার পর ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান, মুসলমানদের মধ্যে যথেচ্ছ পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান প্রদানের সুখ্যাতি করিয়াছেন। অতএব ভারতেও কি তিনি চান যে, হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান, পারসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান অবাধে চলুক!!! "বীরবল" মহাশয় বৈশাখেরই ভারতীতে হিন্দু-মুসলমান মিলের কথা নিয়া এরূপ একটু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে বলি হিন্দু মুসলমান ইংরাজ, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান চলুক, তাহা হইলেই জাতিগঠন হইবে!!

৮। আচার্য্য রায় হিন্দু সমাজের নানা গলদ দেখাইয়া এই প্রতিপন্ন

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুদের সঙ্কীর্ণ সমাজ-সংস্থা এবং তন্মধ্যে জন্মগত জাতি-ভেদই তাহাদের দুর্দ্দশার কারণ। আচার্য্য রায়ের কথামতেই মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে এসব সঙ্কীর্ণতা নাই; বরং তাহাদের সমাজ-সংস্থা জগতের আদর্শস্থল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, হিন্দুরা যেন তাঁহা-দের জাতিভেদ ইত্যাদি হাজার রকম সামাজিক রোগের দরুণ গোল্লায় যাই-তেছে, কিন্তু মুসলমানদের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ কি?

৯। ডাক্তার রায় সাম্যের উদাহরণ দিয়াছেন—আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ক্রোরপতি এবং মজুর পাশাপাশি চলে, পাশাপাশি রেল গাড়ীতে বসে। কিন্তু কোন social dinner বা partyতে শ্রমজীবী ক্রোরপতির পাশে স্থান পাইবে কি? অথচ হিন্দু সমাজে দেখুন, কোন ভোজ উপলক্ষে একজন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ তাহার স্বজাতীয় একজন লক্ষপতির সহিত পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিবে! উদারতা জিনিষটা কি? আচার্য্য রায় বলিতেছেন মুসলমান ধর্ম্ম সব চেয়ে উদার কেননা "জুম্মা মসজিদে বাদশাই হউন, ফকিরই হউন, আর মুটেই হউন, পাশাপাশি নমাজ পড়িবে, আমির ফকির একপাত্র থেকে ভোজন করবে।" তারা ত পাশাপাশি বসিয়া নমাজ করে মাত্র, কিন্তু একজন হিন্দু সম্রাট, পথের ভিখারী সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের পদধূলি লইবে এবং তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে নীচে বসিবে। উদারতা যদি তাই হয়, তাহা হইলে ত হিন্দু সমাজের উক্ত দৃষ্টান্তকে উদারতার চরম আদর্শ বলা যাইতে পারে!! একপাত্রে ভোজন করিয়া উদার হইতে হইলে আমরা সেরূপ উদার হইতে চাই না। বৈজ্ঞানিক হইয়া ডাঃ রায় একপাত্রে ভোজনের কিরূপে প্রশংসা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না! তার পর ডাক্তার রায় বলিয়াছেন হিন্দুদের মধ্যে divorce নাই, মুসলমানদের মধ্যে আছে। সুতরাং মুসলমানধর্ম্ম উদার। আমি জিজ্ঞাসা করি, সামাজিক কোন বন্ধন না থাকার নামই কি উদারতা? মানুষ ব্যতীত ইতর পশু পক্ষী ইত্যাদির সমাজে ত ছোট, বড়, জাতি-ভেদ, বিবাহ ইত্যাদি কোন বন্ধনেরই বালাই নাই! তাহা হইলে কি বলিতে হইবে পশু পক্ষীদের সমাজ-সংস্থা আদর্শস্থানীয় এবং তাহাই আমাদের ideal?

১০। উদার অর্থে আমি বুঝি magnanimous এবং tolerant; এবং সেই আদর্শ অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু-সমাজের ন্যায় উদার ধর্ম্ম এবং সমাজ বোধ হয় জগতে আর নাই। হিন্দু-ধর্ম্ম যেমন open to criticism এমন আর কোন ধর্ম্মই নয়। হিন্দুরা তাহাদিগের ধর্ম্ম বা সমাজসংস্থাকে কেহ গালাগালি দিলে বা সমালোচনা করিলে কখনও বিচলিত

হয় নাই। ধর্ম্মবিষয়ক যে কোন চরিত্র বা institutionকে যে কেহ যতই সমালোচনা করুক্ না কেন, হিন্দুরা তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। উদাহরণ দিতেছি। কালী বাঙ্গালী হিন্দুদের উপাস্য দেবী এবং সেই কালীপূজাতে আজ পর্য্যন্ত বলি-প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। সেই বলি-দান এবং কালীপূজাকে রবিবাবু তাঁহার "বিসর্জ্জন" নাটকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; এমনকি দেখাইয়াছেন যে সেই উপাস্য দেবীকে রঘু পুরোহিত নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল। হিন্দুরা অবিচলিতচিত্তে এই বিসর্জ্জনের অভিনয় দেখে, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগে না। মহারাষ্ট্রীয় নাট্যকার গডকরী তাহার এক নাটকে দেখাইয়াছেন যে একটা লোক নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত পবিত্র "শিব-লিঙ্গ"কে লাথি মারিয়া কুয়ার জলে ফেলিয়া দিল। হিন্দু দর্শকেরা এই দৃশ্য থিয়েটারে দেখে, কিন্তু বিচলিত হয় না। কিন্তু কল্পনা করিতে পারেন কি, ষ্টেজের উপর দেখান হইতেছে একটা লোক অবজ্ঞার সহিত একখণ্ড কোরাণ লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, আর মুসলমান দর্শকেরা অবিচলিত-চিত্তে সেই দৃশ্য দেখিতেছে? বস্তুতঃ ধর্ম্মবিষয়ক কোন সমালোচনা মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারে না। গত ১লা জুনের Evening News of Indiaতে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সভার নোটিশটা পড়ুন।

A public meeting of Mussalmans of Bombay will be held at a near future date under the auspices of Anjumane-Zia-ul-Islam and other Anjumanes and Moslem Associations to protest against the language used against the Holy Prophet in the Marhathi Encyclopaedia.

অন্য ধর্ম্মের প্রতি উদারতারও চূড়ান্ত হিন্দুরাই দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে মুসলমান ধর্ম্মের মত অনুদার ধর্ম্ম জগতে আর নাই। Religious tolerance বলিয়া জিনিষই ইস্‌লামধর্ম্মে নাই। এ সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু না বলিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার প্রণীত History of Aurangzeb হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

By the theory of its origin the Muslim State is a theocracy. Its true King is God, and earthly rulers are merely His agents, bound to enforce His law on all. Civil law is completely subordinated to Religious Law and, indeed, merges its existence in the latter. The civil authorities exist solely to spread and enforce the true faith. In such a State, infidelity is logically

equivalent to treason, because the infidel repudiates the authority of the true King and pays homage to his rivals, the false Gods and Goddesses. All the resources of the State, all the forces under the political authorities, are in strict legality at the disposal of missionary propaganda of the true faith.

Therefore, the toleration of any sect outside the fold of orthodox Islam is no better than compounding with sin. And the worst form of sin is polytheism, the belief that the one true God has partners in the form of other deities......

Islamic theology, therefore, tells the true believer that his highest duty is to make "exertion (jihad) in the path of God," by waging war against infidel lands (dar-ul-harb) till they become a part of the realm of Islam (dar-ul- Islam) and their populations are converted into true believers. After conquest the entire infidel population becomes theoretically reduced to the status of slaves of the conquering army. The men taken with arms are to be slain or sold into slavery and their wives and children reduced to servitude ... The conversion of the entire population to Islam and the extinction of every form of dissent, is the ideal of the Muslim State. If any infidel is suffered to exist in the community, it is as a necessary evil, and for a transitional period only. Political and social disabilities must be imposed on him, and bribes offered to him from the public funds, to hasten the day of his spiritual enlightenment and the addition of his name to the roll of believers....

......A non-Muslim, therefore, cannot be a citizen of the State ; he is a member of a depressed class ; his status is a modified form of slavery. He lives under a contract (zimma) with the State ; for the life and property that are grudgingly spared to him by the commander of the faithful he must undergo politi-

cal and social disabilities, and pay a commutation-money (Jaziya). In short, his continued existence in the State after the conquest of his country by the Muslims is conditional upon his person and property being made subservient to the cause of Islam.

He must pay a tax for his land (Kharaj), from which the early Muslims were exempted ; he must pay other exactions for the maintenance of the army, in which he cannot enlist even if he offers to render personal service instead of paying the poll-tax ; and he must show by humility of dress and behaviour that he belongs to a subject class. No non-Muslim (Zimmi) can wear fine dresses, ride on horse-back or carry arms ; he must behave respectfully and submissively to every member of the dominant sect. (Vol. III, Pp. 283-87).

রমনার কালী বাড়ী মুসলমানধর্ম্মের উদারতার স্মৃতিস্তম্ভ কিনা জানি না ; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে এইটুকু জানি যে সোমনাথের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সহস্র হিন্দু দেবমন্দির মুসলমানেরা ধ্বংস করিয়াছে ; কিন্তু রাজপুত, মারাঠা, বা শিখ (এক রণজিৎ সিংহ ব্যতীত) বিজয়ীরা কোন মুসলমান মসজিদ্ ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বিজয়নগর আজ "হম্পী"র ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু মুসলমানদের বিজাপুর মারাঠাকর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াও ইহার মসজিদ, কবর ইত্যাদিসহ অক্ষত অবস্থায় আছে। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। পুণার পার্ব্বতী মন্দিরের সিঁড়ির পাশে একটী মুসলমান ফকিরের কবর সযত্নে রক্ষিত আছে। ব্রাহ্মণদের কেন্দ্র পুণা নগরীতে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পেশবাদের পবিত্র পার্ব্বতী মন্দিরের পাশে শত সহস্র হিন্দুমন্দির ধ্বংশকারী পেশবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রু যে মুসলমান, তাহাদেরই একজনের সমাধিচিহ্ন পেশবাদের দ্বারাই সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা কি religious magnanimityর চূড়ান্ত নয়? আর শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার প্রবন্ধেই ত লিখিয়াছেন হিন্দুরা মুসলমান পীরকে পূজা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা কি অনুদারতার পরিচায়ক ? অপরপক্ষে দৃষ্টান্ত দেখুন। এই সেদিন যে মুসলমানদের উদারতার প্রশংসা করিয়া আচার্য্য রায় আত্মহারা সেই মুসলমানদেরই দুইজনকে আফগানিস্থানের প্রকাশ্য

রাজপথে "stoned to death" করা হইয়াছিল, কেননা তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মুস্লিমধর্ম্মের নিন্দাকারী। এই ঘটনার সমালোচনা করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধি লিখিয়াছিলেন, কোরাণে যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকেও তথাপি এরূপ কার্য্য নীতিবিগর্হিত এবং অন্যায়। অমনি পঞ্জাবের একজন প্রধান মুসলমান লিখিলেন, কোরাণে যদি এরূপ ব্যবস্থা লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কখনই ইহা অন্যায় হইতে পারে না। The letters of the Quran must be infalible truths সেই দিন মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন, একজন অতি নিকৃষ্ট মুসলমানও ধর্ম্মহিসাবে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! উদারতার পরাকাষ্ঠা আর কি!!

১১। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি বড়ই ভাবপ্রবণ। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় এই যে আচার্য্য রায়ের মত জ্ঞানী, প্রবীন এবং সমীচীন ব্যক্তিও এই ভাবপ্রবণতার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। যদি তিনি ভাবপ্রবণতার স্রোতে আত্মহারা না হইতেন তবে নিশ্চয়ই এরূপ সব দায়িত্ববিহীন এবং প্রমাণহীন অত্যুক্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করিতেন না।

"পূবীষের পু, রোষের রো, হিংসার হি এবং তস্করের ত এ সমস্তের সার পদার্থ লইয়া আমাদের পুরোহিতের সৃষ্টি হইয়াছে"—ইহা কি স্থিরমস্তিষ্ক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের উক্তি না ভাবপ্রবণ ব্যক্তির প্রলাপ-বাক্য, পাঠক বিবেচনা করুন।

রাম, শ্যাম, যদু যা' তা' বলিতে পারে কিন্তু Sir P. C. Rayএর মত ভারতপ্রসিদ্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এরূপ অতিরঞ্জিত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রমাণবিহীন উক্তিসমূহ সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক। তিনি হিন্দুসমাজের যে একতরফা নিন্দা করিয়াছেন এবং মুসলমানসমাজের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট এবং তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে অশোভন।

ভিন্ন জাতির সুখ্যাতি এবং স্বজাতির নিন্দা করিয়া কখনও কোন জাতি নিজকে উন্নত করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। সেজন্য যিনি আমার সমাজের উপর ঘৃণা জন্মাইয়া অপর সমাজের উপর শ্রদ্ধা জন্মাইতে চেষ্টা করেন তিনি কখনই আমার সমাজের মিত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষী নন।

১২। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য রায় বলিতেছেন—"ঘর সামলাও"; হাঁ, আমাদের ঘর আমরা সামলাইব। কিন্তু যাহারা ঘরের ছেলে হইয়াও ঘৃণায় ঘরকে ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া যাহারা এখনও ঘরে আছে তাহাদিগকে ঘরের নানাপ্রকার খুঁত দেখাইয়া চিৎকার করিয়া বলে—"ঘর সামলাও"—তাহাদের নৈতিক সাহস প্রশংসনীয় নহে।

গোলাপুর।
১৭।৬।২৬

শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু।

নানা কথা

"বঙ্গবাণী-সম্মিলনী" *

আপনাদের কার্য্যবিবরণী আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। আপনাদের আদর্শ ও প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন করিতেছি। কিন্তু উহা পাঠ করিয়া একটি বিষয়ে আপনাদের চেতনাকে জাগ্রত করার কর্ত্তব্য অনুভব করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিব। আপনাদের এই বঙ্গবাণী-সম্মিলনীর পশ্চাতে কতিপয় বাঙ্গালীর একটা প্রগাঢ় বঙ্গাত্মবোধের অনুপ্রেরণা সাক্ষাৎকার করিলাম। ইহার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা কাম্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে :—

"জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আত্মোপলব্ধিই বঙ্গবাণী-সম্মিলনীর একমাত্র কাম্য। প্রত্যেক সভ্য যাহাতে গভীর ও আন্তরিক ভাবে, তাঁহার বিশেষ সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন এবং গভীরতর মিলনের ভিতর দিয়া প্রাণের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে যত্নবান হয়েন সেইজন্য এই ভ্রাতৃসম্মিলনী গঠিত হইয়াছে। * * * * * ভারতীয় সভ্যতা, ও বাঙ্গলার বিচিত্র সাধনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নানাবিধ গ্রন্থাদি সংগৃহীত হইতেছে। * * * * * বাঙ্গলার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্যে বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র সাধনাই বঙ্গবাণী। জীবনে সকলদিকে এই সাধনাকে জীবন্ত করিবার জন্য বঙ্গবাণী-সম্মিলনী বহুদিন ধরিয়া প্রয়াস করিয়া আসিতেছে। এবং বঙ্গবাণী মূর্ত্তি পরিকল্পনা ও স্বহস্তে গঠন করিয়া নব ভাবে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সভ্যগণ পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সকলের প্রতিদিনের এই প্রার্থনা যে বাঙ্গলার সাধনা আন্তরিক হউক, বাঙ্গলার প্রাণ সঞ্জীবিত হউক এবং বাঙ্গালীর মিলন অবিচ্ছিন্ন হউক। বাঙ্গালী যেন তাহার সভ্যতা ও সাধনার ধারাকে মহীয়ান করিয়া মানব সভ্যতা নন্দিত করিতে থাকে।"

উপরোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় একটা ভাবাবেশের দ্বারা এই সম্মিলনীর সদস্যগণ আবিষ্ট ; সেই ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁহারা চারিদিকে হাতড়াইতেছেন। সেটি একটি মস্ত তপস্যার বিষয়। বাঙ্গালীর আত্মোপ-

* বঙ্গবাণী-সম্মিলনীর, চতুর্দ্দশ বার্ষিকী উৎসব-সভায় (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) সভানেত্রীর অভিভাষণ।

লব্ধির পূর্ব্বে আত্ম-অভিজ্ঞান চাই। অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে একটি সূত্র ধরিয়া বাঙ্গলার সাধনার বিষয়টি যে কি তাহার স্পষ্ট অনুভব চাই। সে অনুভবের জন্য বাঙ্গালীর জাতি-তত্ত্ব, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-তত্ত্ব, বাঙ্গালীর সমাজ-তত্ত্ব ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের একখানি পূর্ব্বাপর সমগ্র চিত্র চোখের সম্মুখে বিরাজমান থাকা চাই। কোন্ বীজ হইতে আমরা কোন্ বৃক্ষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছি, কোথায় তাহার বাড় হইয়াছে, কোথায় পোকা ধরিয়াছে, ভারতের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, ভারতাতিরিক্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগাযোগ, আমাদের আদানের বিষয় কি আছে, আমাদের প্রদানের শক্তি কতখানি এ সমস্তই অনুধাবনীয়। এই ব্যাপক আত্মজ্ঞানের হ্রদে নিমজ্জিত হইলে তবেই আত্মোপলব্ধি হইবে, তবেই এই পৃথিবীতে বাঙ্গালী বলিয়া যে সাত কোটি লোকের একটি সমষ্টি আছে অপরাপর লোক-সমষ্টির সাধনার তুলনায় তাহাদের সাধনার বৈচিত্র্য যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দ্বিতীয় কথা, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধি আপনাদের কাম্য। সমষ্টিগতভাবে আত্মোপলব্ধির পথে চলিতে গেলে সাত কোটির একটি লোককেও আপনারা বাদ দিতে পারিবেন না। সে মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক বা বৌদ্ধ হউক, সে ব্রাহ্মণই হউক বা বাগদী হউক, বাঙ্গালী মাত্রকে লইয়া সমষ্টিগতভাবে আপনাদের অগ্রসর হইতে হইবে। বাঙ্গালীর সংজ্ঞা এই :—বঙ্গভূমি যার মাতৃভূমি এবং বঙ্গভাষা যার মাতৃ-ভাষা। বাঙ্গালী হিন্দুও বাঙ্গালী, বাঙ্গালী মুসলমানও বাঙ্গালী, বাঙ্গালী খৃষ্টানও বাঙ্গালী। বাঙ্গালীত্বসূত্রে ইহারা এক। যেমন হিন্দুদের শুধু জাতির গণ্ডীর ভিতর বাস করিলে চলিবে না, সে গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া হিন্দু-জাতির অঙ্গনে পা বাড়াইয়া হিন্দু মাত্রের সহিত মিলিত হইতে হইবে, তবেই প্রত্যেক হিন্দুর বল বৃদ্ধি হইবে, বৈভব বৃদ্ধি হইবে। তেমনি বাঙ্গালীর শুধু ধর্ম্ম-প্রাচীরান্তর্গত হইয়া থাকিলে চলিবে না। সেই প্রাচীরের বাহিরে বাঙ্গালীত্বের খোলা মাঠে সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে হইবে। তবেই বাঙ্গালীর সাধনা পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে। ইংলণ্ডে ইংলিস্ হউক, আইরিশ্ হউক, ওয়েলশ্ হউক, স্কচ হউক, ইহুদি হউক, খৃষ্টান হউক, সকলেই ইংলিশম্যান; এবং ইংলিশ-ম্যানরূপে প্রত্যেকে সাম্রাজ্যের পতাকা-বাহী ও ধুরন্ধরী হওয়ার দাবী রাখে ও সুযোগ লাভ করে। সেইরূপ বঙ্গ-জননীর সন্তানমাত্রকে, বঙ্গভাষাভাষী মাত্রকে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সাধনার অধি-কারী জানিয়া তাহাকে সুযোগ দান করিতে হইবে। অজ্ঞ অনভিজ্ঞ হইলে

তার কাণে মন্ত্র দান রিতে হইবে, তাকে দীক্ষা দিতে হইবে, তাকে আনন্দ-পথের যাত্রীগণের সহিত মিলিত করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত একটিও সংসারার্ত্ত মানব এপারে পড়িয়া আছে, ততদিন যেমন বুদ্ধের পক্ষে পারগামিতা অসম্ভব হইয়াছিল, তেমনি যতদিন সাতকোটির একটি বাঙ্গালীও সাধনা-পথের অপথিক থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনাদের সাধনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, এই নিশ্চিত জ্ঞানে ও তদনুযায়ী দৃঢ়সংকল্পে বলীয়ান হইয়া অগ্রসর হউন। যাঁহাকে আপনারা বঙ্গবাণী দেবী বলিয়া পূজা করিতেছেন সেই বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই আপনাদের সহায় হইবেন। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীসরলা দেবী।

শ্রমিক *

বহু শতাব্দীর পর ভারত বর্ত্তমান জগতের জটিল সভ্যতায় যোগদান করবে বলে স্থির করে ফেলেছে। যদি কেউ বলে যে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে রাজনীতিক অবস্থার কোনও সম্বন্ধ নেই, সেটা খুব ভুল বলা হবে। তবে এটা ঠিক যে রাজনীতিক স্বাধীনতার উপর দেশের আর্থিক অবস্থা অনেকখানি নির্ভর করে। আর এই জন্যই শ্রমিক-সমস্যাটা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই শ্রমিকের দাবী প্রতিপন্ন করবার একই রকম চেষ্টা হচ্ছে। আপনারা বলতে পারেন যে এই শ্রমিক সমস্যায় ভারত নূতন পথ বেছে নেবে, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিভিন্ন দেশ বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার ফলে যে পথ অবলম্বন করেছে, যে সম্পদ সৃজনের প্রণালী আবিষ্কার করেছে, সেটাকে আমরা তুচ্ছ করতে পারিনে।

"প্রেস" বলতে চলতি সভ্যতার দুই মস্ত জিনিষের কথা মনে জাগে—এক পুঁথী, আর সংবাদ পত্র। বারুদ আর মুদ্রাযন্ত্র, নাকি ইউরোপ থেকে তামসী যুগ তাড়িয়ে বর্ত্তমান যুগের পত্তন গেড়ে দিয়েছিল। মুদ্রিত পুঁথীর কল্যাণে কেতাব-কুলীন ও অশিক্ষিতদের মাঝখানে যে বেড়া ছিল তা ভেঙ্গে গেছে।

সাময়িক পত্রিকা আজকাল গণতান্ত্রিকতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পত্রিকাগুলো এক কথায় পার্লামেণ্ট,

* নিখিল ভারতীয় প্রেস-কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

যেখানে নানা মত ও পথের কথা আলোচিত হয়ে থাকে। কোন বিশেষ সমস্তায় জাতি তার মত ঘোষণা করে এদের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজ পাঠ করেন তাঁরা একবারও ভাবেন না যে কতখানি কায়িক ও মানসিক শ্রম এক একখানা কাগজের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

আমাদের দেশে সাময়িক পত্রিকার প্রেসগুলি যন্ত্রপাতি কল কব্জার জন্ম নির্ভর করে বিদেশের উপর এবং অনুকরণ করে ওদের দেশের কার্য্যপ্রণালী, কিন্তু ওদের মতন আমরা নরনারীর ছোট ও জঘন্ম বৃত্তি-গুলোকে উত্তেজিত করে সাধারণ লোকের কড়ি কুড়িয়ে বড় মানুষ হতে চেষ্টা করিনে। ওদের দেশের মতন সংবাদ পত্র এদেশে একটা সামাজিক সমস্যায় দাঁড়িয়ে যায়নি।

অনেকে চান যে পত্রিকাগুলোর মধ্য থেকে মামুলী রাজনীতিক কথাকাটাকাটি উঠে যাক। আমার কিন্তু মনে হয় যে এই সব মতভেদ ও মতবিরোধ আমাদের জীবনের অংশ, কাজেই সত্য। আর সত্যিকার স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচার ও আলোচনার উপর।

এদেশে আমরা বিচক্ষণ সংবাদিকদের পেয়েছিলাম। শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ-দাস পাল, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জীর নাম বাংলা চিরদিন মনে রাখবে। আমরা পেয়েছি লোকমান্য তিলক আর মহাত্মা গান্ধীকে। এই আমাদের সান্ত্বনা যে ভারতীয় সংবাদপত্র যথোপযুক্ত দেশের সেবা করেছে। সেদিন আমি বাংলা শাসনের সরকারী রিপোর্ট (১৯২৪-২৫) পাঠ করছিলাম, তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে যতগুলো সংবাদপত্র বাংলায় আছে তার একটাও গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন ত করেই না বরং বেশীর ভাগ চেষ্টা করে তাদের অপদস্থ করতে। এটা ভারতীয় সংবাদিকতার গৌরবের কথা। সরকার বলেছেন যে—কেউই বাংলা অর্ডিন্যান্সের সমর্থন করেনি, এমনকি মডারেট সঞ্জিবনীও বলেছেন যে এতে ইংরেজ জাত সভ্য-জগত থেকে বাতিল হয়ে যাবে। ভারতীয় সংবাদপত্র মহলের পক্ষে এটা মস্ত প্রশংসার কথা।

রিপোর্টের আর এক জায়গায় সরকার বলেছেন যে বিপ্লববাদীরা সব সংবাদপত্র-মহল দখল করে পত্রিকার মারফতে বিপ্লবী প্রবন্ধ ছড়িয়েছে আর কেতাব পুঁথির বান বইয়েছে। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তা প্রমাণ করতে সরকার নিজেই বলেছেন-যে আলোচ্য বছরে তিনখানা পত্রিকা আর পাঁচখানা পুস্তিকা রাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আপনারা যে পুস্তক ও পত্রিকা প্রস্তুত করেন তা মানবজাতির কল্যাণপ্রদ। কাজেই তা থেকে যা লাভ হয় তার হক পাওনাদার আপনারা। সরকারী প্রেস কর্ম্মচারীদের কথা বিশেষ করে আমি

বল্‌ছি। সেখানে "উপরিওয়ালা" কর্ম্মচারীরা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রভু! রাষ্ট্র সুতরাং জনসাধারণই তাদের নিয়োগ-কর্ত্তা, অন্য কেউ নয়। এরা ভাল ব্যবহার আর যথোপযুক্ত বেতনের দাবী করতে পারে।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হ'ল নিজেদের অসুবিধা দূর ও দাবী প্রতিপন্ন করবার জন্য শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। সুতরাং সুচিন্তিত বিধির উপর এর প্রতিষ্ঠা চাই, এবং চাই একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী।

গোঁজামিল

—:০:—

আমাদের ছেলেরা মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে! গত পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের সংশ্রবে আসিয়া তাহারা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, একটা দেশজোড়া ধর্ম্মঘট বা ঐ রকমের একটা কিছু ঘটাইয়া তাহারা ইংরেজকে কাবু করিয়া স্বরাজ নামক অনির্দ্দিষ্ট পদার্থটি আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, সে দেশজোড়া ধর্ম্মঘটের বিশেষ একটা আয়োজন দেখা গেল না। ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া নেতৃ-পুরুষেরা স্বেদ, পুলক, কম্পন প্রভৃতি কতকগুলি সাত্বিক ও চিৎকার, উল্লম্ফন, আস্ফালন প্রভৃতি কতকগুলি রাজসিক লক্ষণের নমুনা দেখাইলেন, কিন্তু তাহার দ্বারা স্বরাজ পদার্থটা যে কতখানি হাতের ভিতর আসিয়া পড়িল তাহা ঠিক বুঝা গেল না। শেষে যখন নেতারা রাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন আর ইংরেজকে শুনাইয়া দিলেন যে পঞ্চাশ বৎসরেই হোক, আর এক শ বৎসরেই হোক, রাজনৈতিক পরিভাষায় যাহাকে বলে 'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স' সেই বিরাট ব্যাপারটা তাঁহারা এইবার গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিবেন, তখন ছেলেদের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—'এবারে আর ইংরেজের রক্ষা নাই'! কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ছাড়িয়া আসিবার পরেও যখন এমন কিছু ঘটিল না যাহাদ্বারা বুঝা যায় যে নূতন একটা কিছু আরম্ভ হইয়াছে তখন ছেলেরা আবার মুখ

চাওয়া চাওয়ি করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে ধর্ম্মের তত্ত্বের মত নেতৃ-পুরুষদের তত্ত্বও 'নিহিতং গুহায়াং'।

এদিকে চোখের সামনে হঠাৎ এমন কতকগুলা ঘটনা ঘটিতে লাগিল কংগ্রেশী পুঁথির পাতা উল্টাইয়া যাহার কারণ ঠিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সেটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। অসহযোগের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন মিশাইয়া দিয়া হিন্দু-মুসলমানকে ত প্রায় একাকার করিয়া তোলা হইয়াছিল। রুমের বাদসাহের দুঃখে যাহারা সভা-সমিতি ডাকিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া একসুরে কাঁদিয়াছিল, আজ হঠাৎ তাহারা মাথা ফাটা-ফাটি করিয়া মরে কেন? বাংলা-দেশে এরূপ দুর্ঘটনা প্রায় বিশ বৎসর ঘটে নাই। সুতরাং ছেলেরা প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সবাই প্রথমে ভাবিল—ওটা গুণ্ডাদের কাণ্ড! কিন্তু হঠাৎ গুণ্ডারা এরূপ প্রচণ্ড ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝা গেল না। ক্রমে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইতে লাগিল। রাজনৈতিক নেতারা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এ সব দাঙ্গা হাঙ্গামা একটা প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক চালের অঙ্গ। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ হইলে ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা আর মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিবে না; সেইজন্য হিন্দু মুসলমানের মিলন ভাঙ্গিবার জন্যই গবর্ণমেণ্টের জনকত হাতধরা লোক এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইতেছে। ছেলেরা তখন জিজ্ঞাসা করিল—"তাহা হইলে উপায়?" নেতারা বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি আর হিন্দু মুসলমানের মিলন-প্রচার—ইহাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা। এই কার্য্য কিছুদিন চালাইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।"

ছেলেরা তাহাই করিল; কিন্তু বেশী দিন আর শাক দিয়া মাছ ঢাকা চলিল না। গবর্ণমেণ্টের যাঁহারা বিরোধী, এরূপ অনেক নেতাদের মুখ হইতেও এমন সমস্ত কথা বাহির হইতে লাগিল, যাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে বিরোধটা শুধু গুণ্ডাদের মধ্যেও নয়, আর গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত দুই চারজন লোকেদের মধ্যেও নয়, ইহার গোড়া আরও নীচে। আবদর রহিম বা গজনবীর মুখ দিয়া যে কথা বাহির হয় প্রায় সেই কথাই যখন ভারতের স্বাধীনতাকামী খিলাফৎ নেতাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন স্বতই মনে নানা রকম সন্দেহ জাগিয়া উঠে আর শুধু গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। কিন্তু সে সমস্ত সন্দেহের কথা তুলিলেই পেশাদারী রাজনৈতিক নেতারা বলেন—"চুপ, চুপ! ও সব কথা মুখে আনিলেই হিন্দু মুসলমানের সখ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, আর স্বরাজলাভের সম্ভা-

বনা থাকিবে না।" ছেলেরাও অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে হিন্দু-মুসলমানের গভীর মিলন ভিন্ন স্বরাজ লাভ অসম্ভব; কাজেই তাহারা ভড়কাইয়া যায়, আর কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া থাকে।

এখন এই কংগ্রেসী স্বরাজ ও জাতীয়তা (Nationalim) লইয়া তাহারা মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে। অমুক জায়গায় দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইয়াছে; অমুকেরা একটু গরুর মাথা কাটিয়া—আরে চুপ, চুপ, ওকথা মুখে আনিও না; মুসলমান ভ্রাতারা রাগ করিবেন। অমুক জায়গায় পাঁচ জন হিন্দুদের মেয়ে জল আনিতে গিয়াছিল, এমন সময় জনকতক মুসলমান—চুপ, চুপ! মুসলমান বলিও না, বল গুণ্ডা; তা না হইলে মুসলমান ভ্রাতারা রাগ করিবেন। অমুক জায়গায় কতকগুলি দেবমূর্ত্তি মুসলমানেরা—আরে সর্ব্বনাশ! বল কে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে জানা যায় নাই, নতুবা মুসলমান ভ্রাতারা রাগ করিবেন।

মুসলমান ভ্রাতারা যদি রাগ করিয়া আমাদের সাধের কংগ্রেস ছাড়িয়া যান তাহা হইলে আমাদের National আন্দোলনটা নাকি ধাঁ করিয়া Communal ব্যাপার হইয়া যাইবে; আর সবাই একসঙ্গে মিলিয়া চীৎকার করিতে না পারিলে যখন স্বরাজ লাভ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই তখন মুসলমানেরা রাগ করিলে স্বরাজের আশাও মারা যাইবে। অতএব স্বরাজ-লাভের আশায় সকলে পিঠে কুলো বাঁধিয়া মার খাও, আর মুখে বল—তাঁনা না না, তানা না না, ম্যাঁও, ম্যাঁও, ম্যাঁও।

পাছে সত্য কথা বলিতে গেলে কথা-গুলো Communal হইয়া পড়ে আমাদের ছেলেরা সেই ভয়ে আড়ষ্ট। তাহারা আর সব সহিতে রাজী আছে, কেবল তাহারা যে anti-national এই অপবাদ তাহারা সহিতে পারে না। আর মুসলমানেরা রাগ করিয়া কংগ্রেশ ছাড়িয়া গেলে পাছে স্বরাজের আকাশ-কুসুম একেবারে শুকাইয়া যায় এই ভয়ে তাহারা অন্যায় অত্যাচারের জোর করিয়া প্রতিবাদ করিতেও চাহে না।

কিন্তু অনেকের মনে মনে একটা গণ্ড-গোল বাধিয়া গিয়াছে। দুই চারিজন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—স্বরাজলাভের অর্থ যদি দেশের স্বাধীনতা-লাভ হয় তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের মিলন ভিন্ন সে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব কেন? যে যে পরাধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে সেখানে কি দেশশুদ্ধ সবাই মিলিয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল? আমেরিকা যখন স্বাধীন হয় তখন ত আমেরিকার অর্দ্ধেকের বেশী লোকের সহানুভূতি ছিল ইংরেজের দিকে! তবু আমেরিকা স্বাধীন হইল কেমন করিয়া? ইতালী, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি সব দেশের পক্ষেই ঐ কথা খাটে। কেবল ভারতবর্ষই কি এমন একটা সৃষ্টিছাড়া

রকমের অদ্ভুত দেশ যে তেত্রিশ কোটীর ভিতর সাত কোটী বাদ পড়িলে যজ্ঞ একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে? কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এ কথার উত্তর এই যে সাত কোটীকে বাদ দিয়া দেশ স্বাধীন হয়ত হইতে পারে, কিন্তু অহিংস-ভাবে হইবে না। তখন প্রশ্ন উঠে—দেশের স্বাধীনতা বড় না অহিংসা বড়। এ প্রশ্নও দেশের লোকের সম্মুখে আজ আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর আর একটা কথা এই—সাত কোটীকে বাদ দিতে গেলে ব্যাপারটা Communal হইয়া দাঁড়ায় কিনা। একথার উত্তর দিতে গেলে Nationalism জিনিষটা কি একটু তলাইয়া বুঝিতে হয়, আর বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটাও একটু পরিষ্কার হইয়া আসে। গোড়ার কথা এই বলিয়া মনে হয় যে হিন্দু-মুসলমানের যে ঝগড়া তাহা ধর্ম্ম বা সাধন-প্রণালীর দ্বন্দ্ব নয়। হিন্দুদের এত ভিন্ন প্রকারের সাধন-প্রণালী বর্ত্তমান যে আর দুই একটা নূতন সাধন-প্রণালী ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। অধিকারী ভেদে বিশ্বাসবান বলিয়া কোন হিন্দুই মনে করে না যে তাহার বিশেষ সাধন-প্রণালীই সত্য, আর বাকি সব মিথ্যা। সুতরাং যে যার নিজের ভাবে সাধন ভজন করুক, এরূপ চিন্তার ধারায় হিন্দু অভ্যস্ত। পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সব সত্যটা আমাদের একচেটিয়া, আর বাকি সবাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে—এরূপ কথা সাধারণ হিন্দুর মুখে শুনা যায় না। সুতরাং সাধন-প্রণালী লইয়া হিন্দু কাহারও গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে যায় না।

ভারতবর্ষের বাহির হইতে যে সমস্ত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মোগল বা পাঠান এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এদেশ জয় করিয়া এদেশের কতক লোককে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে একটা মুসলমান-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহারা নামে, ভাবে, ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে ও রীতি-নীতিতে বিদেশীয়ের অনুকরণ করিয়া এ দেশের প্রতি অনেকটা মমত্ব-বোধ হারাইয়াছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেক মুসলমানই নিজেদের পরিচয় দিবার সময় বলেন—'আমরা মুসলমান'; আর 'বাঙ্গালী' বলিতে তাঁহারা বাঙ্গালী হিন্দুকেই বুঝেন। এ কথাটা আমাদের কাণে কটু শোনায়, কিন্তু ইহার মূলে যে মনোভাবটা প্রচ্ছন্ন আছে তাহা চাপা দিয়া সত্য বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয় না।

এখন হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এদেশের উপর আধিপত্য লইয়া ঝগড়া। মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী মোগল পাঠানেরা যখন এদেশের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী এদেশের লোকেরাও

কতকটা সেই আধিপত্য ভোগ করিতে পাইতেন। এখন পাঠান মোগলের রাজত্ব গিয়াছে কিন্তু এদেশের মুসলমানদের সেই আধিপত্য-ভোগস্পৃহা যায় নাই। হিন্দুরা তাহাতে রাজী নয়। তাহারা বলে—"দেশের সবাই যেমন, তোমরাও তেমনি। সবাইকার পক্ষে যে নিয়ম, তোমাদের পক্ষেও তাই। সকলের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করিয়া তোমরা তুষ্ট হইতে পার না,—এই বা কেমন কথা? তোমাদের বিশেষ বিশেষ আবদার আমরা মানিতে যাইব কেন?" এই কথার পরই মুসলমানেরা ডাণ্ডা লইয়া খাড়া হন, আর তাহার পর যে ব্যাপারটা ঘটে তাহারই নাম হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কংগ্রেশ কনফারেন্স, সভা সমিতির অমনি বৈঠক বসিয়া যায়—আর রাজনৈতিক নেতারা গম্ভীরভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে হিন্দু-মুসলমানের একতা নিতান্তই প্রয়োজন। কেন যে ঝগড়া বাধে, তাহার মূলে কি মনোভাব বর্ত্তমান, একথা কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন না, অনেক সময় বলিতে সাহসও করেন না। কেহ যদি দেখাইতে যান যে মুসলমানেরা দেশের লোকের সাধারণ স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বড় মনে করে বলিয়াই এ সমস্ত ঝগড়া বাধে, তাহা হইলে নেতৃপুরুষেরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলেন—"চুপ, চুপ! একথা শুনিলে মুসলমান ভ্রাতারা রাগ করিবেন; আর আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যাইবে।" কিন্তু একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে গোঁজামিলের উপর জাতীয়তার সৃষ্টি হয় না। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া স্বরাজ লাভ হয় না; মুসলমানেরা যে মনোভাব লইয়া বিশেষ বিশেষ অধিকার চান, যে মনোভাব একেবারে জাতীয়তার বিরুদ্ধ, সেই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব ধ্বংস করিতে না পারিলে এদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতীয়তার বিকাশ (Nationalism) হইবে না। হিন্দুদের যাঁহারা উপদেশ দেন যে মুসলমানের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দাবী মানিয়া লওয়াই মিলনের প্রকৃষ্ট পন্থা ও স্বরাজলাভের একমাত্র উপায়, তাঁহাদের উদারতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের জাতীয়তার সন্ধানও পান নাই, স্বরাজলাভের উপায়ের সন্ধানও পান নাই। মোগল-পাঠানের আমল হইতে এদেশের মুসলমানদের মনে যে বিজাতীয় ভাব পুষ্ট হইয়া আছে, এবং আদিতে যে বিজাতীয় ভাব আশ্রয় করিয়াই এদেশের মুসলমান সমাজের সৃষ্টি, সে ভাব অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় স্বরাজসাধনায় মুসলমান সমাজ যে কেমন করিয়া যোগ দিবে তাহা খুঁজিয়া পাই না। সেই গোড়াকার কথাটা আমরা চাপা দিয়া আসিতেছি বলিয়াই হিন্দু-মুসলমানের মিলন চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষকে মুসলমান করিয়া লইবার অভাবপক্ষে অন্যজাতির উপর আধিপত্য

করিবার দুঃস্বপ্ন যতদিন না মুসলমান নেতারা ত্যাগ করিতে পারিবেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি যতদিন না তাঁহারা শ্রদ্ধাবান হইবেন, ততদিন হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া স্বরাজ-লাভের চেষ্টার কোন অর্থ নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নায়িকা

—:০:—

হরিণেরি নয়নদুটী
বর্ণ যেন চাঁপার পারা,
মরাল-গমন, কুন্দ-দশন
মেজাজটি ঠিক সুধার ধারা ;

অর্থাৎ গো, সবার সেরা
তরুণী আর সুন্দরী এ
দেখলে লোকে মূর্চ্ছা যাবে,
পরশে ফের উঠবে জীয়ে !

রক্ত-মাসের এমনটি জীব
গড়্‌তে নারেন বিধাতা যে,
তার দেখাটি মিলবে নাকো
চতুর্দ্দশ এ ভুবনমাঝে !

কারণ, তিনি থাকেন যদি
আছেন ক্ষ্যাপার চিত্ত-বনে,
নয়তো সে কোন্ স্বপ্নে, কি ঐ
কল্পনাতে করিব মনে !

শ্রীসুখেন্দু মুখোপাধ্যায়।

অপরাজিতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষরা তিনশ বৎসর পূর্ব্বে কালীচকে নিবাস স্থাপন করেন। সমাজে এখন তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু জনশ্রুতি এই যে তাঁহারা রাজপুতবংশোদ্ভব। তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে এখনও একটা বৈলক্ষণ্য পাওয়া যায় যাহা বাঙ্গলার কেরাণীস্বভাব সাধারণ কায়স্থকুলে সচরাচর দেখা যায় না। বংশানুক্রমে ইঁহারা শিকারী। মৃগয়া না করিয়া মাংসাহার ইঁহাদের পরিবারে আজ পর্য্যন্ত কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হয়। ইঁহাদের মধ্যে কৃশ খর্ব্বকায় সন্তানসন্ততি প্রায় নাই বলিলেই হয়। সকলেরই প্রায় বলিষ্ঠ দেহ, ভারি মুখ, আকর্ণবিস্তৃত চোখ ও গৌর বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ইঁহারা সুপুরুষ, কিন্তু সুকুমার নহেন। মানসিক প্রকৃতিও তদনুযায়ী। সূক্ষ্ম কাটিতে জানেন না ইঁহারা, মোটা মোটা কথা বুঝেন। এই বংশের কন্যারাও প্রায় কিছু কঠোর প্রকৃতির। যে বধূরা অনুরূপ স্বভাব লইয়া আসেন তাঁহাদের আগমনে গৃহে শান্তি থাকে না; আর যাঁহারা মৃদুস্বভাবা তাঁহাদের নিষ্পেষণেই গৃহে শান্তি সঞ্চিত হয়।

বিনোদেন্দুর ভগিনী শিখা রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী। পিতা ও মাতা উভয়েই লোকান্তরিত হওয়ার পর পিসিমার স্নেহে ভাই ভগ্নী মানুষ। পিসিমা নিজে একে এই কুলের কন্যা, জমিদারের মেয়ে, তায় বালবিধবা। শ্বশুর গৃহ কখনও দেখেন নাই, শ্বশুরকুলের গৌরব জিনিষটি যে কি তাহা কখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। ভিতরে ভিতরে সেজন্য একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কন্যা-সমা ভ্রাতুষ্পুত্রীও পাছে সেই দুঃখ পায়, সেই অভাব অনুভব করে, তাই তিনি তার জন্য বড় ঘর খুঁজিতেছিলেন। যখন কালীচকের রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ আসিল, যদিও জানিতেন রাজা একবার কৃতদার বিপত্নীক, তাঁর দুইটি যোগ্য পুত্র বিদ্যমান, তথাপি সম্বন্ধটি অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিল না। একবার ঘটককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপের সঙ্গে না হইয়া ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে না? ঘটক উত্তর দিল ছেলে এখন বিবাহ করিতে নারাজ। পিসিমা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, পানপত্রের তত্ত্ব আসিল। বিবাহের দিন স্থির হইল, গায়ে

হলুদের তত্ত্ব আসিল। পিসিমা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। এত ধুমধামের তত্ত্ব এ বাড়ীতে কোন দিন আসে নাই। এ যাবৎ ঘর-জামাই ধরিয়া আনিয়া মেয়েদের বিবাহ দেওয়া গিয়াছে, বর আসিয়াছে, তত্ত্ব আসে নাই।

যখন মনোহরগঞ্জ রেলের ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত তত্ত্বের ঝুড়ি ও থালি মাথায় মেজেন্টার রঙের কাপড়-পরা দাসদাসীর সারি লাগিয়া গেল, যখন বহির্বাটীর বড় দালানেও তাহাদের স্থানসংকুলান হইল না, পিসিমা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ খড়খড়ি হইতে সেই নয়নানন্দকর দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইলেন। শিখাকে একটি ঘরে একাকী ফেলিয়া তাহার সঙ্গিনীরাও রাজবাড়ীর লোক-সমাগম দেখিতে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দয়া করিয়া এক আধবার শিখার কাছে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কিছু কিছু খবর দিয়া তাহারও কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া যাইতে লাগিল। বাহিরে দুই তিন জন সরকার ও কতিপয় বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়েরা সকল ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বিনোদেন্দুর এ সব বিষয়ে কর্ম্মক্ষমতা সামান্য, রুচি তদপেক্ষাও অল্প; সে পলাতক হইয়া নিজের কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল।

বিবাহের দিন দুপুরের ট্রেণে বরযাত্রীর পৌঁছানর কথা। বিনোদেন্দু সবান্ধবে তাঁহাদের ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। দুই একখানা গাড়ী খুঁজিয়া অগ্রসর হইতে হইতে একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ গাড়ী হইতে একজনকে নামিতে দেখিলেন। বিনোদেন্দু সত্বর তাহার সমীপে আসিয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে নামাইলেন। কমনীয় কান্তি। দেখিয়াই তাঁহার প্রতি বিনোদের হৃদয় আকৃষ্ট হইল, মনে হইল ইঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে। এখনও গাড়ীর ভিতরে লোক বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা বিনোদকে দ্বারপ্রান্তে আগত দেখিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমাবতীর্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া নামাইলেন, তিনি প্রথমের প্রায় দ্বিগুণ বয়স্ক হইবেন; চেহারার ছাঁচ একই, কেবল একজন তরুণ, একজন প্রৌঢ়। বিনোদের হঠাৎ প্রতি-ভাত হইল, প্রৌঢ় যিনি তিনিই বর, তরুণটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। উৎফুল্ল মন অকস্মাৎ দমিয়া গেল। জানাই ত ছিল কথাটা, তথাপি যে ঠিক এইরূপটি হইবে তাহা কল্পনায় আসে নাই। বিবাহসভায় পিতার পাশে পুত্র যখন বসিল সভাস্থ সক-লেরই মনে মনে সেই একই কথার প্রতি-ধ্বনি চলিতে থাকিল—পিতার পরিবর্ত্তে পুত্র যদি আজিকার বরাসনে বসিত,শোভন হইত। স্ত্রী-আচারের সময় ভুলক্রমে কেমন করিয়া বরের সহিত তাঁহার পুত্রও অন্তঃপুরে আসিয়া পড়িলেন। মেয়েমহলে বিনাতারের তারের খবর চলাচল হইল।

ছাঁদনাতলায় এয়োতেরা ফিস্‌ফিস্‌ করিতে লাগিল। যদি মেয়েদের ষড়যন্ত্র চলিত তাহারা রাজাকে ঠেলিয়া কুমারকে বরের পিঁড়িতে দাঁড় করাইয়া বরণ করিত। সে সব কিছুই হইল না। যথাসময়ে আত্মীয়-বাহকেরা লাল বেনারসীমোড়া, অবগুণ্ঠিতা, নতনয়না কনেকে পিঁড়িতে করিয়া সাত-পাক ঘুরাইল। ইন্দ্রধনুর সব কটা রঙের সাড়ীতে বডিসে ও অলঙ্কারে ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া সাতটি মোমবাতি হাতে সাতজন নবীনা এয়োস্ত্রী কনের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিলেন। ঘন ঘন উলুধ্বনি চলিল।

শুভদৃষ্টির সময় সকলের তাড়নায় কনের লজ্জানত-চক্ষু যখন আয়ত হইল, আশপাশে না পড়িয়া ঠিক প্রজাপতির অভিপ্রেত স্থানটিতেই উৎপতিত হইল। কচি ও পাকা দু জোড়া চক্ষুর মিলন হইল। অলক্ষ্যে প্রজা-পতি ঠাকুর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মানুষের আগ্রহে তাঁর নির্ব্বন্ধ ব্যর্থ হইল না।

সভাস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া মেয়ে-মহল পর্য্যন্ত পিসিমা ও প্রজাপতির অবৈধ সন্ধির বিরুদ্ধে একটা অব্যক্ত বিদ্রোহ জাগ্রত হইয়াছিল, বিশেষতঃ সাক্ষাৎ কন্দর্পসমান রাজপুত্রকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখিয়া, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া যোগ্যের সহিত যোগ্যার যোজনার একটা দুরাশা তরুণীদের মগ্নচৈতন্যে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষ-মনের উচিতানুচিতের মানদণ্ড দূরে ঠেলিয়া বিধাতা তাঁর অমানুষিক হুকুম জারি রাখিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের শিখা চল্লিশ বৎসরের মহেন্দ্র-নারায়ণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। পিসিমার চোখের কোণে শুভ-দৃষ্টির মুহূর্ত্তে এক ফোঁটা অশুভ-জল লুকাইয়া দেখা দিল। প্রজাপতির সঙ্গে অকস্মাৎ সন্ধিভঙ্গ হইলে তাঁরও সে মুহূর্ত্তে আপত্তি হইত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলা দেবী

বিশ্ববার্ত্তা

—০:০—

দলবেদল—

কয়লার কুলি করলে ধর্ম্মঘট। তাই নিয়ে বেধে গেল বিলাতের রাজনীতিক দলবেদলে কথা কাটাকাটি মনকশাকশি। লিবারাল দলে হ'ল ভাঙ্গন সুরু। লয়েড জর্জ্জ বক্তৃতা করতে পাবেন, পার্লামেণ্টের একজন কেষ্টবিষ্টু, কাজেই নরলোকে তাকে একটু মানে। লর্ড অক্স্ফোর্ড বক্তৃতা করতে পারলেও, বড্ড কথা বলেন চিবিয়ে, ন্যায় যুক্তির পাতেন জাল, আবার পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচন লড়াইয়েও পরাজিত, কাজেই তাঁকে একটু নীচু নজরে যে সবাই দেখবে এটা কিছু বিচিত্র নয়। লিবারাল দলের উভয়েই, উভয়েই দলে প্রভুত্ব রক্ষা করতে চান। কিন্তু সেই প্রভুত্বের সুপারিস কর্ব্বার জন্য লয়েডের রয়েছে বিলাতী সংবাদপত্র মহল। লর্ড অক্স্ফোর্ডের সম্বল সবে "টাইম্স," আর কোন কাগজকে তিনি দেখতেই পারেন না। এখন দলে প্রভুত্ব কার টিঁকবে তা আকারেই মালুম। মাঝখান থেকে আর এক নরম দলের নেতা মাথা তুলছেন, স্যর জন সাইমন। যেই যত মাথা তুলুক আমাদের কিন্তু মনে হচ্ছে যে জয় হ'ল অন্য এক জনের। বাহ্যতঃ দেখতে জয় লয়েড জর্জ্জের, কিন্তু লয়েড জর্জ্জকেও ঘায়েল করে, ধর্ম্মঘটের কল্যাণে বলডুইন বীর হয়ে বেরিয়ে এলেন।

কয়লার ময়লা—

কয়লাখনির কাজ বন্ধের মূলে রয়েছে বিলাতের রক্ষণশীলরা। খনির মালেক ওরাই। খনির শ্রমিকরা বলছে, আর পারিনে বাপ, খাটুনী কমিয়ে দে! মালেকরা বলছে—না, কর্ কাজ কর্! যে কোন রকমে থাবা থুবি দিয়ে ধর্ম্মঘটত মিটল, আট্ঘণ্টায় দিনের মজুরী সেও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি মালেক তাবেদারে আপোশ হয়ে গেল? মালেক বলছে খরচ কমাতে হবে মজুর কমিয়ে, মজুরী কমিয়ে আর কাজের ঘণ্টা জিয়াদা করে। কামিলা বলে, খরচে না পোষায় খনির কাজ বন্ধ করে দাও। মালেকরা বলে চলতি কয়লার দরের অনুপাতে তলব দেব। মজুররা বলে, তা হবে কেন? তোমরা ইচ্ছে করে ছাইয়ের দামে যদি কয়লা দাও কেমন করে হবে? কাজেই এ গোল শীগ্গির মিট্বে না। বড় উজিরও অনেকটা তাই স্বীকার পেয়েছেন। মজুররা

বল্‌ছে যে খনির ব্যাপারটা নতুনকরে গড়ে দাও, নতুন বিধি-ব্যবস্থা করে দাও। সরকারী কমিশনও বলছে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সরকার তবু চুপ। ব্যবসায় মাটি হতে বস্‌ল, গরীবের দুঃখ ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল, তবু তারা গা নেড়ে বস্‌চে না। সন্দেহ আস্‌চে ক্যাবিনেট বোধ হয় একমত নয়। গুজব, অন্য সব বড় বড় ব্যবসায়ী কয়লার দাম কমাবার জন্য খনিওয়ালাদের বেশ উৎসাহ দিচ্ছে। আর রক্ষণশীল দল চীৎকার করছে বলশেভীদের কড়ি খেয়ে শ্রমিকদল ব্রিটেনের ভরা-ডুবি করল। গোলাম ও ভৃত্যরা যখন প্রশ্নোত্তর করতে সুরু করেছে তখন এটা ইংরাজের বুদ্ধিতে সহতে পারে না। এমনি করেও বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বড়র পীরিতি—

অন্যত্র ব্রিটন বিচ্ছেদের ছিন্ন দড়ীতে গিট দিতে সুরু করেছে। আগে ইংরাজ বলত তুরস্ক ভারতে যাবার আধা পথ, কাজেই সামাল হয়ে সবাইকে বল্‌ত, খবর্দ্দার এপথে পা দিও না! এখন ব্রিটিশ বল্‌ছে, তুরস্কের আন্তর্জ্জাতিক ও ভৌগলিক অবস্থিতিটাই বন্ধুত্বের পক্ষে মস্ত কথা। পরস্পর মিতালি না হলে আর চল্‌ছে না এবার। আজ ছয় মাসও যায়নি লীগ অব নেশনস্‌ আপোষের মোড়লী করে মোশুল থেকে ইরাক পর্য্যন্ত ইংরাজের কোলে তুলে দেয়। তুরস্ক বলে ওটা হতেই পারে না। হতে যে পারে না তা ইংরাজ এতদিন বুঝে নি। ভারতের অশান্তিকে তারা গ্রাহ্য করে না, কারণ আন্দোলনের ভিত্তি সেখানে পোক্ত নয়। কিন্তু মিশরকে ওরা ভয় করে। মনে হয় তুর্কীর সঙ্গে সহসা প্রীতি জমানোর কারণই হ'ল মিশরের নতুন অবস্থা। কিন্তু মন্দ লোকে বলছে (The New Statesman) যে কামাল পাশা ইটালীকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। এই নতুন সন্ধিতে তুর্কী মস্থল ছেড়ে দিল। কেউ আর কারু বিরুদ্ধে প্রপাগণ্ডা করবে না। ইরাক পেট্রল খনির আয় থেকে শত করা ১০ ভাগ তুর্কীকে দেওয়া হবে।

নীলের পারে—

তুর্কী ঠাণ্ডা হ'লেই নাকি মিশরও ঠাণ্ডা। ইংরাজ মিশরে তার প্রভুত্ব অটুট রাখতে চায়। তারা বলে, "মিশরীর জন্য মিশর" বেশ ভাল কথা, কিন্তু তাই বলে সুদান দেব কেন; একথাটাই নির্ব্বাচন বিজয়ী জগলুল পাশাকে আজ শিখতে হবে (The Star)। কিন্তু জগলুল সে কথা যে না জানেন তা নয়, তিনি জানেন যে মুখে যতই সহানুভূতি থাক মিশর থেকে ইংরাজ-ফৌজ উঠিয়ে নেবার পক্ষে কেউ সমর্থন করবে না (Daily News)। বিলাতি কাগজ স্পেক্‌টেটর ইংরাজ জাতকে জিজ্ঞাসা করেছেন এত যে

মিশরের জন্য দরদ দেখাচ্ছ যদি আজ দেশটা গোটা পুড়ে যায়, তবে তোমরা কি করবে? উত্তরে কেউ কেউ বল্‌ছে রীতিমত শান্তি রক্ষা করব। এবার সব দলই বুঝতে পেরেছে যে জগলুলীদলকে মিষ্টকথায় ভিজাবার আর উপাই নাই, বল প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ। আসল কথা ওরা সুয়েজ খালের মতন ভারতের পথ ছাড়্‌তে পারে না, বা মিশর ছেড়ে ভূমধ্য সাগরে নতুন একটা শত্রু-শক্তির পয়দা করতে পারে না।

জগলুলের প্রভুত্ব—

কিন্তু ইংরাজরা কি এই গত মিশরি নির্ব্বাচন ফল থেকে এটা বুঝেনি যে ইংরাজেরা বাছা লোকের বে আইনি শাসন মিশরের ঘাড়ে চাপাতে গেলে কেবল জগলুলের প্রভুত্বই বৃদ্ধি পাবে? নতুন ক্যাবিনেটে জগলুলী দলের ছয় জন সচিব রয়েছে, লিবারালদের তিন জন, এক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। কিন্তু এমন সুবিধা পেয়েও, ইংরাজের এত ভয় প্রত্যক্ষ করেও মিশরী নেতা জগলুল পাশা শাসন প্রভুত্ব নিজে গ্রহণ না করে কেন যে আদলী পাশার হাতে তা সমর্পণ করলেন তাই নিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক মহলে অনেকেরই মস্তক ঘর্ম্মসিক্ত করেছেন। আদলী লিবারাল হলেও বলেছেন মিশর থেকে বিদেশী বের করে দেওয়া সম্বন্ধে জগলুলের ওয়াফ্‌দ্ দলের সঙ্গে আমি একমত।

ওতেইত ইংরাজ আবার আঁৎকে উঠ্‌ল। ওরা বল্‌ছে চট্‌ছো কেন, আমরা যে তোমাদের দেশে ফৌজ রেখেছি সেটা মাত্র সুয়েজ ক্যানাল রক্ষা করতে, এটাতে তোমরা একথা মনে করো না যে পাশব সাম্রাজ্যবাদী আমরা তোমাদের জাতীয়তা লোপ করতে বসেছি। অতীতে যাই কেন করে থাকি না, সে কথা তুলে আর খোঁটা দিও না, সম্প্রতি আমরা ওসব দোষে আদৌ দোষী নই। আমরা সবার সুবিধার জন্যই মিশরে থাকবার বন্দোবস্ত করেছি। (If we claim a privileged status there, we claim it neither for purposes of aggrandisement, nor for purely selfish reasons, but for the general advantage.—The New Statesman) কিন্তু তাতে কেউ বাদ সাধ্‌লে ইংরাজ কেন তা শুনবে। শুন্‌বে না বলেই বুঝি ইতিমধ্যে মাল্‌টা থেকে লড়াই জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে ভিড়েছে!

নিমক হালাল—

চীন নুনের খাজনার টাকা আটক করেছে শুনে মিশরের চিন্তার উপর ইংরাজের আর এক দুশ্চিন্তা এসে পড়েছে। টেনসিনের তুফুন বিদেশী

নূনের ট্যাক্স উঠিয়ে নিজের এক ট্যাক্স বসিয়েছেন। আন্তর্জ্জাতিক কি এক ঋণ আছে তারই দেনা শোধ দেওয়া হ'ত এই ট্যাক্সের টাকা থেকে। চীন বলে ওতে আমাদের কোন লাভ নাই। বোধ হয় টেনসিনের সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গা থেকে ট্যাক্স উঠে যাবে। কিন্তু উঠেই যদি যায় তবে উপায়? শক্তিধররা কি ট্যাক্স টাকা উঠ্‌ল না দেখে ধারের টাকা নাকচ করে দেবেন, না জোর করে ট্যাক্স জারী করবেন, না মিঠে বুলি দিয়ে দিল ভিজাবেন? ধারের টাকা মাঠে মারতে কেউ রাজি হবে না। জোর জবর দস্তি করলে এহেন কালে অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তৃতীয় পন্থা যা তাই বোধ হয় সবাই নেবে। কেউ বল্‌ছে লীগের শরণ নাও, আর দোসর কর মার্কিনকে, তাতে যদি কিছু ফল ফলে! বিলাতী সরকার বুঝি এই পন্থাই গ্রহণ করেছেন। সেদিন কমন্স্ সভায় সহকারী বৈদেশিক সচিব আশ্বাস দিয়েছেন যে ভয় নাই, ট্যাক্স মাঠে মারা যাবে না।

রুশের কথা—

দুনিয়ার আর এক ভয় রুশিয়া থেকে। রুশ নৌবাটকের জঙ্গীলাট জোয়ং খোলা বলেছেন যে রুশ খোকা নয়, সেও শক্ত হচ্ছে। রুশ থেকে একখানা লড়াই জাহাজ, দুইখানা ক্রুজার ও কয়েকটা ডেষ্ট্রয়ার এবার দিগ্বিজয়ে বের হবে। এরা ষ্টেটিন, পোর্টস্‌মাউথ, টুলোঁ, জেনোয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, নাগাসাকি, সান ফ্রান্সিস্কো, পানামা ক্যানেল এমন কি কলকাতায় পর্য্যন্ত দর্শন দিবে। বলশেভীরা এদিকে কয়লা ধর্ম্মঘটিদের টাকা জোগাচ্ছে ওদিকে লড়াই জাহাজ নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হবে এতে শক্তিরা ভারী চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। কোনও আপোষ এরা মানে না, কোন ভাল কথায় কান দেয় না! ওদিকে আবার সোভিয়েট সরকার ইংল্যাণ্ডের পেট্রল ব্যবসা হাত করবার বিশেষ চেষ্টা করছে। ইংরাজরা অনেক দিন থেকেই এদের কথা ভেবে রক্ষণশীল দলের দুই পার্লামেণ্ট সদস্যকে রুশিয়ার ভিতরকার খবর জোগাড় করতে পাঠিয়েছিল; তারা এসে যা সংবাদ দিয়েছে তাতে বলসেভীদের উপর দুনিয়ার ভাব ভাল ছাড়া খারাপ হয় না। তারা শ্রমিকদের বেতার যন্ত্র দিয়ে গান শোনায়, তাদের দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই, তাদের বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া অবনতির সম্ভাবনা নেই, দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কথাগুলো শুনে ইউরোপীয় শক্তিধররা এমন কি মার্কিন পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—

বিচলিত হলেই ইংরাজ জাত কিন্তু তা কৌশলে ঢাক্‌তে চেষ্টা করে, এই তার স্বভাব। তাই স্যানফ্রান্সিস্কোতে সেদিন গিলবার্ট ফ্র্যাঙ্ক (Gilbert Frankan)

গলা শানিয়ে বলেছেন ইংরাজ সোস্তালিষ্ট নয়, শ্রমিক ব্যাপারে বিপন্ন নয়. ইংল্যাণ্ড ঘুমিয়ে নেই, ইংল্যাণ্ড গোল্লায় যাচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড সেই মামুলী রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডই আছে। বলশেভিজম্, কম্যুনিজম্, মুসোলিনিজম্, কোন কিছুই ও দেশে পাত্তা পাবে না। এই যে গত ধর্ম্মঘট ব্যাপার ওটা ভূয়া! আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও আর এমন ধর্ম্মঘট হচ্ছে না। বড় বড় কথা দিয়ে মনের ভাব যদি চাপা যেত তবে মনোবিজ্ঞানটাই মিথ্যা হ'ত।

তা. রা.

সত্য মিথ্যা

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—— ০:০ ——

চিন্তাভারাক্রান্ত মনে উমাশঙ্কর বাবু যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা অনেকটা অতীত হইয়া গিয়াছে। বাটী ফিরিবার মুখে সমস্ত পথে তাঁহার মনে হইয়াছে যেন তাঁহার কি একটা বহুমূল্য দ্রব্য অসাবধানতায় হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা ফিরাইয়া পাইবার আর উপায় নাই। উমাশঙ্কর বাবু বুঝিতে পারিলেন না এই নামসহি-জাল সংক্রান্ত সংবাদটীর উদ্ভব হইল কি করিয়া? হয়ত তিনি স্বয়ং ইহার জন্ত দায়ী। গতরাত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া বাটী ফিরিয়া তিনি মেয়েদের নিকট কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতেই হয়ত সকলে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া ইহা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, তার পর বোধ হয় বাটীর পরিচারিকাদিগের মুখে মুখে সমস্ত পল্লীটীতে এ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আজ সন্ধ্যার মধ্যেই নিশ্চয়ই ইহা সারা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। আর রমানাথ দাস? সে কি করিবে? সে কি উমাশঙ্কর বাবুর মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ না

আনিয়া ছাড়িবে ? তবে উপায় ? উমাশঙ্কর বাবুর রাগে ক্ষোভে দেশত্যাগী হইতে ইচ্ছা হইল। তিনি যদি কোনও প্রকারে সংবাদটীকে বাটীর বাহির হইতে বাধা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাটীর সকলকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন যে তাহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তিনি রমানাথ দাসের ব্যবসায়ের বাস্তবিকই জামিন হইয়াছিলেন এবং জালসংক্রান্ত সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু এখন আর তাহা হইবার উপায় নাই, এখন সমস্ত সহরের দ্বারে দ্বারে কৈফিয়ৎ দিয়া আসিতে হইবে এবং উহা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

এই অপরিহার্য্য চিন্তায় উমাশঙ্কর বাবুর মেজাজ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দ্বারদেশে বাগানের মালীকে দেখিয়া বাগানের অপরিচ্ছন্নতার ত্রুটি ধরিয়া তাহাকে বেশ একটু ভৎর্সনা করিয়া লইলেন এবং অন্দরে ঢুকিবার মুখে বাটীর পুরাতন দাসীকে প্রতিবেশীর পরিচারিকার সহিত গল্প করিতে দেখিয়া কোনও জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহাকে জবাব দিয়া দিলেন।

সে দিন আদালতে গিয়াও উমাশঙ্কর বাবু কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনে হইতেছিল হয়ত তাঁহাকে আদালতে জরিমানা দিতে হইবে, হয়ত তাঁহাকে সংবাদপত্রে ত্রুটী স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার মান প্রতিপত্তি সকলই একেবারে ডুবিয়া যাইবে। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। এই ত অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য করিবার ফল ! অর্থনাশ, বাটীতে অশান্তি—এ সকল ত আছেই, ইহা ভিন্ন জগতের সম্মুখে নিজেকে মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুনাম বিসর্জ্জন !

বাটী ফিরিয়া উমাশঙ্কর বাবু বিশ্রামকক্ষে বসিতেই কৃপাময়ী দেবী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গতকল্য রাত্রি হইতে পতি-পত্নীতে কথা বন্ধ হইবার পর আর কোনও কথা হয় নাই ; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলে যে কৃপাময়ী দেবী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবেন, এরূপ আশা উমাশঙ্কর বাবু করিতে পারিলেন না এবং সেই গুরুতর কারণটী কি ইহা ভাবিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রোধকম্পিতস্বরে কৃপাময়ী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ব্যাপারখানা কি বলত ? সব কথাই যে আজকাল আমার কাছ থেকে গোপন করতে চাও ? পুলিশে খবর দেবে কিনা বলত।"

উমাশঙ্কর বাবু চমকিত হইয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চশমার উপর দিয়া পত্নীর দিকে তাকাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"পুলিশ ? না, না, আমি ত আর পাগল হইনি।"

অগ্নিতে ইন্ধন পড়িল। কৃপাময়ী দেবী ভাবিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে অনেক কথা গোপন করা হইতেছে। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া রাগ ও অভিমান-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "দেবে না?" উমাশঙ্কর বাবুও এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পত্নীর এই আদেশ তাঁহার নিকট অন্যায় ও অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি শুধু সংযতস্বরে কহিলেন, "কি বলছ তুমি?"

কৃপাময়ী দেবী বলিলেন, "আমি চাই তুমি পুলিশের কাছে এখনই খবর দাও।"

উমাশঙ্কর বাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "এ ঘর থেকে এখন চলে যাও, আমাকে শান্তিতে বিশ্রাম করতে দাও।"

অভিমানে কাঁদ-কাঁদ স্বরে কৃপাময়ী দেবী উত্তর দিলেন, "জানি, তুমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবে, হাঁ, তোমার সন্তানদের যদি নেংটী পরে' থাকতে হয় এবং দুবেলা আহারও না জোটে তা' হলেও তুমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবে! কেমন? এর পর যে কোনও শঠ জালিয়াৎ এসে তোমার নাম সই করবে, আর তুমি টাকা গুণে দেবে। তা বেশ!" পরে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কৃপাময়ী দেবী বলিলেন, "কিংবা হয়ত তুমি সত্যি জামিন হয়েছ, কে জানে। তুমি যদি বাস্তবিকই দোষী হও, তা'তেও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হব না।"

স্ত্রীর মুখে এই "দোষী" কথাটী শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে হত্যা কিংবা চৌর্য্য-অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, তিনি কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে কৃপাময়ী দেবী ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উমাশঙ্কর বাবুর তন্ময়তা ভাঙ্গিলে তিনি মোটরের শব্দে চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার মুহুরীর ছোট ছেলেটীকে লইয়া বাহির হইতেছেন। দেখিয়াই তিনি তাঁহার স্ত্রীর গন্তব্যস্থল অনুমান করিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া স্ত্রীর পুলিশষ্টেশনে যাওয়ায় মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় উপায়ান্তর না দেখিয়া আপন মনে গর্জ্জন করিতে করিতে তিনি কক্ষে পদ-চারণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকালের মধ্যেই তিনি মোটর-খানি ফিরিয়া আসার শব্দ শুনিতে পাই-লেন। তিনি বাহিরে না তাকাইয়া গদি-আঁটা সোফার উপর শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। কৃপাময়ী দেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথাপি তিনি চক্ষু মেলিলেন না। ইহাতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ না হইয়া কৃপাময়ী দেবী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি হয়ত আবার আমাকে ঘর থেকে দূর

করে দেবার হুকুম দিয়ে পৌরুষ দেখাতে দ্বিধা করবে না; কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য করবার পুরুষত্ব যখন থাকে না, তখন আমাকেই সে কাজ করতে হবে। আমি যতদিন এ বাড়ীর কর্ত্রী আছি, ততদিন আমি এ সব হতে দেবো না। যখন কেউ গেল না, তখন আমাকেই গিয়ে পুলিশে সংবাদ দিতে হল।"

উমাশঙ্কর বাবু সোফা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিতনয়নে পত্নীর পানে তাকাইয়া রহিলেন। তার পর কেশহীন মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্বস্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে তুমিই পুলিশে সংবাদ দিতে গিয়েছিলে?" কৃপাময়ী দেবী একটু বিদ্রূপের সুরে উত্তর করিলেন, "যখন পুরুষেরা তাদের কাজ করতে পিছিয়ে পড়ে, তখন মেয়েদেরই পুরুষের কাজ করতে হয়।" তারপর একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি একেবারে শুধুহাতে এ বাড়ীর কর্ত্রী হতে আসিনি এবং আমার পিতৃ-ধনও যে তুমি শঠ ও ভিক্ষুকদের বিলিয়ে দেবে এমনও কোন কথা ছিল না।"

উমাশঙ্কর বাবুর মুখ ক্রোধে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু পুনরায় পত্নীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি কোনও উত্তর দিলেন না, কেবল তাঁহার শ্মশ্রু ও মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্ত্রীর অর্থের কথায় উমাশঙ্কর বাবুর রাগ করিবারও কিছু ছিল না, কারণ বিবাহের পর তাঁহার পত্নীর স্ত্রী-ধন তাঁহারই চেষ্টায় প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে।

কৃপাময়ী দেবী আর অধিকক্ষণ ঐ স্থলে অবস্থান করা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না মনে করিয়া সগর্ব্বপদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বার রোধ করিয়া দিলেন। উমাশঙ্কর বাবু অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জীবনে তাঁহার এই প্রথম ইচ্ছা হইল যে দৌড়াইয়া গিয়া তিনি পত্নীকে বেত্রাঘাতে স্বামীর আনুগত্য শিক্ষা দিয়া দেন, কেবল পারিবারিক অশান্তির ভয়ে তিনি সে ইচ্ছা দমন করিয়া রাখিলেন।

উমাশঙ্কর বাবু উঠিয়া কক্ষে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল হয়ত তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। অথবা হয়ত তিনি কল্পনায়-অপ্রিয় দৃশ্যের চিত্র দেখিতেছিলেন। যাহা হউক, মাঝে মাঝে তিনি একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিনিদ্রভাবের প্রমাণ গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন ঐত সম্মুখে আম্রবীথির কোণে 'বৌ কথা কও' পাখীর কলরব শোনা যাইতেছে, ঐত পথের ওপারে মসজিদ হইতে

সন্ধ্যার আজান ধ্বনি শোনা যাইতেছে, ঐত পার্শ্বের বাটীর দুর্গামণ্ডপের শীর্ষস্থ চূড়াটি গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইতে কক্ষের অভ্যন্তরে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন, ঐ যে বড় টেবিল আয়নার সম্মুখে গৌরাঙ্গের ছবিখানি শোভা পাইতেছে, ঐ যে আয়নার উপর তাঁহার আদালতের পোষাক-পরিহিত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তবে তিনি ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখেন নাই। তবেই ত তাঁহার পত্নী এ মিথ্যা জালের সংবাদ লইয়া পুলিস আফিসে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন।

এই চিন্তায় উমাশঙ্কর বাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মনে হইল তাঁহার পদতলের কঠিন মৃত্তিকা সরিয়া যাইতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িলেন এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতে লাগিলেন, সত্যই কি, ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল উমাশঙ্কর বাবু, না আর কোনও সাধারণ লোক? তাঁহার নিজের সত্ত্বা মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

উমাশঙ্কর বাবু ঘরের বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ধ্যার জ্যোৎস্না তাঁহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িল। বাতায়নের ঠিক নিম্নে মালতী-ফুলের সারির চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলোক যেন এক স্বপ্নরাজ্যের রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, পার্শ্বের আম্রবীথি হইতে নব-মুকুলের গন্ধে সে রাজ্য যেন নন্দন-পারিজাতের সৌরভে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উমাশঙ্কর বাবুর মন বা চক্ষু আজ সে দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি কল্পনার চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, পুলিশের পেয়াদা তাঁহাকে মিথ্যা জাল-সহির অভিযোগ প্রচার করার অপরাধে সাধারণ আসামীর মত বিচারের জন্য লইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ উমাশঙ্কর বাবু কি ভাবিতে ভাবিতে দ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়াই দ্বারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। না, একেবারে অসম্ভব, তাঁহার স্ত্রীর নিকট গিয়া সত্য কথা প্রকাশ করা এখন একেবারে অসম্ভব। প্রথমতঃ তিনি স্ত্রীর উপর মর্ম্মে মর্ম্মে চটিয়া গিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না এই সংবাদ তাঁহার স্ত্রী কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন। হয়ত তাঁহার স্ত্রী এই সংবাদে ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারেন, হয়ত বা ইহা হইতে ভীষণতর কিছু করিয়া বসিতে পারেন।

উমাশঙ্কর বাবু ধীরে ধীরে দ্বিতলে উঠিয়া আদালতের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশ-ষ্টেসনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া গরদের চাদরটা স্কন্ধে তুলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন এবং পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "এ আমি কি করিতে যাইতেছি, ইহা আমার পক্ষে শুধু লজ্জা নহে, ইহা মহাপাপ। আমি প্রথমে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া একজনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম, তার পর বাস্তবিক

যখন অর্থক্ষতির সময় আসিল, তখন পরিবারের মধ্যে গোল উঠিল এবং আমি মূর্খের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার পুলিশ-ষ্টেসনে গিয়া আমার স্ত্রীর দেওয়া সংবাদ ভুল বলিয়া প্রমাণ দিয়া সমস্ত সহরের মাঝে আপন পত্নীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও হাস্যাস্পদ করিতে যাইতেছি। না, ইহা বড়ই বাড়াবাড়ি।"

উমাশঙ্কর বাবু অনেকক্ষণ গরদের চাদরখানি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমানাথ দাসের মূর্ত্তি সহসা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেই, বিরক্তিতে তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই লোকটাই ত সকল অশান্তির মূল, তাহার জন্যই তিনি এতটাকা দণ্ড দিতে চলিয়াছেন! তিনি হাতের চাদরখানা আল্‌নায় তুলিয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। শুধু ত পুলিশের নিকট হইতে অভিযোগ উঠাইয়া লইলেই চলিবে না, কেমন করিয়া এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার হইল তাহার জন্যও তাঁহাকে জবাবদিহি হইতে হইবে। তবে কি রমানাথ দাসের নিকট গিয়া করজোড়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে হইবে নাকি? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে কি উপায়ে এই অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? অন্য কোনও উপায় আছে কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া তিনি আপাততঃ স্থির করিলেন।

উমাশঙ্কর বাবু ভাবিয়া দেখিলেন—এই যে আশ্চর্য্য ব্যাপারটী হইতে বসিয়াছে তাহার জন্য তিনি বড় বিশেষ অপরাধী নহেন, অধিকন্তু যদিও দৈবঘটনার সমাবেশে তাঁহাকেই সমস্ত দায়িত্ব লইতে হইবে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ন্যায়তঃ অধিক দায়ী কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং দায়িত্বের অনুশোচনায় যে ব্যথা তাঁহাকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিতেছিল, তাঁহার জ্বালা অনেকটা লঘু হইয়া আসিল এবং যে পারিবারিক অশান্তি আজ তিনি ভোগ করিতেছেন তাঁহার মতে তাহা সর্ব্বৈব রমানাথ দাসের প্রতি তাঁহার অনুকম্পার পরিণাম। সুতরাং সমস্ত অপরাধ যে রমানাথ দাসের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অন্ধকারে একাকী বসিয়া তিনি কত কি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পার্শ্বের কক্ষ হইতে পৌত্রের হাসির রোল ভাসিয়া আসিল। তিনি উঠিয়া তাহার নিকট যাইতে উদ্যত হইয়া দ্বারের নিকট আসিয়াই থামিলেন; আজ আর তাঁহার একান্ত প্রিয় পৌত্রের হাসিমুখ দেখিবার মতও মনের অবস্থা নাই।

একদিন একদিন করিয়া কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। উমাশঙ্কর বাবুর নিকট জীবন দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। এক একবার তিনি পুলিসের নিকট গিয়া সমস্ত সত্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন, কিন্তু পরক্ষণেই রমানাথ

দাসের মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-সম্মুখে প্রতিভাত হইলেই রমানাথ সম্বন্ধে কত কি অপ্রিয় কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়া রমানাথের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া রমানাথকে তাঁহার নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। ইহাতে উমাশঙ্কর বাবুর মনে নিজকার্য্যের জন্য অনুশোচনা কাটিয়া গিয়া সাহসের উদয় হইতে থাকে এবং তিনিও প্রতিদিন পুলিশের নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে থাকেন। ক্রমেই তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, রমানাথের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ও অসম্ভব।

তথাপি মনকে চোখ ঠারিয়া উমাশঙ্কর বাবু নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিতেছিলেন না। কে যেন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতেছিল, "ভাবিয়া দেখ, এতটা ভাল নয়।" যদি রমানাথের শাস্তি হয়, যদি সে এই অপরাধে জেলে যায়। কিন্তু বাহিরের লোকের ত তাঁহার অপরাধের পরিচয় পাইবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার সহি করার একমাত্র সাক্ষী নগেন্দ্র উকিল অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে। তবে? তথাপি তিনি কি এক্ষণে নিজের নাম-সহি করা অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু উপায় কি? হয়ত চিন্তা করিলে একটা উপায়ের উদ্ভাবন হইবেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ।

চয়নিকা

সামাজিক বিরোধ

—:•:—

হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা যে কি জিনিষ আর তার গোড়া কোথায়, তা' পঞ্জাবে না এলে ভাল করে বোঝা যায় না। মোগল পাঠান সকলকারই বেলা সামলাতে হয়েছে পাঞ্জাবকে। লাঠালাঠিটাও এখানে অনেক দিন ধরে চলেছে; সুতরাং শত্রুতাও বেশ পাকাপাকি রকমের হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে বিদেশী মুসলমানদের বংশধরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; তাই এখানকার হিন্দুরা মুসলমানদের কতকটা বিদেশী শত্রুর বংশধর বলেই মনে করে, আর তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে প্রায় সেই রকম। এই বিজেতাদের জয় করবার চেষ্টাতেই শিখেদের সৃষ্টি। শিখেদের হাতে যখন রাজ্য আসে তখন এরা অতীত অত্যাচারের শোধ নিতে ছাড়েনি। এখানকার মুসলমানদেরসে কথা আজও বেশ মনে আছে। পাঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধটা অতীত ইতিহাসের জের।

শিখেরা যদি মুসলমানদের সকলকে শিখ করে নিতে পারতো, তাহলে ল্যাঠা চুকেই যেত, কিন্তু ল্যাঠির জোরে বা culture-এর জোরে শিখেরা তা করতে পারেনি। শুধু culture-এর দিক থেকে দেখতে গেলে শিখ-ধর্ম্মে আর মুসলমানধর্ম্মে খুব বেশী তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাদের দোষ গুণ অনেকটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। হিন্দুয়ানিকে মুসলমানেদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে শিখধর্ম্মের রূপ নিতে হয়েছে; তাই শিখধর্ম্মের মধ্যে মুসলমানদের দোষগুণ সবই অল্পবিস্তর এসে পড়েছে। গ্রন্থসাহেব আর কোরাণ, গুরুদ্বার আর মসজিদ, গুরু আর পয়গম্বর—এসব আসলে প্রায় একই জিনিষ; তবে শিখেদের জিনিষগুলো হচ্ছে এদেশী, আর মুসলমানদের জিনিষগুলো হচ্ছে বিদেশী। এক্ষেত্রে যাদের হাতে শক্তি তাদেরই জয় হয়। কিন্তু মোগল পাঠানের হাতে যতদিন রাজশক্তি ছিল, শিখেদের হাতে ততদিন থাকেনি। কাজেই যে experimentটা আরম্ভ হয়েছিল তা শেষ হবার অবসর পায়নি। পাঞ্জাবে শিখ আর

মুসলমান পরস্পরের দিকে চোখ রাঙিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের cultural fusion এর চেষ্টায় অনেক "পন্থ"-এর আবির্ভাব হয়েছে। রাজশক্তি নিয়েও কতকটা কাড়াকাড়ি হয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা তাতে জয়লাভ করতে পারেনি। পাঠান মোগলের বংশধরেরা হিন্দু-সমাজের খানিকটা খসিয়ে নিয়েছে; আর হিন্দি ভাষার ঘাড়ে ফার্সী চাপিয়ে একটা নূতন উর্দ্দু ভাষা আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা উর্দ্দু culture-এর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। দিল্লী আর লক্ষ্ণৌ হচ্ছে এই culture-এর আড্ডা। খাঁটি মুসলমানেরা যে হিন্দুদের কতটা ঘৃণার চক্ষে দেখে, তা এই সব জায়গার মুসলমানদের না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।

পাঞ্জাবে এক শিখ ভিন্ন সকলেই মুসলমানের culture আর রাজশক্তির কাছে হার স্বীকার করেছে; শিখ-cultureও মুসলমানী culture-এর খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমানের হাতে রাজশক্তি থাকা সত্বেও হিন্দু culture হিন্দি ভাষার জোরে নিজের স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের গোঁড়ামিও কতকটা বেড়েছে বটে, কিন্তু হিন্দু-consciousnessটা বেঁচে আছে।

ইংরেজের আমলে হিন্দুস্থানে আর পাঞ্জাবে মুসলমান-culture জয় করবার চেষ্টা করেছে আর্য্যসমাজীরা। মুসলমানদের হাতে এখন আর রাজশক্তি নেই; সুতরাং আগেকার political ঝগড়াটা এখন কতকটা অন্যরূপ নিয়েছে। আর্য্যসমাজীদের ইচ্ছা যে সমস্ত মুসলমানকে আর্য্যসমাজভুক্ত করে নেয়, উর্দ্দুর বদলে হিন্দি চালায়, আর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে পাঠান-মোগলের বিজয়-চিহ্ন মুছে ফেলে। আর্য্যসমাজীদের হাতে রাজশক্তি থাক্‌লে কি হতো বলা যায় না; কিন্তু তা যখন নেই, তখন তাদের চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমানকে "শুদ্ধ" করে আর্য্য করা, আর উর্দ্দুকে তাড়িয়ে হিন্দি ভাষার প্রচলন করা। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর মেজাজটা হয়ে গেছে মুসলমানদের মত। কোরাণের বদলে বেদ, মসজিদের বদলে আর্য্যসমাজ গৃহ, আর 'তবলিগের' বদলে শুদ্ধির প্রতিষ্ঠা এঁরা করতে চান। এঁরা মনে করেন যে শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ সংঘবদ্ধ মুসলমান-সমাজকে গ্রাস করতে পারবে না; তাই হিন্দু-সমাজকে ভেঙ্গে চুরে এঁরা এমন একটা militant সমাজ গড়তে চান যা মুসলমানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

আর্য্য-সমাজের চেষ্টার ফলে হিন্দু-সমাজ হয়-ত একটু বদলাতে পারে; অন্ততঃ হিন্দুসভার তরফ থেকে হিন্দু-সংগঠনের চেষ্টা দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু

মুসলমান-সমাজকে গ্রাস করে ফেলবার শক্তি যে আর্য্য-সমাজের আছে তা মনে করবার কোন কারণ দেখতে পাইনে। কি সামাজিক হিসাবে, কি অধ্যাত্মদৃষ্টির হিসাবে আর্য্য মুসলমানের চেয়ে বড় নয়। সুতরাং এ ঝগড়ার ফলে মুসলমান আর হিন্দু সমাজ দুটোই বেশী সংঘবদ্ধ আর militant হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু কাউকে গ্রাস করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাংলার মুসলমানদের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র। বাংলায় মুসলমান অনেক, কিন্তু তারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর; সুতরাং বাংলার হিন্দুদের এক cultural superiority আছে। তা ছাড়া বাংলা ভাষা ভেঙ্গে উর্দ্দুর মত একটা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয় নি। লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের নিকৃষ্ট জীব বলে মনে করে, বাংলার হিন্দুরা বাংলার মুসলমানকে অনেকটা সেই চক্ষে দেখে! বাংলার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের যে অবস্থা, বাংলার মুসলমানদেরও প্রায় তাই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলার হিন্দুদের গোঁড়ামী অনেক কমে গেছে; আর বাংলার বাইরের মুসলমানের প্রভাবে বাংলার মুসলমানদের মনোভাব অনেকটা বদলেছে। আমার মনে হয় বাঙ্গালী হিন্দু আর বাঙ্গালী মুসলমান দু দলেরই মনে গোঁড়ামীর ভাবটা একটু কম। দু দলেই যদি বাইরের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে cultural fusion হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আপাততঃ কিছুদিন ভেদের মাত্রাটা বেড়েই চলবে বলে যেন মনে হয়।

আপাততঃ যতদূর দেখতে পাচ্ছি তাতে বোধ হয় যে যদি মুসলমানধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের মত ভারতবর্ষ থেকে চলেও যায়, তা হলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর বেশ একটা ছাপ রেখে যাবে। শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজ যদি মুসলমানদের প্রভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে, তা হলে হয়ত একদিন মুসলমান-সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে পারে, কিন্তু সে শক্তি অর্জ্জন করতে হলে হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান রূপ অনেক বদলাতে হবে। নিজেকে সে-রকম পরিবর্ত্তন করবার শক্তি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের আছে কি না তা জানি নে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, আর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন এমন কোন মহা-পুরুষের যদি আবির্ভাব হয় যিনি হিন্দু সমাজকে আবার নূতন ছাঁচে ঢালতে পারবেন, তা হলে এই দুটো সমাজ মিশে গিয়ে একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠতে পারে; কিন্তু এখন দু দলের যে রকম অবস্থা, তাতে কেউ কাউকে গ্রাস করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়। আমার মনে হয় অন্ততঃ বাংলার হিন্দুদের এখন নিজেদের সমাজটাকে শক্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করাই ভাল; যাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই, তাদের পরকে গ্রাস করতে যাওয়া একটা দুশ্চেষ্টা মাত্র।

হয়ত আত্মরক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা মীমাংসার পথ দেখতে পাওয়া যাবে।

তবে একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি যে এ দেশ যদি পরাধীন থাকে, তা হলে নূতন cultureও গজাবে না, আর দুটো জাত মিশে গিয়ে একটা জাতও কখনও হবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"বঙ্গবাণী"।

কলিকাতার দাঙ্গা।

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যে সব কথাবার্ত্তা কওয়া হচ্ছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কারও মাথা নেই, কিন্তু সকলেরই হৃদয় আছে।

হিন্দু মুসলমান কারও কথার ভিতর যে logic নেই, তার কারণ logic জিনিষটে মাথা থেকে বেরয়।

তবে হৃদয়েরও অর্থাৎ রাগদ্বেষেরও একটা logic আছে, যার সন্ধান আরিষ্টটেল কিম্বা গোতম জানতেন না।

সেই হার্ম্ম্যায় বর্ত্তমানে দিব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ও একটা মানসিক রোগ।

রোগেরও একটা লজিক আছে—যা ডাক্তারদের ভাষায় বলতে গেলে, will take its course। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রোগীকে চট্‌পট সারাতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে।

সুতরাং যা হয়েছে তা হয়েছে বলে মেনে নিয়ে দেখা যাক্, সে বিষয়ে কি বলা যেতে পারে।

মৌলবী কলম আজাদ এবং মিষ্টার জে, এম, সেনগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের পঞ্চবৎসরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলে হিন্দুমুসলমানের ভিতর যে সখ্য জন্মলাভ করেছে, উক্ত ঘটনার ভিতর শুধু সেই সখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি এই হিন্দু নেতা ও মুসলমান নেতার পরস্পরের সখ্য উক্ত জাতায় নয়।

প্রণয় জিনিষটে খুব ভাল, কিন্তু তা যদি হয় অতি গাঢ়, তাহলে প্রণয়ী-যুগলকে পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য বলতে হয়—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

দ্বিজু রায় বলেছেন যে, একটি আদর্শ দম্পতির দাম্পত্যপ্রণয় যখন জেগে উঠত, তখন "পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।"

এ কদিন ধরে যে পাড়ার লোকে পুলিশ ডেকেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পাঁচ বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত পলিটিকাল ঘটকালির মূলে হিন্দুমুসলমানের ভিতর উক্তরূপ দাম্পত্যপ্রেম স্থাপিত হয়েছে।

"ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে" প্রস্তাবটা রাজনৈতিক হিসেবে খুব চটকদার। কিন্তু যাঁদের রাজনীতির তর সয় না, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—তার পর? বিয়ে ত আর মৃত্যু নয় যে, তার পর আর কিছু নেই।

ওরকম বিয়ের পিঠ পিঠ কথা ওঠে, "বর বড় না কনে বড় "? তারপরই ঘটে দাম্পত্যকলহ, যার এক নাম হচ্ছে অস্ত্রযুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

যা হয়েছে তা যে যুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধ মানে মারা ও মরা। যে মরেছে তার কাছে সব যুদ্ধই সমান। ওর ভিতর ছোটবড়র প্রভেদ নেই।

যুদ্ধ হলেই লোকে তার কারণ খোঁজে। য়ুরোপের গত যুদ্ধের কারণ লোকে আজও খুঁজছে। কলকাতার যুদ্ধেরও কারণের তল্লাসের হু'চারটি অনু-সন্ধান কমিটী গঠিত হয়েছে।

সম্ভবত যাঁরা খুঁজছেন তাঁরাই তা ঘটিয়েছেন, কারণ এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, এ ব্যাপারের পিছনে brain আছে।

যদি তাই হয় ত সে brain-এর সন্ধান সহজেই পাওয়া যাবে।

একটা লক্ষণে সে brain সহজেই চেনা যাবে। যে brain থেকে এ বুদ্ধি বেরিয়েছে, তা নিশ্চয়ই brainless brain।

হয় মিষ্টার আবদার রহিম, নয় সহিদ সুরবর্দ্দি বলেছেন যে, এ বিরোধের কারণ হুটি—(১) পলিটিকাল, (২) ধার্ম্মিক।

তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতি দলের ভিতর দুটি দল আছে—(১) শিক্ষিত দল, (২) মূর্খের দল।

পলিটিক্স্-এ শিক্ষিত দলের এক-চেটে; আর যে ধর্ম্মের মানে বিধর্ম্ম-বিদ্বেষ, সে ধর্ম্ম মূর্খদের একচেটে।

অর্থাৎ ধর্ম্মের দলে brain নেই, আছে শুধু পলিটিক্সের দলে। সুতরাং brain এর তল্লাস করতে হবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। যদি কোথায়ও তা খুঁজে পাওয়া যায়, ত সেখানেই পাওয়া যাবে।

যদি কেউ বলেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহলে মানতে হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের দলও শিক্ষিত।

সে যাই হোক্, দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স্ মেশানো হচ্ছে Nitric Acid-এর সঙ্গে Glycerine মেশানো। ধর্ম্মের গ্লিসারীন জিনিষটে অতি নিরীহ, পলিটিক্সের অ্যাসিডের সঙ্গে মেশালেই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম্ম মেশালে পলি-টিক্সের যে শক্তি বাড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে শক্তি হয় প্রলয়ঙ্করী, আর পলিটিসিয়ানদের এমন কোনও বিস্তে নেই, যার সাধ্য রোধে তার গতি।

Law and order জিনিষটে বাতা-সের মত; অর্থাৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার মর্য্যাদা মানুষ বোঝে না, বরং হঠাৎ "কাগজ উড়িয়ে নিলে" বলে' তার

উপর মানুষে গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কিন্তু ঐ জিনিষের অভাবেই মানুষে খাবি খায়।

ও ক্ষেত্রে আর এক বিপদ আছে। বাইরের law and order এর সঙ্গে সঙ্গেই মনের law and order চলে যায়। এ অবস্থায় ফূর্ত্তি করতে পারে শুধু তারা, যাদের অন্তরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু আছে। বলা বাহুল্য আমাদের অধিকাংশ লোকের ভিতর তা নেই।

সুতরাং আবার কিসে আমাদের ভিতরে বাইরে law and order ফিরে আসে, সে ভাবনা আমরা ভাবতে বাধ্য।

আমি পলিটিকাল ডাক্তার নই, সুতরাং এ রোগের ওষুধ আফিং কি ব্রাণ্ডি তা বলতে পারিনে।

ইতালিতে মুসোলিনি নামক একজন পলিটিকাল ডাক্তার ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগ করে এ অবস্থায় খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এদেশের ছোট পলিটিকাল ডাক্তারদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যদি communal গোলমালের সত্য সত্যই জড় মারতে চাও, তাহলে communal representation দূর করতে হবে। এ পলিটিকাল রোগের-মূল বজায় রেখে বাইরে প্রলেপের ব্যবস্থা করবে শুধু পলিটিকাল হাতুড়ের দল।

বীরবল—"সবুজপত্র"।

স্বরলিপি *

—০:*:০—

আশাবরি—একতালা।

মা	মা	মা	মাপা	গা	মা।	পা	ণা	দা	পা	-া	মা।
রূ	পে	র	কু	—	ঞ্জ	ঝ	টি	কা	আ	—	জ
গা	গা	রো	গা	গমা	পা।	মা	গা	রো	সা	-া	-া॥
লু	টা	য়	লু	টা	য়	লু	টা	য়	রে	—	—

* ইহার কথা—প্রথম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পা দা দা না র্সা র্সা। না র্সা না দা পা -া
অ রূ প ভা — নু প্র কা শ ভা — য়

মা গা গা মা ণদা পা। মা গা রো সা -া -া।
প্র কা শ ভা — য় ভা — য় রে — —

পা পা দপা মা মা পা। দা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা।
স ব কা — ম না কা — ম ক লা য়
অ শো ক তে — জ প্রা — ণ ভ রি ল

দা দা দা র্সা র্সা র্সা। র্সর্র সর্রজ্ঞা র্রা র্সণা দা পা।
অ ত নু কা র ণে মি লা ল রে — —
ভ রি ল ভ রি ল ভ রি ল রে — —

মা পা দা সা র্সা র্সা। ণা র্সা ণা দা পা মা।
রূ প বু — দ্বু দ অ রূ প সা গ রে
অ রূ প য — জ্ঞে রূ প আ হু — তি

পা ণা ণা দা পা দপা। মপা মগা রো সা -া -া॥
আ প না য় আ জি বি লা ল রে — —
দু খ পা রা বা র ত রি ল রে

সা সা সা ণ্সণ্ দ্া ণ্া। সা মা মা মা — মা।
সু ধা ত র — ঙ্গ না চি উ ঠি — ল

মা মা মা মা মা মগা। মা দা দা পা -া -া।
কো টি সু ধা ক র উ দ য় রে — —

মা দা দা দা -া দা। পা দা দা পা দপা মা।
অ রূ প চ — ন্দ্রে রূ প ত মি — স্র

পা ণা ণা দা পা দপা। মপা মগা রো সা -া -া।
হ ই ল বি ল য় বি ল য় রে — —

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিচ্ছেদ, মিলন ও পুনর্ব্বিচ্ছেদ

স্বরাজ্য-দলে ভেদ-রিপু প্রবেশ করিয়াছে। দলপতি সেনগুপ্তের সহিত দলের ধনপতিগণের মতান্তর হইয়াছে। মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রভৃতি স্বরাজীগণ কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসার পর তাঁহাদের মধ্যস্থতায় ভাঙ্গায় জোড়া লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে জোড়া কায়েমী হইল না বুঝি। দেশবন্ধুর স্মৃতিসভায় ১১ই জুলাই তারিখে টাউনহলে ধনপতিগণের অনুপস্থিতি আবার সর্ব্বসাধারণ্যে দলপতির সহিত তাঁহাদের মনান্তরের ভ্রম জন্মিয়াছে। একদলেরই মধ্যে শতদল জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। মিষ্টার সেনগুপ্তের ত্রিমুকুটের দুটি মুকুট যদি মস্তকদ্বয়ান্তরে ন্যস্ত হইয়া দল বজায় থাকে তবে সেনগুপ্ত মহাশয়ের সেইটুকু স্বার্থত্যাগে স্বীকৃত হওয়া উচিত। দেশের হিতকল্পনায় মহাত্মা গান্ধীর দান দেশের হিতকামনায় অন্ততঃ আংশিক প্রত্যর্পণ করা সুবুদ্ধি হইবে।

* * * *

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ

স্বরাজদলের কেহ কেহ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সেই ভাবাত্মক দু' একখানি চিঠির নকল দলান্তরের হস্তগত হইয়াছে। ইহা লইয়া হৈ-চৈ চলিতেছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মতও পরিবর্ত্তনশীল হওয়া স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিক নিয়মে যদি কোন কোন মুখ্য-স্বরাজী মনে করিয়া থাকেন মুসলমানদের তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষের দিন স্বরাজীদের মন্ত্রীত্ব-পদ গ্রহণেই দেশের উপকার হইবে, এবং সেই সম্বন্ধে দলের অন্য কোন মুখ্য-ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন তবে তাহাতে দোষাবহ কিছু দেখি না। যে দল কোন সময়ে বাধাপন্থী বলিয়াই বিখ্যাত ছিল, তাহা যদি সময়ের প্রয়োজনে বাধা ছাড়িয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করে, অথচ কোন কোন লোকের সঙ্গে কোন কোন লোকের মনের মিল হয়, ও অপরের সঙ্গে হয় না বলিয়া সেই একই দলের লোক যদি এখনও নিজেদের স্বরাজী বলিয়া আখ্যাত করিয়া অপরাপর দল হইতে স্বাতন্ত্র্য রাখে তবে আপত্তি কিসের ?" তবে মতপরিবর্ত্তনটা স্পষ্টাস্পষ্ট স্বীকার করিলেই ভাল।

* * * *

কলঙ্ক

পাবনায় মুসলমানদের হস্তে হিন্দুদের যে অবাধ নির্য্যাতন চলিয়াছে, কলিকাতার দাঙ্গার অপেক্ষাও তাহা শোচনীয়। Pax Britannica দূরে বসিয়া যেন পুতুল নাচাইতেছেন। তৃপ্তিজনক সান্ধ্য-ভোজের পর গোঁফে হাত দিতে দিতে লর্ড বার্কেনহেড একটী আরামের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাতে পাওয়া যায়—"ভাল ভাল, লড়াচ্ছি ভাল—এরা লড়ছেও ভাল, ভারতটা আমাদের হাতছাড়া হতে এখনও দেরী আছে। গোঁফে তেল দিয়ে এখনও দীর্ঘ ঘুম দেওয়া যেতে পারে।"

মূঢ় মুসলমানগণ! মূঢ়তর তাহাদের নেতা! ব্রিটিশকেশরীকে তাঁহারা বলিতেছেন—

ত্বয়া ব্রিটীশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

ইহাতে ব্রিটীশেরও কলঙ্ক, মস্‌লিমেরও কলঙ্ক।

তদপেক্ষাও কলঙ্ক কুষ্টিয়ার হিন্দুদের—যাহারা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত স্ত্রী, মা ও বোনকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল।

* * * *

গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

কলিকাতায় মসজিদের সামনে বাজনার সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা-পত্র জাহির করিয়াছেন তাতে না মুসলমান তুষ্ট, না হিন্দু। দুই দলই ইহার বিরুদ্ধে বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। হিন্দুনেতারা জানাইয়াছেন, প্রয়োজন হইলে এবার ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা আইন অমান্য করিবেন। সেই ধর্ম্মবল জাগ্রত করার জন্যই বোধ হয় বিধাতার এই বিধান।

* * * *

চিররঞ্জন

লোকে আশা করে—

বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া
কুছ্‌ না হো তো থোড়া থোড়া।

সেই আশা শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে উৎসাহিত করে। তাই বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের অকাল-মৃত্যুতে দেশের লোক শুধু যে তাঁহার মাতা ও পত্নীর সহিত সহানুভূতিজনিত শোকানুভব করিতেছে তাহা নহে, দেশের আশা সমূলে উৎপাটিত হওয়ায় দেশের জন্যও মর্ম্মাহত হইয়াছে।

* * * *

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি

মানুষকে যতদিন খণ্ডভাবে জানা যায়, তার পূর্ণ পরিচয় লাভ হয় না। জীবনের নানা কাজে নানা দিকে, নানা লোকের নিকট খণ্ডিত পরিচয় মৃত্যুর পর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র মানুষটিকে শতদলের মত বিকশিত করে। যে চিত্তরঞ্জন জীবিতকালে কখন ভাই, কখন পুত্র, কখন শত্রু, কখন মিত্র, কখন আত্মসেবী,

কথন দেশসেবীর ভূমিকায় সংসার নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, আজ তাঁহাকে সমগ্র-ভাবে চিত্তরঞ্জন বলিয়া উপলব্ধি করিবার অবসর আসিয়াছে। বীজের ভিতর বৃক্ষ নিহিত থাকে, তথাপি বীজ দেখিবামাত্র শাখাপল্লবিত ভবিষ্য বৃক্ষের ধারণা মনে আনা সম্ভব হয় না। সমগ্র দৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর নিরীক্ষণের সুযোগেই বীজে বৃক্ষের অস্তিত্ব সাক্ষাৎকার হয়। আজ দেখা যাইতেছে, যে প্রাণবান, হৃদয়বান্, নির্ভীক, তেজস্বী, ত্যাগী চিত্তরঞ্জন সমগ্র দেশবাসীর চিত্ত রঞ্জন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন—তিনি শিশুতেও ছিলেন, যুবকেও ছিলেন; তিনি স্কুলেও ছিলেন, কোর্টেও ছিলেন তিনি কংগ্রেসেও ছিলেন, কাউন্সিলেও ছিলেন; তিনি কবিতায়ও ছিলেন, কথা-বার্ত্তায়ও ছিলেন; তিনি ভোগেও ছিলেন, ত্যাগেও ছিলেন। যে মানুষ দেশের মানুষ-হৃদয় নাড়াইয়াছিল সে নন্‌কো-অপারেশনে হঠাৎ গজাইয়া উঠে নাই—নন্‌-কো-অপারেশনের দিন লোকে হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল মাত্র। সেই মানুষের মনুষ্যত্ব আজ লোকান্তর হইতে প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয় মন্থন করিয়া তাহার ভিতরের মানুষকে বাহির করিতেছে। চিত্তরঞ্জন-স্মৃতির ইহাই মাহাত্ম্য।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ছোটপাতা—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উপন্যাসের বস্তুর সহিত নহে, বস্তুর বুকের ভিতর যে ভাবের প্রেরণা রহিয়াছে সেই ভাবের সহিত উপন্যাসখানির নামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের একখানি বাস্তব আলেখ্য; তাহরই উপর অবাস্তব ভাবের এমন একটি সুন্দর ছায়াপাত হইয়াছে যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত একটি শিশিরসিক্ত ফুলের পাপড়ির মতই ইহা মনে রেখাপাত করিয়া থাকে। কঠোর বাস্তবিকতার সহিত এমন করুণরসের মিলনে লেখকের পাকা হাত ও কোমল মনের পরিচয়ে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। উপন্যাসের উপসংহার ও নায়িকা বিশাখার শেষোক্তি ভূত সমাজ প্রহরী মাননীয় যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের ছাড়পত্র লাভে সমর্থ হইবে কি না জানিতে কৌতূহল রহিল।

শ্রীসরলা দেবী

চিরকুমার-সভা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত, মূল্য—১।০ মাত্র। 'চিরকুমার সভা' সর্ব্বপ্রথম ভারতী পত্রিকায় উপন্যাস আকারে ধারাবাহিক বাহির হয়। সে ১৩০৭ সালের কথা। তখনি অক্ষয়, হরবালা, শৈল, নীরবালা, বিপিন, পূর্ণ, শ্রীশ, চন্দ্র বাবু প্রভৃতি আমাদের মনে সুগভীর রেখা-পাত করেন ও একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। কবিবরের অমর গানের ছন্দ "অলকে কুসুম না দিয়া" প্রভৃতি বাংলার শিক্ষিত নর নারীর কণ্ঠে সেই সময় হইতেই ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তার পর ঐ বই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" নামে বাহির হয়, সম্প্রতি কবিবর সেই বহিখানির যে নাট্যরূপ দিয়াছেন, এখানি তাই। উপন্যাসে যে সকল অংশ ছিল, এই নাট্যগ্রন্থে তার কতক বাদ পড়িয়াছে আবার বহু বিষয় নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। পুরানো গান দুই একটি ছাড় পড়িলেও অনেকগুলি নূতন গানও কবিবর এ বহিতে রচনা করিয়া দিয়াছেন। এই নব নাট্য-সংস্করণখানি দৈন্য-অবসাদগ্রস্ত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার অন্তরগুলিকে শুভ্র নির্ম্মল হাসির জ্যোৎস্নায় ভরপুর করিয়া তুলিবে, বাংলার মাঠঘাঠ হাসির ধারায় স্নাত হইবে; কৃতজ্ঞ বাঙালী কবিবরের এ অমূল্য দান মাথা পাতিয়া লইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিবে। এই নাট্যসংস্করণ খানিই সম্প্রতি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া বহু অন্ধ-বাঙালীকেও এক অপরূপ কৌতুক হাসির রাজ্য দেখাইয়াছে! তা ছাড়া নব্য বাঙলা-গঠনের এমন প্রচুর ইঙ্গিত ইহাতে আছে, যাহা বরণ করিতে পারিলে বাঙালীর সংসার অপূর্ব্ব শান্তি-শ্রীতে উদ্ভাসিত হইবে।

গীতালি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। বিশ্ব ভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১।০। এযুগের বাঙালীকে কবিবরের কাব্য-গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাওয়া বাতি জ্বালিয়া চাঁদ দেখাইবার প্রয়াসের মতই নিরর্থক। এতদিনে কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাঙালী কবিতার আদর করিতে শিখিয়াছে—কবির মর্য্যাদা-জ্ঞান যে তা'দের জন্মিয়াছে ইহা খুব আশা ও আনন্দের কথা। তবে এ কাব্যের আজ নবম সংস্করণ দেখিব বলিয়াই আমাদের আশা ছিল। আশা করি গীতালির তৃতীয় সংস্করণ অচিরে নিঃশেষিত হইয়া বাঙালীর রসগ্রাহিতার পরিচয় দিবে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মেটকাফ্ প্রেস—১০নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
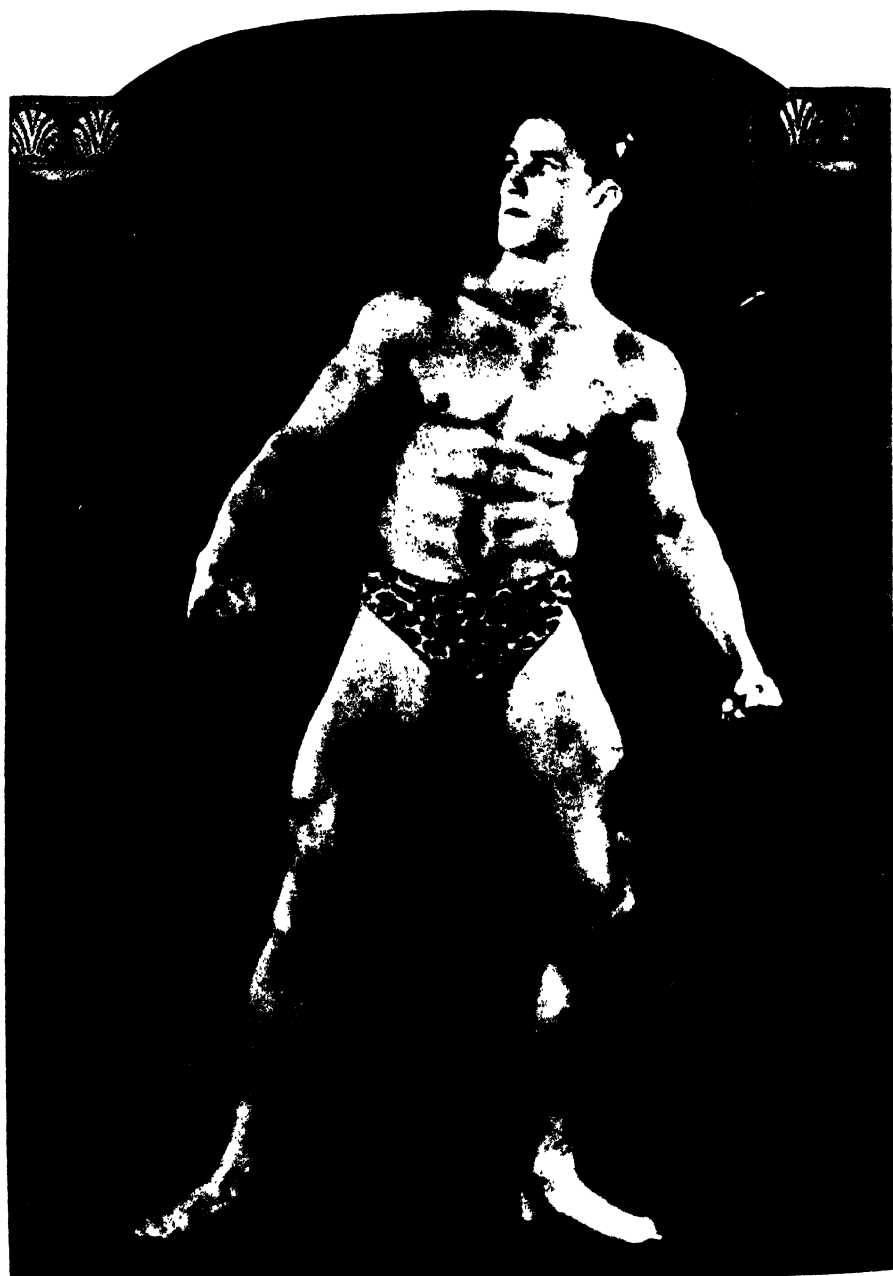
দেহ-সৌন্দর্য্য।

আন্টোনি, জে, সানসন, নিউইয়র্ক।

৫০শ বর্ষ } ১৩৩৩ { শ্রাবণ

শ্রাবণ

—:•:—

শ্রাবণ-বরষা নিল
রাজদণ্ড হাতে !
আলস বিলাস মোহ গেল চলি
আষাঢ়ের সাথে !

বজ্রশঙ্খে দিল ডাক
ভীম ছত্রতলে !
চমকি জাগিয়া উঠি প্রজাকুল
চলিল সদলে !

মৃদুতা-পিয়াস আজি
হল অবসান !
অবশ বিবশতার সবে মিলি
করিল ভাসান।

ভয়াল প্রমোদে সুখে
মাতিল মানব,
প্লাবনের বক্ষোপরি বাহি তরী
সুখে অভিনব !

বাধা সনে মানুষের
কোলাকুলি আজ !
শ্লথ কটিবন্ধ বাঁধি হর্ষে মাতি
করে রণসাজ !

ভাজনেরে যুদ্ধ দেয়
গাহি জয় গান !
ধ্বংস আর নাশ হয় লজ্জাহত
বিগতসম্মান !

শিরায় শিরায় করে
পৌরুষ বিলাস !
উগ্র মদিরা সম নাচে রক্তে
কঠিন উল্লাস !

ব্যর্থ শুধু নর্ম্মদাস
পড়ি গৃহকোণে,
উত্থানশক্তিহীন, পরাঙ্মুখ
সুযোগগ্রহণে !

ধন্য অতিপ্রবর্ষিনী,
বিদ্যুৎহাসিনী !
ধন্য আনন্দ-ভৈরবী-ভীমা,
বীর্য্য-বিকাশিনী।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

উলট-পুরাণ

(পরশুরাম রচিত)

—•:•:•—

রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিষ্টার ক্র্যাম (পণ্ডিত মহাশয়) এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ।

ক্র্যাম। চট্‌ পট্‌ নাও, চারটে বাজে। ডিক, ইতিহাসের শেষটুকু পড়ে ফেল।

ডিক। 'ইউরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে দ্বেষ হিংসা বিবাদ দূর হইয়াছে। প্রবল-পরাক্রান্ত ভারত-সরকারের দোর্দ্দণ্ড-শাসনের সুশীতল ছায়ায়'—দোর্দ্দণ্ড মানে কি পণ্ডিত মশায়?

ক্র্যাম। 'দোর্দ্দণ্ড' জান না? The big rod. Under the soothing influence of the big rod.

ডিক। 'সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া সমস্ত ইউরোপ ধন্য হইয়াছে। আয়ারল্যাণ্ড হইতে রুশিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড হইতে সিসিলি, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স এখন আর জার্ম্মানীর গলা কাটিতে চায় না, ইংল্যাণ্ড আর জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইতে পারে না, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী আর মেতি-পুকুরের দখল লইয়া মারামারি করে না।' মেতি-পুকুর কোন্‌টা পণ্ডিত মশায়?

ক্র্যাম। ঐ সামনে মানচিত্র রয়েচে দেখনা। ইটালির কাছে যে সমুদ্র সেইটে। সেকালে নাম ছিল মেডিটেরেনিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ করতে পারেনা ব'লে নাম দিয়েচে মেতি-পুকুর। সেই রকম অল্‌ষ্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে বলে ছুছুরাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেষ্টারকে বলে নিম্‌তে। তার পর পড়ে যাও।

ডিক। 'ইউরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে পরকালের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। ভারতসন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।' আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, এসব কি সত্যি?

ক্র্যাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেচে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্চে তখন সত্যি বৈকি।

ডিক। কিন্তু বাবা বলেন সব bosh.

ক্র্যাম। তোমার বাবার আর বল্‌তে বাধা কি। তিনি হলেন উকিল, আমার

মতন তো আর সরকারের মাহিনায় নির্ভর করতে হয় না।

ডিক। 'হে সুবোধ ইংরাজ-শিশুগণ, তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে ভারত-সরকার তোমাদের দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যাহাতে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও।'

টম। বু—হু হু হু—

ক্র্যাম। ও কি রে, শীত করচে বুঝি? আবার তুই ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেচিস! বাঙ্গালীর নকল করতে গিয়ে শেষে দেখ্‌চি নিউমোনিয়ায় মরবি।

টম। বাবার হুকুম পণ্ডিত মশায়। আজ পাঠশালের কেরৎ খাঁ-সায়েব গবসন টোডির পার্টিতে যেতে হবে। তিনি নূতন খেতাব পেয়েচেন কি না। সেখানে বিস্তর ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আসবেন, তাই বাবা বল্লেন দেশী পোষাক পরা চল্‌বে না।

ক্র্যাম। তা বাঙ্গালী সাজতে গেলি কেন? ইজের চাপকান পরলেই পারতিস।

টম। আজ্ঞে, বাবা বল্লেন, বাঙ্গালীই সবচেয়ে সভ্য তাই—ব্র র্‌ র্‌ র্‌—

ক্র্যাম। যা যা শীগ্‌গির বাড়ী যা, অন্ততঃ একটা শাল মুড়ি দিগে যা। ও কি, হোঁচট খেলি নাকি?

হ্যারি। দেখুন, দেখুন টম কি রকম কাছা দিয়েচে, যেন স্কিপিং রোপ!

'দি কিংডম্ কাম্' হইতে উদ্ধৃত।

সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছে। ভারত-সরকার আমাদের ধন প্রাণ হস্তগত করিয়াছেন,—আমরা নিরীহ ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় তাহাতে কোনো উচ্চবাচ্য করি নাই, কারণ ইহলোকের পাঁউরুটি ও মাছের উপর আমাদের লোভ নাই এবং সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দেওয়াই শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু আজ এ কি শুনিতেছি? আমাদের ধর্ম্মের উপর হস্তারোপ! ঘোড়-দৌড় বন্ধ করার জন্য আইন হইতেছে। অ্যাসকট, এপ্‌সম্ প্রভৃতি মহাতীর্থ কি শেষে শ্মশানে পরিণত হইবে? বিশপ টোলিব্রোক নাকি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ নাই অতএব রেস বন্ধ করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের হানি হইবে না। হা, একজন ধর্ম্মযাজকের মুখে এই কথা শুনিতে হইল! বিশপ কি জানেন না যে, রেস খেলা বৃটিশ-জাতির সনাতন ধর্ম্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও উপর? আরো ভয়ানক সংবাদ—শীঘ্রই নাকি মদ্যপান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন হইবে। হোলি জিসস্, মদ্য যে তোমারই রক্ত প্রভু! তাহা পান করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। দয়াময়, তৃষ্ণার্ত্ত আমরা, আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না।

'রাষ্ট্রবিদ—যাহার সঙ্গে সংযুক্ত আছে ইঙ্গবন্ধু'—হইতে উদ্ধৃত।

'আমরা খাঁ সাহেব গবসন টোডিকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি

ভোমষ্টাট প্রাসাদ।
প্রিন্স ভোমষ্টাট ও ল্যাং প্যাং।

বঙ্গ ঔজিয় পাঠশালা।
টিচার—ক্র্যাম।

স্যার গবসন টোডির বাড়ী।

ফ্ল্যাপি, ফ্লাফি ও জোছনাদি।
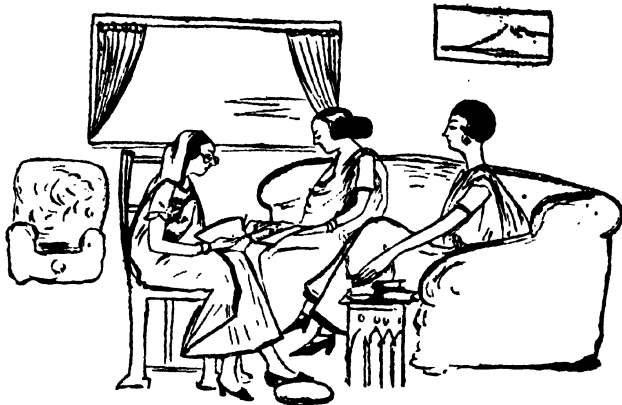
রিজেন্ট পার্ক (টি্রকৃসি টার্ণ কোট)।

অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। দেশীলোকের ভাগ্যে এত বড় উপাধি এই প্রথম মিলিল। আমরা কিন্তু সরকারকে সাবধান করিতেছি—এই সকল উচ্চ উপাধি যেন বেশী সস্তা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং তাহাতে ইউরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। নাইট, ব্যারণ, মার্কুইস, ডিউক প্রভৃতি দেশী উপাধিই সাহেবদের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা হোক, মিষ্টার টোডি যখন নিতান্তই খাঁ সাহেব টোডি হইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার অতি সন্তর্পণে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা উচিত। আশা করি তিনি রাজ-দ্রোহী লিবার্টি লীগের ছায়া মাড়াইবেন না।

গবসন্ টোডির অন্দর মহল। মিসেস টোডি', তাঁহার দুই কন্যা ফ্লুফি ও ফ্ল্যাপি, এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা দি।

জোছনা। ফ্ল্যাপি, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠিনি বাছা। ওই রকম ক'রে বুঝি চুল বাঁধে? আহা কি ছিরিই হয়েচে! কাণ-দুটো যে সবটাই বেরিয়ে রয়েচে। এতখানি বয়স হ'ল কিছুই শিখলে না। দেখ দিকি, তোমার দিদি কি সুন্দর খোঁপা বেঁধেচে।

ফ্ল্যাপি। Let her. কাণের ওপর চুল পড়লে আমি কিছু শুনতে পাই না। আমি ঘাড় ছাঁটবো, ও বাড়ীর মিস ল্যাংকি গসলিঙের মতন।

জোছনা। হ্যাঁ, ঘাড় ছাঁটবে, ন্যাড়া হবে, ভুরু কামাবে, রূপ একবারে উথলে উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি। পড়তে শাশুড়ীর পাল্লায়—

ফ্ল্যাপি—Little Pussy Friskers
Shaved off her whiskers;
And sharpening her paw
Scratched her mum-in-law.

জোছনা। কি বেহায়া মেয়ে! মিসেস টোডি, আপনার ছোট মেয়েকে দুরস্ত করা আমার সাধ্য নয়।

মিসেস টোডি। ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারি বেয়াড়া হচ্চ। জোছনা-দি তোমাদের শিক্ষার জন্যে কত মেহনত করেন তা বোঝো?

ফ্ল্যাপি। আমি শিখতে চাইনা। উনি ফ্লফিকে শেখান না।

জোছনা। আবার 'ফ্লফি'! দিদি বলতে কি হয়? অ্যাঁ ও কি;—ফের তুমি পেন্সিল চুষ্‌চো! ছি ছি কি নোংরা। আচ্ছা, এখন তুমি ও ঘরে গিয়ে সেই উর্দ্দু গজলটা অভ্যাস কর।

মিসেস্ টোডি। জোছনা দি, আপনার ডিবে থেকে একটা পান নেব? থ্যাঙ্ক ইউ।

জোছনা। দেখুন মিসেস্ টোডি, কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ—প্লিজ—সরি এগুলো বলবেন না। ভারি বদ অভ্যাস। এর জন্যই আপনাদের জাতের উন্নতি হচ্চে না। ও রকম তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা

বা দুঃখ জানানো আমরা ভণ্ডামি বলে মনে করি। নিন, একটু দোক্তা খান।

মিসেস্ টোডি। নো, থ্যাঙ্কস্—থুড়ি। দোক্তা খেলেই আমার মাথা ঘোরে। বরং একটা সিগারেট খাই।

জোছনা। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। আপনি একটু চেষ্টা ক'রে দোক্তা ধরুন।

মিসেস টোডি। কিন্তু দু-ইত হ'ল তামাক?

জোছনা। তা বল্লে কি হয়। একটা হ'ল ধোঁয়া, আর একটা হ'ল ছিব্ড়ে। ধোঁয়া পুরুষের জন্যে, আর ছিব্ড়ে মেয়েদের জন্যে। ফ্লফি, তোমার সেই উপন্যাসখানা শেষ হয়েচে?

ফ্লফি। বড় শক্ত, মোটেই বুঝতে পারচি না।

জোছনা। বোঝবার বিশেষ দরকার নেই, কেবল বাছা বাছা জায়গা মুখস্ত ক'রে ফেল্‌বে। লোককে জানানো চাই যে বাংলা ভাল ভাল বইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমার উচ্চারণটা বড় খারাপ। সভ্য সমাজে মিশ্‌তে গেলে চোস্ত বাংলা উচ্চারণটা আগে দরকার, আর গোটাকতক উর্দ্দু গান। আচ্ছা, তুমি বাংলায় এক দুই তিন চার বলে যাও দিকি।

ফ্লফি। এক দুই তিন শাড়—

জোছনা। শাড় নয়, চার।

ফ্লফি। চার পাইচ—

জোছনা। পাইচ নয়, পাঁচ।

ফ্লফি। পাঁইশ—

জোছনা। পাঁ—চ।

ফ্লফি। ফ্যাঁচ—

জোছনা। মাটি কল্লে। মিসেস টোডি, ফ্লফিকে বেশী চকোলেট খেতে দেবেন না, ছোলা-ভাজার ব্যবস্থা করুন, নইলে জিভের জড়তা ভাঙ্গবেনা। দেখ ফ্লফি, আর এক কাজ কর। বার বার আওড়াও দিকি—রিশ্‌ড়ের আড়পার খড়দর ডান ধার—ছাঁদনাতলায় হোঁৎকা হোঁদল।

নেপথ্যে গবসন টোডি। ডিয়ারি—

মিসেস টোডি। উ। কোথায় তুমি?

গবসন টোডি। বাথ রুমে। আরো গোটাকতক আম দিয়ে যাও।

জোছনা। বাথরুমে আম?

মিসেস টোডি। তা ভিন্ন আর উপায় কি। গবি বলে, আম যদি খেতে হয় তবে ভারতীয় পদ্ধতিতেই খাওয়া উচিত। অথচ আপনাদের মতন হাত দুরস্ত নয়,—পোষাক কার্পেট টেবিলক্লথে রস ফেলে একাকার করে। তাই গবিকে বলেচি বাথরুমে গিয়ে আম খাওয়া অভ্যাস করতে। সেখানে দু'হাতে আঁটি ধ'রে চুষ্‌চে আর চোয়াল বয়ে রস গড়াচ্ছে। Horrid!

জোছনা। ঠিক ব্যবস্থাই করেচেন। দেখুন মিসেস্ টোডি, আপনি যে স্বামীকে 'গবি' বলচেন, ওটা সভ্যতার বিরুদ্ধ।

আড়ালে গবি হাবি যা খুসি বলুন, কিন্তু অপরের কাছে নাম উচ্চারণ করবেন না। দরকার হ'লে বলবেন—'উনি'। আর যদি অতটা খাতির না করতে চান, তবে বলবেন—'ও'।

মিসেস্ টৌডি। তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি বসুন একটু। আমি ওকে আম দিয়ে আসচি।

'রাষ্ট্রবিদ্' এর বিজ্ঞাপন স্তম্ভ হইতে।

বিশুদ্ধ আনন্দ-নাড়ু। চর্ব্বি-মিশ্রিত ইংরাজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দ-নাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুঁড়া ও গুড়। যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। নির্ম্মাতা—রসময় দাস, টিকৃটিকি বাজার, কলিকাতা।

অম্বুরী বরুণ। মেমগণের দুঃখ এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাসে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতন রং হইবে। যদি আর একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বেদ্দিগ্রীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজি উহা মাখিতেন। দাম প্রতি পুরিয়া পাঁচ শিলিং। বিক্রেতা—সেখ অজহর, লেডেনহল ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত।

আগামী আশ্বিন মাসে এই লণ্ডন নগরে বিরাট রাজসূয়-যজ্ঞ বসিবে। স্বয়ং মহাক্ষত্রপ ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন। হোতা ঋত্বিক, মোল্লা, মওলানা প্রভৃতি ভারত হইতে আসিবেন। দুইমাস ব্যাপিয়া দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিবে, খরচ যোগাইবে অবশ্য এই গরীব ইউরোপবাসী।

সমস্ত ইউরোপের শোষণকার্য্য অবিরামগতিতে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। ভারত-মাতা তাঁহার খরজিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বলিতেছেন—হে সপত্নীপুত্রগণ, আনন্দ কর, আর একবার ভাল করিয়া তোমাদের হাড় চাটিব।

ঠিক ঐ সময়েই হাগ-নগরে প্যান-ইউরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের অধিবেশন হইবে। হে বৃটন, জন-অ'-গ্রোট্‌স্ হইতে ল্যাণ্ডস্-এণ্ড্ পর্য্যন্ত যে যেখানে আছ, দলে দলে এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মিলনে যোগ দাও। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে তবে রাজসূয়-যজ্ঞের ত্রিসীমায় যাইও না। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যাণ্ড—যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ্ নাই, মাখম নাই, পনীর নাই,—এই-বার বীয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে

গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটা মাত্রই পাঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বল-রূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কার্পাস-বস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে। হায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছ। তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা-ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে। বীয়ার হুইস্কির আস্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শনৈঃ শনৈঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্ব্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে। তুমি ডিসেম্বরের শীতে পর্য্যাপ্ত কয়লার অভাবে হি-হি করিয়া শিহরিতেছ, ওদিকে তোমারই অর্থে শেভিয়ট্ হিলে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়াইয়া কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কারণ ভারতীয় আমলাগণ শীতকালে সেখানে অফিস করিবেন,—লণ্ডনের শীত তাঁদের বরদাস্ত হয় না।

হে বহুধা-বিভক্ত আত্মকলহপরায়ণ ইউরোপীয়গণ, এখনো কি তোমরা তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিবে না? এখনো কি অ্যাংলো সেল্টিক দ্বন্দ্ব, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বন্ধ হইবে না?

হাইড পার্ক। বক্তা—সার ট্রিক্সি টার্ণকোট। শ্রোতা—তিন চার হাজার লোক।

টার্ণকোট। মাই কন্ট্রিমেন, তোমরা আজ আমাকে যে দু-চার কথা বলবার সুযোগ দিয়েচ তার জন্যে বহু ধন্যবাদ। তোমাদের আমি কি বলে সম্বোধন কর্‌বো খুঁজে পাচ্চি না, কারণ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েচে। হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশবাসী ভগবানের নির্ব্বাচিত মানবগণ, হে বৃটন-স্যাক্‌সন-ডেন-নর্মান-বংশোদ্ভব ইংরেজ জাতি—

ম্যাক্‌ডুড্‌ল্। ইংরেজ নয়, বলুন বৃটিশ জাতি। স্কচ্‌রা কি ভেসে এসেচে নাকি?

টার্ণকোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে বৃটিশ জাতি, একবার তোমাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর। হে হেষ্টিংস্-ক্রেসি-এজিন্‌কোর্টের বীরগণ, যাদের বিজয়-পতাকা একদিন ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্সে—

ম্যাকডুড্‌ল্। মিথ্যে কথা। স্কটল্যাণ্ডে তোমাদের বিজয়-পতাকা কোনো কালে ওড়েনি।

টার্ণকোট। আচ্ছা, আচ্ছা, স্কটল্যাণ্ড বাদ দিলুম। যাদের বিজয় পতাকা একদিন আয়ারল্যাণ্ড ফ্রান্সে—

ও’হুলিগান।—O Ireland! Say it again!

টার্ণকোট। আচ্ছা আচ্ছা। বিজয়-পতাকা কোথাও ওড়েনি। হে ইংলিস-স্কচ-আইরিশ-মিশ্রিত বৃটিশ জাতি—

ও' হুলিগান। Begorrah! আমরা বৃটিশ নই,—সেল্‌টিক।

টার্ণকোট। আচ্ছা আচ্ছা। হে বৃটিশ ও সেল্‌টিক ভাই সকল, আজ তোমরা কেন এখানে সমবেত হয়েচ?

ও' হুলিগান। Sure, oi don't know.

টার্ণকোট। কেন এখানে সমবেত হয়েচ তাও কি ব'লে দিতে হবে? হে হতভাগ্যগণ, তোমাদের এই পৈতৃক দেশের বুকের ওপর কোন্ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্চে তার খবর রাখ? রাজসূয়-যজ্ঞ। ভারত-সরকার মহা-আড়ম্বর ক'রে তাঁর ঐশ্বর্য্য এবং পরাক্রমের পসরা খুলে বসবেন, আর সমস্ত ইউরোপের গণ্য-মান্য ব্যক্তি এসে মহাক্ষত্রপকে কুর্ণিস করে বলবেন—ভারত সরকার কি জয়! এই আউট্‌লাণ্ডিশ্ কাণ্ড, এই স্যাক্রিলেজ—

(লর্ড ব্লার্ণির বেগে প্রবেশ)

লর্ড ব্লার্ণি জনান্তিকে।—আরে তুমি কি বলচ সার ট্রিক্‌সি! নিজের সর্ব্বনাশ করচ? আমি কত করে ক্ষত্রপকে বলে কয়ে এসেচি যেন Chiltern Hundreds এর দেওয়ানিটা তোমাকেই দেওয়া হয়। কি আরামের চাকরি, একবারে Sine cure. ক্ষত্রপের ইচ্ছে চাকরিটা টোডিকে দেন, কিন্তু আমার একান্ত মিনতি শুনে বলেচেন বিবেচনা করে দেখবেন। এখনি খবর আসবে, আর এদিকে তুমি রাজদ্রোহ প্রচার করচ!

টার্ণকোট। বটে, বটে? আচ্ছা আমি সাম্‌লে নিচ্চি।

জনতা হইতে। Go on Ticksy, go on.

টার্ণকোট। হ্যাঁ, তারপর কি বলছিলুম—হে আমার দেশবাসীগণ, এই ঘোর দুর্দ্দিনে তোমাদের কর্ত্তব্য কি? তোমরা কি এই যজ্ঞে, এই বিরাট তামাসায় যোগ দেবে?

জনতা হইতে। Never never.

বিল্ স্নুক্‌স্। Say guv'nor, will they stand treat? মদ ক' পিপে আসবে?

টার্ণকোট। এক ফোঁটাও নয়। কেবল বাতাসা বিলি হবে। হে বন্ধুগণ, এই মহাযজ্ঞে তোমাদের স্থান কোথায়?

লর্ড ব্লার্ণি। আঃ, কি বলচ টার্ণকোট!

টার্ণকোট। ঘাব্‌ড়ান কেন, শুনুন না। হে বন্ধুগণ, এই বিরাট যজ্ঞে কি তোমরা যাবে?

জনতা হইতে। বরং শয়তানের কাছে যাব।

টার্ণকোট। না, না, সেটা ভাল দেখাবে না। তোমাদের যেতেই হবে,—না গিয়ে উপায় নেই, কারণ ভারত-সরকার স্বয়ং তোমাদের আহ্বান করচেন।

লর্ড ব্লার্নি। হিয়ার, হিয়ার।

জনতা হইতে। মিয়াও, মিয়াও।

টার্ণকোট। দোহাই, তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। মনে রেখ, ভারতের সহানুভূতি না পেলে আমাদের গতি নেই,—আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর কচ্চে সরকারের দয়ার ওপর—(পচা ডিম)—এঃ, চোখ্‌টা খুব বেঁচে গেছে। হে বন্ধুগণ, আমি কর্ত্তব্য-পালনে ভয় খাই না, যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই অকপটে বল্‌ব।

লর্ড ব্লার্নি। বাঃ, ঠিক হচ্চে। ঐ যে, টেলিগ্রাম নিয়ে আসচে। ব্রেভো সার ট্রিক্‌সি, নিশ্চয় ক্ষত্রপ তোমাকেই মনোনীত করেচেন। আমি পড়ে দেখছি, তুমি থেমো না, বক্তৃতা চলুক।

টার্ণকোট। হে ভাই সকল, আমি যা বল্‌চি তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই।—ব্লার্নি, খবর কি হে?—হে প্রিয় বন্ধুগণ, দেশের মঙ্গলের জন্ম আমি সকল রকম লাঞ্ছনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তোমাদের ঐ বেড়াল-ডাক আমারই জয়ধ্বনি। তোমাদের এই পচা-ডিম আমি মাথা পেতে নিলুম। যদি তোমাদের তুণীরে আরো কিছু নিগ্রহের অস্ত্র থাকে—(বাঁধাকপি)—নাঃ, আর পারা যায় না! ব্লার্নি, বল না হে, কি লিখ্‌চে?

ব্লার্নি। পুওর ট্রিক্‌সি! শেষটায় টোডি ব্যাটাই চাকরি পেলে। নেভার মাইণ্ড, তুমি হতাশ হয়ো না। আবার একটা সুবিধে পেলেই তোমার জন্য চেষ্টা করব। ক্ষত্রপটা অতি গাধা। এটা বুঝলেনা যে টোডি ত পোষ মেনেই আছে। আর তুমি হ'লে এতবড় একটা ডিমাগগ,—তোমাকে হাত করবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে! ছি ছি!

টার্ণকোট। ড্যাম টোডি এণ্ড ড্যাম ক্ষত্রপ। হে আমার স্বদেশবাসীগণ—

জনতা হইতে। Shut up! kick him—lynch the traitor.

টার্ণকোট। না, না, আগে আমাকে বল্‌তেই দাও। এই রাজসূয়-যজ্ঞে তোমাদের যেতেই হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারত-সরকারের জয় জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পণ্ড করতে, লণ্ড ভণ্ড করতে,—ভারত-সরকার যেন বুঝতে পারে যে তামাসা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

জনতা হইতে। Long live Tricksy! Turnooac for ever!

নারী-জাতির মুখপত্র 'দি শি-ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

কাল বৈকালে ঠিক তিনটার সময় নিখিল-বৃটিশ-নারী-বাহিনীর শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রিজেণ্ট-পার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পোর্টল্যাণ্ড প্লেস, রিজেণ্ট

ষ্ট্রীট, পিকাডিলি সার্কস, ট্রাফালগার স্কোয়ার হইয়া এই বিরাট প্রসেশন পার্লিমেণ্ট হাউসে পৌঁছিবে।

হাজার হাজার বৎসর হইতে পুরুষজাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আর তাদের চালাকি চলিবে না। আমরা সবলে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইব। আমরা ভোটের অধিকার যাহা পাইয়াছি তাহা একেবারে ভুয়া। জুয়াচোর পুরুষগণ ছলে বলে কৌশলে ভোট যোগাড় করিয়া রাষ্ট্রীয়-পরিষদ প্রায় একচেটে করিয়াছে। এ ব্যবস্থা চলিবে না। বৃটেনের লোকসংখ্যায় শতকরা ষাটজন নারী। আমরা এই অনুপাতেই নারী-সদস্য চাই। সরকারী চাকরীতেও আমরা শতকরা ষাট জন নারী চাই। পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগার খাই, ককটেল টানি। এরপর দরকার হয়ত মুখে কেশতৈল মাখিয়া গোঁফ দাড়ি গজাইব। পুরুষের সহিত কোনো কারবার রাখিব না, কারণ ওরূপ কুটিল স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তারা মনে করে এই জগৎটা পুরুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাদের ভগবান পর্য্যন্ত পুংলিঙ্গ। আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়ানা, কালী অথবা শূর্পনখা—এঁদের দ্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।

হে নারী, তুমি আর অবলা সরলা niminy piminy গৃহিনী নহ। তুমি দাঁত নখ শানাইয়া এস, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে এই মহাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্লিমেণ্ট আক্রমণ কর। অকর্ম্মণ্য পুরুষদের তাড়াইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে আপন অধিকার আদায় করিয়া লও।

পুরুষজাতির মুখপত্র 'দি মিয়ার ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

সরকার কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কাল এই লণ্ডন সহরের উপরে যে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গেল তাহাতে বোধ হয় যেন দেশে অরাজকতা উপস্থিত। দুর্ব্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে বিষম অত্যাচার করিয়াছে, দোকান পাট ভাঙিয়া তছ-নছ করিয়াছে, নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জ্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া-পুলিস তখন কি করিতেছিল? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—'হী—হ-হ-হ-হ।' খাঁ সাহেব গবসন টৌডি, সার ট্রিকসি টার্ণকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গা-নিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জ্জেণ্টরা তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে—'এ সাহেব-অ, ওপাকে যিব ত ডণ্ডা খিব।'

সরকার নিশ্চয় এই ব্যাপারে মনে মনে

খুসি হইয়াছেন, কারণ দেশে আত্মকলহ যত হয় ততই সরকারের বলিবার ছুতা হয় যে আমরা স্বায়ত্ব শাসনের অযোগ্য।

'রাষ্ট্রবিদ্‌' হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজগণের মধ্যে যদি কেহ বুদ্ধিমান থাকেন তবে এইবার বুঝিবেন যে তাঁদের স্বাধীনতার আশা সুদূরপরাহত। লিবার্টি-লীগ, অ্যাংলো-সেল্টিক ইউনিয়ন, হেটেরো-সেক্সুয়াল প্যাক্ট—এ সব শুনিতে বেশ। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের রক্ত যখন দ্বেষ-হিংসায় গরম হইয়া উঠে তখন আর তত্ত্ব-কথায় চলে না। যখন দাঙ্গা বাধে, তখন একমাত্র ভরসা ভারত-সরকারের দণ্ডনীতি এবং দুর্দ্দান্ত উড়িয়া পুলিস।

কেবলি শুনিতে পাই—স্বায়ত্ব-শাসনে বৃটিশ জাতির জন্মগত অধিকার। কিন্তু হে বৃটন, তোমাদের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা কখনই জানিতে না। প্রথমে রোমান-গণের, তারপর অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, ডেন, নরম্যান প্রভৃতি বিবিধ দস্যু জাতির অধীনতায় তোমাদের দিন কাটিয়াছে। যারা বিজেতারূপে তোমাদের দেশে আসিয়াছে, পরে তারাই আবার অন্য জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে। আজ কে বিজেতা কে বিজিত বুঝিবার উপায় নাই—তোমরা কেহই নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পার নাই। তোমাদের জাতির স্থিরতা নাই, দেশ নিজের নয়, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নিজের নয়। একতা তোমাদের মধ্যে কোন কালেই নাই। সামাজিক আর্থিক কতরকম দলাদলি তোমাদের আছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র বৃটেনের যখন এই অবস্থা, তখন সমস্ত ইউরোপের কথা না তোলাই ভাল। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম ইউরোপকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারত-সরকারের শাসনেই এই মহাদেশ ঠাণ্ডা হইয়া আছে। তোমরা আগে একটু সভ্য হও, তারপর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিও। তোমরা মদে ও জুয়ায় ডুবিয়া আছ, বর্ব্বরের মত তোমরা এখনও নাচিয়া থাক, স্নান করিতে ভয় খাও, আহারের পর কুলকুচা কর না। এখন কিছুকাল শান্ত শিষ্ট হইয়া সর্ব্ব-বিষয়ে ভারতের অনুগত হইয়া চল, তার পর যথাসময়ে তোমাদের অধিকার দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

ভোমষ্টাট প্রাসাদ। প্রিন্স ভোম, চৈনিক পর্য্যটক ল্যাং প্যাং এবং প্রিন্সের খানসামা কোবল্ড।

প্রিন্স ভোম। আচ্ছা হের্ প্যাং, আপনি ত নানা দেশ বেড়িয়েচেন,—আমা-দের এই রাজ্যটা আপনার কেমন লাগচে?

ল্যাং প্যাং। মন্দ নয়। মাঠ আছে, জল আছে, রুটি আছে, ঘাস আছে, শুয়োর ভেড়া আছে। কিন্তু দেশের লোক যেন সব ঝিমিয়ে রয়েচে। কেন বলুন ত?

প্রিন্স। ঐ ত মজা। সমস্ত ইউরোপে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখেচেন,

এখানে তার কিছুই পাবেন না। ভারত-সরকার বলেন—আমাদের খাস রাজ্যে আমরা ইচ্ছামত প্রজাদের একটু আস্কারা দেব, আবার রাশ টেনে ধরব। কিন্তু তুমি নাবালক, ও-রকম করতে যেও না, মারা যাবে। তোমার রাজ্যে গোলযোগ দেখলেই তোমায় কাণ ধ'রে বার ক'রে দেব। তাই রাজ্য শুদ্ধ মৌতাতের ব্যবস্থা করে দিয়েচি,—সব ভোম হয়ে আছে। কোবল্ড্, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠচে। আহা, কি জিনিষই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আবিষ্কার করে-ছিলেন হের্ প্যাং!

ল্যাংপ্যাং। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে জন্মায় না। যা খাচ্চেন তা ভারতে আপনাদের জন্যই উৎপন্ন হয়।

(প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারন ফন ডোপের প্রবেশ)

ফন ডোপ। মহারাজ, ইংল্যাণ্ড থেকে সার ট্রিক্সি টার্ণকোট দেখা করতে এসেচেন।

প্রিন্স। আঃ জ্বালালে। একটু যে শুয়ে শুয়ে আরাম করব তার জো নেই। নিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ড, আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে ত।

ল্যাং প্যাং। আমি তা হলে এখন উঠি—

প্রিন্স। না; না, বসুন। আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলা-কাৎ করি। একে একে অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না, একসঙ্গেই পাঁচ সাত জনের দরবার শুনি। তাতে মেহনৎ কম হয়, গল্পগুজবও ভাল জমে।

(টার্ণকোটের প্রবেশ)

প্রিন্স। হা ডু ডু সার ট্রিকসি? বসুন ঐ চেয়ারটায়। তার পর খবর কি বলুন।

টার্ণকোট। প্রিন্স, আপনাকে হাগ যেতে হবে, প্যান-ইউরোপিয়ান লিবার্টি লীগের সভাপতিরূপে।

প্রিন্স। মাইন গট্! এ বলে কি? কোবল্ড, আর এক গুলি দে বাবা।

টার্ণকোট। আচ্ছা, সভাপতি হতে আপত্তি থাকে, না হয় অমনিই যাবেন। না গেলে আমরা ছাড়চি না।

প্রিন্স। হাগ যাব? খেপেচেন নাকি?

টার্ণকোট। কেন, তাতে বাধা কি? এই ত ভাইকাউণ্ট পফ, কাউণ্টেস্ গ্রিমাল্কিন্, গ্রাণ্ডডিউক প্যাণ্ডানড্রাম—এঁরা সব যাচ্ছেন।

প্রিন্স। আরে তাদের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা হ'ল নগণ্য ভারতীয় প্রজা, ইচ্ছে করলে জাহান্নামে যেতে পারে। আর আমি হলুম একজন স্বাধীন সামন্ত নরপতি, যাব বল্লেই কি যাওয়া যায়? যদি মহাক্ষত্রপের হুকুম নিতে যাই ত বলবেন—ব্যাটা এক্ষুণি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাও।

টার্ণকোট। তবে কথা দিন, রাজসূয়-যজ্ঞেও যাবেন না।

প্রিন্স। গট্ ইন হিম্মেল্! আপনার দেখচি মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। রাজসূয়-যজ্ঞে যাবার জন্যে ছ-মাস ধরে আয়োজন করচি, কোটি খানেক টাকা খরচ হবে,—আর আপনার আবদার শুনে সব এখন ভেঙে দি! হাঁ,—ভাল কথা—ব্যারণ, জগঝম্প সব ক'টা ঠিক আছে ত? সতরটা গুণে দেখেচ?

ব্যারন ফন ডোপ। আজ্ঞে হাঁ। আমি সব ক'টা রদ্দুরে দিয়ে টন্‌টনে করে রেখেচি।

প্রিন্স। ঠিক সতরটা?

ব্যারন। ঠিক সতর।

ল্যাংপাং। জগঝম্প কি হবে প্রিন্স?

প্রিন্স। বাজবে। যখন আমি যাত্রা করব, সঙ্গে সঙ্গে সতরটা জগঝম্প বাজবে। প্রিন্স ড্রুঙ্কেনডর্কের মোটে তেরটা। আমার সতর।

ল্যাং প্যাং। আপনার অভাব কি, আপনি মনে করলে ত সতরর জায়গায় সাতশ জগঝম্প, জয়ঢাক, চড়বড়ে, কাঁশি, ভেপু, রামশিঙে যা খুসি বাজাতে পারেন।

প্রিন্স। হেঁ হেঁ, জগঝম্প হইলেই হয় না। সরকার যে কো'টি বরাদ্দ করে দিয়েচেন ঠিক সেই ক'টি বাজানো চাই। বেশী যদি বাজাই তবে বিলকুল বাতিল হবে। বাবা কোবন্ড, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে ত!

টার্ণকোট। তা হ'লে আপনি আমার কোনো অনুরোধই রাখলেন না?

প্রিন্স। অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনাদের উদ্যমে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন। ব্যারণ ডোপ, আপনি একটু ও ঘরে যান্ ত। হ্যাঁ,—দেখুন সার ট্রিক্‌সি, আপনাদের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমার এই পৈতৃক রাজ্য তার পৈতৃক-প্রাণটি খোয়াতে পারব না। তবে যদি বেঁচে থাকি, আর আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, আর ইউরোপের জন্য একজন জবরদস্ত এম্পারার কি কাইজার কি ডিক্‌টটার দরকার হয়, তখন আমার কাছে আসবেন। ঐ কাজটা আমাদের বংশগত কি না, বেশ রপ্তগত আছে। তার পর সার ট্রিক্‌সি, এক গুলি খেয়ে দেখবেন নাকি? মাথা ঠাণ্ডা হবে। অভ্যাস নেই? আচ্ছা, তবে এক গ্লাস শ্ন্যাপ্স্ খান।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত।

দুই মাস ব্যাপী হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হইল। ইউরোপের জন সাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছে, অবশ্য জন কতক ধামাধরা ছাড়া। আমরা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং আর কোনো খবর জানি না।

'রাষ্ট্রবিদ্' হইতে উদ্ধৃত।

রাজস্য়ূ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল। তথাকথিত দেশনায়কগণকে রম্ভা-প্রদর্শন করিয়া ইউরোপের জনসাধারণ এই বিরাট উৎসবে যোগ দিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে।

যজ্ঞ উপলক্ষে যাঁরা সরকারকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে স্যর টি্কৃসি টার্ণকোটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনিতেছি বৃটিশ মেষ-বংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার টি্কসি তার প্রেসিডেণ্টরূপে শীঘ্রই কামরূপ যাত্রা করিবেন।

অসীমের খেলা

আমি যে খেলিতে চাই অসীমের খেলা,
সব ঠাঁই সব রূপে জীবন রাখিতে,
যখন প্রখর তাপে ফুটে উঠে বেলা,
গভীর সাগর জলে লহরী মাখিতে।
মৃত্যু শুধু হবে মোর প্রাণের নিমেষ,
উদার প্রাণের দৃষ্টি রাখিতে উজ্জ্বল,
মৃত্যু শুধু নবশক্তি করিয়া উন্মেষ
হবে মোর হোমাগ্নির পবিত্র অনল।
বহে যাবে মৃদু মন্দ কালের বাতাস,
জীবনের দিন হবে লহরীর গতি,
মোর হাসি ভরি রবে সকল আকাশ,
লক্ষ ঠাঁই লক্ষ তারা করিবে আরতি।
আমারেই মনে হবে অনন্ত অশেষ,
অভিন্ন জীবন শুধু ভিন্ন ভিন্ন বেশ।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

———:*:———

মৈথিল কোনও কবির পক্ষে বাঙ্গালী-দিগের সৃষ্ট এই কৃত্রিম কেতাবী ভাষায় কবিতা রচনা করা অসম্ভব। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল পদাবলী যেমন বাঙ্গালা-দেশে প্রচারিত ও পূর্ব্বোক্ত কারণে বিকৃত হইয়া কচিৎ কোন স্থলে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ স্থলে ব্রজবুলীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা গোবিন্দ-নামক অন্য কোন মৈথিল কবির মৈথিলী পদাবলীও বাঙ্গালায় আসিয়া—

"চিকণ কালা গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥"

ইত্যাদির মত পদে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ পদেই ব্রজবুলীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এ কথার উত্তরে বলিব যে, মিথিলার প্রাচীন পুঁথিতে বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিল-আকারেই পাওয়া গিয়াছে, উহার সহিত বিদ্যাপতির বঙ্গীয় ব্রজবুলী পদাবলীর ভাষাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সংস্করণে এই বঙ্গীয় পদগুলির একটা কল্পিত মৈথিল-আকার দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, বঙ্গীয় পদাবলীর 'যছু' 'তছু' 'ঐছন' 'তৈছন' ইত্যাদি শব্দের পরিবর্ত্তে 'জসু' 'তসু' 'ঐসন' 'তৈসন' ইত্যাদির ন্যায় কতকগুলি অবান্তর পরিবর্ত্তন ব্যতীত মূলভাষায় বিশেষ কোন সংশোধন করিতে পারেন নাই; তাঁহার বিশেষ চেষ্টা সত্বেও উহার অধিকাংশ ব্রজবুলীই রহিয়া গিয়াছে; ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ বিদ্যাপতির মৈথিল ও বাঙ্গালার সেই পদগুলি একটু মনোযোগের সহিত পড়িলেই উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষায় একই মহাকবির রচনার লক্ষণাক্রান্ত অন্যূন তিন চারি শত ব্রজবুলী পদাবলীর মধ্যে মিথিলার পুঁথিতে যে মোটে ২০।২৫টী পদ দেখিতে পাইয়াছেন এবং উহার অনেকগুলি হইতেই উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে পূর্ব্বোক্ত লেখার কায়দায় 'যছু' 'তছু' 'যৈছন' 'তৈছন' ইত্যাদি স্থলে 'জসু' 'তসু' 'যৈসন' 'তৈসন' ইত্যাদি ব্যতীত ভাষা-গত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। মৈথিল পুঁথিতেও ঐ পদগুলি খাঁটি ব্রজবুলীই রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সেগুলি যে কোনও বাঙ্গালী-কবির রচনা,

মৈথিল-কবির নহে, ইহা এই ভাষা-গত নিঃসন্দিগ্ধ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালায় গোবিন্দদাসের পদাবলীর যে বিকৃতির উপরে এতটা নির্ভর করিয়াছেন, তিনি সেই বিকৃতির কয়টা উদাহরণ দিতে পারিয়াছেন ? অবশ্য 'যছু' 'তছু' ইত্যাদিকে অশুদ্ধি ও বিকৃতি মনে করিলে প্রত্যেক পদেই এরূপ দশ পাঁচটা অশুদ্ধি ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ভাষা-তত্ত্ববিৎ এগুলিকে অশুদ্ধি বা বিকৃতি মনে করিবেন না। মিথিলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লোকে 'স' ইংরেজী 's' অক্ষরের মত ও 'য' ইংরেজী 'ya' অক্ষরের মত উচ্চারণ করিয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালায় 'স' মৈথিলী ও হিন্দুস্থানীদিগের 'শ' বা ইংরেজী 'sh' এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় 'তসু' 'যসু' লিখিলে অনভিজ্ঞ লোকেরা উহা বাঙ্গালা 'তছু' 'যছু' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে উচ্চারণ করিবে। বাঙ্গালা 'ছ' এর উচ্চারণ বাঙ্গালার পূর্ব্ব-অঞ্চলে ঠিক মৈথিল ও হিন্দীর 'স' এর মত; বাঙ্গালার পশ্চিম অঞ্চলে 'ছ' ঠিক হিন্দী ও মৈথিল 'স' না হইলেও, 'স' এর কাছাকাছি; এজন্যই মৈথিল ও ব্রজভাষার 'জসু' 'তসু' ইত্যাদি বাঙ্গালায় লিপ্যন্তরিত করিতে হইলে 'যসু' 'তসু' না লিখিয়া 'যছু' 'তছু' লিখাই সঙ্গত ও সুবিধাজনক। গুপ্ত মহাশয় মৈথিল ও বাঙ্গালার বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীর এই স্বাভাবিক রূপান্তরকে ভাষাগত পার্থক্য, এবং বাঙ্গালার স্বাভাবিক ও চিরন্তন-প্রথা অনুসারে লিখিত 'যছু' 'তছু' ইত্যাদি শব্দগুলিকে অশুদ্ধি ও বিকৃতি, মনে করিয়া যত গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রকৃত পাঠবৈষম্য যে নাই, আমরা এরূপ অসম্ভব কথা বলি না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, খাঁটি বাঙ্গালা পদে ও বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথির পাঠে অনেক গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। পদ-কর্ত্তা যত প্রাচীন হইবেন, এবং পদাবলী ভাষা ও ভাবের জন্য যত কঠিন ও জটিল হইবে, পাঠভেদও ততই অধিক হইবে। এরূপ হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক; ফলে ঘটিয়াছেও তাহাই। চণ্ডীদাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব এবং গোবিন্দদাসের ভাষা ও ভাবের কাঠিন্য হেতু তাঁহাদের পদে যত পাঠান্তর আছে বাঙ্গালী অন্য কোনও পদকর্ত্তার পদে সেরূপ দেখা যায় না; কিন্তু ঐ সকল পাঠান্তরে ক্রমশঃ ভাষান্তরিত হওয়ার ক্ষীণ-চিহ্নও লক্ষিত হয় না। গুপ্ত মহাশয় প্রকৃত পাঠান্তরের যে দুই চারিটা উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা অমূলক ও ভ্রান্তিজনিত, আমরা যথাস্থলে সেই সকল উদাহরণ ও উহার অপব্যাখ্যার আলোচনা করিব; এখানে ভাষাগত প্রমাণের প্রসঙ্গেই গোবিন্দদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, উহার পোষকতায় গোবিন্দদাসের ভাবগত কতকগুলি অনুকূল প্রমাণ ও

কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিব।

(১) গোবিন্দদাস স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের কিছু কিছু অনুকরণ করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু তিনি বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য রূপ গোস্বামীর অনেক সংস্কৃত কাব্য হইতে অনেক শ্লোকের শুধু অনুকরণ নহে, তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বেরই পরিচায়ক। আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম :—

(ক) পদ-কল্পতরুর ১৩৯ সংখ্যক "সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।" ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদটী 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের "একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(খ) পদ-কল্পতরুর ৬৪৬ সংখ্যক "মঝু মুখ-বিমল-কমল-বর-পরিমলে" ইত্যাদি সুন্দর ব্রজবুলীর পদ 'উদ্ধব সন্দেশ' কাব্যের "মদ্ বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবাণুবন্ধে' ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(গ) পদ-কল্পতরুর ৭১৬ সংখ্যক "সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।" ইত্যাদি পদটী উজ্জ্বল নীলমণির ধৃত— "সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো" ইত্যাদি পদের মর্ম্ম লইয়া রচিত।

(ঘ) পদ-কল্পতরুর ১৬৯১ সংখ্যক "মাথুর-দূত করি গরুতহি মানি।" ইত্যাদি পদ 'হংসদূত' কাব্যের অনুকরণে রচিত।

বিস্তৃতি-ভয়ে আমরা সম্পূর্ণ পদ ও শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; বিশেষার্থী পাঠকগণ মিলাইয়া পড়িয়া দেখিবেন।

(২) আমরা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি যে, শ্রীরাধার সখীদিগের অনুগা-রূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা শুধু শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব; শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত পদ-কর্ত্তা-দিগকেই স্ব-রচিত পদাবলীর ভণিতায় সখী-ভাবে সেবায় নিযুক্ত দেখা যায়। ইহাও তাঁহাদিগের বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক বটে। নিম্নে গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদ হইতে সখী-ভাবে সেবার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

(ক) "গোবিন্দ দাস পহু দরশায়ত"
(৭৪৪ সং পদ)

(খ) "গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত
লাজক জালে আগোর।"
(৯০২ সং পদ)

(গ) "চলইতে দীগ-ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোয়॥"
(৯৮৬ সং পদ)

(ঘ) "বীজন করতহিঁ গোবিন্দ দাস"
(১১১১ সং পদ)

(চ) "আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস।"
(১৩৬৭ সং পদ)

(ছ) "হা হা প্রাণ রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দ দাস করু কোর।"
(১৬১৪ সং পদ)

(জ) "সম্বাদি না আওত গোবিন্দ দাস।"
(১৬৩৭ সং পদ)

(ঝ) "জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস॥"
(১৬৪৮ সং পদ)

(ঞ) "কো কহে কানুক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দ দাস॥"
(১৭৩১ সং পদ)

(ট) "জল-সেবন করু গোবিন্দ দাস।"
(২৭৮৪ সং পদ)

(ছ) "চরণ-সেবন করু গোবিন্দ দাস।"
(২৮২৯ সং পদ)

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিভৃত-লীলায় সেবা করার অধিকার সখী ও সখীর অনুগা ভিন্ন আর কাহারও নাই। পুরুষাভিমানীর পক্ষে এখানে দ্বার রুদ্ধ। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দারভাঙ্গার অধীশ্বর স্বর্গীয় সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভা-কবি হর্ষনাথ ঝা পর্য্যন্ত যত মৈথিল কবির যত পদ দেখা গিয়াছে, উহার কোনটায়ই এরূপ সখী-ভাবে সেবার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই; সুতরাং এ সকল দেখিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ সকল পদের রচয়িতা বাঙ্গালী ছাড়া মৈথিল কবি নহেন।

(৩) আলোচ্য পদাবলীগুলি যে, মৈথিল-কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নহে, উহার আর একটা অভ্যন্তরীণ প্রমাণ এই যে, "মিথিলা গীত-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে আমরা গোবিন্দ ঠাকুরের যে নিঃসন্দিগ্ধ একটী পদ দেখিতে পাই, তাহার ভাষার সহিত 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা-যুক্ত পদগুলির ভাষা বা ভাবের কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না; পক্ষান্তরে গোবিন্দদাসের অন্যূন দুই তিন শত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাষা ও ভাবের এরূপ সাদৃশ্য এবং একজন শ্রেষ্ঠ-কবির নিপুণ-হস্তের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সেইগুলিকে গোবিন্দ ঠাকুর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উচ্চ-শ্রেণীর কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ব্রজবুলী পদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা পদাবলীর কথা ধরা যায়, যথা—"চিকণ কালা গলায় মালা" ইত্যাদি (১৪৯ সং), "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" ইত্যাদি (১৫২ সং), "মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান, মনে সে না লয় আন।" ইত্যাদি (৯০০ সং), "অবলা কি জানি গুণ ধরে।" ইত্যাদি (৬৮১ সং), "এই ত মাধবী-তলে" ইত্যাদি (১৬৭৩ সং); তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, এই সকল উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদেও আমরা সেই শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ-দাসেরই নিজস্ব-ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা জ্ঞানদাসের মত গোবিন্দদাসও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ-রচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। রায় শেখরেও অনেকটা এরূপ কৃতিত্ব দেখা

যায়; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোনও কারণ নাই; তবে ব্রজবুলীর অধিক মিষ্টতার জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, গোবিন্দদাস যে ব্রজবুলী পদের রচনায় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী-কালের পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে যেমন কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ, সেরূপ ব্রজবুলীর স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ-প্রবর্ত্তক বলিয়াও তিনি চির-কাল মান্য হইয়া আসিতেছেন। গুপ্ত মহাশয়ের মত একজন প্রবীণ সাহিত্য-সেবী যে অবিচারে আমাদিগের এই গোবিন্দ-দাসকে তাঁহার ন্যায্য গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত করার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্তই দুঃখিত হইয়াছি। বাঙ্গালীরা ভিন্ন-দেশীয় কবি বা পণ্ডিত-দিগের গুণ-গ্রহণে কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই; মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বঙ্গদেশে যত সমাদর হইয়াছে, এমন বোধ হয়, তাঁহার স্বদেশেও হয় নাই; গুপ্ত মহাশয় বা অন্য কেহ যদি সারগর্ভ আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আলোচ্য ব্রজবুলী পদের রচয়িতা গোবিন্দ কবিরাজ নহেন, সেগুলি কোনও মৈথিল কবির রচনা, তাহা হইলে আমরা সেই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়া লইব। সেরূপ না করিয়া, অবিচারে ঐরূপ একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত করায়, আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছি।

এখন ঐতিহাসিক প্রমাণে আসা যাউক। (১) বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস প্রবীণ বয়সে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে "হরিনাম মহামন্ত্র" গ্রহণ করার পরেই "ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ব্রজবুলী পদটী রচনা করেন। গুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিতে আছে—"গোবিন্দদাস নামধারী বাঙ্গালী কবি মিথিলার কবির ভাষার অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও লীলা বর্ণন করিয়া-ছেন; কিন্তু দুই ভাষায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস যে কেবল শ্রীচৈতন্য-লীলার নহে, শ্রীকৃষ্ণলীলারও অন্ততঃ ১০।৫ টা পদও রচনা করিয়া থাকিতে পারেন,এই কথা স্বীকার করিতেও যেন গুপ্ত মহাশয় অনিচ্ছুক; তাই তিনি ভক্তমালের উক্ত প্রমাণটীকে উড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন—"অতএব এই পদ * শ্রীখণ্ডবাসী গোবিন্দদাসের রচিত প্রমাণিত হইতেছে। এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে ভক্তমাল মূলগ্রন্থ হিন্দীতে নাভা জী রচনা করেন। লালদাস কৃত বাঙ্গালা গ্রন্থ আধুনিক, কতক অনুবাদ, কতক চয়ন। বাঙ্গালা ভক্তমালের টীকায় লেখা যে এই পদ

* পদকল্পতরুর ৩০৩২ সংখ্যক পদ।

অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের পদাবলীতে আছে, এই সঙ্কলন নিতান্ত আধুনিক। পাঠেও প্রভেদ আছে। সে পাঠ এস্থলে উদ্ধৃত হইল, উহা কীর্ত্তনানন্দ হইতে গৃহীত এবং মিথিলার পাঠের অনুরূপ।"

(ক্রমশঃ)

পথের সাথী

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দেড় প্রহরের পর কালী বাবুর মক্কেলকুল বিদায় লইলে তিনি অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীচে-তলার একটা ঘরে তাঁর জন্য আহারের স্থান প্রস্তুত করা ছিল, গৃহিণীর স্বহস্তঃপ্রস্তুত একখানি কার্পেটের আসন (এখন সেখানি অনেকটা পুরাতন হইয়া আসিয়াছে) পাতা, রূপা-মিশ্রিত ভাল খাগড়াই কাঁসার সুমার্জ্জিত গ্লাসে খাবার জল, ঢাকনি দিয়া তার মুখটী ঢাকা, সামনেই একটী দেয়ালগিরিতে আলো জ্বলিতেছে, মাথার উপর একখানা সরু কাঠির বোনা মাদুর-আঁটা টানা পাখা। পাখার দড়ি ধরিয়া একটা চাকর বারান্দায় বসিয়া আস্তে আস্তে টানিতেছিল এবং এই পাখার দড়ির অনিবার্য্য স্পর্শশক্তির অমোঘফলে এই সন্ধ্যা-রাত্রেই ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই ঘরেরই একধারে দুখানা আসন পাতিয়া সুমতী ও মলয় তাদের হাতের সেলাই দুইটা লইয়া বসিয়া গিয়াছিলেন, সুমতীর এই নিয়ম বরাবরের। যতক্ষণ স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, চুপ করিয়া শুইয়া বসিয়া সেই সময়টুকুর অপব্যয় করা তাঁর নিয়ম নয়। অনলস-প্রকৃতি সুমতী তাঁর সকল কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকেই শিল্প ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া সময়কে চিরদিনই সার্থক করিয়া থাকেন।

মলয়া আজই নূতন করিয়া একটা চওড়া প্যাটার্ণের ড্রনথে ডের কাজ মায়ের কাছে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নিজে সূচ চালাইয়া কোথাও ভুল করিয়া, কোথাও ভুলের সন্দেহের সে মায়ের কাছে বারম্বার দেখাইয়া লইতেছিল। সুমতীও সস্নেহে সহিষ্ণুতার সহিত মেয়েকে শিখাইয়া

দিতেছিলেন। নিজেও তিনি একটা কুড়ি নং সূতার বড় টেবিলক্লথ বুনিতেছিলেন। সুমতীর বড় ছেলে হিরণ্ময় বিলাতে সিবিল-সার্ব্বিস্ দিতে গিয়াছে, তারই ভবিষ্যৎ নূতন বাসার ড্রইংরুমের টেবিলে পাতার উদ্দেশ্য লইয়া মা তাঁর প্রাণের ঐকান্তিক কামনা মিশ্র আশীর্ব্বাদের সহিত এই সব টুকিটাকি এখন হইতেই তৈরি করিতে বসিয়া গিয়াছেন। শুধু কি তাই! আবার গোপনে গোপনে তার ভবিষ্য বধুর জন্তও এটা সেটা কেনা কাটাই কি না হইতেছিল?

কালীকুমার বাবুর ভিতরে আসার সাড়া পাইয়াই মলয়া ডাকিল—

"ঠাকুর!"

একটু পরেই একটা দরজা দিয়া কালিবাবু এবং আর একটা দিয়া বামুন ঠাকুর খাবারের থালা হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। সুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তরকারী সব গরম আছে?"

বিষ্ণু ঠাকুর থালা নামাইয়া তার উপরকার বাটীগুলি সাজাইয়া দিতেছিল। সুমতীর প্রশ্নে যেন একটু আহতভাবে উত্তর করিল—

"আজ্ঞে মাঠাক্‌রুণ! একবারের তরে যে আজ্ঞে করেচেন, বিষ্ণুঠাকুরের কোন কাজে কি তার ভুল হ'তে দেখলেন কখন?"

সুমতী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কালীবাবু একটুখানি হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

আহারে বসিয়া কালীবাবু কহিলেন—

"কইরে মলু! তোর একজামিনের খবর বেরুলো? মৃন্ময়দের তো বেরিয়ে গেছে, জ্যোতিদেরও কাল বেরুবে বলে শোনা যাচ্ছে, তোদের কি হলো?"

মলয়া ঈষৎ হাসিয়া হাস্যস্মিত মুখে উত্তর করিল "আমাদের বাবা! সব্বাইকার শেষকালে ফাউ দেবে।"

পিতা হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—

"অথচ তোদেরই সকলের আগে পরীক্ষা হয়ে গ্যাছে! যাহোক পাশতো হয়ে যাবি?"

মলয় একটু ম্লান হইয়া উত্তর দিল, "কিজানি বাবা।"

কালীবাবু পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন—

"ঐতো তোদের দোষ! ঐ দেখ্ দেখি বিষ্ণু ঠাকুরকে, নিজের উপর ওর কত বড় শ্রদ্ধা! ঐ রকম সেল্‌ফরেসপেক্ট না থাকলে কখন উন্নতি হয়?"

মেয়ে একথার উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করিল না, কিন্তু স্ত্রী করিলেন। তিনি সেলাইএর লাইন হইতে চোক তুলিয়া সেই হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে ইহার জবাব দিলেন।

"হ্যাঁ তাই জন্তেই তো ওর অত আত্মোন্নতি হয়েছে, তোমার বাড়ী ভাত রাঁধচে! ওসব আধুনিক আত্মম্ভরিতা ওর থেকে কি সুফল হয় জানিনে, কুফল যে যথেষ্ট হয় তা চারিদিকেই দেখতে

পাচ্চি, ভগবান আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে ওটা যতই কম দেন, ওদের ও আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।”

কালীবাবু নতমুখে আহার করিতে করিতে উত্তর করিলেন—

“তা ঠিক।”

সুমতী কহিতে লাগিলেন—

“ওদের ভিতর এজিনিষটা একটু কমই ছিল মনে হ'তো, তবে এখন সব বড় হচ্চে, এখন কে কেমনটী হবে তার কিছুই ঠিকানা নেই। আত্ম-প্রত্যয় আর আত্মগর্ব্বিমী দুটো যে ঠিক এক নয়, এই সূক্ষ্ম বোধটুকু থাকলে আর কোন গোলই ঘটে না। তা' যাহোক, দেখ হীরুর একজামিনের খবর বেরুতে আর তো মোটে একটী মাস দেরী আছে, যদি পাশটা করতে পারে, কাজ পায়, তাহলে ফিরতে তো আর খুব বেশী দেরী হবে না? আমার ইচ্ছে ফিরে এলেই তার বিয়ে দিই।”

কালীবাবু স্ত্রীর কথায় তাঁর অন্তরের বার্ত্তার সন্ধান পাইয়া মনের মধ্যে নিজেও একটু উদ্বেগ অনুভব করিলেন, মা বাপের মনের ভিতরটায় এখন তাঁদের বৈদেশিক ছেলেটীর জন্যই সকল প্রকার সম্ভাব্য ভয় ও সন্দেহ প্রচুর হইয়া জাগিয়া আছে, একটার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা দেখা দেয়। সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব, এমনকি দেশভূমি সমুদয় চিরপরিচিতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, কোন সে সুদূরে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দলের মধ্যে যে আত্ম-নির্ব্বাসন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজন্মের সকল সাহচর্য্য হইতে, অভ্যাস হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া একেবারে ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রীতির মধ্যে মিলিয়া যাইতে হইয়াছে, না জানি সেই সকল লোক এবং তাহাদের রীতি-নীতি ঐ তরুণ-চিত্তে কতটাই প্রভাব, কতই না মায়া-জাল বিস্তৃত করিয়া বসিল! যেমন অম্লান প্রভাত-পদ্মটীকে তাঁহারা তাঁদের হৃদয়-সরোবর হইতে উৎপাটিত করিয়া সেই সুদূর দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ঠিক তেমনটীকে কি আর তাঁহারা ফিরাইয়া পাইতে পারিবেন?

স্ত্রীর বাক্যে তাই স্বামীরও চিত্ত-নিহিত গূঢ় সন্দেহ জাল ঈষৎ ছিন্ন হইয়া পড়িল, হৃদয়োত্থিত ঈষৎ আবেগকে সচেষ্টায় রোধপূর্ব্বক তিনি ঈষৎ উত্তেজনা দেখাইয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন—

“তাতো দেবেই জানা আছে, তা কনেটনেও ঠিক করা হচ্চে নাকি?”

সুমতীও হাসিয়া কহিলেন—সে এক-রকম আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছি।”

কালীবাবুও হাসিয়া কহিলেন—

“তবেতো আর কথাই নেই”—তারপর সহসাই ঈষৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়া সংসারের সহিত কি যেন মনে মনে চিন্তা করিলেন ও পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

“কিন্তু সবটা ভেবে দেখে কাজ

করো সুমু; হঠাৎ যেন কোথাও কথা দিয়ে ফেলোনা। ছেলে ফিরে এসে কি বলে, কি করে সেটা না দেখেত আর কিছুই স্থির করা যায় না, সে যদি তোমার পছন্দর মেয়েকে পছন্দ না করে, সে যদি বিয়েই না করে, সে যদি সে যদি— কি জানো? ভালমন্দ সকল ঘটনারই জন্য আমাদের মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত করে রাখাই সঙ্গত, তাতে করে যদি সত্য সত্যই কোন অমঙ্গল, কোন অনাচারই ঘটে যায়, তাহলে তেমন করে আর আকস্মিকতার বিহ্বলতায় ভেঙ্গে-চুরমার হয়ে যেতে হয় না, সয়বার বয়বার ধৈর্য্য মনের মধ্যে জমা করা থাকে—তাই বলছিলাম—সে যদি ধরেই রাখ, সেখান থেকে একটা মেমকেই বিয়ে করে নিয়ে আসে? তা' এমন তো কতই হয়, আর তারাওতো এই তোমার আমার মতই মা বাপেরই সন্তান।"

এই একান্ত অপ্রীতিকর ও অশুভ আলোচনায় সুমতীর যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল, তাঁর বোধ হইল, তাঁর চির প্রেমময়, সহৃদয় স্বামী যেন হঠাৎ তাঁর গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তাঁর স্বামীর হৃদয় জানিতেন, তাঁর পত্নী-প্রীতি, সন্তানবাৎসল্য ইহার কোন খানেইতো এজীবনে কোন সংশ-য়ের ছায়াটুকুও তিনি কোন দিনই দেখিতে পান নাই, তাই বুঝিলেন, কত দুর্ভাবনা সন্দেহেই এমন সম্ভাবনারও সংশয় তাঁহার স্নেহ প্রবণ পিতৃ-চিত্তকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। ক্ষণকাল নীরব স্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে তিনি কহিলেন,—"না আমি কারুকে কোন কথা দিইনি, এমনকি আভাষও কিছু জানাই নি, তাহলে আগেই তোমায় জানাতুম না? তাছাড়া সমাজের দিক থেকেও তাতে একটু বাধা আছে। তারা ঠিক আমাদের ঘরও নয়। অনেকে সেরকম বিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যের কেউ দেয়নি, সেই জন্য আমি এতে লুব্ধ হলেও খুব বেশী ভরসা করিনি।"

কালীবাবুর আহার সমাধা হইয়াছিল, প্রতীক্ষাকারী ভৃত্য আসিয়া চিলমচিও জলের ঘটি আচমনার্থ জোগাইয়া দিল, তিনি হাত ধুইতে ধুইতে জবাব দিলেন—

"অবশ্য এটা একটা যদির কথা, হয়ত সে এসে তোমার মতেই মত দেবে ও তোমার দেওয়া মেয়েকেই বিয়ে করতে সম্মত হবে, তা যদি হয়, তাহলে সামান্য সামাজিক বাধাটুকুর জন্যও আটকাবে না। যে কার্য্যে সমাজের অবনতির ভয় নেই, ততটুকু করতে পারবার মতন সংসাহস আমাদের থাকাই উচিত। আচ্ছা তোমরা খেয়ে এস, আমি যাচ্চি।"

মলয়ার খাওয়া ভাইদের সঙ্গেই হইয়া গিয়াছিল, সুমতী স্বামীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন, মলয়া কাছে বসিয়া মাকে কি কি দেওয়া হইল, কি হইল না, তাহারই তদারক করিতেছিল,

পিতা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কৌতূহল দমনে রাখিতে না পারিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—

"কে' কনে মা ?"

সুমতী এই প্রশ্নে প্রথমটায় উত্তর না দিয়া নীরবে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়ে তাঁহাকে ছাড়িল না, সে নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনশ্চ ঐ প্রশ্নই করিল—

"বলোনা মা, দাদার জন্য কাকে পছন্দ করেছ ?"

তখন অগত্যাই অনিচ্ছুক-শ্লথ-স্বরে সুমতী উত্তর করিলেন, "কারুকে কিন্তু বলে ফেলো না যেন, রুবি মেয়েটাকে আমার বড্ড পছন্দ। বউ হলে ঘর আলো করবে।"

মলয়া অকস্মাৎ যেন কোথায় বেত খাইল, এম্‌নি করিয়া সে চম্‌কাইয়া মুখ তুলিল এবং তার কণ্ঠ হইতে অকস্মাৎ একটা বিস্ময়াপ্লুত স্বর নির্গত হইয়া আসিল—

"মা !"

সুমতী নতমুখে আহার করিতেছিলেন, তিনি মেয়ের মুখটা দেখিতে পাইলেন না, তবু তার গলার স্বরে কিছু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিলেন—

"কেনরে ? রুবিকে কি তোর পছন্দ নয় ? কেন চমৎকার মেয়েত ! যেমন রূপ তেম্‌নি সরল !"

মলয়ার স্বভাবতঃই শান্ত প্রকৃতি, বিশেষতঃ পরের নিন্দা করা তার স্বভাবই নয়। তাই সে অর্দ্ধ-সন্দেহের ছাড়া ছাড়া ভাবে জবাব দিল "পছন্দ নয় তা' বলছি না, কিন্তু—"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ?" এবার মলয়া নিজের অন্তরস্থ দ্বিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া সজোরে কহিল—

"ও যে সব ছাই পাঁশ কথা বলে সে শুন্‌লে কি করে দাদার বউ হয় ইচ্ছে করবে !"

মেয়ের মন্তব্য শুনিয়া সুমতী একটুখানি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তারপর তাঁর মুখ আবার মেঘমুক্ত হইয়া গেল, তিনি কহিলেন—

"মেয়েটা ভালই, তবে শিক্ষায় গলদ আছে। মা-বাপ বড্ড বেশী আধুনিক-তার উপর নিজেদের নিয়েও ব্যস্ত, মেয়েদের কোন বড় আদর্শ দেখিয়ে মানুষ করচে না। ইচ্ছামতন চলছে ও চলতে দিচ্ছে। ও দোষ শুধরে নেওয়া যায়। যাক্‌ সে এখন অনেক দূরের কথা ; আগে হিরণ ফিরেই আসুক। কিন্তু মেয়েটা বড় সুন্দর, আর গায় যা' মিষ্টি ! আমার কেবলই ওর সেই গানটাই মনে পড়ে থাকে, সেই—

"আমার পথের সাথী কে' হবে ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ফুল-শয্যা

—:০:—

ফাল্গুনের নবপর্ণে সাজাইয়া কামনার ফুল
এস সখি, এস মধুরাতে !
অঙ্গে অঙ্গে ছন্দ রচি যৌবনের সৌরভ-আকুল
এস সখি, ভবিষ্যের রৌদ্র-ছায়া ধরি আঁখিপাতে
সলজ্জ হাসির ফাগে মঞ্জু মঞ্জু স্নেহ সঞ্চারিয়া
গাঁথিয়াছ যেই মালা স্বপ্নময় ফুলদল দিয়া,
—এস ত্বরা পার্শ্বে মম সেই মালা হাতে।

সরম-কম্পিত হাতে অনুপম চাহি মোর পানে
দাও গলে ওই তব মালা।
আবেক-তরঙ্গে তোল হর্ষের কল্লোলধ্বনি প্রাণে,
পরশে স্পন্দিত করি বক্ষে মোর ধরা দাও বালা !
অনাগত মাধুরীর হাস্যে তোর সলীল আভাষ
আকুল করিয়া তোলে শুভ্র-তনু বেলফুল-বাস,
রক্ত-রাগে গোলাপের ঝরে স্নিগ্ধ আলা।

তুমি ছিলে মোর প্রাণে গোপন মানসে মোর গানে
সকল অন্তর ভরি আশা ;
তৃষ্ণার ভাষায় ছিলে, বেদনার ব্যাকুল সন্ধানে ;
রিক্ততার পূর্ণতায় তুমি সখি চুম্বন-পিপাসা।
মূর্ত্তিমতী এলে আজি সঞ্জীবনী সরসে অমিয়া ;
স্বপন-জড়িত স্বরে ডাকো—'প্রিয়'—ডাকো মোরে, প্রিয়া !
হে সখি বাঞ্ছিতা অয়ি শান্তা ভালোবাসা !

ক্ষণিকের খেলা কি এ—ক্ষণিক ছড়ায়ে ফুল-পাঁতি
রুদ্ধ কক্ষে অজস্র বিলাসে ?
—এ যে খেলা অনন্তের মোরা দুহুঁ চিরন্তনী গাঁথি,
সকৌতুক সুপ্তি-সুখ যৌবনের ফুটন্ত বিকাশে !
অতীতে এনেছি মোরা যত্নে ঢাকি স্মৃতি-আবরণে
অস্ফুট লুকানো গাথা—তাহারি মর্ম্মর আজি মনে,
মধুর মধুর মায়া ছড়ায় সুবাসে !

অন্ধকারে আছে মোহ—অন্ধকার প্রণয়ের বাসা,
তাই হিয়া খুলেছি গোপন।
ঘুম যে আসেনা চোখে !—ফুলগন্ধ একি সর্ব্বনাশা !
তুমি কি ঘুমাবে বালা ! মোর বুকে একান্ত আপন ?
রক্তিম পুলকে তব দীপ্ত হোক সুপ্ত স্পৃহা সাথী !
চুম্বনে অধীর করি তোমারে জাগাবো সারারাতি,—
ঘুম নয়—আজি মধু যামিনী যাপন !

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

আর্টের বহুমুখীনতা

—০:*:০—

আরও একটা কথা হচ্ছে প্রত্যেক রূপকলার ভিত্তিই তার নিজের ভিত্তির মধ্যে। পুরাণে একটা বর্ণনা আছে, একটা দেবতার—সে বর্ণনাকে অলসভাবে কোন দেশের শিল্পী, বর্ণে বা প্রস্তরে রূপান্তরিত করেনি। Apollo বা ব্রহ্মমূর্ত্তির যাই নির্দ্দেশ থাকুক না কেন সে মূর্ত্তিকে যখন বিশিষ্ট রূপকলার অঙ্গীভূত করতে হয় তখন তার স্বধর্ম্ম অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে—বইতে বা কেতাবে নয়। ত্রিমূর্ত্তির তিনখানা মুখ কোথা দিতে হবে, কেমন করে দিতে হবে কিম্বা কোনভাবে দিলে তা ভাস্কর্য্যগত কোন সমস্যার সমাধান করবে—এ হিসাব কেতাব বা অন্তদৃষ্টি আর্টিষ্টের বা ভাস্করের একেবারে নিজের—এর ভিতর শিল্পীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এবং এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে যে রূপ-হিল্লোল দ্যোতিত করা

হয় তা'তে জাতির সমস্ত অবগুণ্ঠিত স্বাধীন বৃত্তি ও সাধনা অনেক সময় শরীরী হয়ে পড়ে। সে সব হয়ত পুরাণে ও মহাকাব্যের বর্ণনায় পাওয়া দুষ্কর হয়। এজন্য জাতির চিত্ত এই সমস্ত plastic ও graphic কলায় স্বাধীনভাবে ধরা পড়ে। চন্দ্রমৌলি মহাদেবের মূর্ত্তি সেকালে শিল্পীরা যেভাবে এঁকেছে একালে শিল্পীরা যে তেমন আঁকছে না আপনারা তা এদেশের তরুণ-শিল্পী প্রমোদ কুমারের একখানা মহাদেবের চিত্র দেখ্‌লে বুঝতে পারবেন বা শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্রের নূতন পরিকল্পনায় তা' কিরূপ স্থান পেয়েছে দেখলে বিস্মিত হবেন। তাতে বোঝা যাবে এ সমস্ত উপাখ্যানের বা বইএর দোহাই রূপকলার বিশেষ প্রকাশের কোন জায়গায় খাটে না। তেমনি গ্রীক দেশের এপলো মূর্ত্তিও নানা সময় নানা রকম হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ও পরে এপলো মূর্ত্তি নানা রকম বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। শুধু মূর্ত্তি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। Greek pillar এর মত abstract জিনিষকেও পরখ করে দেখলে একথাটি ধরা পড়বে। Doric column হচ্ছে অলঙ্কারহীন—austere। Ionic column হচ্ছে জলের ফোয়ারার মত হিল্লোলিত। এদেশের নানা মন্দিরের অসংখ্য দৃষ্টান্তের ভিতরও একথার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যাবে।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই—একই দেব-মূর্ত্তির কেতাবে বা পুরাণে দেওয়া লক্ষণ বজায় রেখেও সম্পূর্ণ স্বাধীন চেহারা দেওয়া যেতে পারে। এবং এ রকম স্বাধীনতা দেওয়ার সহস্র পথ রয়েছে। শুধু অঙ্গের বিন্যাস বা অলঙ্করণের কল্পনাও স্থাপনের কারুতায় নয়—রেখার প্রাচুর্য্য, বর্ণের গভীরতা বা উল্লোলতার ভিতরও এমনি ভাবে সম্পূর্ণ নূতনত্ব লীলায়িত করা যেতে পারে। এজন্য যুগে যুগে শিল্পী যা সৃষ্টি করেছে তা এক হিসাবে একেবারেই নূতন বল্‌তে হবে। এক একটা মূর্ত্তি ও চিত্রের ভিতর নানা বৈচিত্র্যের যা ঐক্য তা একটা মহাকাব্যের চেয়ে কম নয়—অবশ্য যারা বোঝে তাদের পক্ষে। শিল্পীরা অনেকটা সংস্কারে আঁকে; তারা নিজেরাই অনেক সময় জানে না তাদের রচনার ভিতর দিয়ে তাদের যুগ কি কি confession বা স্বীকারোক্তি করে যাচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন উঠ্‌ছে—ঐতিহাসিক সময়-হিল্লোলে আর্টের ভিত্তি কি রকম প্রকাশ পেয়েছে—শিল্পীর এই স্বাধীনতা কি রকম ভাবে প্রস্ফুট হয়েছে। যখনই শিল্প ধারাবাহী হয়েছে তখনই তার ভিতর নূতনত্ব খুজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ মানুষ নূতনকে সৃষ্টি না করে' পারে না—প্রাচীনতার ছিন্ন-বস্ত্রের টুকরো হয়ত সে বুকের পাঁজরে রেখে দেয়—সেটা স্মৃতির একটা দুর্ব্বলতা—কিন্তু সৃষ্টির ভিতর যখন তার অখণ্ড নবীন উত্তম থাকে না

তখন তা মন হরণ করতে পারে না। চৈনিক আর্টে একই ছবি হয়ত হাজার বছর আঁকা হয়ে আসছে—সে সমস্ত সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত উৎস কোথা, তা একবার দেখতে হয়—তা হলেই আর্টের দিক হ'তে ইতিহাসকে তলিয়ে দেখা হয়।

এ হ'ল উচ্চতর আর্টের কথা যার ভিত্তি মানুষের নানা ঐতিহাসিক প্রবৃত্তির মূলে খুঁজতে হবে—নিম্নতর আর্টের কথাও তাই—minor artsএর ভিত্তিও জাতির লীলায়িত নব নব উদ্দীপনার ভিতর খুঁজতে হবে—এবং এ সমস্ত উদ্দীপনাকে ইতিহাসের ফল না বলে ইতিহাসকেই এই উদ্দীপনার ফল বললে অন্যায় হবে না। Pottery, Seal, Coin, খেলনা—এ সবের ভিতর লীলার যে রূপাবর্ত্ত Higher আর্টেও তাই—অনেক সময় ছোট আর্টের সঙ্কীর্ণ প্রসরেই জাতীয় উদ্দীপনার মূল ধরা যায়। যেমন মুদ্রার বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে—ভারতীয় ও গ্রীক মনস্তত্ত্ব কোথা তফাৎ। অনেক সময় চিত্রের শিল্পী ছোট কি বড়—ধরা মুস্কিল কিন্তু মুদ্রায় তা' হয় না। "Coins are always the works of master and not pupils". এটা একটা বড় কথা। ভারতে রাজারাই মুদ্রা বের করত। গ্রীসে আদিমকালে priestsরা বের করেছে বলে' কেউ কেউ কল্পনা করেছেন। গ্রীক্ 'মুদ্রা'কে purely 'utilitarian' চোখে দেখেছে—তার ভিতর pure realistic প্রয়োজনের ছায়া আছে। এজন্য Athens ও Argos-এর মুদ্রার ভিতর কিছুই গ্রহণযোগ্য নেই—তবু দূরবর্ত্তী রচনায় কিছু ভাবব্যঞ্জনা আছে—যেমন Syracuseএর বা Claromenaeর। অথচ ভারতবর্ষের কুশান রাজাই হোক্ বা গুপ্ত রাজাই হোক সকলের মুদ্রাই অলঙ্করণে শিহরিত—ভাবব্যঞ্জনায় ভরপুর এবং সে সব প্রয়োজনের গণ্ডী একেবারে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে। কুশাণরাজ ভীমের মুদ্রায় শিবের মূর্ত্তি রয়েছে—কনিষ্কের মুদ্রায় "a whole pantheon of gods and goddesses" আছে। শিবের মূর্ত্তি কনিষ্কের মুদ্রায় ও সব সময় আছে দেখতে পাওয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের Lyrist-type ও Aswamedha type এর বৈচিত্র্য—ভারত ও গ্রীকের সভ্যতার মাঝখানটা তফাৎ কোথা তা দেখিয়েছে।

বর্ত্তমান সময়ে কিছুকাল হ'ল দুইটি মূল্যবান আবিষ্কার সভ্যজগতকে আলোড়িত করেছে। একটা হ'ল মেসোপটেমিয়ায়—অন্যটা হ'ল ভারতবর্ষে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ Herbert Weld ৩০০০ B. C. পূর্ব্বে সুমেরীয় আর্টের নানা অবয়ব আবিষ্কার করেছেন। এ প্রসঙ্গে Mr. Mackay ও Talbot Riceএর আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয় প্রাসাদের ভিত্তি উন্মুক্ত করা হয়েছে—এর ভিতর স্বতই মুখর হয়েছে আমার মতে দুটি জিনিষ—একটা হচ্ছে একটা মাটির

তৈরী ভেড়ার মূর্ত্তি—এটা হচ্ছে খেল্‌না—একটু নাড়াচাড়া কর্‌লেই বেশ আওয়াজ হয়; এটা হ'ল শিশুর স্নেহরাজ্যের পতাকা—আর একটা হ'ল Brooch—অনেকটা আধুনিক safety-pinএর প্যাটারণে; এটা হ'ল নারী-রাজ্যের প্রসাধনপটু মুখরতার নমুনা। তিন চার হাজার বছর আগেকার জীবনের সঙ্গে আমাদের এ রকমের নৈকট্য দেখে আমাদের পুলক উপস্থিত হয়; কালের গর্ভে আর্ট এমনিভাবে নিজের ভিত্তি প্রোথিত করে' গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যেমন আধুনিক যুগের আর্টের লীলা-ভঙ্গ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে; তেমনি অতীতের সভ্যতাও কেবল 'মারকাট' করে তৃপ্ত হয়নি—রসের নানা উদ্বেলিত প্রবাহে সহজেই আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারতবর্ষের Punjab ও Sindএও এই সুমেরীয় সভ্যতার নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে—Sir John Marshall এর মতে তাও "3000 B. C." তার ভিতরও পাওয়া যাচ্ছে—'toys', bangles of blue glass—stone ring, রঙীন potteries. এরূপে দুদিক হতেই একটা বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাপ্রসঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

উচ্চতর শিল্প প্রসঙ্গে মিশর ও চীনের প্রসঙ্গই প্রথম ওঠে। সব দেশে কলার লীলাপুলক একই ভাবে ফুটে ওঠেনি—চৈনিক ইতিহাসে 'ছবি'র সৌন্দর্য্য বল্‌লে যা মনে করেছে—মাইকেল এঞ্জিলো তা কিছু (?) বোঝেনি—অতীতের শিল্পীও তা মনে করেনি। এজন্য ঐতিহাসিক ভিত্তির আলোচনায় নানাদেশের ভিতর আর্টের কোন ভিত্তিটি মুখ্য করেছে তা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করে' যাব। চীনদেশের ছটি কলা—"Luk-i" হচ্ছে ritual, music, archery, charioteering, writing, calculation. এতে দেখা যায় ঠিক aesthetic বা সৌন্দর্য্যগত প্রকাশকে প্রাচীন চীন প্রথম স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করতে পারে নি। আধুনিক কালে Fine Arts কে "meishu" বলা হয়। চৈনিক ললিতকলার বিচিত্র সৃষ্টি "Unicoin", "Phœnix" "turtle", "dragon" প্রভৃতির ভিতরকার কথা নানাদিক থেকে বিচার করতে হয়—এ প্রসঙ্গে সে আলোচনার সময় নেই। চিত্রকলা প্রসঙ্গে চীনেরা কি চায় আপাততঃ সেই প্রশ্নই এবার বিচার করি। চীনদেশের চিত্রকলাটি অনেকটা Caligraphyর অঙ্গ। সেখানে হস্তলিপির কারুতা বিস্ময়জনক তিন রকমের লিপিভঙ্গ আছে chen বা regular, hsing বা running এবং tsao বা draft। তুলিকার আঘাতকে চঞ্চল মেঘের লঘুতা বা সন্ত্রস্ত সর্পের শক্তিমত্তার সহিত তুলনা করা সেখানে সুলভ। সেখানকার Lan Ting' Script বা লেখমালা সবচেয়ে বিখ্যাত—কত কবি কাব্যে তা' প্রশংসা করে গেছে তা' ঠিক

নেই। বস্তুতঃ Caligraphy ও Paintingএর মাঝখানটা এখানে ফাঁকা করবার যো নেই। The materials with which caligraphists and painters worked were the same. The brush was used indifferently for writing or painting but in addition to the black ink of the writer the artist had colour. In all other respects whether as to surroundings, method of approach, use of materials—the two classes were considered fellow members of the "grove of brushes" which is the literary designation of the wielders of the brush.

চীনদেশে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তনকে গৌরবের ব্যাপার মনে করা হয়, সেখানে সহজে কেউ গুরু হ'তে চায় না Indeed it is difficult in chinese painting to determine what is original and what is reproduction")

চৈনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে বল্‌বার অনেক কথা আছে—কিন্তু তার গোড়াকার কথা হচ্ছে 'Pi fate' অর্থাৎ Brush stroke বা তুলিকার আঘাত। Brush strokes form the basis on which different styles of painting are distinguished. এই তুলিকাঘাতকে নানারকম নাম দেওয়া হয়—যেমন Strokes of a large axe—of a small axe, raindrop strokes, hemp-fibre strokes ইত্যাদি—এজন্য চৈনিক যখন চিত্র দেখে তখন এই রেখা-লীলাকেই স্পষ্ট করে দেখে। কোন বিখ্যাত চৈনিক আলোচক পশ্চিমের চিত্র-কলা দেখে বলেছিলেন :—Students may make use of a small percentage of the methods of Westerners and specially of their suggestiveness but they are entirely devoid of style (of the brush). Although their work shows skill in drawing and workmanship yet it cannot be classified as true painting.

কাজেই চৈনিক আর্টের ভিত্তি যেখানে সেখানে তাকে বিচার করতে হবে—গ্রীক্ আর্ট হিসাবে তার বিচার চলবে না।

এরকম ভাবে মিশরীয় আর্টেও কতকগুলি conventions আছে—পদ্ধতি আছে। সমস্ত পদ্ধতি ভেদ করে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতায় আমি যে universal rationalএর কথা বলেছি তাদিয়ে বিচার করা চলে—তাতে করে' অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে কাজ করবার আগে প্রত্যেক আর্টেরই আদিম ভিত্তি-গুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

যেমন মিশরীয় আর্টে মেয়েদের হলদে রঙে আঁকা হয়, পুরুষদের লাল রঙে—এর মানে এ নয় সে দেশের মেয়েরা হলদে ছিল আর পুরুষরা লাল ছিল। এটুকু ব্যাপার মেনে নিতে হবে—দেশ কালের ব্যবধানতার দিক হতে। মিশরে দেখতে পাওয়া যাবে যে "The body and head always bend directly forward" এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে দেশের আর্টের বিচার হবে না।

সকল দেশের আর্ট আলোচনায় চারিদিকের আবহাওয়ার প্রশ্ন এজন্য ওঠে। Soil, climate, race, ধর্ম্ম এ সব প্রশ্ন ওঠে। এজন্য মিশরে দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা রাজার মূর্ত্তি রচনায় বেশী প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছে।

মিশর দেশে আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে দেবতার সমস্ত লক্ষণকে নানা বিভিন্ন মূর্ত্তির সাহায্যে প্রকটিত করা হয়েছে, whip, ostritch feathers, প্রভৃতি দ্বারা ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি ব্যক্ত করা হয়েছে—চেহারার ভিতর সে সব যোগ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। Egyptian portrait idealisticও নয় realisticও নয়, যদিও "কা"-মূর্ত্তিতে তারা দেখিয়েছে realismকে কতটা সত্যোপেত করা যেতে পারে।

বেবিলনীয় কলায় স্মরণ রাখতে হবে সেখানকার দেবতারা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মক নয়—Gods are not identified with phenomena. মিশরে তা হয়েছে। ভারতবর্ষের কথা পরে বল্‌ব। Chaldeaতে প্রতীকের বা symbolএর সাহায্যে দেবতাদের ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত বিচিত্রতার জন্য আর্টে এক দেশে লোকে যা চাইবে অন্য দেশে তা' হয়তো পাবে না।

জাপানী শিল্পের কথাও বল্‌তে হয়। চীনে যেমন তেমনি জাপানেও পারিবারিক এবং সমাজিক জীবনের লৌহ-অর্গল হ'তে সেখানে মানুষ যা মুক্তি চেয়েছে—তা পেয়েছে আর্টে। এখানেও Brush stroke বিচারের একটা প্রধান বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ ওরা লক্ষ্য করে এই সমস্ত তুলিকাপাতের মধ্যে —শরীর ও মনের একনিষ্ঠতা, হাতের দক্ষতার সঙ্গে মনের একটা গূঢ় ও mystic যোগ। এ দক্ষতা পেতে বহু সাধনার সম্মুখীন হ'তে হয়। কোন লেখক বলেন :—What the Japanese connoisseur looks for above all else in examining a painting, a piece of sculpture, or even the chased surface of an example of metal work is the trace of the living hand of the master. It is only when the artist has attained to complete mastery of his craft, when his hand works freely and surely, when, above all, the muscular action answers directly

to the call of the artistic consciousness—some would say of the soul without any laborious direction being given to the individual stroke that the craftsman can lay claim to the title of master. Then and not till then—and this provided only that he has the right stuff within him and is at heart an artist can he in the estimation of a cultured Japanese give full expression to his genius.

এরই প্রখরতা ও একাত্মতা সম্পাদনের জন্য কোন বিখ্যাত শিল্পী প্রথম মদ্য পান করে, তারপর বাঁশী বাজাত—তারপর যখন ভিতরে একগ্রতা অনুভব করত তখন কাজে ডুব দিত। জাপানের transcendental painter বা আধ্যাত্মিক চিত্রকরের হাতে Brush work অনেক সময় shorthandএর মত হ'ত যাতে করে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হত এজন্য কোন পশ্চিমে সমালোচক বলেন :—To the Western mind the clue that should lead us into these inner areana is often difficult to find. The critic may, however, console himself for his incompetence with the doubt whether in works of this nature the limit of true pictorial art have not been outstepped. Landscape-এর জন্য প্রায় ষোল রকমের—'touch' এবং পাতার জন্য ছত্রিশ রকমের (?) touch জাপানী আর্টে সহজে দেখতে পাওয়া যায়।

এজন্য জাপানী রূপদক্ষেরা বিষয়ের অদ্ভুতত্বের দিকে দেখেন। He seeks for the traces of the very play of muscles that have directed the chisel. অন্ততঃ এতকাল পরে জাপান metal work প্রভৃতিতে এমন কারুতা হইয়াছে যে ইউরোপের পক্ষে তা অনুকরণ দুঃসাধ্য হয়েছে। It is the despair of all European workers in metal who have attempted in vain to imitate the effect obtained by the Japanese.

আমি অন্য প্রসঙ্গে বলেছি নানা দেশের পদ্ধতি বিচার না করলে ভারতীয় পদ্ধতি বোঝা যাবেনা। ভারতের চিত্রে কি কি প্রতিপাদ্য হয়েছে ? এ সমস্ত বিচারের জন্য একটু ধৈর্য্য ধরা প্রয়োজন—কারণ এখানে যে বিচিত্র (?) আয়োজন হয়েছিল যা আমি প্রথম দিনের বক্তৃতায় বলেছি তা' আমার কল্পনার ব্যাপার মাত্র নয়। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এ দেশ কি বলে—তা' আমি নানা জায়গায় বলেছি—তা' বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। আজ আমি শুধু

একটা শ্লোক উদ্ধৃত করে' দেখাব এ দেশে চিত্রকরদের কতদিকে দেখতে হ'ত। ভারতীয় আদর্শের ভিতর সমস্ত বৈপরীত্যের যেন সামঞ্জস্য হ'য়েছে বলে মনে হয়—

রেখাং প্রসংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণা
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরেজনাঃ।

আচার্য্যেরা রেখাকে পছন্দ করেন—যেমন চীন ও জাপানে, বিচক্ষণেরা বর্ত্তনকে—যেমন গ্রীক্ দেশে, রমণীরা ভূষণের পারিপাট্য চায়—যেমন ইতালীয় আর্টে, ইতরের বর্ণাঢ্য—যেমন মিশর ও কতকটা চীনে, এমন কি গ্রীসেও।

এ সবের সমন্বয় ভারতীয় আর্টে হয়েছে কিনা তা যথাসময়ে দেখাবার চেষ্টা করা যাবে।

পরিশেষে একবার ইউরোপীয় আর্টের আদর্শ পরীক্ষা করা যাক্। এদেশের নানা সময়ে বিচারের আদর্শের এবং চিত্রব্যঞ্জনার প্রণালীর নানা ব্যতিক্রম হয়েছে। গ্রীসীয় আর্টে ও Byzantine আর্টে সকল রকম ইন্দ্রিয়জ লালিত্য যা আর্টের প্রাণ তাকে ঠেলে দূরে রাখা হয়েছে এবং আর্টকে একেবারে শরশয্যায় শায়িত করা হয়েছে। রিনেসাঁসের পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভিতর ভাবাত্মক চিত্রের মহিমা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। Gothic architecture এরকমের একটা জিনিষ। Renaissanceএর মত্ততায় তা' উড়ে' যায়।

পশ্চিমে নানা অলিগলি ঘুরে অবশেষ একেবারে হুবহু নকল করার ঝোঁকে পড়ে যায়—এ'ত আপনাদের জানা কথা। বর্ণের বা রেখার বাহাদুরী যতটা নয়, ততটা যে জিনিষের অনুকরণ করা হচ্ছে ঠিক তারই মতন নকল করে তোলা—অতি ক্ষুদ্রতম অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও—পশ্চিমের আর্টের একটা মস্ত বাহাদুরী বলে মনে করা স্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছিল একসময়। অবশ্য একালে তা নেই।

অবশেষে এম্‌নি হয়ে পড়্‌ল যে, morgueএ আস্ত মৃতদেহ সন্ধান করে' সেটা ঠিক করাটাকেই আর্টের চরম সৃষ্টি মনে করা হ'ত। এবং সাহিত্যে ও Police Gazetteএ যে সমস্ত লোমহর্ষণ হত্যা ও জুয়াচুরির ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'ত সে সবকে তেমনি ভাবে বইতে লেখাও একটা সফলতার বৈজয়ন্তী হিসাবে দেখা হ'ত।

কিন্তু এসিয়ার আর্টের সাহচর্য্যে ইউরোপ আর তেমনিভাবে পরবর্ত্তীকালে আর্টকে দেখ্‌তে পার্‌ল না। পরবর্ত্তী বা আধুনিক কাল পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে ধিক্কার দেওয়ার একটা বাতিক হ'তে আত্মসংবরণ করতে পার্‌লে না।

"Impressionism" জন্মলাভ করে' পূর্ব্বতন সমস্ত প্রথাকে বর্জ্জন কর্‌লে। শুধু বর্ণের লঘুস্তরের সাহায্যে চিত্র আঁকা সুরু হ'ল। তারপর এল "Neo-impressionism"। তা'তে করে' বর্ণকে বিন্দু আকারে বিশ্লিষ্ট করা হ'ল। বৈজ্ঞানিক

গবেষণায় দেখা গেল রঙ মিশ্রিত করলে প্রখরতা কমে যায়। অমিশ্র ভাবে তাকে নিয়োগ করাই ভাল ইত্যাদি। সা্যা ও সিনিয়াক সম্বন্ধে বলা হয়েছে— To these two painters is due the method of pointallism i. e. division of tones not only by touches as in Moyet's pictuers but by very small touches of equal size causing the spheric shape to act equally upon the retina. Neo-impressionism believes in obtaining thus a greater exactness than that which results from the individual temperament of the painter.

এটা দেখেই কোন আলোচক বলেছিলেন—"It reduces the picture to a kind of theorem which excludes all that constitute the value and charm of art that is to say caprice, fancy and the spontaneity of personal inspiration."

এর অন্তরালে এল এক অপূর্ব্ব চিত্রকর —Vangogh. "As a painter of easel pictures he is too chaotic and unintelligible.

তার পর এল Synthesists. গো-গ্যাঁ এই দলের অন্যতম নেতা। একদিন সে এমন পোষাক পরে' Parisএ এসে উপস্থিত হ'ল যে, তার অদ্ভুত রকম দেখে লোকের তাক্ লেগে গেল। ছবি দেখেও তেম্‌নি অদ্ভুত ঠেক্‌ল। বর্ণের স্বাধীনতা ও বহু বর্ণের নূতন synthesis চিত্রকলায় গো-গ্যাঁই প্রতিষ্ঠা দেন প্রথম।

ইতিহাসের নানা অবস্থায় দেশ ও কালভেদে এম্‌নি ভাবে আর্টের রচনা ও বিচারে বৈচিত্র্য এসে পড়েছে। গ্রীক আদর্শের দিক হ'তে দেখ্‌তে গেলে Impressionistsদের পাগল বল্‌তে হবে—গ্রীসীয় আর্টের হিসাবে আধুনিক neither fish, nor hot good redberrys—একটা হ-য-ব-র-ল তার পর এল Cubism. তারা চাইলে, প্রত্যেক জিনিষের যে বহুমুখী সহস্র রূপ আছে তা একসঙ্গে দেখাবেন--তাতে করে' যে একটা রূপ ছিল সেটাও ইতরজনের চোখের জলে ডুব্‌ল। তার পর এল Futurism—তাঁরা বল্‌লেন—দুনিয়া বল্‌লে একটা static অবস্থা ত বোঝায় না। আধুনিক কালে দার্শনিক Bergson তা খুব ভাল করেই বুঝিয়েছেন—কাজেই Dynamic দিয়া দেখানই হচ্ছে মস্ত কথা। এর পর এলেন Synchronistsরা। তারা রেখা-লালিত্য ছেড়ে দিয়ে শুধু বর্ণের ভিতর দিয়ে চিত্ররচনার চেষ্টা কর্‌লেন—এরকম করে' যে বাস্তবিক জগৎকে হুবহু আঁকা একটা পরমার্থ ব্যাপার ছিল তাকে কিছুকালের জন্য নব্য regulation intern করে'

দিল—কিছুকালের জন্য কারণ পরবর্ত্তী-কালে আবার সে পথে যেতে হয়েছে।

কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যে সমস্ত আদর্শ ও প্রণালীর কথা উল্লেখ করা গেল আদিম শিল্পীর ভজন হ'তে আধুনিকের Tarr musicএর আওয়াজ পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পই নানাকারণে দেশ কাল ও পাত্রভেদে নানা অবস্থার ভিতর মঞ্জরিত হয়েছে—এ সমস্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি ভাল করে না দেখ্‌লে আর্টের আলোচনা দুরূহ হয়ে পড়ে। নানা ভাববিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানবত্ব এগিয়ে এসেছে—এসব ছাড়া রেখে গেছে আর্টের আপাত-প্রতীয়মান বহুমুখীনতায়। ব্যক্তিগত আর্ট—যেমন এযুগের, ধর্ম্মগত আর্ট—যেমন ভারত ও মিশরের, রাষ্ট্রগত আর্ট—যেমন রোম সাম্রাজ্যের, জাতীয় আর্ট ও আন্তর্জাতিক আর্ট এসব যে সমস্ত ভিত্তির উপর ছড়িয়ে আছে তার বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হওয়ার জন্য আমি কিছু উল্লেখ করিনি। বরং এর ভিতরকার অজানা ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য। সে ঐক্য কি তা শুধু সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে বিচার কর্‌লে এবং এসব আকস্মিক ঘটনাকে বর্জ্জন কর্‌লে ধরা পড়্‌বে। কারণ প্রথমেই বলেছি সুন্দর বিশ্বমানবের হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে সমারূঢ় হ'য়ে আছে। সে হৃদয়ের ভিতরকার বিপুলতা হচ্ছে, সমস্তই চারিদিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে। এহৃদয়ে গভীরতার ভিতর রূপকলার লীলাচঞ্চল আদিম মেঘধূসর মন্দির, রচিত হয়েছে—সে আদিম মন্দিরে কবিরের ভাষায় নহবৎ বাজছে, মৃদঙ্গ বীণা ও সেতারে তা ঝঙ্কৃত, মেঘছাড়া বিজলী সেখানে চমকিত হচ্ছে, সূর্য্য বিনা সে পুরী প্রকাশিত, বহ্নি বিনা সেখানে শুভ্রজ্যোতি উদ্ভাসিত, শব্দছাড়া সেখানে সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। যে রিনি-ঝিনির পশ্চাতে মানুষ প্রবহমান কালের ধূসর সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে থম্‌কে যাবে না, যে বিজলীর অফুরন্ত লীলাবাদনে সে বিশ্বকে নূতন নূতন রূপধারাক্রান্ত করে' ক্লান্ত হবে না, যে পুরীর প্রাসাদ-চত্বরে সে লক্ষ জ্যোতিষ্কের দীপালী জ্বালিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে—জীবনের সমস্ত দুঃসহ ব্যর্থতা খণ্ডতা ও জীর্ণতা ও বেদনাকে যে পরম সৌন্দর্য্যের মানমন্দিরে স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুসঙ্গত দেখে সুদূর হতে অদৃষ্টকে পরিহাস করবে, হৃদয়কে বিস্তৃত করবে, প্রয়ানকালে সে সেই পুরীরই আনন্দঘন নবীন জীবনবত্তার নূতন শিকড়োদ্গম করে' পরবর্ত্তীদের হাতে দান করে এসেছে এবং দান করে যাবে এক দুঃসহ ব্যর্থতা নিবিড় আনন্দ এক লোভনীয় সফ-লতার নিঃশব্দ বেদনা; এবং এই সম্প্রদান পরম্পরার ভিতর দেদীপ্যমান হবে কোন নূতন প্রভাতের শুভ্র পাদপীঠে এক অনন্ত জীবনধারা, এক অঙ্গাঙ্গী বিশ্বভুবন! বহুরূপ ও বিশ্বরূপের এই মিলন বাসরসজ্জায়

কলার তোরণ ছায়া দূর দিগন্তে শোনা যাবে উদ্‌গাতাগণের নবীন নহবৎ যা বর্ত্ত-মানকে একালে মুখর করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

দিব্যদৃষ্টি

—:•:—

আমার মলিন চিত্তে হে প্রিয়, সুন্দর,
বিশ্বের মূরতি এল দীনহীন বেশে—
অভিশপ্ত, উদাসীন, কুৎসিত, কাতর
চাহিল আমার পানে বারেক ; নিমেষে
নামাইল চক্ষু দু'টী বেদনার ভরে।
হাসিল না ; কাঁদিল না ; রহিল মলিন ;
আসিল না মুক্তিধারা তা'র বক্ষ'পরে।
বিপুল, সুদীর্ঘ শ্বাসে যাপে নিশিদিন।
আমি জানি, তুমি তা'রে দিয়েছিলে প্রাণ ;
দিয়েছিলে কলহাস্য তাহার আননে ;—
হে সুন্দর, দাও তা'রে নব নব গান !
মোরে দাও দিব্যচক্ষু ; হেরিব নয়নে
তা'র অভিনব রূপ, সুশান্ত, বিমল,
কোমল, সুস্নিগ্ধ, শুভ্র, আনন্দ-উজ্জ্বল।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ছুটীর দিনে

(গল্প)

অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলাম, রাত তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। গৃহিণী ব্যাকুল নেত্রে বসিয়াছিলেন; ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন,—কাণ্ডখানা কি! আপিস কি আর কেউ করে না? রাত দশটা অবধি আপিস! এমন তো শুনিও নি কোনো কালে!

হতাশের হাসি ঠোঁটে ফুটাইয়া কহিলাম,—তাইতো, এত রাত হয়ে গেছে!

হাত হইতে লাঠিগাছটা লইয়া গৃহিণী ঘরের কোণে রাখিলেন; কোটটা খুলিয়া তাঁর হাতে দিলাম, পরে গেঞ্জিও কামিজ খুলিতেই গৃহিণী কহিলেন,—একটু বসো, জিরোও—পাখাটা খুলে দি—তারপর ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে চান করতে যেয়ো…

সুইচ্ টিপিয়া গৃহিণী ফ্যান্ খুলিয়া দিলেন,—স্নিগ্ধ বাতাসে আরাম পাইয়া বর্ত্তাইলাম।

গৃহিণী কহিলেন,—কোথায় এতক্ষণ আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল, শুনি? বাড়ীর বার হলে বুঝি ঘরের কথা আর মনেও থাকে না! রাত দশটা অবধি তোমার আপিস খোলা থাকে, এই কথা আমায় বোঝাতে চাও!

হাসিয়া কহিলাম,—জানো তো আমার স্বভাব—কেন আর গঞ্জনা দাও!

—তা বটে!

অফিসে সামান্য কেরাণী হইলে কি হয়, সাহিত্যের বাজারে আমার পশার কতখানি! দৈনিক কাগজগুলায় মাঝে মাঝে 'হিন্দুর বচন', 'বৃদ্ধের উপদেশ' লিখিয়া দেশটাকে কত-বড় জাহান্নমের পথ হইতে যে কতখানি আগলাইয়া রাখিয়াছি! সনাতন আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, এ-সবের দিকে উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সম্প্রদায়ের মনকে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করিতেছি—অর্ব্বাচীন মাসিক ক'খানায় এই যে উপন্যাসগুলা আলো ও হাওয়ার বার্ত্তা আনিয়া দেশের চিরবদ্ধ সংস্কারকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিতে উদ্যত, সেগুলার আপাদমস্তকে কেবলি কলমের খোঁচা মারিতেছি! সেজন্য পড়াশুনার আয়োজনও যে কি ভাবে করিতে হয়, তাহা অন্তর্যামীর অবিদিত থাকিলেও গৃহিণীর অগোচর নাই! বই কাগজ আর বেগারই আমার সব,—না ছেলেমেয়েগুলাকে দেখাশুনা, না কোনো লৌকিকতা-রক্ষা! এ লইয়া গুরু-গঞ্জনাও কি সহিতে হয় অল্প! কিন্তু যে মানুষ দশজনের একজন হইয়া থাকিতে চায়, তার কি এ ক্ষুদ্র গৃহ-কূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলে! এই বিশাল সহরের কোন্ অলি-গলির মধ্যে কোথায় কি ঘটিতেছে, সে সব সংবাদও সংগ্রহ না

কারণে নয়! এই সব সংবাদকে কেন্দ্র করিয়াই তো মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হইবে! অবোধ বঙ্গ-ললনা এ গুরু কার্য্যের মর্ম্ম কি বুঝিবে!

তবু একটা নূতন উপসর্গ সম্প্রতি ঘাড়ে চাপিতে গৃহিণী কোনো অনুযোগ তুলিলেন না! সে উপসর্গ, বাংলা নাট্যমঞ্চের কল্যাণ-কামনায় আমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করা! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও যে-সব সংবাদ-পত্র বাংলা নাট্যমঞ্চের কোনো খপরই রাখিত না, সহসা তারা সকলে বাংলা নাট্য-মঞ্চের সংস্কার-কল্পে প্রতি সপ্তাহে অভিনয় সমালোচনা সুরু করিয়া দিয়াছে! কিন্তু মস্ত বিপদ ঘটিল এই—যে রাত্রি জাগিয়া থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরিয়া ঐ সব নাটক মহানাটকের অভিনয় কে দেখিয়া বেড়ায়! তবু, থিয়েটারগুলার সংস্কারও তো চাই! কাজেই আমার তলব পড়িল! আমার লেখার বাতিক সংবাদপত্র-মহলে সকলেই জানে, তাছাড়া কলমের এমন জোর আর এতখানি নিঃস্বার্থপরতাও তো চট্ করিয়া অন্যত্র মেলে না! কাজটা হাতে আসিল।

সেদিন একরাশ হ্যাণ্ডবিল লইয়া অলীক বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া বেচারা দর্শককে থিয়েটার-সম্প্রদায়ের প্রতারিত করিবার কথা খুব শাণিত ভাষায় লেখা সুরু করিয়াছি, গৃহিণী আসিয়া একটু রূঢ় স্বরেই জানাইয়া দিলেন, এ সব নূতন জঞ্জাল তিনি ঘরে জড়ো করিতে দিবেন না! তাঁহাকে জানাইলাম, বিনা-পয়সায় থিয়েটারেও এবার কেমন সীট্ আদায় করি, স্থাখো—তখন তিনি শান্ত স্বরে কহিলেন,—ঘরের খেয়ে বনের মোষই তাড়িয়ে বেড়াও চিরদিন! রাজ্যির ব্যাগার! লোকেও তো বেছে-বেছে লোক পেয়েছে ঠিক! দু'পয়সা বেশী যাতে ঘরে আসে, সে চেষ্টা কখনো দেখলুম না! এ-সব ছাই-পাঁশ না করে যদি একখানা উপন্যাসও ছেপে বার করতে পারতে, তাহলে তবু দু' পয়সা আসতো।

গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিলাম—আগে সমালোচনায় এই সব বর্ব্বর উপন্যাস-নাটকগুলাকে ধূলিসাৎ করি, তার পর আদর্শ উপন্যাস লিখে দেখাবো উপন্যাস কাকে বলে!—যাক, এ সব অবান্তর কথা! তবু এটুকু না বলিলে নাকি আমার পরিচয়-টুকুই পরিস্ফুট হইবে না—তাই বলিতে হইল।

পাখার বাতাসে ক্লান্তি ঘুচিলে স্নান করিয়া আসিলাম। তারপর ভোজনের পালা। গৃহিণী কহিলেন,—এই যে এত খাটো, এতে শরীর থাকবে কেন! সকালে গোচ্ছার কাগজ-পত্র নিয়ে বসবে, তারপর তাড়া দিয়ে নাইয়ে-খাইয়ে আপিসে পাঠাতে হবে। আপিস থেকে রাত দশটা-এগারোটায় ফিরেও এই ব্যাগারের বস্তা! রবিবারটাও যদি একটু জিরুতে! কথাটা ঠিক। কতবার মনে হইয়াছে, একটা রবিবার বিশ্রাম লইয়া আরাম-সুখ উপ-ভোগ করি। কিন্তু জো কি! সকাল

হইতে কত যে ডাক আসে! তা ছাড়া বন্ধু-মজলিসে সেদিন একবার না বাহির হইলেও নয়!

কহিলাম—বেশ, আজ তো শুক্রবার, পরশু রবিবার। সেদিন পুরাপুরি বিশ্রাম নেবো! সেদিন কাগজ নয়, লেখা নয়, বন্ধু নয়, বান্ধব নয়, সেদিন শুধু তুমি, আর আমি, আর এই গৃহকোণ!

গৃহিণী কহিলেন—থামো!

অগত্যা থামিতে হইল।

শনিবার ছিল মকরন্দ থিয়েটারে নূতন নাটক 'সূর্পণখা'র প্রথম অভিনয়। 'ছুছুন্দর' সাপ্তাহিকের তরফ হইতে তাগিদ আসিল, ও-বইখানা দেখিয়া সমালোচনাটা লিখিয়া সোমবার সকালেই দেওয়া চাই! 'ছুছুন্দর' কাগজের আমিই একমেবাদ্বিতীয়ং আর্ট-ক্রিটিক।

এত-বড় ব্যাপার—সেদিন আপিসের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গৃহে ফিরিলাম। গৃহিণী কহিলেন—এ কি, অকালে দুর্গোৎসব যে!

আমৃতা আমৃতা করিয়া জানাইলাম, থিয়েটারে যাইব।—ওঃ! গৃহিণীর ঐ একটু স্বরে যেন আকাশের বাজ হাঁকিয়া গেল! তিনি বিনা-বাক্য-ব্যয়ে চলিয়া যাইতেছিলেন, সভয় কণ্ঠে কহিলাম,—ফিরেই খাবো। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো। আমার জন্যে তুমিও উপোস করে বসে থেকো না।

গৃহিণী এ কথার উত্তর দিলেন না—দেওয়া বোধ হয় সমীচীন মনে করিলেন না! কাজেই আমার পথ অবারিত রহিল। থিয়েটারে যাইবামাত্র ম্যানেজার আমায় লুফিয়া লইলেন! নাট্যকার কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। আসুন, বক্সে বসবেন। দেরীও তো নেই বিশেষ!

বক্সে আসিয়া বসিলাম। নীচে তাকাইয়া দেখি, বেশ ভিড় জমিয়াছে! শুভ্র পরিপাটী বেশে দর্শকের দল বসিয়া গিয়াছে। দু'টাকার সীটে...ঐ যে আমাদের বড়বাবু সদলে আসিয়া বসিয়াছেন! গর্ব্ব বোধ করিলাম—অফিসে তুমি আমার অনেক উঁচুতে আছ বটে, মাহিনাও পাও খুব মোটা, তা হইলে কি হইবে, এখানে আমার ঠাঁই তোমার বহু উর্দ্ধে, বৎস! আর খাতির কতখানি! কৃতজ্ঞতা জানাইলাম আমার দুই হাতকে, আর আমার সেই মসীজর্জ্জর কলমটাকে! শুধু ইহাদের জোরেই...

গ্রন্থকার? গ্রন্থকার আমাদের কৃপার উমেদার! সমালোচকের পাশে গ্রন্থকার? যত বড় কেতাব সে লিখুক, আমাদের কলমের একটী খোঁচায় তাকে স্বর্গে পাঠাইতে পারি, ইচ্ছা করিলে নরকেও! কে বড়? কিন্তু থাক্ সে কথা! নাট্যকার আসিয়া বুঝাইলেন, বহিখানিতে নূতনত্ব আছে! বেচারী সূর্পণখা! কাব্যের উপেক্ষিতা! কবির নির্ম্মম ইঙ্গিতে তার কি লাঞ্ছনাই না ঘটিয়াছিল! রাক্ষসী,—এই তার অপরাধ? লক্ষ্মণকে সে ভালো বাসিয়াছিল! ভালোবাসা পাপ? তাই তিনি

সূর্পণখাকে প্রাণের অজস্র দরদে নায়িকা গড়িয়া তুলিয়াছেন—প্রেম যে উচ্চ-নীচ মানে না, লক্ষ্মণ তা তো বোঝে না! বর্ব্বর, নির্ম্মম! হোক রাক্ষসী, তবু নারী—তার এ লাঞ্ছনা, এ কি পুরুষোচিত, না বীরোচিত? ভড়কাইয়া গেলাম! এই জিনিষটা তরুণ-দলের উপন্যাসে জোরালো ভাষায় তারা যে ভরিয়া দিতেছে, আর আমি তাদের কলম-আঘাতই করিয়া আসিতেছি! ওদিকে 'ছুছুন্দর'-সম্পাদক এই নাট্যকারের বিশেষ বন্ধু! এ নাটকের সুখ্যাতিই করিতে হইবে, আমার প্রতি এমনি নির্দ্দেশ! পর-মুহূর্ত্তেই চা-সিগারেট-পাণ আসিল। চা-পানান্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মনকে বুঝাইলাম, ভাবনা কি! এমন ফাঁকির আবরণে লিখিয়া যাইব যে, ঐ এক পয়সার কাগজের লেখা হইতে যে-সব হতভাগা পাঠক নিজেদের মত গড়িয়া তোলে, তারা ঠিক বুঝিবে, সূর্পণখার অজস্র সুখ্যাতিই করিয়াছি! 'ছুছুন্দর' কাগজ খানাও হাত হইতে খসিয়া যাইবে না!

অভিনয় দেখিলাম। অভিনয়ান্তে গৃহে ফিরিলাম, রাত তখন ছুইটা। গৃহিণী কহিলেন—কাল কিন্তু দেখে নেবো—রবিবার, ছুটীর দিন। লেখাপড়া করেচো কি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাবো। থেকো একলা তোমার কাগজ পত্র-নিয়ে! ......

আমি কহিলাম—দেখে নিয়ো—কাল বেদব্যাস বিশ্রাম নেবেনই!

রবিবার। আগের দিনে রাত্রি জাগিয়া 'সূর্পণখা'র অভিনয় দেখা! অত রাত্রে শয়ন করিলেও ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার ঘুমাইবার আশায় চক্ষু মুদিলাম—মনের মধ্যে সূর্পণখার সেই সখীর দল গান ধরিয়া মহারঙ্গে নৃত্য জুড়িয়া দিল! প্রমাদ গণিলাম! এপাশ ওপাশ করিলাম—সব বৃথা হইল। নিদ্রা আর ফিরিয়া আসিল না! শয্যা ছাড়িয়া ছাদে উঠিলাম—পায়চারি করিয়া নীচে নামিলাম। গৃহিণী কহিলেন—ছাতে উঠেছিলে কেন? ভাব সংগ্রহ করতে? জবাব দিলাম না। গৃহিণী কহিলেন,—আজ বাড়ীতে থাকবে তো, তাহলে এক কাজ কর, লক্ষ্মীটি... একটিবার নিউ মার্কেটে যাও। সের ছয়েক ভালো মাংস আনিয়ে দাও—একটু ভালো খাও-দাও দিকি। নিত্যি ঐ চাকরদের বাজার-কুড়োনো খেয়ে তৃপ্তিও তো হয়!

মন্দ নয়! কহিলাম—বেশ, চা খাওয়াও। দাড়ী কামাইয়া লইলাম। চা আসিল,—পান করিলাম। বাহির হইব, দেখি, বাহিরের ঘরে খবরের কাগজ আসিয়াছে। খুলিলাম। চোখ পড়িল ফুটবলের রিপোর্টে! ...মোহনবাগান! ইস্..মাতিয়া উঠিলাম। মোহনবাগানের সঙ্গে কাল নটিংহামের খেলা গিয়াছে; মোহনবাগান ড্র করিয়াছে। বহুদিন মাঠে খেলা দেখিতে যাই নাই! গাঙ্গুলি পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া আছে—খেলিতে পারে নাই! বলাই চাটুয্যে! উঃ, বলাইয়ের জয়-জয়কারে আর প্রশংসায়

কাগজের এক-কলম্ একেবারে ভরপূর! দু'-বার foul করিয়াছিল:! বলাইয়ের ঐ তো দোষ!...না! এ রেফারির পার্শ্যালিটি! পাজী, হতভাগা! এরা আবার স্পোর্টস্-ম্যান্! তাতিয়া ঝাঁজিয়া উঠিলাম। এ-সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার! সংস্কার! এদিকেও সংস্কার চাই! নাঃ,খেলার-রিপোর্টও লিখিব এখন হইতে।

মন এমন উৎসাহে ভরিয়া উঠিল যে কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলাম! বেলা ন'টা বাজে, ভৃত্য জগা আসিয়া কহিল,—মা ডাকচেন।

চৈতন্য হইল। বাহির হইতেছিলাম। গৃহিণী কহিলেন,—আর নিউমার্কেটে যেতে হবে না এত বেলায়! কখন মাংস আনবে, আর কখনই বা তা সেদ্ধ হবে! ছেলেগুলো বেলা তিনটে অবধি হাঁ করে থাকবে? তুমি জগাকে দাম দাও, বাপু, ও এই হাতীবাগান থেকেই এনে দিক্। তাঁর মেজাজ ঝাঁজালো!

রাগে অভিমানে টাকা ফেলিয়া দিলাম; টাকা লইয়া জগা চলিয়া গেল। আমিও বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়া ট্রামে উঠিলাম, এবং সোজা আসিয়া নামিলাম, ইডন্ গার্ডেনের ধারে।

বহুদিন আসি নাই! ভিতরে ঢুকিলাম। কয়েক চক্র দিয়া ভারী আমোদ হইল। রৌদ্র? থাক্ রৌদ্র! তবু আরাম আছে। ফেরার মুখে ট্রামটা বহুবাজারে আসিয়াছে, সুধীর ট্রামে উঠিল।

সুধীর কহিল—কোথা থেকে?

কহিলাম—বেড়াতে গেছলুম।

কথায় কথায় ট্রাম হইতে নামিয়া সুধীরের সঙ্গে গিয়া উঠিলাম গজেনদার বাড়ী... গজেনদার বাড়ী আমাদের মস্ত আড্ডা! বৌদির সারাদিন ধরিয়া সেই চা-পরিবেষণ—শুধু তাই? কচুরি, গজা, ফুলুরি—যা চাই! গজেনদার ঘরে খুব ভিড়। মহা তর্ক চলিয়াছে—'সূর্পণখা' নাটক লইয়া। সে-তর্কে ভিড়িয়া গেলাম। রাত্রে অভিনয় দেখিয়া ভালো কথা বলিব বলিয়া যা সব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, কোথায় তা ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেল! বহিখানাকে সর্ব্বতোভাবে রাবিশ প্রমাণ করিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি, একটা বাজে! বৌদি তখন গরম-গরম কচুরী করিয়া পাঠাইয়াছেন! এত বেলায় কচুরি! বাড়ীতে ওদিকে মাংস রান্না হইতেছে! নাঃ! উঠিয়া পড়িলাম এবং ট্রামে চড়িয়া সটান গৃহে!

বাহিরের ঘরের দ্বার খোলা—ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি একটা ঘরের সামনে! আর চারিদিক জলে জলময়! জগা? আকলু? কেহ নাই! ঘরের দ্বার খোলা...যাক্ সব চোরে লইয়া!

তপ্ত মেজাজে দুম্‌দুম্ করিয়া উপরে উঠিতেই গৃহিণী পাগলের মত আসিয়া কহিলেন,—ভারী বিভ্রাট! শীগগির থানায় যাও গো—থানা! কি ব্যাপার? চুরি নাকি! গৃহিণী কহিলেন—না, না, চুরি নয়! এক ভিখিরী মাগী ভিক্ষে চাইতে এসে বাহিরের ঘরে দোরের কাছে পড়ে হাঁফাচ্ছিল। চাকররা বকে—সে বলে, একটু জল খাবো, এই বলে যেমন কলতলায় গেছে, অমনি পড়ে মাথা

ফেটে অজ্ঞান! ওরা ধরে এনে মাথায় মুখে জল দেয়। আমি তো নীচে নামাতে পারি না, কেউ যদি এসে পড়ে! তাই ওকে ধরা-ধরি করে ওপরে আনাই। ভয়ে একজন ডাক্তার ডাকাই। ডাক্তার অত বেলায় কেউ বাড়ীতে থাকে কি! পথ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে কে ডাক্তার যাচ্ছিল, ছেলেরা ডাকে। ডাক্তার এসে দেখে যায়, বলে, বাঁচবে না! গৃহিণীর দুই চোখে অশ্রুর বিন্দু ফুটিল।

—তারপর?

গৃহিণী কহিলেন—তারপর ঐ স্থাখো, মরে গেছে! কি সর্ব্বনাশ, বলো দেখি! এখন কে এসব ব্যবস্থা করে! সেজঠাকুরপোকে খবর দিছলুম। বাড়ী নেই—সব আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে গেছে! পাশের বাড়ীর লোক বল্লে, পুলিশে খপর দাও। তা কে কি করে!

ভালো আপদ! ভাবিয়াছিলাম, এতটা সময় যে করিয়াই কাটুক, স্নানাহার সারিয়া ছুটির দিনটা বিশ্রাম করিব, না—

থানায় ছুটিলাম। থানায় ছোটা আর ইনস্পেক্টরকে গৃহে আনা, সে যে কি ব্যাপার—তা যিনি ভুগিয়াছেন, তিনিই জানেন! তিনি আসিয়া এজাহার লইলেন। তারপর বলিলেন—তাইতো, আপনার চাকররা কেউ মেরেচে নিশ্চয়, কাটা দাগ কপালে! এ তো দেখচি cognizable case. আপনার চাকর দুজনকে arrest করতে হবে—কি করবো, মশায়…? নিরুপায়!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। ক্ষুধায় পেটও জ্বলিয়া যাইতেছে। কোথায় স্নানাহার সারিয়া একটু আরাম করিব—না, থানা-পুলিশ! জগা-আকলু কাঁদিয়া গৃহিণীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। গৃহিণী আকুল নেত্রে আমার পানে চাহিলেন—আমিও তদ্বৎ নেত্রে ইনস্পেক্টরের দিকে চাহিলাম! তিনি বলিলেন,— এক কাজ করুন, আপনি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের কাছে যান্ বরং! ওদের জামিনের হুকুম আনাবেন।

তাঁকে বুঝাইলাম, ডাক্তার ডাকানো হইয়াছিল। তিনি…

বাধা দিয়া ইন্স্পেক্টর কহিলেন—কোন্ ডাক্তার?

গৃহিণীকে প্রশ্ন করিলাম। তিনি কহিলেন—নাম তো জানি না। পথ থেকে কাকে ধরে এনেছিল আকলু।

আকলু কহিল, ডাক্তারকে সে চেনেও না।

ইন্স্পেক্টর কহিলেন—প্রেসক্রপসন্?

গৃহিণী কহিলেন—নেই।

বিষম ব্যাপার! দুর্গ্রহ আর কাকে বলে! ইনস্পেক্টরের কাছে আমার নাম বলিলাম। মস্ত লেখক, তাও খুলিয়া বলিলাম! বাংলা সাহিত্যের আমি যে এক-জন পাণ্ডা, তাও নিজের মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল—কিন্তু সব বৃথা! তিনি বলিলেন,—আইন-মতে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য! 54 বলে একটা ধারা আছে criminal procedure codeএ জানেন তো……?

আমার দুর্ভাগ্য, পুরাণ জানি, ইতিহাস জানি, ধর্ম্ম জানি, আদর্শ জানি, তা লইয়া গভীর গবেষণা করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতেও জানি! জানিনা শুধু criminal procedure codeএর ঐ ৫৪নং ধারাটি!

ইনস্‌পেক্টর বলিলেন,—তদারক হবে। লাস নিয়ে এখন মর্গে পাঠাবো। ওর সনাক্ত দরকার—ঢের হাঙ্গামা, মশায়। আপনার চাকররা চলুক আমার সঙ্গে,—ভয় নেই, ওদের কোমরে আমি দড়িও দেবো না, হাতে হাতকড়িও লাগাবো না। আপনি এক কাজ করুন বরং—পুলিশ-কোর্টের কোন উকিলকে নিয়ে এ-সি'র কাছে যান!—জোড়াবাগান থানার ওপরেই তাঁর কোয়ার্টার্স—দেখাও হবে এখন। এ-সি বাঙ্গালী।

অগত্যা!...

চাকরদের জামিন করাইয়া উকিল বাবুকে দশ টাকা নগদ ও গাড়ীভাড়া পাঁচ টাকা খরচ করিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন পথে গ্যাস জ্বালা হইতেছে। গৃহিণী বিশুষ্ক মুখে দোতলার সিঁড়ির সামনে বসিয়া দাসীর সঙ্গে অদৃষ্টের দুর্ভাগ্যের শতরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ফিরিতেই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—ঢুক্‌লো? আঃ! এসো, মিছরি ভিজুনো আছে, খাও আগে...যা তো মিতুন, এনে দে...

দাসী মিছরির সরবৎ আনিয়া দিল।

গৃহিণী কহিলেন—জিরিয়ে স্নান করে নাও, ভাত চড়েছে। নতুন হাঁড়ি-কুড়ি আনাতে হলো। কোথাকার পথের কে ঘরে এসে মলো! কি যে হবে, বাপু! আমার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিউরে উঠচে!

ছেলেমেয়েরা?

গৃহিণী কহিলেন,—তাদের ন'দার ওখানে পাঠিয়ে দিছি! তুমি এখন এসো—সেই এক পেয়ালা চা কোন্ সকালে খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েচো!...পেটে কিছু পড়েনি, তায় এই ঘুরুনি! সাধ করে মাংস চড়ালুম, দুটো ইলিশ মাছ আনালুম...সব ছরকোট হলো, কারো মুখে গেল না! এমনি গেরো!

গৃহিণী মনের বেদনায় প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমারো মনটা অশ্রুর বাষ্পে ভিজিয়া যাইবার মত হইল! হায় রে, গজেনদার বাড়ীর কচুরিগুলাও যদি খাইয়া লইতাম!

ছুটীর দিনটা আরামে কাটাইব, ভাবিয়াছিলাম, না, কি এ অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগ! এ যে কল্পনার অগোচর! পাড়ার গৃহে গৃহে তখন শাঁখ বাজিতেছে। গৃহিণী কহিলেন,—ওরে জগা, ওরে আকলু, আয়, বাবা, একটু করে মিছরির সরবৎ দু'জনে মুখে দে...আগে! আগা, বাছাবে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল

বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন, শুধু বাংলা দেশে কেন ভারতবর্ষেই বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার ব্যবসা, বিশেষতঃ দেশীলোকের পরিচালনে আমাদের দেশে ছিলই না। অবশ্য বিলাত হইতে নানাপ্রকার ঔষধপত্রাদি আমদানী করিয়া কেহ কেহ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন। গত শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া হইতে সুতা কাপড় রং করাই প্রধানতম রাসায়নিক ব্যবসা ছিল। যদিও এই রংএর কাজ অতিশয় গ্রাম্য উপায়ে হইত, তথাপি যে রং উৎপাদন হইত তাহার স্থান দেশ বিদেশের রংএর বাজারে অতি উচ্চে ছিল। এই রং করার কাজে, রং-ব্যবসায়ীদের অতিশয় বুদ্ধির এবং কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই সময় নীল এবং মঞ্জিষ্ঠা রং ব্যবসায়ে প্রধান উপকরণ ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইবার কিছু পর হইতে বাংলাদেশের যুবকদের মনে পাশ্চাত্য প্রণালীতে বিজ্ঞানকে আমাদের ব্যবসায়ে এবং ঘরের কাযে প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। কিন্তু এই ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আমাদের দেশের দারুন অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাও বুঝিতে পারিলেন। এই সময় আরও দেখা গেল যে আমাদের দেশে "কাচা মালের" কাটতি নাই, ফলিত বিজ্ঞানের বলে যদি এই কাচা মাল কাজে লাগাইতে পারা যায়, তবে দেশের ভেক বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ সময় দেশে ফলিত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না বলিলেই হয়। ফলিত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাগার আমাদের দেশে মাত্র তিরিশ বা চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে এই সকল ছিল না। স্কলারশিপ্ দিয়া বিদেশে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা এই সময় হইতে সুরু হইয়াছে।

বাংলা দেশে গত ৪০ বৎসরে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এবং ব্যবসার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিফল হইয়াছে, কেহ কেহ বা প্রচুর লাভ করিয়া ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া জমিদারী চালে বাড়ী ঘর করিয়া বাস করিতেছে।

ডি, ওয়ালডি কোম্পানীই বাংলাদেশে রসায়নকে পাকারকমে ব্যবসায় লাগায়। এই কোম্পানীর কারখানা প্রথমে ছিল কাশীপুরে ; তাহার পর এই কারখানা কোন্নগরে উঠিয়া গিয়াছে। এই কারখানা প্রধানতঃ Caoutchicine নামক এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিত। এই দ্রব্য রবার হইতে পাওয়া যায়, এবং মেথিলেটেড স্পিরিট তৈয়ারীর কাজে লাগে। ইহা ব্যতিরেকে ওয়ালডি কোম্পানীতে নানাপ্রকার খনিজ আরক (acids) ইথার, কয়েকপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও প্রস্তুত হইত।

কিন্তু রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং নানাবিধ ঔষধাদি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যবসায় করিবার মত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করার কাজে প্রথমে বাংলা দেশে "বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্" হাত দেয়। প্রথমে এই কোম্পানী দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রস্তুতের কার্য্যেই শক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কার্য্য হাজারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের আরম্ভ অতি সামান্য। আমি কোনো দিন কল্পনা করিতেও পারি নাই যে সামান্য অণুসমান বীজ হইতে এত বড় বৃক্ষ গজাইবে। ৯১, আপার সারকুলার রোড ভবনে বেঙ্গল কেমিক্যালের বীজ পতন হয়। ক্রমে ক্রমে আমাদের কার্য্যের প্রসার হইতে লাগিল এবং বাজারে আমাদের জিনিষ বিক্রয় হইতে লাগিল। এই সময় বাংলা দেশের লোকে দেশীয় লোকের প্রস্তুত ঔষধে বিশ্বাস করিতে পারিত না, গর্ব্ব না করিয়াও বলিতে হয় আমরাই দেশের লোকের এই ভ্রান্তি দূর করিয়াছি। বেঙ্গল কেমিক্যালের কল্পনা আমার মাথাতেই প্রথমে আসে, কিন্তু এই কল্পনা, কল্পনাতেই মৃত্যুলাভ করিত, যদি না সেই সঙ্গে আমি স্বদেশভক্ত এবং স্বার্থত্যাগী কয়েকজন বন্ধুর প্রাণপণ সহায়তা লাভ না করিতাম।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমি ৯১, আপার সারকুলার রোড বাড়ীর একটি ঘরে বাস করি, বাড়ীর চারিদিকে খোলা জমি। সেই জায়গাতে খোলা, ভাঁড়, পিপা, কলসী ইত্যাদি পড়িয়া আছে। এই সমস্ত পাত্রে প্রস্তুত হইত তেজাব, জম্বীরাম্ল (Nitric Acid, Citric Acid,) হীরাকষ প্রভৃতি। এই সময়ে মনে পড়ে, পাড়ার লোকেরা একবার আমাদের কারখানার উপর ক্ষেপিয়া যায়। ক্ষেপিবার কারণ—আমাদের কারখানা বাড়ীর ছাদে কসাইএর দোকান হইতে কাঁচা হাড় আনিয়া শুকাইত। এই হাড় পোড়াইয়া সেই ভস্ম হইতে ফস্ফোরাস্-ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত হইত। এই রকমে নানা উপায়ে আমরা সামান্য একটী কারখানার গোড়া পত্তন করি। আমাদের মূলধন বলিতে অর্থ তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু যে কয়জন সহকর্ম্মী ভগবানের দয়ায়

লাভ করিয়াছিলাম তাঁহারা সকলেই নিজেদের সমস্ত শক্তি এবং স্বার্থ বেঙ্গল কেমিক্যালকে দিয়াছিলেন।

আমার প্রথম সহযোগী আমার বাল্য-বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসু। তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় আমাদের প্রস্তুত দেশীয় ঔষধ ডাক্তার-মহলে খ্যাতি লাভ করে। অমূল্য আসিবার কিছুকাল পরে তাঁহার ভগিনী-পতি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিংহও রসায়নে এম, এ পাশ করিয়াই বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে যোগদান করেন, কিন্তু তিনি অল্প-কালমধ্যেই কারখানার কাজ করিতে করিতে ভ্রমক্রমে প্রুসিক এসিড সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু প্রভৃতি আরো অনেকে বহু পরিশ্রম করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া গিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ উপাধি লাভ করিয়া ১৯০৩ সালে (অর্থাৎ যখন ইহা যৌথ-কারবারে পরিণত হয়) বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান করেন। এই কারখানার উত্তরোত্তর যে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা তাঁহার কৃতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতার কম পরিচায়ক নহে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তও ১৯০৫ সালে কারখানার সুপারিনটেণ্ডেণ্টরূপে প্রবেশ করেন। তিনিও অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের পরীক্ষাকাল পার হইয়া গেলে কারবারটি যখন দাঁড়াই-বার মত হইল তখন আমরা ইহাকে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতা হইতে বাঁচাইবার জন্য লিমিটেড কোম্পানী করিয়া দিলাম। কোম্পানীর বাল্যাবস্থায় আমাদের দেশের ডাক্তারগণ ভরসা করিয়া দেশীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না, সেই কারণে কেবল দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত করিলে কোম্পানী ভাল চলিবে না, এই আশঙ্কায় দেশীয় ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিলাতী ধরণের পেটেণ্ট ঔষধ আমরা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম।

বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন লিমিটেড কোম্পানী হয়, তখন তাহার মূলধন ছিল ২৫০০৲ টাকা। আজ এই কোম্পা-নীর মূলধন ১৯, ০০, ০০০৲ টাকা এবং রিজার্ভ ফণ্ড (Reserve fund) ইত্যাদি ধরিলে ২৫ লক্ষের ও অধিক হইবে। লিমিটেড হইবার প্রায় ৪ বৎসর পরে ৯০, মানিকতলা মেনরোডে কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হয়। এইখানে কোম্পানী বাজারে চালান দিবার মত প্রচুর পরিমাণে মহাদ্রাবক (Sulphuric Acid) এবং অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল নানাপ্রকার দ্রাবক বাজারে যোগান দিবার পর হইতে

দ্রাধকের মূল্য শতকরা ২৫৲।৩০৲ টাকা কমিয়াছে।

চল্লিশ বিঘা জমির উপর মাণিকতলার কারখানা অবস্থিত। এখানে এসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারী করার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া বিবিধ আনুসঙ্গিক ব্যাপার যথা—ছুতোরখানা, প্যাকিংঘর, ঢালাইঘর, গুদাম, কর্ম্মচারীদের মেস এবং বাসা বাড়ী, ছাপাখানা ইত্যাদি সবই সুশৃঙ্খলভাবে সাজান আছে। যেখানে যাহা আছে এবং যাহা দরকার ঠিক তাহা তেমনি করিয়া বসান হইয়াছে। উত্তর কলিকাতা সহরের মতন এই কারখানা আপনা হইতে গজায় নাই, ইহাকে প্লান করিয়া বাড়ান হইয়াছে।

ছাপাখানাতে কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন, লেবেল, ক্যাটালগ ইত্যাদি ছাপা হয়। এই সমস্ত ছাপিতেই প্রেসকে মাঝে মাঝে বেশ বেগ পাইতে হয়, কাজেই বাহিরের কাজ করিবার আর দরকার হয় না। কারখানার ওয়ার্কসপে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত যন্ত্রাদি আজকাল বাজারে বেশ চলিতেছে। বিলাত হইতে মিস্ত্রী আমদানী করা হয় নাই, দেশের লোককে দেশের লোকেই গড়িয়া-পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। কারখানার নূতন কিছু তৈয়ারী এবং পুরাতন মেরামত এই ওয়ার্কসপ হইতেই হয়। বাহির হইতে মিস্ত্রি ডাকিয়া এই সকল কাজ করাইবার দরকার হয় না। নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য শেষ করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ কারখানার লোক দ্বারাই হয়।

বাহিরের অনেক কলেজের ল্যাবোরেটারীর পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজই বেঙ্গল কেমিক্যাল পারদর্শীতার সহিতই করিয়া থাকে।

এসিড ঘরে ছয়টী সীসার চেম্বার আছে। আগা গোড়া সীসার তৈয়ারী। কারখানাতেই দক্ষ লেড্‌ম্যান আছে। এসিড চেম্বার পরিদর্শন করিয়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে বিলাত হইতে পাকা কারিগর আনিলেও ইহা অপেক্ষা মজবুত এবং সুন্দর এ্যাসিড চেম্বার হইত না। এসিড চেম্বারের কাজ অষ্ট-প্রহর চলে। দিন প্রায় ২২,০০০ পাউণ্ড এসিড প্রস্তুত হয়। গবর্ণমেণ্টের ট্যাঁকশালে, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কসপে, গোলাবারুদের কারখানা ইত্যাদিতে বেঙ্গল কেমিক্যালের নানাপ্রকার এসিড ব্যবহৃত হয়।

ফার্ম্মেসীতে বাসক, গুলঞ্চ, নিম, কালমেঘ, হরিতকী ইত্যাদি হইতে নানাপ্রকার দেশীয় ঔষধ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে। সুখের বিষয়, এই সমস্ত ঔষধ আমাদের ডাক্তারগণ অবাধে ব্যবহার করিতেছেন। সিরাপ বাসক, কালমেঘের তরলসার, যমানীজল, গুলঞ্চের তরলসার ইত্যাদি বিখ্যাত

দেশীয় ঔষধ সমূহ আজকাল আমাদের দেশে কাহারো কাছে অবিদিত নাই। বেঙ্গল কেমিক্যালই ভরসা করিয়া এই সমস্ত ঔষধ প্রথমে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। আজকাল অবশ্য আরও অনেক কারখানা এই সমস্ত দেশীয় ঔষধাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রস্তুত করিতেছে ; কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালই এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক।

চিকিৎসা-শাস্ত্র আমাদের দেশে এক সময় অতি উন্নত ছিল। এমন কি-এমন একদিন ছিল যখন তিব্বত, আরব, পারস্য, সিংহল, চীন ইত্যাদি বহুদূর দেশ সমূহ হইতে ছাত্র আসিয়া আমাদের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাইত। অনেকেই আমাদের দেশের চরক ও সুশ্রুতের নাম জানেন। তাঁহারা কোন সময়ের লোক ছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা শক্ত, তবে ৩০০০ বৎসরের এদিকে নয়, একথা বলা যায়। গত কয়েকশত বৎসর হইতে দেশীয় চিকিৎসার অবনতি আরম্ভ হয়। তারপর যখন পাশ্চাত্য ডাক্তারী চিকিৎসার প্রচলন হইতে সুরু হইল, তখন দেশীয় ঔষধের প্রায় লুপ্ত গৌরবটুকুও উড়িয়া যাইবার মত অবস্থায় আসিয়া পঁহুছিল। ঠিক এমনি সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল দেশীয় উপকরণের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংযোগ করিয়া নূতন একশ্রেণীর ঔষধ বাহির করিল। বর্ত্তমান সময়ে দেশের হাওয়া আবার বদলাইয়াছে।

দেশীয় ঔষধের প্রতি লোকের বিরাগ অনুরাগে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসার মধ্যে অনেক কিছু ভাল জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনাবশ্যক বাজে জিনিষও প্রচুর পরিমাণে ছিল। কবিরাজী ঔষধাদির মধ্যেও এই প্রকার অনেক কিছু আছে যাহা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, যাহাদের ঔষধ হইতে একেবারে বাদ দিলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বেঙ্গল কেমিক্যালই কবিরাজী ঔষধাদি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজী-শাস্ত্রকে নূতন জীবন দান করিয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সুগন্ধি প্রস্তুত বিভাগে নানাপ্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি বেঙ্গল কেমিক্যাল সুগন্ধির নাম আজকাল সর্ব্বজন পরিচিত। এত কম দামে এত ভাল এবং পরিমাণে বেশী দেশী বা বিলাতী কোন সুগন্ধি বাজারে নাই। নানাপ্রকার সুগন্ধি চুলের তেলও প্রস্তুত হইতেছে। ক্যাম্থার-আইডিন তেলের নাম বাংলা দেশের ছেলে বুড়া সকলেই জানে।

সমস্ত কারখানা ব্যাপিয়া ট্রলির জন্য রেল পাতা আছে। ইহাতে মাল চলা-চলের বড় সুবিধা হয়।

কারখানার একটি ফায়ার-ব্রিগেড আছে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা নিজেদের কাজে ক্রমশঃ শিক্ষালাভ করিয়া নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত কারখানাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় কোথাও প্যাণ্ট কোট পরা সাহেব নাই। সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকলেই এদেশের লোক। কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ জানাইবার দরকার হইলে তাহারা সোজাসুজি ম্যানেজার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিতে পারে। তাঁহাদের দেখা পাওয়া একেবারেই শক্ত ব্যাপার নয়। বেঙ্গল কেমিক্যাল পুরা-পুরি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। এইখানে বাঙ্গালীর অর্থ, বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর সামর্থ্য সবই বাঙ্গালীর। আমাদের দেশের যে সকল অতি পণ্ডিত লোকেরা বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতায় আস্থাবান নহে, তাহারা একবার বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিবে, কেমন করিয়া কেবল বাঙ্গালীর দ্বারা এত বড় কল কব্জার ব্যাপার চলিতে পারে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের আর একটি কৃতিত্বের কথা না বলিলে এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না। গত কয়েক বৎসর হইতে কোম্পানী টিউব ওয়েল বা নলকূপ তৈয়ার করিতেছে। কোম্পানি কলিকাতা করপোরেশন, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, অনেক ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ইত্যাদির জন্য নলকূপ করিয়া দিয়াছেন। সবগুলিই বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের আরো প্রসার হইতেছে। পানিহাটী (ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর কলিকাতা হইতে প্রায় ৮ মাইল) নামক স্থানে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ৮৫ বিঘা জমি বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা বৃদ্ধির জন্য দখল করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐখানের কারখানাতে তুলা, ব্যাণ্ডেজ, আলকাতরা হইতে ফিনাইল, পিচ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। পানিহাটী বা পেনেটির কারখানা নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ইহা বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার আদি কারখানা অপেক্ষা অনেক বড় হইবে। বর্ত্তমানে বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রস্তুত হয়:—

রাসায়নিক দ্রব্য।—এসিড, এমোনিয়া, ফটকিরি, হীরাকস।

ঔষধ।—ডাক্তারী টিংচার আদি। দেশীয় গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার ঔষধ। Tea waste হইতে Caffine.

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—Fire Extinguishers, Gas Plants, Tube wells.

মাণিকতলার কারখানাতে কুলি-মজুরদের জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। অল্প বয়স্ক সকলেই প্রায় এইখানে সময়-মত পড়াশুনা করিতে যায়। কারখানার সকল কর্ম্মচারীর জন্য একটি হাঁসপাতাল একজন ডাক্তারের চার্জ্জে আছে। আমোদ-আহ্লাদের জন্য একটি ক্লাবও কারখানাতে আছে। কারখানাটীকে

একটি সম্পূর্ণ সহর বলা যাইতে পারে। অন্যূন ১২০০ শত শ্রমজীবী এই কারখানায় নিযুক্ত। ইহাদের অনেককেই বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বর্ষা-স্বপন

ওগো সেদিন গগন পারে—
পাগল মেঘে বাদল এল
হেথায় কাহার খোঁজ সে পেল
নেবে এল ধারার পথে
ধরার অভিসারে!
শ্রাবণ ধারার সুরে সুরে
কোন্ সে সুদূর বঁধূর পুরে
পেতে কি ধন ফিরছিল মন
সে কোন্ জনার আশে—
ঘন বাব্‌লা বনের পাশে
ভরা পাগ্‌লা নদীর ধারে!
আমি হঠাৎ পেলাম তারে
আমার আঁধার কুটীর-দ্বারে
একটী চাওয়াই ঘা দিল মোর
হৃদয়-তন্ত্রীটারে!
ও তার বিজলী-চমক্ চাওয়া
সাথে বর্ষা মেঘের হাওয়া
মেঘকালো তার চুলে
কোমল বাদল হাওয়া দুলে—
তার ঐ বর্ষা বেশের রূপে
কখন্ হারিয়ে গেলাম চুপে
কথা হয়নি কিছুই ভুলে!
দেখি শূন্য ঘরের কাছে
শুধু দাগ্‌টী পায়ের আছে!
ও সেই সিক্ত পায়ের ছাপে—
বৃথাই পরাণ আমার কাঁপে!
কখন্ মিলিয়ে গেছে সে যে
ঘন শ্রাবণ প্লাবন ধারে!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্যিকের প্রতি *

(ক)

জাতীয় স্বভাবে অভাব।

—:o:—

হে নবীন সাহিত্যিকগণ! যদি দীর্ঘ সাহিত্যিক প্রবন্ধ বা বক্তৃতা শুনবার আশা করে আজ তোমরা এসে থাক তবে নিরাশ হবে। আমি যা বলতে চাই, তা আমার বলতে ও তোমাদের শুন্‌তে বোধ হয় দশ মিনিটের বেশী লাগবেনা—কিন্তু যদি আমার বলা অনুযায়ী কাজ করতে চাও তবে সারাটা জীবন তাতেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

যেখানেই বাঙ্গলার যুবকদের একত্রিত দেখি সেখানেই তাদের মনের ভিতর তলিয়ে তাদের মনুষ্যত্বের মাপটা নিতে ইচ্ছা যায়। ডানপিটে ছেলেদের মাপ পাওয়া সহজ, সেটা বাহ্য ক্রিয়া কলাপেই অনেকটা প্রকাশিত হয়। তাদের ভিতর আর কিছু না হোক্ একটা মনের জোর, একটা অকুতোভয়তা পাওয়া যায়, সেটা সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে মনুষ্যত্বের একটা বড় অংশ। কিন্তু যে সব ছেলেরা শুধু কলাবিৎ বা শুধু সাহিত্যিক, তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় নিতে অনেকখানি ডুবজলে নামতে হয়। হয়ত বা এত গভীরে—যেখানে দৈনন্দিন আটপৌরে মানুষের বাসই নেই, যেখানে থাকেন শুধু তিনি যিনি এক, অদ্বিতীয়, অন্তর্যামী, সর্ব্বগত। সুতরাং অত গভীরে নাম্‌লে নামরূপধারী মানুষবিশেষের পরিচয় অপ্রাপ্তই থেকে যায়। অথচ সাহিত্যিক বা কলানুশীলনীর কাছেই অধিকমাত্রায় মনুষ্যত্বের প্রত্যাশা করা যায়। কেননা তারা হল হিতের, সুন্দরের ভক্ত সেবক ও অনুগামী। যা কিছু হিতকর, যা কিছু সুন্দর তা তাদের জীবনে প্রতিফলিত দেখা, তাদের কার্য্যে পরিস্ফুট পাওয়াই লোকের প্রত্যাশার বিষয় হয়। তোমরা সাহিত্যিক, সাহিত্য-সংসদের সদস্য। সাহিত্যচর্চ্চা সাহিত্যানুরাগই তোমাদের বিশেষত্ব। আদর্শ সাহিত্যের উপাদান হচ্ছে মহৎ ও সুন্দর ভাব। তোমরা তাই নিয়ে নাড়া চাড়া কর, তাই নিয়ে মাখামাখি কর। সেই মহৎ ও সুন্দরের রঙ্ তোমাদের সত্তার উপর কতটা ধরেছে তার মাঝে মাঝে হিসেব রেখো।

Blackie's Self.-Culture নামক পুস্তকে The Culture of the Intellect প্রস্তাবে তিনি যা বলেছেন তার

* শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সারাংশ তোমাদের শোনালে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"In modern times instruction is communicated chiefly by means of books. Books are no doubt very useful helps to knowledge,...but the original and proper sources of knowledge are not books, but life, experience, personal thinking, feeling and acting * * Without living experience to work on, books are like rain and sunshine fallen on unbroken soil. * * As a treatise on mineralogy can convey no real scientific knowledge to a man who has never seen a mineral so neither can works of literature and poetry instruct the mere scholar who is ignorant of life, nor discourses on music him who has no experience of sweet sounds, nor gospel sermons him who has no devotion in his soul or purity in his life. All knowledge which comes from books comes indirectly, by reflection, and by echo ; true knowledge grows from a living root in the thinking soul ; and whatever it may appropriate from without, it takes by living assimilation into a living organism, not by mere borrowing."

বইয়েতে যে সকল ভাবের সঙ্গে পরিচয় হবে সেগুলো যতক্ষণ নিজের রক্ত-মাংসে পরিণত না হচ্ছে ততক্ষণ বৃথাই বইয়ের পোকা হয়ে থাকা। তাই ধার্ম্মিক আর সাহিত্যিকের গন্তব্য আসলে এক—পথ যদি বা স্বতন্ত্র হয়। একজন নীরসতার ভিতর দিয়ে আর একজন সরসতার ভিতর দিয়ে মহত্বের রাজ্যে পৌঁছবে। এর জন্যে চাই প্রত্যেক সাহিত্য-সংসদীকে ব্যক্তিগত-ভাবে তার মনের কর্ষণ করা, মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা। নিজের ভিতর অবগাহন করে দেখতে হবে, নিজের কি কি অপগুণ আছে, সেগুলি বিষবৃক্ষের মত ওপ্‌ড়াতে হবে,—আর কি কি সদ্‌গুণ আছে—সেগুলি অমৃতবৃক্ষের মত পোষণ, সেচন ও বর্দ্ধন করতে হবে—তবেই প্রকৃত আদর্শ সাহিত্যিক হবে। শুধু কবিতা লেখায় নয়, প্রবন্ধ রচনায় নয়, নিজেকে মানুষ তৈরি করাতেই সাহিত্যিকের যথার্থ সাহিত্য-রুচি ও সাহিত্য-ভক্তি প্রমাণিত হবে।

সমষ্টিগত ভাবেও নিজেদের গড়তে হবে। আজ দেশের প্রধান কথাটা কি? জাতীয়তা,—অর্থাৎ একের অনেকে, ক্ষুদ্রের বৃহতে, পরিচ্ছিন্নের ব্যাপকে আত্মবিস্তৃতি।

যেমন ব্যক্তিবিশেষের একটা ব্যক্তিগত স্বভাব আছে; তেমনি জাতিবিশেষের একটা জাতিগত স্বভাব আছে। কোন জাতির বহুব্যক্তির মধ্যে যে কতকগুলি ঝোঁক সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় সেইগুলিই সেই জাতির জাতীয়-স্বভাব বলে গণনীয় হয়। এখন দেখতে হবে আমাদের সেই জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় স্বভাবে অভাব কি কি আছে। কোথায় কোথায় ত্রুটী পূরণ করলে তবে আমরা জাতীয় চরিত্রে বড় হব,—জাতীয়তায় বলিষ্ঠ হব।

শোনা যায় বাঙ্গালী পরস্পরের হিংসেয় ভরা—কেউ কারো উন্নতি সইতে পারে না, সেইজন্যে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে গড়ে ওঠে না। তাই জন্যে আজ আর বাঙ্গালীর বাণিজ্য ব্যবসা চলেনা, যৌথ-কারবার চলেনা, কণ্ট্রাক্টরি চলেনা—সব মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও পাঞ্জাবীর হাতে যাচ্ছে। এ কথা সত্য কি না হে সাহিত্য-সংসদের যুবকবৃন্দ তোমরা নিজেদের মনের ভিতরে তলিয়ে দেখ। পরস্পরের প্রতি কতটা ঈর্ষা পোষণ কর বা কতটা ঈর্ষা দমন কর বুঝে দেখ। ব্যক্তির বুকের গোড়াটাতে যে বিষটুকু আছে, সেইটেই জাতিতে ছড়িয়ে যাবে। ধরে ফেল সেইটুক এই বেলা, এবং ঝেড়ে ফেল, জ্বালিয়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল—চড়তে দিও না, সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত হতে দিও না।

আর একটা কথা শোনা যায়—বাঙ্গালী বড় অলস, কুড়ে—খাটতে চায় না, পরিশ্রম করতে চায় না, বসে বসে গল্প করতে, পরচর্চ্চা করতে, তাস পিটোতে বা সিগারেট টান্‌তে পেলে আর কিছু চায় না। সাহিত্য-সংসদের যুবকবৃন্দ তোমরা শতবার শুনেছ—Genius is the capacity to take infinite pains—তোমাদের অন্ততঃ সকলেরই সাধ যায় এক একটি literary genius হতে, সুতরাং অক্লান্ত সাধনা বা কর্ম্মোদ্যম, তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ত করতেই হবে।

আর একটা কথা ধর—গড়িমসি, সময়ের মূল্য না জানা, সময়ের চুক্তি রক্ষা না করা—এই আমাদের আর একটা জাতীয় অভাব বলে নিন্দা আছে। সে জাতিগত অভাবের মূলেও ব্যক্তিগত ত্রুটী বিদ্যমান্। প্রত্যেকে সতর্ক হও, প্রত্যেকে নিজের চরিত্রগঠনে তৎপর হও, নিজের প্রতি কড়া নজর ও কড়া শাসন রাখ—তাহলেই জাতীয় কলঙ্কেরও অবসান হবে। এই রকমে প্রতিবিষয়ে চিন্তা কর, নিরীক্ষণ কর, অনুধাবন কর। অন্য জাতিতে কি কি সদ্‌গুণ আছে, যা আমাদের মধ্যে নেই, তাদের জাতীয় স্বভাবে কিসের সদ্ভাব রয়েছে, আমাদের স্বভাবে যার অভাব-বশতঃ আমরা উঠতে পারছিনে—অন্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছিনে। সাহিত্যের ভিতর তোমরা এই সব আলোচনা অনেক সময় পেয়ে থাক, সেই আলোচনাগুলি সম্যক আয়ত্ত

করে তার সুফল স্ব স্ব চরিত্রে বিকশিত কর। এক এক দিনের জন্য, এক এক সপ্তাহের জন্য, এক এক মাসের জন্য, এক এক বৎসরের জন্য এক একটা চরিত্রগঠনী সাধনা গ্রহণ কর—এইভাবে তোমাদের সাহিত্য-সংসদকে জীবনের দ্বারা জীবন্ত কর, শুধু পাঠের দ্বারা বা বক্তৃতার দ্বারা জড়বৎ করে রেখোনা।

আমি চাই বাঙ্গালীর ভিতর practicality—কেবল sentimentality, নয়, —আমি চাই তোমাদের জলন্ত অগ্নি দেখতে, শুধু ধূমায়মান নয়! ভাবের জগতের ডুবুরি হলে চলবে না শুধু—বাস্তব-জগতে মণিমাণিক্য হাতে নিয়ে উঠতে হবে। যা ভাবো তা হও এই চাই। সাহিত্য-সংসদের ভাবুকদের কাছে জাতির আশা ও দাবী সব চেয়ে বেশী। সে আশা পূরণ করবে কি? সে দাবী দেবে কি?

শ্রীমতী সরলা দেবী।

(খ)

পল্লী পাঠাগারের আদর্শ *

—০:—

পাঠাগারের উন্নতিকল্পে কিছু করিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের দেশের পাঠাগার কিরূপ হওয়া উচিত, অর্থাৎ পাঠাগারের আদর্শ কি তাহা ঠিক করা। হয়ত প্রত্যেকস্থানের পাঠাগারের আদর্শ সব সময় সব বিষয়ে ঠিক এক না হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও মূলতঃ বড় অধিক প্রভেদ না হইবারই কথা।

মানুষের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি-সাধনে সহায়তা ও পাঠাদি দ্বারা নির্ম্মল আনন্দে সময়াতিপাত করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়াই পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং যে পাঠাগার এই কার্য্যের যতটা উপযোগী, তাহাই ততটা আদর্শস্থানীয়।

পাঠাগার হইতে লোক শিক্ষার যে সাহায্য হয়, তাহার প্রধান উপকরণ সদ্‌গ্রন্থ। বহুল বিষয়ের বিবিধ গ্রন্থ সমূহই পাঠাগারের শোভা এবং সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহই উহার প্রথম কার্য্য। কিন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি সুন্দর মূল্যবান গ্রন্থরাজি সজ্জিত রাখিয়াই মানুষকে জ্ঞান দিবার সহায়তা করা হয় না। যাঁহারা স্বেচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে উৎসুক, তাঁহাদের উহা লাভের

*উত্তরপাড়ায় হুগলি জেলা পাঠাগার সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

সুযোগ করিয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থপাঠে নিরত নহেন, তাঁহাদের পাঠেচ্ছা উদ্দীপ্ত করাও পাঠাগারগুলির একটি বিশেষ কার্য্য। এই উভয় কার্য্যের জন্য একদিকে যেমন পাঠার্থ ভাল ভাল পুস্তকাদি সহজ ও বিনা বা স্বল্প ব্যয়ে লভ্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তেমনই পাঠের জন্য যাহাতে একটা তৃষ্ণা বা লোভ জন্মে সেজন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও করিতে হইবে।

শুধু এদেশে নয়, জগতের সকল সভ্য দেশেই বহু প্রাচীন কাল হইতে পুস্তকাগারের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মিশর, গ্রীস্, রোম্ প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন কালেও, এমন কি ছয় সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। জ্ঞান-বিদ্যা মণ্ডিত করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্ব দানের জন্য বিদ্যালয় অপেক্ষা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত কম নহে বরং এক হিসাবে অধিকও বলা যাইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা, ভাষার জ্ঞান হইতে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য স্কুল কলেজ থাকিলেও, ঐ সকল লব্ধ বিদ্যার উৎকর্ষতা লাভের জন্য, গবেষণা কার্য্যের দ্বারা নিজের ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য, জ্ঞান-দীপ্তির দ্বারা তমোময় মানব-মনকে রত্ন-মঞ্জুষার শোভা দানের জন্য ভাল ভাল পাঠাগারের আবশ্যক। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে শিক্ষার স্থান নাই, পাঠাগারের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাহা যথেষ্ট আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ের উপযোগীতা যথেষ্ট হইলেও, সকল বয়সের সকল লোকের শিক্ষালাভের জন্য সাধারণ পাঠাগারই প্রধান স্থান। জ্ঞানান্বেষী শিক্ষিতজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেমন পাঠাগারের গ্রন্থ সমূহ হইতে বহু বিষয় জ্ঞানাহরণ করিয়া থাকেন, স্বল্প-শিক্ষিত সামান্য ব্যক্তিগণ অবসর সময় যাপন বা চিত্ত বিনোদনের জন্য উপন্যাস নাটকাদি লঘু সাহিত্য হইতে অনেক জ্ঞান লাভ ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হইতে পারেন।

উপন্যাস ও নাটকের নামে কোন কোন সুধীজনকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে দেখা যায়। অবশ্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা অশ্লীল অথবা লালসা-উদ্রেককারী নাটক উপন্যাসাদি গ্রন্থ, সকলের পক্ষেই অপাঠ্য, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠে কোন আশঙ্কার কথাই নাই বরং উপকারের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। বালক ও যুবকদের জন্য অতিরিক্ত পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে বা অবসর সময়ে পাঠের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচিত শিক্ষাপ্রদ গল্প বা উপন্যাসেরও প্রয়োজন। এ জন্য উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া বিশেষভাবে পুস্তক সকল সুবিচক্ষণ বিজ্ঞ লেখকদিগের দ্বারা

লিখিত হওয়া আবশ্যক। ঘটনাবৈচিত্র্যময় বা মনোরঞ্জন গল্পের মধ্য দিয়া সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, দেশ-প্রেম ও বিবিধ জ্ঞানের যাহাতে উন্মেষ হয় সে দিকে লেখকদিগের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। উপন্যাস বা নাটক পাঠেই যখন যুবকদের, অন্ততঃ অনেকের স্বাভাবিক প্রবনতা দেখা যায়, তখন সে দিকে একেবারে গতিরোধের চেষ্টা করা সমীচিন বলিয়া মনে করি না; বরং সেই পথ ধরিয়া কিরূপে তাহাদের কোমল মনের উপর সুশিক্ষার ছাপ পড়িতে পারে, তাহার উপায় করাই উচিত। ভাষায় অধিকার বৃদ্ধি করিবার পক্ষে, মৌলিক রচনায় আসক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষেও উপন্যাসের উপযোগীতা অস্বীকার করা যায় না।

আমার মনে হয়, বালক ও অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীদের জন্য প্রত্যেক পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহাদের পুস্তকাগারের গ্রন্থতালিকা হইতে উহাদের উপযোগী গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি নির্ব্বাচিত করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এবং অসমর্থ পক্ষে বা সম্ভব হইলে প্রত্যেক প্রার্থী ছেলে মেয়েদের তাহা হইতে পুস্তকসকল বিনামূল্যে পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নারী-পাঠ্য গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর যেমন বিদ্যালয় পাঠ্য, পারিতোষিক ও পুস্তকাগারের জন্য পুস্তকের একটি করিয়া তালিকা স্থির করিয়া গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পাঠাগার সম্মিলন একটি শাখা-সমিতির দ্বারা প্রতি বৎসর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তন্মধ্য হইতে বালক, যুবক ও নারী পাঠ্য অতিরিক্ত পুস্তকের একটি করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলার সমস্ত পাঠাগারে দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

পাঠের দ্বারা সাধারণ-জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে কি বালক, কি যুবক, কি বয়স্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে জেলা-বিশেষে যে এমন কিছু বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন বা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক ব্যবস্থার আবশ্যকতা আছে, তাহা মনে হয় না। তবে স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বা সমাজোপযোগী যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন, সে বিষয়ে পল্লী-পাঠাগারের দৃষ্টি থাকা ও তদুপোযোগী গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা দরকার। এজন্য তাহাদের হাতে দুই চারি খানি পুস্তক দিয়া শুধু যে কর্ত্তব্য শেষ করা উচিত তাহা নহে; যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা ও ম্যাজিক্-লণ্ঠন্ চিত্র দ্বারা তাহাদের ও অন্ত-গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি মনে করি, এ বিষয়টি হুগলী জেলার ন্যায় স্থানের সমর্থ পল্লী-পাঠাগারগুলির কার্য্য-গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এই জেলার অধিকাংশ পাঠাগারের আর্থিক অবস্থা অতি হীন। সম্মিলন এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া অন্ততঃ একটি বা দুইটি আবশ্যকীয় ম্যাজিক্ লণ্ঠন্ ও শিক্ষা-প্রদ শ্লাইড্ রাখিয়া প্রতি পল্লীর পাঠাগার গুলির সহায়তাকল্পে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিমাসে একটি করিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যে সকল পাঠাগারের সামর্থ্য আছে, তথা হইতে ক্ষমতামত সম্মিলনীকে এ কার্য্যে কিছু কিছু সহায়তা করা উচিত। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয় অধিকাংশ পাঠাগার নিয়মিতভাবে এ সাহায্য করিতেও অক্ষম। এরূপ সমবায়ের নীতি ধরিয়া একত্র হইয়া অনেক কাজই হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য যে অর্থের দরকার, তাহার অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এজন্য কর্ম্মি-গণের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পশ্চাতে চাই দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণের মুক্ত দান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর অভাব না হইলে, এই অর্থের অভাব থাকিয়া যায় না।

পুস্তকাগারকে জনশিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইলে, বহু এবং বিবিধ বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহের সহিত উহা সাধারণের মধ্যে আদরনীয় করিবার পক্ষে বা সাধারণের পাঠের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার ও রুচি পরিবর্ত্তিত করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক একজন উপযুক্ত গ্রন্থ রক্ষক। কিন্তু ইহা মুখে বলা সহজ হইলেও কার্য্যে পরিণত করা খুবই দুরূহ। দেখা যায়, অধিকাংশ পল্লী-পাঠাগারে, এমনকি কলিকাতার খুব নির্দ্দিষ্ট অল্প কতিপয় পুস্তকাগার ভিন্ন এ অভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একার্য্যের জন্য অন্ততঃ এমন একজন লোক প্রত্যেক পাঠাগারে থাকা আবশ্যক, যাঁহার পাঠাগারের সমস্ত বা অধিকাংশ, অন্ততঃ পক্ষে বিবিধ-বিষয়ের বহু গ্রন্থ পড়া আছে। যাঁহার অন্যতম কার্য্য হইবে, পাঠকদের ঈপ্সিত বিষয়ে অনুসন্ধানের সহায়তার সহিত, যিনি যে বিষয়ের পাঠক, তাহাকে সেই বিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া তাঁহাদের পাঠ-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির সহিত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সহায়তা করা। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে একজন হরিনাথ দে বা সিঃ চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেবের গুণাবলী সমন্বিত লাইব্রেরিয়ান পাওয়া না গেলেও, এই কার্য্যের জন্য একজন নিতান্ত স্কুল কলেজের ছেলে বা অল্প বেতনের সামান্য শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপর ভার না রাখিয়া কোন শিক্ষিত বিশিষ্ট সভ্যের উপর ভার দেওয়াও অন্ততঃ উচিত। দুঃখের বিষয় খুব কম পাঠাগারেরই এ দিকে দৃষ্টি দেখা যায়।

পাঠাগারের আদর্শ পাশ্চাত্যদেশ-সমূহের বিবরণ হইতে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। এদিকে তথাকার ব্যবস্থার অধিকাংশই যে খুব ভাল এবং

তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশ, কাল, অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহার সহিত কতটা সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব সে কথা ভুলিয়া, শুধু আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন ফল নাই। অনেক সময় সে সব ব্যবস্থা এই সামান্য পুস্তকাগারগুলিতে নিয়োগ করিতে যাইয়া অনেক অসুবিধায় পড়িতেও দেখা গিয়া থাকে। এ বিষয়ে আমাদের উপযোগী যে সব পাশ্চাত্য-পদ্ধতি লওয়া যাইতে পারে, সেইগুলি লওয়াই ভাল। কোন্ বিখ্যাত পুস্তকাগার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে তালিকা-পুস্তক প্রস্তুত করা হইবে বা কি পদ্ধতিতে বই সাজান বা পাঠকদের দেওয়া হইবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাগারগুলির তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকার এমন কোন প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝিতে পারি না। সামান্য পাঠাগারগুলির এ সব বিষয়ে সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা, গ্রন্থসংগ্রহ বিষয়ে যদি সেগুলি নিজ নিজ বা কোন একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শুধু স্থানীয় লোক কেন, বহুস্থানের বহু লোকের পাঠের জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ভাল ভাল গ্রন্থাদি প্রাপ্তির সহায়ক হইয়া পরমোপকার সাধিত হয়।

পাঠাগারের গৃহ, পরিচ্ছন্নতা, আলো, বাতাস, আসন, সাজ, সরঞ্জমাদি বিষয়ের বিস্তারিত কথা তুলিয়া সময়ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। মাত্র এইটুকু বলি, সংগ্রহ যেমনই হোক, গৃহ যত সামান্যই হোক, আসবাব পত্রের দৈন্য যেমনই থাকুক, অবস্থার মত করিয়া পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিষ্ঠানটিকে যতটা চিত্ত-প্রীতিকর বা লোভনীয় করা যাইতে পারা যায় তাহা করিতে চেষ্টা করা উচিত। পুনরায় বলি, সর্ব্বসময়েই মনে রাখা আবশ্যক, কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টিতে পল্লী-পাঠাগারের কাজ শেষ হইবে না। উহার কাজ অনেক; পাঠাগারকে যে দিক দিয়া এবং যত দিক দিয়া সম্ভব একটি জন-শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তোলা আবশ্যক। এমন কি, উহাকে শুধু জ্ঞানাহরণের কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, তথা হইতে তাহা অবাধে বিতরণের সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সকল হইতে, বড় বড় সহরের পাঠাগারের তুলনায় পল্লীপাঠাগারের কাজ অনেক বেশী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। উহার পবিত্রতা ও কার্য্যকারিতার সহিত তুলনা করিবার জন্য যে অন্য অনেক প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায় তাহা নহে। আরও এক কথা, উদ্দেশ্যের দিকে শিথিলতা থাকিলে যে শুধু সেই প্রতিষ্ঠানের নিরর্থকতাই প্রতিপন্ন হইবে তাহা নহে, উহা গ্রাম্য দলাদলি ও অবাঞ্ছিত আড্ডায় পরিণত হইয়া ইষ্টের

পরিবর্ত্তে শেষে অনিষ্টের আকর হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কাও আছে।

আর অধিক কিছু বলিবার নাই; আমার স্থূল কথাগুলি আর একবার বলি। সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহাদের শিক্ষার স্থান নাই, সাধারণ পাঠাগারে তাহাদের স্থান আছে, সেখানে যে সব শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, এখানে তেমন শিক্ষা পাইবার সুযোগ আছে। দেব-মন্দিরে যে সমন্বয় সম্ভব নয়, সমবেতভাবে সাধনার সুযোগ যাহা কোথাও নাই, এই পাঠ্যমন্দিরে তাহা সম্ভব। লোক-শিক্ষার ইহা পবিত্র মন্দির। দেশকে ভালবাসিতে, তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে যদি আমি একটুও শিখে থাকি, আমার সে শিক্ষার মূল, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব, অপ্রত্যক্ষ্য ভাবে হইলেও উহা আমাদের পুস্তকাগার। ভারতীর মন্দিরে আমি অতি নগন্য হইলেও, পরিচারকরূপে আজ যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছি, তাহাও সেই পুস্তকাগার হইতে। এই মন্দিরই আমার কাছে দেব-মন্দির। অবস্থাবৈগুণ্যে আমার যাহাই হোক, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি না যে ইহাই আমার অভিষ্ট দেবতার মন্দির। আমার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান যদি কিছু থাকে, তবে তাহা দিয়াছে আমাকে আমাদের চন্দননগর পুস্তকাগার।

শ্রীহরিহর শেঠ।

সত্য-মিথ্যা

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:•—

রমানাথ দাস যখন ঢাকার ফুলবারিয়া ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতীর্ণ হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। উৎকণ্ঠায় ও অনাহারে তাহার মুখখানি শীর্ণ, ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় তাহার চোখ দুটী কোটরা-বিষ্ট। তাহার একহাতে একটী ব্যাগ ও অন্যহাতে একটী ছাতি। ট্রেণ হইতে নামিয়াই রমানাথ তাহার বাটী যাইবার পথ ধরিল। পথে কোনও দিকে রমানাথ দৃষ্টিপাত করিল না, কত পরিচিত লোক তাহার পথে পড়িল, কিন্তু কাহারও পানে তাকাইয়া কুশল প্রশ্ন করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না। রমানাথ তাহার ব্যবসায়ের পতনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছিল, সহরের অনেক ভদ্রলোকের যথা সর্ব্বস্ব তাহার

ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল, এখন সে তাহাদের নিকট মুখ দেখাইবে কি করিয়া। হয়ত তাহারা এখন তাহাকে দেখিতে পাইলে শঠ জুয়াচোর বলিয়া লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া আসিবে।

রমানাথের বয়স প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর, দেখিতে সে গৌরবর্ণ ও ছিপছিপে। নাতিদীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজি তাহার মুখমণ্ডল যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার দেহের অসীম শক্তি তাহাকে সহরের যুবকগণের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার সে লাবণ্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ঋজুদেহ বৃদ্ধের ন্যায় ঈষৎ নুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ব্যবসায়কে বাঁচাইতে পারে নাই। সর্ব্বত্র বিফল হইয়া এখন সে ঢাকায় ফিরিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে ভয়ে ভয়ে গৃহপানে চলিয়াছিল। কেমন করিয়া সে তাহার স্ত্রীর নিকট এ সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।

রমানাথের পিতা ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি অতি সামান্য অর্থ ই পুত্রের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রমানাথ উপার্জ্জনের অনেক পথ ধরিয়াছে, কিন্তু কোনটীতেই বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে রমানাথ কিছু জমি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্য্যের উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময়ে কয়লার খণির একধনী মালিকের কন্যাব সহিত তাহার বিবাহ হইল। এই বিবাহে রমানাথের শ্বশুরের প্রথমে আদৌ সম্মতি ছিল না, কিন্তু রমানাথের পিতার বন্ধুদিগের চেষ্টায় এ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পরে রমানাথের স্ত্রীর হস্তে বেশ কিছু অর্থ আসিল, রমানাথ পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময়ে স্ত্রীকে বুঝাইয়া নানা স্তোকবাক্যে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়া সে অর্থ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়া দিল। শুধু যে সে তাহার স্ত্রীর অর্থই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহা নহে, উপরন্তু সে তাহার স্ত্রীর চেষ্টায় নিজের বাক্‌চাতু-র্য্যের প্ররোচনায় তাহার শ্বশুর ও শ্যালককেও এ ব্যবসায়ে অর্থসাহায্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সহরের অনেক ভদ্রলোক রমানাথের ব্যবসায়ে তাহাদের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছিল। দুই এক বৎসর তাহারা বেশ লভ্যাংশও পাইয়াছিল। কিন্তু এখন উপায় ?

ক্রমে সে টিকাটুলির পথে আসিয়া পৌছিল। লাইনের ওপারেই কয়েকটী একতলা বাটী, উহাদের একটীর নিকটবর্ত্তী হইতেই রমানাথ দাসের সহিত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটীর অসময়েই দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছে, চুল একগাছিও পাকিতে বাকী

নাই, তাঁহার ঋজু দেহ একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার প্রকাণ্ড নাকের উপর মাঝে মাঝে সুতা জড়ান চশমাটী বহু-কালের সাহচর্য্যের প্রমাণ দিতেছে। নাম তাঁহার চণ্ডীচরণ ঘোষ, একসময়ে ঢাকায় মোক্তারি করিতেন, কিন্তু অধিকমাত্রায় মদ্যপানে আদালত হইতে এক সময়ে তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তদবধি তিনি আর আদালতের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই। কোনও একসময়ে মদ্য পানের অবস্থায় তিনি নিজে জজ সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তদবধি স্থানীয় লোকেরা উপহাস করিয়া তাঁহাকে জজ সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত। চণ্ডীবাবু রমানাথকে দেখিয়াই হাসিমুখে তাহাকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। রমানাথ ম্লানমুখে উত্তর দিল, "না জজসাহেব, এখন থাক।" হো হো শব্দে হাসিয়া চণ্ডীবাবু বলিলেন, "না হে না, শোনই না, তোমার জন্য নূতন সংবাদ আছে।" রমানাথ আর কোনও কথা না বলিয়া অগ্রসর হইল। তাহার তখন কেবল মনে হইতেছিল, স্ত্রীর নিকট সে এই দুঃসংবাদ ভাঙ্গিবে কি করিয়া। তাহার স্ত্রীর তখন অন্তঃসত্বা, যদি এই সংবাদ শুনিয়া তাহার কোনও অনিষ্ট হয়।

চণ্ডীবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও রমানাথের সঙ্গ লইলেন এবং ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইয়া রমানাথের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "ওহে শুনে যাও, অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথায়।" তারপর হস্তস্থিত মদের বোতলের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া একটু উপহাস ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া চণ্ডীবাবু বলিলেন, "এই যে দেখছ, এতে তোমার সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেব।" রমানাথ দ্রুত পদচালন করিতে করিতে বলিল, "কি বলছেন জজসাহেব, আমি এখন কোন স্থানে বসতে পারব না।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ রমানাথ পূর্ব্বে মাঝে মাঝে চণ্ডীবাবুর বাটীতে আড্ডায় যোগদান করিয়াছিল এবং দুই একবার তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একটু আধটু সুরাপান করিয়াছিল। কিন্তু আজ সে বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে কোনও স্থানে অপেক্ষা করিতে বা সুরাপান করিতে স্বীকৃত ছিল না। অথচ চণ্ডীবাবু এমনভাবে রমানাথকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করি-লেন যে অবশেষে রমানাথ লজ্জার খাতিরে ও চণ্ডীবাবুর বাটীতে না গিয়া পারিল না।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি চণ্ডীবাবুর বসিবার ঘরে তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। ছোট ঘরটিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে সিগা-রেটের আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, ঘরের চৌকির উপর এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি অন্ধকারে ভূতের মত বসিয়া সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিতে করিতে ঝিমাইতেছিল। ঘরের আলো জ্বালিয়া রমানাথকে বসিতে বলিয়া চণ্ডীবাবু সেই ক্ষীণকায় ব্যক্তিটীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি

হে ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী, কতক্ষণ এসেছ ?" ক্ষীণকায় ব্যক্তিটী অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ"।

এই ক্ষীণকায় ব্যক্তির নাম হরগোবিন্দ নাগ, ঢাকায় ওকালতি করিতেন, অসহ-যোগ আন্দোলনে ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া আড্ডাটী সম্বল করিয়াছেন এবং লোকে কিছু বলিলে বলিতেন, "এক বছরেরই ত স্বরাজ হয়ে যাবে, তখন প্রধান মন্ত্রী হয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, সে জন্য উৎসাহের ভাণ্ডারে চাবি দিয়ে রেখেছি।" এক বৎসরে যখন স্বরাজ হল না, তখনও হরগোবিন্দ বাবুর কোনও কাজ করিবার লক্ষণ দেখা গেল না এবং লোকে সেই সময় হইতে ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

চণ্ডীবাবুর বার বার অনুরোধে রমানাথ ঘরের এক কোণে ব্যাগটী রাখিয়া চৌকির উপর উপবেশন করিল। সকলে উপ-বিষ্ট হইলে হরগোবিন্দ বাবু দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এস, সকলে মিলে এক হাত তাস খেলা যা'ক, কি বল জজ সাহেব"। এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একজোড়া তাস বাহির করিলেন। চণ্ডীবাবু উত্তর দিলেন, "চুপ কর হে মন্ত্রী, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেল, আগে এস গলা ভিজিয়ে নি।"

রমানাথ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, না, না, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমি এখন মদ খেতে পারব না। আমায় নূতন সংবাদ দেবেন বলে ডেকে আনলেন, সেটা কি ?"

"আরে বসই না, রমানাথ। দাঁড়াও আগে ঠোটটা ভিজিয়ে নি।" এই বলিয়া জজসাহেব একগ্লাস তুলিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন। তারপর দুই ওষ্ঠে একপ্রকার শব্দ করিয়া ঈষৎ দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "দেখ রমানাথ, পৃথিবীটাকে যত ভাল ভাবছ, তত ভাল নয়।"

জজসাহেব সহজে কাহাকেও ভাল বলিতে চাহিতেন না, তাঁহার মত তীব্র-সমালোচকের মুখে এ কথা শুনিয়া রমানাথ ভাবিল এ কথায় নিশ্চয় বিশেষ অর্থ, আছে। তাই রমানাথ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথার অর্থ কি জজসাহেব ? আমার বাড়ীতে ত কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি ?"

জজসাহেব চৌকীর উপর মদের গ্লাসটী রখিয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া চশমার উপর দিয়া রমানাথের দিকে বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ওহে, কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, রমানাথ। আচ্ছা উমাশঙ্কর বাবুর সম্বন্ধে তোমার কেমন ধারণা ?"

"কেন ভালই। তবে এসব কথা এখন কেন ? আমার অনেক কাজ করবার আছে, আমি এখন যাই।"

"আরে দাঁড়াও না। বলি তোমার বিরুদ্ধে উমাশঙ্কর বাবু এমন জাতক্রোধ হয়ে উঠলেন কেন ? তুমি নাকি তাঁর সই

জাল করে প্রচুর টাকা সরাবার মতলব করেছ, এই বলে তিনি তোমাকে জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন, বুঝেছ।"

ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী নিজের মনে তাস বাটিতে'ছিলেন, একবার চক্ষু উঠাইয়া রমানাথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং এমন একরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, যাহাতে বুঝা গেলনা তিনি হাসিতে চেষ্টা করিতেছেন না কাঁদিতে যাইতেছেন।

রমানাথ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া রহিল। জজসাহেব চশমার উপর দিয়া রমানাথের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নীরবে বেশ তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন।

রনানাথ দাস হো হো শব্দে খানিকটা অর্থহীন হাস্য করিয়া অন্যমনস্কভাবে চৌকী হইতে এক গ্লাস মদ তুলিয়া লইয়া মুখে ঢালিয়া দিল এবং তৎপরে তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "ভাল গল্প ফেঁদেছেন, জজসাহেব।" চণ্ডীবাবু ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে উত্তর দিলেন, "কেন, বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি। সত্যি বলছি। আচ্ছা, মন্ত্রীমশায়কে জিজ্ঞাসা করে দেখ না কথাটা সত্যি কিনা।"

ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ মন্ত্রীমহাশয় জজসাহেবের কথায় সায় দিয়া মাথা নাড়িলেন। রমানাথ বিহ্বল অবস্থায় একের মুখ হইতে অপরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। কথাটা কিছুতেই তাহার বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। তাই রমানাথ বলিয়া উঠিল, "কি বাজে কথা বলছেন আপনারা?"

সাপের ছোবলের মত হাসিতে বিষ ঢালিয়া চণ্ডীবাবু উত্তর দিলেন, "বাজে বলে উড়িয়ে দিলে কি চলে, রমানাথ। এ পৃথিবীটা যে মজার রাজ্য, এখানে কি সম্ভব, আর কি না সম্ভব তা বলা বড় কঠিন।"

"তা, হলে আমার স্ত্রীও সব জানতে পেরেছে? তার কাছেও কি কেউ বলে এসেছে না কি?" এ কথা বলিতে রমানাথের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

চণ্ডীবাবু আবার তাঁহার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জানে বৈ কি। তোমার স্ত্রীর কাছে লোক গিয়েছিল যে হে।"

রমানাথ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

নির্ব্বিকার মনে চণ্ডীবাবু উত্তর দিলেন, "কেন পুলিশের পেয়াদা।" "কেন, পুলিশের পেয়াদা কেন? আমি জাল করেছি বলে?"

"ঠিক তাই।" চণ্ডীবাবু রমানাথের অবস্থাটা এমন তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছিলেন যে সম্মুখে গ্লাসে মদ ঢালিয়া রাখিয়াও তাহা পান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রমানাথ সেই পূর্ণ গ্লাসটী অন্যমনস্কভাবে তুলিয়া সবটা মুখে ঢালিয়া

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "যদি এ কথা সত্যি হয়, তবে আমাকে নয় উমাশঙ্করকেই জেলে পচতে হবে।"

এই কথা বলিয়াই গৃহকোণ হইতে তাহার ব্যাগটী তুলিয়া লইয়া রমানাথ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

আলোচনা

(ক)

সুরের নেশা

—:০:—

জগত চলেছে সুরের তালে তালে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সুরের স্রোত অনাহত ও অশ্রান্তভাবে চল্‌ছে। জগত ছুটেছে সেই সুরের ভেতর দিয়ে। এই চলার মাঝে গড়ে উঠেছে ছন্দঃ। এই ছন্দ-তেই ফুল তার স্বর্গের সুষমা নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে, আবার বৃন্ত থেকে ঝরে' পড়্‌ছে।

সারা জগতটা সুরের স্রোতে ভাস্‌ছে; প্রকৃতি গানে ডুবে আছে। তাই জগতের প্রাণ একসুরে বাঁধা। এর যেখানেই ঝঙ্কার উঠুক না কেন এতে প্রত্যেককেই সাড়া দিতেই হবে। তাই অনেক সময় আমরা দেখি—আমরা অনেক গান শুন্‌ছি, তার ভাষা হয়ত আমাদের অজানা; কিন্তু তার সুরের রেশ আমাদের প্রাণে মিশে' প্রাণকে উন্মাদ করে তুল্‌ছে। পাখীর গান আমরা শুনি; তার ভাষাত আমরা বুঝি না। তবুও আমাদের মনে তার পরশ, তার ছোঁয়া লাগে কেন?

"সুরের আলো ফেলে গগন ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে।"

এই সুরের হাওয়া গগন বেয়ে চলেছে বলেইত আমাদের প্রাণ গানে সাড়া দেয়। মানুষের গলার সুর যে সেই বিশ্ব-বীণার সুরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। তাই যেখানেই সুর উঠুক না কেন, এস্রাজের ঝঙ্কারের তারগুলির মতো মানুষের প্রাণ তা'তে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

মানুষের গলার গান, পাখীর কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জরণ,—সেত সেই বিশ্ব-বীণার

অনাহত অশ্রান্ত সুরের আভাস মাত্র। এই স্বর-সঙ্গতির মধ্যে, সুরের সঙ্গে সুরের নিয়মিত মিলনের মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে যাহা পশু পক্ষীদেরও নেশার সৃষ্টি করে।

জগতে এমন কোন জাতি নাই যার প্রাণ, গানে সাড়া না দেয়। গানের কাছে ধরা না দেয় এমন কিছুই নাই। তাই দেখ্‌তে পাই গদ্যর চেয়ে কবিতার সৃষ্টি আগে।—হিন্দুর পবিত্র মন্ত্র, বেদের সূক্ত সমস্তই গান, সমস্তই কবিতা।

গানে ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। রামপ্রসাদ ত গান গেয়েই ভগবানকে পেয়েছিল। তাই দেখতে পাই ছায়া-স্নিগ্ধ, তৃণগুল্ম-শ্যামল, তরুবীথিপূর্ণ পল্লীর কোলে অনেক উদাসীন, বাউল, ফকির ছিলেন যাঁদের ভগবানকে আরাধনার সামগ্রী ছিল শুধু একতারা। এই একতারার সঙ্গে প্রাণের তারের সুর মিলিয়ে যখন তাঁরা গান কর্ত্তেন, তখন সেই সুরলহরী মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা নিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করে দিত। এই গানের সুর-গঙ্গা এখনও আমাদের দেশে সমান ভাবে বয়ে চলেছে।

আর বাস্তবিকপক্ষে এগুলি সাহিত্যেরও সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন সাহিত্যে ত আমরা বেশীর ভাগই দেখ্‌তে পাই পাঁচালী আর এই গান, সুতরাং এগুলিকে সাহিত্যের ভিত্তিও বলা চলে।

এখনও এই নিরক্ষর সাধকের রচিত গান আমাদের দেশের বাউল ফকির প্রভৃতি গেয়ে বেড়ায়। ভাব-সম্পদে এগুলি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। অথচ এগুলি যারা নিরক্ষর, শুধু তাদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ। সুখের বিষয়, আজকাল সাময়িক পত্রিকাগুলি এই অনাদৃত মেঠো-গানগুলি চয়ন করে শিক্ষিত সমাজের সাম্‌নে ধরে এর রসগ্রহণে সমর্থ করাচ্ছেন।

এখানে কতকগুলি গান সংগ্রহ করে দেওয়া গেল। এর মধ্যে তারকা-চিহ্নিত গানগুলি ফকির লালন সার তৈরী, ফকির লালন সার গান নদীয়া জেলায় "সাঁইজির গান" নামে পরিচিত, নদীয়া জেলাতেই তাঁর আখড়া ছিল এবং সেই জন্যই তাঁর গানগুলি সেখানে বেশীর ভাগ প্রচলিত। ফকির লালন সার গান আমি ইতিপূর্ব্বে "প্রবাসীতে" প্রকাশ করেছি, অন্য গানগুলির রচয়িতার নাম জানা যায় না। ফকির লালন সার সংক্ষিপ্ত জীবনী * আমি "প্রবাসীতে" এক প্রবন্ধেও আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে বেশী করে তাঁর পরিচয় দিলাম না।

(১)

আছে ভবের গোলা আস্‌মানে (১)।
ও তার মহাজন ক'নে ? (২)

* আমার লেখা প্রবন্ধ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩১

(১) আস্‌মান—আকাশ। (২) ক'নে—"কোথায়" এই শব্দের অপভ্রংশ।

ওরে ভবের গোলা আছে খোলা—

যে যতই টানে।

মন বুঝে দিয়েছে রে ধন

যে এই ভবে বেচে কেনে।

চাঁদ সূর্য্য দুই ভাই তারা

সেই গোলায় লেগে আছে,

মন বুঝে দিয়েছে রে ধন

যে এই ভবে বেচে কেনে।

এই গানটীর রচয়িতার নাম অজানা। খুব অল্প গানেই সাধক তাঁর নিজের নাম প্রকাশ করেছেন।

(২)

* খাঁটী আদমের ভেজ্

সে ভেজ্ পশু কি বোঝে ?

সেরাজ আজিল সয়তান ছিল

আদমে না ভজে।

আদম কালামে খোদা,

ওসে খোদায় বিরাজে।

শুনে' আজিল খাস্তন

গঠিলেন আদম্ত গঠন।

আদম শরীফ আমার,

ভাষায় বলেছে আধার

ওসে সাঁই নিজে।

লালন বলে সে ভেজ ভজে

বুঝেছে যে।

এই গানটীর মধ্যে কতকগুলি শব্দ আছে যার মানে বোঝা শক্ত। নিরক্ষর গায়কের উচ্চারণের অশুদ্ধতা হেতুই এরূপ হয়ে থাক্‌বে।

(৩)

গুরু, দয়া কর মোরে গো

বেলা ডুবে গেল।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল

যমরাজের ডঙ্কা বেজে এল।

মহাকালে ঘিরে নিল

আমার সঙ্গের সাথী

কেউ না রইল।

অমূল্য ধন লয়ে সাথে

এসেছিলেম ভবের হাটে ;

ছয় বোম্বাটে জুটে'

আমার পথ ভুলায়েছে

ওধন নেছে লুটে।

দয়া কর মোরে গো

বেলা ডুবে গেল।

মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে ঈশ্বরকে না পাওয়ায় যে একটা ব্যাকুল ভাব এবং নিজের দীনতার একটা সকরুণ অনুযোগ এই গানটীর ভিতরে বেশ ফুটে উঠেছে।

(৪)

* সাঁই আমার কোন সময়

কোন রূপ ধরে,—

তার লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা

কেমন করে ?

আপন ঘোরা আপনি ঘুরি'

আপনি কর্লেন রসের চুরি

কতরূপ ধরে।

গঙ্গায় নামিলে গঙ্গাজল হয়,
গর্ত্তে নামিলে কুপ-জল হয় ;
ওসে মন বিচ্ছেদে,

সাঁই আমার হাত্‌ড়ে বেড়ায়
মায়ার ঘোরে,

ফকির লালন বলে সাঁই আমার
ঘুরে বেড়ায়
ইচ্ছা করে ;—
ওসে কতরূপ ধরে !

ভগবান যে নিজে অবতার হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন জীব উদ্ধারের জন্যে, সাধক এই গানটীর ভিতরে তার ইঙ্গিত কচ্ছে্ন। সাধক বল্‌ছেন নিজে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে মায়ার ফাঁসি নিজেই ভগবান পরেন। মায়ার মোহিনী আসক্তি থেকে তিনিও বাদ পড়েন না।

(৫)
যেজন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা।
কানা চোরে চুরি করে,
ঘর রেখে সিঁদ দেয় পাগারে।
মিছামিছি খেটে মরে
কানার ভাগ্যে ধন জোটে না।
কাঠুরিয়া মাণিক পেলে
দোকানেতে দেয়গো ফেলে,
অভিমানে মানিক কাঁদে
মহাজনে টের পেলনা।
কুমারেরা কাটে মাটী,
ছেলে করে পরিপাটী।
কাঁচারঙে রঙ্ মিশায়ে
পোড়া কর্ল্লে কাঁচা সোণা।

সাধক যে ভগবানকে চিন্‌তে না পেরে নিজেকে বার বার ভুল কর্চ্ছিল, এই গানটীতে তারই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। গানটী বেশ ভাব-দ্যোতনাপূর্ণ!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

(খ)
রস সাহিত্য

রস সাহিত্য বলিতে কি বুঝা যায় এবং জীবনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক জড় জগতের কোন একটা অংশকে অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বিশ্লেষণ এবং তর্কের দ্বারা আলোচনায় বিষয়ীভূত অংশের (material knowledge) বা জড় তত্ত্বজ্ঞান দিয়া ক্ষান্ত হন।

কিন্তু রস সাহিত্যের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটী জীব বা একটী বৃক্ষ যেমন প্রাণ শক্তির অভিব্যক্তি সেইরূপ রস-সাহিত্যও প্রাণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ। রস সাহিত্য জগতের অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর

মতই আপনা হইতে বিকসিত হয়, জড়ীয় শক্তির দ্বারা ইহাকে তৈয়ার করা যাইতে পারে না। প্রাণ শক্তি কিরূপ ভাবে সাহিত্যের মধ্যে কার্য্য করে তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটী বটবৃক্ষকে ধরিতে পারি। একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ প্রথম হইতেই আমাদের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষরূপে আবির্ভূত হয় না। উহাকে আমরা প্রথমে একটী ক্ষুদ্র বীজ নিহিত শক্তিরূপে দেখিতে পাই। এ বীজই মৃত্তিকা, জল ও বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে অঙ্কুরিত এবং অবশেষে একটী প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়। মানব মনের ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাবও সেইরূপ প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় থাকে না। উহা প্রথমে মনের ভিতর সুপ্ত শক্তিভাবে বিরাজ করে এবং ক্রমে বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে ও অবশেষে ভাষার সাহায্যে আত্ম প্রকাশ করে। এইরূপ ভাবে ভাষায় অভিব্যক্ত ভাবই রস সাহিত্য। অতএব রস সাহিত্য সৃষ্ট বস্তু, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাবই তাহার প্রাণ এবং দূর সম্পর্কে বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণই তাহার প্রাণ। বিজ্ঞান বা জগতের অন্য কোন জ্ঞানই বস্তুর মধ্যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের এই অনন্ত ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল রস সাহিত্যেই কল্পনার সাহায্যে সেই চিন্ময় ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম। কিন্তু এই কল্পনা সাধারণ কল্পনা হইতে স্বতন্ত্র। নিম্ন শ্রেণীর কল্পনার দ্বারা শুধু মনগড়া জিনিষ সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য অধিক নহে। কিন্তু যাহা মুখ্য কল্পনা তাহা শুধু মন গড়া জিনিষ সৃষ্টি করে না, তাহা বস্তু নিহিত সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত চিন্ময় ভাবের সংবাদ আমাদের নিকট আনিয়া দেয়—আমাদের জড় জগতের সকল সত্য পুঞ্জীভূত করিলেও এ সত্যের এক কনিকার সমতুল্য হইতে পারে না। এরূপ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঋষির ন্যায় কবি দেখিতে পান বলিয়াই কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলা হইয়াছে। ঋষি ও কবির মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে ঋষি সত্য সৌন্দর্য্য—এবং আধ্যাত্মিক ভাবের রাজ্যে নিজকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আর সে রাজ্য হইতে নামিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু কবি যতক্ষণ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন কেবল ততক্ষণই আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা বলিতে পারেন। ভাব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি সামান্য মানবের ন্যায় সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়েন!

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে আমাদের ভাষা সান্ত, এই সান্ত ভাষা কেমন করিয়া অনন্ত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে? ইহার উত্তর এই যে ভাষা সান্ত হইলেও ভাবের সংস্পর্শে আসিয়া উহা অনন্ত শক্তি ধারন করে। ভাব প্রসূত একটী

কথা আমাদের মনে কেবল একটী মাত্র চিত্র অঙ্কণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না। উহার পশ্চাতে যে সব ব্যঞ্জনা থাকে তাহা অনন্ত সূক্ষ্ম চিন্ময় বস্তুর সংবাদ আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। এই ব্যঞ্জনা শক্তি না থাকিলে ভাষার দ্যোতনা নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা মানবীয় জ্ঞানের অন্য যে কোন শাখা রস সাহিত্যের সমতুল্য হইতে পারে না। উপরোক্ত জ্ঞানের শাখা সমূহ বিশ্ব জগতের কোন একটী অংশকে সমগ্র বিশ্ব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষা করে এবং তৎসম্বন্ধে তর্ক করিয়া উক্ত অংশ মাত্রের জ্ঞান আমাদিগকে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু উক্তরূপ জ্ঞানের মূল্য কোন ক্রমেই রস সাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারে না। বিচ্ছিন্ন করিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া যে জ্ঞান পাওয়া যায় সেই জ্ঞান—বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান নহে। বস্তুর অন্তরে যাহা প্রকৃত রহস্য রূপে বর্ত্তমান ইহার দ্বারা সেই প্রাণ শক্তির কোন ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয় না। কোনও বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইলে সমগ্রের সহিত তাহার কি সম্পর্ক সে রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে সে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে দর্শন সমগ্র বিশ্বেরই জ্ঞান দেয় উহা অনন্তের মধ্যে সান্তকে এবং সান্তের ভিতর দিয়া অনন্তকে বুঝিতে চেষ্টা করে। এরূপ বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু বস্তুতঃ দর্শনের দ্বারা সে কার্য্য সম্যক সাধিত হয় না। কারণ দর্শনের উপকরণ মানব বুদ্ধি (Intellect) মানবের বুদ্ধি এবং মানবের চিন্তা শক্তি সান্ত, সে কেমন করিয়া অনন্তের সংবাদ আনিয়া দিবে? শুধু বুদ্ধির দ্বারা অনন্ত ভাব রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। নদী সৈকতে প্রস্ফুটিত একটী পুষ্প অরসিকের নিকট—গন্ধ ও বর্ণের সমষ্টি মাত্র, তাহার হৃদয়ে কোনও ভাবের প্রেরণা আনিয়া দেয় না। কিন্তু কবি ও ভাবুকের নিকট অতি সামান্য একটী পুষ্প হৃদয়ে যে ভাবের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয় উহা বাক্যে দূরে থাক অশ্রুর দ্বারাও ব্যক্ত হয় না।

রস সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়কে সরস করা। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ হইতে কবি ও রসিক এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রস সাহিত্য সৃজন করিয়া আসিতেছেন। বহির্দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যে সংসার কেবল স্বার্থের সংঘাতে উত্থিত দ্বন্দ্ব কোলাহলে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভাবুকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে সেই জগতেরই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণ অহংকার বিলীন হইয়া গিয়া মনে হয়,—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"

চারিদিকে শুধু মধু! মধু! মধু! আর মধুময়ের লীলা মাধুরী। যে রস সাহিত্য

ইতিহাসে অমরতা লাভ করিয়াছে তাহা এই মধু বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু ভাবুকের মন, রস পিপাসু যে জন তিনিই মাত্র এই মধু আকণ্ঠ পান করিতে পারিয়াছেন।

জগতের সাধারণ মানুষ যারা ঘরকন্না খাওয়া দাওয়া কথা লইয়াই জীবন কাটায় যারা তাহারা এই রস সাহিত্যের কাছ দিয়াও ঘেঁসে না। জন সাধারণের মধ্যে যথার্থ রস সাহিত্যের বিস্তার মানব ইতিহাসে কেবল অতি অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটী মাত্র স্থানে ঘটিয়াছিল—যেমন খৃঃ পূঃ, পঞ্চম শতাব্দীর Athens এ, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর Florence নগরীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। উল্লিখিত প্রত্যেকটী যুগেই দেখা গিয়াছে যে জনসাধারণের ভিতর রস সাহিত্যের বিস্তৃতি লাভের ফলে দেশে যেন অমৃতের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, যে অমৃত সেই যুগে পরিবেশিত হইয়াছিল, আমরা শুধু তাহার স্মৃতি লইয়াই রহিয়াছি।

হয়ত সকল যুগে সাধারণ মানবের পক্ষে রস সাহিত্য উপলব্ধি করা কোনও দিনই সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু তাহা যদি না হয় তাহা হইলে শত League of Nations এর দ্বারাও, শত নীতি উপদেশের প্রচার দ্বারাও, শত Contract ও Compact এর দ্বারাও মানব মনের অন্তর্নিহিত জিঘাংসা-বৃত্তি-উত্থিত মহা-সমরের নিবৃত্তি হইবে না। রস সাহিত্য যদি জনসাধারণের অন্তরে স্থান লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে অমৃতের বাণী কখনই জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত হইবে না। সেই জন্যই রসিক ও ভাবুককে বিশ্ব কল্যাণের জন্য জনসাধারণের মনকে রস সাহিত্যের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিতে হইবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ব্যথাই আমাদের অমূল্য সম্পদ হইবে।

শ্রীশরৎকুমার সেন।

আমেরিকার মিশন

—০:•:০—

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইহুদি লেখক Israel Zangwill পোনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে "The melting pot" নামে একখানি উপন্যাস লিখেন। ইহাতে তিনি বর্ণনা করেন যে আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য হইতেছে ঐ melting pot (দ্রবপাত্র)। তথায় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকারের লোক আসিয়া আমেরিকার সাম্যতা সম্মত নূতন সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া এক নূতন মানবে অভিব্যক্ত হয়। আমেরিকার নূতন

আবহাওয়া, নূতন সমাজ, নূতন আর্থ-নীতিক ব্যবস্থা, নূতন রাজনীতিক অধিকার সমূহ, তারপর সর্ব্বোপরি সাম্যবাদ যথায় মানবের জন্য জীবনের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, এই সব আবর্ত্তের মধ্যে নিষ্পীড়িত, অত্যাচারিত, পদদলিত, পুরাতন জগতের একজন লোক পড়িলে তাহার নূতন জীবন লাভ হয়, সে আর পুরাতন মানব থাকে না! সর্ব্বদেশের লোক এই কটাহে পড়িয়া দ্রবীভূত হইয়া এক নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠে। তাহাকেই আমেরিকার বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

জান্‌গউইল বলিয়াছেন যে, এই কটাহে সর্ব্বপ্রকারের জাতি দ্রব হইয়া এক নূতন মানব জাতিতে পরিণত হয়, তাহাকেই "আমেরিকান" বলে। ইঁহার এই মতটি আমেরিকায় বিশেষ আদৃত হয়, সকলেই বলেন বস্তুত আমেরিকা এক দ্রবপাত্র। অগ্নি যেমন সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া কোন দ্রব্যকে শুদ্ধ করে, আমেরিকার নূতন সভ্যতা প্রাচীন দেশের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া এক নূতন মানবের সৃষ্টি করে। আমেরিকার এই কটাহে সর্ব্বজাতির রক্ত সংমিশ্রণ হইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে তাহা আমেরিকান। জান্‌গউইল্ সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া :এই নূতন জাতির বর্ণনা করিয়াছেন। আর প্রায় পোনের বৎসর আগে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রান্স বোয়াস্ (France Boas) বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া তাহাই বলিয়াছেন। তিনি তিন হাজার রোমাণীয়-ইহুদি ও দক্ষিণ ইতালীয় বংশীয় আমেরিকায় জাত লোকদের শারিরীকনৃতত্ত্বীক মতানুযায়ী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েন যে, চওড়া মাথা (brachycephal) বিশিষ্ট রোমানীয় ইহুদিদের আমেরিকায় জাত পুত্রদের মাথা অপেক্ষাকৃত লম্বাকার বিশিষ্ট হয়, আর লম্বামাথা (dolichocephal) বিশিষ্ট দক্ষিণ-ইতালীয়দের আমেরিকায় জাত পুত্রগণ অপেক্ষাকৃত চওড়া মাথা বিশিষ্ট হয়। এবম্প্রকারে উভয় জাতীয় আমেরিকানেরা পরস্পরের কাছাকাছি একটা মাথার আকৃতি পাইতেছে যেটাকে বোয়াস্ আমেরিকাম Type বলেন। ইনি ইহা আমেরিকার জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতির প্রভাবের ফল বলিয়া মনে করেন না; ইহার অর্থ ইউরোপীয় লোকদের সন্তানসন্ততিগণ আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ জন্য তথাকার প্রকৃতির প্রভাবে (milieu) একটা নূতন জীব জাতিতে (raical type) অভিব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ এ মত ইউরোপের নৃ-তত্ত্বীকেরা গ্রহণ করেন নাই! আবার চিকাগো বিশ্ব বিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক Frederick Staar নাকি ইহার আগে বলিয়াছিলেন যে, নব ইংলণ্ডের লোকেরা আর ইংরেজী Type এর নয়

এবং তিনি স্বয়ং আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাপযোপ করিয়া দেখিয়াছেন পেনসেল্‌ভেনিয়ার জার্ম্মানদের সঙ্গিত ইউরোপীয় জার্ম্মাণদের শারীরিক সাদৃশ্য নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করিয়া অন্যান্য নৃ-তত্ত্বীকেরা এই সব শারীরিক পরিবর্ত্তনের মত গ্রহণ করেন না। যাহাই হউক, আমেরিকার অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয় বংশীয় লোকেরা আমেরিকায় একটা নূতন জাতিতে পরিণত হইতেছে। ইহা অনেকে ধ্রুব সত্য ভাবিয়া ভাবের দিক দিয়া তাহাকে আমেরিকার "মিশন" বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন জগতের আর্ত্ত, পীড়িত, নির্য্যাতিত জনবৃন্দ আমেরিকার নূতন আলোকে আসিয়া নূতন সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া বাহ্যতঃ যেমন নূতন প্রকারের মানব হইতেছে যাহার নূতন সংস্কার, নূতন আশা, জগতের প্রতি নূতন ধারণা (new world view); সেই প্রকারে তাহার শরীরের পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। এই নূতন মানবের নূতন আশার কথা অনেক ঔপনিবেশিক পণ্ডিতেরা "আমেরিকার মিশন" বলিয়া চারিদিকে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। জান্‌গউইলের দ্রবকটাহ মতও বোয়াসের নৃ-তত্ত্বীকমত এই উভয়টির উপর 'আমেরিকার মিশন' বাদ স্থাপিত হইয়াছে। যে সব পণ্ডিতেরা এই মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন অধ্যাপক ষ্টাইনার (Dr. Steiner)। এই উক্ত মিশনবাদটিকে তিনি তাঁহার Thesis স্বরূপ করিয়া সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, উদ্দেশ্য আমেরিকানদের বিজাতীয়দের উপর ঘৃণা অপনোদন করা। তিনি তাঁহার নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও বোয়াসের মতটি উভয়কে উল্লিখিত করিয়া বক্তৃতাতে বলেন, 'আমেরিকায় কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিওনা, জগতে বড়জাতি ও ছোটজাতি নাই, সবই আবহাওয়া, সামাজিক ও অর্থনীতিক কার্য্য কারন ফল প্রসূত। আজ আমেরিকায় ধনের গর্ব্ব করিয়া যাহারা গরীব ঔপনিবেশিককে ঘৃণা করিতেছে, তাহারা বিস্মৃত হয় যে তাহাদের-পূর্ব্বপুরুষেরাও এতাদৃশ কুলি ছিল। আমেরিকায় ইউরোপের আভিজাত্যবর্গ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, সকলেই কুলি মজুর ছিল, মেফ্লাওয়ার জাহাজে "কোন আভিজাত্যবংশ সম্ভূত লোক আসে নাই; আমেরিকার বিভিন্ন প্রকারের মানবের মাথার গঠন ও বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইত্যাদি।" ইনি সার্ব্বজনীন প্রেম ও মানবের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক। অবশ্য ইনি শ্বেতজাতির সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত। একটী বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কোন আমেরিকান তাঁহাকে বলেন ডেগোদের শ্বেতপুরুষের সহিত একগাড়িতে চড়িবার কি অধিকার আছে? ডেগো হইতেছে নিগার!

আমেরিকায় দক্ষিণ-ইতালীয়দের "ডেগো" বা 'গিনি' বলা হয়, আর উপরের উক্তিদ্বারা তাহাদের মলীন বর্ণের উপর কটাক্ষপাত করা হয়। তিনি তাহার উত্তরে বলেন, তোমারই বা তাহার প্রতি ঘৃণা করিবার কি অধিকার আছে? তাহাদের মধ্যে বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, রাজনৈতিক, বিজয়ী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর যে দেশে তুমি বাস কর সেই দেশও একজন ডেগো দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার নাম কলাম্বাস! প্রত্যুত্তরে উক্ত আমেরিকানটি বলেন যে তুমি এই সবলোক দ্বারা যে সব ডেগো আমাদের দেশের রাস্তায় কুলীগিরি করে তাহাদের বুঝিতেছনা! ষ্টাইনার ইহার উত্তরে বলেন, আর তুমিও জর্জ্জ ওয়াশিংটন বা এব্রাহাম লিন্‌কলন্ নও! অর্থাৎ একটি জাতির ভিতর সর্ব্বপ্রকারের লোক থাকে, তাহাদের একশ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া সমস্ত জাতিকে অভিশপ্ত করা অনুচিত। অধ্যাপক ষ্টাইনার ইউরোপের দুর্দ্দশাগ্রস্থ জাতি সমূহের বিপক্ষে আমেরিকায় যে জাতিবিদ্বেষ আছে তাহা নিরাকরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তিনি নিজে ঘৃণিত জাতি সম্ভূত, অষ্ট্রীয়ান-ইহুদিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমেরিকায় আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং পতিত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তাহাদের মঙ্গলার্থে কর্ম্ম করিয়াছেন।

আর একটি অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তিনি নিজে জার্ম্মানিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বাল্যকালে পিতা মাতার সঙ্গে আমেরিকায় আসেন। তিনি বলেন, "ইউরোপ হইতে গরীব ঔপনিবেশিকেরা অনেক আশা লইয়া আসে, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পোঁটলাপুঁটলি লইয়া জাহাজে চড়িয়া যখন আমেরিকার বন্দরে উপনীত হয়, তখন তাহাদের ভীষণ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। যাহারা কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত হয় (বন্দরে প্রত্যেক যাত্রীর চক্ষুর ব্যায়রাম আছে কিনা পরিক্ষীত হয়, রোগীরা ও যাহাদের নিয়মানুযায়ী অর্থাদি নাই তাহারা প্রত্যাখ্যাত হয়) তাহারা হাহাকার করে, আর যাহারা গৃহীত হয় তাহারা আনন্দে নূতন আশায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা ইহাদের মস্তিষ্কে, আমেরিকা ইহাদের হৃদয়ে অবস্থান করে। ইহার অর্থ নূতন দেশে নূতন অবস্থায় জীবন সাফল্য করিবে এই আশায় তাহারা আমেরিকায় আসে। ইউরোপের গরীবদের ইহা বিশ্বাস যে নূতন জগতের রাস্তায় সোনা কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তথায় মানবের সাম্যতা আছে, যোগ্যতানুসারে জগতে উত্থিত হইতে পারে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া তথায় আসে।

এইরূপভাবে আমেরিকার "মিশনের" কথা প্রচারিত হয়। আমেরিকার মিশন আমেরিকানত্বেরই কথা গৌণ ভাবে বলে। এই মিশনের উদ্দেশ্য নূতন মানব গঠন করা, সেই নূতন মানব "আমেরি-

কান" হইবে। ইহা হইল ভাব রাজ্যের কথা; কিন্তু চর্চ্চা ও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া নিরীক্ষণ করিলে বোধগম্য হইবে, এই "আমেরিকান" "খাঁটি-আমেরিকান" হইতে বাধ্য। তত্রাচ দ্রবপাত্র ও মিশন-বাদের মধ্যে কতক সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা সত্য যাহারা আমেরিকায় বেশীদিন বাস করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়া যায় এবং যাহারা তথায় জন্মগ্রহন করে বাহ্যতঃ তাহারা পুরাতন দেশের মানব হইতে পৃথক ভাবাপন্ন হয়। এই পার্থক্য তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গী, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, মনঃস্তত্ত্ব, চিন্তা ও ধারণা প্রভৃতিতে প্রকাশ পায়। এই বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া ইউরোপে আমেরিকানকে শীঘ্র চেনা যায়। আর যাহারা তথায় জন্মিয়াছে তাহাদের বাহ্যিক আকৃতিতে যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনা তাহা আমি স্বীকার করি না। আমেরিকার শুস্ক বায়ুতে ইউরোপ হইতে মানবের শরীরের বাহ্যিকাকৃতির যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি, আর পর্য্যাপ্ত আহার, আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি সম্মত থাকিবার স্থান, সর্ব্বপ্রকারের সুখ-সাচ্ছন্দতা প্রভৃতি দ্বারা মানবের মনঃস্তত্ত্বেরও পরিবর্ত্তন হয়। যে ইউরোপীয় কৃষক বা শ্রমিক দেশে কুঁড়ে ঘরে থাকিত ও জমিদার বা ধনীশ্রেণী দ্বারা পদদলিত হইত এবং শুষ্ক রাইয়ের রুট ও শাক-সবজির দ্বারা কায়ক্লেশে উদরপূর্ণ করিত, সেই ব্যক্তি আমেরিকায় তিনবেলা মাংস ও অন্যান্য পুষ্টিকর পর্য্যাপ্ত আহার করিতে পায়, বৈদ্যুতিক আলোক সমন্বিত আধুনিক স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতা সম্মত পাকা বাড়ীতে বাস করে, বেশী অর্থোপার্জ্জন করে এবং তদ্বারা ভাল হালফ্যাসানের পরিচ্ছদাদি পরে ও আমোদাহ্লাদ করে, পুত্রকন্যাদের বিনাবেতনে শিক্ষাদান করিবার সুবিধা পায় ও তাহারা গুণ ও সুবিধানুসারে জীবনে উন্নতিলাভ করে। এই সব যোগাযোগে তাহারা যে পিতৃপুরুষ হইতে নূতন ধরণের লোক হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথাও নহে ও অবৈজ্ঞানিক তর্কও নহে। তৎপর আমেরিকায় সর্ব্বজাতির সম্মিলন হয় বলিয়া বিবাহের গণ্ডী সংকীর্ণ নহে। বিবাহ তথায় বিবাহর্থীদের স্বেচ্ছাধীন, তথায় ব্যক্তিগত পছন্দ আছে, একটা যৌন নির্ব্বাচন আছে। এবং ইহার ফলে বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণ হইতেছে ও sexual selectionএর ফলে তথায় একটি সুন্দরকায় নরজাতির সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুতঃ ইউরোপীয় শ্বেতকায়জাতিসমূহ মধ্যে আমেরিক্যানরা একটি বিশেষ সুশ্রী জাতি।

আর জলবায়ুর গুণে যে মানবের চরিত্র গঠিত হয় ও মনোবৃত্তির পার্থক্য হয় ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাচীন কালের আরিষ্টটল, মধ্যযুগের ইবন খালদুন ও বর্ত্তমান কালের বাকল্ এই সত্যেরই পুন-রাবৃত্তি করিয়াছেন, রুষের অচল ও অলস

শ্লাভিক মুজিকের কৃষক শিরাতে যখন আমেরিকার বায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে ozone প্রবেশ করে তখন সেই অলস ব্যক্তি উদ্যমশীল ও স্নায়বীক (nervous) পুরুষে পরিণত হয়। আমেরিকায় কথিত হয় মিসিসিপি উপত্যকায় ও পশ্চিমের প্রেরির (prearie) শ্বেত লোক সমূহ তৎস্থানের প্রকৃতির গুণে wild Indian রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে! বস্তুতঃ পশ্চিমের মরুভূমির লোক সকল আদিম অধিবাসীদের ন্যায় nervous, বর্ব্বর ও, কলহপ্রিয়। তাহাদের জীবনের কার্য্যের সহিত আদিম অধিবাসীদের জীবনের সহিত মূলতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই; যাহা আছে তাহা শ্বেত জাতির সভ্যতা ও সংস্কারের শীর্ণ ব্যবধানের ফলপ্রসূত ?

উপরোক্ত সমাজতত্বীক কারণ সমূহ বশতঃ আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য যে এক-প্রকারের melting pot তাহা সত্য কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ। আমার বিশ্বাস প্রাচীন কলে ভারতবর্ষও একটি দ্রবকটাহ ছিল। যে কোন স্বাধীন উদীয়মান জাতি (nation) এই প্রকারে বিভিন্ন জাতিকে (race) নিজের এক জাতীয়ত্বের (nationality) ভিতর জীর্ণ করিয়া লইবে। ইহা স্বাস্থ্য ও সবলতার লক্ষণ। আমেরিকা একটি পরাক্রমশালী উদীয়মান দেশ, কাজেই তথায় সর্ব্ব জাতিই তাহার শরীরে জীর্ণ হইবে। কিন্তু এই স্থলেই একটা খটকা ওঠে! এই সর্ব্বজাতি অর্থে আমেরি-কানেরা "সর্ব্ব প্রকারের শ্বেত জাতি" বুঝেন! তাঁহারা বলেন, "আমরা শ্বেত-বর্ণের লোকদের সমাজ শরীরের উদরে জীর্ণ করিতে পারি; উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপীয়ের গাত্রবর্ণের পার্থক্য থাকিলেও এক সভ্যতা ও এক ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া তাহারা একীভূত হইতে পারে, এবং ইহার সঙ্গে এসিয়াবাসী শ্বেতকায় খৃষ্টান জাতিরা যথা—সিরিয়, আর্ম্মেনীয়, গ্রীক, চালডীয় প্রভৃতিরাও এই আমেরিকান সমাজে মিলিত হইতে পারে কারণ ইহারা বর্ণ সমস্যা আরও গুরুতর করিবে না; কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এসিয়ার বিভিন্নবর্ণের বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন সভ্যতার লোকেরা আমেরিকান সমাজে উদরস্থ হইবে না, বরং বিভ্রাট আরও বৃদ্ধি করিবে।" এই বিষয়ে অনেকে নানাপ্রকার নৃ-তত্বীক, সমাজতত্বীক আপত্তি ও সমস্যার উদ্ভাবন করেন যথা—প্রাচ্যীয় লোকেরা নিম্ন-জাতি সম্ভূত অতএব তাহাদের রক্ত দুষ্ট, তাহাদের সংস্কার ও সামাজিক আচার জঘন্য তাহা আমেরিকায় বসবাসের ফলেও দূর হইবে না ইত্যাদি। এই সব বিদ্বেষ-পূর্ণ যুক্তি বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও একটি অকাট্য সত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান হয় যে—আমেরিকান সমাজ এই "রঙ্গীন" জাতি সমূহকে চাহে না। দ্রবকটাহ-মতবাদ যদি শ্বেতজাতি সমূহের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে "রঙ্গীন" প্রাচ্যীয়দের পক্ষেও

প্রযোষ্য হইবে। আমি ভারতবাসী যুবক দেখিয়াছি যিনি বাল্যকাল হইতে আমেরিকায় পালিত হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে আমেরিকান মনঃস্তত্ত্বের অধিকারী; আমি চৈনিক যুবতীদের দেখিয়াছি যাঁহাদের একজন আমেরিকায় বাল্যকাল হইতে বাস করিতেছেন আর একজন তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উভয়েই দ্রবপাত্রে দ্রবীভূত হইয়াছেন। আমি প্রথমে তাঁহাদের স্পানীশবংশীয় দক্ষিণ আমেরিকান মহিলা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আলাপের পরে তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা চীন বংশীয়া যদিচ তাঁহার চীনাভাষা পর্য্যন্ত কহিতে পারেন না। ইহাঁরাও ঐ melting pot এর লোক, তাঁহাদের ভাবেতে, মনেতে ও বাহ্যিকাকৃতিতে "heathen Chinese" এর কিছুই লক্ষিত হয় না তত্রাচ আমেরিকান সমাজ তাঁহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে! আর একটি চৈনিক যুবতী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন আমার কোন ইউরোপীয় বন্ধুর কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নিজের মাতৃভাষা জানি না, ইংরেজিতে কথা কহি, আমেরিকানের মতন চিন্তা করি ও জীবনের কার্য্যও তদ্রূপ, তথাপি আমায় আমেরিকানেরা "চীনা" বলিয়া একপাশে রাখিয়া দিয়াছে, আমি আমেরিকান হইতে পারিলাম না!" আমার বন্ধুটি বলেন "এই মহিলাটির social isolation দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইত।" ইহাঁরা দ্রবপাত্রে দ্রবীভূত হইলেও আমেরিকান সমাজ তাঁহাদের চায় না। ইহাকেই বলে বর্ণ বিদ্বেষ।

এই melting potএ সর্ব্ব জাতিই দ্রবীভূত হইয়া আমেরিকানরূপে "শুদ্ধ" হইতেছে কিন্তু বর্ণ বিদ্বেষ জন্য তাহার মধ্যেও পার্থক্য করা হইতেছে। এইজন্য বলি জান্‌গউইল ও ষ্টাইনারের দ্রবপাত্রমতবাদ সর্ব্বথা সত্য নহে, এবং ইহা একটি ধ্রুব সত্য হইলেও সর্ব্বত্র তাহা প্রযুয্য না হওয়ায় তাহার গুণের হানি করিতেছে। সত্য কথা এই—আমেরিকা ইউরোপীয়দের জন্য melting pot বা আর কিছু হইতে পারে, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের ও আফ্রিকার লোকদের জন্য নহে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশ্ববার্ত্তা

—:০:—

রাজনীতি—

স্বাধীনতার অপূর্ব্ব তেজ ও সৌন্দর্য্য অনেকের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মুস্তাফা কেমাল পাশাকে হত্যা কর্ব্বার যে ভয়ানক ষড়যন্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এতে অনেকটা তাই প্রমাণিত হয়। এই হত্যার উৎসাহী কোন ইউরোপীয় শক্তি কিনা তা জানা না গেলেও, অনেকে সন্দেহ করছে। অপোজিসন পার্টির (Opposition Party) কয়জন বিশিষ্ট সভ্য এই যন্ত্রের যন্ত্রী। গত বছর ডিসেম্বর থেকে এই হত্যার চেষ্টা চল্‌ছে। মুস্তাফা সম্প্রতি ব্রুসা নামে এক স্থানে গেছলেন, ওরা মনে করল এই সুযোগ। কনষ্টাণ্টিনোপলে শুকরীবে জমায়েৎ ডেকে সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী এই দলে যোগ দিলেন। কেউ কেউ ইতঃস্তত করতে লাগ্‌লেন। সংবাদ পাওয়া গেল যে রাষ্ট্রপতি কনষ্টাণ্টিনোপলে যাচ্ছেন। যন্ত্রীরা সেখানেই চলে গেল। ঠিক হল যেই কেমাল সহরে ঢুকবেন অমনি কাজ ফতে করা হবে। স্থির করা হ'ল একজন মহিলাকে দিয়ে ফুলের তোড়ার মধ্যে করে কয়টি ছোট ছোট গ্রেনেড তাঁর হাতে দেওয়া হবে। কয়দিন ওরা নগরদ্বারে অপেক্ষা করল। গাজী এলেন না। যন্ত্রীরা শুনলেন মুস্তাফা স্মার্ণা যাবেন। শুকরীবে নিজে সুটকেশে করে বোমা নিয়ে চল্‌লেন। ১২ই জুন সবাই স্মার্ণায়। এক যন্ত্রী গিয়ে মুস্তাফাকে সব কথা বলে ফেল্‌ল। শুকরীবে তালাৎ-পাশার উজীর ছিলেন। একটি মহিলা এর সঙ্গে জড়িত, এঁর নাম নেদ্‌জি হানুম। তুরস্কের শ্রেষ্ঠ রণসর্দ্দার জেনারল কাজিম কারা বেকির পাশা এর ভিতর ছিলেন। বিচার চলছে।

*　　*　　*

অমনি ষড়যন্ত্র স্পেনে। জুনের শেষ হপ্তায় স্পেন-কর্ত্তৃপক্ষ লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারাল এগুইলেরা ও ব্রিগেড জেনারাল ব্যাটেটকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অপরাধে গ্রেপ্তার করেছেন। সরকারী ইস্তাহার বলেছে Syndicatists, Republicans ও কতকগুলি বিপ্লববাদী বুদ্ধিমান এবং কয়জন কর্ম্মচারী এর ভিতর রয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য কেবল নিজেদের স্বার্থ।

*　　*　　*

কিন্তু বিদেশীরা যাই বলুক, চীনের জাতীয় দল সম্বন্ধে ওকথা বলা চলে না। শক্তিধররা দুদিন আগে গালভরে যে রণসর্দ্দার উপিফু আর চাংসো লিনের নিন্দা করেছেন আজ তারা পেকিংএ এসে জাতীয় ফৌজের বিরুদ্ধে মৎলব আঁটবে দেখে শক্তিধররাও খুসী হয়ে গেছেন। চাংসোলিন পেকিংএ একা যাননি সঙ্গে গেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দেহরক্ষী। ভগ্নদূত সংবাদ পাঠিয়েছে যে উপিফু জাতীয় দলের সঙ্গে নাকি লড়াই করতে চাচ্ছেন না। তাঁর নিজের নাকি কোনও ফৌজ নেই। ওঁর নাম দিয়ে কাজ হাসিল করতে যারা উপিফুকে দাঁড় করিয়েছিল, তারা যে কোন সময় দল-ছাড়া হয়ে যেতে পারে। এদিকে উপিফুর সাহায্য ছাড়া চাং কিছু করতে পারবেন না। ওদিকে জাতীয়-দল মজুত করেছে ২ লাখ সৈন্য, ওদের রসদ আছে, অস্ত্র

আছে, রুশিয়া যথেষ্ট টাকা জোগাচ্ছে। এবার নাকি জাতীয় দল শানশী প্রদেশ দখল করবে। এই প্রদেশ একবার যদি তারা নিতে পারে তবে উত্তর-পশ্চিম চীন তাদেরই হয়ে গেল।

* * *

চীনের কথা বলতেই রুশিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। বিদেশে প্রপাগণ্ডা চালাবার জন্য সোভিয়েট সরকার স্থির করেছেন যে ২০লক্ষ লোক গোটা দুনিয়ায় নিযুক্ত করবেন। লোক বাছাই করা হবে দেশ-বিদেশের রাজনীতিক অপরাধে নির্ব্বাসিত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্য থেকে। এর মধ্যে জার্ম্মনই বেশী হবে। তবে মুসলমান, চীনা, জাপানী ও ভারতীয় বিভাগও রইবে।

কিন্তু ইংরাজ বা ফ্রান্স যখনই বলে,—এইভাবে তোমরা গোটা দেশে বিপ্লব জ্বালাচ্ছ, তখনই সোভিয়েট সরকার বলে বসেন,—রুশ সরকার কিছু করছে না, করছে Third (Communist) International. এরা মস্কোতে থাকে মাত্র যখনই সুবিধা হবে ওদের সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু রাইকফ্, কামেনফ্, ট্রটস্কী, সোকোল-নিকফ্, ভোরোশিলফ, টমস্কী—এরা সোভিয়েট সরকার ও কমুনিষ্ট দল উভয়েরই কেষ্ট বিষ্টু।

এই কমুনিজিমের জন্যই সব দেশের স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসক ও জমীদার ওদের উপর চটা। সেদিন রুশ সরকারের কৃষি বিভাগ (Commissariat of Agriculture) ঘোষণা করেছেন যে গত তিন মাসে অনেক জমির মালেকানা স্বত্ব বাতিল করা হয়েছে। ২০ মার্চ্চ থেকে ১০১৭ জন জমীদার সম্পত্তিহীন হয়েছে। এদের দূর দূর দেশে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে সরকার বলেছেন যে ওরা শিক্ষার বহর দেখিয়ে চাষীদের উপর প্রভুত্ব করবে ("because they threatened by their superior education and experience to gain an undue influence over the peasantry")। ১৯২৫ সালে ১২৯৫ জন জমিদারকে সম্পত্তিহীন হতে হয়েছে। এখনও ২৮০০ জনের নাম তালিকায় রয়েছে। এদের নির্ব্বাসিত করা হলেও কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না। প্রত্যেকের মর্য্যাদা অনুসারে ভালবাড়ী ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

রুশ একটা ভাল কাজ করছে। ভোরো-শিলযোর প্রস্তাব অনুসারে সরকার সমস্ত স্কুলে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার আয়োজন করছেন।

সামাজিক—

আমেরিকার সাইরাকুসে একজন নার্সকে কে বোমা পাঠিয়ে খুন করেছে। পুলিশ যুবতীর কক্ষে কয়টি চিঠি পেয়েছে। একখানাতে এক প্রেমিক লিখেছে—"প্রাণপ্রিয়, আমি তোমায় ভালবাস্‌ব, তুমি চাও বা না চাও।" এক খানাতে শাসিয়ে লেখা হয়েছে—"ওর চাইতে বেশী তুমি পেতে পার না, আমিও তোমায় ছেড়ে কথা কইব না।" যে নটবর এই চিঠির নীচে সই দিয়েছিল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বেচারার স্ত্রী মারা যায় আজ ২৩ বছর। ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ফ্রাঙ্ক মহা মুস্কিলে দিন কাটাতে লাগল। এক এক করে আত্মীয়রা মিলে ছেলেগুলোর ভার ভাগ করে নিল। ফ্রাঙ্ক বুঝল এবার ছুটি! ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে কয়-দিন কেঁদে হতভাগ্য কোথায় চলে গেল। কন্যা মিসেস্ স্পেলম্যান পিতার সন্ধান করছে। সে বলে—যখন বৃষ্টি হয়, ভাবি বাবার আর দাঁড়া-বার জায়গা নেই! কে বলে দেবে বাবা বেঁচে আছে! কে তাঁকে এনে দেবে?

* * *

এডওয়ার্ড উইলিয়ম্‌স্‌ নিগ্রো। বয়স প্রায় ৪০। স্ত্রী অন্তের সঙ্গে মেলামেশা করে, সে তা পছন্দ করে না। এই নিয়ে একটু বচসা হতেই এডওয়ার্ড স্ত্রীর মুখে ঘুঁসি মারে। কোলের আটমাসের শিশু এমা কেঁদে উঠ্‌ল। রাগে এডওয়ার্ড এক চড়ে ছেলেটাকে সাবাড় করে দিয়ে পালিয়ে গেল। গোয়েন্দা পুলিশে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

*　　*　　*

মিসেস্ ব্রনসন ব্যাচেলর—পদস্থ ঘরের বধূ। অদ্ভুত সজ্জায় তিনি সেদিন টেনিস খেলতে নেমে-ছিলেন। পায়ে সোণার মল। মোজা নেই। পুরুষগুলো রেগে ক্লাবের গভর্ণরের কাছে নালিশ করতে গেছল। মেয়েটি বলেছে—আমার বয়স ২৮। পুরুষরা যে খালি বুকে খেলতে নামে আমিও খালি পায়ে খেলতে নেমেছি তার কি হয়েছে?

*　　*　　*

হেরল্ড ষ্টার্ণ এক হোটেলে অরচেষ্ট্রার মূল বাজিয়ে। একদিন সে এক পত্র পেল—মিঃ হেরল্ড ষ্টার্ণ,

তোমার চাইতে আমি ভাল বাজিয়ে, ভাল ওস্তাদ। তবু আমি খেতে পাই না, আর তুমি মজা করে রয়েছ। তুমি একরাতে যা' উপায় কর "জাজ" নাচ্‌নার বাজনা বাজিয়ে আমি এক বছরে তা পাইনে। তোমার টাকা থেকে ১৮০ ডলার আমায় পাঠিয়ে দিবে, নৈলে তোমার সব অরচেষ্ট্রা আমি যেয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আস্‌ব। মনে রেখ সব মানুষ সমান হয়ে জন্মেছে, কেউ বেশী ভোগ করতে পেতে পারেনা।

মাথা খারাপ কেউ লিখেছে মনে করে হেরল্ড চুপ করেই রইল। হঠাৎ একদিন, মেয়েরা "জাজ" নাচ্‌না নাচ্‌ছে, হেরল্ড একমনে বাজনা বাজাচ্ছে, কে এসে তাকে জখম করে পালিয়ে গেল।

শিশু হেরল্ড জেলে পচ্‌ছে, মা রোজ বিচ সঙ্গে। আমেরিকার এক কাউন্টি জেলে বসে জননী রোজ বলেছেন—

বিচ আমার তৃতীয় স্বামী। মা আমার ছিলেন বড্ড কড়া, কাজেই বাড়ী বড় পছন্দ হ'ত না। মনে করলুম ওদের একঝুড়ি মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান আমিই বেশী। এখন বুঝছি মা কিছু বুদ্ধি ধরতেন। মাকে ফেলে আমি ষ্টিফেন গার্ব্বারের সঙ্গে চলে গেলাম। মা মারত না, ষ্টিফেন মারত, যাক্ সে কথা! বিয়ের তিন বছর পর ষ্টিফেনকে ছেড়ে খুকী ইভেলীনকে নিয়ে চলে গেলাম। খুকীর বয়স এখন তিন বছর। এই গত বছর আমার বর্ত্তমান স্বামী হেরল্ড বিচের সঙ্গে দেখা। সে বললে আমায় বিয়ে করবে। আমি ভাবলুম ষ্টিফেনের কাছ থেকে তালাকনামা লিখে আনি। কিন্তু ষ্টিফেনের ভাই বললে সে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কাজেই আর গেলুম না। গত ডিসেম্বরে আমাদের বে হয়েছে। বেশ সুখেই ছিলুম। পরে শুনলুম ষ্টিফেন মরেনি। আজ এর জন্ত জেলে আমি এসেছি তাতে দুঃখ নেই, খোকা হেরল্ড আমার বুকে রয়েছে—বয়স তার এই তিনহপ্তা হল। শুনলুম শ্বশুর মশাই ষ্টিফেনকে উত্তেজিত করে মামলা আনিয়েছেন।

আদালতে নারীর এই কাহিনী শুনে জজ বিচলিত হয়ে বলেছেন—"আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কেন নারী-সমিতি ব্যাপারটাতে আদৌ আগ্রহ দেখাচ্ছে না।"

আমেরিকায় যুবতী খুন এখন প্রায় প্রত্যহই হচ্ছে। গত ১২ই জুন ৫ জন ঠক মোটর চড়ে এক বাড়ী এসে হাজির। দু'জন ভিতরে ঢুকল,

দু'জন পাহারা দিতে লাগল। গাড়ীর মোটর চলছেই। একজন শোফারের আসনে বসে। সেটা আফিস। ২৫ জন যুবতী বসে কাজ করছেন। ইঙ্গিত হ'ল "বিঁধে ফেল।" অমনি গুলি। তিন জন আহত হয়ে পড়ল। ঠকরা টাকাকড়ি নিলে না, পালিয়ে গেল। আসামীর পাত্তা নিতে দু'শর উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক —

একরকম নতুন গ্রামোফোন রেকর্ড বিলাতে চলন হবে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। রেকর্ডগুলো হবে সস্তা, হাল্কা অথচ পড়লে ভাঙ্গবে না। কাগজের দু'পিঠে একরকম জিনিষের পোঁচ দিয়ে এগুলো তৈরী। দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে সেলুলইড রেকর্ডে আর এতে তফাৎ কি। দুই ধারে গানওয়ালা এই রকম রেকর্ডের দাম এক সিলিং—এর চাইতে বেশী হবে না।

সই ওজনেরও দরকার হয়ে পড়েছে। গত ৩রা জুন বিলাতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেন্ট্রাল হলে নিক্তির প্রদর্শনী খুলেছে। একটা নিক্তিতে সইকরা নামের ওজন পর্য্যন্ত মিলবে। আগে সাদা কাগজ, তারপর সেই কাগজে নাম সই করে ওজন করে সঙ্গ ওজন ধরা হবে। এই যন্ত্রে এক গ্রামের ১ কোটি ৫০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত ধরা পড়বে।

রেডিও দিয়ে ফটো তুলবার নতুন এক পদ্ধতি বেরিয়েছে। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ শ্রোটার এবং ডাঃ ক্যারোলাস। কয়েক সেকেণ্ডে এই উপায়ে ফটো তোলা হচ্ছে। ভিয়নাতে ফটো পাঠাবার জন্য মস্ত আড্ডা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ডেনমার্কেও এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তণ কর্ব্বার চেষ্টা হচ্ছে।

ভিয়ানার প্রসিদ্ধ ডাঃ এডলফ্ লোরেঞ্জ কখনও বৈদ্যগিরী করতে রক্তপাত করেন না। তাই তাঁর প্রধান প্রধান রোগী হ'ল ছেলে মেয়েরা। এই বৃদ্ধ চিকিৎসককে ছেলেরা খেলার সাথী মনে করে। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কোন শিশুর হাতপা না থাকে তবে কি তাকে মেরে ফেলা চলে? তিনি বলেন যদি প্রকৃতি মারে মারবে।

বিলাতে নর্দ্দাম্টন জেনানার হাসপাতালে অদ্ভুত এক অস্ত্রোপচার হয়েছে। রোগিণী প্রৌঢ়া। লেরিংসের পেশী বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁর আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছল। অস্ত্রোপচার করে স্নায়ু বদল করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ডাক্তারকে আগে বানর কুকুরের গলার উপর দিয়ে মহড়া দিয়ে নিয়ে হয়েছিল। চিকিৎসার ফল ছয় মাস আগে জানবার উপায় নেই, তবে ডাক্তাররা খুব আশা করছেন যে সুফল ফলবে।

তা. রা.

ফাঁদ

—০—

মুক্তি আমি চাই,
বিশ্বের এই বিচিত্রতায়
মুক্তি কিগো নাই ?
যতই ছুটি মুক্তি আশে,
রঙিন আলো, সবুজ ঘাসে,
ততই ওগো মোহন পাশে
জড়িয়ে আমি যাই।
বিশ্বের এই বিচিত্রতায়
মুক্তি কিগো নাই ?

কোন্ কুহকের মন্ত্রবলে
প্রাণ ওঠে গো পুরে,
জানিনে কোন্ কাহার টানে
কেবল মরি ঘুরে !
অনন্তেরি পাতায় পাতায়,
মুক্তি খুঁজি—পাইনা যে তায়,
মুক্তি যদি না মেলে হায়
মরণ আমি চাই।
বিশ্বের এই বিচিত্রতায়
মরণও কি নাই ?

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিবাহ রাত্র হইতেই মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতি বিনোদেন্দুর কেমন একটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। শিখা তার বড় আদরের বোন ছিল। সেই প্রভাতের পূজার পুষ্পের মত তার অনিন্দিত বোনটি এই পশুটার হাতে পড়িল! পশু নয় ত কি? যে দুই পুত্র সত্বে, পুত্রদের অপেক্ষাও বয়োকনিষ্ঠা বালিকাকে বিবাহ করিতে চায় সে পাশব প্রকৃতি ছাড়া আর কি? যাহারা বিবাহ দিল, তার পিসিমা এবং সে স্বয়ংও যে সেই পশুপ্রকৃতির চরিতার্থতার সহায়তা করিয়া পাপাচরণ করিল, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ও পরিতাপের শেষ রহিল না। বিনোদেন্দুর মনে হইল মৃতদারিকের পুনর্ব্বিবাহের মত গর্হিত কার্য্য আর নাই। যেমন বিধবা স্ত্রী মৃতস্বামীকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে, তেমনি পত্নীহীন স্বামীর উপরও মৃতপত্নীর স্মৃতি মনে মনে চিরপোষণ করার একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে সে স্থির করিল। এক স্ত্রীর আসনে অপর স্ত্রীকে বসাইবার অধিকার পুরুষের নাই।

তারপর দশবৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিনোদেন্দু আজ নিজে মৃতদারিক। উর্ম্মিলার ত্যক্ত তার হৃদয়াসনখানি আজ আর একজনে দখল করিবার উপক্রম করিতেছে। বুঝিয়াও বুঝিল না; সময়ে নিজের উপর রাশ টানিলনা।

নরেশনিয়োগী বর্শিবিদ্ধ মাছকে খেলাইয়া খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে লাগিল। দিন চার অদৃশ্য থাকিয়া হঠাৎ আবার আবির্ভূত হইল। বিনোদেন্দুর আগ্রহ যখন ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছিল তখন আবার তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিল। এবার দিনদশেক প্রত্যহ তাহাকে ইহুদি বাড়ী লইয়া গেল। সেখানে রেবেকার সঙ্গে একক আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সুযোগের পূর্ণ আয়োজন করিল।

ঘরের একপাশে বাজী রাখিয়া তাস খেলা এ বাড়ীতে প্রায় চলিত, কোন কোনদিন লোকাভাবে সেপাশে বিনোদেরও ডাক পড়িত। বিনোদ প্রথম দুই একদিন মাত্র জিতিয়াছিল, পরে খেলিলেই হারিত, এবং কতিপয় মুদ্রাখণ্ড দণ্ড দিত। রেবেকা তাসের মজলিযে নামিত না, বিনোদের অনুরোধেও অগ্রসর হইত না, বিনোদ তাই খেলা শেষ করিতে ছট্‌ফট্‌ করিত, খেলায় অমনোযোগও বাড়িত। দশদিন এইরূপে কাটার পর নরেশ আবার একদিন আসিল না। বিনোদ ৪টা হইতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ৭টা পর্য্যন্ত নরেশ না আসায় একবার মনে করিল, আমি

নিজেই যাই না? নরেশের সঙ্গের অপেক্ষা রাখার আর প্রয়োজন কি? এখন ত যথেষ্ট পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাধ বাধ ঠেকল, এ পর্য্যন্ত কোনদিন একলা যায় নাই। দ্বিতীয় দিনও যখন নরেশ লইতে আসিল না, আর থাকিতে পারিল না। ৬টার পর বাহির হইল। কিন্তু শোফারকে একেবারে সোজা আইভ্যাকের গৃহে যাওয়ার জন্য হুকুম দিতে জিভ আটকাইয়া গেল। এদিক উদিক অনির্দ্দিষ্ট-ভাবে খানিকটা মোটর ঘুরাইয়া অবশেষে লাউডন ষ্ট্রীটে যাইতে বলিল।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিল কার্ড পাঠাইবে, না যেমন বিনা খবরে অন্য দিন নরেশের সঙ্গে উপরে উঠিয়া যায় সেইরূপ যাইবে? কাছাকাছি কোন চাকর ছিল না, সুতরাং খবর পাঠানর উপায়ও রহিল না। সোজা উঠিয়া ড্রইংরুমের দরজায় দু' একটা টোকা দিতেই কেহ বলিল "আও"!

বিনোদ প্রবেশ করিল। ঘরে প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিল ঘরের একপাশে এক খানি গদি মোড়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটি পরমা সুন্দরী বৃদ্ধা বসিয়া আছেন, পাশে তাঁর একটি বাহারে গুড়গুড়ি, এবং তার নলটি উহাঁর মুখে। সুবাসিত তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের সেদিকটা আচ্ছন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধার পরিধানে ইহুদি মেয়েদের ঢিলে ঢালা সাদা গাউন, আর মাথায় একটি রেশমী রুমাল বাঁধা; মোজাহীন পায়ে মখমলের চটিজুতা শোভিত।

বিনোদেন্দু একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন ও নিজের পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কাছে আসিলে হিন্দী ও বাংলাতে মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন—"তুমি বোধ হয় রাজা বিনোদ রায়?"

বিনোদেন্দু টুপি হাতে করিয়া ঘাড় নাড়িলে বলিলেন—"আজ আমার নাত্-নীরা পিক্‌নিকে গেছে, স্যামুয়েল নিমন্ত্রণ করেছে। নিয়োগীও সঙ্গে আছে, তুমি যাও নি?"

বিনোদ এই সম্বাদে ও প্রশ্নে অপ্রতিভ হইল। কেন আসিল? বৃদ্ধা তাহার অপ্রতিভ ভাবটি বুঝিতে পারিয়া চট্‌পট্ কথা বদলাইয়া লইলেন। এমন অমায়িক সরস প্রকৃতির বৃদ্ধা নারী বিনোদেন্দু কখন দেখে নাই। ঘণ্টা খানেক ধরিয়া কত গল্পে, কত হাস্য পরিহাসে তাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। একবার বলিলেন—"তুমি গান ভালবাস রাজা? আমি বাঙ্গলা গান জানি—শুনবে?" এই বলিয়া বিকৃত উচ্চারণে নিধুবাবুর একটা টপ্পার দুটি লাইন গাহিলেন।

"বিচ্ছেদ-যাতনা অতিশয়, তা ত নয় গো।
সুখের জলধি-স্রোত; নিরবধি বয় গো॥"

বৃদ্ধার অদ্ভুত বাঙ্গলা উচ্চারণে এবং এই গানটীর নির্ব্বাচনে বিনোদেন্দু হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। মুখে

তাঁর বাঙ্গলাগীতি কুশলতার প্রশংসা করিল। কিন্তু তিনি তাহাকে রঙ্গরসে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও তার মন হইতে অনাহূত আসিয়া পড়ার লজ্জা মুছিয়া যায় নাই। যার জন্য আশা তাকে দেখিতে না পাওয়ার ব্যথার সহিতই সে লজ্জা মিশ্রিত। সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগীর প্রতি রাগ এবং শ্যামুয়েলের প্রতি ঘৃণা ও ঈর্ষার দংশনও মাঝে মাঝে হুল ফুটাইতেছিল।

বৃদ্ধার অতি সরস বাক্যালাপের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া সে অন্যমনস্ক হইতেছিল গানের পর বিদায় গ্রহণ করিয়া উঠিল। অস্বস্তিপূর্ণ মনে গৃহে ফিরিল। রাত্রিও অস্বস্তিতে কাটিল।

তার পরদিন সকালে প্রথম ডাকে এক খানি চিঠি পাইল। খামের শিরোনামায় হস্তাক্ষর চিনিতে পারিল না। চিঠি খুলিয়া দেখিল ইংরাজীতে লেখা। নীচের স্বাক্ষরটিতে চোখ পড়িতেই বুকের রক্ত সজোরে বহিতে লাগিল। চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত, তার মর্ম্ম এই—প্রিয় রাজা, কাল আমরা বাড়ী ছিলাম না, আপনি আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, বড় দুঃখিত হইলাম। আজ নিশ্চয় আসিবেন, আমরা থাকিব।

আপনারই – রেবেকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরলা দেবী

দুলাল

(গল্প)

১

স্বর্গীয় পিতার একটি গুণ পূর্ণভাবেই পুত্র দুলালচন্দ্রে বর্ত্তিয়াছিল। দুলালের পিতা চরণদাস বৈরাগী একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। তাহার রচিত মান মাথুরের পালা আজও সাতপাড়া অঞ্চলে গাওয়া হয়। এখনও কোন বড় ওস্তাদ সে অঞ্চলে আসিলে মজলিসে বসিয়া ইতর-ভদ্র সকলেই স্বর্গীয় চরণদাসের কথা তুলিয়া দুটা গল্প করে।

দুলালকে তিন বছরেরটি রাখিয়া চরণ মারা যায়। সে আজ চার বছরের কথা। ইতিমধ্যে দুলালের মা শ্যামা বৈষ্ণবী গোবিন্দ বৈরাগীর সহিত কণ্ঠী বদল করিয়া আবার নূতন গৃহে সংসার পাতিয়াছে। তাহাতে দুলালের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। সে আগেকার মতই চারবেলা ভাত খায়, সমস্ত দিন বাড়ী-বাড়ী নাম কীর্ত্তন ও মান মাথুরের এক

আধ খানা ভাঙ্গা পদ গাহিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ প্রহার করিয়াও দুলালকে তার মুড়ী-মুড়্কীর দোকানে কাক তাড়াইবার কাজে লাগাইতে পারে নাই।

এই প্রহার পিতার আমলে তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা, সে কথা তাহার মনে পড়ে না, তবে এখন এটা নিত্যকার ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে; কাজেই প্রহার তার সহিয়াও গিয়াছে। সমস্ত দিনের পর শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া চারটি ভাত ও এক ঘটি জল খাইয়া মার আঁচলে মুখ মুছিয়া সে শয্যা লয়, পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলে আবার একবাটি ভাত গুড় ও তেঁতুলের সহিত উদরস্থ করিয়া প্রহর-কালের জন্য দৈনন্দিন সঙ্গীত কলার অনুশীলনে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়।

কিন্তু সহসা একদিন এই নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রায় বাধা পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দুলাল দেখিল, উঠানে জলচৌকির উপর ভদ্রবেশ-ধারী একটী লোক, সম্মুখে তার মা ও গোবিন্দ; উভয়ে দাঁড়াইয়া পরম নিবিষ্ট চিত্তে সে লোকটির সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। ভদ্রলোক দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়,—খুব শৈশবেই চরণ তাকে এ কথা শিখাইয়াছিল। সে আসিয়া টিপ্ করিয়া আগন্তুকের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আগন্তুক দুলালের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "বাঃ, বেশ সভ্য তো তোমার ছেলেটি, বোষ্টমী!"

শ্যামা কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই ক্ষুধার্ত্ত দুলাল মার আঁচল টানিয়া কহিল, "ভাত দে মা।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আহা, যাও, যাও ভাত দাওগে, কথা তো হয়েই আছে, সন্ধ্যা হলেই আগাম টাকাটা দিয়ে যাবো' খন।"

শ্যামা দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটী কলিকাতার সুরেন্দ্র থিয়েট্রি-ক্যাল যাত্রা পার্টির ম্যানেজার। তিনি এদিকে তাঁর শ্যালিকার গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যায় সেখানে হরি-সংকীর্ত্তনে দুলালের গান শুনিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে এমন মিষ্ট কণ্ঠে তাল-লয়-শুদ্ধ গান তিনি আর কখনো শোনেন নাই! তাই গান শুনিয়া ছেলেটির প্রতি তাঁহার লোভ হয়, এবং সন্ধান লইয়া গোবিন্দর সঙ্গে শ্যামার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! গোবিন্দর মোটেই আপত্তি নাই। তবে শ্যামা? শ্যামাও মাসিক এক-কুড়ি টাকা মাহিনা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তবু ছেলে দূরে চলিয়া যাইবে, এ কল্পনায় মন তার বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু টাকা...! এক মাসের মাহিনা নগদ হাতে পাইবে, তাছাড়া ছেলের ভবিষ্যতেরও একটা হিল্লে হইয়া যাইবে...! মনকে বুঝাইয়া শ্যামা দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিল।

মার মুখে অন্যত্র যাইতে হইবে শুনিয়া দুলাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া যখন কহিল, "মা আমি যাব না" তখন এ কথায় শ্যামার মনে আবার সেই বেদনা জাগিয়া উঠিল। গোবিন্দ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি উঠে এসোনা! বাবু কি বলছেন,—"টাকাক'টি নেবে কিনা?"

এক কুড়ি টাকা চট করিয়া ফেলিয়া দিতেও শ্যামার মন সরিল না। দুলালের দিকে না চাহিয়া সে বাহিরে আসিল এবং আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর নোট দু'খানি আঁচলে বাঁধিয়া আগন্তুকের পা ধরিয়া কহিল, "আপনি আমার বাপ! ওট বৈ আমার আর কেউ নেই। দেখবেন, আপনার হাতেই ওকে তুলে দিচ্ছি!"

আগন্তুক গোপাল বণিক সহাস্যে কহিলেন, "ছ'মাস পরে চিনতে পারবে না বোষ্টমী তোমার এই ছেলেকে।" শ্যামা তথাপি বার বার করিয়া বলিয়া দিল তাহার ছেলে কি কি খাইতে ভালবাসে, কি তার সাধ, মনটা কতখানি কোমল, এই সবের মস্ত ফর্দ্দ সে দিতে চলিল। গোপাল বণিক ধৈর্য্য-সহকারে সব কথা শুনিয়া কহিলেন, "কিছু ভেবো না, দু'বেলা ভাত-মাছ তো আছেই—তাছাড়া লুচী-মেঠায়ের ছড়াছড়ি! পূজোর পর ছেলে এলে তার মুখেই সব শুনতে পাবে গো।" শ্যামা আশ্বস্ত হইল, দুলাল কিন্তু সারারাত মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবলই কহিতে লাগিল, "আমি যাবোনা মা, আমি যাবো না।" গোবিন্দ দু'বার তার চুল ধরিয়া টানিয়া তাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিল। শ্যামা কহিল, "আহা, মেরো'না—আমি বুঝিয়ে বলছি।"

শ্যামা অনেক করিয়া বুঝাইল, মিঠাই, মোণ্ডা, কেমন রঙীন ঝক্‌মকে সাজ-পোষাক, কত আদর! তার উপর কলিকাতা সহর—কত গাড়ী-ঘোড়া, কত বড়-বড় বাড়ী, লোকজন! এত প্রলোভনের কথা শুনিয়াও দুলাল কহিল, "সেখানে যে তুমি নেই! আমার মন টে'কবে না।"

শ্যামা অঞ্চলে চোখ মুছিল। দুলাল কহিল, "তুমি যাবে সঙ্গে?" শ্যামা এ কথার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইল, কহিল, "তুই আগে যা, তারপর আমাকে চিঠি দিলেই আমি যাবো।" এ ব্যবস্থায় দুলাল রাজী হইল।

পরদিন প্রাতে গোপাল বণিকের হাতে-পায়ে ধরিয়া, অনেক মিনতির সহিত ছেলেকে দেখিবার অনুরোধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামা দুলালকে বিদায় দিল। রাত্রির কথা ভুলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দুলাল মার অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা করিয়া ধরিয়াছিল—গোবিন্দ আসিয়া মুঠা খুলিয়া দুলালকে টানিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল "গাড়ী ছাড়্"। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী হইতে মুখ

বাড়াইয়া কহিল, "কাল চিঠি দেবো মা—চলে আসিস্।"

গাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু একটা আর্ত্ত ভগ্ন কণ্ঠস্বর বাতাসকে নিমেষের জন্য ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল!.........

২

চিৎপুর রোডের উপর তিনতলা বাড়ী। তেতালার একটি ঘরের বাহিরে বড় সাইন-বোর্ডে লেখা—"সেই সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি। স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা। ম্যানেজার শ্রীগোপাল চরণ বণিক।" গৃহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ছেঁড়া মাদুর-বিছানা। তাহার উপর মাঝে মাঝে বালিশ, ছিন্ন আবরণ-শূন্য। ইতস্তত অনেকগুলি বই! অধিকাংশই যাত্রার পালা, খান কয়েক সচিত্র প্রেমলিপি, থিয়েটার সঙ্গীত, পাঁচালী ও কবির লড়াই। ঘরের কোণে গুটিকয়েক বাক্স, তাহাদের গায়ে নানা বর্ণের লেবেল আঁটা। বাক্সগুলির উপর কয়েক-জোড়া তবলা ও খঞ্জনী; দেয়ালের উপর-দিকে খান-কয়েক নগ্ন নারীর বিলাতী ছবি, একটা কুলুঙ্গিতে একটি গণেশের সিঁদুর মাখা মাটীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তিটির পাশে ন্যাকড়া-জড়ানো একটি গাঁজার কলিকা! দেওয়ালের নীচের দিকে ও গৃহের প্রত্যেকটি কোণ পানের পিকে বিচিত্রিত! তখন বেলা এক প্রহর। মেঝের বসিয়া কয়েকজন অভিনেতা আয়নার সামনে বিচিত্র-ভাবের মুখভঙ্গী আয়ত্ত করিতেছিল। গৃহের কোণে একটি ছিন্ন তাকিয়ার বুক রাখিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল মুখে দিয়া দৈনিক জমা-খরচের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন।

এইসময় দুলালকে লইয়া ম্যানেজার বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, এনেচি। তৈরি করে নিতে পারলে ভড়ের "সীতা-নির্ব্বাসন" একেবারে কাণা!"

স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এ যে একেবারে খোকা দেখচি। পারবে কি?"

"পরখ করেই নিননা।"

—"আচ্ছা, একটা গাও তো খোকা!"

দুলালের অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে কহিল, "বড্ড খিদে পেয়েছে।"

ম্যানেজার বাবু চাকর ডাকিয়া চ' পয়সার মুড়ী আনিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "আস্চে খাবার—তুমি ততক্ষণ একটা গেয়ে ফ্যালো তো!"

দুলাল ভূমিতলে বসিয়া হাত নাড়িয়া একটা পদ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। নিত্য-কার মত আজ এ গানে প্রাণ তার লুটাইয়া পড়ে নাই, তবু স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতার দল বিমুগ্ধ হইল। স্বত্বা-ধিকারী বলিলেন, "চলবে। ভালই চলবে। তবে, রাখ্তে পারলে হয়।" তার-পর দুলালের গৃহের সংবাদ শুনিয়া কহি-

লেন, "না, পালাবার ভয় নেই। আজ থেকেই তালিম দিন্। কুশের পার্টটায় গান আছে, আর দু'একটা চণ্ডীদাসের পদ জুড়ে দিলে ছোক্‌রার সুবিধা হবে।" সেই দিন হইতেই দুলালের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে দুলাল জানলা দিয়া বাহিরের জগৎটাকে দেখিয়া লইল। এই কলিকাতা সহর! লোকজন, গাড়ীঘোড়া! দুলালের এ-সব মোটেই ভালো লাগে না। গাঁয়ের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িল, সেই বাবলা গাছের সারি, সেই বাঁশঝাড় ও গাব গাছের অন্তরালে তাদের সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি! অদূরে এক স্যাকরার দোকানে বসিয়া একটি ছোকরা বাঁশী বাজাইতেছিল,—কি করুণ সুর! দুলালের মনটা উদাস হইয়া উঠিল।

মার কথা মনে পড়িল! মা এখন কি করিতেছে? সেকথা মনে হইতেই দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাহিরের বিশ্ব সে জলে ভাসিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর অশ্রুর আব-ছায়ায় মধ্যে মার মূর্ত্তি সহস্ররূপে তার সামনে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল! জানলার গরাদেয় দুই গাল চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মা, মা, মাগো!"

কতক্ষণ কাঁদিয়া সে ম্যানেজার বাবুর কাছে গিয়া কহিল, "আমি থাকতে পারবো না এখানে, মার কাছে যাবো।"

ম্যানেজার বাবু তখন দু' পয়সার ফুলুরির সঙ্গে বৈকালিক চা পান করিতে-ছিল, দুলালের কথা শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল "সোনার চাঁদ আর কি! যা, ওপর-তলায় বোস্‌গে। এখ্‌নি মাষ্টার আস্‌বে।" বিষণ্ণ ম্লান মুখে দুলাল চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মোশন-মাষ্টার আসিয়া দুলালকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্বত্বা-ধিকারীকে কহিল, "ছেলেটা খুব ভালোই মিলেছে, বাবু। টিঁকে থাক্‌লে আস্‌চে পূজোয় নরমেধ যজ্ঞ খুব ভাল উৎরে যাবে।"

দুলালের শিক্ষা সুরু হইল। সেই সঙ্গে দু' বেলা চার পয়সার মুড়ি-মুড়কী জল-খাবারেরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ম্যানেজার বাবু দুলালকে রাস্তায় বাহির হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিল। 'সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যালে'র প্রতিদ্বন্দ্বী 'নিতাই অপেরা'র ঘর রাস্তার মোড়ে। সে-দলের অভিনেতারা সর্ব্বদাই সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। এমন একটা রত্নের সন্ধান পাইলে তারা তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! গত বৎসর তাদের একটি ছেলেকে ভাঙ্গাইয়া নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'সমুদ্র-মন্থন'কে এরা একেবারে জখম করিয়া দিয়াছিল!

দুলালকে সতর্ক করিয়া ম্যানেজার বাবু দরোয়ান, চাকর এবং অভিনেতা-দিগকে এই বালকটির দিকে বিশেষ সতর্ক

দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করিল। ইঁট-কাঠের আবেষ্টনে অনেকগুলি সতর্ক দৃষ্টির শৃঙ্খলে পল্লীর দুলাল বন্দী রহিল। মন তার সারাদিন পড়িয়া থাকিত তার সেই গ্রামের মাঠ-ঘাটের মধ্যে! বেলা দশটায় ভাত খাইতে বসিয়া প্রথম যে অন্নের গ্রাসটি সে মুখে তুলিত, সেটা প্রত্যহই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। যেদিন মার কথা বেশী করিয়া মনে হইত, সেদিন অন্ন আর মুখেও রুচিত না! ইতিমধ্যে ম্যানেজার বাবুকে অনুরোধ করিয়া সে মার কাছে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছিল। দুলালের কথা-মত তার মাকে আসিবার জন্য ম্যানেজার বাবু একখানা সাদা পোষ্টকার্ড লিখিয়া বিনা-মাশুলেই সেখানা পোষ্ট করিয়াছিল। দুলাল জানিত, সে পত্রপাঠ-মাত্র মা এখানে আসিবে। কাজেই দিন কয়েক বিনা-বাক্য-ব্যয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু চিঠি পাঠাইবার দিন হইতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিত, এবং পরমুহূর্ত্তেই মুখখানা ছোট করিয়া ফিরিয়া আসিত।

এমনিভাবে দেড় মাস কাটিয়া গেল। প্রত্যহ প্রত্যুষের আশা সন্ধ্যায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইত! তথাপি দুলাল মার আগমন-সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারিল না। এই আশা ও নৈরাশ্যের অবকাশে দুলালের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

৩

পূজা আসিতেছে, যাত্রার দলের নূতন পালা "সীতার বনবাস" নাটকের বিজ্ঞাপন বড় বড় রক্তাক্ষরে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। জোড়াসাঁকোর বারোয়ারি-তলায় এই যুগান্তর-কারী নাটকের প্রথম অভিনয় হইবে, স্থির হইয়া গিয়াছে।

অভিনয়ের দিন প্রাতঃকালে দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাব।" ম্যানেজার তাহার কথা শুনিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, "তুমি বেশ্ তো ছোক্‌রা,—আজ প্লে, আর তুমি যাবে মার কাছে! আবদার আর কাকে বলে!" দুলাল বুঝিল, যাওয়া হইবে না! চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

রাত্রে অভিনয় আরম্ভ হইল। স্বত্বাধিকারী দেখিল, ম্যানেজার মিথ্যা বলে নাই। কুশের অভিনয়ে দুলাল যে দক্ষতার পরিচয় দিতেছিল, তা অপূর্ব্ব! যাত্রার ইতিহাসে এমনটি দেখা যায় না! শ্রোতার দলও মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারই দুলালের আগমনের সঙ্গে করতালিধ্বনি তুলিয়া তাকে উৎসাহিত করিতেছিল। দুলালের চরম কৃতিত্ব ফুটিল শেষ দৃশ্যে,—রামায়ণ-গানের অবসানে যখন সীতা আসিলেন এবং কুশবেশধারী দুলাল যখন "এই যে মা" বলিয়া সীতাকে জড়াইয়া ধরিল! শ্রোতাদের চক্ষু সে মিলন-দৃশ্যে ছল-ছল করিয়া উঠিল। নিবিড়

আলিঙ্গনে সীতাকে বাঁধিয়া কুশ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিনয়ের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা, মাগো।"

তার এই ক্রন্দনে আর ভগ্ন কণ্ঠ-স্বরে কিছু কালের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী যাত্রার আসর ভুলিয়া যেন কোন্ সুদূর অতীত লোকে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বত্বাধিকারী হইতে বেহালাদার পর্য্যন্ত দুলালের এই শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাদের জীবনে যাত্রার আসরে এমন জীবন্ত অভিনয় করিতে তাহারা আর কাহাকেও দেখে নাই!

গান ভাঙ্গিল। চিকের আড়াল হইতে একটি রমণী একখানা বহুমূল্য শাল কুশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পুরুষদের দলেও দু' একজন পুরস্কার দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন দুলালের ডাক পড়িল। কিন্তু খুঁজিয়া তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

অভিনয়-শেষে দুলাল সাজ-ঘরে আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া অপরের অলক্ষিতে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার সমস্ত অন্তর মার বুকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার দলের সাজ-ঘর, ম্যানেজার ও মাষ্টারের প্রশংসা, শ্রোতাদের উৎসাহ-বাণী এ সব কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়! প্রশ্ন করিতে করিতে সে একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পয়সা চাই—টিকিট কিনিতে হইবে। নহিলে রেলে তো চড়িতে দিবে না! উপায়? প্লাটফর্ম্মের এদিক-ওদিক বৃথা ঘুরিয়া শ্রান্ত পায়ে গিয়া সে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল—ঘুমে দুই চোখ মুদিয়া আসিতেছিল—সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে!

কতক্ষণ পরে......

দুলাল স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন মার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে,... মার বুকে মাথা রাখিয়া বলিতেছে, "আমি যাবো না, আর যাবো না মা।" মা তাকে বুকে টানিয়া বলিতেছে, "না, বাবা, না, আর তোমায় যেতে দেবো না।" সহসা মাথায় আঘাত পাইয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখ চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া ম্যানেজার আর পার্টির চাকর ভোলা। তারা খোঁজ করিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজারকে দেখিয়াই দুলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁদিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাবো।"

চোখ রাঙাইয়া দুলালের কাণ ধরিয়া তাকে বেঞ্চ হইতে নামাইয়া ম্যানেজার কহিল, "হতভাগা, কম ভোগান্ ভুগিয়েচো! যাওয়াচ্ছি মার কাছে..." বলিয়া টানিতে টানিতে তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া চিৎপুর রোডের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

যাত্রার দলে যে আসে, সেই দু'দশ দিনে পোষ মানিয়া যায়—আর এ ছেলেটা বাগ মানিবে না! পীর না কি! অধিকারী মহাশয় রাগে গন্‌গন্‌ করিতে-ছিল। এই সময় ম্যানেজারের সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া দুলাল নত-মুখে অপরাধীর মত দাঁড়াইল। দুলালকে দেখিবামাত্র পা হইতে চটি খুলিয়া অধিকারী তাকে প্রহার করিল, দুলাল বিনা বাক্যব্যয়ে সে প্রহার পিঠ পাতিয়া গ্রহণ করিল। তারপর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া আরাম পাইয়া বাঁচিল... !

সারা দিন না খাইয়া ঘুমে কাটাইয়া সে সন্ধ্যায় যখন উঠিল, তখন মাথা বিষম ভার বোধ হইতেছে! দুই চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে! শরীর এমন যে নড়িবার সাধ্য নাই! গা তাতিয়া আগুন! প্রবল জ্বর। অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, জল পানের জন্য নীচে আসিতে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়া দুলাল কাঁদিয়া উঠিল। ম্যানেজার ও দুই একজন অভিনেতা ... রা তাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল। ...ত্র কুড়ি গ্রেণ কুইনিন খাওয়াইয়াও ম্যানেজার দুলালের জ্বর ছাড়াইতে পারিল না। শেষ রাত্রি হইতে দুলাল গান গাহিতে সুরু করিল,—

"এই তো এসেছিস্ মা—
এবার আমায় কর্ মা কোলে—
এ যে কি রীত, বুঝিনে মা!
মা কি তার ছেলেকে ভোলে?"

পাড়ার একটা ডিস্‌পেন্সারির কম্পাউণ্ডার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেল, বিকার!

সন্ধ্যায় দুলালের গান থামিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ইহজীবনের মত ম্যানেজার ও অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া গেল!

* * * *

গ্রামের তিন ক্রোশের মধ্যে এক জায়গায় পূজার সময় দুলালের সেই যাত্রার দলের বায়না ছিল। ছেলে দুলালও সঙ্গে আসিবে—তাকে তার অতি প্রিয় খাদ্য নূতন ধানের চিঁড়া খাওয়াইবে বলিয়া শ্যামা আর একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিঁড়া কুটিতেছিল। এমন সময় পিয়ন শ্যামা বৈষ্ণবীকে এক মনি-অর্ডার আনিয়া দিল।

মনি-অর্ডারে কমিশন-বাদ দুলালের প্রাপ্য মাহিনা ন' টাকা ছ' আনা অধিকারী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছে। শেষের ছত্রে লেখা আছে, জ্বর-বিকারে ২৭শে ভাদ্র দুলাল মারা গিয়াছে।

শ্যামা টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিয়া চিঁড়ার কাঠাটি বুকে করিয়া চীৎকার-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে দুলো—দুলাল···বাপ্‌রে আমার!"

কলিকাতার যাত্রার আখড়ায় গোপাল বণিক তখন মোটঘাট বাঁধাইবার মহা উদ্যোগ সুরু করিয়া দিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

চীনের নব-অভ্যুদয় *

আজ কাল চীনে যাহা ঘটিতেছে তাহাকে বিশেষ কোন অভ্যুদয় হয়ত না-ও বলা চলিত; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা এই আন্দোলনকে বহুপরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে আজ চীনের অন্তরতমস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

এই আন্দোলন সমস্ত অন্যায় বৈদেশিক সর্ত্ত ফিরাইয়া লিখাইতে চায় এবং বৈদেশিক জাতিসমূহের নিকট হইতে অতিরিক্ত-ভূমি অধিকারের দাবী ফিরাইয়া লইতে চায়। এককথায় চীনের যদিও আজ সেরকম কোনও নৌ-বহর অথবা সৈন্যসামন্ত নাই তথাপি সে স্বাধীন শক্তি-সমূহের সহিত একাসন দাবী করে।

১৯২৫ সালে ৩০শে মে সাংহাইএর এক জাপানী তুলার কারখানার মজুররা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। এই দিন হইতেই আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। ধর্ম্মঘটে বাধা দিবার জন্য কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ সেইখানেই গুলি করিয়া কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারীকে মারিয়া ফেলে।

এই সমস্ত নিরীহ শ্রমিকরা যদি জানাইতে পারিত যে তাহারা কি ভয়ানক শ্রম করিয়া কি উপার্জ্জন করে বা কি রকম ভাবে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সমস্ত সুসভ্য জগতের পক্ষে তাহা সম্মানের বিষয় হইত না ধর্ম্মঘটকারীদের অবস্থা দেখিয়া সাংহাইএর ছাত্রমণ্ডলী তাহাদের আন্দোলনে পূরামাত্রায় যোগদান করে। ছাত্ররা যখন পথে শ্রমিকদের আন্দোলনের সহানুভূতি-জ্ঞাপক শোভাযাত্রা করিয়া চলিতেছিল তখন তাহাদের উপর গুলি করা হয়। মানবতার জন্য এই অগ্নি-পরীক্ষার কথা সমস্ত চীন ছাত্রদিগের মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে অনলের মত ছড়াইয়া পড়িল।

৩০শে মের তিন সপ্তাহ পরে ক্যানটন সহরের ছাত্রগণ ক্যানটনের অন্তর্ভুক্ত শামিন্ নামক বৈদেশিক সীমানায় গিয়া শোভা-যাত্রা করে। শোভা-যাত্রা সম্পূর্ণ শান্তভাবে চলা সত্ত্বেও এবং ছাত্ররা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও সহায়হীন থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক পুলিশ তাহাদের উপর গুলি-বর্ষণ করে। সহপাঠী ও অধ্যাপকগণ নিহত ও আহত ছাত্রদিগকে বহন করিয়া কলেজে লইয়া যায়।

এই ঘটনার পর ক্যানটন ক্রিশ্চান কলেজের আমেরিকান্ বিভাগ আমেরিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাঠান :—

* "ভারতী"র জন্য বিশেষভাবে লিখিত।

যেহেতু, ১৯২৫ সালের ২৩শে জুন বৈকালে একদল চীনা ছাত্র কানটনের ব্যাণ্ড ও শাকীর মধ্য দিয়া যখন শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, তখন শামিনের সৈন্যদল তাহাদের উপর গুলি-বর্ষণ করে—এবং,

যেহেতু, শোভাযাত্রা নিতান্ত শান্তভাবে চলিয়াছিল এবং যেহেতু ছাত্র ও শ্রমিকগণ একেবারে নিরস্ত্র ও সহায়হীন ছিল এবং, যেহেতু, গুলি-বর্ষণের ফলে বহুলোক হত ও আহত হয় (এবং যেহেতু হত ও আহতদিগের মধ্যে আমাদের বিভাগের অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র ছিল) সেইজন্য, ক্যানটন ক্রিশ্চান্ কলেজের আমেরিকান বিভাগের পক্ষ হইতে এই জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিতেছি যে, আমরা বিশ্বাস করি এই নির্দ্দয় ও অন্যায় অত্যাচারের জন্য শামিনের যে সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষ গুলিবর্ষণের হুকুম দিয়াছিলেন তাঁহারাই দায়ী, এবং এই সদ্য সংযোগী চীন ছাত্র, অধ্যাপক ও বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্যইচ্ছা জানাইতেছে এবং যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ঘটনা বহুপরিবর্ত্তিতরূপে প্রচারিত হওয়ার দরুণ চীন-আন্দোলনের প্রত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, । সেইজন্য আমরা সত্যঘটনার প্রচারের সহায়তায় চীন-ছাত্রদিগের সঙ্গে একান্ত সহযোগ করিব এবং আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ও আমেরিকাবাসীদের নিকট আমাদের দিক হইতে জানাইতেছি ও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে ন্যায্য ব্যবস্থার দ্বারা বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে চীনের মুক্তির সংগ্রামে চীনকে সহায়তা করেন।

আজ কাল খবরের কাগজের সংবাদগুলি এত নিপুণভাবে সেন্সার করা হয় যে, চীনের এই ঘটনা সম্বন্ধে সত্যকার খবর পাওয়া নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র আমরা, যারা চীনদেশে বাস করি, চীনভাষার কথা বলি, চীনের অতীত ও বর্ত্তমানকে সম্যকরূপে চিনি ও জানি তারাই এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। চীন মহাদেশের অন্তরে একটা বিরাট আত্মগৌরব বোধ আছে এবং সে গৌরব বোধের যথেষ্ট কারণও আছে। চার সহস্র বৎসর ধরিয়া চীনের সভ্যতা তাহার বিরাট জাতিকে সুউচ্চ নৈতিক বিকাশের ধারায় টানিয়া আনিয়াছে, আজও যাহার বলে চীন জগতের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় ও কর্ম্মশীল জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

দূর শতাব্দীতে যে সমস্ত বৈদেশিক জাতি চীনের অটল প্রাচীর লঙ্ঘণ করিয়া চীনে আসিয়াছিল, তাহাদের লুণ্ঠন-স্পৃহা ছিল না, মার্কোপোলো চীন দেশে আসিলেন, চীনের ভাষা আয়ত্ত করিলেন। চীনও তাঁহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া প্রসিদ্ধ নগরী ওয়াংচাউ-র মেয়র পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল এবং আজ বহু শতাব্দীর

পরেও ক্যান্টনের মন্দিরে মার্কোপোলোর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শ্বেতাঙ্গগণ চীনের ধনাগারের দিকে লুব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই চল্লিশ কোটি লোকে যে বাজার সাজাইয়া রাখিয়াছে তাহাতে তাহাদের লুণ্ঠনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিক দেখিল যে, চীনে বহুমূল্যের কাঁচা মাল পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার খবরও পর্য্যন্ত রাখে না। ১৮৫৮ সালে অহিফেন যুদ্ধের স্মৃতি চীনের অন্তরে গভীর মর্ম্ম-ক্ষতের সহিত জাগরূক রহিয়াছে। চীন অহিফেনের আমদানীতে আপত্তি করে কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন এক বিশাল নৌবহর লইয়া চীনের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে চীনকে লজ্জায় শুধু হংকং ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল তাহাই নয়, চীনদেশের সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিশাপকেও মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। চীনে আফিং-এর প্রবেশের পথ চীনকে আপনি খুলিয়া দিতে হইয়াছিল। নানা কারণে একে একে বিদেশীর কামানের সম্মুখে অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া চীনকে একটি একটি করিয়া তাহার বন্দরগুলি বিদেশী শক্তি ও জাপানের হাতে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। নিরুপায় হইয়া চীনকে একে একে এই সমস্ত বিদেশীয় জাতিকে সুবিধা দিতে হইয়াছিল, এবং এই সুবিধার ফলে চীনের বন্দরে যে পতাকা উড়িত সে চীনের নয়,—সে বিদেশীয়। এই সমস্ত বিদেশী জাতি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের পুলিশ ও আইন আদালত লইয়া আসিয়াছিল এবং তাহারা চীনদেশে থাকিয়াও আপনাদের দেশের আইন কানুন অনুসারে চলিত ফিরিত, আত্মরক্ষা ও বিচার করিত।

বর্ত্তমান আন্দোলনকে অনেক মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইতেছে। প্রচার করা হইয়াছিল, এই আন্দোলন শুধু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এবং চীনের বাইরে যাহারা সেন্সার-মার্কা খবরের কাগজের পাঠক তাহারা অনেকেই এখনো তাহাই বিশ্বাস করেন। এই আন্দোলন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়, পরন্তু এই আন্দোলন সেই সমস্ত খ্রীষ্টান জাতীয়তা ও শাসনের বিরুদ্ধে যাহারা নির্দ্দয়-ভাবে আজ চীন জাতি ও দেশকে লুণ্ঠন করিতেছে। আজ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও পশ্চিমের জাতিসমূহের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্যের সূচনা দেখা গিয়াছে। যীশু খ্রীষ্টের বাণী-বাহক অনেক মিশনারী আজ এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পাঠাইয়াছেন যে, আজ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও সাহায্য চাহেন না এবং চীনদেশে থাকিতে হইলে তাহারই বিচারালয় সহায় ও বিচার চীন-বন্ধুদের সহিত তাঁহারা মানিয়া লইবেন। এই আন্দোলন যে মোটেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে,

ইহার অনেক নেতাই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। জেনারেল ফেং, যাঁহার তুলনায় চীনদেশে গোঁড়া খ্রীশ্চিয়ান নাই তিনি এই আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা।

এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আছে যে ইহা বোলশেভিক নেতাদিগের দ্বারা প্রণোদিত। এই জনরবের মূলে একটি বিশিষ্ট ব্যাপার আছে। বিগত জারের শাসনতন্ত্র অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ন্যায় চীনের নিকট বহু আন্তর্জাতিক সুবিধার জন্য ঋণী ছিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে পর রুশিয়া এই সমস্ত সুবিধাজনক সর্ত্ত ও তাহার সহিত চীনে সমস্ত ভূমি অধিকার ছাড়িয়া দেয়। সোভিয়েট শাসন তন্ত্রের অনুযায়ী পিকিংএর রুশ-প্রতিনিধি-স্বরূপে যিনি ছিলেন তাঁহাকে য়্যাম্বেসেডার পদে উন্নীত করিয়া দেওয়া হয়। এই উন্নতির ফলে রুশের প্রতিনিধি রাজধানীর অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত ইউরোপীয় জাতিগণও রুষের মত উদার পথ অবলম্বন করিতে পারিত; কিন্তু সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও তাহারা সে মনোবৃত্তির পরিচয় দেন নাই। রুষজাতির সেই উদার রাজনৈতিক চরিত্র এখন শিক্ষিত চীন কৃতজ্ঞ-অন্তঃকরণে স্বীকার করিতেছে দেখিয়া অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিগণ "আঙুর ফল টক" মহানীতি অনুসরণ করিয়া চীৎকার করিতেছেন।

অনেক কাগজে এই আন্দোলন বিদেশী শক্তির-বিরুদ্ধ আন্দোলন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে চীন ছাত্র ও ব্যবসায়ীগণ যে দুই দেশকে এই সাংহাই ব্যাপারে সম্পৃক্ত বলিয়া বুঝিয়াছে শুধু সেই দুই জাতির পণ্যদ্রব্যই বয়কট করিয়াছে।

একটা মজার ব্যাপার এই যে অনুসন্ধান সমিতির তত্ত্বাবধানে জাপানী ও বৃটিশ বিচারকগণ সাংহাইয়ের পুলিশ কমিশনারের উপর কোনও দোষ বিন্দুমাত্র আরোপ না করা সত্ত্বেও তাঁহাকে জনসাধারণের তীব্র মনোভাবের দরুণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

চীনদেশের এই আন্দোলন ক্রমশঃ এক ব্যাপক ও গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অন্যায় সর্ত্তের অন্তরালে তাহারা যেমন বৈদেশিক জাতির অত্যাচার ও অবিচারের স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইয়াছে তেমনি তাহারা বুঝিয়াছে যে চীন দেশের অভ্যন্তরে অশিক্ষিতের সংখ্যা এত বেশী যে তাহাদের লইয়া আজ চীন শক্তিহীন ও পঙ্গু। সেই জন্য আজ চল্লিশ হাজার স্বেচ্ছা-সেবক শিক্ষক চীনদেশের পল্লীতে পল্লীতে নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া চীনের অশিক্ষিত বিপুল জনসঙ্ঘের লেখাপড়া শিখানর ভার লইয়াছেন।

এই শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধার জন্য চীনের প্রধান প্রধান নেতাগণ এক হাজার প্রয়োজনীয় কথা সংকলন করিয়া জনসঙ্ঘকে শিখাইতেছেন; এবং খবরের কাগজের

সম্পাদকগণ সেই একহাজার কথার মধ্যে কাগজের সংবাদাদি লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই প্রকারে অচিরেই এই বিরাট কার্য্যে তাহারা সফল হইবেন।

সেনাপতি ফেং এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত চীন আজ বিশ্বাস করেন যে পশ্চিম শুধু একটী ভাষা বুঝিতে পারে—সে শুধু কামানের ভাষা; তাই আজ চীন তাহার সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। চীনের সহস্র বর্ষের ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় যে, চীনজাতি শ্রেণীগত-ভাবে চারি ভাগে বিভক্ত। এই শ্রেণী-বিভাগ কিন্তু ভারতবর্ষের জাতি-বিভাগের মত দৃঢ়নিবদ্ধ নয়। এখানে এক শ্রেণী হইতে অনায়াসে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু চীনের অন্তর্জীবনে এই শ্রেণী-বিভাগ স্পষ্ট পাঁচটি আকারে রহিয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে ছিল জ্ঞানীর আসন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষাণের, যে জাতির অন্ন দান করে; তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল দক্ষ কারিকরগণ যারা জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল বণিকগণ—কারণ তাহারাই তো মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রীকে দেশ দেশান্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। সর্ব্বশেষ অতি অল্প স্থান লইয়াছিল সৈন্যের আসন। যাহার কাজ মানবকে হত্যা করা তাহার আসন সর্ব্বশেষেই হওয়া স্বাভাবিক। তাই সৈন্যের নাম অনেক সময় শ্রেণী হইতে বাদও পড়িত।

কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার পক্ষে এ এক নিদারুণ লজ্জার বিষয় হইবে যদি আজ সহস্র বর্ষের শান্তির সাধনার পর চীনকে তার সমাজের সনাতন শ্রেণীবিভাগকে বদলাইয়া সৈন্যকেই প্রধান স্থান দিতে বাধ্য হইতে হয়।

ডব্লিউ, এইচ, ফিশার।*

প্রহেলিকা

—:০:—

দেশের মানুষে যেবা ভালো নাহি বাসে
দেশেরে সে কবে প্রেম, দেখে হাসি আসে
যে জন সহিতে নারে কুসুম-সৌরভ
সে কেমনে রচে বসি পাঁপড়ির স্তব?

—রাজা—

* বিশপ ফ্রেড্‌রিক্ ফিশারের পত্নী।

ননকোঅপারেশনের আদিকর্ত্তা কে?

ইংরেজ না ভারতবাসী? *

ইংরাজশাসন যুগে রাজা রামমোহন রায় হতে আরম্ভ করে সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুযো অবধি বাংলার বড়লোক অনেক অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক সভাও হয়েছে। কিন্তু বেয়াল্লিশ বৎসর ধরে বৎসরের পর বৎসর কৃষ্ণদাস পালের মত স্মৃতি সভা কারও জন্যে হয় নি বা হবার লক্ষণ দেখা যায় না। আবার তা নমো নমো করে নয়—ভীড় এত হয় যে তা ঠেলে ঢোকা দুষ্কর। সভাসমিতির ভীড় বুড়োর দলের নয়—ছেলের জাতের। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগে মরা একটা মানুষের চরিত চর্চ্চায় আজকের ছেলেরা কি স্বাদ পায় যার লোভে ভীড় করে? তারা পায় এই, যে মানুষ সেই চল্লিশ বৎসর আগে মরেছিল সে আজও বেঁচে আছে—এই দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত শরীরে,—এই সভাপতি, এই বক্তৃবৃন্দ, এই শ্রোতাগণের দেহে সে আজও বাস করছে। সে মরেনি, তার স্বদেশের স্বাধীনতাগত সেই জ্বালাময়ী তৃষা আজও অতৃপ্ত রয়েছে, তার অভিমান, তার ক্ষোভ, তার নালিশ এখনও মেটেনি। নালিশ কার কাছে? অভিমান কার প্রতি? ক্ষোভ কার বিরুদ্ধে? যার সম্বন্ধে,—সেও প্রতিনিধি-শরীরে বৎসরের পর বৎসর এই সভায় উপস্থিত থাকে—এই আর এক বৈচিত্র্য।

এই একটি সাম্বৎসরিক সভা—কলিকাতায় মানব জাতির মিলনভূমি, মানবিকতার পুণ্যক্ষেত্র, মানবের প্রতি মানবের মানমঞ্চ এই বক্তৃতা মঞ্চ, স্মৃতিভবন এই স্মৃতিসভা। এই দেশে আজ দেড় শত বৎসর ধ'রে দ্বিজাতীয় মানবের অধিবাস—শাসিত জাতি ও শাসক জাতি। শাসক জাতি মুষ্টিমেয়, শাসিত জাতি অগণ্য। অনেকদিন এই মুষ্টিমেয়ের চোখে এই অগণ্য নগণ্য থাকে। আজ তাদের নগণ্যতার মধ্যে মানুষহিসাবে যা চিরমান্য এবং শাসিত হিসাবে যা' অবশ্যগণ্য কৃষ্ণদাস কায়ে তারই স্বীকারোক্তি ও স্তবের জন্যে শাসক মানব এখানে উপস্থিত হন—এ সভার বিশেষত্ব এতে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কৃষ্ণদাসের জীবিত কালে শাসকজাতির সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ ছিল আজকের স্মৃতি

---

* ৺কৃষ্ণদাস পালের দ্বিচত্বারিংশৎ স্মৃতিসভায় কথিত।

সভায় মুখ্যতঃ তারই পর্য্যালোচনা করলে তাঁর মরণের পর বাঙ্গালী ও বৃটিশের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা নির্ণয় হতে পার্ব্বে।

কোঅপারেশন ও নন্‌কোঅপারেশন এই দুইটী শব্দের আমাদের জীবনে এত চল হয়েছে যে, বাংলা অভিধানের নূতন সংস্করণে তারা স্থান পাবার শীঘ্রই দাবী কর্ব্বে। এই কোঅপারেশন কবে আরম্ভ হ'ল, কে কার সঙ্গে করলে, এবং নন্‌কো-অপারেশনেরই বা সূত্রপাত কবে এবং কোন্ দিশা হতে হ'ল,—উত্তর দক্ষিণ প্রাচী বা পশ্চিম — তার একটু খবর নিলে মন্দ হয় না।

কৃষ্ণদাস পাল কো অপারেটর ছিলেন বলে প্রসিদ্ধ, সুতরাং নন-কোঅপারেশনের বাত্যাহত আমি রাজায় প্রজায় সেই আদান প্রদানের ব্যাপারটাতে আপনাদের দৃষ্টি খানিকক্ষণ আবদ্ধ রাখব। কো-অপারেশন হয় সমানে সমানে। যদি অসমানে কোঅপারেশন দেখা যায় তবে বুঝে নিতে হবে একপক্ষ অগ্রসর হওয়াতেই হয়েছে, এবং সে পক্ষ সবল পক্ষ, কারণ দুর্ব্বলের সবলকে কো-অপারেশন ভেট দিতে যাওয়া, নির্ধনের ধনীকে কো-অপারেশনের প্রস্তাব করতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার মাত্র। যে দিন বাংলার নবাবের দরবারে, জগৎ শেঠের ভবনে ও উমীচাঁদের দোকানে ইংরাজ বণিক নিজেদের কোম্পানীর বাণিজ্যবিস্তারের জন্য সুবিধাপ্রার্থী হয়েছিল সে দিন তাদের কো-অপারেশনের দ্বারা লাভবান করেছিল বাঙ্গালী—যেদিন বাণিজ্যযোগে রাজ্য লাভ হোল, যেদিন একমুষ্টি লোক শত কোটী লোকের প্রভু হ'ল,—বুদ্ধি, বল, সাহস, একতা, স্বদেশ-প্রীতি, স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি বহু গুণের দ্বারা নিজেদের বাঙ্গালীর চেয়ে সমৃদ্ধ জানতে পার্‌লে, সেদিন বাঙ্গালীর সঙ্গে কো-অপারেট করেছিল ইংরেজ—বাঙ্গালীর ভিতর সেই সবগুণ সঞ্চারের প্রভাবে ও চেষ্টায়। আজ সেই কো-অপারেশন সরিয়েও নিয়েছে ইংরেজ। এক পুরুষ পরে ইংরেজ যখন দেখলে এদের ইংরেজী ভাবে মানুষ করে এক একটা আস্ত ইংরাজ তৈয়ারী করে আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে তুল্‌ছি, তখনই তারা ভিতরে ভিতরে হাত গোটাতে আরম্ভ করলে—মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে সমান সমান ভাবে যে কো-অপারেশন আরম্ভ করেছিল সেইখানে নন্‌কো-অপারেশনের স্টেশন গাড়লে। 'এদের সঙ্গে আর মানুষের মত ব্যবহার করবে না, এদের সঙ্গে খাদ্য খাদকের, লুণ্ঠিত লুণ্ঠকের, শাসিত শাসকের ব্যবহার রাখবে'—এই কনফিডেন্সেল ইসারা পরস্পরের মধ্যে চলাচল হ'ল। প্রতিদিন নব নব উল্টা আইন কানুনের চাপে বৃটিশের মানুষকে মানুষ-করা কো-অপারেশন থেকে আমরা বঞ্চিত হতে থাকলুম। বৃটিশ জাতি নিজেই জাতীয় চরিত্রে অধঃপতিত হতে থাক্‌ল। বৃটিশ

যুগে বাঙ্গলার যে বিভাগে যত বড়লোক দেখা দিয়াছেন তাঁরা ব্রিটানিয়ার স্তন্য দুগ্ধে পালিত। গোটা নবীন বাঙ্গলা ব্রিটিশ ধাত্রীর দুধে মানুষ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সবেতেই য়ুরোপীয় খোরাকে তার পুষ্ট মন। এ যুগের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, হেম বাঁড়ুয্যে, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্র নাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার যে রূপ আধান ও কাব্যময়ী ভাষায় তাঁর যে রূপ গঠন করেছেন, প্রায় দুই-হাজার-বৎসর-পর্য্যন্ত-খোঁজ-পাওয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে তার কোন আদর্শ নেই, আর এ যুগের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পুরুষ ত পুরাচিত্রে একেবারেই অপ্রাপ্তব্য। রাজ-নীতির প্রভূত উল্লেখ বঙ্গসাহিত্যে না হোক্ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। রাজনীতি বিদ্যা সেখানে প্রজা-জাগ্রতি শেখায় না। রাজনীতি বলতে সেখানে শুধু রাজার কর্ত্তব্য ও পলিসি শেখায়। রাজা ও প্রজায় মিলে রাজ্য। রাজ্যরূপী বাহনের দুখানি চাকা রাজা ও প্রজা। প্রজাচক্র-বিকৃতিকল্পে অর্থাৎ কোন প্রজা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে না চলে তবে তাকে শায়েস্তা করার পন্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের শাস্ত্রে বিবৃত আছে। কিন্তু রাজ-চাকাখানি যেদিন বিগড়বে, অর্থাৎ রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা যেদিন যথাযথ কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হবেন, সেদিন প্রজারূপী চক্র একা একা রথকে টানার জন্য কি করবে তার ব্যবস্থা দেওয়া নেই। প্রজার স্তরে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন কার্য্যের বিধান লেখা নেই। সে ভাবে ভারতের প্রজা ইতিপূর্ব্বে মানুষও হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক পুরাণে আছে, অত্যা-চারিত প্রজার উদ্ধার অবতার পুরুষে করেছেন—প্রজারা নিজ হতে কোন উদ্যম করেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে মানব-ধর্ম্ম-সম্পন্ন দুর্ব্বল প্রজা চক্রান্ত করে প্রবল বিদেশী রাজাকে ডেকে এনে স্বদেশে প্রতিষ্ঠান করেছে। জয়চাঁদকৃত মহম্মদ ঘোরীর আমন্ত্রন বা জগৎ শেঠকৃত ক্লাইবের আমন্ত্রণের সঙ্গে ইংলণ্ডের টোরি হুইলের দ্বন্দ্বের এমন কি প্রথম চার্লসের শিরকর্ত্তনের অনেক প্রভেদ আছে। সেখানে প্রজাশক্তি রাজশক্তির সঙ্গে লড়েছে। ফরাসী বিপ্লবে তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। য়ুরোপের ধর্ম্মবিপ্লবেও তাই হয়েছে। যজমান যাজকের অযথাবশ্যতা অস্বীকার করেছে। মানুষ যে সে মানুষ, অপর মানুষের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বে কোন ভেদ নেই, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ বা তার অভাবেই যা কিছু ভেদ হয়।

The rank is but the guinea stamp

The man is man for a' that.

সোনা সোনাই, তার উপর 'ছাপ মারলে তার নাম হয় গিনি, কিন্তু সে সোণার বেশী কিছু নয়। মানুষ মানুষই, পোষাক পরিয়ে ইংরাজী বলিয়ে তাকে

রাজা খেতাব দিতে পার কিন্তু সে মানুষের বেশী কিছু নয়, প্রজা যে মানুষ সেও সেই মানুষ। রাজা সেজে, যাজক সেজে, শিক্ষক সেজে সে যদি অন্য মানুষদের অনেক গুণ অধিকার হরণ করে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করে, তবে প্রজা, যজমান বা ছাত্র নিজের মানুষ-অধিকার অপহরণের প্রশ্রয় দেবে না; মরদ হয়ে লড়বে—এই হল য়ুরোপধাত্রীর শিক্ষা। মেকলে, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ প্রথমযুগের ইংরেজ পুরুষ-শ্রেষ্ঠরা বাঙ্গালীকে মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন—তাদের ভিতর মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে দিয়েছিলেন।

সেই জাগ্রতির পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণদাস পালে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল। তাই কৃষ্ণদাস পালের প্রতি ইংরেজের শিরও সম্মানে নত হয়।

আজকের দিনের অধঃপতিত ইংরেজ জাতির মধ্যেও যে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয় নি, তার প্রমাণ তাবৎ ভারতবাসী ইংরেজের এমন কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক সংবাদ পত্র পরিচালকগণেরও কৃষ্ণদাস পালের নির্ভীকতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতি গুণের মুক্তকণ্ঠে স্তুতিবাদ।

শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণের পর রাজার জাতের অনেক নিকৃষ্ট পুরুষের ভারত-ভূমিতে আগমন ও জন্ম হল। ইংলণ্ডের স্বার্থান্ধ বণিক সম্প্রদায়ের লোভাগ্নিতে তারা ইন্ধন যোগালে এমন কি স্বয়ং লাটেরাও স্বজাতিপ্রীতি আধিক্যে বিজাতী প্রজাপালনে অপক্ষপাত কর্ত্তব্যবুদ্ধি হতে চ্যুতি দেখালেন। কিন্তু তখনও রাজপুরুষেরা সকলেই আদর্শচ্যুত হননি। তাই যে দিন ভাইসরয় লিটন ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিককুলের লাভার্থে ভারত সাম্রাজ্যের আয়হানি করিয়ে দিলেন, তুলার শুল্ক উঠিয়ে দিলেন, সেদিন তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রত্যেক ইংরেজ মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে প্রচণ্ড মতভেদনামা স্বাক্ষর করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :—

O for an hour of Kristodas Pal !

আমরা বলি :—

O for an hour of those truly English-in-spirit English members of the Viceroy's Council !

সে রামও থাকল না, সে অযোধ্যাও রৈল না। কৃষ্ণদাস পালের কালেই যুগ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছিল, তখনই ইংরেজ রাজপুরুষের ইংরাজী আদর্শ থেকে পতনের ও আমাদের সঙ্গে নন্কো-অপারেশনের সূত্রপাত হয়েছিল। রেল ষ্টীমার যত বাড়ল, বিলাতে শীঘ্র যাতায়াতের পথ যত সুগম হল, ততই তাঁরা বেশী বেশী নন্‌কো-অপারেটর হতে থাকলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-দাসের আশা তখনও মরেনি, তাঁর শ্রদ্ধা তখনও লুপ্ত হয়নি। যেখানেই দেশীর সঙ্গে ইংরেজের স্বার্থে সংঘর্ষ হয় সেইখানেই রাজকর্ম্মচারীরা অবিচার করেন, পদে পদে তার প্রমাণ পেলেও কৃষ্ণদাস পাল শেষ পর্য্যন্ত বলেছিলেন :—British genius

and British traditions ব্রিটিশ রাজ-কর্ম্মচারীদের সুবুদ্ধি জাগ্রত রাখবে, কৃষ্ণদাস পালই লর্ড লিটনের Licence Tax Bill এর উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন -"We are sorry that His Excellency should have made such a remark. It was not worthy of his high position. Was it for this threat that the paid official members of the council voted for the motion like so many innocent sheep? May we not ask what is the use of the farce of a council where its president is so peremptory and wishes that the decrees of the Govt. alone should be registered. The spirit of British freedom is not dead however despotic the visible ruler in India may be, the invisible Genius, which protected Britannia whereever her flag waves, is present in all his beneficence and that Genius is never deaf to the vox populi.

ইংরাজকে দিন দিন নন্-কো-অপারেটর হতে দেখেও কৃষ্ণদাস বলেছিলেন :—

We do not want severance, we are quite content with English rule, we only wish and pray that England will govern India in the same spirit in which she governs herself and her colonies * * * Why should not India like the colonies be admitted into a partnership in that joint stock concern of intellctual moral and political freedom, which the British power represents! কৃষ্ণদাস পালের অন্য এক স্মৃতিসভায় অন্যতম বক্তা Shirley Tremearne বলেন :—

"We are all citizens of this great city one of the largest in the world. We are also, I trust all proud to be citizens of the great British Empire and such being the case, surely we ought to try and live in peace and harmony with each orher, each in his own little way endeavouring to do something for the public good. Recollect that in the daily intercourse of public life there must always be some give as well as take."

কথাগুলি সত্য হলে সুন্দর হত। আমরা যদি সমানাধিকারের দ্বারা অনুভব করতুম আমরা citizens of the

British Empire তাহলে আমরা সেজন্য গর্ব্বিতও হতে পারতুম, কিন্তু ব্রিটিশ যেখানে মালিক আর বাঙ্গালী কুলি মাত্র, সেখানে এক সাম্রাজ্যের citizen হবার গৌরব সে কেমন করে অনুভব করে ? যেখানে give and take এর টীকায় অর্থ পাওয়া যায় heads you lose, tails I win সেখানে এ উপদেশে ভবি কেমন করে ভোলে ?

Hon. Mr. Lyon একবার এই সভায় বলেছিলেন :—Inspite of his sterling independence and his spirited contest with many a high placed opponent, Kristodas Paul stood for unity and Co-operation and the bringing together of all the forces of the empire in the course of Progress.

লায়ন সাহেব আরও বলেন :—

"I can have no doubt that he would have been filled with hope and enthusiasm at the thought of the position that India is to attain at no distant day as a partner in the great Empire of which she has for so long been but a dependant. His insight would have enabled him to understand how deeply the loyalty of India has impressed the great Co-sharers in our Empire and how it has strengthened the hands of all who wish her well and work for her advancement."

মুখ্যস্থানীয় রাজপুরুষগণের এই সকল আশ্বাস বাক্যের পর Rowlatt Actএর বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা ও Martial Lawর হৃদয়বিদারক কারখানায় বাঙ্গালী যদি এগুলিকে নিতান্ত স্তোকবাক্য মনে করে ব্রিটিশরাজের ধর্ম্মপরায়ণতায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে এবং পদে পদে মূর্তিমান অধর্ম্মের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে কোন কোন গরম রক্ত যুবকের মনে অত্যাচারিত দুর্ব্বলের চিরন্তন অরাজকতা-বুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রর কল্পনা জেগে ওঠে তার দরুণ দোষী কে ?

জালিয়াঁওয়ালাবাগের হত্যার পর কি আর সেই রাজপুরুষদের মুখে বলা সাজে—

"Now Bengal is suspect, her loyalty is distrusted, her judgment is found wanting and she is condemned because she can not secure in her midst the peace and order which are essential to true progress."

এই কথাগুলিই কি উল্টে বলা যায় না : —Now the British official is suspect, his sincerity is distrus-

ted, his judgment is found wanting and he is condemned because he can not secure in his midst the peace and order which are essential to true government.

এই উপলক্ষে আর একজন ইংরেজের উক্তিও আমি উল্টিয়ে সরকারী ও বেসকারী ইংরেজদের শুনাচ্ছি, তাঁরা প্রণিধান করবেন—

"Not by violence and exaggeration, not by destruction and the violation of the laws of truth and justice, not by strife and bickerings,—but by honesty of purpose open mindedness, sympathy and understanding shall you best serve the Empire's needs."...

কৃষ্ণদাস পালের প্রতি সম্মান প্রকাশ সূত্রে পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের বক্তা Bradley Birt অন্যান্য ইংরেজ পুরুষগণের অনুসরণে বলেছিলেন—"His criticism was built upon solid fact and figures and not upon mere rhetorical declaration— সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন উক্ত কারণেই কৃষ্ণদাস পালের সমালোচনার এত মূল্য ছিল এবং তাঁর প্রত্যেক কথা ইংরেজদের শ্রুতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'র্‌তো। হ'তে পারে; কিন্তু সেই শ্রদ্ধার ফলে ইংরেজ সরকার বা বে-সরকারী ইংরেজ পুরুষ তাঁর উক্তি অনুযায়ী কার্য্যপথে কতদূর নিজেদের অগ্রসর ক'রেছেন?

আজ কৃষ্ণদাস পালের অনুস্মরণে এই সভায় আমি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ ক'রছি, এস, পরস্পরের সঙ্গে কো-অপারেশন করি। তোমাদের নন-কো-অপারেশন উঠিয়ে নাও, মানুষের সঙ্গে মানুষের কো-অপারেশনে অগ্রসর হও। মনুষ্যত্বের কো-অপারেশন হোক মনুষ্যত্বের সঙ্গে। ব্রিটিশে বাঙ্গালীতে সমদর্শী হও, বাঙ্গালীর অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রো না, ভারতীয় প্রজার ক্ষতি করে ব্রিটিশ প্রজার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করো না—এই স্মৃতিমঞ্চে তোমরা যে বলছ আমরা fellow citizens—citizens of the same Empire এই মঞ্চের বাইরে হৃদয় মন ও কার্য্যে তা প্রমাণিত কর। এই citizenship এর জন্যে আমাদের সঙ্গে হাতে হাত বেঁধে চল, Indian for Indians বল, তোমরাও-Indian হও—এস সবাই মিলে এক নতুন Indian Nation গড়ে তুলি। India ও Indian এর সেবা তোমার আমার উভয়ের লক্ষ্য হোক্, India ও Indianএর সম্মান তোমার আমার উভয়ের কাম্য হোক্, India ও Indian এর বৃদ্ধি তোমার আমার উভয়ের সাধ্য হোক্। Indiaর ধন বাইরে বেরিয়ে যেতে দিও না, Indianএর প্রাণ তুচ্ছ

নগণ্য হতে দিও না—হোক সে ফকির হোক সে আমীর, হোক সে সাদা, হোক সে কালো—Indianএই তার গর্ব্ব হোক, Indian এই তার ভরসা হোক। এই পারস্পরিক Co-operationএ ব্রতী হও। শাসক ও শাসিত—রাজা ও প্রজা এই দুই জাতিভেদ উঠে গিয়ে, এক-স্বার্থবদ্ধ, এক-লক্ষ্যযুত এক ইণ্ডিয়ান, জাতি হোক।

যুগধর্ম্মে বাঙ্গালীর ভিতর যে সব স্বাধীন চিন্তার বীজ এসে পড়েছে, তাকে দাবাতে তোমাদের অধিকার আছে মনে কর না, Spirit of Evolution এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করো না, সহজ সখ্য স্থাপন কর, কো-অপারেট করে বাঙ্গালীকে কো-অপারেশন শেখাও। ভারত লাটের হাতে কৃষ্ণদাস লাটের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচনের সার্থকতা এতেই হবে।

যদি না করবে তবে হে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষপুঙ্গব বা তাঁদের বে-সরকারী ভাই বন্ধু—এমূর্ত্তি তোমরা নিজ হাতে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দাও। এ মূর্ত্তি শুধু ব্যক্তি বিশেষের মূর্ত্তি নয়, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে জাতীয় আশা জাতীয়তা-বোধ তোমাদেরই হাতে পালিত পোষিত হয়ে প্রবৃদ্ধ হয়েছিল তারই প্রতিমূর্ত্তি এ!

শ্রীমতী সরলা দেবী।
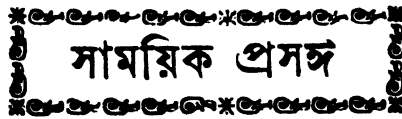
সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতিসভায় বাঙ্গলা বর্জ্জন

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ধুমধামের সহিত কৃষ্ণদাস পালের বেয়াল্লিস-তম স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম সভায় লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী সামিল ছিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাছাড়া তখনকার দিনে বাঙ্গলা ভাষায় কোন সভা সমিতির কার্য্যই পরিচালনা হইত না। সেদিন বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। এই বেয়াল্লিশ বৎসরের জাতীয় জীবনে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বাঙ্গলা ভাষা স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাদে-

শিক জাতীয় সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ পর্য্যন্ত আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় হয়। কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভায় ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। একমাত্র অমৃতলাল বসু মহাশয় এবং ভারতী সম্পাদিকা ব্যতীত আর কেহ মাতৃভাষায় শতেক শতেক উপস্থিত বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দকে অভিভাষণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না।

সভাপতি ছিলেন বেঙ্গল কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মাননীয় রাজা শিব শেখরেশ্বর রায় মহাশয়, বক্তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী যাঁহাকে এই সেদিন কৃষ্ণনগরে মহাদ্বন্দের মধ্যে বাঙ্গলাভাষাতেই রণভূমে সুদক্ষ শস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়াছি।

অন্যান্য রাজনৈতিক জনসভা ও কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতি সভায় প্রভেদ কি? এখানেও প্রত্যক্ষ শ্রোতা উপস্থিত নব্যবঙ্গ, পরোক্ষে শ্রোতা অনুপস্থিত রাজন্যবর্গ। সেদিনকার সভায় তিনটি গৌরাঙ্গী ও একজন গৌরাঙ্গ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন খ্রীষ্টমিশনভুক্ত, একজন কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য। সুতরাং এই চারটি বাঙ্গলা অনভিজ্ঞের খাতিরে উপস্থিত সহস্রাধিক বাঙ্গালী যুবক বৃদ্ধ ও নারীর মর্ম্মে যে ভাষা দিয়া পৌছাইয়া ভাবে মাতাইয়া কাজে প্রবৃত্তি দিতে পারিত সে ভাষা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া এই সভার সার্থকতা কি হইল? রাজনৈতিক সভায় প্রজার যে বক্তব্য সরকারের কাণে পৌছানর আবশ্যক—তাহা প্রজার ট্যাক্সে পরিচালিত সরকারী তর্জ্জমাবিভাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং উক্ত বিভাগের পারিশ্রম লাঘবের খাতিরে নিজেরাই আগে ভাগে নিজেদের মনোভাব তর্জ্জমা করিয়া ইংরাজীতে ব্যক্ত করার বৃথা জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণদাস পাল বাঙ্গালী রাজনৈতিকগণের আদিগুরু। তাঁহার কালে মাতৃভাষা ইংরেজীর সমকক্ষতা লাভ করে নাই বলিয়া, তাঁর স্মৃতি সভায় বাঙ্গলার অনাদর তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ও প্রচেষ্টিত বাঙ্গালীর ও স্বাধীনতা প্রমুখতারই ও আত্ম-সম্মানজ্ঞানেরই অনাদর।

আমরা আশা করি আগামী বৎসর যাহাতে এই বিসদৃশ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে এই স্মৃতিসভা কমিটি দৃষ্টি রাখিবেন।

তিলক পুণ্যাহ

১লা আগষ্ট তিলক পুণ্যাহ বলিয়া যদি দলাদলির বিরাম দিনরূপে সম্মানিত হয়, যদি সেদিন ভারতের সকল দলের দলপতিগণ সৌভ্রাত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সখ্যভাবে মতের আদান প্রদান করেন, মহাভারতের যোদ্ধবর্গের মত অস্ত্রত্যাগ করিয়া দুদণ্ডের নিমিত্ত আত্মীয়ের আত্মীয়তা হৃদ্যতা ও পরামর্শের আলিঙ্গনে নিজেদের আপদ দূর করেন তবে লোকমান্যের প্রকৃত সম্মান করা হয়। কর্ম্মীদের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ভয় ও আক্রোশের সংস্কার সম্পন্ন ভারতবাসীকে তিলকই প্রথমে এক জাতীয়তা বোধের প্রেমে বাঁধিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালার সহিত মহারাষ্ট্রীয়ের আশ্চর্য্য মনের মিল হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে নামিবার অনেক পূর্ব্বেই তিলক প্রেমিক হইয়াছিলেন। তারও বহুপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিয়াই প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য উৎসব এবং বাঙ্গলায় বীরাষ্টমীর

উদ্ভব সম্ভাবনা কিশোরী উদ্ভাবয়িত্রীর মনে ঘনীভূত হইয়াছিল। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতীতে প্রবাসীর কয়েকটি কথায় তাহার স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

তিলকের মৃতদেহের পার্শ্বে গান্ধিদল ও তিলকদলের মিলন হইয়াছিল। সেদিন পিতৃহারা ও বন্ধুহারা তিলকভক্তগণ বিরুদ্ধ পথাভাবী গান্ধির ললাটে তিলকের শ্মশান-ভস্মের পূত তিলক পরাইয়াছিল। গান্ধি তাহা স্বীকার করিয়া তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড নাম দিয়া এক কোটি টাকা তুলিয়া দেশের কাজে উৎসর্গের দ্বারা তিলক সম্মান বৃদ্ধি করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

তাঁহার ষষ্ঠ বার্ষিক দিন সমাগত। আজ আবার দলপতিদের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল সম্পন্ন হইবে না কি? তাঁহারা পরস্পরকে সম্মানের তিলক পরাইবেন না কি?

কিবা মুক্তি কিবা বন্ধন!

তিলকের জেলাবস্থানকালেই 'কেশরী'তে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারী মামলা হয়। সে মামলা তিলক নিজের পক্ষ নিজে পরিচালনা করেন। আড়াই দিন ধরিয়া সরকারী জবানীর পর পাঁচ দিন ধরিয়া তিলকের সওয়ালজবাব চলে। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি-শালী ও স্বদেশ প্রেমপূর্ণ জবানবন্দীতে শত্রু মিত্র সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তার শেষ কয়টি কথা চিরস্মরণীয়:—

"জুরীর বিচার সত্ত্বেও আমি বলিতেছি, আমি নির্দোষ। মানুষ ও বস্তুজগতের ভাগ্য বিধানের জন্য রাজশক্তি অপেক্ষাও যে মহান শক্তি বিরাজ করিতেছেন, হয়ত তাঁহার ইচ্ছা যে যে-কাজের জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি তাহা আমার মুক্ত অপেক্ষা বন্দীজীবনেই বেশী ফলপ্রসূ হইবে।"

উদয়াদিত্য উৎসব

ঘোর বর্ষাতেই বাঙ্গলা আধুনিক জাতীয় মহাপ্রাণের অনেককেই হারাইয়াছে—ঘোর বর্ষাতেই বঙ্গের যুবকবীর উদয়াদিত্যকে বঙ্গমাতা রণাঙ্গণে বিসর্জ্জিত প্রাণ দেখিয়াছিলেন। নব্য বাঙ্গলার যুবকেরা ২৫শ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র তাঁহার স্মৃতি পুলকিত একটি শ্রাবণ দিন উৎসবে মুখরিত করিয়াছিল। জাতীয় স্বাধীনতার উৎসব-রূপে এই দিনটি বর্ষে বর্ষে সজীব রাখা কর্ত্তব্য। সেবার যুবকদের বলিয়াছিলাম—"উদয়াদিত্যের ফটো নাই, প্রতিকৃতি নাই, চিত্র নাই সত্য—কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উজ্জ্বল তরবারিই ক্ষত্রিয়ের শুদ্ধ আত্মার প্রতিরূপ তাহাতেই তাঁহার পূজা করো—তাহাকেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর।"

যুবকেরা করিয়াছিলও তাহাই। বীর-পূজার ইহাই প্রকৃষ্ট বিধি।

চয়ন

সুভাষ বসুর পত্র

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্ম্মীর অভাব বেশী। তবে যেরূপ উপাদান জোগাড় হয় তাহা নিয়াই কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না - ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদান ভালবাসা পাওয়া যায় না—নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করা যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই দুইটী আদর্শ রাজনীতিক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে, রাজনীতিক আন্দোলন—নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * * *

তোমার মনের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি না জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয় লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়! ভিতরের সংযম না হইলে, বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটা কথা—নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—নিয়মিত সাধনা করিলে সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটী (১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা (২) ভালবাসা, শক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রী-লোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রীমূর্ত্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রীমূর্ত্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে, ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কল্পনা করিয়াছিলেন. ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানুষের মনে যে কোনও ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা বা ভক্তি বাড়িলে ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতা কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতা কমাইতে পারে। ভালবাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা বা ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে কোনও বস্তুবিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করা দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ সে হইয়া পড়ে। নিজেকে "দুর্ব্বল পাপী" যে ভাবে সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোনও রূপ মনের মধ্যে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের সব দুর্ব্বলতা ও মলিনতা বলি স্বরূপ প্রদান করিলে, মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সবল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করি, কর্ণ আছে তাই আমরা শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির সাহায্যে পূজা করি। নাসিকা আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা, অপর দিকে সদ্বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্য ভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্য ভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্ব্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। স্বামী বিবেকানন্দের বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী"ও তাঁহার বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। "ভারতে বিবেকানন্দ" বই এর মধ্যে এ সব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। "Philosophy of Religion" or "Jnan Yoga" বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়িতে পারো। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি. এল, রায়ের অনেক বই আছে (যেমন মেবার পতন, দুর্গাদাস) যা পড়িলে শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীনসেনের "পলাশীর যুদ্ধ"ও পড়িতে পারো। "শিখের বলিদান" (বোধ হয় শ্রীমতি কুমুদিনী বসু লিখিত) ও ভাল বই। Victor Hugoর La-Miserables পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে

আছে) খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়িতে এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসর মত চিন্তা করিয়া একটী তালিকা করিয়া পাঠাইব। ইতি--

(আত্মশক্তি)

ঘর-শত্রু

—:*:—

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে উঠে চার খানা॥
কেমন করে নাম্‌বে বোঝা,
তোমার আপদ নয় যে সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভার খানা॥

রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো
মূর্চ্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো॥
ঝড় তুফানে ঢেউয়ের মারে,
তবু তরী বাঁচ্‌তে পারে,
সবার বড় মার যে তোমার ছিদ্রটার ঐ মার খানা॥

পর তো আছে লাখে লাখে কে তাড়াবে নিঃশেষে ?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে,
তখনি কি মুক্তি মেলে ?
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বার খানা।

শূন্য-ঝুলির নিয়ে দাবী রাগ করে রোস্‌ কার' পরে ?
দিতে জানিস্‌ তবেই পাবি—পাবি নে ত ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্‌ মাতি,
ফল পেতে চাস্‌ রাতারাতি,
মুঠোরে তোর কর্‌বে ফুটো আপন খাঁড়ার ধার খানা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য

—:•:—

সবুজ-পত্র—আষাঢ়, ১৩৩৩।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' এ সংখ্যার শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ। বহু নজীর-পত্র ঘাঁটিয়া আলোচনা করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কাব্যের শরীর হচ্ছে বাক্য, অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। কোনো কোনো আলঙ্কারিক বলেন, অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য নয়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এমন বহু কাব্য আছে, যাকে কবি কোনো অলঙ্কারেই সাজান্ নি, অথচ মনোহারিত্বে তা পাঠকের মনকে একেবারে লুঠ করে নেয়। তাঁরা বলেন, নিরলঙ্কার বাক্যও কাব্য হয়, তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে, রীতি বা ষ্টাইল। ষ্টাইল হচ্ছে কাব্যের অবয়ব-সংস্থান। অন্য একদল আলঙ্কারিক বলেন, রমণী-দেহের লাবণ্য যেমন অবয়ব-সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে, যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গী এ-সবের অতিরিক্ত আরও-কিছু। এই অতিরিক্ত বস্তুই কাব্যের আত্মা। এ 'বস্তু' কি? বস্তুবাদী আলঙ্কারিক বলেন, এ বস্তুটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতঃই মনোহারী,—"চন্দ্র-চন্দনকোকিলালাপভ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ।" অথচ এটা কাব্য নয়। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। এই অভিব্যঞ্জনার নাম "ধ্বনি"। ধ্বনিবাদীরা বলেন, এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু। যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলঙ্কারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়। 'বিবাহ-প্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানত-মুখী হলেও পুলকোদ্গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়'—এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে :—'কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকো-দ্গমৈঃ। সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥" অথচ এ কাব্য নয়। ঠিক এই কথাই কালিদাস পার্ব্বতী সম্বন্ধে কুমার-সম্ভবে বলেচেন—"এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী। লীলা-কমলপত্রানি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥" এর কাব্যত্ব অপূর্ব্ব। কেন? এ কবিতার শব্দার্থ লীলাকমলের পত্র গণনা, তাই কাব্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরে—পূর্ব্ব-রাগের লজ্জাকে ব্যঞ্জনা করছে; এবং এইখানেই এর কাব্যত্ব। মদনের দেহ-ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব বিশ্বময়—এই ভাব নিম্নের দুটী কবিতায় বলা হয়েছে। 'স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ। হরতাপি তনুং যস্য শংভুনা ন হৃতং বলম॥' অর্থাৎ সেই এক কুসুমায়ুধ ত্রিলোক জয় করেন। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বল হরণ করতে পারেন নি।

তারপর—'কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমাঞ্জো জনে জনে। নমোঽস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে ॥' দগ্ধ হলেও কর্পূরের মত প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে। আবার্য্য-বীর্য্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার! এ কবিতা দুটিতে ব্যাখ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এ কাব্য হলো না। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মদন-ভস্মের পরে' কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে।

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ ও কি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে উচ্ছ্বসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে!"

এ হলো কাব্য। এ কবিতার কথা তার কাব্যকে ছাড়িয়ে মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ বা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে—এইখানেই এর কবিত্ব। এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে, এর করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি। কাজেই বাক্য যদি কেবল মাত্র বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের ধ্বনি হচ্ছে রসের ধ্বনি। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং—কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, রস যার আত্মা।" কাব্যের এই সংজ্ঞা লেখক খুব সহজে ও সরলভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁর আলোচনা চমৎকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এ ধরণের প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া প্রায়ই দেখি, সমালোচকের দল ধোঁয়ার অদৃশ্য হইয়া যান! এ প্রবন্ধের রচনায় ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নাই—ইহা অল্প শক্তির পরিচয় নয়। 'চিত্রা ও চৈতালি' শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর আলোচনা; বিশেষত্বহীন। 'বিধি-নিষেধ ও মানব প্রকৃতি'—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দারের সময়োপযোগী রচনা। লেখকের বক্তব্য, 'আমাদের রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক বা সামাজিক জীবন থেকে আমরা এইটে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারচি যে, আমরা মানুষকে দিন দিন যতই মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করচি, সে ততই অমানুষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং যতদিন মানুষের প্রকৃতি এবং তার পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে তাদের যথাযোগ্য মান্য করে আমরা নীতি-নিয়ম প্রণয়ন বা পরিবর্জ্জনের আবশ্যকতা বোধ না করি, ততদিন মানুষের এ বিদ্রোহী ভাব ঘুচবে না, এবং মানুষে-মানুষে ও জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষেরও অবসান হবে না।' কিন্তু এইটা কি করিয়া সম্ভব হইবে, লেখক তার কোনো হদিশ দেন নাই! 'ফুলের বিয়ে' নিবন্ধটির লেখা চমৎকার—খুঁটিনাটী নানা তথ্যে পরিপূর্ণ, তবে ছেলেদের কাগজে বাহির হইলেই অধিকতর সার্থক হইত। "ফুলের গন্ধ কোথা হতে আসে? লেখকরা বলিয়াছেন—ফুলের পাপড়ির মধ্যে একরকম গন্ধতেল পোরা আছে। একটা ফুলের পাপড়িকে যদি আলোর দিকে রেখে অণুবীণ দিয়ে দেখ, তাহলে তার মধ্যে অনেকগুলো কালো কালো দানা দেখতে পাবে। ঐ কালো কালো দানাই গন্ধতেলের দানা। পাপড়ির গায়ে কতকগুলো খুব সরু সরু ছেঁদা আছে—ঐ ছেঁদার ভিতর দিয়ে গন্ধতেলের গন্ধ বেরিয়ে আসে।'

—বসুমতী—আষাঢ়, ১৩৩৩

এ সংখ্যার প্রথমেই শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-রচিত 'জয়শ্রী' নাটক। নাটকের উপাখ্যান বৌদ্ধ আমলের। প্রথম দৃশ্যে বনবেষ্টিত বিহারভূমি; বল্লমহস্তে নারী সেনার দল গান গাহিয়া নাট্যের সূচনা করিয়াছে, * * *

"প্রতি পদভরে বুঝাও নারী
আমরা চলিলে চলিতে পারি,—
অবলা নহি, অবলা নহি—জাতির স্বাস্থ্য আমরা।

পুত্র মোদের অজর অমর, অজরা আমরা অমরা ইত্যাদি।

অত্যন্ত কৌতূহল লইয়া আমরা নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু ক্রমেই এমন জটিল গহন, আর সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার--সুলভ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হাল্কা কোরাস্- গানের মধ্যে ঢুকিলাম যে দিশাহারা হইতে হইল। নাটকে কোথা হইতে আচম্‌কা লোকজন ছুটিয়া আসে, হেঁয়ালির মত কথা কয়, যে, ব্যাপার বুঝা দুষ্কর। আগাগোড়া নাটকখানি পড়িয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম; অথচ রীতিমত চেষ্টা করিয়াছি, বহিখানি বুঝিব বলিয়া! পাঠশেষে দুটা জিনিষ শুধু মনে থাকে—রাজার উক্তি,—'আজ আমি রাজা নহি, বিধি রাজা।' 'আর রাজধানীর নর-নারীর মদিরা লইয়া প্রমত্ততা! ইহার মধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল, রাজা, রাজকন্যা জয়শ্রী, কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন, সুমিত্রা, সুষেণা, ও দেবসেনার দল! এত আয়াস সত্ত্বেও যদি নাটক না বুঝা যায় তো মর্ম্মদাহের অন্ত থাকে না! তার পর এ সংখ্যায় দেখিলাম, মৌলিক প্রবন্ধ—'পুরাণে আয়ুষ্কাল' (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), 'ডাক্তারের জন্য' জোগাড়' ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা (কিন্তু অতি-সংক্ষিপ্ত; একপৃষ্ঠায় শেষ!), 'বেদান্তের অনুবন্ধ চতুষ্টয়,' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশের 'অভিভাষণ' 'আধুনিক স্থাপত্য' কলের ব্যবসায় এবং বর্জ্জরেসে ছাপা দপ্তর—এ ছাড়া কবিতা, গল্প বাদে বাকী সব অনুবাদ! অর্থাৎ এ সংখ্যায় একদিক বসুমতী টোল্ খুলিয়াছেন, এবং অপর দিকে বিদেশী আসবাবের একজিবিসন্ খুলিয়াছেন! এতখানি রচনা-দৈন্য মাসিক-পত্রে প্রায় দেখা যায় না। 'পাবনার তাণ্ডব লীলা' দৈনিক বসুমতীতে ছাপা হইবার যোগ্য! তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'অভিভাষণ'ও বহু-পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—আষাঢ়, ১৩৩৩

প্রথমেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখিত 'সাহিত্যে জাতীয় ভাব।' সাহিত্য-মিউনিসিপালিটির 'স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর' সিংহ মহাশয় প্রবন্ধের গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল প্রভৃতির রচনা হাতড়াইয়া সে-সবে জাতীয়তা-হীনতা লক্ষ্য করিয়া বিলক্ষণ অনুযোগ তুলিয়াছেন; তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও ভূদেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—জাতীয়তার উন্মেষের লক্ষণ এই যুগে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে তিনি জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সাহিত্যের ব্যাখ্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের যুগে হিন্দুর জাতীয় ভাব অন্তর্হিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁর মতে 'রবীন্দ্রনাথ কখনো মিশনারী, আবার কখনো স্বদেশী' রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাসের ধারা' সিংহমহাশয়ের মতে ব্রাহ্ম মিশনারী-রূপে লিখিত—'গোরা' তাঁর মতে 'হিন্দুর জন্মগত বিশিষ্টতার বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ'। এ আলোচনায় আবার তিনি সেই ঘরে-বাইরের সীতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, এবং হাকিমী চালে নিজের লেখার নিজেই তারিফ করিয়া বেশ সজোরে বলিয়াছেন, "আমি আমার 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) এই মত খণ্ডন করিয়াছি। তারপর সিংহ মহাশয় সিংহ-বিক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' লইয়া পড়িয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন—"মহাদেবীকে ছাগ-রক্ত বা নর-রক্তের জন্য এতদূর লালায়িত বলিয়া তাহারা (জনসাধা-

রণ) জানে যে দেবীর সন্তোষ-বিধানের জন্য তাহারা রাজাকে রাজ্যান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাই কি হিন্দু জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস?" সিংহ মহাশয় ক্ষমা করিবেন,'বিসর্জ্জন' নাটক তিনি তাহা হইলে আদৌ বুঝেন নাই। বিসর্জ্জন নাটক, হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা নয়। তিনি এই প্রসঙ্গের আলোচনায় বলিয়াছেন—'সেজন্য (অর্থাৎ বলিদান বন্ধ করা) কোন্ পুরোহিত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অথবা সেই কর্ত্তার গৃহিণী রাগ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন' ইত্যাদি! আমরা বলি, মহাশয়, এর চেয়েও ঢের ছোট-খাট ব্যাপারে বহু কর্ত্তার গৃহিণী কর্ত্তাকে ছাড়িয়া পিতৃ-গৃহে চলিয়া গিয়াছেন! ফৌজদারী কোর্টে হাকিমী করিয়া সিংহ মহাশয় কি দেখেন নাই, কত ছোট-খাট ব্যাপারে কত বড় বড় গৃহবিবাদ, সমাজ-দ্বেষ প্রভৃতি কাণ্ড ঘটিয়া যায়! প্রসঙ্গতঃ আমরাও বলি, স্বর্ণলতা একখানি আদর্শ উপন্যাস—এ কথা সিংহ মহাশয়, বোধ হয় অস্বীকার করেন না। এ গ্রন্থে যখন জেল অনিবার্য্য বুঝিয়া শশিভূষণ আসিয়া স্ত্রী প্রমদাকে বলিল, 'তোমার গহনাগুলি দিয়া আমায় বাঁচাও,' তখন প্রমদা মুখ-ঝামটা দিয়া স্বামীকে পুলিশের হাতে ফেলিয়া গহনা-গাঁটী লইয়া চম্পট দিল,—এ ব্যাপারে হিন্দুর আদর্শ গেল' বলিয়া কোনো পাঠকই তো চীৎকার করেননা! কারণ পাঠক জানেন, প্রমদার যে-স্বভাব, তাহাতে ও-সময়ে ও ভাবে সে চম্পট না দিলে প্রমদার চরিত্রই সমঞ্জস হয় না! তবে? যত দোষ বুঝি রবীন্দ্রনাথের বেলায়! যেমন চরিত্র, কবি বা লেখককে তেমনি ভাবেই তো তাকে গড়িতে হইবে—না, 'গড়াচরচণ্ড'র মুখ দিয়া বেদ-বেদান্তের বাণী বাহির হইবে? না, দুর্য্যোধন দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র সসঙ্কোচে তাঁর পায়ে 'মা' বলিয়া আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে? এ-কথাও বুঝাইতে হয়, আশ্চর্য্য! এ প্রসঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সেই কথাটাই মনে পড়ে—'আমি যুক্তি দিতে পারি, কিন্তু আক্কেল বা বুদ্ধি দিতে পারি না—সেটা বিধাতার দান!' 'বিসর্জ্জনে'র আসল কথা আমরা বুঝি এই যে মানুষের চিরন্তন মনোবৃত্তি,—প্রেম, মায়া, মমতা, দরদ—এগুলার দিকে লক্ষ্য না করিয়া কতকগুলা বিধি-আচারের শাসনমাত্র মানিয়া চলিলে জয়সিংহের মত মহাপ্রাণ বিসর্জ্জিত হয়! জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির দারুণ মর্ম্মদাহ কি এই ইঙ্গিতই দিতেছে না! তাছাড়া দেবীত্বের বা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া বিসর্জ্জন তো কোনদিন আমরা বুঝি নাই। বুঝিয়াছি বিসর্জ্জনে আছে—মানব প্রণীত কয়েকটি আচার বিধির নৃসংশতার বিরুদ্ধে মানবচিত্তের বেদনার্ত্ত প্রতিবাদ! তাই অন্ধসংস্কারে জড়িত জয়সিংহ রঘুপতির কণ্ঠে 'রাজরক্ত চাই,—শুনিয়াও তাহা দেবীর বাণী বলিয়া ভুল বুঝিয়াছিল। এর অর্থ কি এই নয় যে, মানুষ ঐ সংস্কারে অন্ধ থাকিলে পদে পদে ভুল করে—হৃদয়ের সত্যকে দেখিতে পায় না! তারপর সিংহ-মহাশয় পাশ্চাত্য ভাব আনিয়া দেশে বিলাইবা দিবার চার্জ্জে রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করিয়াছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিয়া আমরা যে-হাকিম হইয়া এটুকুই বুঝিয়াছি যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার দিকেই রবীন্দ্রনাথ এ-সকল রচনায় আমাদের বারবার ইঙ্গিত করিয়াছেন! বিধি আচার—তা যতই প্রাচীন হোক, তার ঠাঁই, মনুষ্যত্বের অনেক নীচে,—একথা স্বীকার করিবই! তা যতই চোখ রাঙান! রচনাটি আগাগোড়া একচক্ষু হরিণের এক চোখে দেখিবার প্রয়াসে ভরা! অন্ধ গোঁড়ামি ইহার প্রতিছত্রে—যুক্তির ইহাতে একান্ত অভাব। তারপর কোন্ কথাটা যে লেখক না তুলিয়াছেন,

বলিতে পারি না। তবে সবগুলার সব দিক দিয়া আলোচনাও তিনি করিতে পারেন নাই। বিরুদ্ধ মতের কোনো যুক্তিকে ওজন করা দূরে থাকুক, সে ইঙ্গিত-মাত্রে সরিয়া আপনার অন্ধ বদ্ধ সংস্কারের গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন! 'বঙ্গ সাহিত্যের ধারাও বিরোধ' আর একটি প্রবন্ধ; কিন্তু ধারাবাহিক। এরূপ প্রবন্ধ একেবারে গোটা প্রকাশিত হইলেই আলোচনার সুবিধা হয়—নচেৎ মাসের পর মাস ধরিয়া পড়িবার ধৈর্য্যও কাহারো নাই। এ সংখ্যায় কয়েকটী গল্প উপন্যাস ও কবিতা আছে—কোনটিই তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয় 'সেকালের বঙ্গনারী' উপাদেয় সংগ্রহ।

প্রবাসী —আষাঢ়, ১৩৩৩।

প্রথমেই কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বৈকালী'। তারপর কবিবরকে বহুবৎসর-পূর্ব্বে লিখিত "জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী।" এগুলির মধ্যে এত তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে যে ইহা শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদানই যোগাইবে না, নব্য বাংলার চিন্তাধারার প্রচুর পরিচয় দিবে।" "পুরাতনী" শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উপাদেয় প্রবন্ধ—ভারতের বহুপ্রাচীন প্রথার কথা চমৎকার হৃদয়গ্রাহীভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সংখ্যায় সতীদাহ, সহমরণ, নরবলি প্রভৃতি কয়েকটি প্রথার কথা বিবৃত হইয়াছে। 'কাব্যকলা'—রীতিমত গবেষণাত্মক; দেশী-বিদেশী বহু কাব্যাংশের কোটেশন আছে; এবং মুরুব্বির ভাবে টীকা-টিপ্পনীও আছে প্রচুর, —তা সত্ত্বেও বলিব, ধোঁয়ার পরিমাণ এত বেশী যে তার মধ্যে ভাবের আগুন আছে কি না বুঝা দায়! এ প্রবন্ধটির সঙ্গে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' পড়িয়া দেখিলে দুটি রচনার প্রভেদ কি এবং কোথায় নিমেষে ধরা পড়িবে। কাব্য সমালোচনা বুঝাইতে গেলে প্রকাশের যে শক্তির প্রয়োজন, 'কাব্যকলা'-লেখকের রচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইলাম না। 'বাঙ্গলার নূতন চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'! প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত নানা কথার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—'আর্টিষ্টের বিশেষ করে' আশে-পাশের জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ এবং ষ্টাডি করা দরকার। ষ্টাডি ভালো না থাকলে খালি কল্পনার জোরে ভালো আঁকা যেতে পারে না। আর্ট মানে নকল করা নয়। কিন্তু কল্পনার ফুল ফোটাতে হলে বস্তুর গঠন (form) এবং তার বিশিষ্টতা (character) বিশেষ করে জানা দরকার।" কথাটা খুব ঠিক! আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। এ প্রবন্ধের লেখক আরো একটি সত্য কথা বলিয়াছেন—'আমাদের নবীন শিল্পীদের ভিতরে জীবনের ধারা যেন বন্ধ হয়ে গেছে; কাজ একেবারেstereo-typed রকমের mannerismএ পর্য্যবসিত হয়েছে। কেবল permutation and combination চলেছে। "এ কথার সত্যতা প্রতি মাসে সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র খুলিলেই বুঝা যাইবে, এবং ঐ কারণেই "প্রতি বৎসরে চিত্রকলার যে প্রদর্শণী হচ্ছে তা যেন একঘেয়ে রকমের হয়ে যাচ্ছে। বৎসর বৎসর কাজের উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয় না। এ দৈন্য ঘুচাইতে হইলে লেখকের মতে 'প্রকৃতির ভিতর জীবনের ভিতর ফিরে যেতে হবে; তার রং ও রেখা শিল্পীকে ফোটাতে হবে। তবেই আমাদের আর্টে আবার নবীন প্রাণের চেতনা জাগবে। কথাটা খুব খাটি। হে নবীন চিত্রকরের দল, মনকে সচেতন কর—নকল করিয়া আর্টিষ্ট হওয়া যায় না। মাসিক পত্র জোগাড় করিয়া ছবি ছাপাইলেই মানুষ আর্টিষ্ট হয় না! আর্টিষ্ট হয়

লোকে জীবনকে রঙে-রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়া। এ-সংখ্যায় এক নূতন গল্প-লেখকের সাক্ষাৎ পাইলাম। গল্পটির নাম, 'তৃষিত' লেখকের নাম শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। লেখকের গল্পটিতে বৈশিষ্ট্য আছে; ছোট গল্প লেখার আর্ট লেখকের জানা আছে—ভাষা ঝরঝরে। এঁর প্রতি অনুরোধ, বিলাতী লেশ আর চায়ের পেয়ালার প্রলোভনে পড়িবেন না! বাঙালীর বৃহৎ জীবনের নানা সুখ-দুঃখ হর্ষ-বেদনা বাংলার বাতাসে পরিপূরিত রহিয়াছে; তারি ছবি তুলির লেখায় ফুটাইয়া তুলুন। বাঙালী যে বাঙালী, ফিরিঙ্গী বনে নাই, বাঙালীর লেখায় তার পরিচয় দিন্। লেশ চায়ের পেয়ালার কাহিনীর জন্ম বিদেশী মাসিকের পৃষ্ঠা হাতড়াইতে রাজী আছি! মাসিক-পত্রের ছোট গল্পে আজকাল আর বাঙালীর দেখা পাই না, এ কি কম দুর্ভাগ্য! সম্পূর্ণ অজানা লোকের :কাণ হইতে ধুতি-শাড়ী পরাইয়া অসম্ভব নর নারীকে টানিয়া আজকালকার গল্প লেখকেরা দল গড়িতেছেন, তা তাঁরাই বোঝেন! তাঁদের গল্প পড়িয়া মনে হয়, হাইড পার্কে বসিয়া কোন্ ফিরিঙ্গী বাঙ্গালীর কথা পড়িতেছি! আমাদের চোখে দেখা আত্মীয়-অনাত্মীয় বাঙালী জাতি বুঝি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! চিত্র কলার প্রবন্ধে লেখক চিত্রকরদের যে কথা বলিয়াছেন, তারি প্রতিধ্বনি তুলিয়া এই সব নব্য গল্প লেখকদের বলি—ওগো আর্টিষ্টের দল, প্রকৃতির ভিতর, জীবনের ভিতর ফিরিয়া যাও! বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় ঘুরিয়া বাঙালীর মনস্তত্ত্ব সংগ্রহের বিরাট সঙ্কল্প, বিপুল অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর! রচনা প্রাণ পাইবে, সত্যই লিখিতে হইবে। দরদ আর আন্তরিকতা না থাকিলে গল্প হয় না, গল্প প্রলাপে পরিণত হয় মাত্র।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়, ১৩৩৩।

'জাত্যাভিমান, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রচিত মস্ত প্রবন্ধ কথা পুরাতন, তবু সময়োপযোগী। কিন্তু কথার পর কথা জড়ো করিয়া কি ফল, যদি কাজে তা পরিণত করার জন্ম কিছুমাত্র না উদ্যোগী হই! 'ভুলে গেছি প্রিয়া,' শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। বহুকাল ভাবে-ভাষায় ভরপুর; কিরণধনের কবিত্ব-কিরণের বিশেষত্বে মণ্ডিত। ইচ্ছা হয়, আগাগোড়া উদ্ধৃত করি—কিন্তু স্থানাভাব. শেষ দুই ছত্র—

বারে বারে ডাকিতেছি কারে?
আমার পূর্ণিমা-চাঁদ সে কি ডুবে গেছে চির-অন্ধকারে?

বিরহের কি বেদনাই যে বুকে পুঞ্জিত করিয়া তোলে! অশ্রুর কি বাষ্পেই সমস্ত অন্তর একেবারে আর্দ্র হইয়া ওঠে! 'যৌবনের দিগ্বিজয়' শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের চিন্তাশীল সন্দর্ভ। যৌবনই জীবন। লেখক বলিতেছেন, এই যৌবন-বিজ্ঞানের নজীর পাই সেই মান্ধাতার কালেও। নব্য বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের বার্ত্তা আনিয়াছেন; কিন্তু সে বার্ত্তার সন্ধান পায় যুবক-বঙ্গ, প্রৌঢ় বঙ্গ নয়। 'বন্দে মাতরম্'-আগুনের স্রোত যে যুবক ভারত কোথায় নিয়ে ঠেকাবে, তা আজও কেহ জানে না। তারপর বিবেকানন্দ—যুবক বাঙ্গলা একটা মানুষের মত মানুষ খুঁজছিল—তাই বাঙ্গলার যৌবনশক্তি এই অহঙ্কারী আত্ম-চৈতন্ত-শীল দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্ববীর 'বাপকা বেটাকে' নিজেরাই অবতার-রূপে খুঁজে বের করেছে। বাঙ্গালী-

যৌবনের দিগ্বিজয়ে বিবেকানন্দ এক বিপুল কীর্তিস্তম্ভ। তারপর মনস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—গ্রীক্ পেরিক্লেস বা ফরাসী নেপোলিয়নের মতই জবরদস্ত দুঁদে কর্মবীর। চিত্তরঞ্জন? —তাঁর গুরু—লেখকের মতে—এই যুবক বাঙ্গলা। তারপর বৃহত্তর ভারতে রবীন্দ্রনাথ সেরা যুবা। তিনি যুবক ভারতের ডাকে সাড়া দিতে পেরেছেন—আর কোন প্রবীণ ভারত-সন্তান তো তা পারেন নি। এইটাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। তারপর লেখক বলিয়াছেন—যৌবনই শক্তি। কিন্তু এ শক্তি শুধু রাষ্ট্রিক ব্যাপারে লাগিয়া থাকিলে চলিবে না। স্বরাজ সাধনার নূতন সমস্যা অর্থসমস্যা; যুবক-বাঙ্গালাকে এই অর্থ আনিতে হইবে। যুবক-ভারত ভাবো মজুর সৃষ্টি, মজুর সৃষ্টির কথা, মধ্যবিত্তের পথ আপনা আপনিই পরিষ্কার হয়ে আসবেই। এই অর্থসমস্যার দিনে এ কথাগুলি প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। 'পুরাতনী' শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উপাদেয় সংগ্রহ। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন—বলিয়া একটা যে কথা প্রচলিত আছে—এ সম্বন্ধে লেখক সেই গৌরীসেনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর নিকটে বালী নামক পল্লীতে সেন-পরিবার বাস করিতেন; এই পরিবারে গৌরীসেনের জন্ম হয়। ব্যবসা দ্বারা তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন; জাতিতে তিনি ছিলেন সুবর্ণ-বণিক। তাঁর দানশীলতা ছিল অলৌকিক 'অতিকায় প্রত্নমানব।' শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের রচনা। লেখক প্রমাণ-প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে চান, দক্ষিণাপথে অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সপ্তহস্ত পরিমিত মানব বিদ্যমান দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকেই তাঁরা দৈত্য, দানব ও রাক্ষস বলিতেন। 'সৌন্দর্য্য ও প্রেম উচ্ছ্বাস'; ছাপিবার সার্থকতা বুঝিলাম না। ছিটে-ফোঁটায় 'অনাদি আধারে পুরাণ' উপভোগ্য। 'হিন্দু' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দ নাই। ইংরাজীতে নিগারশব্দের যে অর্থ, পারসীতে হিন্দুশব্দেরও প্রায় সেই অর্থ। ফারসী ভাষায় হিন্দু অর্থে কাফের; হিন্দুস্থান বা হিন্দোস্তান অর্থাৎ যে দেশে হিন্দুনামে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে। প্রবন্ধটি কৌতুহলোদ্দীপক।

—•:•—

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

একজন বিখ্যাত ফরাসী ভাবুক একবার বলেছিলেন যে, মানুষ যখন জন্মায়, সে থাকে স্বাধীন; তারপর দেখি, তার চারিদিকে শৃঙ্খল।

মানুষ জন্মায় স্বাস্থ্যের অঙ্কুর নিয়ে কিন্তু তার চারিদিকে দেখি রোগ-শোক আর স্বাস্থ্য-হীনতা। পুরুষ বা নারী যাই হৌন্, এমন লোক আজ খুব কম দেখা যায় যিনি স্বাস্থ্যের সেই জন্মগত অধিকারকে অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখতে পেরেছেন। সহস্রমানুষের জনতার মাঝখানেও অটুট স্বাস্থ্য-বান্ লোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কে না সেই সুস্থ দেহের দিকে চেয়ে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়?

অটুট স্বাস্থ্যের কথা শুনলেই আমরা ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলেই ভাবি। আমাদের কাছে স্বাভাবিক হচ্ছে অসুস্থতা। আমরা বেমালুম ভাবে স্বীকার করে নিয়েছি যে এই দেহ, সে তো ক্ষণ-ভঙ্গুর; এবং ব্যাধি আর তার আনুসঙ্গিক পীড়ন, সে দৈবাধীন; মনুষ্যজন্ম

৭০ বৎসরের যুবা

গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়! স্বাস্থ্যই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এবং ব্যাধি আর অসুস্থতাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক। প্রথমতঃ আমাদের কোন রোগ হওয়াটাই অস্বাভাবিক; দ্বিতীয়ত, জীবনের ও স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ পথ হতে নিবৃত্ত থাকলে এবং প্রকৃতির সুন্দর ও সহজ নিয়মের অনুশাসন মেনে চললে এই সমস্ত ক্ষণিক ব্যাধি আপনা থেকেই তিরোহিত হয়। জাতির অমঙ্গল যখন সুরু হয় তখন সকল রকমেই তার পতন হতে থাকে। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এই সহজ ধর্ম্ম থেকেও আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

রোগ-শোক যেমন শরীরের ব্যাধি, পরাধীনতাও তেমনি সমগ্র জাতির পক্ষে একটা মহাব্যাধি। হয়ত বা এ মহাব্যাধিই আমাদের সকল রকম উন্নতির অন্তরায় ও গোড়ার কথা। সুস্থ মানুষ আমাদের দেশে

ভবিষ্যতে রবীর

এখন কোহিনুর মতই দুর্লভ! কিন্তু পশ্চিম ভূখণ্ডে এখনও অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা জীবনের সমস্ত দীর্ঘ পথঅতিবাহিত করেও বলতে পারেন যে—আমি জন্মেছিলাম সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে, আমি মরবও সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে।

এই প্রবন্ধের প্রথমে আমরা একজন পশ্চিম ভূখণ্ডবাসীর ছবি দিলাম। তাঁর বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি নিজেকে বৃদ্ধ বলতে চান না—তিনি সত্তর বয়সেও যুবা।

সত্যই তো তাই। যৌবন বা বার্দ্ধক্য, সে তো সময়ের সঙ্গে বাঁধা নয়। সে যে দেহের শক্তির সঙ্গে বাঁধা।

জাতি-গতভাবের অভাবই হোক আর যে কোন কারণেই হোক্ আমরা শক্তির চর্চ্চা থেকে বিরত হয়েছি। তার ফলে ক্রমান্বয়ে এক দুর্ব্বলের জাতি সৃষ্ট হয়ে চলেছে।

আমাদের শিশুদের শৈশবের হাসির মধ্যেই তাই সঙ্কুচিত জীবনের ছায়া পড়ে। আমাদের নারীর যৌবনে তাই বার্দ্ধক্য ঝুঁকে আসে। জাতির অকল্যাণ এই রকমেই বেড়ে যায়।

(অষ্টম বর্ষীয় বালকের দেহবিন্যাস)

কিন্তু আজ অন্যান্য স্বাধীন দেশে ব্যায়ামের চর্চ্চা রীতিমত ভাবে জাতীয়তার সাহায্য করছে। সেখানে শিশুকেও সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্ করে তোলবার জন্যে কত-রকম অভিনব প্রণালীর উদ্ভব হচ্ছে। কারণ ঐ শিশুরাই হয় দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা!

উপরে আট বছর বয়সের ছেলেটার যে ছবিখানি দেওয়া গেল, তা দেখে বোঝা যায় যে, শরীর-সাধনায় কী অপূর্ব্ব ফল

লাভ হয়! এইটুকু বয়সেই তার দেহে কত শক্তির স্ফূর্ত্তি!

য়ুরোপ-আমেরিকায় নারী-দেহের উৎকর্ষের জন্যও নানারকম ব্যায়াম প্রণালীর উদ্ভব হচ্ছে। নারীদেহ থেকেই সমাজের সৃষ্টি। নারীকে তাই জাতির কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্যবান হতে হবে। আমরা নারীর মহিষ-মর্দ্দিনী রূপের পূজা করি; কিন্তু আসলে নারীকে দেহে ও মনে নিতান্ত অসহায়া ক'রে রাখি। আজ আমাদের দেশের নারীরা যদি আত্ম-রক্ষায় পটু হতেন—তা হ'লে দেশময় নির্য্যাতন ও কলঙ্কের এই সব কাহিনী শোনবার দুর্ভাগ্য আমাদের ঘটতো না।

আমাদের অনেকের ধারণা যে ব্যায়ামে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একাধারে যে, কেমন তুল্যরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে, এই প্রবন্ধের চিত্র গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্বাস্থ্যের শ্রী

সুখের বিষয় আজ দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এ বিষয়ে একটু ভাবতে আরম্ভ করেছেন এবং প্রতিকারের চেষ্টাও যে কিছু না চল্‌ছে এমন নয়। কিন্তু সবকিছুর পিছনেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় একটা অত্যাচারের নিদারুণ কশাঘাত। ক্ষমতা কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্পন্ন না হলে, তার পরিণতি বা স্থায়িত্ব ঠিক ততদিনই হয়, যতদিন না সেই অত্যাচারের চিহ্ন একেবারে মুছে যায়।

ব্যায়াম ও সৌন্দর্য্য
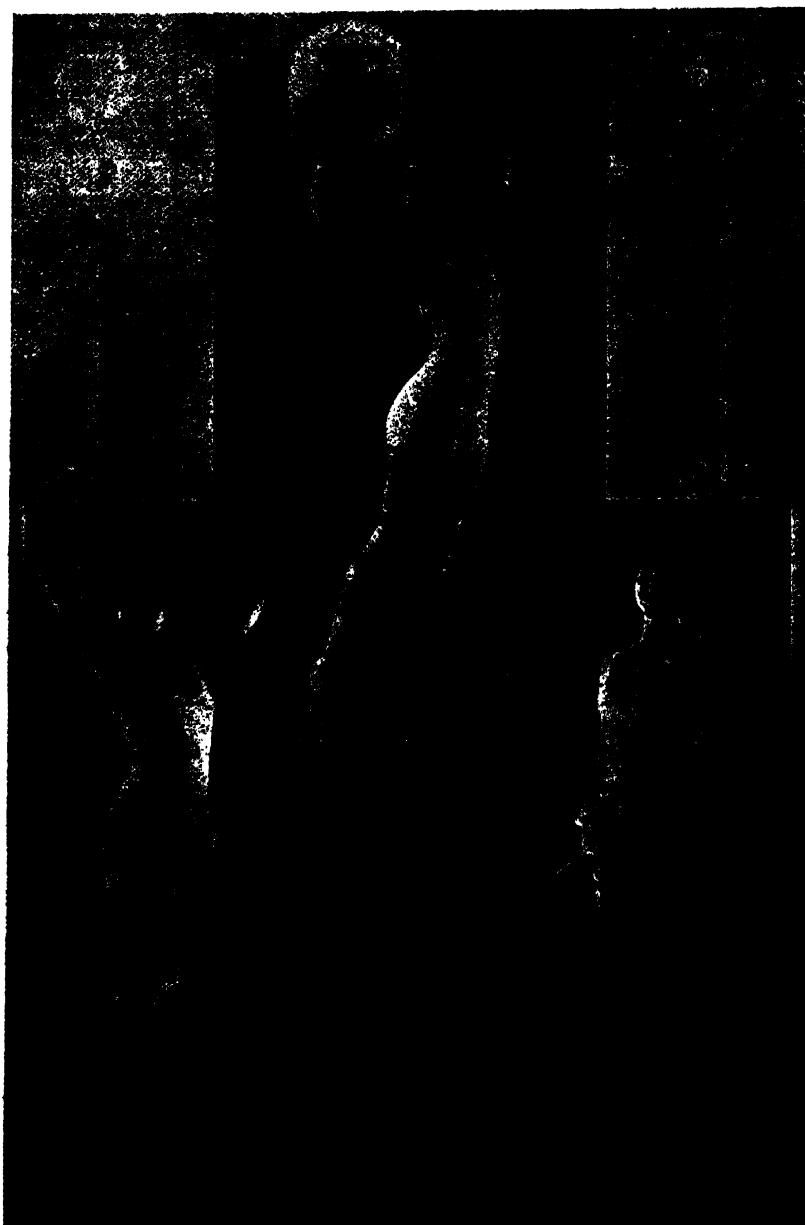
এবিষয়ে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগিরিজাচরণ ভট্টাচার্য্য

স্বয়ম্বর-সভা

(নাটক)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিমানের পড়িবার ঘর। ছুটির দিন—দুপুর বেলা ; বিমান খপরের কাগজ পড়িতেছে]

বিমান। (দূর হইতে দেখিতে পাইয়া) এসো ! এসো ! (বিজয়, অপ্রকাশ, ললিতের প্রবেশ) ভাবছিলুম, এমন ছুটির দুপুরটা একা-একাই কেটে গেল বুঝি ! নাও—তাস পেড়ে বসে পড়া যাক্ ! কি হে বিজয়, অপ্রকাশের মুখের পানে অমন হাঁ করে চেয়ে রইলে যে !

বিজয়। জানোনা বুঝি ? ও যে তাস খেলার ঘোর বিরোধী।

অপ্রকাশ। Surely that is an idle dissipation—only killing time.

বিমান। সময়কে মেরে ফেলচি, এ কথা কে বল্লে ? তাকে একটু জখম করে ছেড়ে দিচ্ছি বৈ ত নয়—যাতে খানিক ক্ষণের জন্যে ভারী হয়ে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে না বসতে পারে !

অপ্রকাশ। May be ! but still that's a game for ladies.

বিজয়। কিন্তু তুমি যে ভাষায় আমাদের সোজা বাংলা কথার জবাব দিচ্ছ, that's a language for an Englishman.

অপ্রকাশ। Oh ! That makes no difference so long as we understand each other.

(খদ্দরের জামা-কাপড় গায়ে সুনীলের প্রবেশ)

বিজয়। এই যে সুনীল !—সকালে অমন হনহনিয়ে যাচ্ছিলে কোথায় ?

সুনীল। দাদার ছেলের পরশু ভাত কি না, তাই একটা নেমন্তন্নর চিঠি ছাপতে দিতে যাচ্ছিলুম। কর্ম্মভোগের কথা আর বল কেন ! চিঠি-পত্র এক-প্রস্থ সব ছাপা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাবা সে চিঠি দেখেই একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে বলে উঠলেন—আমার সঙ্গে এয়ারকি পেয়েচো ?—যা ব্যাটা, এখনি ভাল করে চিঠি ছাপিয়ে আন্।

বিমান। কেন ? কেন ? কোন্ প্রেসে ছাপাতে দিয়েছিলে ?

সুনীল। ছাপা ঠিকই হয়েছিল কিন্তু চিঠির বয়ান নাকি ঠিক হয়নি !

বিজয়। নেমন্তন্নর চিঠির আবার বয়ানের ঠিক-অঠিক কি ? ওর গৎ ত বাঁধা।

সুনীল। ঐ বাঁধা-ধরার ভিতর আমি নেই বলেই ত যত হাঙ্গামা! বাবা চান চিঠি ছাপাতে সেই মামুলি ভাষায়, যা এখন একেবারে অচল হয়ে গেছে! অর্থাৎ কি না যথাবিহিতসম্মান-পুরঃসর করে আরম্ভ করে মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন—এই না লিখলে তাঁর আর মনঃপূত হবে না।

বিমান। নেমন্তন্নর চিঠি তো ঐ রকমই লেখে হে!

সুনীল। তুমি দেখ্‌চি তা হ'লে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন খপরই রাখো না! ও ভাষা যে এখন একেবারেই অচল—একেবারে devitalised—প্রাণ-হীন জড় পদার্থ হয়ে গেছে। জীবন্ত প্রাণবন্ত সচল চলতি ভাষাতেই তো আজকাল বাংলা সাহিত্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ লেখা হচ্ছে। কিন্তু prejudice dies hard—কুসংস্কারের কঠিন জান্—সহজে মর্‌তে চায় না—তাই এখনো কেউ কেউ আছেন, যাঁরা অষ্টপ্রহর সশঙ্কিত এবং সতর্ক হয়ে আছেন যে, যে-ভাষা আমাদের মুখ দিয়ে অবাধে রাত-দিন বের হচ্ছে তা যেন কলমের মুখ দিয়ে খবরদার না বের হয়। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি (পকেট হইতে ছাপা কার্ড বাহির করিয়া) এর মধ্যে আপত্তিকর রয়েছে কোন খানটায়?

"আসচে রবিবার ২৮শে মাঘ আমার ছোট নাতির ভাত। আপনারা বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে ঐ দিন দুপুর বেলা আমার বাড়ী এসে খাওয়াদাওয়া করবেন। চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন জানালুম, দোষ ধরবেন না যেন!"

বিজয়। ও অপ্রকাশ,—অমন অন্য-মনস্ক হয়ে ভাবচো কি? সুনীলের চিঠিখানা কেমন লাগলো?

অপ্রকাশ। I don't think it a profitable discussion—absolutely idle and useless.

বিজয়। তাস খেলাটা হোলো idle dissipation—এটাও হোলো absolutely idle and useless discussion—তবে একটু active useful কাজ করে দেখিয়ে দাও দেখি—যাও, ষ্টোভ্‌টা জ্বেলে চায়ের কেটলিটা চড়িয়ে দাও। (All right বলিয়া অপ্রকাশের ষ্টোভ্ জ্বালাইবার উদ্যোগ) —দেখ সুনীল, চলতি ভাষা চলতি ভাষা করে অমন ক্ষেপে উঠলে চলবে কেন? চলতি ভাষা মানে যদি হয় কলিকাতার colloquial ভাষা—তাতে সমস্ত বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি হবে কি করে? আর কলিকাতার চলতি ভাষায় ধরলুম না হয় কতকগুলো beautiful idea প্রকাশ করা যায়, কিন্তু যেটা sublime তার ধ্বনি তার সুর কি চলতি ভাষার মধ্যে

দিয়ে বেরোয়? তার জন্যে যে একটা স্বতন্ত্র ধ্বনি স্বতন্ত্র সুরের প্রয়োজন। চলতি ভাষা থিওরির আর একটু গলতি আছে—নজর করেচো কি? যাঁরা চলতি ভাষা চলতি ভাষা করেন—তাঁরা অনেক সময় শুধু কলিকাতার colloquial inflexionটাই চালান—কিন্তু তাঁদের মূল পদগুলোর ভিতর বেমালুম কেতাবী ভাষা দেখতে পাবে।

সুনীল। ঠিকই বলেচো তুমি। আমিও তাই ভেবেচি, অনেক নামজাদা লেখকের লেখা আধুনিক পুরোদস্তুর চলতি ভাষায় rewrite করে একখানা বই ছাপাবো। এতে বাংলা সাহিত্যের গতি অনেকগুণ বেড়ে যাবে! ধর,

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক জননী-জননী!—

এর বদলে লিখবো,

ওগো মন-ভোলানি দুনিয়ার!
পষ্কের ঝক্ঝকে রদ্দুরে চক্চকে
চারিধার—
মা তুমি বাপ্পা-মায়!

কিংবা—

জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ,
চাহিনা মান!
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল
কমল চরণে স্থান!

এর বদলে লিখবো—

ও মা বাংলাভাষা এই জীবনে টাকা
কিংবা মান না-চাই,
যদি তোমার সাদা পদ্ম পায়ে দাও
আমাকে একটু ঠাঁই!

বিজয়। হায় মা ভারতবর্ষ! এখানে সোনা উঠে গিয়ে ক্রমশঃ কি নিকেলেরই প্রচলন হবে!

সুনীল। তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে গিয়ে আসল কথাটাই চাপা পড়ে গেল! বিমানের বিয়ের কথাবার্ত্তা কতদূর এগুলো? আমি ত ইতিমধ্যে এক কবিতা লিখে বসে আছি—যাচাই করে বল দেখি—সোনা না নিকেল?

(কবিতা পাঠ)

লাগলো ভেল্কি লাগলো রে!
আজকে দুটি ঘুমন্ত প্রাণ
কার পরশে জাগলো রে!
চোখ চেয়ে কয়—এ কি! এ কি!
আজকে আমি কারে দেখি!
আর-জনমের আমার সে-কি
এই জনমে মিললো রে!
লাগলো ভেল্কি লাগলো রে!
ভানুমতীর খেল কি সরেস,
সরস মরু করলো রে!
দুই বনের দুই বিজোড় পাখী—
জোড় মিলে প্রাণ-মাখামাখি,
হাতে রাঙা সুতোর রাখী
এক করে কায় বাঁধলো রে!

কি বিমান, পছন্দসই হয়েছে? যদি

হয়ে থাকে, বল—এই বেলা এক সঙ্গে ছাপতে দিয়ে আসি।

(একতারা হাতে বাউলের প্রবেশ)

কি বাবাজী, এমন অসময়ে ঠিক দুপুর-বেলা তুমি এখানে কি করে এসে হাজির হলে! তোমার দেখছি, কোথাও অগম্য স্থান নেই।

বিজয়। তোমার গান আমাদের বেশ লাগে। ধর, একখানা গান ধর—শোনা যাক।

(বাউল ষ্টোভে চড়ানো চায়ের কেটলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গান ধরিল)

গান

হরিনাম দার্জ্জিলিং চা পান কর মন দিবা-নিশি,
তোর সকল অসুখ যাবে সেরে খাস্‌নে ওষুধ শিশি-শিশি!
নেইকো আগুন? কাঁদিস ক্ষোভে!
জ্বাল্‌না প্রেমের স্পিরিট ষ্টোভে,
ভক্তিজলে নিবৃত্তি-দুধ মেশাস খানিক শেষাশিষি!
জীবে দয়া মিষ্টি চিনি,
মিনি পয়সায় আনিস কিনি,
(ও মন) ছাড়্‌না দ্বন্দ্ব, পরকে সন্দ, দ্বেষাদ্বেষি, রেষারিষি!

সুনীল। বেশ গেয়েচো বাবাজী, বেশ গেয়েচো কিন্তু হরিনাম শোনবার বয়সে এখানো আমরা ঠিক গিয়ে পৌঁছুই নি! অন্য কোন রকম গান-টান জানা আছে?

বাউল। এক-আধটা জানি বৈ কি বাবু—কিন্তু ভালো লাগবে কি? (সুনীলের খদ্দরের পোষাকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গান ধরিল)

গান

খদ্দরেতে অঙ্গ ঢেকে
ও মন, আপনারে তুই দিস ফাঁকি!
ওরে, আরশোলা কি হয় কখনো
বদলে পোষাক বাজ-পাখী?
তোদের ভিতর যে কয়জনা
আসল মানুষ, খাঁটি সোনা—
ও সে দু আঙুলে হয় তা গোনা—
পিতল-কাঁশা বাদ-বাকী!
ভাবিস কি তুই কথার ফাঁদে
আকাশের ঐ ধরবি চাঁদে?
কচি ছেলেও ককিয়ে কাঁদে
চাঁদ ধরা দেয়—হয় তা কি?
গায়ে তুমি সাবান মাখো,
খদ্দরেতে অঙ্গ ঢাকো—
ওরে, মনকে ধোলাই করলি নাকো
হায়, হায়, বুঝলিনাকো কোনটা কি!
ওরে, নামাবলী গায়ে দিলে
ভাবিস কি তুই কৃষ্ণ মিলে?
ও তোর একটু পেটের খপর নিলে
করবে কোঁকোঁর রামপাখী!
হাড় পাজী তুই, হারামজাদা,
কাপুরুষের ঠাকুরদাদা,
মানুষ নয়, তুই আস্ত গাধা—
মানুষ হলে ভাবনা কি!

খদ্দরেতে অঙ্গ ঢেকে
আপনারে মন দিস ফাঁকি !

বিমান। সুনীল, গান শুনতে চেয়েছিলে, কেমন মুখের মত হলো ত ?

সুনীল। বাবাজী, তোমার গালাগালি ভারি মুখরোচক লাগলো। এই নাও—(বাউলের হাতে একটা সিকি দিল, আর সকলেও কিছু কিছু দিল। বাউলের প্রস্থান। বিজয় অপ্রকাশ ষ্টোভ হইতে কেটলি নামাইয়া লইলে চা প্রস্তুতে নিযুক্ত হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রমেশের অন্দর-বাটীর ঘর। বীণা সেলাইয়ের কলে কি-একটা সেলাই করিতেছে। রমেশ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া সেমিজের লেস্ প্রভৃতি বীণার কারুকার্য্য পরীক্ষা করিতেছে। সময়—দ্বিপ্রহর, রবিবার।]

বীণা। জামাইবাবু, তুমি ভারী জ্বালাতন করচো ! তোমার দিকে চোখ রাখতে গিয়ে এই দ্যাখো, আমার সেলাই বেঁকে গেল ! তুমি সব ঘেঁটে-ঘুঁটে একাছত্তোর কোচ্ছো—এখনই আমার নমুনার টুকরো তুমি হারিয়ে দেবে।

রমেশ। চুপ কর্, শালী ! তোর ঐ ছোট ছোট আঙুল খুড়ুক্ খুড়ুক্ করে, কি করে এই জটিলতায় জাল ভেদ করে বের হয়ে এসেচে—তাই দেখচি, আর মনে মনে তোর তারিফ করচি ! তুই যদি আমাকে মাল-মসলা, উপকরণ, তার মানে—সাবেক আর হাল ফ্যাশানের নানা রকম নমুনো জোগাড় করে দিতে পারিস, তা'হলে আমি তার সাহায্যে বুনন-বিস্তার বিবর্ত্তনবাদ নাম দিয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ চিত্র-বিচিত্র-করা একটা থিশিস্ লিখি আর Y. M. C.A কি University Instituteএ ঐ বিষয়ে Lantern lecture দিয়ে একটা সোরগোল হৈ-চৈ বাধিয়ে দি ! তারপর দেখতে পাবি, তোর ভগ্নীপতি একদিন বিলেত যাবার উদ্যোগ করছে ! তোর বোন কত কাঁদবে, তুই কত বারণ করবি, কিছুতেই কর্ণপাত করবো না—অবশেষে মাস-কতক বাদে খবরের কাগজের টেলিগ্রামের কলমে একদিন দেখতে পাবি যে R. C. Bose নামক জনৈক ভারতীয় কলাবিৎ F. R. S. হয়েছে। তখন তোদের কি মনে হবে বল্ দেখি ?

বীণা। জামাইবাবু, তুমি এত বাজে বকতেও পারো—মতলব, আমায় সেলাই করতে না দেওয়া !

রমেশ। উল্টা বুঝিলি শালী ! তোকে সেলাই, বোনা এই সব জিনিষে উৎসাহ দেবার জন্যই ত এত কথা কইলুম ! আর তুই বুঝলি কি না, তোকে সেলাই না করতে দেওয়া আমার মতলব ! হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম, যখন আমি F. R. S. হবো, তখন আমি পণ্ডিত-সমাজে কি প্রচার করে দেবো, জানিস ?

বীণা। কি আবার প্রচার করে দেবে?

রমেশ। I owe a deep debt of gratitude to my dear beautiful sister-in-law Sm. Binapani for inspiration and very many valuable suggestions and informations. আচ্ছা Priestly, Lavoiser এদের ত রসায়ন-বিদ্যার father বলে, Euclid হলো জ্যামিতির father—তোর ঐ বুনোন বিদ্যার fatherটা কে, বলতে পারিস?

বীণা। ওখানে father নয়, mother! তুমি বুঝি জেনে রেখে দিয়েচো, যত যা বিদ্যে আছে সবারই father আছে, একটারও mother নেই?

রমেশ। ভুল হয়েছে ভাই, ভুল হয়েছে। তোমার ঐ বুনোন বিদ্যার ধার দিয়ে ঘেঁষে, father কেন, Grand-father-এরও সে সাধ্যি নেই!

বীণা। তা হলে এই রইলো সেলাই! তুমি যখন অমাকে বকাবেই, তখন বকিই, এসো। আচ্ছা, প্রথমে একটা গান শুনিয়ে দাও দেখি—তার পর অন্য কথা হবে।

রমেশ। এবারে যে বীণা তোমার ভুল হলো! এ গলা ছাত্রদের সামনে Shakespear Milton নিয়ে ভীম-নির্ঘোষে জলদ-গম্ভীর স্বরে lecture দেবার জন্য অর্থাৎ পরের বুলিগুলোআপনার—এই রকম ভাব দেখিয়ে অনর্গল বকে যাবার জন্যই তৈরী হয়েছে—শ্যালিকার কর্ণে গুন গুন করে গান শোনাবার জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেন নি!

বীণা। আর খুঁটি-নাটি নিয়ে হাঁক-ডাক করে দিদির সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে তৈরী হয়েছিল—কি বল?

রমেশ। দ্বিতীয়বার ভুল করলে বীণা—যেটাকে তুমি ঝগড়া বলে আমার প্রতি আরোপ করচো, সেটা হচ্ছে অযুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তির আত্মরক্ষা—নিরস্ত্র প্রতিরোধ,, passive resistance

বীণা। জয় গান্ধি মহারাজ-কি জয়! গুজরাটে আর বাংলায় এক সময়ে দুজন মহাত্মা জন্মেছিল—এ কথা এতদিন চাপা রয়েছে, ভারতময় রাষ্ট্র হয়নি!

রমেশ। আমি আমার বন্ধুমহলে আর শালী-সমাজ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও আত্মপ্রকাশ করতে চাই না যে!

বীণা। উঃ, কী বিনয়! বুঝেচি, বুঝেচি! এটা-সেটা করে আমায় ভুলিয়ে দেবার মতলব! এই তিনবার বলুম—গান গাইবে না? গাইবে না? গাইবে না?

রমেশ। গাইব, গাইব, গাইব। তবে এই দুপুর বেলা রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করচে, এমন সময় মানুষ—

বীণা। ফের অমন করলে আর কখনো কথা কইব না, এই বুঝে—

রমেশ। একটা কথা ছিল কিন্তু—

বীণা। আবার?

রমেশ। (গান আরম্ভ করিল)

গান

গৃহিণী যখন ভীষণ ক্রুদ্ধ বরিষে বচনধারা—
প্রতিবেশী করে জানালা বন্ধ, গৃহবাসী ভয়ে সারা—
মাঝে মাঝে আসি কে দ্যায় তখন তরঙ্গে তৈল ঢালি ?
মোর প্রিয়তমা শ্যালী সে যে গো, প্রিয়তমা মোর শ্যালী !
রসহীন যবে লাগে দুনিয়াটা পালাতে পারিলে বাঁচি,
এক হাতে নিয়ে খাবার রেকাবী, আর হাতে পাণ ছাঁচি
কে আসি তখন দাঁড়ায় সমুখে ঘুচায় মনের কালী
মোর মনোরমা শ্যালী সে যে গো, মনোরমা মোর শ্যালী !
ছুটিতে যখন কাটে নাকো দিন, নেইকো কাজের ঠেলা—
ব্যতিব্যস্ত তাগাদার চোটে পাওনাদারের মেলা !
কার মুখখানি ভেসে ওঠে চোখে রূপের প্রদীপ জ্বালি ?
মোর নিরুপমা শ্যালী সে যে গো, নিরুপমা মোর শ্যালী !
হাসি-পরিহাস কৌতুকরাশি উছলে কাহার অঙ্গে ?
যৌবন যেন আসে ফিরে পুনঃ কাহার সরস সঙ্গে
কাণমলা লাগে মিষ্টি-মধুর, অম্ল-মধুর গালি ?
কৌতুকপ্রিয়া শ্যালী সে আমার, কৌতুক-প্রিয়া শ্যালী !

[একটি পাত্রে গরম খাবার লইয়া সরলার প্রবেশ]

সরলা। খুব সুরের সুরধুনী বইয়ে দিয়েচো, দেখতে পাচ্ছি। এখন এগুলো যে জুড়িয়ে যাবে! চটপট খেয়ে ফেল। যে কখানা ভেজেছিলুম, সবই এনেছি আর চাইলে পাবে না!...বীণা একবার নীচে আয় তো।

রমেশ। বীণা একবার নীচে আয় তো! কথা তো এইটুকু,—কিন্তু এর ভিতর কতখানি idea প্রচ্ছন্ন রয়েছে!

সরলা। কি আবার idea রইল ?

রমেশ। 'বীণা একবার নীচে আয় তো'—এই sentenceটা amplify করলে দাঁড়ায় কি, জানো? দাঁড়ায়—"বীণা, আয়, আমরা নীচে রান্নাঘরে যাই। সেখানে গিয়ে দুই বোনে মিলে বিনা-উপদ্রবে থালা থালা পাচার করে দি আর ঐ আহাম্মুখ ততক্ষণ ওপরে মুখ শুকিয়ে বসে থাকুক্।"

(খাইতে খাইতে গান আরম্ভ করিল)

গান।

যদি বারণ কর, তবু
চাইব গো।

যদি গরম লাগে মুখে,
খাইব গো।
যদি ফুরালো নেই বলে
ভুলাও মিছে ছলে,
তোমার পাকশালে
ধাইব গো।
যদি বারণ কর, তবু
চাইব গো।
যদি লুকানো পড়ে থাকে
কোথা কিছু,
আমি করবো চুরি, যাই
ফের পিছু,
যদি নেহাতি ধরা পড়ি,
কেড়োনা ; হাতে দড়ি
বরং দিয়ো, জেলে
যাইব গো!
যদি বারণ কর, তবু
চাইব গো।

বীণা। দিদি, জামাই বাবুর সুরের সুর-ধুনীতে আজ বাণ ডেকেছে গো! এই এতক্ষণ আমাকে নিয়ে প্রিয়তমা মনোরমা নিরুপমা বলে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ যে করা হলো! এখন আবার পড়েছেন তোমার ওপরে!

সরলা। দিস ত বীণা মনে করে ওর কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে এই সব জানিয়ে। কাল একখানা চিঠি লিখে দেবো। লিখে দেবো যে বাড়ীতে আমরা কিছুতে পেরে উঠচি না—তুমি তোমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীটিকে একটু কড়া শাসন করে দাও—তা না হ'লে আমাদের প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠেচে। আয় বীণা (আঁচল ধরিয়া) [দুইজনে যাইতে উদ্যত।]

রমেশ। (ভর্ত্তিমুখে) আর দুখানা পাঁপর-ভাজা আনিস বীণা—তোর ভাগ থেকেও অন্ততঃ—নইলে আমি এখনই রান্নাঘরে অনধিকার প্রবেশ করে একটা বে-আইনী কাণ্ড বাধিয়ে দেবো।

ক্রমশঃ

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

শোধ-বোধ।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিবরের রচিত নাটক। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর 'কর্ম্মফল' নামে একটি গল্প লেখেন,—পারফিউমার ৺ এইচ বসু মহাশয় সে বই প্রকাশ করেন। তারপর সেই গল্পটিই কবিবর সম্প্রতি নাট্যাকারে গাঁথিয়াছেন। আচারে-ব্যবহারে কৃত্রিমতা থাকিলে মনুষ্যত্ব প্রতি পদে কিভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং চারিদিকে কত জটিলতা ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের সৃষ্টি হয়, তার উজ্জ্বল আলেখ্য দেখি এই নাটকখানিতে। মেঘ ও রৌদ্রের মত করুণ ও হাস্যরসের সুমধুর সমাবেশ! কয়েকটি নূতন গানও এ গ্রন্থের জন্ম কবিবর রচনা করিয়া দিয়াছেন। বহিখানি সম্প্রতি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। কবিবরের নাটকের সম্বন্ধে দু'এক কথায় তারিফ করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ মাত্র। সুধী ও রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এ নাটকখানি পড়িয়া যে মুগ্ধ হইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য।

বিসর্জ্জন।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। এখানি তৃতীয় সংস্করণ। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেকার সংস্করণ হইতে বিভিন্ন বহু নূতন দৃশ্য যোজনা-দ্বারা নাটকের মানবীয় দিকটা এ বইয়ে বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তার ফলে অত্যন্ত সাধারণ পাঠকের পক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অংশ দুর্ব্বোধ ঠেকিত, তাহাও এক্ষণে সরল বোধ হইবে। এ নাটকখানিও সম্প্রতি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। বহিখানির ছাপা, কাগজও বেশ সুদৃশ্য হইয়াছে। দাম খুবই সস্তা।

গান।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি তৃতীয় সংস্করণ। বাল্মীকি প্রতিভা হইতে সুরু করিয়া বহু প্রাচীন ও আধুনিক গান এ বহিতে সংগৃহীত হইয়াছে। গানগুলি সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে সুবিন্যস্ত এবং বাছাই করা। কবিবরের গানের এ সংস্করণখানি অচিরে নিঃশেষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বীরবলের হালখাতা।—প্রথম পর্ব্ব। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম দেড় টাকা। একটা কথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল যে, আমরা শুধু গল্প-উপন্যাসই পড়ি; প্রবন্ধ,—বিশেষ যার মধ্যে চিন্তা করিবার কিছু থাকে, তার ধারেও ঘেঁষি না। এ অপবাদ মিথ্যা দাঁড়াইতেছে, এ বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণে। কারণ, এখানি গল্পের বহি নয়; তার উপর পাণ্ডিত্যাভিমানী জন-কয়েক লেখক বীরবলের ভাষাকে বাংলাভাষা বলিয়া আমোল দিতেও রাজী নন্! তা সত্ত্বেও বাঙালী পাঠক প্রথম সংস্করণ কিনিয়া বহিখানির যোগ্য সমাদর করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বীরবলের লেখা এই কয়টি পুরানো নিবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে—হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল-খাতা; মলাট-সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জ্জমা; বইয়ের

ব্যবসা; বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজ পত্র; বীরবলের চিঠি; "যৌবনে দাও রাজটীকা": ইতিমধ্যে। সমস্ত নিবন্ধগুলির মধ্যে নিপুণ যুক্তি (logic) ও সুগভীর চিন্তা-শীলতার সঙ্গে যে বলিষ্ঠ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলা সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যের সম্পর্কে ইঙ্গিতের এত প্রাচুর্য্যও বড় একটা পাওয়া যায় না। বীরবলের "কথার কথা" নিবন্ধটি সাহিত্যের কারবারী মাত্রকেই পড়িতে বলি। "বাঙ্গলা ভাষা কাকে বলে?" "এ কথার উত্তর বহু লেখক আজো জানেন না!" তাঁদের ডাকিয়া বীরবল বলিয়াছেন, "যে ভাষা আমরা সকলে জানি, শুনি, বুঝি! যে ভাষার আমরা ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ বিনা আরামে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং সম্ভবতঃ আরো বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ করবো......বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর মুখে।" বাংলা সাহিত্যে অতি গম্ভীর গোমড়ামির প্রাচুর্য্য দেখিয়া বীরবল সত্য কথাই বলিয়াছেন— "করুণ রসে ভারতবর্ষ স্যাঁৎ সেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বদেশের জন্যও হাস্য-রসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" এমনি নানা ইঙ্গিত এ বহিখানির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীকে বিশেষ করিয়া তরুণের দলকে আমরা এই বহিখানি বার বার পড়িতে ও পড়িয়া বুঝিতে বলি। বুঝিতে পারিলে তাঁদের হাতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, তার কোথাও বিদঘুটে কান্না বা ন্যাকামির সুর থাকিবে না—তেজোবলে বলীয়ান, ও যুক্তিতে সুদৃঢ় হইবে এবং ভাবাও সরস সজীব হইবে। বীরবল বলিয়াছেন "যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।"

মায়া-মৃগ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা। এখানি ছোট গল্পের বহি। বিদ্রোহী, পূজারী, পুরীর ডায়েরি, একটা দিনের ইতিহাস, ও রিক্তা—এই পাঁচটি গল্প এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সব-কটি গল্প পড়িয়াই আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। গল্পের ভাষা ও ভাব আগাগোড়া স্বচ্ছ, সলীল; কোথাও অনাবশ্যক এতটুকু আড়ম্বর নাই। গল্পগুলির সব কটিই করুণরসে পরিপ্লুত এবংপাঠান্তে প্রাণে করুণ সুরের রেশ রাখিয়া যায়। Realism-এর সহিত idealism চমৎকার মিশ্ খাইয়াছে। বহিখানির নাম মায়া মৃগ। মায়া-মৃগ যেমন ধরিবার ছুঁইবার বস্তু নয়, তবু মন তার জন্য লোলুপ হয়! গল্পগুলিও তেমনি আমাদের নীরস দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আবহাওয়া হইতে একনিমেষে কোন্ স্বপ্নে-দেখা কল্পলোকে বহিয়া লইয়া যায়! লেখক ভাষা-দিয়া বসা, সমুদ্র ও সন্ধ্যার যে সব ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, নিপুণ চিত্রকর তুলির লেখায় তার চেয়েও ভালো ছবি আঁকিতেপারিতেন কি না, সন্দেহ হয়। বহিখানির ছাপা কাগজ মলাট চমৎকার।

লচ্ছমী। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবাগীশ প্রণীত। কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা। এখানি সামাজিক নাটক। বহিখানির গোড়াতেই শাল গায়ে দেওয়া ছড়ি-হাতে একখানি ফটোর প্রতিলিপি,—তাঁহার নাম নাই। গ্রন্থকারের ছবি বলিয়াই মনে হয়। তারপরই মুখপাতে 'চক্রবর্ত্তীর' বানান্ দেখিলাম 'ত্তীর' স্থানে 'ত্তি; তারপরই 'বিদ্যাবাগীশ'!

'নিবেদনে' নাট্যকার বলিয়াছেন,—"আমার হৃদয়োদ্ভূতা এ লছমীর আদর্শ আমাদের মহিলাবৃন্দ ও সমাজ গ্রহণ করিলে দেশে সুধা-বৃষ্টি হইবে বলিয়া আমার প্রত্যাশা হয়! "বটে! বহিখানি খুবই আগ্রহে পড়িলাম, লছমীর আদর্শ বুঝিবার জন্ত! কিন্তু আদর্শ কি, লছমী একটা 'চরিত্র'ই হয় নাই! সেই পচা মামুলি প্লট, তার রচনাতেও তেমনি কারিগরী! তার উপর এখানি 'নাটক' যখন, 'গান'ও তখন থাকিবে! একটু গানের নমুনা দি—

আয় আয় বঁধু শুনবি আমার প্রেমের নিবেদন,
বুকের মাঝে রাখবো তোরে করি সঙ্গোপন।
জেগে উঠছে কত কথা পেয়ে তোর দরশন,
হৃদি-ভরা আশা-কলি ফুটে উঠবে পেলে তোর
পরশন।"

লেখক নিজের পরিচয় দিয়াছেন, 'সচিত্র গোধন' প্রণেতা বলিয়া। তাঁর প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, বেচারী অবোলা 'গোধনের'ই তিনি উন্নতি করুন,—'মানবধন'কে লইয়া আর এ পীড়ন কেন!

শুকতারা।— শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা! এখানি কবিতা-গ্রন্থ। বহু খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সান্ধ্যতারা,' 'হতভাগ্য,' 'জ্যোৎস্নার স্বপ্ন', 'বাসন্তিকা' হইতে সুরু করিয়া 'শান্তি-নিকেতন' অবধি কাহাকেও কবি ছাড়িয়া কথা কন্ নাই! কবিতাগুলি বৈচিত্র্যহীন, বিশেষত্বহীন। কবি কিছুকাল ছন্দ মিলানো মক্সো করুন্। যা লিখিব, তাই ছাপিতে ছুটিব, এ একটা ব্যাধি; এ-ব্যাধির চিকিৎসা প্রয়োজন; আর সে চিকিৎসা ছাপা-খানায় হয় না!

দুর্দ্দিনের যাত্রী।—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ছয় আনা। ক্ষুদ্র নিবন্ধ-পুস্তিকা। লেখকের রচনায় যা বিশেষত্ব, তার কোনো পরিচয় এ পুস্তিকায় পাইলাম না। খানিকটা প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস, আর খানিকটা হেঁয়ালি! লেখার উদ্দেশ্য এ রচনায় সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়!

পুরুষোত্তম।—জীমূতবাহন প্রণীত। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। বহিখানি পড়িয়া আনন্দ'লাভ করিলাম। উপন্যাসের ছলে এ বহিতে লেখক নব্য বঙ্গের কল্যাণ-কল্পে চিন্তার উপযোগী বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন! উপন্যাসের প্লটটি খুবই সাদাসিধা অথচ সরস। তার মধ্যে মনস্তত্ত্বের লীলাও দেখিতে পাই। ভাষা বেশ ঝরঝরে হালকা। পুরুষোত্তম বড় মানুষ লোক—তার সহিস ছিল গোষ্ঠ, জাতে ডোম। গোষ্ঠও তার স্ত্রী ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগে মারা যায়। মৃত্যুকালে তিন বছরের মেয়ে লক্ষ্মীকে বাবুর স্ত্রী নিরুপমার হাতে দিয়া যায়। গৃহে রাধামাধবের বিগ্রহ—খুবই শুচি হইয়া নিরুপমাকে ঠাকুর-পূজার আয়োজন করিতে হয়। সেই গৃহেই এই ডোমের মেয়ের অবাধ গতি! তিনি একটি ডোম জাতীয়া দাসী নিযুক্ত করিয়া বাড়ীর নীচের তলায় লক্ষ্মীর ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী অস্থির মেয়ে—সে ঐ ঘরে বদ্ধ থাকিবে কেন! ছুটাছুটি করিয়া সৃষ্টির জিনিষ ছুঁইয়া বেড়ায়, ঠাকুর পূজার ঘরে আধি গিয়া দাঁড়ায়—বাড়ীশুদ্ধ লোকে হাঁ হাঁ করিয়া তাড়া দেয়। বালিকা সভয়ে নিরুপমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দেব-পূজার কথা ভুলিয়া গিয়া নিরুপমা লক্ষ্মীকে কোলে তুলিয়া লন। এমনি করিয়া নিরুপমা ক্রমে হৃদয়ের স্নেহ দিয়া বুঝিলেন, পিতৃমাতৃহীন এই অনাথ বালিকাকে বুকে তুলিলে দেহমন অশুচি হয় না।

তারপর যামিনী নন্দ প্রভৃতি বিবিধ চরিত্রের সংঘাতে নানা ঘটনা পরম্পরায় উপন্যাসের গতি বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নন্দ নীচজাতির পুত্র; সে বি-এ পাশ করিয়া কোনো ভালো অফিসে চাকুরি পায় না কারণ, তার সঙ্গে এক ঘরে কেহ বসিতে চায় না! তার অবস্থা খুবই অস্বচ্ছল, কোনো মেসে তার প্রবেশ অধিকার নাই। অবশেষে নিরুপমার স্বামী পুরুষোত্তম তাকে চাকুরী দিলেন। নন্দ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তাঁর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। পুরুষোত্তম তাকে বলিলেন—এতে মহত্ব কিছুমাত্র নেই, নন্দবাবু। এ শুধু সামান্য কর্ত্তব্য পালন মাত্র। আপনি হিন্দু, আমিও হিন্দু। এই নন্দর সঙ্গে শেষে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। নন্দর চিত্ত কিন্তু কতকটা বিদ্রোহতপ্ত বাহিরে সে যে সঙ্কীর্ণতা, যে নীচতা দেখিয়াছে, মনুষ্যত্বকে পদে পদে দলিত করিবার যে প্রয়াস, তাহাতেই তার মন তাতিয়া ছিল। লক্ষ্মী এ দিকে পুরুষোত্তমের গৃহে যে শুচিতা যে শুদ্ধাচারের মধ্যে পালিতা, তাহাতে তার মনেও একটা কুণ্ঠা আপনা হতেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক বিধি-নিষেধ লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই তর্ক উঠিত। সে তর্ক গিয়া পুরুষোত্তমকেও স্পর্শ করিত। নন্দ বলে, 'ব্রাহ্মণ যদি এই অস্পৃশ্য জাতিকে বাড়বার অবকাশ দেয়, তাহলে হিন্দুসমাজ আরো বলশালী হয়'। সে বলে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ আমি করতে চাইনা। জগন্নাথ ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ হয়নি! অথচ সেখানে জাতিভেদের কঠোরতা নেই। জগবন্ধুর মন্দিরে বিভিন্ন বর্ণ যেরূপ প্রীতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষে আমি তাদের তেমনি মিলন চাই। জগন্নাথের মন্দির যদি সকলে প্রবেশ করতে পায়, অন্য মন্দিরে পাবেনা কেন? এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং এ দাবী উড়াইবার নয়! সম্প্রতি এই হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষেও এ দাবীর সার্থকতা ও মূল্য খুবই বুঝা গিয়াছে। উপন্যাসখানিতে বেশ সহজ উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বৃহত্তর ও নব্য হিন্দুসমাজের এই বাণীই ফুটিয়াছে, তার নির্ভীক ভঙ্গীর সহজ সুরে—যুক্তি ও সম্ভাবনার উপর ভর করিয়া! এ বাণী হিন্দুমাত্রকেইবৃহত্তর ও মহত্তর কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত করুক। যিনি সমাজের কথা একটুও চিন্তা করেন, হিন্দুজাতির গৌরবে গৌরব অনুভব করেন, হিন্দু-সমাজের যথার্থ কল্যাণ চান তাঁদের প্রত্যেককে এই উপন্যাস পড়িতে বলি।

নিগৃহীতা—শ্রীমতী বিজনবালা কর প্রণীত। কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, আর্য্য পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস। প্লট একান্ত ঘরোয়া। তার মধ্যে কোন রকম জটিলতা নাই—পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি, দরদ-মায়া লইয়াই এর পরিণতি। লেখিকার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সহজ, সরল, হৃদয়-গ্রাহী—একনিমেষে চিত্তকে স্পর্শ করে, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। মহামায়া, তারা, কিরণ, বরদাকান্ত, দেবেন, প্রবোধ, প্রকাশ, নিস্তারিণী, গৃহিণী, অমিয়া, কুলকুমারী, সুনীতি প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রই গোটা, জীবন্ত। বাঙলার ঘরে ঘরে বরদাকান্তের মত দরদী কর্ত্তা, গৃহিণীর মত সঙ্কীর্ণমনা নারী, মহামায়ার মত সেবা-পরায়ণা ভাইয়ের সংসারে আশ্রিতা বিধবা ভগ্নী ও তার নিগৃহীতা কন্যা তারার মত মেয়ে, প্রবোধের মত নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী যুবা, কিরণের মত হিংসুটে মেয়ের অভাব নাই! নিতান্ত ছোট খাট পারিবারিক ব্যাপারে এমনি দ্বন্দ্ব-বিরোধে কত গৃহ যে অশান্তিতে ভরিয়া আছে—নিত্য ছুটছুটির হাঙ্গামায় সে-সব যাঁদের চোখে পড়ে না, এ উপন্যাসখানি পাঠ করিলে নিমেষে সে সব হীন ব্যাপার তাঁদের কাছে সজীব হইয়া ধরা পড়িবে! এ সঙ্কীর্ণতা, এ হীনতা, পারিবারিক শান্তি-নীড় হইতে কবে দূর হইবে! বহিখানি পড়িয়া লেখিকার পর্য্যবেক্ষণ-

শক্তি ও মনস্তত্ব-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া প্রভূত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই সামাজিক সমস্যার যুগে, গৃহ-সমস্যা কত বড় হইয়া কত অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, সে কথা ভাবিয়া বুঝিবার মত কিন্তু আমরা উপন্যাসই পড়ি,—এ সমস্যার কথা চিন্তাও করি না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর আছে!

বহিখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল হইয়াছে। লেখিকার প্রতি অনুরোধ, রোমান্সের ঘনঘটার মধ্যে বিলাতী সমস্যার স্ফুলিঙ্গ না জাগাইয়া এমনি পারিবারিক আলেখ্যই তিনি আঁকিয়া তুলুন—এ ছবি আঁকিবার শক্তি তাঁর সামান্য নয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:*:—

ভ্রম সংশোধন—এই সংখ্যায় "বর্ষা-স্বপন কবিতার লেখক শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর স্থলে শ্রীতারাপদ মৈত্র হবে।

বিশ্বভারতী প্রেস—২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন

ভারতীর বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, (দোতালায়) ভারতীর হেড অফিস করা হইল। এ সময় হইতে ভারতী সংক্রান্ত চিঠি পত্র, ও যাবতীয় প্রবন্ধ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
"ভারতী।"

৫০ম বর্ষ | ১৩৩৩ | ভাদ্র

ভারতীয় মহাজাতি-সঙ্ঘ

উদ্বোধন *

—•—

যে দেশে মানুষ নাই সে দেশ মানুষের প্রেমে বা যত্নে নূতন করিয়া রচিত হয় না। স্বদেশ প্রীতির ধারায় না তার ভূমি সিঞ্চিত হয়; না তার দিগন্ত পরিশোভিত হয়। প্রকৃতির সৃষ্ট সে দেশ প্রকৃতিরই হাতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যে দেশে মানুষের বসতি হয়—মানুষের বুদ্ধির, হৃদয়ের ও হাতের ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গ বহন করে। গৃহের ভিতরখানি যেমন গৃহবাসীদের চরিত্রজ্ঞাপক দেশের বহিঃরূপটিও তেমনি দেশবাসীদের চরিত্রের প্রতিরূপ। সমষ্টিগতভাবে কোন্ দেশের লোক কতটা মনুষ্যত্ববান্ ও কতটা দেশ-প্রেমিক, দেশের চেহারাখানি তারই নির্ভুল নথি। যে দেশের লোক যত প্রেমিক বা যত কুশল সেই অনুপাতেই সে দেশ উর্ব্বর বা অনুর্ব্বর, সুন্দর অথবা কদর্য্য, স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর হইবে।

যদি দেশবাসী অলস হয় অধিকাংশ কৃষিভূমি পতিত হইয়াই পড়িয়া থাকিবে, যেখানে ফুল ফুটিতে বা ফল ফলিতে পারিত সেখানে শুধু আগাছাই বাড়িয়া উঠিবে; যদি তাহাদের মস্তিষ্ক মাদা হয়, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে মানবিক কৌশল পরাস্ত

* ভারতীয় মহাজাতি-সঙ্ঘের (Indian National Federation) প্রতিষ্ঠানিক অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

হইবে; যদি তাহারা দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তিশূন্য হয় তবে নিজের রাজ্যেই তাহাদের ক্রীতদাসের মত পড়িয়া থাকিতে হইবে। আর পর রাজ্য হইতে আগত বিদেশীরা তাহাদেরই শ্রমের ফলে পুষ্ট হইয়া তাহাদের মূক, লাঞ্ছিত পশুর মত অবজ্ঞা করিবে। কোন জাতিকে অপরাপর জাতির সহিত কাঁধে কাঁধে সমান উচ্চ হইয়া খাড়া থাকার জন্য, অন্যান্য জাতির অন্যায় অভিভব প্রতিরোধকল্পে, কিম্বা নিখিল-জাতিসভায় সম্মানের আসন দাবী করিতে হইলে—সে জাতিকে নিজেদের মধ্যে সত্যকারের মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইবে—শরীরে, হৃদয়ে, মস্তিষ্কে—বলে, তেজে ও উদ্যমে পূর্ণবিকশিত মানুষ—যাহাদের স্বদেশপ্রীতি অদম্য শক্তিতে পরিণত হইয়া নব নব কল্যাণকর কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিবে। জাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন তাই—মানুষ গড়া।

সুধীগণ বলিয়াছেন—

(১) ভৌগোলিক হিসাবে স্বতন্ত্র প্রত্যেক দেশ ক্রমশঃ একটি স্বতন্ত্র এক-জাতির সৃষ্টি করে।

(২) সে কখন? যখন নাকি সেই দেশবাসী সকলের হৃদয়ে এক-দেশীত্ববোধ একই স্বার্থজ্ঞান, একই অধিকার বুদ্ধি ও একই কর্ত্তব্যজ্ঞতা জাগ্রত হয়—তখনই সেই দেশের অধিবাসীরা এক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়।

(৩) যখন সেই জাগ্রতি একবার আসে তখন আর কুল, ধর্ম্ম বা ভাষার ভেদ তাহাদের এক-জাতিত্বের প্রতিবন্ধক রূপে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

(৪) জাতি হিসাবে জাতির তিনটি কর্ত্তব্য আছে—

(ক) নিজেদের অর্থনৈতিক মঙ্গলের সাধনা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা,

(খ) যে দেশের তাহারা বাসিন্দা সেই দেশের স্বাধীনতাসংরক্ষণ ও কায়িক শ্রীসম্পাদন করা,

(গ) এবং সেই দেশে উচ্চতর মানুষ বিকাশের বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকা।

এই কার্য্যক, ভৌগোলিক ও ক্রমোবিকাশিক (Technic, Geo-technic ও Evolutional) ত্রিবিধ জাতীয়-কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে জাতীয়তা বা জাতীয় ধর্ম্ম বলা যায়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্ম পদ্ধতিতে জাতির এই ত্রিকোণ উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। শিল্প ও বাণিজ্যগত দৃষ্টির দ্বারা জাতির আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ মানুষ গঠনের দ্বারা জাতির মধ্যে মানবতার উচ্চতর বিকাশের সহায়তা করাও কংগ্রেসের স্বরাজ-কার্য্যানুক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। জাতীয়তা-বুদ্ধিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ বিলীন করিতে হইবে। হিন্দুবংশধরের অতীত ভারত, মোস্‌লেম-পশ্চাৎদৃষ্টির হিন্দুস্থান, বা ইংরেজ-পূর্ব্ব

স্মৃতির ইষ্ট-ইণ্ডিসের অস্পষ্ট দৃশ্যপটগুলি পিছনে রাখিয়া. সম্মুখে নব আশা ও নব প্রচেষ্টার তাজা রঙে রঙীন, উজ্জল নূতন ভারতচিত্র সকলে মিলিয়া তুলিয়া ধর। নবযুগের নবমানবসমষ্টির মিলিতপ্রতিভার অপূর্ব্ব সৃষ্টি নব্যভারত উদ্ভাসিত হউক। মা কি ছিলেন তাহা জানি, কি আছেন তাহা দেখিতেছি—কি হবেন তাই গড়।

যদি তুমি হিন্দু হও—তবে এই বিশাল জাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দুত্বের সহিত জাতীয়তার বিরোধ দূর করিতে চেষ্টা কর।

যদি তুমি মুসলমান হও তবে স্বধর্ম্মীদের মধ্যে এমনভাবে কাজ কর যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে রাজনৈতিক ও নাগরিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখাতেই তাহাদের ভারতের বাসিন্দা হিসাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখের স্থায়িত্বও নির্ভর করিতেছে ; সে আদর্শ এই !—জন্ম ও ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যে কাহাকেও কোন বিশেষ অধিকারে অধিকারী না করা, বা কোন বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত না করা। ইহাতেই জাতিগত কল্যাণ। এই কল্যাণ খর্ব্ব করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের আপাতলাভে পরিণামে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে ভারতীয় ইহুদি, ক্রীশ্চান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আহ্বান করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব গোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তর মানব সৃষ্টিবিষয়ে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে—যেন তাঁহাদের ধর্ম্ম উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয়তার জন্য স্থান সংকুলান করিতে পারে। যেন ত্রিকর্ত্তব্যের সমষ্টি জাতীয়ধর্ম্মে ক্রমোবিকাশ বা বিবর্ত্তনমূলক তৃতীয় কর্ত্তব্যটি, জাতিদেহের প্রত্যেক সন্ধির ভিতর দিয়া পুষ্টি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং আমরা এমন একটি নূতন জাতি গড়িয়া তুলিতে পারি যাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতবাদ. বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানগত স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিবে না—জাতীয় আদর্শ প্রতিপালন ও জাতীয় মঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠাই সে জাতির সর্ব্বসমাদৃত গুণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নব্যভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাকে তাহাদের রুদ্ধ গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া জাতীয়তার সাহচর্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, যেন তাহারা আর জাতীয় উন্নতির পথে অন্তরায় না হইয়া তাহার সহায় হয়। শৃঙ্খলখানা শক্ত তখনই হইবে যখন তার প্রত্যেক গাঁটগুলি পোক্ত হইবে। অন্যথায় মুক্তি নাই।

গত সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে আবার যখন আমি সহসা বীরাষ্টমী উৎসবের জন্য সকলকে আহ্বান করি—তখন যে দ্রুত সাড়া পাই, তাহাতে প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গলার সজাগতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম যে, মৃত আচার ও অনুষ্ঠানের ভিতর নবপ্রাণসঞ্চারের বাসনা সকলের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে। তখনই

"বীরাষ্টমী" এই শব্দে ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যে শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে হেলায় না হারাইয়া,ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরিকল্পনায় প্রযুক্ত করিবার সংকল্প-গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ভারতের মুক্তির জন্য ভারতবাসী মাত্রকে এক নবপ্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দিত করিবার মানসে প্রস্তাব করিতেছি—মহাজাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং বীরাষ্টমী সমিতি সকল তাহার অন্তর্ভুক্ত হউক। সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে মহাসঙ্ঘের সভ্য সংগ্রহ করা হউক। ভারতবাসী প্রত্যেক যুবক, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী,—এক একখানি ইষ্টক দিয়া, এক এক মুঠা স্বভাবানুকুল সাহচর্য্য দিয়া এই জাতীয় মহামন্দির গড়িয়া তোল। শরীরের স্ফূর্ত্তি, অন্তরের রসগাঢ়তা ও বুদ্ধির বিকাশের দ্বারা নিজে মানুষ হইয়া দেশের কাজ কর। মনুষ্যত্বে পূর্ণবিকশিত সঙ্ঘবদ্ধ ভারতবাসী স্বাধীনতার পথে স্বতন্ত্রতার পথে অগ্রসর হও।

শ্রীসরলা দেবী।

আশ্রয়-ভিক্ষা

আমার এ বেদনারে হে দয়িত মোর,
লহ লহ তব বুকে। ঐ নয়ন-লোর—
অহরহ চক্ষু হ'তে যাহা ঝরে' পড়ে
গভীর অসহ দুখে বেদনার ভরে,
তা'রে রাখ' নিশিদিন আপনার করি';
পক্ষিণী যেমন রাখে শাবকেরে ধরি',—
আপন বুকের মাঝে কোমল শয্যায়
সুনিবিড় মাতৃস্নেহে আবরিয়া তায়!
হে প্রিয়, এ বেদনারে বেস' তুমি ভালো!
একদিন জীবনে এ দিয়েছিল আলো;
তারপরে অন্ধকারে ঢেকে গেল দিক্;
পথহারা, উদাসীন, উদ্‌ভ্রান্ত পথিক্
চিত্তের অসহ দুখে চাহিছে আশ্রয়।
তা'র ভার লহ তুমি, নাশ' তা'র ভয়!

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী।

বঙ্গের নৃ-তত্ত্বের অনুসন্ধান

:o:

মধ্যে মধ্যে একটা কথা উঠে যে "বাঙ্গালীরা" কি জাতি? এবং অনেক বঙ্গ-ভাষীয়দেরও বিশ্বাস হইয়াছে যে তাঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক সমূহ হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতি। নানা-কারণে একটা "বাঙ্গালী স্বদেশপ্রেমিকতা" বা "বাঙ্গালী স্বজাতি প্রেমিকতা" জাগিয়াছে। তাহা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রাজনীতিতে ও অর্থনীতিকক্ষেত্রে, মনেতে ও প্রত্যেক দিনের কথাবার্ত্তায় উৎকট-ভাব ধারণ করিয়া উঠিতেছে! এই জন্যই "বাঙ্গালী" কে ও তাহার উৎপত্তিই বা কিপ্রকারে হইল, তাহা একটি নৃ-তত্ত্ব ও জাতি-তত্ত্বের অনুসন্ধানের বস্তু।

এ বিষয়ের বিচারের পূর্ব্বেই আমাদের 'কতকগুলি পারিভাষিক গোলমাল মিটা-ইতে হইবে। বঙ্গভাষায় আমরা race, people, nation, caste প্রভৃতি ইউ-রোপীয় শব্দসমূহের অর্থ "জাতি" শব্দ দ্বারাই পরিপূরণ করি। এই ইউরোপীয় ভাষার শব্দসমূহের বাঙ্গলা পরিভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই। এই প্রত্যেক শব্দটির বিচার করিয়া দেখি যে race শব্দের পরি-ভাষা সংস্কৃত শব্দ "জাতি" বা ফার্শি "কৌমে" অনূদিত হইতে পারে না। যদি "কৌম" শব্দকে tribe শব্দের পরিভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয় এবং যাহা সত্য অর্থ, তাহা হইলে ইহা race শব্দের পরিচায়ক হইতে পারে না। Raceকে যদি "মূল-জীব জাতি" বলিয়া বঙ্গভাষায় অনূদিত করা হয়, তাহা হইলে হয়ত তাহার অর্থ ব্যক্ত হয়। কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্বে ও নৃ-তত্ত্বে race কথাটা অপ্রচলিত হইতেছে, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে Biotype শব্দ প্রযুজ্য হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে Biotype কাহাকে বলে? কোন একটি মানবজাতি সমষ্টির নৃ-তত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে ইহা দেখা যায় যে তাহা বিভিন্ন Biotypeএর সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ইংরেজ, জার্ম্মান, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষার লোকদের, তাহারা টিউটন বা লাটিন বা গ্রীক race প্রভৃতি না বলিয়া কোন্ কোন্ Biotype তাহাদের মধ্যে আছে তাহা আজকালকার বিবেচ্য। Biotype হইতেছে—একটি জাতির মধ্যে অবিনশ্বর ও বংশপরম্পরায় প্রকট শারীরিক লক্ষণের সমষ্টি বিশিষ্ট জীব। যদি একটি বিশিষ্ট লোকমণ্ডলী মধ্যে সকলেই এক বাহ্যিক আকৃতির লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একটি Biotypeএরই সন্ধান পাওয়া যায়, এবং সেই মণ্ডলী বিশুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত

হইবে। কিন্তু এ প্রকারের বিশুদ্ধতা জীবজগতে পাওয়া যায় না। এক লোক মণ্ডলী বা জাতি বিভিন্ন Biotypeর সমষ্টি। এই Biotypeকে "মূলজীবাকার" বলিয়া হয়ত অনুদিত করা যাইতে পারে। আর Phenotype হইতেছে মানবের সাক্ষাৎ আকৃতি (man as he looks)। তৎপর, people শব্দের পরিভাষা "জনসমূহ" বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়; আর nation শব্দ হইতেছে একটা জনসমূহের রাজ-নৈতিক—ঐতিহাসিক—চর্চ্চা প্রভৃতি সূত্রে সম্বন্ধতার পরিচায়ক। শেষে, বর্ত্তমানে caste শব্দকে প্রাচীন "বর্ণ" অর্থ দ্বারা পরিজ্ঞাত করা সমীচিন নহে। প্রাচীন কালে, উহার যে অর্থই থাকুক, বর্ত্তমানে caste কে "বর্ণ" অথবা "শ্রেণী" শব্দ দ্বারা অনুদিত করা যায় না; কিন্তু এস্থলে প্রকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের অভাবে "caste" শব্দ "বর্ণ" বলিয়া অনুদিত হইল। আশা-করি সাহিত্যিকগণ বিজাতীয় ভাষা সম্ভুত নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহের পরিভাষা বাঙ্গলায় সঙ্কলন করিয়া আমাদের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

"বাঙ্গালী" জনসমূহের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে হইলে আমাদের শারীরিক নৃ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শারীরিক নৃ-তত্ত্বের অনুসন্ধানের ফলে বঙ্গভাষার লোক সমষ্টির মধ্যে কি প্রকারের মূলজীবাকার (Bio-type) আছে, তাহার নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়। জাতি-তত্ত্ব দ্বারা বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহারে, রীতি নীতিতে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানেতে, কোন কোন মূল জীব-জাতীর কিংবা জনসমূহের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিরূপিত হয়। তৎপরে, ভাষা-তত্ত্বের দ্বারা বঙ্গীয় ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া কোন কোন মূলজীব জাতি কিংবা জন সমূহের ভাষা আমাদের মাতৃ ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে পারি।

বঙ্গভাষীদের নৃ-তত্ত্বের বিষয়ে (সে বিষয়ে সমগ্র ভারতেরই কথা উল্লেখ করা যায়) বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই; এবং যেটুকু করা হইয়াছে তাহার উপর একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালীর নৃ-তত্ত্বের অনু-সন্ধান নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের ও সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে যথা—হারবার্ট রিসলী, রায় বাহাদুর গুপ্তে, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ, B. Davis যিনি তাঁহার "The saurum Craniorum" পুস্তকে কতকগুলি বাঙালী মাথার খুলির (skull) মাপযোপ দিয়াছেন, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Studends' welfare committee, হইতে গৃহিত ছাত্রদের মাথার মাপ। ইহাই হইল বর্ত্তমানে বাঙালীর শারীরিক নৃ-তত্ত্বের ভিত্তি (data)

এদেশে শিক্ষিত লোকে বাঙালীর উৎপত্তি সংক্রান্ত রিসলীর অভিমতই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীরা "মঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়" মিশ্রিত জাতি!, আর সাধারণ লোকে এইটি একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া চারিদিকে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে, যেটুকু নৃ-তত্ত্বীক উপকরণ আমাদের হস্তে আছে, তাহা দ্বারা আমরা একটা স্থায়ী ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বৈজ্ঞানিক মত ব্যক্ত করিতে পারি না।

বাঙ্গালীর উৎপত্তির কথার বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে হইবে বাঙ্গালী কে? এ প্রশ্নের সামাজিক অর্থাদি বাদ দিয়া এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যিনি বঙ্গভাষায় কথা বার্ত্তা কহেন ও পুরুষানুক্রমে বঙ্গ প্রদেশে বসবাস করেন, তিনিই বাঙ্গালী। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই বাঙ্গালীকে কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গ প্রদেশ উত্তর ভারতের অন্তর্গত, এবং মনুর মতানুসারে ইহা আর্য্যাবর্ত্তের ভিতরে। এই আর্য্যাবর্ত্তবাসী বাঙ্গালীকে আমরা ভাষায়, আচারে, রীতিনীতিতে, ধর্ম্মে, জনশ্রুতিতে আর্য্য সভ্যতারই অন্তর্গত দেখি। এইজন্য সভ্যতা হিসাবে বাঙ্গালী আর্য্য। আর ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উত্তর পুরুষেরাও এই আর্য্য সভ্যতার অন্তর্গত ছিলেন। এই হেতু সকলকেই আর্য্য বলা যায়। কিন্তু আর্য্য বলিলেই আবার অনেক গোলমালের কথা উঠে। "আর্য্য" কে, তাহার স্বরূপ কি, তাহার বাসস্থান কোথায় ছিল, ইহা লইয়া বিশেষ বিসংবাদ আছে এবং সে কলহ এখনও মিটে নাই। তবে এস্থলে সে কলহের অবতারণা না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আজকালকার নৃ-তত্ত্বীকেরা "আর্য্য" বলিলে কোন একটা মূলজাতি (race) বুঝেন না। তাঁহারা বলেন "আর্য্য" একটা ভাষার নাম যাহাকে Indo-European বা Indo-German ভাষা বলে।

এ হেন বাঙ্গালীর মূল নির্ণয় করিতে যাইলে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রথমতঃ জাতি-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। জাতি-তত্ত্বের আলোচনার বিষয় হইতেছে, একটি লোক সমষ্টি বা জাতির প্রাচীনকালের আচার ব্যবহার, বেশভূষা, রীতিনীতি, তৈজস পত্রাদি, ধর্ম্মজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। এ বিষয়ে প্রাচীন বাঙ্গলার জাতি-তত্ত্বের অনুসন্ধানের ফলে কি দেখা যায়? বাঙ্গলার জাতি-তত্ত্বের এবং সে বিষয়ে সমগ্র ভারত খণ্ডের জাতি-তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হয় নাই; ভারতের Ethnography সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে কিন্তু Ethnologyর কার্য্য বিশদ ভাবে এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষীয়দের আচার ব্যবহার,

রীতি, অনুষ্ঠানাদি, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিয়া কি প্রকারের প্রভাব তাঁহাদের জীবনে আধিপত্য করিয়াছে এবং তাহার উৎপত্তির মূল কি, এ বিষয়ের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এখনও করা হয় নাই। বাঙ্গলা প্রদেশের বিষয়ও তদ্রূপ। মোটামুটিভাবে বলিতে যাইলে ইহা অসঙ্গত বলা হইবে না যে জাতি-তত্ত্ব হিসাবে বাঙ্গলা প্রদেশ ভারতের এক অংশ। এই ভারতীয় জাতি-তত্ত্বের ভিতরে কতটা আর্য্যভাবীদের প্রভাব বিরাজ করিতেছে আর কতটা বা অনার্য্যদের তাহার বিশ্লেষণের ফল কোথায়? বাঙ্গলা সভ্যতা কতটা আর্য্যের এবং কতটা অনার্য্যের নিকট ঋণী তাহার নিরাকরণ কোথায় হইয়াছে? জাতি-তত্ত্ব বলে যে মানবসমাজ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে যথা:—পিতার কর্তৃত্ব (patriarchate), মাতার কর্তৃত্ব (matri-archate), বহুপত্নীত্ব (polygamy), বহুস্বামীত্ব (polyandry), অবিবাহিতদের বিভিন্ন সমাজ ও বাসস্থান (bachelor's society and sleeping house), Totemism, Preanimism, (জন্তুপূজা) animism, যাদু (magic) রোজা বা ভূতুড়েবাদ (shamamism) প্রভৃতি। অবশ্য কোন একটি বিশিষ্ট লোক সমষ্টি বা জাতি এই সব গুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই। তবে মাতার কর্তৃত্ব, বহুপত্নীত্ব, বহুস্বামীত্ব, অবিবাহিতদের শয়নাগার, Totemism, -জন্তুপূজা, ম্যাজিকরূপ ধর্ম্ম, ভূতুড়েবাদ ভারতে স্থান বিশেষে ও কাল বিশেষে অজ্ঞাত নাই। আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ করিলে এই সকলের কতকগুলিকে আজ পর্য্যন্ত বিরাজমান দেখিব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই স্থলে উল্লেখ্য বাঙ্গলার সভ্যতাকে আমরা আর্য্য সভ্যতা বলি ও হিন্দুদের ধর্ম্মকে বেদ প্রসূত আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু বাঙ্গলায় নিম্নস্তরের ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে গাছপুজা মাকাল পুজা, শীতলা পুজা, মনসা পুজা, স্থানবিশেষে জন্তুপূজা, মারণ, বশীকরণ, বাণ মারা, ডাইনি খাওয়া, রোজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি কোথা হইতে আসিল? এসব মধ্যে আমরা preanimism, animism, magic, shamamism প্রভৃতির নিদর্শণ পাইতেছি। এক্ষণে বিচার্য্য, এই গুলি বৈদিক অতএব আর্য্য প্রভাবের, বা অনার্য্য প্রভাবের ফলস্বরূপ যাহা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা আর্য্যীভূত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সভ্যতায় অন্তঃসলিলারূপে বাহিত হইতেছে বলিয়া গণ্য করিব, এ প্রশ্নের নিরাকরণ কোথায় হইয়াছে?

তৎপর, যাঁহারা বাঙ্গালীকে "মঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়" জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণের ফলে বর্ণসঙ্কর জাতি বলেন, তাঁহারা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি তথাকথিত মঙ্গোলিয় জাতিদের মধ্যে প্রচলিত তাহার কিছু নিদর্শন বাঙ্গালীর সমাজে আবিষ্কার

করিতে বাধ্য ; কারণ Bastien আসামে bachelor's sleeping house পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতে পাইয়াছেন, আর ভিব্বতে বহুস্বামীত্ব বিরাজমান, অন্যদিকে দ্রাবিড় ভাষীদের মধ্যে মালাবারে কাল পর্য্যন্ত বহুস্বামীত্ব ছিল এবং matriarchate আজ পর্য্যন্ত আছে। তদ্ব্যতীত অসভ্য দ্রাবিড়ী ভাষীয়দের মধ্যে Totemism আছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে বা জনশ্রুতিতে বহুপত্নীত্ব ব্যতীত এই সবগুলির কোন চিহ্ন নাই!

আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইবে যথা, বাঙ্গালী হিন্দুর "গোত্র"রূপ অনুষ্ঠান। আর্য্যভাষী হিন্দুদের মানব গোত্র ; অর্থাৎ যাহার যে গোত্র সে সেই ব্যক্তির বংশধর। অন্যদিকে সমাজতত্ত্ববিদ্ ও জাতি-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে অনার্য্য জাতিদের মানব গোত্র নহে। তাহাদের গোত্র হইতেছে একটি জন্তু যাহা তাহাদের Totem অর্থাৎ তাহারা বলে যে তাহাদের গোষ্ঠী বা tribe এইরূপ এক একটি জন্তুর সন্তান সন্ততি। এই Totemকে তাহারা পূর্ব্বপুরুষ বলে বলিয়া সেই জন্তুর মাংস খায় না। দক্ষিণ ভারতের অনেক জাতির এবম্প্রকারে নাকি Totem গোত্র। আর যে সব জাতিদের Totem গোত্র, জাতি-তত্ত্ববিদেরা তাহাদের অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়াই সন্দেহ করেন। বাঙ্গলার এই অনুষ্ঠানের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায়, যে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজভুক্ত জাতি সমূহ মধ্যে Totemism নাই, তাহাদের সব মানব গোত্র। এই সব কারণে দেখি সভ্যতা হিসাবে বাঙ্গলার লোকের প্রতিষ্ঠানাদি "আর্য্য" এবং বাঙ্গালীর ক্রমবিকাশ ভারতীয় আর্য্যের ক্রমবিকাশ পৃথক নহে।

এবম্প্রকারে বাঙ্গলার জাতি-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে গিয়া দেখি যে এবিষয়ে বাঙ্গলা নিখিল ভারতের অন্তর্গত ; এবং আমাদের সভ্যতার মধ্যে আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্বের ব্যবধান কোথায় তাহা এখনও বিশিষ্ট রূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেই জন্য জাতি-তত্ত্ব দিয়া কোন্ কোন্ মূল জাতির উপাদানের দ্বারা "বাঙ্গালী জাতি" সংগঠিত তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারিল না।

তৎপরে ভাষা-তত্ত্বের কথা আসে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত মূলক, কিন্তু ভাষা তত্ত্ববিদেরা বলেন যে ইহাতে সংস্কৃত ব্যঞ্জন বর্ণের কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ ব্যতিক্রম হইয়াছে ; এবং অনেক অনার্য্য মূলক শব্দও নাকি ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? ইহাতে ইহা নির্দ্দেশ করে যে বাঙ্গলায় আর্য্যভাষীদের সহিত অনার্য্য-ভাষীদের সম্মর্ষণ লাভ হইয়াছিল এবং উভয় ভাষীদের সংঘর্ষণের ফলে সংস্কৃত মূলক ভাষা বাঙ্গলায় পরিণত হয়। কিন্তু সংস্কৃত মূলক অন্য ভাষাতেও এবম্প্রকারের সংঘর্ষণের চিহ্ন নাকি দেখিতে পাওয়া যায়।

এবং এই সংঘর্ষণকারীদের জাতীয় স্বরূপ কি তাহা জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আর্য্যভাষীরা ভারতে প্রবেশ কালে অনার্য্যদের সাক্ষাৎ লাভ করেন, এবং সংঘর্ষণও উপস্থিত হয়। সেই জন্য আর্য্য-ভাষীরা যখন বাঙ্গলায় পদার্পণ করেন তখন তাঁহাদের মূলজাতীয় হইতে কতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং স্থানীয় মূল জাতিরও স্বরূপ কি ছিল তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। ভাষা হইতেছে সভ্যতার একটি অনুষ্ঠান, তাহা একটি জাতি হইতে অন্য জাতি দ্বারা গৃহিত হইতে পারে। কিন্তু ভাষার ঐক্যতার দ্বারা মূল জীব জাতির ঐক্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভাষাতত্ত্ব বিদেরা বলেন যে একটা জাতি কখনও আর একটা জাতির ভাষা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না; তাহাকে তাহারা নিজেদের মানসিক সংস্কারানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিবে। ইহা সত্য হইলে কোন কোন মূল জাতির নিদর্শন বাঙ্গলাভাষায় দেখিতে পাই তাহা বর্ত্তমানের বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের অবস্থায় সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী যদি মঙ্গোলো দ্রাবিড়ীয়দের বর্ণ সাঙ্কর্য্যে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে উভয় জাতির ভাষার অন্ততঃ কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিশ্চয়ই বঙ্গ ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভাষা-তত্ত্ববিদেরা এবিষয়ে কি বলেন ?

শেষে শারীরিক নৃ-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখা যাউক। বাঙ্গলায় এ বিষয়ের প্রধান হোতা হইতেছেন রিশলী। তিনি যে সব বাঙ্গলার জাতি সমূহের শারীরিক মাপযোগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার "Tribes and castes of Bengal" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভিত্তি (data) absolute নহে, বাঙ্গলার গোটাকতক বর্ণের (caste) মাপ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহাদের তিনি বেশী মাপিয়া ছিলেন তাহাদের সংখ্যা একশতের বেশী যায় নাই। তৎপরে এই subjectদের যথাবিহিত বিভাগ করা হয় নাই যথা:—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রকারের ব্রাহ্মণই মিশ্রিত করা হইয়াছে, এমন কি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের তালিকায় তিনি "পাণ্ডে" নামক এক ব্যক্তিকে গণ্য করিয়াছেন এবম্প্রকারের পদ্ধতি ভারতে সমীচিন নহে, কারণ ভারতের জন সমূহ homogeneous নহে। শেষে তাঁহার বাঙ্গালীর তালিকায় অনেক উচ্চ বর্ণ সমূহের মাপ উল্লিখিত নাই, অন্যদিকে ইহার মধ্যে তিনি পাহাড়ি, মাল পাহাড়ি নামক বর্ণ দ্বয়কে গণ্য করিয়াছেন। এবম্প্রকারে বাঙ্গালী বর্ণদের একত্রিত করিয়া তিনি তাঁহার "Bengal Proper এর average index করিয়াছেন। এই বর্ণ সমূহ মধ্যে মাথা ও নাকের indices এর তারতম্য দেখিয়াই বোধ হয় দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় মূল জাতিদ্বয়ের বর্ণ সাঙ্কর্য্যে

বাঙ্গালী সমুদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পূর্ব্বে, average indices এর দ্বারা কল্পিত জীবাকার (type) নিরূপিত করা নৃ-তত্ত্বীকদের পদ্ধতি ছিল, কিন্তু আজকাল জীবতত্ত্বের ও নৃ-তত্ত্বের Biometric অঙ্কশাস্ত্র প্রয়োগ হইতেছে। ইহাদ্বারা কোন' একটি বিশিষ্ট জীব সমষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্যে বিভিন্ন মূল জাতীয় উপাদান (different racial elements) নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তৎপরে একটি সমষ্টির বিশ্লেষণের ফলের তুলনা করিয়া সেই স্থানের সাধারণ মূলজীবাকার নিরূপিত হয়। Average index দ্বারা একটি সমষ্টি মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান (element) আছে তাহা নিরূপিত হয় না। সেইজন্য আমরা যদি বর্ত্তমানের নৃ-তত্ত্বের biometric অঙ্ক শাস্ত্রানুসারের বিশ্লেষণ রীতি বাঙ্গলার নৃ-তত্ত্বীয় dataতে প্রয়োগ করি তাহাতে কি ফল পাই তাহা দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি রিসলীর "Anthropological Data of Beluchistan" "Tribes and castes of Bengal" নামক পুস্তকে যে সব data আছে তাহার একটি biometric বিশ্লেষণ করিয়াছি, তন্মধ্যে বঙ্গ প্রদেশের যতগুলি জাতির data আমি বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহার কতকটা ফল এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

নৃ-তত্ত্বীকেরা বলেন যে মানবের মাথার ও নাকের গঠন পুরুষানুক্রমিক অবর্ত্তনীয়। এক লোকসমষ্টির জাতীয় উৎপত্তির ইহা বিশেষ নিদর্শন। এইজন্য তাঁহারা মাথার ও নাকের indicesএর উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন। এই তথ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমি রিসলীর data মাত্র গ্রহণ করিয়া মাথার ও নাকের indices এর একটা সম্বন্ধ (correlation) দেখি। প্রথমে দেখি যে মাথার মাপ dolichoid (dolicocephal ও mesocephal) এবং Brachycephal এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তৎপর, এই মাথার আকৃতিগুলি কিপ্রকারের নাকের আকৃতির সহিত correlate (সম্বন্ধস্থাপন) করিতেছে তাহা দেখি। ইহার ফলে, আমি যে জাতিগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাদের correlation এর একটা বিশ্লেষণ করি ও তাহা percentage এ কষি যথা—

ব্রাহ্মণ

লম্বামাথা সরুনাক—২৯.০%
(Dolichoid—leptorrhine)
লম্বা মাথা মধ্যমাকৃতি নাক—৪০.০%
(Dolichoid mesorrhine)
লম্বা মাথা চওড়া নাক—২.০%

৭১.০%

গোলমাথা—সরু নাক—১৩.০%
(Brachycephal leptorrhine)
গোল মাথা মধ্যমাকৃতি নাক—১৫.০%
(Brachycephal mesorrhine)
গোলমাথা চওড়া নাক—১.০%
(Brachycephal chamoerstive)
—২৯.u%

৭১.০
২৯.০ —১০০.০%

১০০.০

কায়স্থ

ল—স—৩০.০%	গো—স—১৭.০%
ল—ম—৩৮.০%	গো—ম—১৪.০%
ল—চ—১.০%	গো—চ—০
৬৯.০%	৩১.%=১০০.০%

গোয়ালা

ল—স—১৯.৫%	গো—স—৫.০%
ল—ম—৫৮.৫%	গো—ম—৭.৩%
ল—চ—৭.০%	গো—চ—২.৪%
৮৫.০%	১৪.৭% =১০০.০%

কৈবর্ত্ত

ল—স—১১.০%	গো—স—২.০%
ল—ম—৫৪.০%	গো—ম—১৪.%
ল—চ—১১.০%	গো—চ—৮.০%
৭৬.%	২৪ % =১০.০%

চণ্ডাল

ল—স—১৫.০%	গো—স—১২.০%
ল—ম—৫১.০%	গো—ম—১০.০%
ল—চ—৯.০%	গো—চ—৩.০%
৭৫%	২৫.০% =১০০.০%

সৎগোপ

ল—স—২৭.০৮%	গো—স—৪.১৬%
ল—ম—৪৫.৮৩%	গো—ম—১৪.৫৭%
ল—চ—৬.২৫%	গো—চ—২০.৮%
৭৯.১৬%	২০.৮১ =১০০.০%

এই বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা লম্বামাথা-মধ্যমাকৃতি (Dolichoid mesorrhine) সমষ্টিকে সর্ব্বজাতি মধ্যে বৃহদাকারে দেখিতে পাই। ইহাতে সর্ব্বজাতি মধ্যে dolichoid

(লম্বাকৃতি) মাথার মাপকে সর্ব্বত্র বেশী পরিমাণে দেখি। আবার অন্য দিকে mesorrhin (মধ্যমাকৃত) নাককে বেশী পরিমাণে বিরাজমান দেখি, তাহার নিয়ে leptorrhin (সরু) নাকের পরিমান দেখি এবং chamoerrhin (চওড়া) নাকের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম দেখি যথাঃ—

ল (lep)	ম (meso)	চ (cha)
ব্রাহ্মণ—৪২.০%	৫৫.%	৩.%=১০০.%
কায়স্থ—৪৭.%	৫২.%	১.%=১০০.%
গোয়ালা—২৪ ৫%	৬৫.৮%	৯ ৪%=৯৯.%=১০০%
কৈবর্ত্ত—১৩.%	৬৮%	১৯.%=১০০.০%
চণ্ডাল—২৭.%	৬১.%	১২.% ॥ ১০০%
সৎগোপ—৩১.২০%	৬০.৪০%	৮০.৩=১০০.%

ইহা ব্যতীত "ছোটনাগপুর ও পশ্চিম বঙ্গ" নামক তালিকায় যে মাথার indices রিসলী দিয়াছেন তাহাদের পর্য্যায় ৭২.৪—৭৬.০ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইহারা সব লম্বাকৃতি মস্তকের গঠন বিশিষ্ট ; আর নাকের indices পর্য্যায় ৭৯.১—৯৫.৯ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে মধ্যমাকৃতি নাক ও চওড়া নাক উভয়েই আছে। কিন্তু তালিকা দৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে এই স্থলের পরীক্ষিত বর্ণসমূহ বেশীর ভাগই ছোট-নাগপুরের আদিম অধীবাসীরা। ইহারা বেশীর ভাগই Dolichoid—Chamoe-rrhin (লম্বামাথা—চওড়া নাসা) লক্ষণা-ক্রান্ত। খাঁটি বাঙ্গালায় রাজবংশীয় জাতীর যে কয়টিকে মাপ করা হইয়াছিল তাহারা "Bengal proper"এর তালিকায় এক-মাত্র brachycephal (গোলমাথা)। ইহাদের মাথার indices ৮৩.৩ এবং নাকের indices ৭৬.৬। এই হিসাবে ইহাদের brachycephal-mesorrhin element বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে এই উপাদান অন্যান্য বর্ণেও যৎকিঞ্চিৎ ভাবে বর্ত্তমান।

এক্ষণে বিচার্য্য বাঙ্গালীর "মঙ্গোলো দ্রাবিড়ীয়" উৎপত্তির গল্প। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মঙ্গোল ও দ্রাবিড় কাহাদের বলে? "মঙ্গোল" শব্দে যদি পূর্ব্ব এসিয়ার অধিবাসী সমূহকে বুঝা যায়, আর তথাকার লোকদের brachycephal-mesorrhin বলিয়া ধরা যায় আর যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে brachy-cephal element (গোলাকার মস্তক উপাদান) পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে তাহা

হইলে উপরোক্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে গোলাকৃতি মস্তক এই dataর মধ্যে বহু পরিমাণে কম, এবং ইহার মধ্যে brachycephal mesorrhin (গোল-মাথা-মধ্যমাকৃত নাক) ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১৫.% ব্রাহ্মণদের মধ্যে রহিয়াছে, এবং গোয়ালাদের মধ্যে ৭.% অতি কম সংখ্যায় রহিয়াছে! আর brachycephal chamoerrhin (গোলমাথা-চওড়ানাক) কৈবর্ত্তে ঊর্দ্ধে ৮.% সংখ্যায় রহিয়াছে! ইহাতে দেখা যায় যে কল্পিত পূর্ব্ব এসিয়ার লক্ষণ বাঙ্গালীর মধ্যে কম। ইহার মধ্যে আবার আর একটি বিশেষ কথা বিবেচ্য। পূর্ব্ব এসিয়ার লোক হইলেই যে গোলাকৃত মস্তক হইবে তাহার কথা নাই! জাপানের Koganci ও অন্যান্য নৃ-তত্বীকেরা চীনে mesocephal element (মধ্যমাকৃত মস্তকের গঠন) বাহির করিয়াছেন, Heddon ও চীনাদের mesocephal বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন আর untrodden fields of anthropologyর গ্রন্থকার আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে অনেক dolicho cephal বাহির করিয়াছেন।

আবার যদি এই গোলাকার মস্তক উপাদান বঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে আগত বলিয়া গণ্য করা যায় তাহা হইলে রিসলীর মাপানুসারে আমরা দেখি যে চট্টগ্রামের পর্ব্বতের লোকদের মাথার average index তিনি ৭৯.৯% দিতেছেন। এবং নাকের index ৮২.৭%। এতদ্বারা এই সমষ্টি dolichoid mesorrhin বিভাগে গণ্য হয়। আর দার্জ্জিলিং পাহাড়ের লোকদের মাথার index ৮০.৭% নাকের index ৭৪.৭। এতদ্বারা ইহারাও Mesocephal mesorrhin element 'বলিয়া' গণ্য হয়! কিন্তু indices এর ঐক্যতাতে মূলজীব জাতির ঐক্যতা স্থাপিত হয় না। শরীরের ও মস্তকের অন্যান্য অংশের ঐক্যতা স্থাপনের প্রয়োজন।

আবার ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমানা ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমে নিরীক্ষণ করিলে দেখি, রিসলী তাঁহার বেলুচিস্থানের বেশীরভাগ জাতি সমূহের average indices brachycephal বলিয়া দিয়াছেন এবং ভারতের ভিতরে, পাঞ্জাব রাজপুতনায় এগারটি জাতির মধ্যে ৮-৯ টিকে brachycephal (গোলমাথা) বলিয়া লক্ষণাকৃত করিয়াছেন! ইহাদের মধ্যে অনেকের মধ্যমাকৃতি নাকের গঠন (mesorrhine) ও আছে। সেই জন্য কথা উঠিতে পারে যে বাঙ্গলার গোলাকৃতি মস্তক-মধ্যমাকৃতি নাসার সহিত পশ্চিমের কোন যোগাযোগ সম্ভব কি না।

তৎপরে, প্রশ্ন এই যে দ্রাবিড় কাহাদের বলে ও তাহাদের লক্ষণ কি? রিসলীর data অনুসারে দক্ষিণের বেশীর ভাগ লোক dolichoid mesorrhine, আর তথা কথিত নিম্নশ্রেণীর কতিপয় জাতি

সমূহ dolichoid chamoerrhin (লম্বা-মাথা-চওড়া নাক)। তদ্ব্যতীত, রিসলীর Peoples of India নামক পুস্তকে যে সব উত্তর দক্ষিণ ভারতের জাতি সমূহের average indices দেওয়া আছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে গুটি কতক জাতি ব্যতীত ভারতীয় বেশীর ভাগ জাতি mesorrhin! আর তাহারা মাথার মাপ বিষয়ে dolichoid অর্থাৎ dolicho-cephal ও mesorrhin ইহা হইতে আমরা দেখি যে ভারতের বেশীর ভাগ লোকই dolichoid mesorrhin। ইহাতেই বোধগম্য করা যায় যে বাঙ্গলার এই dolichoid mesorrhin উপাদান যাহা এ প্রদেশের সর্ব্ব জাতিতে বেশী পরিমানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কোথা হইতে আসিল। আর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে chamoerrlin element দক্ষিণে আছে এবং উত্তরে ছোটনাগ-পুরের জাতি সমূহ মধ্যে সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া ও মালী বা আসল পাহাড়িয়া যাহাদের রিসলী বাঙ্গালীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও এই উপাদান রহিয়াছে। আবার দক্ষিনে এবং মধ্য ভারতে এই দুই উপাদানই দ্রাবিড় ভাষা কহে। সেই জন্য প্রশ্ন উঠে যে দ্রাবিড় কাহাদের বলে, ইহাদের মধে কাহারা দ্রাবিড় বলিয়া গণ্য হইবে?

উত্তর ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহে বিভিন্ন উপাদান কি ভাবে আছে তাহা জানিবার জন্য আমি রিসলীর dataর কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিয়াছি এবং তাহাতে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রীর মধ্যে dolichoid mesorrhin (লম্বামাথা মধ্যম নাক) ৭০.০%, dolichoid chamoerrhin (লম্বামাথা-চওড়ানাক) ৫.০% শিখ জাঠদের মধ্যে লম্বামাথা-মধ্যমাকৃতি নাসা ৪.%, লম্বামাথা-চওড়ানাসা ১. ২৫%, চুড়ার মধ্যে লম্বামাথা—মধ্যমাকৃতনাসা ৬৪.০% ল—চ ৪.০%। ইহাতে বোধগম্য হয় যে শিখজাঠ ব্যতীত অন্য জাতি সমূহে লম্ব.মাথা-মধ্যমাকৃত নাসার সমষ্টি প্রবল ভাবে বিরাজমান। বারান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

পথের সাথী

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

———○———

মলয়াদের পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, দ্বিতীয় বিভাগেরও অনেকখানি নীচে তাহার স্থান হইয়াছে, আর শ্রীমতী করবী দেবীর নামটা প্রথম বিভাগের খুব উপরের দিকেই ছাপা হইয়া গিয়াছে! এটা দেখিয়া মনে মনে সে যেন ঈষৎ একটু বিস্ময়ানুভব না করিয়া পারিল না। এই পরীক্ষার জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টাই করিয়াছে, একটুও কিছু ত্রুটী সে করে নাই, অথচ সে অত নীচু হইয়া পাশ করিল, আর যে রুবি পড়ার বই কদাচিৎ ছুঁইত, সে হইল সসম্মানে উত্তীর্ণ! কিন্তু ইহার জন্য সে একটুও দুঃখিত বা ঈর্ষান্বিত হইল না, রুবি যে কত বড় শক্তিময়ী সে কথা সে ভাল করিয়াই জানিত। তদ্ভিন্ন নিজের ক্ষতিতে ব্যথিত হইতে পারে, কিন্তু পরের ভালয় দুঃখিত হইবার মত মেয়ে সে মোটেই নয়। বরং সে ভাল না হোক, তবু যে রুবি হইয়াছে ইহাতেও সে অনেক খানি সুখী হইল।

রুবির কিন্তু কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। সে তখন এখানকার মেয়ে স্কুলের আগতপ্রায় প্রাইজ-দিনের জন্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের অনুরোধে তাদের লইয়া মাতিয়া বেড়াইতেছিল। অলকা, অপরাজিতা, কাঞ্চনমালা, সরস্বতী, ঊষা, কালী, যোগমায়া ও সুরেশ্বরীকে মহোৎসাহে "জনগণ মন-অধিনায়ক, জয়হে,—

ভারত ভাগ্য বিধাতা!"

ইত্যাদি গাহিতে শিখাইতেছিল এবং ইহার কোরাসে "জয়হে জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় জয়হে—ইত্যাদিতে আরও প্রায় জন পনেরো মেয়েকে যোগ দেওয়াইয়া, তাদের লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বাইশ জন মেয়ের গলা প্রায় বাইশ ভুবনে পৌঁছিতেছিল। চিৎকারটাই খুব ভাল রকম জমিতেছিল, কিন্তু সঙ্গীতের অংশটাতেই ঐ জিনিষটার বদলে জমা হইতেছিল কোলাহল। রুবি বেচারা এই দলটাকে লইয়া মহা বিপদেই পড়িয়াছিল। তার ইচ্ছা ছিল, এত বড় একটা দলকে সামলানার বৃথা চেষ্টা না করিয়া জন পাঁচ ছয় মাত্র বাছাই করা মেয়ে লইয়া সে এই গানটী শেখায়, কিন্তু সে ইচ্ছাটা প্রকাশ করা মাত্রে স্কুলময় এম্‌নি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া উঠিল, যে নালিস ফরিয়াদের জ্বালায় জ্বালায় অস্থির অতিষ্ঠ

হইয়া উঠিয়া হেড মিষ্ট্রেস স্বয়ং রুবিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি একটি মেয়েকে গান গাইবার জন্তে নিলে রুবি ! এদিকে মেয়েরা এবং মেয়ের মা'রা, এমন কি কোথাও কোথাও দু একজন বাপরা শুদ্ধ এর জন্ম আমার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। সাধারণের স্কুলে সকল মেয়েই কেন সমান ভাবে তাদের গুণপনা দেখাবার অধিকার পাবে না ?' ইত্যাদি সে অনেক কথা ! এর মধ্যে আবার নাকি সুন্দর চেহারা দেখেও বড় মানুষদের মেয়ে দেখে দেখে বাছাই করাও হয়েছে ! যাকগে এখন যত কটাকে পারো, যারাই যোগ দিতে চায়, ওর মধ্যে টেনে নিয়ে নাও, আমার প্রাণটা বাঁচুক।"

অগত্যাই রুবি এই মহাভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকের স্বাতন্ত্রিকতার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর আবার ছোট রকম একটা অ্যাকৃটিং শেখানোর ভারও সে লইয়াছিল। জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিবেন, তাই মেয়েদের দিয়া অভিনয় করানো হইবে, ইহারও অনেকখানিই ভার পড়িয়াছিল রুবির ঘাড়ে। যে ঘাড় পাতিয়া লয়, তাহারই উপর ভারটা গিয়া চৌচাপটে পড়ে, এ বিধান সর্ব্বত্রই আছে। রুবিরও এ সকল খাটুনীতে আলস্য ছিল না। তবে মুস্কিল বাধিয়াছিল এই যে মেয়েগুলির সখের অনুপাতে তাদের অভিনয় শক্তির ও কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট অভাব, অথচ তারা সেটা একেবারেই বুঝিতে চাহে না। ইহার সহিত "পথভোলা পথিকে"র অভিনয়টাকেও জুড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। সব মেয়েই চায় যে সে-ই "করবী" "মঞ্জরী" ইত্যাদি সাজে, অথচ মোটে এক একটা করিয়া মাত্র দুটা পাচকের দরকার ! কাজেই রুবি ভাবিয়া পায় না যে, সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে " জয় জয় জয় জয় জয়হে''র মতন ইহাতেও থলো থলো আমের মঞ্জরী এবং মালতি-মাধবীর-করবীর গুচ্ছ তৈরি করিয়া দিলে চলে কিনা ? "পথভোলা পথিক" সাজিয়াছিল তৃপ্তি। সে একটী শান্ত স্বভাব ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ শ্রীযুক্তা ফার্ষ্ট ক্লাসের মেয়ে। মেয়েটী এই প্রস্তাব শুনিয়াই তো ভয়ে আৎকাইয়া উঠিল। সভয়ে সে বলিয়া উঠিল—"তাহলে আমি কিন্তু পথিক সাজতে পারবো না রুবিদি ! বাব্বা ! ওই অতগুলি আমের থলো আর ফলের বোঝা যদি আমার গলা ধরে ঝুলতে আরম্ভ করে তাহলে সেই খানেই তো আমার দফা নিকেশ ! না ভাই তোমরা তা'হলে ষণ্ডা দেখে একটা পথিক খোঁজ।" এখন 'ষণ্ডা পথিক কোথা হইতে মেলে ! এ যুগের পড়ো ছেলে মেয়েদের ভিতর ষণ্ডা-চেহারা কি দেখা যায় ? সে বরং ত্রিশ পার হওয়ার পর যাহারা টি'কিয়া আছে, তাদের ভিতর বিস্তর পাওয়া যায়। এখন তারাইবা 'পথভোলা পথিক' সাজিতে রাজী হইবে কেন ? আর সাজিলেও ত আর সেটা

স্কুলের মেয়েদের সাজা হইবে না। কাজেই অভিনয়টা বদলাইয়া দিতে হইল। অনেক প্রকার ভাঙ্গা গড়া হইতে হইতে সেই চিরন্তনী লক্ষ্মীর পরীক্ষায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রোগ্রামটী এই রকম দাঁড়াইল।

প্রথমে ঐ কোরাসে গীত গানটী, তারপর ইংরাজী অভিনয়। তারপর স্কুলের রিপোর্ট পাঠ, তৎপরে প্রাইজ বিতরণ। এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া গেলে বাংলা অভিনয়। মেমসাহেবেরা যে ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, সে আশা তো নাই, কাজেই সব কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেখা শোনার জন্যই লক্ষ্মীর পরীক্ষা সর্ব্বশেষে স্থান পাইয়াছিল। এই লক্ষ্মীর পরীক্ষার আগে মধ্যে ও শেষে গোটাকতক গান ও নাচ জুড়িয়া দিয়া ইহাকে সাধারণের পক্ষে একটু উপাদেয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। নাট্যালয়ের সকল অভিনয়েই যেমন স্থান কাল পাত্রাদি নির্ব্বিচারে নাচের ব্যবস্থা আছে এবং তা' না থাকিলে দর্শক-দর্শিকা-দলের মনঃপূতও হয় না, তখন এই বেচারা-দলের অভিনয়কেও সর্ব্বজনের মনোমত করিবার জন্য একটুখানি নাচের ব্যবস্থা না করিলেই বা চলে কিরূপে? এই ব্যবস্থাটী সম্পূর্ণরূপেই কবির মস্তিষ্ক-প্রসূত। ফিরো-রাণীর রাণী-সভায় জন আটেক মেয়েকে নাচনী সাজাইয়া তাদের মুখে "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।"—গানটী গাওয়াইয়া, তারপর আবার "কর্ণার্জ্জুন" থিয়েটার হইতে টানিয়া আনিয়া নিয়তি-দেবীকে একবার প্রস্তাবনায়; একবার লক্ষ্মীর পরীক্ষার প্রারম্ভে এবং আরও একবার রাণী-কল্যাণীর ফিরো-রাণীর নিকট সাহায্য লাভাশায় আগমনের পূর্ব্বে সেই কর্ণার্জ্জুনেরই হলদে রঙে লাল ফিতার পাড়ের সাড়ীটী পরাইয়া দিয়া এলোচুলের রাশি এলাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেজের উপর পরিক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গানগুলি অবশ্য যে নিয়তির মুখের গানগুলি ঠিক ঠিক স্মরণ না থাকায় অগত্যা নিজেরাই যা' তা করিয়া তৈরি করিয়া দিতে হইয়াছিল এবং সুর সংযোগ ও কবি নিজেই করিয়াছিল। যাহোক করিয়া আর সব তো এক রকমে তৈরি হইল; কিন্তু ঐ নিয়তির পার্টটী লইবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। গানের ভাষা ও সুর যদি ভাল হয়, সে গান যেমন হোক করিয়া গাহিয়া গেলেও একরকম শোনায়, কিন্তু কাঁচা লেখকের লেখা জোড়া তাড়া দেওয়া গানকে বেসুরে গাহিলে তাহা অত্যন্তই শ্রুতিকটু হইয়া দাঁড়ায়।

"আমি নিয়তি এসেছি তোমার পাশে,\
দেখি ভাগ্য তোমারে কিবা দিতে পারে,\
ওগো দেখিতে এসেছি সেই আশে;\
দেখি বাঁধা পড়ো কি না পড়ো এই ফাঁদে"।

এই যে কবির তৈরি করা গান, এ কবি ছাড়া অপর কাহারও গাহিবার সাধ্য

হইল না। তার গলাটী ভাল, শিক্ষাও আছে, কাজেই সে নিজেই এই নিয়তি সাজিল। আর স্কুলের শ্রেষ্ঠ মেয়ে তৃপ্তি সাজিল মা লক্ষ্মী। তৃপ্তিকে দেখিতেও ভাল, স্বভাবটীও লক্ষ্মীর মতন শান্ত, আর তার গলাটীও বড় মন্দ নয়। এস্থলে বলা দরকার এই অভিনয়ে মা লক্ষ্মীও গায়িকার আসন পাইয়াছিলেন। তাঁকেও দুইবারে দুইটী গান গাহিতে হইবে।

মলয়া যেদিন নিজেদের পরীক্ষার খবর পাইয়া তাহার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হওয়ার দুঃখে মুখ ভার করিয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছিল, রুবি তখন একটার স্থলে দশটা হইয়া মেয়েদের লইয়া মাতিয়া রহিয়াছিল। অভিনয় শিক্ষা একরকম হইয়া গিয়াছে, এখন নিত্য নিত্য রিহার্সেল চলিতেছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি পায়ে কেহ ঘুঙুর কেহ পাইজোর, কেহ ঘুঙুর-গাঁথা মল যার যা জুটিয়াছিল পরিয়া, আঁচল ধরিয়া, কাঁকালে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল, আবার খানিক পরেই কোরাসে যোগ দিয়া স্কুলবাড়ী ফাটাইয়া চিৎকার তুলিতেছিল "জয় হে জয় হে জয়হে—জয় জয় জয় জয় জয়হে।"

রুবির সব কাজ কর্ম্মের ভিতর হইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে মালক্ষ্মীর জন্য একখানা মুকুট সংগ্রহ করা তখনও ঘটিয়া উঠে নাই। রাণী কল্যাণীর জন্য ও একখানা হলে ভাল হয়। যেহেতু রাজারাণীর মাথায় মুকুট না থাকিলে তাদের সাধারণের সঙ্গে আর তফাৎটা কি রহিল! মাকে আসিয়া ধরিলে নর্ম্মদা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মাকেতো আর তোর বাবা মুকুট পরিয়ে রাণী করে রাখেনি, আমি মুকুট কোথায় পাব? দেখ্‌গে যা তোর মাসিমাদের বাড়ী যদি কিছু পাস।"

রুবি আসিয়া মলয়াকে মুরুব্বি ধরিল, মলয়া বলিল—"মুকুট তো নেই ভাই, তবে টায়রা আছে। মা যদি দেন, বলে দেখি।"

রুবি চিন্তিত হইয়া কহিল—"টায়রায় হবে নাতো! মাথায় এটা কি? সোনার টোপর! সোনার টোপরের বদলে কি টায়রা হলে চল্‌বে?"

সমস্যার কথাই বটে! অগত্যা সুমতিকেই মধ্যস্থ মানা হইল। তিনি বলিলেন,—"টায়রায় ঠিক হবে না, মুকুট চাই, কিন্তু মুকুটতো আমাদের বাড়ী নেই, বসন্তবাবুর বাড়ী তাঁর বড় বউএর হীরের মুকুট আছে, সে কি আর তারা দেবে। তাঁর মেয়ে শোভার মুক্তোর মুকুটও আছে দেখেছি। আর কারু বাড়ী কই মুকুট দেখিনি আগে বল্লে না হয় রাংতার মুকুট তৈরি করিয়ে দিতুম, এখন তো আর সময়ও নেই।"

রুবি প্রোৎসাহিত হইয়া লাফ দিয়া উঠিল—"আচ্ছা ওই বসন্তবাবুর বাড়ীর মুকুটই আমি আদায় করে আনাচ্ছি দাঁড়ান না।"

সুমতি এই মন্তব্যে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন "নারে বাছা! ওকাজ করিসনি।

ও কাজ করিসনে, কোথায় হারিয়ে ফেল্‌বি। মুক্তোপাথরের জিনিষ ও যেন সর্ব্বদা ঝরে, ছুটো চারটে পড়েও যেতে পারে, তাছাড়া তারা দেবেই বা কেন ?”

রুবির মনটা এই কথায় একান্তই দমিয়া গেল। লক্ষ্মী ও রাণীর মাথায় মুকুট না থাকিলে যে তার এতখানি চেষ্টা সমস্তই মাটি হইয়া যাইবে; সে তখন নিতান্ত সংশয়াকুল মিনতির সহিত সুমতিকে বলিল—“তাহলে কি হবে মাসিমা! মুকুট না হলে যে অভিনয়টাই সব মাটি হয়ে যাবে ?”

সুমতিও এই কথায় একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আহা ছেলে মানুষ এতটা কষ্ট করিয়া চেষ্টা করিয়া পাঁচজনের জন্ত একটুখানি আমোদের জোগাড় করিল, আর এই সামান্ত জিনিষটার জন্ত সেটা নষ্ট হইবে? রুবির উদ্বেগ ম্লানমুখের দৃষ্টি তাঁহার মাতৃহৃদয়ের গোপন-সঞ্চিত স্নেহের সিন্ধু আলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—

“তার জন্তে অত ভাবছিস কেন মা! আমি তোকে একখানা মখমলের কি আর রঙ্গীন চুমকি দিয়ে লক্ষ্মীর মুকুট তৈরি করে দোব, আর রাণীর জন্তে একটা ভাল টায়রা দিলেই বেশ হবে। এখনকার রাণীরা মুকুট পরে বেড়ায় নাতো, বিশেষ ঘরের মধ্যে।”

রুবি এ আশ্বাসে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়া আহ্লাদে হাততালি দিয়া উঠিল। “ও মাসিমা! আপনি কি রকম ভাল! মলি! তুই মাসিমার মেয়ে হয়েও কি রকম মাদামারা; দেখতো মাসিমা এখনও কত উৎসাহী।” সে সুমতির গলা জড়াইয়া ধরিল।

সুমতিরও এই মনখোলা সরলা মেয়েটীর উপর স্নেহ যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া তার মুখে চুম্বন করিয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন—“দেশেও কোন আমোদ আহ্লাদই নেই, যদিইবা কিছু তোরা করছিস, তাতেও একটু উৎসাহ দোব না? মানুষ কি একটু আমোদ স্ফূর্ত্তি না পেলে এম্‌নি চুপটী করে বার মাস থাক্‌তে পারে? না তাতে তাদের স্বাস্থ্যই ভাল থাকে!”

সুমতি জরির মুকুট তৈরি করিতে বসিয়া গেলেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্প, তাঁর সংসারের যথেষ্ট কাজকর্ম্মও আছে, কাজেই দেখা গেল যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও সেই অভিনয় দিনের পূর্ব্বে আর তা' শেষ হইবার আশা নাই। চঞ্চলা রুবির ইহাতেও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল যদিইবা না হয়ে ওঠে!

ইতিমধ্যে একটা সুযোগ আসিয়া দেখা দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বাসন্তী পূজায় আদিম আর্য্যজাতির অতীব কৌতুকাবহ প্রত্নতত্ত্ব

:o:

বাসন্তী দুর্গারই নাম। বসন্তকালের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়াই তাঁহার এই নাম হইয়াছে। সুতরাং বাসন্তীপূজা বসন্ত-কালে বিহিত দুর্গারই পূজা! পক্ষান্তরে শরৎকালেই দুর্গারপূজা অধিক প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে 'দুর্গাপূজা' বলিতে শরৎকালের পূজাই সাধারণে বুঝিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে বসন্ত-কালের দুর্গাপূজাই, দুর্গার আদি পূজা, শরৎকালের পূজা পরবর্ত্তী পূজা। শরৎ-কালীন দুর্গাপূজার ইতিহাসও তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্যই প্রদান করে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিবার জন্যই শরৎঋতুতে দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, ইহাই সংক্ষেপে শরৎ কালীন দুর্গাপূজার ইতিহাস। দুর্গা-পূজার পূর্ব্বানুষ্ঠান "বোধন" বলিয়া সুবিদিত। এই বোধনমন্ত্র বিল্বশাখাতে এইরূপে পাঠ করিতে হয়—"ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানু-গ্রহায়চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা ॥" "পূর্ব্বকালে রাবণ-বধদ্বারা রামের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা তোমাতে অকালে দেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।"

এস্থলে "অকালে" ও "বোধ" এই দুইটী শব্দ বিশেষরূপে লক্ষনীয়। 'অকালে' শব্দদ্বারা দুর্গাপূজা শরৎকালে যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দুর্গাপূজার প্রকৃত কাল নহে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে এবং 'বোধ' শব্দদ্বারা দেবীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করা হইয়াছিল, ইহাই প্রকাশ পায়।

শরৎকাল দুর্গাপূজার প্রকৃত কাল কেন নয় এবং তখন দেবী কেনই বা নিদ্রিতা ছিলেন এই দুইটী প্রশ্নই এক্ষণে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

এই প্রশ্ন দুইটীর যথার্থ উত্তর পাইতে হইলে, আমাদিগকে আদিম আর্য্য জাতির প্রথম ইতিহাস উদঘাটন করিয়া দেখিতে হয়। তাঁহাদিগের আদি-নিবাস কোথায় ছিল, সেই রহস্যের সহিতই প্রশ্ন দুইটারই উত্তর জড়িত। যদি উত্তরমেরু বা তৎ-সন্নিহিত উত্তরকুরুতে আর্য্যদিগের আদি নিবাস স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন দুইটীর সমাধান নিতান্তই সহজ হইয়া আসে।

উত্তরমেরুতে উত্তরায়ণের ছয়মাস সূর্য্য পরিদৃশ্যমান হওয়ায়, তখন তথাকার দিবস

হইয়া থাকে, আর দক্ষিণায়নের ছয়মাস সূর্য্য তথায় অদৃশ্য থাকায়, তখন সেখানে রাত্রি হইয়া থাকে। রাত্রিকাল নিদ্রার সময় বলিয়া দক্ষিণায়নের ছয়মাস আর্য্যগণের কাজকর্ম্ম সম্ভবপর ছিল না, ঐ সময় তাঁহারা প্রধানতঃ নিদ্রায়ই কাটাইতেন। পরন্তু উত্তরায়ণের ছয়মাস দিবাকাল বলিয়া তখনই তাঁহারা নিদ্রার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম সম্পাদনে ব্যাপৃত হইতেন। দক্ষিণায়নে আর্য্যগণ আপনারা নিদ্রায় কাটাইতেন বলিয়া দেবকার্য্যাদি করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের দেবগণও তখন তাঁহাদেরই ন্যায় নিদ্রায় কাটাইতেন বলিয়া যে তাঁহারা মনে করিবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ইহা-হইতেই দক্ষিণায়ন দেব-নিদ্রার কাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। শরৎকাল দক্ষিণায়নের মধ্যেই পড়িয়াছে। তাহাতেই দেবী ঐ সময়ে নিদ্রিতা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার বোধনেরও আবশ্যকতা হইয়াছে।

বাসন্তীদেবী বসন্তকালে পূজিত হন। বসন্তকাল উত্তরায়ণের অন্তর্গত। তখন দেবতাদের জাগরণের কাল। সুতরাং বাসন্তী দেবী জাগরিতা বলিয়া দুর্গার ন্যায় তাঁহার "বোধনের" কোন প্রয়োজন করে না। শব্দকল্পদ্রুমে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—"বিশেষস্তত্র বোধন প্রাত্রীয়া নাস্তি বোধিতায়া বোধনা সম্ভবাৎ॥" "বোধিতের বোধন অসম্ভব বলিয়া বাসন্তী পূজায় বোধন প্রকরণ নাই। ইহাই দুর্গাপূজার সহিত বাসন্তী পূজার প্রভেদ॥"

এখানে বাসন্তীদেবীতে আমরা দুর্গার আদিরূপই পাইতেছি। এই বাসন্তী প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিব। মেরুতে শীতের সুদীর্ঘ নির্জ্জীবভাবের পর, বসন্ত ঋতুতে নূতন জীবনের নব-শক্তি, নব উদ্যম, নব সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়া যে অপূর্ব্ব লীলাময়ী প্রকৃতি আবির্ভূতা হন, তাহাই মূর্ত্তিমতী হইয়া বাসন্তী দেবী হইয়াছেন। তাহাতেই তিনি শক্তিরূপিণী, তিনি স্ফূর্ত্তিরূপিণী, তিনি তেজোরূপিণী, তিনি প্রভারূপিণী।

বাসন্তী নব সৌন্দর্য্যের মূলীভূতা, তাহাতেই তিনি শ্রী বা লক্ষ্মীরূপিণী। বাসন্তী জাগরণের চৈতন্য সঞ্চার করেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জ্ঞানের উৎসও খুলিয়া দেন, তাহাতেই তিনি জ্ঞানরূপিণী বা সরস্বতীরূপিণী। এইরূপেই বাসন্তী দেবীর সহিত লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমাবেশ হইয়াছে।

শত্রুজয় ও সিদ্ধি উভয়ই শক্তির আয়ত্ত। তাহাতেই বাসন্তী দেবীর সহিত জয় ও সিদ্ধির রূপক কার্ত্তিকেয় ও গণেশ সংযোজিত হইয়াছেন।

বসন্ত কালে আর একটী বিশেষ দৈবানুষ্ঠান সরস্বতী পূজা। ইহা শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহার একনাম হইয়াছে শ্রীপঞ্চমী

এখানে "শ্রী" বিশেষণের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। বসন্তের পঞ্চমীতে প্রকৃতি প্রথম নব শোভা ধারণ করিয়া মনোহর মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। তাহাতেই শ্রীযুক্তা বলিয়া "শ্রীপঞ্চমী' নাম হইয়াছে। 'শ্রী' যেমন সৌন্দর্য্যের বোধক তেমনই 'লক্ষ্মীদেবীরও' বোধক—যথা অভিধানে—'শোভা সম্পত্তি পদ্মা-সুলক্ষ্মীঃ শ্রীরূপি দৃশ্যতে।' ইহাতে 'শ্রীপঞ্চমী' লক্ষ্মীদেবীর উৎসব বলিয়াই মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীদেবী প্রধান ভাবে আরাধিতা হইলেও লক্ষ্মীদেবীও তৎসঙ্গে সঙ্গে আরাধিতা হওয়ার বিধান আছে। এইরূপে বাসন্তী দেবী বা দুর্গার সহিত সরস্বতী ও লক্ষ্মী, বসন্তকালের দেবী হইয়াছেন। দুর্গার সহিত লক্ষ্মী সরস্বতীর যোগের রহস্যের প্রকৃত সন্ধান এইখানেই পাওয়া যাইতেছে।

শরৎকালে দুর্গার যে পূজা হয় তৎ-প্রসঙ্গেও, স্বতন্ত্রপ্রভাবে লক্ষ্মার যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শুক্লপক্ষে দুর্গারপূজা, তাহারই পূর্ণিমায় লক্ষ্মার পূজা। তাহাতেই এই পূর্ণিমার নাম লক্ষ্মী পূর্ণিমা। শরৎকালে বর্ষার ঘোর মেঘাচ্ছন্নতার পরে স্বভাবের যে সুবিমল সুষমা বিকাশ পায়, লক্ষ্মী তাহারই মূর্ত্তি।

এইরূপেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী শক্তিদেবীর সহচারিণী হইয়াই তাঁহার নিত্য সঙ্গিনী হইয়াছেন।

বাসন্তী দেবীর সহিত ইহাদের আদি যোগের দ্বারা ও বসন্তকালের পঞ্চমীতে ইঁহাদের পূজাদ্বারা ইঁহারা যে প্রকৃতপক্ষে উত্তরায়ণের পূজিত দেবতা, সুতরাং আদিম আর্য্যাদিগের উত্তরকুরু বাসেরই সাক্ষীভূত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

সরস্বতী পূজায় তাঁহার অষ্টতনুর উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভাধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী॥"

এখানে 'লক্ষ্মী' ও 'গৌরী' বা দুর্গাকে সরস্বতীরই অঙ্গীভূতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গাকে মূলতঃ অভিন্না তাহাই উপপন্ন হইতেছে!

'প্রভা' সরস্বতীর অন্যতম অবয়ব। ইহাতে তিনি যে বসন্তের দ্যোতমানা নব প্রকৃতিরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহাই প্রকাশ পায়। 'প্রভা' দুর্গাদেবীরও এক নাম। সুতরাং ইহাতে তিনি বিশেষরূপে উজ্জ্বল বিচিত্র বসন্ত কালেরই দেবী অর্থাৎ প্রকৃত বাসন্তীদেবী তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে সরস্বতীতে বসন্তের দেবীরূপ প্রথম প্রকটিত হইয়া, বাসন্তীতে তাহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। *

---

* বঙ্গদেশেই দুর্গাপূজার প্রচলন অন্যত্র দুর্গা পূজার স্থলে সরস্বতী পূজার প্রচলন দেখা যায়। ইহাতেই সরস্বতী ও দুর্গার অভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

বেদের দেবী সূক্তে সরস্বতীর মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ বাগ্দেবীই এই সূক্তের দেবতা। দেবীর অসীম মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চারম্যহংমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রবরুণেভ্য বিভম্যাহমিন্দ্রাগ্নী অহ মশ্বিনোভ্য॥
অহং সোম মাহনসং বিভমহং ত্বষ্টারমুত্ত পূষণং ভগম্॥'

ঋগ্বেদ। ১ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত।

(বাগ্দেবীর উক্তি) আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতা দিগের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বকে অবলম্বন করি।'

'যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পী-ড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমিই তাঁহাকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টাও পূষা ও ভগকে ধারণ করি॥

রমেশ বাবুর অনুবাদ।

বাগ্দেবী বা শক্তিদেবী যে সকল দেবতারই মূলাধার, এখানে তাহারই সঙ্কেপে নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

প্রভারূপা সরস্বতী বা দুর্গাদেবী হইতেই যে, সকল দেবতার উন্মেষ হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট আভাসই এখানে পাওয়া যায় এবং সরস্বতীও দুর্গার সঙ্গে বসন্ত কাল লইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরা-য়ণের কালই যে তাঁহাদের প্রকৃত উন্মে-ষের সময় তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়।

এই প্রকারেই উত্তরায়ণে দেবতা-দিগের দিব্য অর্থাৎ দীপ্তরূপে উন্মীলন ও দক্ষিণায়নের নিমীলন কথিত হইয়াছে। মেরুবাসী আদিম আর্য্যদিগের উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে যথাক্রমে ছয়মাস ব্যাপী দিবা ও রাত্রির সহিতই যে দেবতাদিগের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে জাগরন ও নিদ্রার অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে এক্ষণে আর কোন কষ্টই হয় না।

শ্রীশীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রেম—?

প্রেম সে চিরদিনের,—কেঁদে বল্‌চে তারা,
পায় না কোথাও, কেবল খুঁজে চল্‌চে তারা!
বল্‌চে তারা,—"দুটি হৃদয় মিল্‌লে পরে—
রইবে প্রেমে বাঁধা যুগে যুগান্তরে।"
কিন্তু পথে দিনের আলোয় চক্ষে দেখি
তাদের চলা,—সত্য সে প্রেম তার চেয়ে কি?
চল্‌চে তারা ছাড়িয়ে চলে হারিয়ে চলে,
প্রেমের বাধায় রয় না বাঁধা কুটীর-তলে?
এক ফাগুণে, একটি দিনে, একটি চাওয়ায়,
প্রেম যে ফুরায় মিলন হারায় একটু পাওয়ায়!
সে প্রেম তবে সত্য কি নয়? বুকের কোলে
কাঁটার মত ব্যথার সুরে বাজল ব'লে?
ক্ষণের মিলন তাতেই তারা দুঃখী-সুখী—
আড়াল হ'লে হয় নাকো আর মুখোমুখী,
মেলেনা আর এই জীবনে এই ভুবনে
কোনোদিনে এই অসীমের কোনও কোণে!"
বল্‌চে তারা,—"প্রেম যদি যায় একটু ক্ষণে,
চিরদিনের নয় যা কী তা এই জীবনে!"
জীবনেরই সৃষ্টি তো প্রেম, মনেরই বশ?
জীবন ও মন তাই থাকেনা চির দিবস!
দিনের আলো—তাও ক্ষণিকের, রাত্রি আসে,—
তবু তারা দিবসকে চায়—ভালোবাসে!
পূর্ণিমা রাত যায় ফুরিয়ে একটি রাতেই—
তার ক্ষণিকের প্রেমে তারা মুগ্ধ তাতেই!

একটি যেন দীর্ঘ-নিশাস দখিন হাওয়া
তারেও তো চায়—তার ক্ষণিকের আসাযাওয়া ?
নদী যে সে নিরুদ্দেশে কেবল বহে,—
সত্য এরা সবাই—কেহ মিথ্যা নহে !
তবে কেন মিথ্যা হবেই অবশেষে
একটু-ক্ষণের-প্রেমের পথিক সঙ্গী যে সে ?
যদিও তারে "ভালোবাসি" হয় না বলা,
বারেবারেই অশ্রুধারে হারিয়ে চলা !

দিনের আলো নিব্‌ল বটে আজকে রাতে,—
তাকেই আবার ফিরে যে পাই কাল প্রভাতে ?
প্রেম তো কভু হারায় নাকো রয় সে জাগি
অনাগত আরেক-প্রিয়ের মিলন মাগি !
হারিয়ে যারা গেছে তাদের নতুন ভাবে
নতুন বঁধুর মাঝে আবার ফিরে পাবে।
যায়নি তারা লুকিয়ে আছে গোপন-আশায়
তোমার প্রাণে, গানে, তোমার ভালোবাসায়।
মিলবে যবে বঁধুর সাথে মুখোমুখী—
তোমার ও তার চোখে তারাই মারবে উঁকি ।
একই বন্ধু—মিলন মাগে ক্ষণে ক্ষণে
নব নব সুন্দরেরই আলিঙ্গনে... ।
রইবে তবু অশ্রু, হাসি, আঁধার-ছলা,
কাছে-পাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া, ছাড়িয়ে-চলা। —
প্রেম ও চলা একই—চির-চলার ত্বরায়,
প্রেমও চলে প্রেমিক চলে বসুন্ধরায় ।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

বে-খাতির

(গল্প)

——:•:——

পুলিশের চাকরি। সদ্য পেন্সন লইয়া চাকরির জোয়াল খুলিয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছি। গায়ে বাতাস লাগিয়াছে! চারিধারে চাহিয়া বিস্ময়ও একটু বোধ করিতেছি, পৃথিবীখানা এখনো তেমনি সবুজ শ্যামল আছে! সেই আলো, সেই হাওয়া, সূর্য্যের উদয়-অস্তের সেই শোভা, সেই মহিমা...... বাঃ! চাকরির ক'বছর এ-সব চোখেও পড়ে নাই!

পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, লোক-লৌকিকতা সব ভুলিয়া চাকরিই করিয়াছি। ডায়েরি লেখা আর ডায়েরি পড়া—ইহাই ছিল দিনের কাজ। ঘর-সংসার কোথা দিয়া যে চলিয়াছিল, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যেন কলের পুতুলের মতই নড়াচড়া করিয়াছে—তাদের ঠিক ভালো করিয়া অনুভব ক'রতে পারি নাই! চুরি-জুয়াচুরি, জাল-জালিয়াতির তদারকে কেবলি কোন্ অপূর্ব্ব জগতের পরিচয় লইয়াছি—চিরদিনের এ-জগৎ ভুলিয়া! তার মাঝেই চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভের সন্ধানে ঘুরিয়াছি! মনে কত আশা গড়িয়া তুলিতাম! রিওয়ার্ড—তারপর প্রোমোশন—অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারী...অন্ততঃ রায়-সাহেব খেতাবটাও...! হায় রে! এর মধ্যে দুটা মেয়ের বিবাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া হইয়া গিয়াছে ..একটী ছেলেকেও বড়বাজারের এক মাড়োয়ারী ফার্ম্মে চাকরিতে ঢুকাইয়া দিয়াছি—সেগুলা যেন স্বপ্ন! আজ আবার নিজের সেই কৈশোরে-ছাড়িয়া-যাওয়া জগতে ফিরিয়া আসিয়াছি! ফিরিয়া চারিধারে চোখ মেলিয়া চাহিবার অবসর মিলিয়াছে!...

পাড়ার চাটুয্যে-বাড়ীর মোহিত আসিয়া সেদিন সকালে ধরিয়া বসিল—এইবারে এক কাজ করুন। পুলিশ লাইফের কতক-গুলো কাহিনী খুব ভাষা শাণিয়ে লিখুন! ডিটেকটিভের গল্পের বাংলা সাহিত্যে একান্ত অভাবও!

মোহিতের বাংলা লেখার সখ। মাসিক কাগজে সে গল্প লেখে, রোমান্স লেখে! এ খপর অবশ্য আগে রাখিবার অবসর ছিল না; সম্প্রতি শুনিতেছি। মোহিতের বাপ ছিল আমারি সমবয়সী; এক-ক্লাশের সহপাঠী! আজ কোথায় সে!

আমি বলিলাম,—তা, যা-সব ব্যাপার দেখেছি, লিখলে মন্দ হয় না!

মোহিত বলিল—দু' একটা কাহিনী বলুন না...

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। গড়গড়ার

নলটা মুখে দিয়া কহিলাম—সব-চেয়ে বড় হয়ে যে-কাহিনীটা বুকের মধ্যে ফুটে আছে, সেটা হয়তো খুবই সামান্ত! ঘটনায় কোনো ঘোর-প্যাচ নেই, অতি তুচ্ছ ঘরোয়া ব্যাপার! কিন্তু সেইটে আমি ভুলতে পারিনি! প্রায়ই সেটা কাঁটার মত বুকে খচ করে ওঠে!... বেচারী লোটন সিং!

মোহিত উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া বসিল।

আমি কহিলাম—লোটন সিং ছিল মুচিপাড়া থানার জমাদার। পুলিশে চাকরি লইয়া মুচিপাড়া থানায় সব-ইনস্পেক্টর হইয়া আসিলাম! দোতলার দু'খানা ঘর পাইলাম। বাবা তখন মফঃস্বলের হাকিম। থানায় একা আসিয়া উঠিলাম, সঙ্গে একটি মাত্র ভৃত্য। ভারী নিঃসঙ্গ ঠেকিত। তার উপর পুলিশের লোক-জনের মাঝখানে নিজেকে মনে হইত, যেন কোন্ মস্ত জলাশয়ের মাছ ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছি! কলেজ হইতে সদ্য তখন বাহির হইয়াছি। কীট্‌স্ শেলির প্রচণ্ড মোহ মনটাকে জুড়িয়া আছে, সাইকলজি আর এথিক্সের গতে প্রাণটা ভরপূর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই ছত্রটাও কাণের কাছে যখন-তখন বাজিয়া ওঠে,—what man has made of man! সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সুর প্রাণে বসন্তের হাওয়ার মতই বহিয়া ফিরিতেছে সর্ব্বক্ষণ! একালে রবীন্দ্রনাথের পাঠক হওয়া বা তাঁর কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করাটা বড় কথা নয়! সে সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিত ক'জন? যারা বুঝিত, তাদেরি শুধু মানুষ গণ্য করিতাম! আর যে-সব হতভাগা তা বুঝিত না, না বুঝিয়া নানা টিটকারী ফাঁদিত, তাদের তো মানুষ বলিয়া মনেও করিতাম না! কিন্তু যাক্ সে কথা!

সকালে দুপুরে অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বক্ষণই থানার অফিস-ঘরে বসিয়া ডায়েরি লিখিতাম। বড় বাবুর আদেশে তদারকে বাহির হইয়া মনুষ্য-জীবনের চরম দুর্গতির পরিচয় পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতাম! হায় রে, দু'টা পয়সার জন্ম যত রাজ্যের চোর-জালিয়াতের পিছনেই ঘুরিয়া মরিব! যৌবনের এই সজীব চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলা, আশার রঙে রঙীন ঐ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতের ক্ষেত্র...এমনি তাহাতে কালি লেপিয়া ফিরিব! আশৈশব আলো হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত আমার প্রাণটা এমন বিদ্রোহের সুর তুলিত, সে আর বলিয়া বুঝাইবার নয়! মাকে চিঠি লিখিলাম, তরুণী স্ত্রীকে মনের বেদনা লিখিয়া জানাইলাম...বাবার কাণেও কথাটা পৌঁছিল। তিনি লিখিলেন,—জীবনটা ঠিক কলেজের ফিলজফির ক্লাশ নয়, নিছক কাব্য-সুখ উপভোগ করার আশাও করিয়ো না কোনোদিন। পস্তাইতে হইবে। মানুষকে জীবনে এমনি হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-পাপ, কলহ-কোলাহলের মধ্য দিয়াই পথ করিয়া চলিতে হয়! শুধু এই-টুকু সতর্ক থাকিয়ো, সে-সব কোলাহলের মধ্যে নিজেকে হারাইয়ো না। জীবনে যে-

হতভাগা শুধু ফুলের ঘ্রাণ পাইবার আশা করে, তাকে নিরাশ হইতেই হয়। ঝড়-ঝাপটা লইয়াই জীবন। বড় বড় পরীক্ষা আছে জীবনে, সেগুলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা ঠিক। তবে দুঃখ হয় এই ভাবিয়া যে, এই দ্বেষ-হিংসা, দ্বন্দ্ব-কোলাহলটাই যে মানব-জীবনের পনেরো আনা অংশ দখল করিয়া আছে! অথচ এই মানুষই এখানে বসিয়া কাব্য রচে, এথিক্স্ লেখে, ধর্ম্মের উপদেশ দেয়! মানুষের জীবনের মত এত-বড় এ্যানোমালির ব্যাপার বুঝি আর কোথাও নাই...মানুষের কল্পনার খেয়ালে-রচা নাটক-নভেলেও নয়!

একদিন কি একটা ফাঁক পাইয়া এক শীর্ণ ছোকরাকে এক জমাদার থানায় আনিয়া বিরাট ধাক্কায় হাজতে ঠেলিয়া বড় ইনস্পেক্টরকে জানাইল, চাঁপাতলার বস্তীতে চুরি হইয়াছে। ঘটি চুরি! এ ছোকরা চুরি করিয়াছে।

ছোকরাকে বাহিরে আনিয়া ইনস্পেক্টর অকথ্য গালি দিয়া কহিলেন,—চুরি করেচিস্? কাঁদিয়া সে অস্বীকার করিল। বড় ইনস্পেক্টর তার গালে ঠাশ্ করিয়া এমন চড় মারিলেন যে দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে পড়িয়া গেল। আমি তখনো কাঁচা, পুলিশ-লাইনে ডাঁশিয়া উঠিতেও পারি নাই। মায়া-মমতাগুলা তখনো মনের কানায় পূরা মাত্রায় ভরতি আছে! আমি কহিলাম, আহা!

প্রকাণ্ড চোখ দুইটা মেলিয়া আমার পানে চাহিয়া ইনস্পেক্টর কহিলেন,—এত আহা-উহু-ভরা প্রাণ যদি তো পুলিশে ঢুকলে কেন হে ছোকরা? আঁচল ঘুরিয়ে শাড়ী পরে রান্নাঘরে বসে থাকতে পারলে না?

দুঁদে অফিসার বলিয়া বড় ইনস্পেক্টরের ভারী নাম-ডাক ছিল। যেমন ছিল তাঁর হুঙ্কারের জোর, তেমনি...অর্থাৎ ফন্দী খাটাইয়া অর্থ আদায় করিবার শক্তিও নাকি এমন আর সেকালে কারো ছিল না! ঘটির মামলার ছোকরা বার-বার মার খাইয়াও চুরি অস্বীকার করিল। বড় ইনস্পেক্টর তাকে আরো দুই-তিনটা চড়-ঘুষি মারিয়া শেষে আমায় হুকুম দিলেন, সে মামলার তদারক করিতে।

তদারকে বাহির হইলাম। জমাদার তার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পথে বাহির করিবার উদ্যোগ করিতে সে কাঁদিয়া লুটাইল। জমাদার তাকে ভারী জুতাশুদ্ধ পায়ের ঠোক্কর মারিল। আমি কহিলাম,—খবর্দ্দার, মেরো না...

জমাদার চোখ দুইটা মস্ত করিয়া পাকাইয়া কহিল,—আপনি সমঝাচ্ছেন না! পাকা বদমাস আছে এ। চোরি করিয়ে কবুল যা—না বলে, বেকসুর! সাক্ষী আছে! আরে! ভারী দিগ্‌দারী লাগিয়ে দেবে, ছোটা বাবু...

তার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আসামীকে কহিলাম,—চল হে...

সে কাতর কুণ্ঠিত স্বরে জানাইল, মামলায় যা হইবার, তা পরে হইবে ; কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পথে পথে তাকে ঘুরাইয়া এই যে জানোয়ারের হাল করা হইতেছে, ইহাতে সে মরমে মরিয়া যাইবে !

মায়া হইল। জমাদারকে কহিলাম—দড়ি খুলে দাও। ও পালাবে না।

জমাদার মহা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, আর, পালাইলে দায়ী হইবে কে? তারপর বলিল, চুরির আসামীর কোমরে দড়ি দিয়া লইয়া যাইবে না তো কি বরের তাঞ্জামের ব্যবস্থা করিবে তাহার জন্য !

আমি কহিলাম—গাড়ী ডাকো।

জমাদার কহিল, ভাড়া কে দিবে? তাছাড়া বড় বাবু ভারী গোঁস্‌সা হইবে !

বাবার কাছ হইতে তখনো কিছু টাকা আনাই মাসে মাসে ! আমি কহিলাম, —আমি দেবো ভাড়া। গোল চুকিয়া গেল।

তদারকে গিয়া দেখি, মামলাটি একেবারে মিথ্যা ! বেচারার মার সঙ্গে বস্তীর বাড়ীওয়ালীর বিবাদ। বাড়ীওয়ালীর সহিত পুলিশের ঐ জমাদারের দহরম আছে ; তাই ঐ জমাদারের সাহায্যে বাড়ীওয়ালী এই মিথ্যা কেশ্ করিয়া তাকে বেইজ্জৎ করিতে চায় ! শুধু বেইজ্জৎ কি একটা দারুণ দুগ্র্হের সৃষ্টি করিয়া এদের দুজনকে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায় !

সন্ধ্যার দিকে ডায়েরি লিখিতে বসিতেছি, বড় ইনস্‌পেক্টর কহিলেন—এমান করেই চাকরি করবে তুমি, বটে !

অবাক হইয়া তাঁর পানে তাকাইলাম। সেই জমাদার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, একেবারে নিষ্কম্প ষ্ট্যাচুর মত। শুধু চোখ দুইটায় কি যেন ফন্দী খেলিতেছে! বড় বাবু কহিলেন,—ও তদারক কিছুই হয় নাই ! বাড়ীওয়ালীটা পুলিশের ঢের সাহায্য করে ওকে হাতে রাখায় স্বার্থ আছে হে !...

আমি কহিলাম,—কিন্তু মশায়...

তিনি কহিলেন,—আমায় দাও কাগজপত্র...আমি গিয়ে তদারক করে আসি। এই কথা বলিয়া ছোকরাকে লইয়া জমাদারের সঙ্গে তিনি আবার বাহির হইলেন। আমি অবাক !

কতক্ষণ বসিয়া আছি, হঠাৎ রাইটার আসিয়া জানাইল, ঐ বাড়ীওয়ালীর সহিত বড় বাবুর ভারী দোস্তী আছে ! মাগীর কোকেনের কারবার আছে না ! অগাধ টাকা ! সে থাকে ঐ বস্তীর পাশের বড় বাড়ীটায় ! তাই এ কেশ্ বড় বাবু নিজে প্রথমে না লইয়া আপনার হাতে দিয়াছিলেন তদারকের জন্য। কোর্টে জেরার সময় আবার যদি সেই সব কথা ওঠে !...

ভালো কথা, লোটনের কথা বলিতে গিয়া কি সব বকিতেছি !

মোহিত কহিল,—কিন্তু ও মামলাটার কি হলো?

আমি কহিলাম,—বড় বাবুর তদারকের পর দেখি, ঐ কেশ কোর্টে চালান্ হইয়া গেল। সেখানে ছোকরা তেমন উকিল দিতে পারিল না, টাকার অভাবে। সাজাও হইল দেখিয়া আমার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! ভাবিলাম···নাঃ, আর কিছু না হোক, ভিতরের কথা তো আমি জানি। কিছু পয়সা দিয়া ভালো উকিলের ব্যবস্থা করাই। কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম, জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিব! বড় বাবুর প্রতাপও ছিল প্রচণ্ড! হয়কে এমন নয় করিয়া তুলিতে পারিতেন যে, আশ্চর্য্য! হাঁ, তারপর, ঐ লোটন সিং...তার কথাই বলিতেছি।

থানায় আমার উপর কাহারো দরদ বা সহানুভূতি ছিল না—টিটকারীটা প্রায়ই সহিতে হইত। রাত্রে কোনো তদারকী মামলা আসিলে বড়বাবু আমায় শুনাইয়া বলিতেন,—ছোট বাবুকে ছেড়ে দাও হে! আর কেউ তদারকে যাও। বড়লোকের ছেলে, আয়েসী...এ-রাত্রে ওঁকে কষ্ট দেওয়া আর কেন!

এ তো দরদ নয়! এ কথায় আমি মনে মনে জ্বলিয়া উঠিতাম! কিন্তু বড় বাবুর মুখের ভাষায় যত দরদই ঝরিয়া পড়ুক, রাত্রের তদারকের ভার পড়িত প্রায়ই আমার উপর। তারপর এ কষ্টের তারিফও কি আছে! সকালে ডায়েরি লেখার সময় বড় বাবুর বিরক্তির সুর আর অম্লমধুর টিপ্পনী! কোন দিনই তা বাদ পড়িত না—সঙ্গে সঙ্গে একালের শিক্ষা-দীক্ষা, চাল-চলন, স্বাস্থ্য—এ সব ব্যাপারও তাঁর সমালোচনার খোঁচা এড়াইত না!

তার উপর রাত্রে ছিল রোঁদ দিবার পালা! বড়বাবু প্রথম রাত্রেই রোঁদ সারিতেন। বর্ষায় উপর্য্যুপরি চার-পাঁচ রাত্রি আমাকে রোঁদ দিতে হইল। সেই এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া, পথে পথে ঘোরা··· বড় বাবু ও তাঁর অনুগৃহীতের দল তখন নিদ্রাসুখে বিভোর!

সেদিন একটা বাড়ী পড়িয়া তিন-চারিটা মানুষ মরিয়াছিল। সেই সব ইট-কাঠ সরাইয়া কবর হইতে দলিত পিষ্ট নরদেহ সরাইয়া মর্গে পাঠানো, তদারক প্রভৃতির ব্যাপারে খাটুনিও হইয়াছিল খুব। রাত্রে চা পান করিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, আবার রোঁদ আছে! এমন সময় লোটন সিং আসিয়া কহিল, ছোটবাবুর বহুৎ তকলিফ হইবে, রাত্রে রোঁদে বাহির হইতে! তা ছাড়া একা ঐ সব বদমায়েসের আস্তানার ধারে ঘোরা! ছেলেমানুষ...

বাধা দিয়া আমি কহিলাম,—তাতে কি?

লোটন কহিল—আমি আপনার সঙ্গে যাবো, বাবু। আমার ডিউটি শেষ হইয়াছে। রাত্রে পড়িয়া ঘুমাইতাম, নয় আপনার সঙ্গে থাকিব! সত্যই তো, বড় ঘরের ছেলে, গাড়ী চড়িয়াই

ঘুরিয়াছেন,—পুলিশের এ নোক্‌রি কেন যে নিলেন বাবু!

লোটন আমার সঙ্গে রাত্রে রোঁদে বাহির হইত। তার তখন ঘুমাইবার পালা! সে সময়টা ক্লেশ সহিয়া এমনি ভাবে ঘোরা,—সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, এক পয়সার প্রত্যাশা না করিয়া—আমি শুধু আশ্চর্য্য হইতাম না, কুণ্ঠিতও হইতাম। লোটনকে নিষেধ করিতাম যে, লোটন, ঘুমাইবার সময় ঘুরিয়া কাটাও, এরপর ঘুমাইবে কখন! সকাল হইতেই তো আবার ডিউটী সুরু, তার উপর নিজের রান্না-বান্না আছে। লোটন সে নিষেধ মানিত না। শুধু এই? থানায় থাকিতে একবার ডেঙ্গু হয়—,লোটন যখনই ফুরসৎ পাইত, কাছে আসিয়া গা-হাত টিপিয়া দিত, কোথায় ভালো দুধটুকু পাওয়া যায়, তার সন্ধান করিয়া দুধ আনা…! যথাসময়ে স্নানাহারে ত্রুটি করিলে সে হাঁ-হাঁ করিয়া আসিত। এই দরদ-ছাড়া পুলিশের রাজ্যে এমন মায়া-মমতা, এমন স্নেহের পরশ পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছিলাম। পূজার সময় তাকে কাপড় কিনিয়া দিলাম, শীতে একখানা কম্বল…। কিছুতে লইবে না! লোটনকে তা লওয়াইতে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল, তা আমিই জানি!

তারপর একদিন বদলি হইয়া লোটন চলিয়া গেল টালিগঞ্জে। আমিও থানায় ঘর-সংসার পাতিলাম। প্রতাপও ক্রমে জাগিল! তারপর আজ বহুবাজার, কাল চিৎপুর, পরশু হেষ্টিংস, এমনিভাবে সাত থানার জল খাইয়া রীতিমত পুলিশ বনিয়া উঠিলাম। লোটন মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত। আসিয়া ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে করিত, গৃহিণীর দুই-চারিটা ফরমাশও খাটিয়া যাইত!

ক্রমে যত কাজে পাকা হইতে লাগিলাম, অফিসারের ভ্রূকুটি-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াই জীবনের পথে নিজেকে ছাড়িয়া দিলাম! তাঁর হাসি আর ভ্রূকুটিকেই কম্পাশ করিয়া চলাফেরা সুরু হইল। তস্মিন তুষ্টে—এই মন্ত্র সাধনার মাঝে কোথায় ভুলিয়া বসিলাম, জগৎ-সংসার, মায়া-মমতার বিচিত্র ইন্দ্রজাল, লৌকিকতা, ভদ্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য! চাকরির কঠিন গণ্ডীর বাহিরে ওগুলার সঙ্গে লোটন সিংও কোন্ লক্ষ যোজন দূরে যে সরিয়া গেল, তাদের একটা ক্ষুদ্র রেখাও মনের কোণে ঠাঁই রাখিতে পারিল না!

প্রায় বারো বৎসর পরের কথা। আমি তখন পুলিশ কোর্টের কোর্ট-ইন্‌সপেক্টর। জবরদস্ত জেদে ডায়েরি দেখিয়া কোর্টে মামলা চালাই। যে ডায়েরির পাতায় দেখি, পুলিশের মামলার বাঁধন কিছু শিথিল, সেইখানেই তার অন্তরালে একটা পাকা বন্দোবস্ত সন্দেহ করিয়া ধমকে-চমকে সাক্ষীর দলকে সন্ত্রস্ত করিয়া বাঁধনটাকে কষিয়া আঁটিয়া লই—তার উপর পুলিশ-পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী যেমন হুঁশিয়ার হইয়া লই, তার চতুর্গুণ হুঁশিয়ারীর সহিত

আসামীর সাক্ষীকে জেরায় কাবু অপদস্থ করিতে ছাড়ি না এবং পরিশেষে সজোরে তাকে আইনের খর্পরে ফেলিয়া গভর্ণমেণ্টের জেলখানা ভরতি করিয়া তোলার জেদও তেমনি দেখাই। উভয় পক্ষ উকিল ডাকিয়া মামলা মিটাইতে গেলে বাধা দিয়া এ্যাড্‌-মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টকে জাঁকালো করিয়া তুলিবার দিকে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতে দিই না! চারিদিকে খুব বেখাতিরী বলিয়া যেমন নাম রটিয়াছে, তেমনি জবরদস্ত জেদী বলিয়া উকিলের দলও ভয় করেন, সম্ভ্রম করেন।

এমনি সময়ে এক দিন এক আসামীর চালান পড়িয়া দেখি, আসামীর নাম লোটন সিং জমাদার। অপরাধ,—পাঁচ দিনের ছুটী লইয়া দেশে গিয়া পনেরো দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। ডেপুটী কমিশনার তখন এক সাহেব—ভারী কড়া লোক। কর্ত্তব্যে কেহ ত্রুটি করিলে তাঁর কাছে তার আর ক্ষমা নাই, এমনি তাঁর ব্যবস্থা। আইনের লাইন ধরিয়া চলেন, একটু টলেন না! তাঁকে দেখিলে মনে হয়, নীরস কঠিন পেনাল-কোডের বহিখানি খাড়া আছেন! মায়া-মমতা বলিয়া বৃত্তিগুলার ধারও তিনি কোনো দিন মাড়ান নাই! তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ স্বরূপ লোটন সিং অনেক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিল, বহু বৎসরের চাকরির কথা তুলিয়াছিল, সুদীর্ঘ চাকরির মধ্যে একটী দিনের জন্ত গাফিলি হয় নাই, সে-সব কথার উল্লেখ করিয়া মাপ চাহিয়াছিল,—তবু সাহেবের এক কথা,—বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ!

লোটন আসিল। সে'ই বটে! আরো বুড়া হইয়াছে! তা হইলেও স্নেহে ঢলঢল সেই মুখ, মমতায় ভরা সেই দুই চোখের দৃষ্টি! লোটন হাসিয়া সেলাম করিল। আমি কহিলাম—তাইতো লোটন, তুমি এমন কাজ করলে!

লোটন কহিল,—নশীব, হুজুর!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমি কহিলাম,—কিন্তু এ সব তো নশীবের কথা নয়! অর্থাৎ বুঝচো কি না......

লোটন সব কথা খুলিয়া বলিল। আট-বছর পূর্ব্বে তার স্ত্রী মারা যায়, একমাত্র মেয়ে লছমীকে রাখিয়া। লছমীকে ভাইয়ের কাছে রাখিয়া লোটন নোকরি করিতেছে... টাকা...টাকা চাই···। টাকা নহিলে লছমীর ভালো ঘরে বিবাহ দিবে কি করিয়া! ভাই চিঠি লিখিত, লছমী বাপকে দেখিতে চায়! সে খেলনা পাঠাইয়া কাপড় পাঠাইয়া লছমীকে ভুলাইবার প্রয়াস পাইত। চাকরি ছাড়িয়া যাইতেও তো পারে না, প্রাণ যতই কাঁদুক, মন যতই অধীর হউক! মেয়ে, ... মা-মরা মেয়ে বাপকে দেখিতে চায়—এ কথা বলিলে ছুটীও তো মিলে না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর ক'টা বছর, বৈ তো না.. তারপর একে-বারে পেন্সন লইয়া দেশে ফিরিবে, তখন...

লছমী বাপের কাছ হইতে দূরে

থাকিয়াও ডাগর হইতে লাগিল। লোটন ভাইয়ের কাছে কিছু টাকা মাঝে মাঝে পাঠাইত, আর কিছু সঞ্চয় করিত। যেভাবে নিজেকে রাখিত...কি করিবে, উপায় নাই! মেয়ের মুখ চাহিয়া সে-কষ্টকে কষ্ট বলিয়া ভাবেও নাই কোনোদিন! তার জীবন তো একরকম কাটিয়াই গিয়াছে! ভাঙ্গা ঘরটাকে তালি দিয়া কি আর লাভ! তার চেয়ে যে নূতন ঘরখানা তার দৃষ্টির আড়ালে গড়িয়া উঠিতেছে, সেও যে তার নিজের ঘর! আশার সাধের সে ঘরখানিতে প্রাণ ঢালিয়া দিলে তার যে আর শ্রী-ছাঁদের সীমা থাকিবে না! গত বৎসর হইতেই ভাই লছমীর বিবাহের কথা জানাইতেছিল, কিন্তু একটু ভালো ঘর দেখিয়া বিবাহ দিবে, এই ছিল লোটনের সাধ। পুলিশের নোকরি লইয়া জামাইকে যেন দূর-দেশে পড়িয়া থাকিতে না হয়! ছুটী মেলে না! তার নিজের বেলায় কি হইল? স্ত্রীর অমন অসুখ...শুনিয়া অস্থির-চিত্তে তিন মাস ধরিয়া কেবলি ছুটির দরখাস্ত দিয়াছে, —তবু ছুটী মেলে নাই! যখন ছুটী মিলিল, তখন ছুটিয়া গৃহে স্ত্রীর পাশে গিয়া দেখে, দুঃখিনী নারীর জীবনের দীপ নিবিয়া আসিয়াছে! লোটনের যাওয়ার দু'দিন পরেই সব শেষ হইয়া যায়! এমন নোকরি জামাই করিবে? না। মেয়ে লছমীর যদি অমনি তার মার মতই কোনো দিন অসুখ করে? না হইবে তার সেবা, না শুশ্রূষা! তার চেয়ে দেশেই চাষবাস করে, এমন জোয়ান ছোকরা দেখিয়া সে মেয়ের বিবাহ দিবে।

গেল-বছর হইতে সে ছুটীর দরখাস্ত দিতেছিল—মাসে একখানা করিয়া এই দরখাস্ত দিয়া ছুটির ক্লেম পাকা করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু ছুটী আর মেলে না! শেষে ভাইয়ের উপর ভার দেয়...কি রকম পাত্র চায় ভালো করিয়া জানাইয়া। তার সারা জীবনের সঞ্চয় পাঁচশো মুদ্রা... তাই খরচ করিয়া সে কাপড় কিনিয়াছে, রূপার গহনা গড়াইয়াছে।—সব ঠিক—শুধু ছুটীর অভাব! শেষে সাহেবের পায়ে ধরিয়া বহু কান্নাকাটি সুরু করিল। সাহেব কড়া লোক,—বিশেষ তাঁর এলাকায় তখন কোকেনের কাজ বহুৎ-জোরে চলিয়াছে—লোটন পুরানো লোক, এমন সময় তাকে ছাড়া অসম্ভব!

লোটন কহিল,—বাবু, গরু-ঘোড়ার একটু জখম থাকিলে গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনিয়া জরিমানা করান্...এত দরদ! আর ছেলে মেয়েদের দেখার জন্য আমাদের প্রাণটা যখন ফাটিয়া যায় তখন তা চোখে দেখার ফুরসৎ পান্ না—সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনেও করেন না! কেন? আমাদের জান, আমাদের ছেলেমেয়ের জান্, স্ত্রীর জান্ সে কি ঘোড়া গরুর জানের চেয়েও কম-দামী!

লোটন একটু চুপ করিয়া রহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শেষে এই মাস-খানেক পূর্ব্বে আমার ভাই

খপর দেয়, যেমন চাই তেমনি পাত্র একটি পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা দশ-বারো দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে চায়! না দিলে পাত্র হাত ফস্কায়!

আবার সাহেবের পায়ে পড়িলাম। মেম সাহেবের পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিলাম। মেম-সাহেবের সুপারিশে সাহেব চারদিনের ছুটী মঞ্জুর করিলেন। চারদিন মাত্র! ভাবিলাম, যাক্, তবু তো মেয়েটাকে দেখিতে পাইব। ছুটী পাইয়া রওনা হইলাম। বিবাহও হইয়া গেল। বাবু, সেই মেয়ে... কতদিন পরে দেখা! সে কি ছাড়িতে চায়! চাকরিতে ছুটী নাই—এ কথা সে কাণেও তোলে না। বেচারী! বাহিরের কঠিন জগতের খপর তো রাখে না! তার উপর তার সেই হাসিমাখা মুখ...সে যে দেখিয়াও আমার দেখার আশা মিটিতেছিল না! চলিয়া আসিব শুনিয়া কি তার কান্না!... এই হাসি-কান্নাই যে আমার কাল হইল! সে কান্না এ বুকে কি ব্যথাই যে জাগাইয়া তুলিল! তার গাঁয়ের লোক পরামর্শ দিল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাও, ছুটী বাড়াইয়া লও! কিন্তু কখনো মিথ্যা বলি নাই—আজ বুড়া বয়সে, ক'টা দিনের জন্ম মিছা কথা বলিব? পারিলাম না। সাহেবকে মিনতি জানাইয়া আরো এক-সপ্তাহ ছুটী বাড়াইয়া দিবার দরখাস্ত দিলাম। মেঘে ঢাকা মেয়ের মুখেহাসির আলো ফুটিল! ছুটী মঞ্জুর হইল না! তবু মেয়ের কান্না ঠেলিয়া চলিয়া আসিতেও পারিলাম না!

লোটন সিং কাঁদিতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—আমার আর কেহ নাই বাবু, ঐ এক মেয়ে! কত সাধ ছিল, চাকরি শেষ করিয়া পেন্সন লইয়া দেশে ফিরিব! ফিরিয়া স্ত্রীকে লইয়া মেয়েকে লইয়া শেষ কয়টা দিন মহাসুখে কাটাইয়া দিব! তা স্ত্রী তো রহিল না! বাকী ঐ একটা মেয়ে! দুদিন তার কাছে থাকিয়া তার মুখে হাসির আলো দেখিব, তাও অদৃষ্টে ঘটিবে না! এমন চাকরি! চাকরির পায়ে এমনি করিয়া জান্ বিকাইয়া পড়িয়া আছি...চাকরির দায়ে ঐ একটা মেয়ের পানেও ফিরিয়া চাহিবার ফুরসৎ নাই! বুক যখন মমতায় খাঁ-খাঁ করিয়াছে, তখন পরের ছেলে-মেয়েকে আমার লছমী ঐ ভাবিয়া তাদের মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়াছি! তাদের হাসির মেলা দেখিয়া মশগুল হইয়া ভাবিয়াছি, আমার লছমী ঐ ওরাই! গরিবের ছেলে-মেয়ের হাতে কত-দিন কিনিয়া মিঠাই তুলিয়া দিয়া ভাবিয়াছি, আমার লছমী এ...! কি তৃপ্তি ইহাতে পাইয়াছি আপনারা তা বুঝিবেন না, বাবু! ছেলেমেয়ে ছাড়িয়া বিদেশে যদি থাকিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন—দু'দিন ছুটী লইয়া চারদিন দেরী হয় কেন?

সব কথা শুনিলাম। কিন্তু সেই চাকরি...যতক্ষণ চাকরি করিতেছি, ততক্ষণ পরের পানে দরদ-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিবার অধিকারও তো নাই!

মামলা চলিল। তবুতারি মধ্যে সাহেবকে

একবার ধরিলাম,—লোকটা অনেক দিনের —তা ছাড়া ভালো লোক! একটা তুচ্ছ অপরাধে...

সাহেব বলিলেন—না, এ সব কসুরের মাপ নাই। একজনের দৃষ্টান্তে আর পাঁচ-জন বিগড়াইতে পারে!

তথাস্তু! বলিয়া আইনের কলে লোটনকে লটকাইয়া দিলাম। হাকিম রায় দিলেন, পনেরো দিনের জেল। তাঁরো তো পরের চাকরি! চাকরি যে করে, তার কাছে কারো খাতির নাই! স্নেহ, মায়া, মমতা ...ও-সব কেতাবের কথা! সত্য শুধু অনাদি, অনন্ত হিংসা!

পনেরো দিন পরে কোর্টের ফেরত সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া গড়-গড়াটা পরখ করিতেছি, লোটন আসিয়া হাজির। আমার প্রাণটার উপর সজোরে কে যেন চাবুক মারিল! তার পানে চাহিয়া তখনি চোখ নামাইলাম!

লোটন সেলাম করিয়া হাসিয়া কহিল—দেশে চলেছি বাবু।...আপনার কোনো কসুর নাই। চাকরির খাতিরে আমার জেল! সেই চাকরির জন্যে আপনাকে মামলা চালাইতে হইয়াছে। দুঃখ করিবেন না। তবে, এতদিনের চাকরিট গেল! চুরি, জুয়াচুরি, ঘুষ লওয়া—কোনো কসুর করি নাই! মেয়ের মায়ায় চাকরির কথা একটু ভুলিয়া ছিলাম—তার দরুণ জেল খাটিলাম! সমস্ত জীবনটায় কালো দাগ পড়িল। তাছাড়া পেন্সনটাও গেল!...এই অপমানের জন্যই এতদিন মেয়েকে ছাড়িয়া মায়া-মমতার বুক মাড়াইয়া কেন যে এই চাকরি লইয়া পড়িয়া ছিলাম!

স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোটন আর একবার সেলাম করিল, তার পর কহিল,—বাবুজীরা ভালো আছেন? মা-জী...? জেল-ফেরত আসামী আমি... ভিতরে যাইব না। তাঁদের সেলাম জানাইবেন!

লোটন চলিয়া গেল।

আমার যেন চেতনা ছিল না! বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিল। বুক ঠেলিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইল। ভাবিলাম, হায়রে, যে-লোটন আমার জন্ম অত সহিয়াছে, একা আমার সেবায় একদিনের জন্ম নিজের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই, সেই লোটনের এ উচ্ছেদের ব্যাপারে আমিই শেষ উপলক্ষ হইলাম...এমনি চাকরি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নিরক্ষর গ্রাম্যকবি ৺ শীতল মণ্ডল

বাঙ্গালার সরস মাটী ও জল হাওয়ার গুণে, প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই দুই একজন গ্রাম্য কবির অভ্যুদয় হইয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর অথচ তাহাদের রচিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত এবং ব্যঙ্গ কবিতাগুলি কথা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব অবদান। দুঃখের বিষয়এই সমস্ত কবিতার অধিকাংশই অধুনা লুপ্ত হইয়াছে, এখনও চেষ্টা করিলে কতকাংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে এক সময়ে এই সকল কবিতার বহুল প্রচার ছিল। বর্ত্তমানে পল্লীর প্রাচীন প্রাচীনাগণের মুখে দুই একটা কবিতা শুনিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নৈহাটী অধিবেশনে প্রাচীন সাহিত্য কিংবদন্তী প্রাদেশিক শব্দ ইত্যাদি সংগ্রহ জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু মেদিনীপুর ভিন্ন অন্য কোন জেলায় আশানুরূপ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। যশোহর জেলায় নড়াল মহকুমার অন্তর্গত রায়গ্রাম একটী বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর বংশধর ঘোষ বাবুদের এক সময়ে খুবই প্রতাপ ছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের ন্যায় আধিপত্য না থাকিলেও প্রাচীন বংশ বলিয়া এতদঞ্চলে ইঁহাদের সামাজিক সম্মান প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ আছে। দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষ গণের সুব্যবস্থায় বার মাসে তের পার্ব্বন "দোল দোল দুর্গোৎসব" অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। মালদহের গম্ভীরা বা পশ্চিম বঙ্গের শিবের গাজন এতদঞ্চলে দোলপূজা বা পাটপূজা বলিয়া পরিচিত। রায়গ্রাম পল্লীমঙ্গল সমিতি হইতে প্রাচীন সাহিত্য কিংবদন্তী প্রাদেশিক শব্দ ইত্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে জানিতে পারিলাম, এই রায় গ্রামেরই ঘোষ বাবুদের দোলপূজা উপলক্ষে রায় গ্রামের করবংশ সম্ভূত জনৈক গ্রাম্যকবি **ছিদাম** (**শ্রীদাম**) **কর** দোল পূজার সমস্ত অনুষ্ঠান ত্রিপদী ও পয়ারাদি ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। আজও পূজা উপলক্ষে তাহাই পঠিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কবিতা লোকের মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে পাঠান্তর ঘটিয়াছে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত ও হইয়াছে, ভ্রম প্রমাদ ত আছেই। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়া সত্যানুসন্ধান সময় সাপেক্ষ। "পল্লীমঙ্গল সমিতির" চেষ্টায় সংগৃহীত রায় গ্রামের

নিরক্ষর গ্রাম্য কবি ৺ **শীতল মণ্ডলের রচিত** কয়েকটী ব্যঙ্গ কবিতা সমাগত সুধী মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত দেল পূজা উপলক্ষে দশাবতার সংক্রান্ত কবিতা পঠিত হইয়া থাকে, এই কবিতা গুলিও দশাবতারের অনুকরণে রচিত, তজ্জন্যই আমরা এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে তাহার কিছু আভাস দিয়াছি। ছিদাম করের রচিত কবিতা পঠিত হইবার পর শীতল মণ্ডলের ব্যঙ্গ কবিতা শুনিবার জন্য লোকে সাগ্রহে অপেক্ষা করিত! মুখে মুখে কবিতা রচনা করিবার ইহার অসাধারণ শক্তি ছিল অথচ লেখাপড়া কিছুই জানিত না। কবিতা গুলি আমরা ৺ শীতল মণ্ডলের ভ্রাতা শ্রীকেদার মণ্ডলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় ইহার রচিত অনেক কবিতা অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

(১)

ছাই গাদার' পর থাকেন প্রভু দুই সারি তার মাই,
বছর বছর বিয়েন (প্রসব করে) তিনি দুধের পেত্যাশ (প্রত্যাশা) নাই,
শিয়েল (শৃগাল) দাবড়ান (তাড়া) তিনি অনেক মে(হ)নতে,
দ্বং প্রণাম হই কুকুর দেবী নমস্তে।

(২)

নেঙ্গটী পিদং (পরিধান) করি বিল চরণ,
এড়ো নিয়ে কান্ধে থালই নিয়ে হস্তে,
ঘাটং পিস্তে হড় হড়োয়ে দৌড় দিলেন গজার দেবী-নমস্তে।

(৩)

জলের তলে থাকেন প্রভু গা করেছেন হিম,
নরম মাটী পা'য়ে প্রভু পাড়ায়ে গেছেন ডিম;
হাতপাগুলো খাটো খাটো দীঘ্‌লে দীঘ্‌লে নখ
কপালে তিলকের ফোঁটা কুত্‌কুতলে চোক!

(৪)

চারি পায় প্রভু খাট নেজং
বনে থাকেন প্রভু বন গমন
দড়ী পাতং করি কালা হাতং
প্রভুর কুঁচি দিয়ে নথ্‌নী ঝালন।

(৫)

জলের তলে থাকেন প্রভু লম্বা লম্বা রয়,
ধান কাটিতে গেলে প্রভু লাগেন আসে পায়,
প্রভুরে ছাড়াতে কিছু ছেপ (থুতু) লাগে হস্তে,
টান দিয়ে ফেলে দিলাম জোঁক দেবী নমস্তে।

(৬)

ডালের পর থাকেন প্রভু করেন খা খা,
ঠাকুরদের নৈবিদ্দি কিছুই রাখেন না,
গরুর টিকরেটী খোচেন অনেক মে(হ)নতে,
দ্বং প্রণাম হই কাক দেবী নমস্তে।

(৭)

মাটীর তলে থাকেন প্রভু মাটীর সোড়ং(সুড়ঙ্গ)
বটবৃক্ষের তরু লতা দন্তে ধারণ,
ডোল ভাঙ্গি কাটেন তিনি অনেক মে(হ)নতে
দ্বং প্রণাম হই ইন্দুর দেবী নমস্তে।

(৮)

মেও মেও করেন প্রভু কাটাকুটি খান,
টাকাচুকো পা'লে পরে তখনি উম্বলান,
(উত্তোলন)
ইন্দুর দাবড়ান তিনি অনেক মে(হ)নতে,
ত্বং প্রণাম হই বিড়াল দেবী নমস্তে।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বয়নশিল্প

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিন আফ্রিকা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে জন্মভূমির লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী বস্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না। দেশের এই দুর্দশা তাঁহার প্রাণে বড় বিষম আঘাত দিল; তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। কি করিয়া এই বিষম সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহাই হইল, মহাপুরুষের তপস্যার বিষয়। গভর্ণমেণ্টকে দিয়া এই সমস্যার একটা কিনারা করিতে চাইয়াছিলেন, কিন্তু সরকার হইতে কোন আশাই তিনি পাইলেন না। এই সময় ভারতের বুকের উপর ডায়ার ওডায়ার দ্বারা জালিয়ানওয়ালা-বাগে যে ভীষণ নরহত্যা হইল, শত শত কোমল প্রাণ পৃথিবীর বুক হইতে স্বর্গে চলিয়া গেল, আর সেই নিরপরাধ ভাই-বোন্‌দের রক্তে পাঞ্জাবের বুক রঞ্জিত হইল এবং সেই রক্তের স্রোত সিন্ধু গঙ্গা বাহিয়া ভারতের প্রতি গৃহকোনে গিয়া পৌঁছিল। এই নিরপরাধ ভাইবোন্‌দের শোকে ভারতবাসী কাঁদিয়া উঠিল। অন্যায় নরহত্যার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট বিচার চাহিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করিল না। ভারতবাসী তখন শোকে আচ্ছন্ন। তাহারা প্রতি-কারের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রতিকারের ভার পড়িল সমস্ত দেশের জনশক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের উপর। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার ও দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য কংগ্রেস সরকারের সহিত অসহযোগ করিল। আন্দোলনের নায়ক হইলেন

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র হইল, চরকা ও খদ্দর। খদ্দরের এবং চরকার প্রধান কাজ হইল, দেশের নিরাহারী নরনারীর মুখে দুইমুঠা অন্ন দিয়া তাহাদিগকে বাঁচান এবং বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ মায়ের জাতিকে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা তাহাদের লজ্জা নিবারণ করা। দেশের চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, চরকা ও খদ্দরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে যুবকের দল গ্রামের দিকে ছুটিল। একটা হুজুগে দেশ গরম হইয়া উঠিল! চরকা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই নূতন হুজুগে চরকা গরীব দুঃখীকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না এবং তাহাদের দুইমুঠা অন্ন ও একখণ্ড বস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিল না। মধ্যম শ্রেণীর লোক হুজুগের মত্ততায় মাতাল হইয়া চরকা কাটিল; কিন্তু তাহার পরিমান অতি অল্প। এই হুজুগ বেশী দিন চলিল না। মহাত্মা জেলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর একটা অবসাদ আসিল। অনেকেই আস্তে আস্তে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কেহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিল, কেহ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী হইয়া দেশ সেবা করিতে লাগিল, কলেজের ছাত্রবৃন্দ আবার কলেজে যোগ দিল, উকীল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টারগণ পুনরায় আদালতে যোগদান করিল; জাতীয় বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল বা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত স্কুলে পরিণত হইতে লাগিল। দেশে অবসাদের একটা রুদ্রমূর্ত্তি হাঁ, হাঁ, করিতে লাগিল। কেবল যে দেশে অবসাদ আসিল তাহা নহে, নেতাদের ভিতর মতানৈক্য হইতে আরম্ভ করিল, ফলে কংগ্রেসের ভিতর দুইটী দলের সৃষ্টি হইল—স্বরাজ্যদল ও নো-চেঞ্জার দল।

এই অবসাদের দিনে যখন চরকা লোপ পাইতে বসিল এবং দেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; উলঙ্গ মায়ের জাতির বস্ত্রের কোন প্রতিকার হইল না; তখন একদল লোকের মনে সেই বিষম আঘাতটা নূতন হইয়া লাগিল। তাঁহারা বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে চরকা লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা গরীবের ভিতর প্রবেশ করে নাই, তাহাদের ভিতর ইহা প্রবেশ করাইতে পারিলে, এই চরকা দ্বারাই তাহাদের সমস্ত দুর্দ্দশার অবসান করা যায়। এই কাজের ভার গ্রহণ করিল নো-চেঞ্জারগণ এবং তাহাদের সংযোগে কাজ করিতে লাগিল দেশের প্রধান প্রধান কয়েকজন মহারথী—মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে খাদী প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম, বিহারে গান্ধী কুটীর, তামিল নাইডুতে খদ্দর বোর্ড এবং অন্যান্য প্রদেশে ছোট বড় আরো অনেকগুলি

প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল কর্ম্মীগণ এমন ভাবে কাজ করিতে লাগিলেন যে, দেশের অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্থ নরনারী অন্ন বস্ত্র পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খদ্দরের পরিমান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা কিছু যে উন্নত হইয়াছে, তাহা সাধারন লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক; অর্থনীতি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অনেকে বুঝেন না যে, খদ্দর এবং চরকা, স্বাধীনতা লাভের একটা মস্তবড় অস্ত্র এবং অনেকে ইহাও বুঝেন না যে, কি করিয়া এই চরকা দ্বারা দরিদ্র দিগের দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হইতে পারে। আমরা এসম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত বয়ন ব্যবস্থার কথা দিয়া বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, সেই সময় অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে কিরূপে খদ্দর প্রস্তুত হইত এবং তাহাদ্বারা লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র জিনিষটা কি?—তাহা অনেকেই জানেন না; আমরা যাঁহাকে চাণক্য বলিয়া জানি এবং যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসন দান করেন; পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই কৌটিল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একখানা গ্রন্থ লিখিয়া যান; তাহার নাম অর্থশাস্ত্র। এতদিন এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতাম না। কিছুদিন হইল মহীশূরের লাইব্রেরী হইতে শ্যাম শাস্ত্রী নামক একজন লাইব্রেরীয়ান উহার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং ইংরেজী ভাষায় উহার অনুবাদ করেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, যে সকল বিষয় এই পুস্তকে লেখা আছে, উহা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের শাসন পদ্ধতি এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত, তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যে দেখা যায় নাই। শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য অনেক বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজ শৃঙ্খলার সহিত করিবার জন্য একজন প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত হইত। সৈন্য, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগের মত বয়নশিল্পের উন্নতির জন্যও একটী বিভাগ ছিল। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী এই বিভাগের সমস্ত পরিদর্শণ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে তাহার অধীনে উপকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত।

বয়ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী কাজের সুবিধার জন্য তাহার সমস্ত কাজের কতকগুলি উপবিভাগ করিয়া লইত এবং প্রত্যেক উপবিভাগে একজন উপকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত! সে তাহার উপবিভাগীয় সমস্ত কাজের ভুল ত্রুটির জন্য প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট দায়ী থাকিত।

সাধারণতঃ সমস্ত বিভাগে চারটী উপবিভাগ ছিল,—সূতা, যুদ্ধের সাজ পোষাক, কাপড় ও রসি।

প্রত্যেক বাড়ীর স্ত্রীলোকগণই সূতা কাটিত এবং ঐ সূতার কাপড় বাড়ীর সকলে পরিধান করিত। বৎসরে যত কাপড়ের আবশ্যক তাহা স্ত্রীলোকগণ সূতা কাটিয়াই সরবরাহ করিত। ইহা ভিন্ন যে সকল বিধবার অন্ন সংস্থানের কোন উপায় থাকিত না; তাহারা সরকারী বয়ন-বিভাগের অধীনে সূতা কাটিয়া অনায়াসে তাহাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিত এবং অসময়ের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। খোঁড়া স্ত্রীলোক, অভিভাবকহীনা বালিকা, রাজদ্বারে অভিযুক্তা স্ত্রী, বেশ্যা-স্ত্রীলোকের মাতা, রাজার বৃদ্ধা দাসী, প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ বয়নবিভাগের অধীনে কাজ করিত। যাহারা ভাল সূতা কাটিতে পারিত, তাহারা অতিরিক্ত মজুরী পাইত, তাহা কাটুনীগণের অসময়ের জন্য গচ্ছিত রহিত। অকর্ম্মণ্য পুরুষগণও এই বিভাগে কাজ করিত। কাটুনীগণ, তূলা, শোন-পাট, রেশম্ শিমলতূলা প্রভৃতি হইতে সূতা কাটিত। রেশম প্রভৃতি দ্রব্য হইতে যে সূক্ষ্ম সূতা এবং উহা হইতে যে মিহি কাপড় প্রস্তুত হইত তাহা দ্বারা রাজপোষাক তৈয়ার হইত।

"Widows, criple women, girls mendicant or ascetic women (provrajita), women compelled to work in default of paying fines (dandapratikarini), mother of the prostitutes, old women-servants of the Kings and prostitutes (davrdasi) who have ceased to attend temples or service shall be employed to cut wool, fibre, cotton panicle (tula) hemp, and flax." বয়ন বিভাগের সূতা বিভাগের উপকর্ম্মচারীগণ বাড়ী বাড়ী অর্থাৎ কাটুনীগণকে তূলা দিয়া আসিত। যে যে প্রকার সূতা কাটিত তাহাকে সেই প্রকার তূলা দেওয়া হইত। সূতা কাটা হইলে নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন পর ঐ সকল কর্ম্মচারীগণ, নূতন তূলা এবং মজুরী দিয়া সূতা লইয়া আসিত।

এই সূতার ভাল মন্দ এবং প্রকার-ভেদে নানা ভাগে ভাগ করিত। যে তাঁতি যে রকম কাপড় তৈয়ার করিত, তাহাকে সেই রকম সূতা দেওয়া হইত। তাঁতিগণ কাপড় বয়ন করিয়া যথেষ্ট রোজ-গার করিত। সময় সময় ভাল তাঁতি-গণকে উৎসাহ দিবার জন্য, নানা প্রকার উপহার বিতরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েরাও এই কাজে যোগ দিত। কাজের সুবিধার জন্য অনেক সময় বয়নের অনেক কাজ স্ত্রীলোকগণ করিত। রেশম প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্রবয়নের জন্য পরিদর্শকগণ এই সকল তাঁতি ও স্ত্রীলোকগণের সহিত মিলা-মিশি করিত। যদি কখন এই সকল

পরিদর্শকগণ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কুদৃষ্টি করিত তাহা হইলে তজ্জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত।

ভাল বস্ত্র হইতে যুদ্ধের জন্য নানা প্রকার সাজ সরঞ্জাম তৈয়ার হইত। পোষাক তৈয়ার করিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই নিযুক্ত হইত। যুদ্ধে সাজ সরঞ্জাম ভিন্ন রাজপরিবারের পোষাকও এই সকল স্ত্রীপুরুষগণ তৈয়ার করিত। অতিরিক্ত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও পোষাক দেশের ধনী লোক ক্রয় করিয়া লইত।

চতুর্থ বিভাগের উপকর্ম্মচারীগণ, শোন-পাট, কুশবৃক্ষের নরম বল্কল হইতে স্ত্রীলোক-দ্বারা রসি তৈয়ার করাইয়া লইত, এই সকল রসি হাতী ঘোড়া প্রভৃতি বাঁধিবার এবং যুদ্ধের নানা কার্য্যের জন্য ব্যবহার হইত।

বয়নশিল্পের উন্নতির জন্য যেমন একটি বিভাগ ছিল; তেমনি কৃষিবিভাগ নামে একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কার্পাস প্রভৃতি নানা প্রকার তুলা উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। ইহা ভিন্ন বয়ন বিভাগের অনেক কর্ম্মচারী নানা স্থান হইতে উত্তম পশম ও রেশম সংগ্রহ করিত।

বৌদ্ধযুগে বস্ত্র শিল্পবিভাগে কাজ করিয়া মায়ের জাতি আপনাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিত। কেহ কেহ উহা হইতে অনেক কিছু সঞ্চয় করিত এবং দান ধ্যান করিত। সে সময় যে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল তাহার জন্যই আমরা ঢাকার জগৎ বিখ্যাত মসলিন দেখিতে পাই এবং তাহার ফলেই এক ভারতীয় বস্ত্র সমস্ত ইউরোপের বিলাস বসন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিবৎসর এমনি করিয়া কোটী কোটী টাকা বিদেশ হইতে ভারতে আসিত। আজকালও সেইভাবে কাজ করিয়া মায়ের জাতি নিজেদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহাতে ভারতের দারিদ্র্য নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে।

এখন কথা হইতেছে যে, যে সকল স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী খদ্দর করিয়া দেশের দরিদ্রগণকে দুই মুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া-দিতেছেন; দেশের লোক তাঁহাদিগকে বাধা দেন কেন? অনেকে মিলের কথা বলিয়া খদ্দরের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভি-যোগ আনেন, তাহারা কি বুঝেন না,—মিলের সাহায্যে দরিদ্রদিগের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এবং খোঁড়া, রোগা বিধবা প্রভৃতি লোকের দারিদ্র্য দূর হওয়া সম্ভব নহে। মিলের কথা মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মহাপুরুষই বলিয়াছেন সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

"পাগল"

আলোচনা

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা

—— :০: ——

মানব যে দেশেই জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের ভাষাই তাহার মাতৃভাষা। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতৃক্রোড়ে তাঁহারই স্তন্যে লালিত পালিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কথা বলিতে শেখে। তখন সে মাতারই কণ্ঠধ্বনি ও ভাবভঙ্গি অনুসরণ করে। অতীব শৈশবাবস্থায় সন্তান সন্ততির সঙ্গে পিতার দেখা শুনা খুব কমই হইয়া থাকে বলিয়া শিশু পিতা অপেক্ষা মাতাকেই বেশি চেনে ও তাঁহারই বাক্য অনুকরণ করিতে শেখে। এবং তজ্জন্যই মানবের কথিত ভাষাকে পিতৃ-ভাষা না বলিয়া মাতৃভাষা বলা হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে বাঙ্গালা দেশের মুসলমানের কথিত ভাষা কি হওয়া উচিত? আমার মতে যখন বাঙ্গালাদেশেই বাঙ্গালী মুসল-মানের জন্ম, তখন বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাই বাঙ্গালার মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে পারে না।

ইহার কারণ এই যে এই বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর সংখ্যা যতই হউক না কেন, তাহার অর্দ্ধেকের উপর অধিবাসী মুসলমান। যখন বঙ্গের অর্দ্ধেকের উপর মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষাতে কথা বলিয়া থাকেন এবং ইঁহাদের পিতা মাতা, পিতামহ, মাতামহ, প্রভৃতি পুরুষ পরম্পরায় বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বলিয়া আসিতেছেন, তখন বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের মুসলমানের মজ্জাগত এবং ইহারই শব্দ তরঙ্গ তাঁহার প্রত্যেক ধমনীতে প্রবাহমান। এস্থলে আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালা দেশের দুই একজন স্বনামধন্য মুসলমান বাঙ্গলা ভাষা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হইতেছে দেখিয়া ঈর্ষা বশতঃই হউক্ আর যে কারনেই হউক্ উর্দ্দু ভাষাকে বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষার বাহন করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বাঙ্গলা ভাষা যাহাতে শিক্ষার বাহন না হইতে পারে তজ্জন্য মহা আন্দোলন করিতেছেন। তবে সুখের বিষয় সে সকল নামজাদা মুসলমান সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াই সমস্ত বঙ্গ দেশীয় মুসলমানের প্রিয়ভাজন হইবেন কিন্তু ইহাতে তাহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পরিয়াছেন তাহা জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে দুই একটি মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবার ও আপত্তিকারী কতিপয় ব্যক্তি উর্দ্দুভাষী হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বাংলার বাকী প্রায় তিনকোটী মুসলমানের সুবিধা অসুবিধার দিকে মোটেই দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষার স্থলে সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞিত একটি ভাষাকে স্থান দিতে হইবে ইহাই বা কি রকম আব্দার? তাহারা যে ভাষায় জন্মকাল হইতেই কথা বলিয়া আসিতেছে তাহারা লেখাপড়া না

জানিলেও সেই ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে ও জীবন যাপন করিতেছে তখন সেই ভাষায় শিক্ষালাভ করিলে তাহাতে যেমন সকল আবশ্যকীয় বিষয়েরই মনোভাব প্রকাশ করা যায় আমার বোধ হয় আর কোন বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ দখল থাকিলেও তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করা যায় না। আমি এস্থলে একজন অতীব বরেণ্য একটি প্রধান মুসলমান সুন্নিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার মন্তব্য প্রকাশ করিব। ইঁহার নাম ইমাম মোহাম্মদ হানিফ অলম্বোমানী। ইনি পারস্য দেশবাসী। প্রত্যেক মুসলমান তিনি যে দেশবাসী হউন না কেন—যেরূপ আজ পর্য্যন্ত উপাসনা আরবী ভাষায় করিয়া থাকেন—তদ্রূপ তিনিও আরবী ভাষায় উপাসনা করিতেন বটে, কিন্তু উপাসনার শেষভাগ মোনাজাত (স্তবস্তুতি) পারসী ভাষাতেই করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি পারস্য দেশবাসী, পার্শীভাষা আমার মাতৃভাষা। অতএব উপাসনান্তে ঈশ্বরের নিকট মোনাজাত অর্থাৎ তাঁহার নিকট আবেদন নিবেদন ও তাঁহার স্তবস্তুতি যেরূপ আমার মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি, বোধ হয়, আমি অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ ব্যক্ত করিতে পারি না। তাই আমি আমার মাতৃভাষা পার্শীতে স্তবস্তুতি (মোনাজাত) করিয়া থাকি। উহাতে কিছুই আসে যায় না।

অতএব বাঙ্গলা শিক্ষার বাহন হইলে পাঠ্যপুস্তকগুলি বাঙ্গালাতেই পাঠ করিতে হইবে এবং পরীক্ষা বাঙ্গালাতেই দিতে হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি বাঙ্গালায় উত্তর প্রদানে যেরূপ সক্ষম হইবে বোধ হয় অন্য কোন নূতন মার্জ্জিত ভাষায় তদ্রূপ সক্ষম হইবে না। কারণ বাঙ্গালা তাদের মাতৃভাষা। যেমন ইমাম হানোফী সাহেব বলিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমি বলিতে পারি যাঁহারা উর্দ্দুকে বাঙ্গালার মাতৃভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মুসলমান ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন বরং তাঁহারা অনিষ্টকারী!

আমার বোধ হয় তাঁহারা কলিকাতার কতকগুলি মুসলমান বাসেন্দার নিমিত্ত (ইঁহাদিগের অনেকেই পশ্চিমদেশবাসী বহুকাল বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন বলিয়া বাঙ্গালি হইয়াছেন) সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানের কথিত ভাষাকে ভাষার মধ্যে না ধরিয়া উর্দ্দুকে স্থান দিতেছেন। যে সকল কলিকাতার মুসলমান উর্দ্দুতে কথা বলেন, তাহা উর্দ্দুও নহে, বাঙ্গালাও নহে, হিন্দিও নহে তাহা একটা জগাখিচুড়ী মাত্র। এরূপ মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের জন্য যে বাঙ্গালা ভাষাকে একেবারে পাল্টাইয়া দিতে হইবে এ'ও বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

এক্ষণে দেখা যাউক উর্দ্দু ভাষাটা কি। প্রত্যেক দেশেরই এক একটা ভাষা আছে। আমি মুসলমানের দেশ লইয়া আলোচনা করিব। আরব দেশে ভাষা আরবী, পারস্য দেশের পার্শী, তুরস্কের তুর্কী, আফগানিস্তানের পুস্তু ইত্যাদি। এই হিসাবে ধরিলে উর্দ্দু কোন্ দেশের ভাষা? ইহার তো কোন অস্তিত্বই নাই। উর্দ্দু তাহা হইলে কোন দেশেরই ভাষা নহে, উর্দ্দু বলিয়া তো কোন দেশই নাই। অথচ সেই উর্দ্দুর খাতিরে বাঙ্গালাদেশের প্রায় তিন কোটী মুসলমানের জাতিগত, মজ্জাগত, প্রকৃতিগত, পুরুষপরম্পরাগত (অর্থাৎ যতদিন হইতে এসলাম ধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইয়াছে সেই দিন হইতে কথিত) ভাষা বাঙ্গালা ভাষাকে নাকচ করিতে হইবে।

উর্দ্দুভাষার ইতিহাস এরূপ জানা যায়; উর্দ্দু অর্থে শিবির বা সৈন্যদল। উর্দ্দু মুসলমান বাদশাহ দিগের আমলের শিবির ভাষা

মুসলমান বাদশাহদিগের সৈন্যদলে নানা দেশীয় নানান্ ভাষী সৈন্য ছিল। যুদ্ধের সময় সকলকেই এক শিবিরে বাস করিতে হইত। সে সময় তাহাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিবার বড়ই অসুবিধা হইত বলিয়া তাই হিন্দি (হিন্দুস্থানের ভাষা) আরবী, পার্শী, প্রভৃতি ভাষার বাক্য লইয়া একটি মিশ্রিত ভাষা গঠিত করিয়া সৈন্য শিবির মধ্যে প্রচলিত করা হইয়াছিল বলিয়া এই ভাষার নাম উর্দ্দু (শিবির) দেওয়া হয়। ইহা কোন দেশের ও ভাষা নহে বা কোন জাতিরও মাতৃভাষা নহে। এরূপ উর্দ্দু ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াও বাদশাহগণ আরবী ও পার্শীতে শিক্ষার ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার কোন ব্যতিক্রম করেন নাই।

বাঙ্গলাদেশে মুসলমান আগমনের পর বাঙ্গলার ইতিহাসে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না যে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত্যধিক, তথায় কি ইতর, কি ভদ্র, সকল শ্রেণীরই মুসলমান কেবল উর্দ্দুতেই কথা বলিতেন এবং উর্দ্দুতে লেখাপড়া শিখিতেন। যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে তদ্দেশীয় মুসলমানেরা আদৌ বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না বা উর্দ্দু বলারও কিছু কিছু চিহ্ন থাকিত! উর্দ্দু একটি মিশ্রিত ভাষা। আরবী বা পার্শীর ন্যায় কোন বিশিষ্ট দেশের ভাষা নহে। ইহা এক্ষণে একটি অর্জ্জিত (acquired) ভাষা মাত্র। অতএব জেদের খাতিরে কি এই অর্জ্জিত ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অসম্ভব। আমি বাটীতে কথা বলিব বাঙ্গলায়। আমার সন্তান সন্ততি যখন কথা বলিতে শিখিবে তখন তাহারাও কথা শিখিবে বাঙ্গলায়, এতদ্ব্যতীত হিন্দু প্রতিবেশীর সঙ্গে কথার আদান প্রদান হইবে বাঙ্গলায়, আর আমার শিশু সন্তানকে পাঠশালে আসিয়াই শিক্ষালাভ করিতে হইবে উর্দ্দুতে; বর্ণমালা শিখিবে উর্দ্দুতে, লিখিতে শিখিবে উর্দ্দুতে, পড়িতে শিখিবে উর্দ্দুতে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি বলেন যে ক্রমশঃ শিক্ষার প্রভাবে উর্দ্দুই মাতৃভাষার স্বরূপ হইবে। হয়ত যাঁহারা এই উর্দ্দুভাষার পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা সম্ভ্রান্ত বড়লোক বলিয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরচারিনীগণ ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়া উর্দ্দুভাষিণী হইতে পারেন। তাই বলিয়া বঙ্গের সমস্ত মুসলমান কৃষককুল যাহাদিগের সংখ্যা সম্ভ্রান্ত মুসমানের সংখ্যা অপেক্ষা খুব বেশী তাহাদিগের পুত্রসন্তানের তো লেখাপড়া হয়ই না তার উপর আবার মেয়েদের লেখাপড়া হইবে—বাঙ্গলা ছাড়া তাদের কিরূপে কথাবার্ত্তা হইবে। অধিকন্তু, এই বাঙ্গলা দেশে যত হিন্দু ততই মুসলমান। মুসলমান না হয় কিছু বেশি। বহুকাল ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান একত্রে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহিত সমস্ত কাজের আদান প্রদান রহিয়াছে। অতএব তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলায় বলিতে হইবে আর বাটীতে আসিলেই উর্দ্দু। মন্দ ব্যবস্থা নয়। এক বঙ্গ দেশবাসী মুসলমানকে বাধ্য হইয়া একাধারে দুইটি ভাষা শিখিতে হইবে, বাঙ্গলা আর উর্দ্দু।

বাঙ্গলা ভাষাটা হিন্দুদের মাতৃভাষা বলিয়া যদি ইহাকে মুসলমানের মাতৃভাষা বলিতে ঘৃণা করা হয় তো সেটাও অন্যায়। একদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতি—আজি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাস করিতেছেন। সেই দেশেরই উৎপন্ন সামগ্রী এই দুই জাতিরই খাদ্য। সেই আহার্য্য সামগ্রী হইতে উভয় জাতির দেহ ধারণ ও দেহের পুষ্টি সাধন। সেই দেশেরই আবহাওয়ায় উভয় জাতিরই প্রকৃতিগত এবং সেই দেশের প্রকৃতিদত্ত ভাষাও এই দুই জাতির মাতৃভাষা অর্থাৎ সেই দেশের ভাষায় কথা•

বলাও প্রকৃতির একটি নিয়ম। অতএব সেখানে হিন্দুই থাকুন আর মুসলমানই থাকুন যে কোন জাতিই থাকুন না কেন তাঁহাদের সেই একই ভাষায় কথা বলিতে হইবে এবং সেই একই ভাষায় লেখাপড়া শিখিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম করা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

মুসলমানেরা ইচ্ছা করিলে উর্দ্দু পড়িতে পারিবে এরূপ ব্যবস্থা করিলে কোন দোষ হইবে না। তাই বলিয়া যে বাধ্য হইয়া সকল মুসলমানকেই প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে হইবে তাহা খনই সর্ব্বমত সাপেক্ষ নহে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদযোগ্য।

তাঁহারা দেখাইয়াছেন উর্দ্দু ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় Islamic culture ও thought প্রকাশ করা যায় না। এতটাও ঠিক কথা নহে। এই ওজরে উর্দ্দু ভাষাকে preference দেওয়া আর বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত মুসলমানদিগকে অযোগ্য বলা দুইই সমান; কারণ যখন তাঁহারা একমাত্র উর্দ্দু ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায়—যে ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা—Islamic culture ও thought প্রকাশ করিতে পারিবেন না তখন তাঁহারা অযোগ্য ছাড়া কি হইতে পারেন। বরং বাঙ্গালা ভাষায় Islamic culture ও thought প্রকাশ করিলে বঙ্গের অর্দ্ধেক অধিবাসী হিন্দুগণও এই Islamic culture ও thought এর রস আস্বাদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপে মুসলমানদিগের পূর্ব্ব গৌরব তাঁহাদিগের জ্ঞান গোচরে আসিলে তাঁহাদিগের মুসলমানদিগের প্রতি যে বিতৃষ্ণার ভাব আছে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

আর এই Islamic ও thought বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে বাঙ্গলা ভাষায় যদি আরবী ও পার্শী শব্দের ব্যবহার করিতে হয় তাহাও করা চাই এবং আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণের ইহাতে আপত্তিও করা চাই না। ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যদি বিদেশীয় ভাষার শব্দসম্ভার ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে তাহাও দোষনীয় নহে। মহামহিম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন "যাহা চলে তাহা চালাও" তাহা ইংরাজী হউক পার্শীই হউক আর যে কোন ভাষাই হউক না কেন সেই সকল ভাষার শব্দ ব্যবহার করা চাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইংরাজী ভাষা। ইহার পরিপুষ্টির জন্য ইংরাজ লেখকেরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষা হইতে কিছু না কিছু শব্দ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই এবং ইহাতে ভাষার শ্রীসম্পদ বাড়িয়াছে। বলিতে পারেন ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা বিকৃত হইতে পারে; কিন্তু হিন্দু ভ্রাতারা মুসলমানদিগকে একেবারে বাদ দিয়াও বঙ্গ ভাষার উন্নতি সাধন করিতে পারেন না। কারণ যখন বাঙ্গালার অর্দ্ধেকের উপর অধিবাসী মুসলমান, তখন তাঁহারাও যে স্বতন্ত্র একটি মুসলমানী-বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ করাও মুসলমানদিগের উদ্দেশ্য নহে বরং যাহাতে মিলিয়া মিশিয়া ভাষার উন্নতি সাধন হয় তজ্জন্য হিন্দু মুসলমান এই দুই জাতিরই চেষ্টা করা উচিত। কারণ ইহাতে উভয় জাতিরই পক্ষে সম্পূর্ণ কল্যাণকর। ইহাতে মিলন সুদুর পরাহত। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কারণ হিন্দু মুসলমানের মিলন একান্তই আবশ্যক। কিন্তু এই মিলন এক সাহিত্যের ভিতর দিয়াই অন্য রকমে আশা করা যায় না। সুতরাং ইহাতে একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা না দেখাইয়া বরং উদারতা দেখানই আমাদিগের হিন্দুভ্রাতাগণের উচিত। বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে এ সম্বন্ধে প্রথম চেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মহম্মদ কেৰ্চাঁদ বিদ্যাবিনোদ।

দ্রৌপদী

—০—

ওগো পঞ্চ দেবতার উপাসকের দেশ, তোমার দেশের মেয়েরা যখন সেই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করেন তখন সেই পাঁচটি দেবতা কাঙ্গালের মত লুব্ধ হয়ে তাদের চঞ্চল মীন চক্ষু লয়ে সে মেয়েদের আশে পাশে ঘুরে বেড়ান তারা কি সুদর্শন হয়ে আসেন না? তবে কেন দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী শুনে শিহরে উঠ? চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি দেবতা কি সেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরম পুরুষ বাসুদেবের মূর্ত্তি নয়? তিনিই যে পঞ্চানন শিব ঠাকুরটি। আমি যে অযোনিসম্ভবা শিবশক্তি গৌরী। আমি না থাকলে আমার শিব ঠাকুরটি শব মাত্র। আলো দেখেছ; কল্পনা করে বুঝ দেখি সেই আলোর যদি দাহিকা-শক্তি না থাকে তবে সে আলো কি একটা মায়া মরীচিকার মত নিরর্থক নয়?

যখন নিজের ভিতর তাঁকে দেখে তাঁর মিলনের সময় আপনাহারা হয়ে যাই, যখন তাঁর বিরহের মধ্যে নিখিলের মাঝে তাঁকে দেখি, সবার মধ্যেই আমাকে দেখি, আর যখন তাঁর মধ্যেই সব দেখার অভ্যাসই আসল দেখা, তখন যে নারী সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বামী বলে জানে তার কুণ্ঠাশূন্য মন যে পুরুষ মাত্রকেই যারা তাদের চঞ্চল মীন চক্ষুকে বিদ্ধ করে সুদর্শন হয়ে আসবে তাদের সবার মধ্যে তাঁকে দেখে মনে মনে তাদের ভালবাসবে লুকিয়ে চুরিয়ে তাদের দেখে নেবেই এতে অনিয়ম কিছুই নাই। এ নারীত্বের গৌরব।

আমি অযোনী-সম্ভবা দ্রৌপদী। তোমরা যাকে প্রকৃতি বল, মায়া বল, অদৃষ্ট বল, কর্ম্ম বল, আইন বল আমি সেই নিয়ম। যে মহানিয়মকে তুচ্ছ করবার জন্য স্ত্রী শূদ্র বলে, কামিনী-কাঞ্চন বলে হেয় করে রেখেছ আমি সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের ঢেউ। সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আমাকে শাস্ত্রের আদেশে না মানার কথা থাকলেও গুণ-পুরুষদের এই ঢেউ খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই, অন্য একটু স্বতন্ত্র জায়গা সমুদ্রের মধ্যে এমন নাই যেখানে আমি নাই।

আমি সেই নারী জাতি মাধ্যাকর্ষণের মত যারা মহানিয়মরূপী অতএব ছোট ছোট শাস্ত্রের অনিয়ম বিধি নিষেধ শুনে আমাদের গায়ের জ্বালা হয় এজন্য শাস্ত্রকারদের যত ভয় আমাদের লইয়া পাছে—শাস্ত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, এই ভেবে শাস্ত্রকাররা আমাদের শাস্ত্রে অধিকার দিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। আমার শাশুড়ী কুন্তি ঠাকুরাণী যখন আমার জন্য পঞ্চ স্বামীর ব্যবস্থা করলেন, তখন সেই শাস্ত্রকার ব্যাস ঠাকুরটি বর্ত্তমান ছিলেন, তার খোঁতামুখ ভোতা হয়ে যায়নি কি? ওগো আইন নিয়ম কর্ত্তা তোমাদের আইন তোমাদের নিয়ম আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গেই তো মজবুৎ করে তুলেছি। তোমাদের মণি মাণিক্যে শান দিয়েই তো আমরা চিকন করে দিই, এ কথা তোমরা ভুলে গিয়ে আমাদের দোষ দাও কেন? শাস্ত্র বিধান করলে সতী নারীর সতী-ধর্ম্ম এককে নিয়ে

একের প্রেমে মজে থাকা। পুরাণে সতী সাবিত্রীর সত্যবানকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনার কথা রচিত হলো। কিন্তু সতীত্ব যে সেই এক সত্যকে রক্ষা, সে যে ভ্রষ্ট একটিমাত্র পুরুষের বাসনার চিতার আগুনের কলঙ্ক মেখে রাক্ষসী হয়ে থাকা নয়, তা কেউ বুঝলে না। সত্যরক্ষাকে সতীর নারীর মর্য্যাদা-রূপ ফাঁকি ধামা চাপা দিয়ে রেখে দিলে।

আমি সেই নারী জাতির একজন যাদের মনের কথা দেবতারাও জানতে পারে না, মানুষ কোন ছার। আমি সেই নারী জাতির একজন যাদের আচারের শৃঙ্খল গলায় পরিয়ে হাতে ও কোমরে সোনার, পায়ে রূপার শিকল বেঁধে দিয়ে পুরুষ আপনার মনের মত কাজ করিয়ে নেয় বলে মনে মনে স্পর্দ্ধা করে—অথচ জানে না আমরা স্বেচ্ছায় সেই শিকল সর্ব্বাঙ্গে প'রে দিনের মোহিনী রাতের বাঘিনী সেজে পলকে পলকে তাদের রক্ত শুষে, তাদের বুকে পা দিয়ে আপনাদের তৃপ্ত করিয়ে, প্রসন্ন করিয়ে নিয়ে তাদের প্রাণে মেরে ধন্য করি সার্থক করি। আমাদের অসংযমের ফলে তারা মরে বাঁচে, তাই সব রাবণের মৃত্যুবাণ তাদের মন্দোদরী-রূপিনী রাক্ষসী সহধর্ম্মিনীদের হাতে। আমরা যাতে তাদের ছেঁচেকুদে ভোগ না করে রয়ে বসে ভোগ দখল করি তার জন্যই আমাদের বৈধব্যরূপ কঠোর শাস্তি, সন্ন্যাসীর ব্রত নেবার বাধ্যবাধকতা। পুরুষ দশরথ যখন যত ইচ্ছা বিবাহ করে নিজ শক্তিকে হীনবল করে' কৈকেয়ীর মত একের শাসনে, তখন পাছে অন্য সতীনে তাকে বিষ দিয়ে মারে অথবা বাগে পেলে তাকে ছেঁচেকুদে ভোগ করে' তার ক্ষয়-রোগ জন্মিয়ে দেয় তাইতো শাস্ত্রকারেরা সহমরণের ব্যবস্থা করেছিল। যখন সে ব্যবস্থা লোপ হলো সেইদিন থেকেই বৈধব্যের কঠোরতা নির্জ্জলা একাদশী-রূপিণী ভীষণা রাক্ষসীর আমদানী করলে তোমাদের স্মার্ত্ত শিরোমণিরা। দশরথের মৃত্যু এনেছিলো রূপবতী সুমিত্রা। দশরথের অসংযম কালরাত্রি বাছেনি। কৈকেয়ীর শাসন দশরথ যখন থেকে মানলে না তখন থেকে কৈকেয়ী রাক্ষসী হতে সুরু করলে। কিন্তু দশরথ নিজের অসংযমের ফলে নিজে মরলো বলেই তো কোন রাণীই তার সহমরণে গেল না। তাকে ঘিয়ের কুপোয় রাখা হলো। এদিকে মাদ্রির উপর পাণ্ডুরাজার অসংযম চাপন হলো। মাদ্রীকে সহমরণে পোড়ান হলো। পাশ্চাত্য জগতে যেখানে নারীকে বিলাসিতার মধ্যে ফেলে রেখে স্বামীর মৃত্যুতে তাকে অনু-শোচনায় ফেলে দেয়—তারা ভাবে যে গেল এমন আর হবে না বলে অন্ততঃ কিছুদিনও পুন বিবাহে ক্ষান্ত থাকে, প্রাচ্য ভারতবর্ষে সেখানে সহমরণের শাস্তি, বৈধব্যের যন্ত্রণা ও দুর্দ্দশা চক্ষের সামনে রেখে তাদের জব্দ করা হয় আর এর ভিতর যে পুণ্য হয় তা যুদ্ধস্থলে মারামারি করে মরে স্বর্গে যাওয়ার মত বলা হয়, আর সেই ফাঁকিটা সব মেয়েরা মেনে নেয় কেন জান; তারা চায় তাদের জাতের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে। এ প্রতিহিংসা নয় এ নিজেদের দুর্ভাগ্যকে খুব বেশী করে বাড়িয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তিকে উদ্দীপন করা। এ যেন যুদ্ধের সময়কার তেজস্কর উদ্দীপন বাণীর মত যোদ্ধার হৃদয়ে বীরত্বের রক্ত-সঞ্চালন।

তারা বিধান করে শাস্ত্রে লিখলে সতী নারীরা সতীধর্ম্ম একে নিয়ে একের প্রেমে মজে থাক আর রাধার সঙ্গে বৃন্দাবনের সব গোপীকে পরকীয়া রসে বিভোর করে পরকীয়া প্রেমের আবীরে চুপিয়ে পুরাণে চিত্রিত করলে। ওগো

পর কখন আপন হয় না। পরকীয়ার পর সেই আপনারই নিত্য নিত্যরূপ সিদ্ধদেহ যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেই লজ্জানিবারণ বাসুদেব তাকে খোঁজাই আসল সতীত্ব। তা যদি না হবে নারীর ভাবে যদি এত অসংযম থাকবে, যার পরিতৃপ্তির সীমা নাই তাই যদি হবে তবে তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে ভোর গোরাচাঁদটি কেন এই গোপীভাব রাধাভাব নিয়ে এসেছিলেন? কার সংযম বড়—অমন সোনার লক্ষ্মী সোনার বিষ্ণুপ্রিয়া ছেড়ে পলাতক যোদ্ধার মত সন্ন্যাসী-সাজা সংযম না যে লক্ষ্মী তার বিরহরূপী সর্পকে বুকে নিয়ে দংশন করিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করবার সময় বলেছিল "না পেলাম গোরা যদি পেয়েছি বিরহ তার—এই সেই বিরহরূপী সর্প আমার মাথার মানিক!" তা যদি না হবে তবে সেই পর'শ পাথর বিষ্ণুপ্রিয়া নিমকাটের গৌরাঙ্গকে জড়িয়ে বলতেন না এবার ভোগা দিও—পালাও দেখি ঠাকুর তাহলে তার স্বামীর নাম জপ করে প্রতি জপে একটি একটি চাউল রেখে রেখে তাই ফুটিয়ে খেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর স্মৃতি বুকে রেখে বেঁচে থাকতো কি?

হা হা হা এ রক্তমাংসের লোভের কথা নহে, এ সেই ভাবের কথা, রসের কথা, এ একটা আদর্শ আমরা সেই শিব ঠাকুরটির তাণ্ডব নৃত্যের লীলা মাধুর্য্য—যা দিয়ে সৃষ্টির সব বিচিত্রতা। শুধু পুরুষ নহে, জগতটাকে ভোলান আর খেলানই আমাদের কাজ। আমি নারী প্রকৃতি অক্ষসূত্র ক্রীড়কের মত জগত-সূত্রের দড়ি ধরিয়া জগতটাকে কক্ষচ্যুত হতে দিই না, আর গুণপুরুষেরা জগতের বাহিরে জায়গা না রেখে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করো শিক্ষা দিতে দিতে আর আমাদের জন্য কি নিয়ম শাসন বিধান করবে ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন সমাধিতে জগতটার বাহিরে দাঁড়িয়ে এক ঠেলাতে তাকে কক্ষচ্যুত করে মিথ্যায় পরিণত করতে যায়। আমি সেই ধ্রুব সত্য রাজা দ্রুপদ নন্দিনী, যজ্ঞ থেকে আমার জন্ম, তাই আমি যাজ্ঞসেনী অযোনী সম্ভবা! নারীর দুর্ব্বলতা আমার স্থালীর মধ্যে এককণা শাকের আকারে পড়ে ছিল তা আমার স্বামী নারায়ণের সেবার জন্য রেখেছিলাম, তাই আবার নারীজন্ম। এজন্মে আমি দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছি।

আমি সেই আমার পিতার পঞ্চতপের পঞ্চ যজ্ঞের অমৃত যজ্ঞ-লব্ধ কুরুকুল নাশিনী যাজ্ঞসেনী অভিচার রূপিনী মারণ মন্ত্রের মত দুষ্ট শাস্ত্র-শাপরূপী দুঃশাসনের বুকের রক্তে আমার কবরী বন্ধন করে সমগ্র নারী জাতীর সিঁথির সিঁদুরে তার এয়োতেরও-তার অস্তিত্বের চিহ্ন রেখে যাবো। শিখিয়ে যাবো জগতের নারীকে যে এ দুষ্ট শাস্ত্র শাসনের বানী দিয়ে রক্ত তিলক কপালে দিয়ে রাখবি যতদিন, ততদিন তোরা নারী, তার পর থেকে তোরা বাঁদী, দাসী, পরিত্যক্তা, পরপদদলিতা বিধবা। শাস্ত্র-বিধান ছিল পুরুষ বহু পত্নী বিবাহ করিবে কিন্তু নারী একটি মাত্র বিবাহ করবে, আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে একেবারে বরণ করে দেখাইয়া দিলাম শাস্ত্রের এ ব্যবস্থা পুরুষ তৈয়ার করে নারীকে যত ছোট মনে করেছে নারী তত ছোট নয়। কে তুমি শাস্ত্র-নিয়ম নারীর নির্ব্বাচন মধ্যে হাত দিয়া বাধা দিয়া নিয়ম ফলাইয়া বাহাদুরী করিতে আস; তোমার কি মা ছিল না কোন দিন। বরণ করবো আমার যাকে পছন্দ হবে, যে আমার সন্তানের পিতা হবার উপযুক্ত তাকে স্বয়ম্বরা হব আমরা—কে তুমি দেশাচার এর মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে নারীর উন্নত আত্মসমর্পণের আদর্শকে খাট কর। বরণ তো একটা বাকদান। বিবাহ তো একটা লোকাচার। এর সঙ্গে গর্ভাধানের কি সম্পর্ক। বরণ করলাম আমরা বাকদান জন্য কিন্তু মিলনের যোগ্য কিনা, তার সামর্থ্যাদি না বিচার করে—রক্তমাংসের অধিকার

কেন দিতে যাবো। বিবাহ কর্ব্বো আমরা কিন্তু যতদিন আমরা তাকে যোগ্য না করে নিতে পারবো ততদিন আমাদের সঙ্গের অধিকার তাদের দেবো কেন। নারীর প্রতি সন্তান-স্নেহ ভগবান এত প্রচুর ভাবে দিয়েছেন সেটা দেশাচারের ঠেকনো দিয়ে বাড়িয়ে শাস্ত্র নিয়মকে যত ছোট করবে ততই এই সব নিয়ম বেড়া পাক্ ভেঙ্গে ব্যাভিচারির সৃষ্টি হবে। সাবিত্রীর মত সত্যবানকে খুঁজে নিতে নারীকে ছেড়ে দাও, দেখবে, তার সন্তানের পিতা হবার যে যোগ্য তাকে সে যখন খুঁজে আনবে তখনি সে তার মনের ভিতর এত বড় বল পাবে যার দ্বারা সে তাকে যমের মুখ থেকেই ফিরে আনতে পারবে। নারীর হৃদয় অসংযত হতো তো সে সংযমী স্বামীর পূজা করতো না। সংযমীকে সম্মান করতো না। যদি বল, তবে তোমার পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ সন্তান হলো কোথা থেকে, তার উত্তরে আমি বলি হয় নি আমার কোন পুত্র কোন পাণ্ডব থেকে। আমার পঞ্চ স্বামীর দ্বারা পঞ্চ পুত্র হলো আর এক দিনে মলো, তার মধ্যে যেটা ভীমের সন্তান দুর্য্যোধন তাকে লাথি মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দিলে, এত নিষ্ঠুর ও বোকা দুর্য্যোধন নয়। এ সকল কবির প্রক্ষিপ্ত অংশ। "পুত্রার্থে কৃয়তে ভার্য্যা" পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন এই শ্লোক রচনার পরে রচিত প্রক্ষিপ্ত অংশ। তাহা মিথ্যা কথা। সুভদ্রার অভিমন্যু এত বীরপণা দেখালে আর আমি বিড়ালীর মত পঞ্চ শিশু লয়ে তাদের স্তন্য পান করাতেই আমার সারা জীবন কেটে গেল, পক্ষিণীর মত আমি কেবল পাঁচটা ডিমে তা দিতেছিলাম, এত বড় ফাঁকি লোকের মনে বিশ্বাস হয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনা করলেও আমার হাসি পায়।

আমার স্বয়ম্বরে পণ ছিল মাছের চোখ বিঁধা, মধ্যে সুদর্শন চক্র ঘুরছিলো। সেই চক্রের মধ্যে দিয়ে বান মেরে মাছের চোখ বিঁধতে হবে। এ কে পারে। যে মাছের চোখ বিঁধবে সে মাছের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না সে-ই এ মাছের চোখ বিঁধতে পারে। ওগো এতে যে তার নিজের মীণ চক্ষু যা রমণী সঙ্গের লালসায় বিভোর হয় তাকে বিদ্ধ করে সুদর্শন হয়ে আসে সেই বিদ্ধ করতে পারে। যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহী হয় সে-ই এ কার্য্য পারে।

স্বয়ম্বর সভায় আজ কুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্ম যখন লক্ষ্য বিঁধতে এলেন্ তখন মৎস্য চক্ষু বিঁধতে পারলে তিনি দুর্য্যোধনকে আমায় দেবেন, সভায় একথা বলে তবে লক্ষ্য বিঁধতে এলেন, তার কার্য্যই এই স্বয়ম্বর সভায় কন্যা অপহরণ করে আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেওয়া। অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকাকে নিয়ে কি নাকালই করেছিলেন—যেন দাস ব্যবসায়ী—আর আমরা যেন অপহৃত দাসী। আমার নারায়ন আমায় এ অপমান থেকে রক্ষা করলেন, বাণের লক্ষ্য পথ রোধ করে আমায় বাঁচালেন। যদি তিনি না বাঁচাতেন তবে এই দুর্য্যোধনের কদন্ন ভোজী কুলস্ত্রীদের লাঞ্ছনা প্রতিকার করণে অসমর্থ বৃদ্ধ পিতামহের গলায় আমি কখনও মালা দিতাম না। দ্রোণাচার্য্য লক্ষ্য বিঁধতে এলেন এসে বললেন, লক্ষ্য বিঁধতে পারলে তিনি আমায় দুর্য্যোধনকে দেবেন। আমরা যেন ছাগল ভেড়া পণে জেতা সামগ্রী। এবার রাধা চক্রে তার লক্ষ্য বাধাপ্রাপ্ত হলো। আমার ভাই "যে জাতি হউক যে লক্ষ্য বিঁধবে সেই দ্রৌপদীকে লাভ করবে" বলে স্বয়ম্বর স্থলে চেঁচাতে লাগলো। এ যে আমারই কথা, যে জাতের পুরুষ সুদর্শন হয়ে আসবে আমার গলার মালা সেই পুরুষ রত্নের পূজা করবে—এ যে সত্য কথা আমার হৃদয়ের কথা। কিন্তু তাকে যদি আমার মনে ধরে কারণ এও একটা স্পর্দ্ধার কথা আমি তার ভগিনী আমাকে সে এত ছোট মনে করেছিলো, তাই কর্ণ যখন লক্ষ্য বিঁধতে এলো তখন

আমি সুতপুত্রকে বরমাল্য দেবো না বলে কর্ণের কর্ণমূল লজ্জায় রক্তবর্ণ করে দিলাম। এ আমার ভ্রাতার ধৃষ্টতার প্রতিফল; আমি নারী, আমি নিয়ম, আবার কে নিয়ম বড় হয়ে আমাকে খাটো করবে। আমার স্বয়ম্বর সভায় আমার পণের মধ্যেও থাকবে আমার নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। এইটুকু শক্তি, স্বাধীনতা পৃথিবীর সমস্ত নারী জাতির আছে তাই জানাতেই আমার জন্ম। লক্ষ্য বেঁধা একটা উপলক্ষ্য। আমরা মেয়ে মানুষ ডাঙ্গায় থাকে মাছের মত, পুরুষ মানুষ থাকে জলে তাদের চক্ষু একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আমাদের চক্ষু কটাক্ষের বিক্ষেপে বন বন করে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের কাছে মিলনের জন্যে আসতে হলে লালসার চক্ষু নিয়ে এলে চলবে না। শ্বাস প্রশ্বাস বাহিরে ফেললে চলবে না। প্রাণায়ামের কুম্ভক করে আমাদের পেতে হবে, আমরা যে পুরুষের বড় সাধনার, বড় তপস্যার, বড় আদরের ধন।

চেয়ে ছিলাম আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে বরণ করতে যখন বাসনার রজ্জু-মুক্ত অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করলে তখন অর্জ্জুনের গলায় মালা দিতে যাবার ভান করলাম। আমার এলোচুল অর্জ্জুনের গায়ে ঠেকিয়ে খুব কাছে গিয়েও যেন মালা দেবার কথা ভুলে গেলুম এরূপ ভাবে দাঁড়ালাম। আমি যদি সত্য সত্য অর্জ্জুনের গলায় মালা দিতে যেতুম অর্জ্জুনের সাধ্য কি আমার মালা দেওয়াকে বারন করে। মালা দিলে তো সব গোল চুকেই যেতো, আমি যে তাদের সবার চিত্ত ক্ষোভের কারণ সেইটে জেনে নিজের নারীগর্ব্ব বজায় রাখবো তাই মালা দিতে গিয়েও দিলুম না। মালার দেবার মত সাজ গোছ দেখলেও মালা দেওয়াটা যে বাকি রেখে দিলাম। আমার এ উপেক্ষাটা অর্জ্জুন অপমান না ভেবে নিজের যেন মালা নেবার ইচ্ছা নাই এই দেখিয়ে আমার সেই যুবা পুরুষটির উপর শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়ে দিলে। মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই জন্ম তার সব ভাইদের মধ্যে তার উপর পক্ষপাতী হয়ে ছিলাম। নারী মাত্রেই এই খেলান ভাব আছে, আমি সেই পুরুষকে খেলানর মূর্ত্তিমতী অবতার। সব নারীকে আমি এই সাপ খেলানর ভাবটা শিখিয়ে দিয়েছি কিন্তু এই ভাবটা যে পুরুষ সহজভাবে গ্রহণ করে তার উপর আমাদের লোভ অনেকগুণে বেড়ে যায় আর এটার সুবিধা নিতে গেলেই তাকে আর দূর ছাই করে তুলি।

শাস্ত্রের বিধানে বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিবাহ হতে পারে না, আমার দরকার সেই নিয়মটাকে তাচ্ছিল্য করা, তাই ধরে বোসলাম একই সময়ে বড় ছোট সবাইকে বিবাহ করবো। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যার বিবাহ হবে সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না এটা ছিলো লোকাচার আমি এ লোকাচারের মুখে প্রথম ছাইয়ের মুড়ো জ্বেলে দিলাম; বড় ভাই ছোট ভাই সবাইকে পতিত্বে বরণ করে নিলাম উল্টে এই ভাসুর ভাদ্র বউ সম্পর্কটা স্বামীদের উপর আরোপ করে দিলাম যে বড়র সঙ্গেই থাকি আর ছোটর সঙ্গেই হাস্য পরিহাসে থাকি ছোট বড় যে আমাদের মাঝখানে মুখ দেখাবে তার দ্বাদশ বৎসর বনবাসই তার শাস্তি।

আমার ইচ্ছা জেনেই কুন্তি দেবীর আদেশ হলো যে আজিকার ভিক্ষার ধন পাঁচজনে বেঁটে নাও। কারণ এ ব্যবস্থা আমার ইচ্ছায় না হলে সাধ্য কি কুন্তীদেবীর আমার পঞ্চ স্বামীর ব্যবস্থা করে। আমি কি সেই মেয়ে, কুন্তীদেবীও আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে, যখন ব্যাসাদির শাস্ত্র বিচার স্থান পাইল না তখন মনুস্মৃতির মধ্যে মানুষের আত্মার ঐকান্তিক যা ইচ্ছা সেইটারই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে খটকা হইলে সদাচার সদাচারে যদি আস্থা না হয় তখন স্মৃতি যদি মনের সঙ্গে না মিলে তখনি বেদ দেখার বিধি হলো কিন্তু বেদে

সব একাকার। সেখানে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে কথা কইছে যে মা তারও প্রণয়ীর হাতে নিস্তার নাই। শ্বেতকেতুর মা সেখানে প্রনয়ীর হাত ধরে সবার কাছ থেকে প্রনয়ীর মনোরঞ্জনের জন্য চলে গেলেন। তখন ছিল অবাধ প্রণয়। যে যে ইচ্ছা তাই করতো কিন্তু তাদের ইচ্ছা নিয়ম হয়ে ফুটে উঠতো।

আমি যদি যুধিষ্ঠিরের পাটরাণী হতাম তবে তাকে কখন পাশা খেলতে দিলাম, তার পাশার নেশা আমার তাকে একান্তভাবের উপেক্ষা। আমি ভীমের পত্নী কখনও হতেই পারিতাম না কারণ তার হিড়িম্বা ছিল ঘটোৎকচ ছিল এ জেনেও তার সঙ্গে মিলিত হইবার অভিলাষ থাকা দ্রৌপদীর নারী মর্য্যাদার কাছে অস্বাভাবিক। অর্জ্জুনকে অবহেলা করে ঠেকিয়ে রাখিবার অগ্নি পরীক্ষার অন্তকালে দ্বাদশ বৎসর বনবাসের তীব্র উৎকট বিরহ দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নি সুভদ্রা হরণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বাঁচান হইল আর সে বাঁচাইলেন আমারই লজ্জানিবারণ শ্রীহরি। এক ঢিলে তার দুই পাখী মারা হলো আমাকেও অর্জ্জুনকে ঠেকানর দুসাধ্যতা হতে বাঁচালেন নিজেও আমাকে ভাল করে পেলেন, কারণ তিনি যে ভক্তের ভগবান ত্রেতায় গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করে রেখেছিলেন দ্বাপরে লজ্জাবস্ত্র যোগাবার জন্য।

আর নকুল সহদেব তারা তো পাণ্ডু রাজার মাদ্রী মিলনের উৎকট আনন্দের হর্ষ মৃত্যুর উৎকট সৃষ্টি তাহা তো পুরুষ ও নারীর মাঝখানের অনাসৃষ্টি। এদের নিয়ে খেলতে দ্রৌপদীর কাছে ঘেঁসতে পারবে এ ইচ্ছা এদের কল্পনায় কখনও হয় নাই। সব ভাইকে একে একে শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম যে আমি যতদিন ইচ্ছা যে পাণ্ডবের কাছে ইচ্ছা বাক্যালাপে খেলার নেশার আবেগে যতক্ষণ থাকিব ততদিন আর কাহারও কোন কথা বলা চলবে না। আর একের সঙ্গে যে ঘরে আমি থাকবো অন্য কেউ সে ঘরে কোন কারণে খিলানের মধ্যে প্রবেশ করতে পার্ব্বে না যদি করে তবে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে বনবাসে নির্ব্বাসন আপনা হইতে মেনে নিতে হবে। আমি থাকতাম আগ্‌লে আগ্‌লে কখনও নকুলকে লয়ে কখনও সহদেবকে লয়ে কারণ এরা পাণ্ডুর সেই বিশ্রী রোগটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল যে রোগটির জন্য কুন্তী তাকে আগলে আগলে রাখলো কিন্তু মাদ্রীর উত্তেজনা না থাকায় সে বাসনার তীব্রতা ছিল না তাই তারা ছিল, না পুরুষ না নারী। আমার ভিতর নারীত্বর কামনা শাকের মত এক কণা ছিল কিন্তু আমি স্থির জেনেছিলাম এদের মধ্যে বলবান পুরুষভাবের ইচ্ছা এক কণাও ছিল না।

হাঁ সেই একদিন যুধিষ্ঠির যখন আমায় একান্ত কাতর ভাবে মিলনের জন্য অনুরোধ করলেন তখন তাকে ঠেকালাম অর্জ্জুনকে দিয়ে। ব্রাহ্মণের গরু যে তস্করে চুরি করে নিয়েছিল সে আমারই চাকর, আমি গোকাল ব্রত করবো বলে তাকে সেই ব্রাহ্মণের সুন্দর গাভীটি বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে আনতে হুকুম দিয়াছিলাম। আমি ইচ্ছা করিয়াই অর্জ্জুনের অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলনের জন্য বাসর ঘরের সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করি। আমি জানতাম যে কর্ত্তব্যরূপী নিয়ম পালনকে অর্জ্জুন বড় চোখে দেখিত সে কর্ত্তব্য-পালন নিয়মের লৌহ বাঁধনের মত আমার স্বাধীন মুক্ত প্রাণে পরিহাসের মত, অভিনয়ের মত, সং লজ্জা? বলিয়া মনে হইত। তাই হলো, এক ঢিলে দুই পাখীকে আধমরা করা হলো। বজায় থাকলো অযোনীসম্ভবা যাজ্ঞসেনীর মান, বরমালা দেব যাকে তাকে মিলনের অধিকার দেওয়া না দেওয়া জগতের নারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে; এই অধিকার জগতের নারীর সকলেরই আছে সেইটি শিখাইতেই আমার আসা। এইটি দ্রৌপদী চরিত্রের বিশিষ্টতা।

একান্ত ভাবে যখন বিবাহিত স্বামী পরিণীতা দয়িতাকে মিলনের জন্য অনুরোধ করে কোন

প্রণয়িনীর সাধ্য সে অনুরোধ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু শাস্ত্র কাররা এ ডাকটা মাতা হবার ইচ্ছায় প্রণোদিত রমণীর কাছ থেকেই আসা স্বাভাবিক মনে করতেন বলেই মেয়েদের সেই ডাকার ইচ্ছাটা খেলাবার ইঙ্গিত হয়ে একটা মানান সই ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়।

বাসুদেব কোন পদ্মের শোভা সম্পদ নিয়ে কোন্ জোছনার হাসির উপাদান নিয়ে নারীকে গড়েছ জানিনা কিন্তু যেদিন ধর্ম্মরাজের প্রবল অনুরাগের আবেগ আর অস্ত্রাগারে অর্জ্জুনের অস্ত্র লইতে আগমন-জনিত শাস্ত্রীয় লজ্জা ভেঙ্গে গেলো দুইটি নিয়ম গণ্ডী, বাঁচলাম আমি পাপের ভোগ নারীর দুস্কৃতি থেকে অর্জ্জুন তো আমার বিবাহিত স্বামী যুধিষ্ঠিরও তো তাই—লজ্জা কেন তাদের। পুরুষ যখন দুই বিবাহিত রমনীর মধ্যে নিজেকে রাখিয়া অনায়াসে বিশ্রাম লাভ করে তখন রমণীর বেলায় এ লজ্জা কে সৃষ্টি করিল। পূর্ব্বপত্নীর সন্তানদের যত্ন করিতে পতি যদি লজ্জার মাথা খেয়ে তার স্বপত্নীকে অনুরোধ করতে পারে তবে বিধবা তার পূর্ব্ব স্বামীর সন্তানদের স্নেহ করিতে বর্ত্তমান বিবাহিত স্বামীকে অনুরোধ করিতে বাধ বাধ করে কেন? পুরুষের লজ্জা সব নারীদের তৈয়ার। নারীর লজ্জা তার নানা বিষয়ের শাসনের দুর্ব্বলতা, পুরুষই তার প্রশ্রয় দিয়া অভ্যাসের মত করিয়া তোলে। নইলে নারীর যেখানে লজ্জা সেই খানটাই তার শোভা, সেইটাই নারী গোপন করে রাখে একেবারে তাকে অনাবৃত করিয়া পুরুষের কৌতুহল বৃদ্ধির জন্য—কারণ যা ঢাকা থাকে সেইটি দেখিবার জন্যই কৌতুক বেশী উৎপন্ন হয়। বৃন্দাবনের রাধা ও গোপিনীরা তো যমুনায় উলঙ্গ হইয়াই স্নান করিতে নামিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাপড় চুরি করিয়া লজ্জা বস্ত্র পরিধান করিবারই তো ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

কোথায় কি হলো ভেসে গেলো কি হলো। এ বুভুক্ষিত হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা আকাঙ্ক্ষা চেপে চেপে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার দুর্ব্বলতা স্বভাবতই এসে গেছলো। নদীর গতি যেদিকে সেদিকে যদি বাঁধ দাও তার ধারা অন্য দিকে যাবেই যাবে; কে তাকে ঠেকাবে। যুধিষ্ঠিরের যে পাশার নেশা সে আমার অনাদরের ফল, আমি যদি তার অনুরাগের আগুণে আমাকে আহুতি দিতাম তবে সাধ্য কি যুধিষ্ঠির পাশা খেলে। তার পাশা খেলা যে আমারই সৃষ্টি। নইলে নিজেকে পাশায় বাজী রেখে যখন তার আমার উপর কোন অধিকার ছিল না তা জেনে শুনে আমাকে পণ করে হেরে গেল এ কি আমার অবহেলার জন্য আমাকে একটা নিরর্থক বোঝা জেনে বিলিয়ে দেবার মত প্রতিহিংসার মত কথা নয়—একি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মের পাশা খেলা না আমার অবহেলার প্রতিশোধ।

হাঁ, অর্জ্জুন ছাড়া আর একজন যাকে আমি পতিত্বে বরণ করি নাই সে পঞ্চ ভাইয়ের বড় ভাই কর্ণ, তাকে খেলিয়ে তুলতে গেলে হয়তো দ্রৌপদীর যা করতে আসা তা যে বাধা পড়তো। দ্রৌপদীর গর্ব্ব চূর্ণ হতো, নারী পুরুষকে বিবাহ করবে অথচ তার মিলনের অধিকার নারীর সম্মতি সাপেক্ষ এ সনাতন নিয়ম হয়তো ভেসে যেতো। কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হবার আগাগোড়া ইচ্ছা তাই রয়ে গিয়েছিলো, মাঝে মাঝে এ ইচ্ছাটা চাগাড় দিতো। কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর মিলন, বিবাহ হলে কর্ণ দ্রৌপদীকে একান্তভাবে মিলনের সঙ্গ পেলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতো না কুরুকুল নির্ম্মূল হতো না। কিন্তু কর্ণের স্পর্দ্ধা, সে লক্ষ্য বেঁধবার আশে বসেছিল যদি সে লক্ষ্য বিঁধতে পারে তবে দ্রৌপদীকে সে দুর্য্যোধনকে দেবে। ইস আমি যেন নারী নই দেবী নই শাস্ত্রে শাসনরূপ পুরুষের অধিকার আমায় ফেলে দেবে। অর্জ্জুনও যদি লক্ষ্য বেঁধবার আগে বলতো আমাকে যুধিষ্ঠিরের গলায় মালা দিতে

হবে কারণ বড় ভাই থাকতে ছোট'র বিবাহে অধিকার নাই তবে অর্জ্জুনকেও দ্রৌপদী বলে বসতো "আমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে মালা বদলে রাজি নই।" লক্ষ্য বিঁধতে পারবে সে যার মালা বদলের কর্ম্মফলের জন্য চিন্তা থাকবে না।

দ্রৌপদীর দর্প যে কত বড় তা জানতো শুধু অর্জ্জুনের সখা নারায়ণ ঠাকুরটি। কাম্যক বনে সেই পরীক্ষা হয়। গাছের পাড়া ফল গাছে লাগান কি যায় গো মনের কথা বললে। এ যে কত বড় মনের কথা ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে বেরিয়েছে তাইতো এ অঘটন ঘটলো। কথার সৃষ্টি ভাষার সৃষ্টি তো মানুষের মনের ভাব গোপন করতে তাই দ্রৌপদী তার মনের সব কথা বলতে না বলতে সে ফল জোড়-বার মুখে গেছলো। কারণ এ জোড়া লাগা বিশ্বের নিয়ম দিয়েও লাগে অনিয়ম দিয়েও লাগে। পঞ্চ-পতির স্থলে ছয়টি পতি হলে ভাল হয় এ কথা দ্রৌপদীর মনের কথাও নয় লজ্জার কথাও নয়—

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'নারীর কথা'

আমাদের বঙ্গদেশ আজ জাগিতেছে। সম্পূর্ণ না জাগিলেও সুপ্তির ঘোর যেন ভাঙ্গিয়াছে, শীঘ্র হউক বা দুদিন বিলম্বে হউক—সে জাগিবে। আনন্দের কথা।

বাঙ্গালায় এতদিন নারী সত্যই নারী ছিল! পুরুষের সর্ব্ব কর্ম্মে সকল সময়ে শক্তি স্বরূপিণী সঙ্গিনী ছিল, বীরের মাতা বীরের পত্নী ছিল, সেই বাঙ্গালায় আবার নারী সেই মহীয়সী নারী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবে।

যেখানে খনা, লীলাবতী, আত্রেয়ী, গার্গী জন্মিয়া-ছিলেন, যেখানে বিশ্ববারার মুখ হইতে পবিত্র বেদ রচিত হইয়াছিল। যেখানে রমণীর অমর গৌরবময়ী মীরা, লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যা বাঈ নারীর আদর্শ নারীর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন আজ নারী সেইখানে শুধু অবগুণ্ঠনবতী নারীর সাজে পিতা ভ্রাতা স্বামীর অথবা যে কোনও অভিভাবকের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী অন্তঃপুর-নিবাসিনী হইয়া নারীর নারীত্ব ডুবাইয়া শুধু ঘর করা হাঁড়ি বেড়িতে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া জড় পিণ্ডের মতই জীবনাতিবাহিত করিতেছেন।

কেন না কারণ নারীর সে শিক্ষা নাই, অনভি-জ্ঞার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজই তাই অসম্পূর্ণ রহিতেছিল।

নারীর এই দুর্গতির কারণ আমাদর সমাজ! সামাজিক বিকারে নারীর কোনও পৃথক শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই, শিক্ষার অধ্যবসায় নাই, এক কথায় নারীর নিজের কিছুই করিবার নাই। তাই তাহারা পুরুষের হাতের যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকা।

অথচ এই দেশেই পুরাকালের বিদুষীরা অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব বিশ্রুতা লীলাবতী শুনেছি তাঁর স্বামীকে পাণ্ডিত্য শিক্ষা দান করিয়া-ছিলেন। আর্য্যেরা রমণীর শক্তিতে অনেক কঠোর কার্য্য সাধন করে গেছেন। ভীমসিংহের পত্নী

পদ্মিনী বাদলের জননী এমনি কত রমণীই জগতে অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর সেই রমণীই বুদ্ধিহীনা নারী নামে খ্যাত হইয়া অবস্থাভেদে অশেষবিধ নির্য্যাতন সহিয়া শুধু সন্তান প্রসব ও ঘর কন্নার কার্য্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকুক্ ইহাই সমাজ বিচার করিয়াছিলেন।

আজ নারী শিক্ষার প্রসারে নারী পুরুষের সমকক্ষ পদ পাইতে আরম্ভ করেছেন, নারীর দ্বারা সংসার সমাজ অনেকখানি পাইতেছেন, পাইবার আশা করিতেছেন। তাই মনে আশা জাগিতেছে, নারী আবার মহিয়সী নারী নামেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

ইহার একমাত্র অন্তরায় শিক্ষার প্রসার। এখনও এমন অনেক অন্তঃপুর আছে যেখানে স্ত্রী-শিক্ষার আলোক আদৌ প্রবেশ করে নাই। এমন অনেক গৃহ আছে যেখানে গৃহ কর্ত্তারা নারী শিক্ষিতা হইলে সংসারের সুখ নষ্ট হইবে বলিয়া তাহার বিরোধী। আবার এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাহারা সঙ্গতী না থাকায় স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়াও এ বিষয়ে উদাসীন; অথবা অগ্রসর হইয়াও পশ্চাদ্‌পদ হইতেছেন। এমন রমণীও অনেক আছেন যাহা আমার প্রত্যক্ষ করা যাঁহারা নিজের জীবনে শিক্ষা হীনতার ক্ষতি সহিলে ও নিজে জাগিয়া ও নিজের ভগ্নি কন্যা-বধুকে জাগাইতে অসমর্থ।

শিক্ষা যে কি জিনিষ, শিক্ষিতার জীবন শুধু নিজের নহে, দশের দেশের আত্মীয় স্বজনের পক্ষে কতটা কার্য্যকরী এটা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন।

স্থানে স্থানে শুধু নয় জনে জনে মিলিয়া যদি পূজনীয়া জননায়িকাগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করেন, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে যদি এইটুকু প্রচার করিতে পারেন যে সন্তান পালন শুধু খাইয়ে পরিয়ে নয়; সু-শিক্ষা তার প্রধান অংশ, কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিলেই কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না তাহাকে এই বহু বিপদ সঙ্কুল সংসারে সুগৃহিণীপণা করিতে হইলে শিক্ষা তার একান্ত প্রয়োজনীয় অতএব শিক্ষাদান না করিলে তাহার জীবনের কোনও কার্য্যই ক্রটী বিহীন হইবে না। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিধবা সকল অবস্থাতেই রমণীর সুশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

তার উদাহরণ আমি কন্যাকে অশেষ যত্নে পালন করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিলাম, কিন্তু কর্ম্মদোষে যদি তার বৈধব্য ঘটিল। যদি তার পিতৃদত্ত বিপুল যৌতুক সবই নষ্ট হইয়া গেল, স্বামীর সঞ্চিত প্রভুত ধন সম্পদেও যদি সে কোন ক্রমে বঞ্চিত হইল, (এটা সংসারে বিরল নহে সত্যকার এমন কি নিত্যকার ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না)। এর উপর যদি তার গর্ভের দুচারিটী সন্তান রহিল, তখন—তখন তার পরিণামে কি? সে খাইবে কি? দাঁড়াইবে কোথায়? সন্তান পালন করিবে কি করিয়া? কাহার গলগ্রহ হইবে?

তাহলেই দেখুন তার পিতামাতাই তার এই দুর্গতির এক মাত্র কারণ। তাঁরা তার পশুজীবন বর্দ্ধিত করেছিলেন মাত্র, শিক্ষা দানে গঠিত করেন নি।

সেই অবস্থায় সে বিধবার যদি ভিতরের সম্পদরূপ শিক্ষা থাকে, তবেই সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অকূলে কূল পাইতে পারে।

আর যাতে সে মনে না করে যে আমার পিতামাতা আমাকে বৃথা লালন পালন করেছিলেন।

ধন, রত্ন, অর্থ, সম্পদ, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার যাহা দিয়াই সাজাইয়া কন্যাকে সম্প্রদান কর—অহা দুদিনের, একটা প্রতিকূল বাতাসেই তাহা কর্পূরের মতই উবিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কন্যার প্রাণে

যদি সুশিক্ষার দীপ জ্বেলে দিতে পারেন ভিতরকার সে সম্পদই তার পিতৃমাতৃ দত্ত অক্ষয় সম্পদ! এ সম্পদ সে নির্ব্বিবাদে যাবৎ জীবন ভোগ করিবে। এর কেউ প্রতিদ্বন্দী হবে না। কেউ ফাঁকি দিয়ে লইতে পারিবে না।

ধনী গৃহস্থ মনে করুন, আপনি কন্যাকে যাবৎ জীবন ভোগ করিবার জন্য লক্ষমুদ্রার যৌতুক সহ বিবাহ দিলেন। কিন্তু তার স্বামী যদি দূষিত চরিত্র হয়ে দুদিনে সে অগাধ ঐশ্বর্য্য সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, অথবা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে যদি তাহার সে সম্পদ নষ্ট হইল? তখন সে যদি সুশিক্ষিতা হয় তার রহিল একমাত্র ভিতরকার সম্পদটুকুই; সে সেই টুকুর জোরেই ভগবানের দত্ত নির্ঘাত দণ্ড অথবা মানুষের দত্ত দণ্ড মাথা পেতে নিতে সক্ষম হ'ল,—এবং সে নিজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ অশান্তি-ময় বৈধব্য অথবা যে কোন অবস্থায় শান্তিকে বরণ করে নিয়ে হাসিমুখে জীবন কাটাইবার পথ খুঁজে নিতে পারলে? আর তাকে এই শিক্ষারূপ অমূল্য সম্পদ দান করেছেন বলে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নত হ'ল ও তাঁদের চির-জীবন পূজা করলে।

ধরুন, সে যদি সধবাও রইল তাহলেও যে সংসার কত্তে প্রতি পদে তার শিক্ষার একান্ত দরকার—

সাধারণ গৃহস্থের ভিতর দেখুন যতদিন সংসারের কলেবর বৃদ্ধি না হয়, ততদিনই স্বামীস্ত্রীর সম্প্রীতি; তারপরই কলহ, অভাব, অশান্তি! কারণ গৃহকর্ত্তার আয় অল্প ব্যয় অনেক—অভাব কিছুতেই মিটে না। প্রাণপাত পরিশ্রমেও আহার জুটে না, কাজেই উৎসাহ স্ফূর্ত্তি হীন জীবন!

এরূপ স্থলে স্ত্রী যদি শিক্ষিতা হ'ন স্বামীর শুধু ধর্ম্মসঙ্গিনী পদবাচ্য না থেকে কর্ম্ম সঙ্গিনী হইয়া তার পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করিয়া যথার্থ পাতিব্রত্য পালন করিতে পারেন তাহাতে সে স্ত্রীর জীবন কতখানি সার্থক হয়।

স্বামীর আরামের জন্য যেমন গৃহে অনেক রকম ব্যবস্থা করিয়া রাখেন তেমনি তার ৫০ অথবা ৬০। ৭০ অথবা মাসিক ২০০ শত টাকা আয়েও ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না দেখিয়া নিজেও পরিশ্রম করিয়া আয়ের ভাগ কিছু বর্দ্ধিত করেন বা করিতে পারেন ২টা অভাব স্বামীকে মিটাইবার ভার দিয়া আর ৫টা ক্ষুদ্র অভাব নিজেই মোচন করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে সংসারের এই ঘোর অশান্তি অনেক কমে নাকি? এবং সন্তানের পর সন্তানের আবির্ভাবে গৃহ কর্ত্তার মাথায় বোধ হয় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

এর উপর আরো নীচে ইতর শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি করুন আরো কত উজ্জ্বল চিত্র শিক্ষা অভাবের কত চরম দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। সেদিন আমার একজন বন্ধু বল্লেন "আমার বাটীর পাশে একজন পরামাণিক বাস করিত। সে সম্প্রতি হটাৎ মারা গেছে, তার স্ত্রী সবে মাত্র ১৭ বৎসরের যুবতী একটী ১ বৎসরের শিশু নিয়ে বিধবা হইল। স্বামীর সঞ্চিত কিছুই নাই, কাজেই গৃহ-কর্ত্তার অবর্ত্তমানে দিন চলা ভার হওয়াতে সেদিন কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিতে আমার কাছে আসিয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বল্লাম তুমি কিছু কাজ কর নইলে কি হবে? সে বল্লে 'কি জানি মা, যে কাজ কর্‌বো? বাপ মা ত রান্না-বান্না ছাড়া আর কিছু শেখান নি, আর স্বামীও কখনও ঘরের বার হতে দেন নি। শুধু ঘরের কাজই করতে জানি। পথে বেরুলে গা কাঁপে। পাছে কেহ আমায় দেখে বলে কখনও আমায় জাতের কাজেও কখনও বেরুতে দেন নি।' বল্‌তে বল্‌তে অভাগিনীর দুচক্ষে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়িল, বোধ হয় স্বামীর অগাধ ভালবাসা স্মরণ হওয়াতেই;

তাই ভাবলাম হায় রে অন্ধ ভালবাসা! এ ভালবাসা অন্ধ নয়ত কি? যাকে ভালবাসি বলে কখনো চোখের আড়ালে যেতে দিলাম না, পাছে আমার নিজস্ব জিনিষ অপরের দৃষ্টি স্পর্শেও কলঙ্কিত হয়। আর আমার অবর্ত্তমানে—সেই আমার স্ত্রী দুটী উদরান্নের জন্য যখন পরের দ্বারস্থ হবে? তারপর দাসীবৃত্তি অথবা আরো কোন অধম বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হবে তার প্রতিকার করিলাম না। এই ত ভালবাসার পরিণাম?”

তাঁর কথা শুনে আর একজন আমাদের বন্ধু বল্লেন—আরও একটা গল্প শোন “আমার বাটীর নিকটেই একটা পল্লীতে এক ঘর গৃহস্থ ছিল—তাদের আমি চিনিতাম, বৃদ্ধ গৃহকর্ত্তার দুটী কন্যা ও গৃহিণী লইয়াই সংসার! কন্যা দুটীকে যথা সময়ে একটী অশীতিপর বৃদ্ধকে ও একটী চরিত্রহীন মদ্যপকে দান করিয়া বৃদ্ধ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পরপারের যাত্রী হইল। তারপরই জ্যেষ্ঠা কন্যাটী বিধবার সাজে বৃদ্ধা মায়ের গৃহে আসিল। মেয়েটী ইতর গৃহে জন্মিলেও একটু চালাক চতুরা ছিল। বৃদ্ধমাতা কন্যার বৈধব্য বেশ দেখিয়া প্রথমেই গগনভেদী হাহাকার করিলেন, তারপর শান্ত হইয়া কন্যাকে বলিলেন মা তুই আমার মেয়ে নহিস পুত্র! এ বৃদ্ধাবস্থায় তুই আমায় খেতে দেমা, সৎপথে থেকে কোন কাজ কর। মেয়েটী কয়দিন ঘরে বসেছিল তারপর আমাদের বাটী এসে সামান্য সামান্য রকম এক আধটু সূচীকার্য্য শিখে নিলে, আমার কন্যাদের কাছে। তারপর আজ ২ বৎসর দেখছি সে সেই সেলাইয়ের দ্বারা নিজের এবং মাতার উদরান্নের সংস্থান করে নিচ্ছে—ইহার উপর দেখি হঠাৎ ছোট মেয়েটী একদিন এসে হাজির, শুনলাম তার স্বামী যা কিছু অলঙ্কারাদি ছিল সব বলপূর্ব্বক কাড়িয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল সে দুর্বৃত্ত নিরুদ্দেশ।

দিনকতক পরে শুনলাম, বড় বোন কনিষ্ঠাকে বল্‌ছে—‘আমার মত কিছু কাজকর্ম্ম কর নইলে একা আমি কি করে সব যোগাড় কর্‌বো।’ কনিষ্ঠা মেয়েটী ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌ছে ‘কোথা থেকে খাওয়াবে কি জানি, কিন্তু যেমন করেই হোক খাওয়াতেই হবে, কারণ, নইলে আমি কোথা যাব? তুমি বাপমার বড়মেয়ে ছিলে তখন বাবার অবস্থা ভাল ছিল, তোমায় গাঁয়ের স্কুলে দিছ্‌লেন, তুমি লেখা পড়া জান তাই এটা সেটা শিখতে পেরেছ তৈয়ার করে দুপয়সা ঘরে বসে আন্‌তে পার্‌ছ। আমায় ত বাবা মা কিছু শেখান নি আমি কি জানি যে করবো?’

ইহার কিছুদিন পরে মেয়েটী মায়ের সঙ্গে এক দিন আহারে বসিয়া বিষম কলহ করিল এবং অভুক্ত উঠিয়া গেল—তার পরদিনই শুনিলাম সে রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।”

এই ত শিক্ষাহীনতার ফল, খুঁজলে এমনি শত শত দৃষ্টান্ত দেখা ও শোনা যায়। এর উপর পরের কথা দূরে ফেলে নিজেকে দিয়েই আমি অনেকখানি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাই মনে একান্ত ইচ্ছা আপনি যতখানি কষ্ট পাইলাম বা পাইতেছি, শুধু শিক্ষার অভাবে—এতখানি, আমার ভগ্নি বা বধূ কন্যা কেহ না পায় ভবিষ্যতে কেহ আমায়ই এ দোষারোপ না করিতে পারেন সেইটুকু যদি করিয়া যাইতে পারি, তা হলেও জানবো জীবনের এককণা সত্যকার কাজ করিয়া গেলাম।

আজ দেশ জেগেছে। এবং দেশের মাতৃস্বরূপা অনেক রমণীই জেগেছেন। এবং বিবিধ রকমে পথ নির্দ্দেশ করে এই স্ত্রীশিক্ষার অভাব দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইতেছেন, তাই দেখিয়াই আমার এই লেখনী ধারণ তাঁদেরই নিকটে নিবেদনার্থে।

যাতে দিনে দিনে নারী শিক্ষার বিস্তার হয়,

যাতে ঘরে ঘরে প্রতি রমণী তাঁহার কন্যা ভগ্নি বধূকে সুশিক্ষিতা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, যাহাতে আমাদের দেশপুজ্যা রমণীগণ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার কল্পে ত্যাগ স্বীকার করিয়া সাধারণ রমণীদের শিক্ষার সর্ব্ব রকমে সুবিধা করিয়া দিয়া শত শত রমণীর চোখের জল মুছাইয়া দুঃখের ভার লাঘবের ব্যবস্থা করিয়া দেন ইহাই আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী ধারণের ক্ষুদ্র আয়াসের ফলে যদি পুজনীয়া নারীগণের প্রাণে নারীর ব্যাথায় নারীর দুঃখে বারেকও জাগিয়া উঠে তবেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। যদি প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাপ মায়ের প্রাণে এই মন্ত্র উপ্ত করিতে পারেন—যে কন্যা পালন শুধু খাইয়ে পরিয়ে নয় শিক্ষাদানে, যৌতুক তাকে টাকা কড়িতে নয় অক্ষয় যৌতুক তার শৈশবের শিক্ষাতে, যাহা তার আমরণের সম্পদ! তবেই এই নারী শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। রমণী রমণী নামের যোগ্যা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—সংসারের সুখ শান্তি ফিরে আসে।

সংসারের শত দুঃখ কষ্ট ঘাত প্রতিঘাতেও নারী নারীর গৌরবে জোর করে বেঁচে থেকে নারীর মহিমা বজায় রাখতে পারে তা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

বারান্তরে আরো কিছু লিখিবার প্রয়াস রহিল যদি দেশপুজ্যা ভগ্নিগণ আমার অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সার মর্ম্ম গ্রহণ ও অনুমোদন করেন।

শ্রীমতী ইন্দুবালা সিংহ।

হিন্দু-মুসলমান

:o:

ভারত মায়ের তনয় দু'টি হিন্দু এবং মুসলমান,
দুইএর প্রতি অসীম স্নেহ, প্রবল তাহার প্রাণের টান!
নাই গো কিছু বন্দিনী মার আছে দু'টো নয়ন-মণি,
বিপুল বিরাট বিশ্ব মাঝে তাদের পেয়ে তাই সে ধনী।
পক্ষিণী মার পক্ষপুটে বাঁধলো তারা যে যার গেহ,
কোথায় কাহার এমন মাতা কাহার এমন প্রাণের স্নেহ!
ধাত্রী সে যে পালন করে অফুরন্ত পীযুষ দানে,
ফসল দানে বাঁচিয়ে রাখে হিন্দু এবং মুসলমানে।

এরাই যে তার দেহের নাড়ী এরাই যে তার প্রাণের প্রাণ ;
এরা ছ'জন ছুলাল ছেলে, হিন্দু এবং মুসলমান।

* * * *

দেশের তোরণ সিং দরজায় মরণ ভেরী বাজলো কার,
বিষ-মাখা তুন হানলো কে গো মরণ মুখী বারম্বার ?
নীল দরিয়ার বুক চিরে আজ উথ্‌লেছে কোন বিষের ঝোরা,
ঝর ঝরিয়ে বিষ ঝরে গো নীল বাসুকীর বমন করা !
পবিত্র মার বুকের পরে দাঙ্গা বিবাদ বাধায় কে,
অগৌরবের গুরুভারে জননীরে কাঁদায় রে ?
লাজে দেবী নোঁয়ায় মাথা বিশ্বরাজের সভা মাঝে,
নয়নে তার অশ্রুপ্লাবণ অন্তরে তার ছুঃখ বাজে।
কিসের লাগি হানা-হানি কিসের তরে রক্তপাত,
হিংসা দ্বেষের বিষ্‌বিয়ন জাগলো আজি অকস্মাৎ !
রুধির ধারে রাঙা হ'লো মায়ের শ্যামল আঁচল খান,
বিদ্বেষিতার মুষল হানে হিন্দু এবং মুসলমান।
সুরু হ'লো ভারত ব্যাপি' বিবাদ এবং বিসম্বাদ,
পান করেছে ছুই ভা'য়েতে ভেদের গরল তিক্তস্বাদ।
হিন্দু বলে "ম্লেচ্ছ, যবন" সহোদর ভাই মুসলমানে,
মুসলমান সে "কাফের" বলে হিন্দু ভা'য়ে অকারণে।
ভগবানের সৃষ্ট মানুষ সবাই যে তার রূপের ছাপ,
নররূপী নারায়ণে ঘৃণা ভাবা বিষম পাপ।
ম্লেচ্ছ, যবন, কাফের বলে ভারতে কেউ নাইরে নাই,
আছে ছ'টো সভ্য জাতি মুসলমান আর হিন্দু ভাই।
ভুবন জোড়া কীর্ত্তি যাদের শিরায় বহে বীরের ধাত,
অতি প্রাচীন ব'নেদি ঘর বাদশা এবং রাজার জাত।
স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব কিসের, কেন অহংমত্ত মান ?
হরিশ্চন্দ্র রাজার জাতি—নাওশেরওঁয়ার হে খান্দান !
ত্যাগের মন্ত্র জন্মদাতা বিশ্বমাঝে তোমরা গো !
কিসের লাগি দলা-দলি স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া গো ?

পঁচিশ বছর আগের কথা বিবাদ কেহই জানতে না,
স্বার্থ লাগি ছুরি কৃপাণ পরস্পরে হানতে না!
পাড়া গাঁয়ের খবর রাখি রহিম এবং উদ্ধবের,
অধর মেথর, হারাণ খুড়ো, কছিমুদ্দি ওসমানের।
হারাণ বুড়োয় খুড়ো বলে হিন্দু এবং মুসলমান,
খুড়ো মশা'য় করেন স্নেহ ভাইপো গুলোয় এক সমান।
কছিমুদ্দি লম্বা দাড়ি গ্রামের মোড়ল পঞ্চায়েত,
নীলু এসে বলচে "চাচা, ডুবলো আমার আউষ ক্ষেত।"
বৌমা তোমার ভুগছে জ্বরে পথ্য কেনার শক্তি নাই
দাওনা টাকা গোটা দশেক প্রাণে তবে ভরসা পাই।
পারবো যখন শুধবো তখন হাতে যখন টাকা হবে,
বিনা খতে চাচা মিয়া টাকা দিল নীল মাধবে।
প্রাণের আভাষ এমনি গ্রামে, এমনি হেথায় মাধুর্য্য,
একের ব্যথা অন্যে বুঝে, দরদী প্রাণের প্রাচুর্য্য।
আজকে এদের সরল প্রাণে কুটিলতা আনলো কে,
হিংসা দ্বেষের পঙ্ক মাঝে কে ইহাদের টানলো রে?
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'লো রাঙ্গা হ'লো গাঁয়ের কোল,
ঘরে ঘরে উৎপীড়ন আর অবলাদের কান্না রোল।
বইতো সেথা সোণার গাঁয়ে শান্ত নদী—অঞ্জনা
ঊষার আলোয় মুখ রাঙিয়ে নাচতো পাখী-খঞ্জনা।
গাঁয়ের জীবন তুলতো গড়ে হিন্দু এবং মুসলমান,
সেদিন ত কই শুনিনি গো এমন ধারা ভাঙ্গার গান।
কাটাকাটি আর লাঠালাঠি এ ত নিছক ষণ্ডামি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিবাদ ধর্ম্ম নিয়ে ভণ্ডামি!
মুণ্ডু গুলো দিচ্ছে তারা যারা চরস চণ্ডুখোর,
উভয় জাতির নিম্ন শ্রেণীর গুণ্ডারা সব মূর্খ ঘোর।
হায়গো তারা বুঝতে নারে ভালো এবং মন্দ কি,
প্রাণে তাদের খেলচে না হায় মুক্তি কুসুম গন্ধটি!
দুটি ভা'য়ের প্রাণের মিলন এযে মহৎ কল্পনা
মুক্তি রথের সারথি সে যুক্তি পথের মন্ত্রণা।

মূর্খ এরা, গোঁয়ার এরা সবাই এদের শিক্ষা দাও,
সখ্যতা আর ভালোবাসার মন্ত্রে এদের দীক্ষা দাও।
ভদ্র তুমি, জ্ঞানী তুমি, পুণ্যবান হে বিদ্বজন!
এস নেতা সমাজ শাসক করবে এদের বিষ হরণ।
মন্থিয়া আজ এদের গরল সুধার ধারা ছড়িয়ে দাও,
মিলন গানে নাচাও এদের রাখীর সুতো পরিয়ে দাও,
সর্ব্বনাশের জ্বললো শিখা পাপাচারে ডুবলো দেশ,
এস এস মহারথী, এস সাধু পুণ্যবেশ।
মন্দিরেরি পবিত্রতা নষ্ট হ'লো হিন্দুদের,
মসজিদও সে নাপাক হ'লো ধর্ম্মভীরু মোস্লেমের।
আশ মেটে না খুন খারাপে প্রেমের দেউল ভাঙ্গতে চায়,
উপাসনার ঘরে ঘরে দাঙ্গা বিবাদ, হায়রে হায়!
হায় বিধাতা! তবুও এদের শান্তি পথে আনছো না,
গোঁয়ার গুলোর চোয়াড় মাথায় বজ্র তোমার হানছো না!
হাদিস পাতায় নেইত কথা ঈদের গরু কোর্ব্বানীর,
মনুও নিষেধ করছেনা ত থামিয়ে দিতে রেওয়াজটির।
এই নিয়ে হায় বিবাদ কেন আবাদ করা রক্ত বীজ,
খুন জখমের ফলবে ফসল এ যে বিষম শক্ত চীজ্।
গরু যারা কাটবে ঈদে তাদের গরু কাটতে দাও,
মসজেদেরই সুমুখ দিয়ে বাজনা নিয়ে হাঁটতে দাও।
করবে খোদার উপাসনা সে যে পরম শক্তিমান,
বাদ্য বাজার কোলাহলে, শ্রবণ প্রখর তাহার কান।
খোদা তোমার প্রাণের মাঝে আরাধনা করবে তার,
ভক্তপ্রাণের করুণ ডাকে আসন জেনো নড়বে তার।
জেদা জেদীর নয় এ কথা, খাঁটি কথা এইটে ভাই,
ব্রহ্মময় এ নিখিল জগত ইহার বাড়া সত্য নাই।
আইন করে বন্ধ করা ঈদের গরু কোর্ব্বানী,
নিছক ইহা জেদের কথা বিফল শুধু হয়রাণী।
ভালো করে বুঝিয়ে বল "দেবতা বধে কষ্ট পাই,"
দাও জাগিয়ে অনুভূতি দেখবে সবাই থামবে ভাই।

দেওয়া নেওয়া শিখতে হবে নইলে মিলন আসবে না,
সাধন পথে মালা হাতে জয়শ্রী সে হাসবে না।
মিলন তোমার আনতে হবে তবেই হবে তোমার জয়,
মুক্তি দিনের পাশুপত সে মরণ দিনের বরাভয়।
জাতের নামে বজ্জাতি সব এইগুলো দাও কোর্ব্বাণী,
দূর করে দাও ভণ্ডামি সব দুষমনী আর সয়তানী।
দেশকে নিজের ভাবছো বিদেশ শোন আমার জাত ভায়েরা,
ধরার বুকে ঠাঁই পাবেনা অন্য কোথাও এদেশ ছাড়া।
সুজলা এই ভারত মাতা শ্যামল যাহার দেহের বরণ,
কোলটিতে তার বাঁচতে হবে তার বুকেতেই ঘটবে মরণ।
তুর্কী নিয়ে তোর কিরে ভাই কাবুল, ইরাক কান্দাহার,
খোর্ম্মা মেওয়া খাচ্চে তারা ভাগ্যে তোমার অর্দ্ধাহার!
তুমি হ'লে দীন ভিখারী শূন্য তোমার "মণি-ব্যাগ",
খোঁজত তোমার কেউ রাখেনা শুধুই তোমার নিদ্রাত্যাগ।
খোঁজ করনা নিরন্নদের মিটাও দেশের তেষ্টাকে,
আছে কামাল দেবে সামাল গরিয়সী তার দেশটাকে।
ঘুচাও মায়ের দৈন্য দশা পরের নিয়ে কাজ কি ভাই,
দেশ মাতাকে আপন ভাব দেশের বাড়া স্বর্গ নাই।
হিন্দু ভায়ের অনুজ তুমি একথা ত মিথ্যে নয়,
অনেক যুগের পরে তোমার দেশের সাথে পরিচয়।
অহমিকা ভুলতে হবে দল্‌তে হবে ভণ্ডামি,
ধর্ম্মে তোমার লাগবে না ঘা রইবে সে ঠিক ইসলামই।
উদার মহান ধর্ম্ম তোমার অতি বড় গৌরবের,
জগত জুড়ে উড়বে বিজয় বৈজয়ন্তী ইসলামের।
একটা কথা বলব তোমায় শোন আমার হিন্দু ভাই,
ধনে, মানে, জ্ঞানে, দানে দেশে তোমার তুল্য নাই।
তোমরা অনেক উচ্চে আছ অধিক তুমি শিক্ষিত,
স্বদেশ মায়ের উদ্বোধনার মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত।
আমরা তোমার অনেক পিছে টানতে হবে তোমায় রথে,
একই সাথে চলতে হবে মিলতে হবে কর্ম্ম পথে।

জাত যাবে না, নাওনা সাথে ? জাতটা তোমার ঠুনকো নয়
সনাতন সে ধর্ম্ম তোমার বিশ্ব জগত দিচ্চে জয়।

* * *

ঐ দেখা যায় আশার আলো দেশ গগনের কণক-চুড়ে,
বায়েত এবং শ্লোকের বাণী জাগ্‌তেছে আজ একই সুরে।
মসজিদেরি সুমুখে আজ সানাই ঢোলক বাজছে না,
বাজনা নিয়ে সদলবলে হিন্দু ভাইত যাচ্চে না।
মন্দিরে আজ ঘণ্টা কাঁশর মসজিদে আজ কোরাণ পাঠ,
ঐক্য এবং সখ্যতারি পণ্যে ভরা প্রাণের হাট।
পেরিয়ে গেছে পেরিয়ে গেছে পার হয়েছে কাঁটার বন
পৌঁছেচে আজ মিলন পথে দুটি জাতির একটি মন।
হয়তো জাতির পরীক্ষা এ তাইতে বিবাদ বিসম্বাদ,
আশীর্ব্বাদীর মালা হাতে করচে কে ঐ শঙ্খনাদ—
"অমৃতেরি পুত্র ওগো তোমরা হিন্দু মুসলমান
জগত জুড়ে নাম জেগেছে রাখগো নামের মান।"
প্রেমের বানে দাও ভাসায়ে ভেদের তীব্র গরল ধার,
বুকের ছোঁয়ায় বাঁচিয়ে তোল প্রাণের দরদ আর একবার।

মহমুদ হোসেন।

অন্ধকারের অন্তরে

(গল্প)

—*—

কি করিয়া মতি অধিকারীর আট্-চালায় আসিলাম সে ইতিবৃত্তটা এই আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত না করিলেও চলিবে। এ গল্পের গোড়ার কথা ইহাই যে আমি তাহারই একটা ঘরে স্থান লাভ করিয়া খাটিয়া পাতিয়া কায়েমী হইয়া বসিয়াছি, আজ দু'মাস হইল। আরো চারিজন দুইটি ঘরে বাসা পাতিয়াছিল; তাঁহাদের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়া দিনগুলি কথাবার্ত্তায় নির্ব্বিরোধে বেশ আনন্দেই বোধ করি কাটিত যদি নিম্নলিখিত ঘটনাটি একান্তই দৈবাধীন না হইত।

একদিন কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, একটি লোক অধিকারীর অধিকৃত ঘরখানির দাওয়ায় বসিয়া জলশূন্য কাঠের হুঁকায় সোঁ সোঁ শব্দে ধূমপান করিতেছে। সর্ব্বাগ্রেই আমার দৃষ্টি পড়িল লোকটার চোখ্ দু'টির উপর—অমন অস্বাভাবিক চক্ষু আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই, নাসিকার পার্শ্ববর্ত্তী দুই চক্ষুর প্রান্ত দু'টি যেন এক বিন্দুতে আসিয়া মিশিয়াছে। ভাবিলাম, যখন কাঠের হুঁকা সঙ্গে তখন লোকটি নিশ্চয়ই বিদেশী এবং পরিব্রাজক শ্রেণীভুক্ত। সরু রশি দিয়া জড়াইয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধা ছোট একটি বোচ্কার উপর আসনগ্রহণ করিয়া সে হাঁটু তুলিয়া বসিয়া ছিল—আমি তাহার চোখ্ দুটি, কাঠের হুঁকা, কপালের রক্তচন্দন আর সিন্দুর নগ্ন হাটু, লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি, লম্বা গোঁফ্—গেরুয়াবস্ত্র এবং খেরুয়া-বাঁধা বোচ্কাটি এতগুলি বস্তু এক পলকেই লক্ষ্য করিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ... ...

সন্ধ্যার পর আমার ঘরে তাসের আড্ডা চলিত। যে কারণে নগেন গাঙ্গুলিরা একঘরে দু'জন বাস করিত, সেই কারণেই তাহারা আমারই ঘরে তাস খেলিতে আসিত—আসাটা প্রেমমূলক নহে, ব্যয়নীতি মুলক। এক কথায়, যার ঘর তার তামাক, কাজেই আনন্দ দানের ঝুঁকিটা তাহারা আমার স্কন্ধেই ফেলিয়া ছিল। আমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখে নাই। ... ...

খট্টাঙ্গে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া তাল রাখিয়া জ্ঞান ঘোষ গান ধরিল—কোন্ কাননের ফুল গো তুমি, কোন্ কাননের তারা।—তাহাকে থামাইয়া দিয়া তাস-জোড়া হাতে লইয়া উদ্বেগ করিয়া বসিয়াছি,

ছাপরা জিলার শিউবালক টিকা ধরাইয়া কলিকার উপর খণ্ড খণ্ড করিতেছে, ব্রজগোপাল নাসিকা গর্জ্জন শেষ করিয়া রুমালখানা ঝাড়িতেছে এমন সময় অধিকারীর দাওয়ায় দৃষ্ট চক্ষুষ্মান্ সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়া এককোণে চুপ করিয়া বসিল।

সুখ দুঃখ কপালে লেখা মরণ
লেখা পায়,
যেখানে মরিবে বান্দা
পায়ে হেঁটে যায়।

কথাটী মিথ্যা। মরণই পায়ে হাঁটিয়া ঘরে আসিল, আমি শুধু মাথা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলাম,—কোথা থেকে আস্‌ছো তুমি? শেষে বুঝিয়াছিলাম, অনাবশ্যক কৌতুহলেরও দায়িত্ব মাঝে মাঝে কিরূপ কঠিন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজক বলিল,—বহুদুর থেকে' আস্‌ছি, বৃন্দাবন থেকে'।

—তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছ বুঝি?

—না।

—তবে বৃন্দাবনে গিয়েছিলে কেন?

—মা ডেকেছিলেন।

যা' ভেবেছি তাই—লোকটি পরিব্রাজক ত' বটেই, উপরন্তু বোধ হয় ভৈরব। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী এবং কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল।

নগেন গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিল,—মা ডেকেছিলেন—তা' বৃন্দাবনে কেন? মা ত' কালীঘাটেও আছেন, আরও কোথায় কোথায় বাহান্ন জায়গায় আছেন।

পরিব্রাজক কিছু বলিত কি না জানিনা, কিন্তু সে কিছু বলিবার পুর্ব্বেই জ্ঞান ঘোষ বলিল,—বৃন্দাবনে ত' সব পুং সম্পর্কীয়, সখা, বঁধু, ভাই; মা ত সেখানে নেই যে ডেকে পাঠাবেন?

—মা যে আমার ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করে' ব্রহ্মাণ্ডেই লয় হয়ে আছেন, বৃন্দাবন কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া?

আমি বলিলাম,—তা' যেন হ'লো, কিন্তু তিনি ডেকেছিলেন কেন? কোনো দরকার ছিল বুঝি?

যে কারণেই হোক্, লোকটী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, প্রত্যুত্তর করিল না।

আমি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলাম,—কেউ কিছু জান্‌লে না অথচ তিনি ডেকে' পাঠালেন কি করে? খবরটা মা পাঠালেন কি প্রকারে?

জ্ঞান বলিল,—স্বপ্নে?

—না।

—তবে?

নগেন গাঙ্গুলী বলিল,—বলই না, প্রভু, খুলে। ডাকে নয়, তারে নয় তা' বোঝাই যাচ্ছে'। তারপর প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিয়া বলিল,—ভুত পাঠিয়ে?

নগেন গাঙ্গুলীর দিকে অকস্মাৎ ঝুঁকিয়া পরিব্রাজক বলিল,—হ্যাঁ তাই—

বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা দুলাইতে লাগিল। মাথার সঙ্গে সঙ্গে তার অগ্নিবর্ণ রুক্ষ দীর্ঘ চুলগুলিও দুলিতে লাগিল, এবং আমাদের হাসির প্রচণ্ড ঢেউয়ে অধিকারীর টিনের চাল ঝন্ ঝন্ করে শব্দ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। রন্ধনশালা হইতে অধিকারী এবং নিকটবর্ত্তী বাসা হইতে পোষ্টমাষ্টার বাবু ছুটিয়া আসিলেন!

তাঁহারা যখন আসিয়া পড়িলেন তখন হাসির রোল থামিয়া গেছে কিন্তু তখনো প্রায় পাঁচ জোড়া বিবিধ বর্ণের দন্তপংক্তি নিঃশব্দে বিকশিত হইয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া পোষ্টমাষ্টার বিষ্ণুবাবু বলিলেন,—তাই বল, হাসছ'। অমন করে' হাস! আমি ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি, বলি কার কি হল'। বিষ্ণুবাবু হাসির শব্দটাকে আর্ত্তনাদ মনে করিয়াছিলেন।

তাস পড়িয়া রহিল, আমি বিষ্ণু-বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলাম,—আসুন, দাদা, বসুন। কিই বা করলেন জীবনে, আর কিই বা শুন্‌লেন, কিই বা দেখ্‌লেন!

বিষ্ণুবাবু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—মানেটা কি? মানেটা কি?

আমি বলিলাম,—মানুষ খবর দিয়ে নিয়ে এদেশ সেদেশ করে', অবশ্য জানেন, কারবার দ্বারাও একাজ হচ্ছে, তাও অবশ্য জানা আছে, দূতের কর্ম্ম এদেরই আজ পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘট্‌তে সুরু করেচে। এই লোকটি বৃন্দাবন থেকে আস্‌ছে—মা ওকে ডেকেছিলেন। কে ওকে ডাক্‌তে' এসেছিল জানেন? ভূতে।— বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া বিষ্ণুবাবুর মুখের দিকে, প্রত্যাশী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের নিরাশ করিলেন। বিষ্ণুবাবু আদৌ হাসিলেন না। বলিলেন,—তা' হতে পারে. বিচিত্র কি? এমন অনেক গল্প শোনা গেছে যাতে ভূত আছে বিশ্বাস ক'রতে হয়। সাপ যদি শ্রীকৃষ্ণের বাড়ী পাহারা দিতে পারে তবে ভূত এসে লোককে ডাক্‌বে' এটা এমনই কি আশ্চর্য্য কথা! আর ভূত যদি নাই থাক্‌বে' তবে ভূত' প্রেত, পিশাচ এই কথাগুলির সৃষ্টি হল" কেন?

জ্ঞান ঘোষ বলিল,—গল্পে ত' চাঁদের মা বুড়ীর কথাও শোনা গেছে, তা' হলে, চাঁদের একটি মা আছেন, কারণ যদি মা না থাক্‌বেন তবে মা আছেন এ কথাটা রটল, কেমন করে'? যা' রটে তা কিছু বটে, চাঁদের মা না থাকিলেও একটি সৎমা নিশ্চয়ই আছেন। কি বলেন, মাষ্টার মশাই?

আমি দলের অগ্রণী, প্রশ্ন করিলাম—আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন কখনো?

বিষ্ণুবাবু বলিলেন,—না, স্বচক্ষে কখনো দেখিনি'। স্বচক্ষে হিমালয় পর্ব্বত দেখিনি, প্রশান্ত মহাসাগর দেখিনি, দক্ষিণাবর্ত্ত দেখিনি' আকবরী মোহর দেখিনি'—তাই বলে' কি হিমালয় পর্ব্বত,

প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণাবর্ত্ত আকবরী মোহর নেই ?

বিষ্ণুবাবু কথা শেষ করিলেন এবং সেই সঙ্গে দেখাটাই যে শোনা বস্তুর থাকার পক্ষে শেষ কথা নহে ইহারও মীমাংসা হইয়া গেল। বিষ্ণুবাবু প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না. তিনি এ কথা কটী বলিয়া সহসা ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—রাগ করবেন না. দাদা, বসুন।

তিনি বসিলেন।

বৃন্দাবন প্রত্যাগত লোকটি বলিল,—ভূত আছে, আমাদের চারিদিকে তারা সর্ব্বক্ষণ বিচরণ কর্‌ছে'। আত্মা দেহ ত্যাগ করে' যায়। কিন্তু ভূমণ্ডল ত্যাগ করে' যায় না। আত্মা যতদিন স্থূল দেহে থাকে ততদিনই সে অপ্রসন্ন আবদ্ধ, অন্ধ আত্মবিস্মৃত; দেহযুক্ত হলেই সে আনন্দময়, অতীত তার কাছে স্পষ্ট, ভবিষ্যৎ রহস্যশূন্য, তখন সে অনন্তের অংশ।

আমি বলিলাম,—আমাদের চারিদিকে তাঁরা বিচরণ ক'রছেন, তবু কেন আমরা তাঁদের দেখ্‌তে পাইনে ?

—দেখ্‌বার ক্ষমতা নেই, কেউ দেখিয়ে দেয়নি'। দেখ্‌তে চান ?

লোকটি উপস্থিত সকলেরই মুখের উপর দিয়া তাহার ভয়াবহ চক্ষু দুটির বীভৎস দৃষ্টি টানিয়া লইয়া আমার মুখের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। পরিহাসের চপল হাসি এক মুহূর্ত্তেই নিবিয়া যাইয়া সকলের চোখেই একটা শঙ্কার ছায়া দেখা দিল। জন্ম জন্মার্জ্জিত সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিয়া উঠিতে আমরা কেহই পারি নাই; মুখে তর্জ্জন করিয়া ভূতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও ভূত প্রদর্শনের প্রার্থনাটী শুনিয়া মনকে আর বুঝাইতে পারিলাম না যে ভূতের ভয়টা নিতান্তই অমূলক; এমন কি তাহার চক্ষুদুটির দিকে চাহিতেও যেন আমার ভয় করিতে লাগিল।

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলাম,—না, আমি দেখ্‌তে চাইনে। আর কেহও চাহিল না; তাহাতে বিষ্ণুবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

খুব মোটা গলায় হঠাৎ উচ্চারিত হইল,—আমি চাই।

চম্‌কিয়া উঠিলাম, কে রে? বিশ বাইশটি চক্ষুর ত্রস্তদৃষ্টি শব্দকারীর মুখের উপর যুগপৎ পতিত হইল। লোকটিকে পূর্ব্বে আমরা লক্ষ্য করি নাই, কখন ঘরে আসিয়া আমাদেরই একজন হইয়া বসিয়াছে জানি না।

লোকটি বলিল,—আমি ভূত দেখ্‌তে চাই।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম,—তোমার নামটি কি ?

—কেশব, কেশবচন্দ্র দাস। আমি অমন ভূত ঢের দেখেছি।

—কি রকম, কি রকম? বলিতে

বলিতে সকলে তাহাকেই ঘিরিয়া বসিলাম।

কেশব বলিল,—আমাদের গাঁয়েরই ঘটনা। একবার এক সন্ন্যাসী এলেন—ইয়া তাঁর জটা, ইয়া কমণ্ডলু, ইয়া বাঘ-ছাল। এসে ত আছেন ; থাক্‌তে থাক্‌তে প্রকাশ পেল—সন্ন্যাসী পিশাচসিদ্ধ, ভূতের কাঁধে চড়ে' তিনি তিনমাসের রাস্তা তিন ঘণ্টায় যাতায়াত করেন। এক কৈবর্ত্ত চাষীর বাড়ীতে ভূত এনে' সন্ন্যাসী ঠাকুর গ্রামের সকলের নাম ধাম ভূত ভবিষ্যৎ বলে' দিতে লাগ্‌লেন—দেখে' শুনে' সবারই গেল তাক্ লেগে'। ভূতের জন্য আবার ভোগের ব্যবস্থা হত' লুচি মেঠাই কত কি। ভূত খেয়ে দেয়ে চলে' যেতেন ; প্রায় রোজই এই রকম চল্‌তে লাগ্‌ল', ওষুদ মাদুলী দিতে লাগ্‌লেন। একদিন আমি—আমার গোড়া থেকেই কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে এ-টী. বাবা, বুজ্‌রুকি—আমি ক'রলাম কি, একদিন ভূতের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম, পাড়াগাঁয়ে আর কি পাব, গোটা দশ বারো মাছি মেরে' তাই কুচিয়ে।—হাতে হাতে ফল ; ভূত অনেকের ভূত ভবিষ্যত বলে' গাল মন্দ দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে', সেদিন আবার খিঁচুড়ি হয়েছিল, খিঁচুড়ি খেতে সুরু ক'র্‌লেন। বেশী নয় দু' চার গ্রাস গলাধঃকরণ কর্‌বার পরই ভেতরে ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। সন্ন্যাসী সবাইকে বের করে, দিয়ে অন্ধকার ঘরে ভূতের সঙ্গে একা থাক্‌তেন কি না—ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দ শুনে' তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকে' দেখি সাধুবাবা স্বয়ংই বমি করে' ঘর ভাসাচ্ছেন। হা হা হা।

কেশব প্রচণ্ডরোলে হাসিয়া উঠিল এবং আমরাও সশব্দে হাসিতে লাগিলাম। হাসির স্রোতে ভূতের ভয় ভাসিয়া গেল, এবং আর একটি উপকার ইহাই হইল যে পরিব্রাজকের যে বিকট চক্ষু দুটি ইতিপূর্ব্বে বিভীষিকা দেখাইতেছিল, হাস্যরোলের পর তাহা হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিলাম এইটুকু যে এই বিদ্রূপ পরিব্রাজক গায়ে মাখিল না ; তাহার মুখে বিরক্তি বা অপ্রতিভের বিন্দু-মাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না, অথচ সুরু হইতে প্রশ্নমালায় সকলে মিলিয়া তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিয়াই আসিয়াছি। সে বলিল, হাস্‌বেন না, প্রেতাত্মা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। তাই যদি হত' তবে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তর্পণের ব্যবস্থা কর্‌তেন না। তর্পণের ব্যবস্থা তাঁরা কেন করে গেছেন জানেন কি ?

পোষ্ট্‌মাষ্টার বিষ্ণুবাবু তাঁহার টুলের উপর নড়িয়া উঠিলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন মনে মনে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দল, দাও, উত্তর দাও। সে কর্ম্ম তোমাদের নয়।

সত্যই তাই ; আমরা কেহ এ প্রশ্নের সঙ্গত কি অসঙ্গত কোনো উত্তরই দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের পক্ষের কেশব হটিবার পাত্র নয়। সে বলিল,—

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তর্পণের ব্যবস্থা করেছেন স্বর্গগত আত্মার তুষ্টির জন্যে—এ-কথা আমি মানি। কিন্তু যারা তর্পণ করে না তাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মারা কি হায় হায় করে' বেড়াচ্ছে'? আমি নিজেই কস্মিন কালেও তর্পণ করি না, তবু কোনো আত্মা যে তিল জলের লোভে লিক্ লিক্ করে' বেড়াচ্ছে' তা ও ত টের পাইনে।

—আপনাকে টের যেন পেতে' না হয়। যে টের পায় সে মরে। আবার বল্‌ছি, দেখ্‌বেন ভূত?

—দেখ্‌ব', দেখাও। বলিয়া কেশব আমাদের সকলের মুখের দিকে একবার চাহিল।

পরিব্রাজক বলিল,—ভয় পাবেন না ত'?

—সে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, সে ভাবনা আমার।

—বেশ একজন মৃতব্যক্তির নাম করুন যার প্রেতাত্মা আপনি দেখ্‌তে চান!

—নামটা আমি গোপন রাখ্‌ব, তোমাকে ব'ল্‌ব না। রাজি আছ?

পরিব্রাজক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; দেখিয়া কেশব অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; বলিল,—এই ত দৌড়। আমি ত' আগেই জান্‌তাম।

পরিব্রাজক বলিল,—না জা'লেও ক্ষতি নাই, তবে আমার বেশী কষ্ট হবে, আর তাঁরও আস্‌তে দেরী হবে' আমাকে না বল্‌লেন, কিন্তু সে নামটি এঁদের কাছে বলে' যাবেন—শেষে না বল্‌তে পারেন যে আমি অন্য আত্মা এনেছি।

—তা' আমি বলে' যাব। বলিয়া কেশব আমাদের দিকে সরিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'লোকটা হয় পাগল না হয় গাঁজার ঝোঁকে মনে করছে' আমি মহাদেব হয়েছি, শিক্ষে দিয়ে দিতে হচ্ছে'। বাজি রাখা যাক্, কি বলেন?

আমি দোমনাভাবে বলিলাম,—যদি সত্যি সত্যিই আনে?

কেশব বলিল,—ক্ষেপেছেন? আমি ও-র বুজ্‌রুকি একদণ্ডে ভেঙ্গে' দিচ্ছি, দাঁড়ান না।

আমরা তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া বলিলাম,—তুমি যা' ক'র্‌বে তাই হবে, আমাদের কিছু আপত্তি নেই।

কেশব তখন পরিব্রাজককে বলিল,—ওহে, তুমি যা' ভূত দেখাবে' তা' জানি। এক কাজ কর, বাজি রাখ, তবু আমাদের মেহনতের মুজুরিটা উঠ্‌বে'।

পরিব্রাজক বলিল,—বাজি আমি রাখিনে।

আমাদের দিকে চাহিয়া—"ভয় পেয়েছে", বলিয়া কেশব টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

পরিব্রাজক বলিল,—ভূত দেখানো আমার নেশা নয়, উপযাচক হয়ে' নিজের কৃতিত্বও আমি দেখাচ্ছিনে। শুধু আমি

অবিশ্বাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই। বাজি—

কেশব বাধা দিয়া বলিল,—উঁ হু, তা' হবে না। এই যে সন্ধ্যে বেলার তাস খেলাটা মাটি করে' দিলে তার খেসারৎ আমরা চাই।

—বেশ, আসুন! বলিয়া পরিব্রাজক কোমর হইতে একটা থলি বাহির করিয়া আমার ট্রাঙ্কের উপর ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, —আমার কাছে পনরটি টাকা আছে— এই আমি হার্‌ব যদি ভূত দেখা'তে না পারি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে একজনকে আমি দেখাবো। রাজি আছেন?

কেশব বলিল,—আছি।

—আপনারা কত হার্‌বেন্?

আমি বলিলাম,—ঐ পনর।

তখনি চাঁদা করিয়া পনর টাকা তুলিলাম—আমি দিলাম প্রায় অর্দ্ধেক; কেশব দিল আট আনা; ঝোঁকের মাথায় জ্ঞান ঘোষ পর্য্যন্ত বিনাবাক্যে এক টাকা দিয়া ফেলিল।

পরিব্রাজক ত্রিশ্‌টি টাকা তাহার থলিতে পুরিয়া বিষ্ণুবাবুর হাতে দিয়া কহিল,—আপ্‌নি তৃতীয় পক্ষ, আপ্‌নার কাছেই টাকাটা গচ্ছিত থাক্; যে পক্ষ জিত্‌বে তাকেই দেবেন।

আমি বলিলাম,—বেশ, দাদাই টাকাটা রাখুন, আপ্‌নি যখন তৃতীয় পক্ষ তখন প্রবঞ্চনা কর্‌বেন না আশা করি।

বিষ্ণুবাবু গম্ভীরমুখে থলিটি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রশ্ন উঠিল, কাহার প্রেতাত্মাকে আহ্বান করানো যায়? কেশব বলিল,— সে আমি ঠিক্ করেছি,—কিছু ভাব্‌তে হবে না।

পরিব্রাজক বলিল,—আমি বাইরে যাই, আপনারা নামটা ঠিক করে ফেলুন।

পরিষ্কার জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল—সে যাইয়া উঠানে দাঁড়াইল।

আমরা মাথাগুলি সব একস্থানে জড়ো করিলাম, মাতব্বর কেশব মাথার ভিড়ের মধ্যে নাক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল,—আমার এক জ্ঞাতি ভাই মেস্‌পটে গিয়ে মারা গেছে। তার আত্মাকে আনা যাক্। তার নাম ছিল কালিনফর।—

জ্ঞান ঘোষ বলিল,—আমার ঠাকুদ্দার নাম ছিল ত্রিপুরারি। তিনি মারা যান দেশে—রেল থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে।

—কিন্তু কাছাকাছি মরা লোকের আত্মাকে চট্ করে এনে ফেল্‌তে পারে, আর কালিনফর নাম্‌টাও সাধারণতঃ মেলে না। কি বলেন?

জ্ঞান ঘোষ বলিল,—কাছাকাছি কোথায়? ত্রিপুরারি ঘোষ মারা যান রেল থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে। আর ত্রিপুরারি নামটাও—তারপর কি ভাবিয়া বলিল,—আচ্ছা, ঐ কালিনফরই থাক্।

—বেশ হবে এখন; বেটার পনরটা টাকাই গেল।—বলিয়া কেশব এম্‌নি হাসির আম্‌দানী করিল যে তাহার উৎসাহ

দেখিয়া আমাদেরও উৎসাহ দ্বিগুণ দৃঢ় হইয়া উঠিল। পনর টাকার ঝোঁকে পরিব্রাজকের অদ্ভুত চক্ষু দুটি কিরূপ চেহারা ধারণ করিবে তাহাই কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া আমাদের ভারি হাসি পাইতে লাগিল। বলিলাম,—ডাকো বেটাকে।

কেশব হাঁকিয়া বলিল,—এসো হে এইবার, আমাদের সব ঠিক্ হয়ে গেছে। বলিয়া সে আমাদের সবাইকে বারান্দায় আনিল।

পরিব্রাজক উঠানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেশবের আহ্বানের উত্তরে নড়িল না, কথাও বলিল না। কেশব দ্রুতপদে উঠানে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—এসো দয়াময়, ভূত তোমাকে দেখাতেই হবে!

—চলুন। বলিয়া পরিব্রাজক উঠিয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ ঘরে?

অপর কক্ষবাসী নগেন গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল,—এই ঘরেই, আম্‌রা অন্য ঘরে গিয়ে বস্‌ছি।

আমারই শয়নকক্ষে প্রেতাত্মার আবির্ভাবে আমার দারুণ আপত্তি ছিল—ঘরটা ভাল, চিরকালের জন্য তাহা আমার পক্ষে অব্যবহার্য্য হইয়া যাওয়া সুবিধার হইবে না। কিন্তু এতটা অগ্রসর হইবার পর আপত্তিটা প্রকাশ করি না করি একটা চক্ষুলজ্জার বাধা পাইয়া দ্বিধাগ্রস্ত মনে তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় পরিব্রাজক কেশবকে বলিল,—এই ঘরে দরজায় খিল এঁটে আলো নিবিয়ে একা আপ্‌নাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে, আমি অন্যত্র এঁদের নজরবন্দী হয়ে থাক্‌ব। টেবিলের উপর কাগজ পেন্সিল রেখে দেবেন—প্রেতাত্মা আপ্‌নাকে স্পর্শ করে' তার নাম লিখে রেখে' যাবে। ঢুকুন্ ঘরে।

আপত্তির যে কথাটা জিহ্বাগ্রে তির্ তির্ করিতেছিল তাহা আর বলা হইল না; বলিলাম,—স্পর্শ না কর্‌লে কি চলে না?

শুনিয়া পরিব্রাজক আমার দিকে এক নজর চোখ্ ফিরাইল; মনে হইল, আমাকে সে নিঃশব্দে ধিক্কৃত করিল।

কিন্তু এদিকে কেশবকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখাইতে লাগিল।

জ্ঞান ঘোষ তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল,—কি কেশব, তবে শেষকালে কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর্‌লে? আট গণ্ডার পয়সা জলে দিলে? ঢুকে পড়ো লক্ষ্মি, আম্‌রা কাছাকাছি আছি ঐ ঘরে—ভয় কি তোমার?

কেশব বলিল,—না মশাই, বলা যায় না অদৃষ্টের কথা; শেষকালে ডরিয়ে অপমৃত্যুটা ঘট্‌বে!

জ্ঞান ঘোষ বলিল,—গদাধর আছেন, গাছে গাছে বেশিদিন বেড়াতে হবে না। আমি গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আস্‌ব, কথা দিচ্ছি।

গদাধরের অনুগ্রহে পারলৌকিক ত্রাণের

ভরসায় কেশব জোর পাইল কি না জানি না, তবে সে খানিক দম্ ধরিয়া থাকিয়া থাকিয়া আসিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।—বহুবার আসিয়া এবং থামিলেই আমাদের সমবেত উৎসাহ পাইয়া সে ঘরে ঢুকিল; দরজায় খিল লাগাইয়া দিয়াই সে চট্ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল।

আলো নির্ব্বাপিত হইতেই আমাদের ভয় আবার দুঃসহ হইয়া উঠিল। সকলে নিঃশব্দে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলাম—নগেন গাঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, জ্ঞান ঘোষ একদৃষ্টে পরিব্রাজকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অনন্তবাবু ঊর্দ্ধমুখে চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বিপিন দাস হাঁটু তুলিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, আমি একবার ইহার এক বার উহার গা ঘেঁসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, পোষ্টমাষ্টার বিষ্ণুবাবু টাকার থলিটা হাতে করিয়া স্বল্প-পরিসর স্থানের মধ্যেই দ্রুত বেগে পায়চারি করিতে লাগিলেন, প্রতিবেশী বিপ্রদাস বাবু অস্ফুটস্বরে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইত্যাদি! কিন্তু কেহই একটি কথা কহিতে পারিলেন না। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কেশবকে ঠেলিয়া পাঠানো ভাল হয় নাই; যদি কোনো বিপদ ঘটে? তাহার সে রকম ইচ্ছা ছিল না, প্রথমে মুখে আস্ফালন করিলেও শেষে সে ভয় পাইয়াছিল। যদি এমন তেমন কিছু ঘটে তবে তাহার জীবনের জন্য আমাকেই দায়ী হইতে হইবে। আমারই ঘরে—

সবাইকে চকিত করিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতর কেশব চীৎকার করিয়া উঠিল,—কতক্ষণ বসে থাক্‌ব, ঠাকুর, এই অন্ধকারে?—ভূতের খেয়ে' দেবে' আর কাজ নেই, সে আস্‌বে মতি অধি—

যেমন সহসা আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনিই সহসা কেশবের কণ্ঠস্বর নিঃশেষে বন্ধ হইয়া গেল; পরক্ষণেই বন্ধ কপাটের উপর একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ত্রাসের একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়া সমস্ত পৃথিবীই যেন শব্দশূন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমার সর্ব্বশরীর, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একবার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া দুর্ব্বহভার অচল হইয়া গিয়াছিল, মুহূর্ত্তকাল পরেই সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। সকলেই চলচ্ছক্তিহীন—সকলেরই চোখে অসহ্য ত্রাসের বিমূঢ় ভাব, পাথরের পুতুলের মত নিস্পন্দ অসাড় দেহ যেন মাটির সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেছে। কাহারও কণ্ঠ দিয়া ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনো প্রকার স্বরই নির্গত হইল না।............

মুহূর্ত্তেক পরে "শেষ হয়ে গেছে" বলিয়া পরিব্রাজক ছুটিয়া গেল।

পরিব্রাজকের কথা তিনটি যেন মন্ত্রবলে আমাদের সংজ্ঞা ফিরাইয়া দিয়া একটা ধাক্কা দিয়া গেল। কিরূপ ভয়ে

অভিভূত হইয়াছিলাম তাহা বর্ণণা করিতে পারি না--মৃত্যুভয়ের মত ভয় নয়, মৃত্যুভয় বোধ হয় চালিত করে, উত্তেজিত করিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিবার সুযোগ সে দেয়—কিন্তু এ ভয় যেন সমস্ত চেতনা একটি বিন্দুতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে হিমসমুদ্রে স্পন্দহীন করিয়া ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, রক্ত চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

পরিব্রাজকের কথায় আমাদের গতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। —বন্ধ দুয়ার অন্ধকার ঘরে প্রেতের আক্রমণে একটা লোক বিপন্ন, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে, ভয় ছাপাইয়া এই কথাটাই তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল—আমরা পরিব্রাজকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মহাশব্দে দরজায় করাঘাত করিয়া কেশবকে ডাকিতে লাগিলাম। অধিকারী উঠানময় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এত শব্দেও ভিতর হইতে কোনো সাড়া আসিল না! তবে কি কেশব প্রেতের স্পর্শে—

পরিব্রাজক বলিল,—দরজা ভাঙ্গতে' হবে।

চার পাঁচ জন চীৎকার করিয়া বলিল,—লণ্ঠন, লণ্ঠন। অধিকারী দৌড়াইয়া লণ্ঠন লইয়া আসিল। তখন কেহ পিঠ, কেহ মাথা, কেহ কাঁধ, কেহ হাঁটু, কেহ হাত দিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিল—বিষ্ণুবাবু ডান হাতে টাকার থলি লইয়া বাঁ হাতের আঙুল দিয়া প্রাণপণে ঠেলিতে লাগিলেন। ঠেলিতে ঠেলিতে খিল ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া গেল—পরিব্রাজক নির্ভয় অবাধে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু আমরা পিছাইয়া বাহিরেই রহিলাম, একে ঘর অন্ধকার, তার উপর যে বলবান্ প্রেতাত্মা মানুষকে তুলিয়া দরজার উপর ছুড়িয়া দিয়াছে সে আছে কি গেছে তার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু বিষ্ণুবাবু অকুতোভয়—তিনি আমাদের ইতস্ততের অবসরে অধিকারীর হাত হইতে লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া ডান হাতে টাকার থলি লইয়া এবং বাঁ হাত দিয়া আমাদের জনকতককে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বায়ুবেগে ঘরে ঢুকিলেন—ঘর আলো হইতেই আমিও ঢুকিলাম। দেখিলাম, কেশব সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত রহিয়াছে, তাহার মুখের চেহারা ভাবশূন্য, সর্ব্বাঙ্গে ঘামের ধারা, এবং পরিব্রাজক হেট হইয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—আছে না গেছে?

—আছে, ধরুন বাইরে নিয়ে যাই।

ধরাধরি করিয়া কেশবকে বাহিরে আনিলাম—মাথায় হাওয়া দিতে দিতে সে চোখ মেলিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে কেশব মৃতকল্প নির্জ্জীব হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ খুলিয়াই সে উঠিয়া বসিল। আমি ভাবিতেছিলাম, জ্ঞান ফিরিলেও দৌর্ব্বল্য বশতঃ কথা বলিতে

তার সময় লাগিবে; কিন্তু কেশবের প্রাণশক্তি অসাধারণ; সে উঠিয়া বসিয়াই সতেজ ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—কাগজ কাগজ—সেই কাগজখানা কেউ নিয়ে আসুন।

কেশবের মুখের কথা মুখে থাকিতেই পোষ্টমাষ্টার বিষ্ণুবাবু এবং আরও কয়েক ব্যক্তি ছুটিয়া গেলেন—আমাদের জব্দ করিতে পারিলেই যেন মাষ্টার মশায় সুস্থ হন্ এম্‌নি তাঁর ব্যগ্রতা। কাগজের উপর লণ্ঠনের আলো পড়িতেই বিষ্ণুবাবুকে নেতা করিয়া তাঁহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কালিনফর।.........

আমরাও দেখিলাম. কাগজের উপর অবিকৃত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—কালিনফর। প্রেতাত্মার হস্তাক্ষরের প্রতি কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, জ্ঞান ঘোষের মুখমণ্ডল, বোধ হয় আকাশে চাঁদ ছিল বলিয়া, অত্যন্ত ফেকাসে দেখাইতেছে, নগেন গাঙ্গুলি পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, বিপিন দাস দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, অনন্তবাবু অনুপস্থিত, বিষ্ণু বাবু হাসিতেছেন, পরিব্রাজক নির্ব্বিকার, কেশব বিকারের ঝোঁকে অস্বাভাবিক গম্ভীর. অধিকারী রাগ করিতেছে এবং জনতা কমিয়া গেছে!

বিষ্ণুবাবু শর নিক্ষেপের এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। বলিলেন,—চাঁদের মা এসেছিলেন, জ্ঞানবাবু; একেবারে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি এখন চল্লুম, টাকার থলিটা কোথায় রাখব? অঙ্গুল সঙ্কেতে পরিব্রাজককে দেখাইয়া দিলাম। সে বিনা আপত্তিতে যুক্ত করতল-দুটি পাতিয়া টাকার থলিটা যেন অনুগ্রহের মত গ্রহণ করিল।

পরিব্রাজক কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই রাত্রেই হোটেল ত্যাগ করিল। আমি, জ্ঞান ঘোষ, নগেন গাঙ্গুলি, বিপিন দাস, অনন্ত বাবু, অধিকারী এবং তাহার ছাপরা জিলাবাসী ভৃত্য নিউবালক একঘরে গা ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া শয়ন করিলাম।

কেশব আমারই ঘরে সে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালেই প্রস্থান করিল। তাহার দুঃসাহসের কথা বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল।

* * * * *

বদ্‌লি হইয়া পুনরায় সদরে আসিলাম। মাস নয় দশ পরে সন্ধ্যার পর একদিন ক্লাবে ঢুকিতে সিঁড়িতে পা দিয়াই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াই থম্‌কিয়া গেলাম। আওয়াজ হইতেছিল—প্রেতাত্মা যদি হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ হয় তবে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তর্পণের ব্যবস্থা করে' গেছেন কেন?

দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম খুব মোটা গলায় প্রত্যুত্তর হইল—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তর্পণের ব্যবস্থা করেছেন স্বর্গগত আত্মার তুষ্টির জন্য এ কথা জানি—

দেখিতে দেখিতে তর্কযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল।

নয় দশ মাস পূর্ব্বের সেই ভৌতিক ঘটনার রহস্যটা বুঝিতে আমার কিছু বাকী রহিল না। বেশ করিয়া র‍্যাপারখানা মুড়ি দিয়া শুধু চোখদু'টি বাহিরে রাখিয়া ঘরে ঢুকিলাম। দেখিলাম, কেশব এবং তাহার সম্মুখে কিয়দ্দূরে সেই পরিব্রাজক বসিয়া আছে। নবাগত আমার পানে একটিবার চোখ তুলিয়া কেশব বলিতে লাগিল,—কিন্তু যারা তর্পণ করে না তাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মারা কি হায় হায় করে' বেড়াচ্ছে?—কেশবের বক্তৃতা যেন দামামা জয়ডঙ্কা বাজাইয়া প্রতিপক্ষকে দলিয়া পিষিয়া চলিয়াছে।

যাহাতে ভাল করিয়া আমার মুখের উপর আলো পড়ে, মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া এইরূপ স্থানে সরিয়া বসিয়া রহিলাম, —জয়দর্পে ঘাড় উচু করিয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে আমার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই কেশবের বক্তৃতা যেন বজ্রাহত হইয়া মারা পড়িল।

এমন জমাটি সরস বক্তৃতা হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় এবং কেশবের মুখের আমূল ভাবান্তরে ক্লাবের সভ্যগণই যেন সহসা অকারণ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া দিশেহারা হইয়া গেলেন।

পরিব্রাজকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে নতমুখে বসিয়া আছে।

আমি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—আমার কথা অসংলগ্ন এবং আচরণ আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও আমাকে ক্ষমা করতে' হবে। আপনাদের নূতন রকমের এই আমোদ বাধা দিয়ে আমি অপরাধ করছি বটে কিন্তু অকারণে ভয় পেয়ে আমরা কটি প্রাণী কদ্দিন ধরে' যে প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করেছি সে কথা মনে থাকতে আমি কিছুতেই আর অগ্রসর হতে' দিতে পারিনে।

—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বলতে বলতে বাবুরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

সাত পাঁচ ভাবিয়া কথাটা সমস্তই প্রকাশ করিলাম না—হাঙ্গামা করিয়া এখন আর লাভ কি? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তারপর দু একজন ছাড়া বাবুরা সকলেই নব্য যুবক এবং ক্ষীণজীবি কেহই নহেন। সুতরাং ক্রোধের উত্তেজনায় হঠাৎ তাঁরা কি করিয়া বসিবেন তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। বলিলাম—পরে বল্‌ছি, আগে ঐ দুটি লোক্‌কে যেতে বলুন।

কাহাকেও বলিতে হইল না, কেশব, পরিব্রাজক উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল—বোধ হয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতেই গেল।

ভূত আসার গল্পটা তখন আদ্যন্ত বলিলাম। শুনিয়া বাবুরা অবাক হইয়া গেলেন। নিমাইবাবু বলিলেন,—হায় হায় আগে কেন ব'ল্‌লেন না?—বলিতে বলিতে তাঁর দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিল।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত।

মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:•:—

(২) গোবিন্দ কবিরাজ যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার পরবর্ত্তী ও আন্দাজ ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন কবি, 'ভক্তি-রত্নাকর'-গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীখণ্ডের দামোদর কবি-কুলে শ্রেষ্ঠতর
গোবিন্দের হন মাতামহ।
সুর-গুরু সঙ্গে যার তুলনায় বারে বার
লোকে যশ গায় অহরহ ॥
বুঝি মাতামহ হৈতে কবি কীর্ত্তি বিধিমতে
পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি
গুণ গায় পণ্ডিত সমাজ ॥

(গৌর-পদ-তরঙ্গিনী ৪৭৯ পৃঃ)

আন্দাজ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা বল্লভ দাস লিখিয়াছেন—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি-সমাজ
কাব্য-রস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি ॥
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন
গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে, শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিলা পূরণ ॥
এমন সুন্দর তাহা, আচার্য্য-রত্ন শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে "কবিরাজ" শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটী করিলা প্রদানে ॥
গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবি-কুলে যেন রবি
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে ॥"

(গৌ, প, ত ৪৮০ পৃঃ)

পদ-কল্পতরুর সঙ্কলন-কর্ত্তা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—

"জয় কবিরাজ-রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁনা হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম মুরতি পরকাশ ॥
যা কর গীতে সুধা-রস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চিত।

শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত ॥
(পদকল্পতরু ১৮ সং)

গোবিন্দ কবিরাজ যে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট হইতে কবি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, ভক্তি রত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞা কবি সবে প্রশংসয় ॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে ॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥

তথাহি—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিল
নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং ॥

গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় বহুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন; সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীলোকনাথ আদি' দ্বারা শ্রীনিবাস আচার্য্যও লক্ষিত হইতেছেন; এজন্য ভক্তিরত্নাকরের এই উক্তির সহিত পদ-কর্ত্তা বল্লভের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই।

ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে উদ্ধৃত রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম দাস ও গোবিন্দ কবিরাজের নামীয় শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রেরিত সংস্কৃত পত্রে লিখিত আছে—"শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি সমীহা বিশেষস্তু ভবতাং কুশলং। স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলব্ধত্বাৎ তদেব মুহুর্বাঞ্ছামি। তত্র যন্মসি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীব মঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি।" ইত্যাদি।

সে সময়ে আজকালের মত উপাধি সুলভ ছিল না; শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সংস্কৃত কবিরাও গৌরব-সূচক উপাধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহারা যাঁহাকে গৌরব করিয়া 'কবিরাজ' উপাধি দানে অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার মহাকবির উপযুক্ত গুণগ্রাম ছিল না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে কি? গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন সে ভাবে অন্যের পদ "আবৃত্তি" (?) করিয়া কেহ কোন কালে 'কবি-রাজ' হইতে পারিয়াছেন কি? আমরা এখন গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ-বিকৃতির সম্বন্ধে

কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব ।

(১) গুপ্ত মহাশয় পাঠ-বিকৃতির দৃষ্টান্ত-স্থলে প্রথমেই গোবিন্দদাসের "মেঘ যামিনী চলিল কামিনি" ইত্যাদি ৯৯৩ সংখ্যক পদটার প্রথম ও অন্তিম কলিটা বাদ দিয়া মাঝের দুইটা কলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"হেরিয়া যামিনী ফটিক তরু জানি চমকি ধরণী ধারয়ে"—ইহার কোন অর্থ হয় না। শুদ্ধ ও সঙ্গত পাঠ,—

গরুঅ কুচভরে চলু উলট পদ
পীন জঘনক ভারয়ে।
হেরি দামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধরু নীর ধারয়ে ॥
দেখি ফণি মণি দীপ জনি মানি
বামকর দএ ঝাঁপয়ে।
জানল যুবতী ইহ ফণিপতি
সঘন তনু উঠ কাঁপয়ে ॥

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে 'হেরি দামিনী' স্থলে কেবল বটতলার পদকল্পতরু ও তদনুযায়ী সংস্করণ-গুলিতেই 'হেরিয়া যামিনী' এই অর্থ-শূন্য অশুদ্ধ পাঠ আছে ; খ, ঘ, চ, পুঁথি ও পদরত্নাকর দৃষ্টে সংশোধিত, আমা-দের সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদের সংস্করণে 'হেরি দামিনি' পাঠই মূলে ধৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত "শুদ্ধ ও সঙ্গত"-পাঠের 'ভারয়ে' 'ধারয়ে' 'ঝাঁপয়ে' ও 'কাঁপয়ে' শব্দগুলি অশুদ্ধ ও অসঙ্গত ; পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পুঁথিগুলি দৃষ্টে আমাদের উক্ত সংস্করণে 'ভারয়ে' ইত্যাদি শব্দ চারিটার স্থলে, যথাক্রমে 'ভার রে' 'ধার রে' 'ঝাঁপি রে' ও 'কাঁপি রে' পাঠই ধৃত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের পরিত্যক্ত প্রথম ও অন্তিম কলির প্রত্যেক চরণের শেষে 'রে' শব্দ দ্বারাই ছন্দঃ পূরণ করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ এখানে 'ভারয়ে' 'ধারয়ে' ইত্যাদি শব্দগুলি ক্রিয়া-পদ হইতে পারে না ; 'ভারয়ে' ইত্যাদির অন্তিম 'য়ে' অংশটা স্বরের মাত্রা বলিয়া ধরিলে, 'ভারয়ে' ইত্যাদি না লিখিয়া 'ভার এ' ইত্যাদিই লিখা সঙ্গত ; এতদ্ব্যতীত গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত 'ইহ' পাঠও স্পষ্টই অশুদ্ধ, কেন না, 'এস' ('এহ' অক্ষর দীর্ঘ) পাঠ না হইলে এই মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের প্রত্যেক চরণের ৩+৪ ৩+৪

৩+৪+৪=২৫

মাত্রার পূরণ হয় না ; এজন্য গুপ্ত মহাশয়ের ধৃত 'দামিনী' 'নীর' 'জানল' শব্দগুলির স্থলেও 'দামিনি' 'নির' ও 'জানি'ই শুদ্ধ পাঠ হইবে ; আমাদের সংস্করণে উহাই আছে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে বাঙ্গালায়, এমন কি মৈথিলেও 'আ' 'এ' প্রভৃতি দীর্ঘস্বর সর্ব্বত্র দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, এজন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই বাঙ্গালার পুঁথির বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য 'গরুঅ' ও 'দএ' স্থলে

আমাদের আদর্শ-পুঁথি দৃষ্টে 'গুরুয়া' 'দেই' পাঠ গ্রহণ করিয়াছি; বলা বাহুল্য যে, অভিজ্ঞ পাঠক 'য়া' ও 'দে' অক্ষর দুইটী দীর্ঘ উচ্চারণ করিবেন না। 'গুরুঅ' ও 'দ এ' রূপ বাঙ্গালা ব্রজবুলীতে নাই। সুতরাং মৈথিলীর সহিত কল্পিত সাদৃশ্য ঘটাইবার জন্য 'গুরুয়া' 'দেই' প্রভৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন আমরা কোন মতেই সমীচিন মনে করি না। এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মৈথিল 'দএ' শব্দেও উচ্চারণের সৌকর্য্যের জন্য গুরু স্বর 'এ' অক্ষর লঘুই উচ্চারিত হয় এবং এখানে 'এ' লঘু না হইলে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(২) গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদ-তল" ইত্যাদি ১০০১ সংখ্যক পদটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"কর কঙ্কণ পণ কলিমুথ বন্ধন শিখই ভুজগে গুরু পাশে—ইহারও অর্থ হয় না।" গুপ্ত মহাশয় শুদ্ধ পাঠ দেখাইয়াছেন—

"কর কঙ্কণ পুনু মণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গরুঅ পাশে॥"

গুপ্ত মহাশয়ের মতে পংক্তি দুইটীর অর্থ—"আবার কর-কঙ্কণের মুখমণির বন্ধনে ভুজঙ্গের গুরু-পাশ শিক্ষা করে।"

গুপ্ত মহাশয় এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উদ্ধৃত পংক্তি-দ্বয়ের যে অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, উহার বিন্দু-বিসর্গও আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই। মাঝখানে 'পুনু' শব্দের ব্যবধান থাকিলেও 'কর-কঙ্কণ' শব্দের অর্থ যে কিরূপে সম্বন্ধ-বাচক 'কর-কঙ্কণের' ও 'বন্ধন' শব্দটীর অর্থ 'বন্ধনে' (অর্থাৎ বন্ধন বিষয়ে) হইতে পারে এবং 'ভুজঙ্গের গুরু পাশ শিক্ষা করে'—এই বাক্যটীরই বা তাৎপর্য্য কি, গুপ্ত মহাশয় দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন কি?

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত 'কলি মুখ বন্ধন' বা 'মণি মুখ বন্ধন' কোনও পাঠই আমাদিগের দৃষ্ট পুঁথিগুলিতে নাই; শুদ্ধ পাঠ 'ফণি' মুখ বন্ধন'ই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। লিপিকরদিগের ভ্রমেই 'কলি মুখ বন্ধন' বা মণিমুখ বন্ধন পাঠের উৎপত্তি হইয়াছে।

"কর-কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে।"

পংক্তিদ্বয়ের একমাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে—(শ্রীরাধা অন্ধকার-রজনীতে অভিসারের একটা অন্তরায় সর্প-ভয় নিবারণের জন্য) নিজের (বহুমূল্য রত্নময়) কর-কঙ্কণ পণ অর্থাৎ মূল্য বা পারিতোষিক-দ্বারা ভুজঙ্গ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওস্তাদের নিকট (ঔষধ মন্ত্রাদির সাহায্যে) ফণাধারী বিষধর-সর্পের মুখবন্ধন অর্থাৎ যে উপায়ে বিষধর সর্পের মুখ বন্ধ করা যায়, সেই কৌশল শিক্ষা করেন। গোবিন্দদাসের এই পদটী বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ; গুপ্ত

মহাশয় ইচ্ছা করিলে যে কোন অভিজ্ঞ কীর্ত্তন-গায়কের নিকটও এই পংক্তিদ্বয়ের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ জানিয়া লইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া মৈথিল গীত-সংগ্রহের বিকৃত পাঠ গ্রহণে গোবিন্দ-দাসের এরূপ দুর্দ্দশা করায় আমরা বস্তুতঃই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের ভাব স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গীত-কর্ত্তা কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহোদয়ের বিখ্যাত "রাই উন্মাদিনী" পালার একটী গানে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের যতদূর স্মরণ হয়, ঐ গীতটী ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র সেন মহা-শয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থেও স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে; আমাদিগের কাছে এখন সেই গ্রন্থগুলি না থাকায় আমরা ঠিকানা দিতে পারিলাম না; কৌতূহলী পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই খুঁজিয়া লইতে পারিবেন।

(৩) গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের "অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।" ইত্যাদি (৯৯১ সংখ্যক) পদটী উদ্ধৃত করিয়া, ঐ পদের ভূমিকায় মন্তব্য লিখিয়াছেন—"আর একটি পদে পাঠ-বিকৃতি নহে, ভাষার বিশিষ্টতা প্রমাণিত হয়"। তাঁহার উদ্ধৃত পদের ৪র্থ কলিটী এইরূপ যথা—

"ভ্রমর ভুজঙ্গ মনিসি আঁধিয়ার।
তাঁহি বরিখত অবিরত জলধার।"

গুপ্ত মহাশয় পংক্তি দুইটীর সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন—"মনিসি শব্দের অর্থ মনে করিতেছি, অনুমান করিতেছি। এই আকারে এই শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না।"

প্রয়োগ দেখা যায় না, তথাপি সেই অর্থ মানিতে হইবে; ইহা নিতান্ত গরজের কথা বটে। 'প্রায় দেখা যায় না'—ইহা দ্বারা গুপ্ত মহাশয় বুঝাইতে চাহেন কি যে তিনি এরূপ দুই একটা প্রয়োগও দেখিতে পাইয়াছেন? আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, 'মনিসি' শব্দটার অস্তিত্ব হিন্দী, মৈথিল বা বাঙ্গালা ভাষায় কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই; ইহা পাঠোদ্ধারের কৌতুক-জনক ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। হস্তলিপি পুঁথির ও মুদ্রিত গ্রন্থের পদ-চ্ছেদের অভাবেই পাঠোদ্ধারে ভ্রান্তি হেতু "ভ্রমর ভুজঙ্গম নিসি আঁন্ধিয়ার" পাঠই—"ভ্রমর ভুজঙ্গ মনিসি আঁন্ধিয়ার" এই অর্থ-শূন্য দুর্ব্বোধ্য পাঠে পরিণত হইয়াছে। যদিও ক, খ, ঘ, চ ও পদ-রস-সার পুঁথি-গুলিতে 'ভ্রমর' পাঠই আছে, কিন্তু আমরা 'পদ-রত্নাকর' পুঁথি অনুসারে আমাদের সংস্করণে 'ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ারি' পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। বলা আবশ্যক যে, 'মনিসি' পাঠ কোন পুঁথিতেই নাই; শব্দটা ও উহার কল্পিত অর্থ সম্পূর্ণ অমূলক।

(৪) গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের "চাঁচর চিকুর চূড় পরি" ইত্যাদি (২৪২৫ সংখ্যক) পদের "নিকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল" পংক্তিটীর সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া-

ছেন,—'নিকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল খাঁটি হিন্দী।"

গুপ্ত মহাশয়ের এই মন্তব্যের ইঙ্গিত বোধ হয় এই যে, মৈথিল গোবিন্দদাসের পক্ষেই এরূপ হিন্দী কায়দায় লেখা সম্ভবপর, বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের পক্ষে নহে। ইতিপূর্ব্বে আমরা ভাষা-তত্ত্ববিৎ সুনীতি বাবুর 'ব্রজবুলি' সম্বন্ধে যে সারগর্ভ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই বলা হইয়াছে যে—"এই মিশ্র ভাষায়* দুই চারিটী অবট্‌ঠ ও পশ্চিমা হিন্দীর রূপও আসিল।" বস্তুতঃ কৃত্রিম এবং মৈথিল ও হিন্দীর অনুকরণপূর্ণ ব্রজবুলীতে 'নিকে বনি' ইত্যাদির মত প্রয়োগ পাওয়া অসম্ভব নহে। গুপ্ত মহাশয়ের অবগতির জন্য আমরা লিখিতেছি যে, বিদ্যাপতির মৈথিল পদেও 'নিক' শব্দের 'সুন্দর' বা 'উত্তম' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় †। সুতরাং ইহাকে খাঁটি হিন্দী বলা চলে না; বাঙ্গালা ব্রজবুলীতে মৈথিল ও হিন্দী উভয় ভাষার প্রভাবেই এই রূপটী আসিতে পারে।

অতঃপর গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের 'অনুপ্রাস' সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন—"অতিরিক্ত অনুপ্রাস কাব্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নহে। মিথিলার এই কবির অনুপ্রাস-পূর্ণ পদসমূহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্যও নহে। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে শুধু শব্দ কৌশলের হিসাবে এমন কবিতা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পদ একরকম ভাষার ও শব্দের ব্যায়াম-সাধনা, শ্রুতি-মনোহর কোমল শব্দরাশির উপর কবির একাধিপত্য ও কণিত স্বর্ণ-শৃঙ্খলের ন্যায় শব্দ যোজনা দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

গুপ্ত মহাশয় এই অনুপ্রাস-পটুতার উদাহরণস্থলে গোবিন্দদাসের "মুখরিত মুরলি মিলিত মুখ মোদনে" ইত্যাদি (২৪২৬ সংখ্যক) পদটা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও "মনমথ মন মথ মারি" স্থলে, অর্থ-বৈচিত্র্য-শূন্য "মনমথ মন মন মারি" পাঠ ও "মন্দ-মরন্দ-মুদিত মত মধুকর, স্থলে 'মন্দ মকরন্দ মুদিত মত মধুকর" ছন্দোদুষ্ট পাঠ গ্রহণ করায় পদটীর বিকৃতি ঘটিয়াছে। মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস যে তাঁহার কতকগুলি পদে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের বাহুল্য দেখাইয়াছেন, সেগুলিকে কোন অভিজ্ঞ সমালোচকই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে উহা তৃতীয় শ্রেণীর 'চিত্র-কাব্য' শ্রেণী ভুক্ত। গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব এ জন্য নহে। তাঁহার বহুসংখ্যক পদেই সুপ্রযুক্ত, নাতিবহুল 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' বিশে-

* অর্থাৎ আলোচ্য ব্রজবুলিতে।

† গ্রিয়ার্সন সাহেবের Maithil Chresto-mathy গ্রন্থের Vocabulary, ১৯৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

যতঃ সুশ্রাব্যত য় অতুলনীয় ছেকানুপ্রাসের সহিত সুমধুর রস-ভাব যুক্ত ব্যঞ্জনা-পূর্ণ রচনার এরূপ মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছে যে, তাহার তুলনাস্থল অতুলনীয় পদ-সাহিত্যও বিরল। তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট রস-ব্যঞ্জনা-পূর্ণ পদে অনুপ্রাসের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য দেখা যায় না। যাঁহারা গোবিন্দদাসের অনুপ্রাস-পূর্ণ প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা—

"আঘণ মাস রাস-রস-সায়র
নায়র মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিণি-গণ পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥"
ইত্যাদি (১৮১৪ সংখ্যক)

"নীরদ-নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥"
ইত্যাদি (৬৭ সংখ্যক)

"চূড়ক চূড়ে ময়ুর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতি-মাল।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কার॥"
ইত্যাদি (৭৪ সংখ্যক)

পদগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "আঘণ মাস" ইত্যাদির মত একটা পদ যিনি রচনা করিয়াছেন, আমাদের মতে তিনি অন্য পদ রচনা না করিলেও শুধু ঐ একটী পদের জন্যই অমর ও চিরস্মরণীয় হইতেন। গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে একটা ইঙ্গিত দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও লীলার বর্ণনা-কারী বাঙ্গালী গোবিন্দ-দাসের রচনা কোন বিষয়েই ব্রজলীলার কবি গোবিন্দদাসের অনুরূপ নহে। এই-রূপ ইঙ্গিত যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অসঙ্গত শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা-সূচক উল্লিখিত "নীরদ নয়নে" ইত্যাদির মত দুই চারিটী পদ পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারিবে। গোবিন্দদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পদগুলিতেও তাঁহার ব্রজ-লীলার পদের ন্যায় একই মহাকবির সুনিপুণ হস্তের পরিচয় বিরল নহে ; তবে কাব্যোচিত বিষয়ের প্রাচুর্য্য হেতু তাঁহার হাতে যে ব্রজ-লীলার বর্ণনা অধিক ফুটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল গোবিন্দ-দাস নহে, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধেও এ কথা তুল্যভাবে প্রযোজ্য বটে।

গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে অনেক অপ্রাসঙ্গিক উক্তি ও ইঙ্গিত করায়, আমা-দিগকে উহার খণ্ডন জন্য অনেক বাহুল্য কথা বলিতে হইল। আমাদের বিশ্বাস যে শুধু ভাষা-গত ও ভাব-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও বিশ্বাস-যোগ্য ঐতিহাসিক প্রমান দ্বারাই আলোচ্য বিষয়ের সুমীমাংসা হইতে পারে। গুপ্ত মহাশয় তাহা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা না করিয়া, কয়েকটী কল্পিত ও অবান্তর বিষয়ের উপর অযথা আস্থা স্থাপন করিয়াই তাঁহার এই অভিনব

মতটী উপস্থাপিত করিয়াছেন। মিথিলার পণ্ডিতগণও যে কবি-সম্মানের জন্য কখনও দাবী করেন নাই, সেই কবি-সম্মান গুপ্ত মহাশয় উপযাচক হইয়া মিথিলা-বাসীকে দিতে ইচ্ছা করায়, আমরা তাঁহার উদারতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত একজন প্রবীণ সাহিত্য-সেবীকে এরূপ একটা অমূলক মত স্থাপনে ব্যগ্র দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত না হইয়া পারিতেছি না। যদি অতঃপর গুপ্ত মহাশয় বা তাঁহার পক্ষীয় কেহ, সুযুক্তি দ্বারা আমাদের উল্লিখিত প্রমাণের অসারতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা চিরস্মরণীয় উপকার করা হইবে এবং মৈথিল মহাকবি গোবিন্দদাসের আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহাদের নামও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম, এ।

স্বয়ম্বর সভা

তৃতীয় দৃশ্য

[রমেশের অন্তর্ব্বাটীর ঘর। মাদুরের উপর—বীনা, ললিতা সুষমা, লীলা। সময়-দুপুরবেলা—মাদুরের উপর তাস ছড়ানো]

ললিতা। তোর ভাই এ অন্যায় আব-দার বীণা! এসেছি কি অমনি গানের ফরমাস। অত গানই বা পাই কোথা থেকে বল দি কিনি—আর মেজাজটা গলাটা সব সময়ই কি তৈরী হয়ে আছে যেন গ্র্যামোফোনের কল ঘোরালেই হোলো? আজ তুই গা আমরা শুনি।

বীণা। গাইবি না তাই বল—অত কথা ক'বার কি দরকার?

ললিতা। রাগ করিস কেন লো? তোর বাসর ঘরের জন্যে গান যে সব জমিয়ে রাখ'চি। শোন্ তবে একটা গাই—

কাঁদিতে জানেনা যে লো সখি
জানেনা কভু সে ভালবাসা,
কে বলে প্রণয় হাসি মধুময়?
নিশিদিন আঁখি জলে ভাসা!
বিরহ-স্বপনে মিলনের রাতে
কাঁদিয়া জাগিয়া উঠি দুজনাতে,
অভিমানে মরি কুসুম আঘাতে,
তবু কাছে তারি ফিরে আসা।

শুনলি ত গান—লাগলো কেমন লো বীণা?

বীণা। শুনতে ত ভালই লাগলো—কিন্তু ওর মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারলুম কই?

লীলা। আর কটা দিনই বা! আট দশ দিন যাক—তার পরে দেখবি—ও গান তোর কাছে একেবারে জল!

বীণা। শুনে গা টা জল হয়ে গেল! আচ্ছা ললিতা ভালবাসার তোর যে দিন প্রথম হাতে খড়ি হোলো সে দিনটা তোর বেশ মনে পড়চে?

ললিতা। সে আবার কবে?

বীণা। কেন?—সেই ফুল শয্যার রাত্তিরে!

ললিতা। সে রাত্তির কি কখনো কেউ ভোলেরে! সে যে জীবনের পাতায় সোনার জলে ছাপানো—চোখের সামনে জল্ জল্ করছে!

বীণা। তাই নাকি? কি ছাপানো রয়েছে—বলনা ভাই একটু শুনি—

সুষমা। দুদিন সবুর করনা বাপু পরের মুখে ঝাল খুড়ি মিষ্টি খেয়ে কী হবে?

ললিতা। শুনবি আবার কি? আমি ত ভাই সেজেগুজে আপাদমস্তক গয়না পরে বিছানার উপর এসে বসলুম—তার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম—একলাটি কেউ কোথাও নেই। যখন জেগে উঠলুম তখন একেবারে সকাল—তখনো কেউ কোথাও নেই। চেয়ে দেখি, বিছানার কোণে আমার সব গয়না খোলা পড়ে রয়েছে—গলায় শুধু আমার একগাছি ফুলের মালা—তা দেখে রাজকুমারীর মত কেবলই ভাবতে লাগলুম—কে পরালে মালা!

বীণা। আর একথা মনে হোতে লাগলো না?—

সে যে পাশে এসে বসেছিল চেয়ে দেখিনি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

ললিতা। ঠিকই বলেচিস ভাই! ঐ কথাই ত মনে হচ্ছিল!

লীলা। যাঃ আর চালাকি করতে হবে না। সত্যি কথা বল্

(চুড়িওয়ালীর প্রবেশ)

(গান)

চাই চুড়ি বেলোয়ারী রকমারি ঢের,
এনেছি পসরা ভরা রঙ বেরঙের!
চুড়ি ঝকমকে ঝলমলে হাতে না লাগে,
পরো পরো সখি—অনুরাগে;
চলে গেলে ফিরে পরে পাবেনাক ফের।
চুড়ি ম্যাগনেটি গুন,
চুড়ি হাতে পান থেকে খসেনাক চুন,
বেহাত হয় না বঁধু ভালবেসে খুন,
বের ফুল ফুটে ওঠে কুমারী মেয়ের।

বীণা। ও চুড়িওয়ালী—নতুন কোন রকম চুড়ি আছে?

চুড়িওয়ালী। আছে বৈ কি দিদি-মণি—এই নিন্ না নন-কো-অপরেশন চুড়ি (চুড়ি বাহির করিয়া)

বীণা। সুষমা, লীলা, চুড়িওয়ালীর

গান শুনলিত। পরনা কেন এই নন-কো-অপরেশন চুড়ি—উপকার পাবি! আর ললিতা তুই ত পরবই।

লীলা। আর তুই?

বীণা। আমার পরে আর কি হবে? আমার ত বিয়ের ফুল যা ফোটবার ফুটে গেছে—প্রমাণ পাকা দেখা—অথচ এখনো বঁধু হয়নি যে সে বেহাত হোলো কিনা তার জন্যে সাবধান হতে হবে।

সুষমা। সত্যিই ত! ও চুড়িওয়ালী—যে সব কুমারী মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটে গেছে বিয়ে টুকুর শুধু বাকী তোমার চুড়িতে তাদের কিছু হবে বলতে পার?

চুড়িওয়ালী। হবে বৈ কি দিদিমণি ফুল ফুটে গেছে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফল ধরবে এ চুড়ি পরলে।

বীণা। দুর পোড়ারমুখী! চল্ ও ঘরে চল্ দিদির কাছে দাম দস্তুর হবে আয়লো লীলা ললিতা সুষমা

চতুর্থ দৃশ্য

রমেশের অন্তর্ব্বাটী। সরলা বীণার চুল বাঁধিয়া দিতেছে হ্যাট কোট টাই পরা পোষাকে রমেশের প্রবেশ

সরলা। কী গো! এই তিনটে বাজলো এরি মধ্যে আজ? আজ শুক্রবার আজ ত তোমার চারটেয় ছুটি।

রমেশ। আমার রুটিন দেখচি যে তোমার সব মুখস্থ! ছেলেরা মাথা ধরেছে বলে ক্লাস ছেড়ে পালায়, আজ আমি রোল কল্ করে মাথা ধরেছে বলে ক্লাস হ'তে পালিয়ে এসেছি। ছেলেরা মহা খুসী!

সরলা। তারা ত জানে না মাষ্টার মশায়ের বিয়ে তাই তারা তোমার কথা বিশ্বাস করলে। আচ্ছা, অমন মিথ্যে কথা বলে আসার চেয়ে প্রিন্সিপ্যালকে কেন বলে এলেনা যে পরিবারের আমার সাংঘাতিক অসুখ দুদিন ছুটি চাই তা হলে কাল শনিবারটা আর কলেজ যেতে হোতো না ক'দিন ধরে বীণা দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ী দেখতে যাবে ধরেছে সেখানেও যাওয়া হোতো।

রমেশ। মাথা ধরেছে এইটে মিথ্যে কথা আর পরিবারের সাংঘাতিক অসুখ এই বুঝি বড় সত্যি কথা হোলো?

সরলা। ওমা! আমার সাংঘাতিক অসুখ নয়? এই যে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারিনা—রাত্তিরে ভাতে একেবারে অরুচি হয়ে গেছে—একটু ক্ষিদে পেলেই অন্ধকার দেখি—একটু কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠি—এগুলো বুঝি সব সুস্থ শরীরের লক্ষণ!

রমেশ। ভুলে গেছি বড় সাংঘাতিক ব্যায়রামই বটে! ওকথা যাক্, পড়াতে আজকে আমার ভাল লাগলো না! কলেজ যাচ্চি, পথে একখানা চিঠি পেলুম। বিমানের দাদা লিখেছে যে তাদের খুড়ী কাল রাত্তিরে মারা গেছে—তাহ'লেই বুঝতে পাচ্চ—বোশেখ মাসের আগে আর বীণার বিয়ে হচ্চেনা—মনে মনে

আমোদ আহ্লাদের যে সব প্লান এঁটে ছিলুম সব এক মাস দেড় মাস পেছিয়ে গেল! পাকা দেখা হয়ে গেছে—বিয়ের আর কোন গোলমাল নেই—তবু চার হাত না এক হওয়া অবধি সুস্থির হতে পাচ্চি না! বীণা—ভাবিসনি ভাই—আসিবে সখি আসিবে, হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে তবে এক মাস সবুর করে থাকতে হবে—এইটে তোর প্রাণে বড় বাজিবে সখি বাজিবে। ওকি ও! কথাটা না শুনতে শুনতেই মুখখানা কাগজের মত শাদা করে ফেল্লি যে!

বীণা। দিদি দেখচো জামাই বাবু বাড়ীতে পা দিয়েই আমার সঙ্গে লেগেছেন!

রমেশ। তা তোর কথা কইতে অমন ঠোঁট কাঁপচে কেন?

বীণা—দিদি দেখচো!

রমেশ—"এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেচি," মন প্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেচি!

বীণা। দিদি দেখচো!

সরলা। মনে করেছিলুম মুখে হাতে জল দিয়ে কিছু না খেলে কোন কথা কইব না—কিন্তু আর থাকতে পাল্লুম না কথা শুনলে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে। ওছেলে মানুষ—ওকে নিয়ে অমন করতে একটু লজ্জা করছে না? হোলোই বা শালী! তুমি কার চোখে দেখলে মুখখানা ওর কাগজের মতন শাদা হয়ে গেছে—কথা কইতে গেলে ঠোঁট কেঁপে উঠচে। এখনই যেন ও বড় সড় হয়েছে—ওকে তুমি কত টুকু দেখেছ বলদিকিনি! ওর সঙ্গে অষ্ট প্রহর ঐ বিয়ের কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হয়? এক মাস পেছিয়ে গেল গেলই—বিয়েই যদি ওর ওখানে না হয়—তাতেই বা ওর কি বোয়েটা গেল? আমাদের জাত অমন বিয়ে পাগলা হয় না—ওরোগটা তোমাদের জাতেই দেখা দিয়ে থাকে। যাও এখন মুখ হাত পা ধুয়ে এসো—তার পর কিছু খেয়ে আমায় কৃতার্থ কর!

রমেশ। আমি একটু ঠাট্টা করেছি বৈত নয়! এতেই এত? এদিকে চাণক্য পণ্ডিত কি বলে গেছেন জান? তিনি বলে গেছেন—প্রাপ্তে তু ষোড়ষ বর্ষে শ্যালীম পত্নীবদাচরেৎ অর্থাৎ ষোল বছরে পা দিলেই শালীকে পত্নীবৎ জ্ঞান করবে।

সরলা। দিনকের দিন হোচ্চো কি? মুখে যা আসবে তাই বলে যাবে? তোমার কথার কোন জবাব দিতে চাইনা—আমি চল্লুম!

(প্রস্থানোদ্যত)

বীণা। জামাই বাবুর জন্যে সেই কমলা নেবুটা জল খাবারের সঙ্গে নিয়ে এসো দিদি!

রমেশ। দিদিকে দিয়েও আমায় এতক্ষণ খুব একচোট বকুনি খাওয়ালি—আমি তোকে খালি জ্বালাতন করি,

ঠাট্টা করি—তবু আমার জন্যে আবার কমলা নেবু আন্‌তে বল্‌লি যে!

বীণা। বা তা বোলবো না? তুমি কোন সকালে খেয়ে গেছ—তেষ্টা পায় না? আর দিদি যে অত কথা তোমায় বলবে—তাকি জানতুম?

রমেশ। বীণা তোর মনের ভিতরটা কিরকম কচ্চে ঠিক করে বলনা ভাই!

বীণা। পাশের খপর পেয়েও গেজেটে নামটা না বেরোনো অবধি তোমাদের মনটা যে রকম করতে থাকে কি জানি কি হয় বা এই রকম বুঝলে! যাও, ছোটো, এইবার দিদিকে এই কথা বলে দিতে!

রমেশ। বড় চমৎকার কথা বলেচিস্ ত। রমেশ বেশ পরিবর্ত্তন করিলে সরলা জল খাবার আনিয়া দিল—রমেশ খাইতে বসিল বীণা টেবিল হারমোনিয়মে গান ধরিল—

রামা শ্যামা যদু ভোলা
সবাই দু হাত দু পা ওলা,
মগজ এবং মাথাগুলাও অনেক পাবে খুঁজে;
কিন্তু যারা রসিক এবং রসের মর্ম্ম বুঝে—
হাজার করা একটি করে গড়েন সরস্বতী,
যেমন আমার ভগ্নীপতি ওগো আমার ভগ্নীপতি
ওগো আমার ভগ্নীপতি!
তরল হাসি এমনতর খেলে কাহার ঠোটে?
সোণার বরণ লীলা কমল হৃদয়তলে ফোটে!
মন্দাকিণী সম পূত পরিহাসের ধারা
সিক্তকরে চিত্তভূমি পরাণ মাতোয়ারা,
কৌতুকে কার ঝর্‌তে থাকে পান্না মুক্তো মতি
সে যে আমার ভগ্নীপতি ওগো আমার ভগ্নীপতি ওগো আমার ভগ্নীপতি!
ভায়ের মতন এমন স্নেহ—
কোথাও নাহি পাবে কেহ,
এমনতর যত্ন আদর কার অদৃষ্টে জোটে?
বিদ্রুপেরি রূপ ধরে যা রং বেরঙে ফোটে!
কৌতুকে তাই প্রাণের প্রীতি জানাই কাহার প্রতি,
সে যে আমার ভগ্নীপতি ওগো আমার ভগ্নীপতি
ওগো আমার ভগ্নীপতি!

ক্রমশঃ

শ্রীকিরণ ধন চট্টোপাধ্যায়

খোকার আঁখি

খোকার আঁখির জন্মভূমি—নীলাব্জেরি আবছায়া,
বিপুল ধরার লাবণ্য যে জড়িয়ে আছে তার কায়া।
কিশলয়ের আগ্রহ তার সপ্ত-ঋষির কণ্ঠে যে,
অরুণ আলোর উদার স্নেহ আকাশ তারে বণ্টে যে;
ইন্দিরা তার হর্ষ জাগায় স্পর্শে দিবা-শর্ব্বরী,
আবীর বাগের মর্ম্ম কাঁপায় হাস্য তাহার মর্ম্মরি,'
পলকে ধীর লীলায় ফেরে থির বিজুরী সঞ্চরি';
পল্লবে ঘুম চুম্ দিয়ে তার ফুটায় স্বপন-মঞ্জরী ;
মণি—কালো কোকিল ফুটায় ফাগুন বনের ফুল গুলি,
মণি—মাতাল ফুলের নেশায় দেয় মিঠে শিস্ বুলবুলি ;
ভাষা মোহন ছন্দে ঘেরা ঝর্ণাধারার মন-তুষা,
কান্না ক্ষয়ায় অশ্রু—যেন পান্না ঝরায় মঞ্জুষা ।
খোকার আঁখি—মুক্ত পাখী—শিল্পী ভুলায় মন্তরে,
মায়ের স্নেহ কাজল হ'য়ে বাঁধ্‌লো তারে অন্তরে !

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

রবীন্দ্র-সাহিত্যে রস-বিচার

(রবীন্দ্র-জন্মতিথি-অনুষ্ঠান সভায় পঠিত)

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যের নয়টি রসের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শান্ত। ইহা ব্যতীত বাৎসল্য নামক আর একটি অতিরিক্ত রস কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ অলঙ্কার শাস্ত্রেই উহাকে শান্ত রসের অঙ্গ বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত কবি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাব্যে এক বা একাধিক রসের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারো কাব্যে এই নব রসের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাকবি রবীন্দ্র নাথের কাব্যে এই রস কিরূপ সুবিন্যস্ত ভাবে আছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শৃঙ্গার রস।

ইহা সর্ব্ব রসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে আদিতে গণ্য করা হইয়াছে। এ জন্য ইহার আর একটি নাম আদিরস বা আদ্যরস। শৃঙ্গ এবং আর এই দুইটি শব্দ হইতে শৃঙ্গার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মন্মথের উদ্রেককে শৃঙ্গ কহে। যাহা হইতে তাহার আর অর্থাৎ আগম হয়, তাহাকে শৃঙ্গার কহে।

এই শৃঙ্গার রস উত্তম নায়ককে আশ্রয় করিয়া হইবে।

আদিরস মাত্রেই অশ্লীল নহে। যে শৃঙ্গার রস উত্তম নায়ক অবলম্বন করিয়া প্রকাশ না পায় তাহাই অশ্লীল।

পরস্ত্রী বেশ্যা ও অনাসক্তা কামিনী সম্বন্ধীয় অনুরাগ আদিরস বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রত্যেক রসেই আলম্বনবিভাব, উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব আছে।

যাহাকে অবলম্বন করিয়া যে রসের উৎপত্তি তাহাই সেই রসের আলম্বনবিভাব।

অনুরাগী নায়ক ও অনুরাগিণী নায়িকা শৃঙ্গার রসের আলম্বনবিভাব।

প্রত্যেক রসের আবার উদ্দীপনবিভাব আছে। চন্দ্র, চন্দনাদি সুগন্ধী দ্রব্য, ভ্রমর ঝঙ্কার, কোকিল কুজন প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাব।

অন্তরে রসের বিকাশ হইলে যে সমুদয় ক্রিয়ার দ্বারা বাহিরে তাহা প্রকাশিত হয় তাহাই সেই রসের অনুভাব।

ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষপাত ইত্যাদি শৃঙ্গার রসের অনুভাব।

রসের আতিশয্য অবস্থা ব্যভিচারীভাব। যে রসের যাহা পরিণতি তাহাই সেই রসের স্থায়ীভাব।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নয়টি রসের স্থায়ীভাব যথাক্রমে—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা, বিস্ময় ও শান্তি।

শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব—রতি। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক রসের বর্ণ ও দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছে।

শৃঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম, দেবতা—বিষ্ণু।

উদাহরণ—

"শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও,
অলকে কুসুম না দিও,
কাজল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও।"

এ স্থলে নায়কের বিশুদ্ধ অনুরাগ সূচিত হইতেছে। নায়িকাকে কবরী শিথিল করিয়া বাঁধিতে, অলকে কুসুম না দিতে এবং নয়ন কাজল বিহীন করিতে বলায়, নায়িকা যে নায়কের প্রতি অনুরাগ বশে এই সব করিয়াছে তাহা ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং অনুকূল নায়ক নায়িকা আলম্বন বিভাব হইয়াছে।

কবরী সংযমন, অলকলগ্ন-কুসুম, নয়ন-

লগ্ন কাজল উদ্দীপন বিভাব হইয়াছে কারণ নায়িকা এই সমস্ত উপচার দ্বারাই নায়কের চিত্তে শৃঙ্গার রসের উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আর সুসংযত কবরী, কুসুম খচিত অলক, কাজল-উজল নয়ন দ্বারা নায়িকার অন্তরের শৃঙ্গার রসের বিকাশ হইয়াছে এ জন্য ইহা অনুভব।

অশিথিল কবরী, কুসুমিত অলক, কাজল-উজল নয়নেও পরিতৃপ্ত না হইয়া শিথিল কবরী, কুসুম শূন্য অলক, কাজল বিহীন সজল নয়ন দেখিবার জন্য নায়কের যে ঔৎসুক্য ইহাই ব্যভিচারী ভাব।

ইহা দ্বারা নায়ক নায়িকার মনে যে একটি অবিচলিত অনুরাগের সৃষ্টি হইল, এই রতিই স্থায়ীভাব।

এইরূপে অনুকূল নায়ক নায়িকার আলম্বন. উদ্দীপন, অনুভাব ব্যভিচার ও স্থায়ীভাবের সৃষ্টি করিয়া এই কবিতাটি একটী পরিপূর্ণ শৃঙ্গার রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

সেই শৃঙ্গার রস আবার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দুই প্রকার।

যে স্থলে নায়ক নায়িকা উভয়েরই প্রকৃষ্ট অনুরাগ আছে কিন্তু তাহাদের মিলন হয় না তাহা বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার।

যেমন—

সে কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়।
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মতো
বেজেছে কানের কাছে
যেন তার প্রাণের কথা
আধেক খানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়।

সম্ভোগের উদাহরণ—

"আমায় এম্নি খুসি করে' রাখ
কিছুই না দিয়ে—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।"

হাস্য রস

বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হইতে হাস্য রসের উৎপত্তি হয়।

বিকৃত আকারাদি ইহার আলম্বন বিভাব।

হাসাইবার জন্য যে বাক্য এবং প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয় তাহা ইহার উদ্দীপন-বিভাব।

অক্ষির সংকোচন এবং মুখের বিকারাদি ইহার অনুভাব।

হাস্য সংযমন প্রয়াস ইহার ব্যভিচারী-ভাব।

হাস্য ইহার স্থায়ীভাব।

ইহা শ্বেতবর্ণ। ইহার দেবতা প্রমথ।

স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত,

অপহসিত ও অতিহসিত ভেদে হাস্যরস ছয় প্রকার। তাহাকেই স্মিতহাস্য বলে —যাহাতে নয়ন ঈষৎ বিকসিত হয়।

স্মিত হাস্যের সহিত যদি অধর স্পন্দিত হইতে থাকে, দন্ত অল্প লক্ষিত হয় তবে তাহা হসিত।

হসিত হাস্য যদি মধুর স্বর সংযোগে হয় তবে তাহাকে বিহসিত বলে।

শির কম্পের সহিত যে হাস্য তাহা অবহসিত। হাসিতে হাসিতে অশ্রু নির্গত হইলে তাহা অপহসিত।

ইতস্ততঃ অঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া যে হাস্য তাহা অতিহসিত।

এই হাস্য পাত্র বিশেষে প্রয়োজিত হইবে। উত্তম পাত্রে স্মিতহাস্য ও হাসা। মধ্যম পাত্রে বিহসিত ও অবহসিত; আর নীচ পাত্রে অপহসিত ও অতিহসিত হইবে।

উদাহরণ—

চারিদিক হতে এল পাণ্ডতের দল,
অযোধ্যা কণোজ কাঞ্চি মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হ'তে এল বুধ অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিণেয় বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি ল'য়ে উল্টায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকি সুদ্ধ মাথা।
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ সমেত।
কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে কেহ অভিধান;
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনো রূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে "হিং টিং ছট্"।

এখানে পাকা শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় সঠিক মাথা সঞ্চালন ইহার আলম্বন বিভাব।

মোটা মোটা পুঁথি লইয়া পাতা উল্টানো "হিং টিং ছটের" অর্থ অন্বেষণ জন্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ব্যাকরণ অভিধান অন্বেষণ, অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ বৃদ্ধি করা, এবং থাকিয়া থাকিয়া "হিং টিং ছট" করিয়া ওঠা ইহার উদ্দীপন বিভাব,

নিরর্থক শব্দের অর্থ খুঁজিবার জন্য বিষম সঙ্কটে পড়িবার মতো চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ইত্যাদি ইহার অনুভাব।

হাস্য সংযমন প্রয়াস ইহার ব্যভিচারি ভাব।

করুণ রস

প্রিয় বস্তুর বিনাশ কিংবা কোনো প্রকার অনিষ্ট ঘটিলে করুণ রস হয়।

শোকের বিষয়ীভূত বস্তু ইহার আলম্বন বিভাব।

শোকজনিত যন্ত্রণা ইহার উদ্দীপন-বিভাব। সন্তপ্ত ব্যক্তি বিলাসাদি যাহা কিছু করে তাহা অনুভাব।

নির্ব্বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাদি ইহার ব্যভিচারীভাব।

শোক স্থায়ীভাব।

ইহা ধূম্রবর্ণ। যম ইহার দেবতা।

উদাহরণ—

"তবে আমি যাইগো তবে যাই!
ভোরের বেলা শূন্যকোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে'
বল্‌ব আমি—নাই সে খোকা নাই!"

এখানে পুত্রহীনা মাতার পুত্র আলম্বন। পুত্রের অদর্শন উদ্দীপন।

"খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বল্‌ব তোমায় ঘুমো
তুই ঘুমিয়ে পড়্‌লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে' ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাবো চুমো।"

খোকা বলে ডাকা, খোকার লাগি অনেক রাত্রি জাগা, অনুভাব।

"পূজোর কাপড় হাতে করে'
মাসি যদি শুধায় তোরে
"খোকা আমার কোথায় গেল চলে?"
বলিস্‌, খোকা সে কি হারায়!
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে!"

এই বিবেক উক্তি ব্যভিচারী ভাব।

রৌদ্র রস

ক্রোধ যাহার স্থায়ীভাব তাহাই রৌদ্র রস। শত্রু ইহার আলম্বন। শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন।

তর্জ্জন আত্মপ্রশংসাদি অনুভাব।

আবেগাদি ব্যভিচারীভাব।

ইহা রক্তবর্ণ—রুদ্র ইহার অধিদেবতা।

উদাহরণ—

"উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি',
প্রকাশ-হীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে
ভব্যতার গণ্ডীমাপে
শান্তি নাহি মানি।"

এই যে পরাধীনতা রূপ শত্রু, ইহাই আলম্বন বিভাব।

পরাধীনতার জন্য চিন্তার অপ্রকাশ ইহার উদ্দীপন বিভাব।

"মর্ম্মে যবে মত্ত আশা
সর্প সম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে,"

এই যে সর্প সম মত্ত আশা; এই যে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন উচ্ছ্বাসে"

এই বীরোচিত তর্জ্জন ও আত্মপ্রত্যয়, ইহাই অনুভাব।

ভব্যতার গণ্ডীমাঝে শান্তি না পাইয়া কোথাও ছুটিয়া যাইয়া শান্তি পাইবার জন্য এই যে আবেগ, ইহাই ব্যভিচারীভাব।

বীররস

উত্তম প্রকৃতির লোকের ক্রোধ প্রকাশকে বীর রস কহে।

বীজেতব্য ইহার আলম্বন বিভাব।

বীজেতব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপণ বিভাব।

বিজয়ীর সহায়ক দ্রব্যাদি অনুভাব। ইহা হেমবর্ণ। ইহার দেবতা মহেন্দ্র।

উদাহরণ—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ ভার
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলি তলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে
সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারংবার
মনুষ্য মর্য্যাদা গর্ব্ব চির পরিহার
এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর।”

এ স্থলে পাষাণ ভার, পেষণ যন্ত্রণা, নিত্য অবনতি, আত্ম-অবমান, দাসত্বের রজ্জু, বৃহৎ লজ্জারাশি বিজেয় বিষয়। ইহাই আলম্বন বিভাব।

সর্ব্ব প্রকার ভয় উদ্দীপণ বিভাব।

বীর রসের সহায় অন্বেষণাদি অনুভাব ;. সুতরাং এস্থলে মঙ্গলময় অনুভাব।

চরণ আঘাত ব্যভিচারী ভাব।

এই বীর রস যুদ্ধবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর ও দয়াবীর ভেদে চারি প্রকার।

বাহুল্য ভয়ে দিঙ্মাত্র উদাহরণ প্রদর্শণ করিলাম।

ভয়ানক রস

যাহাতে ভয় স্থায়ীভাব হয় তাহাই ভয়ানক রস।

যাহা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় তাহা আলম্বন বিভাব।

যে কারণ হইতে ভয় উপস্থিত হয় তাহা উদ্দীপন বিভাব।

ভীত ব্যক্তির বিবর্ণতা, বাক্যের জড়তা, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, কম্প, ইতস্তত দৃষ্টিপাত, ইত্যাদি অনুভাব।

মোহ, মৃত্যু ইত্যাদি ইহার ব্যভিচারী ভাব। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। কাল ইহার অধিদেবতা।

উদাহরণ—

সূর্য্য অস্ত না যাইতে ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে
রূপনারাণের মুখে পড়ি বালুচর
সঙ্কীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর-সমীরে
উত্তাল উদ্দাম। তরণী ভিড়াও তীরে
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রী-দল।
কোথা তীর? চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে।
—দিগন্তরে যায় দেখা
অতি দূরে তটপ্রান্তে নীল বনরেখা ;—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যের পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভবে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ় সম। তীব্র শীত পবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্দ্ধ ডাক,
ডাকি' আত্মজনে।”

এ স্থলে ভয়ের উৎপত্তির কারণ ঝড় আলম্বনবিভাব।

ক্ষিপ্তোন্মত্ত জলের উত্তাল উদ্দাম তরঙ্গ, উদ্ধত বারির উচ্ছ্বাস, তরীর ঘূর্ণণ ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব।

হতবাক্ হওয়া ইত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বীভৎস রস

ঘৃণা যাহার স্থায়ীভাব তাহা বীভৎস রস। ঘৃনাজনক দ্রব্যাদি ইহার আলম্বন।

ঘৃণাজনক দ্রব্যাদিকে যে কারণে ঘৃণিত করে তাহা ইহার উদ্দীপণ বিভাব।

ঘৃণা জন্য মুখ চক্ষুর যে সংকোচনাদি উপস্থিত হয় তাহা অনুভাব।

তজ্জনিত আবেগাদি ব্যভিচারী ভাব।

ইহার বর্ণ নীল। মহাকাল ইহার দেবতা।

উদাহরণ—শান্ত ও মধুর রসের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বীভৎস রসের অসদ্ভাব। যাহা কিছু স্মরণে আসিতেছে লিখিলাম।

"নিদারুণ রোগে মারী গুটিকায়
ভরে' গেছে তার' অঙ্গ।
রোগ-মসী ঢালা কালী তনু তার
লয়ে' প্রজাগণে ; পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তা'র সঙ্গ।"

এখানে রোগে মসীঢালা কালীতনু আলম্বন বিভাব।

মারী গুটিকায় অঙ্গ-ভরিয়া যাওয়া উদ্দীপন বিভাব, প্রজাগণের তাহাকে ঘৃণায় বাহিরে লইয়া ফেলা অনুভাব।

তাহার বিষাক্ত সঙ্গ পরিহার করা ব্যভিচারী ভাব।

অদ্ভুত রস

বিষয় যাহার স্থায়ীভাব তাহা অদ্ভুতরস। অলৌকিক বস্তু ইহার আলম্বনবিভাব। সেই অলৌকিক বস্তুর মহিমা উদ্দীপন বিভাব। সেই অলৌকিক বস্তুর দ্বারা যে সম্ভ্রমাদি উপস্থিত হয় তাহা ইহার অনুভাব।

তাহার পর বিতর্ক ভ্রান্তি ঈর্ষাদি যাহা হয় তাহা ব্যভিচারীভাব।

ইহা পীতবর্ণ। গন্ধর্ব্ব ইহার দেবতা।

উদাহরণ—

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।
কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে
লীলা কমল রৈত হাতে
কি জানি কোন কাজে।
অলক সাজ্ত কুন্দ ফুলে
শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব নীপের মালা।"

এস্থলে কবির কালিদাসের কালে জন্ম লওয়া মানবিকার জালে বন্দী হওয়া, আর বিভিন্ন ঋতুতে প্রাপ্ত কুরুবক, কমল, কুন্দ শিরিষ, কদম্ব ও লোধ্র ফুলের আভরণ

ধারণ এই সব অলৌকিক ব্যাপার আলম্বন বিভাব।

কালো কেশের মাঝে শাদা কুরুবক পরা, আনমনে কমল হাতে রাখা, কুন্দফুলে অলক সাজানো, শিরীষ ফুল পরা কটীতটে নূতন কদম ফুলের মালা দোলানো, আর—

"ধারা যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু
মাখ্‌তো মুখে বামা।"

এই ধারাযন্ত্রে স্নান—শেষে ধূপের ধোঁয়া এবং—

"ছল্ করে তা'র বাধ্‌ত আঁচল
সহকারের ডালে।"

আর একটিবার দেখার জন্য সহকারের ডালে ছল করে' আঁচল আটকে দেওয়া, এই ব্যাপারগুলি উদ্দীপনবিভাব।

এই বর্ণনায় কালিদাসের কালের প্রতি যে একটা সম্ভ্রম উদ্রেক করিতেছে তাহা ইহার অনুভাব।

পাঠান্তে এ কালের কবির কালিদাসের কালে জন্ম লওয়া সম্ভব কি না, হয় তো বা কালিদাসই রবীন্দ্রনাথ হইয়া জন্মাইলেন এইরূপ বিতর্ক ভ্রান্তি অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে যে হর্ষের আবির্ভাব হয় তাহাই ব্যভিচারী ভাব।

শান্তি রস।

শান্তি যাহার স্থায়ীভাব তাহাই শান্তিরস। সংসারের অনিত্যতাদি এবং সেই সত্য শিব সুন্দরের স্বরূপ চিন্তন ইহার আলম্বন বিভাব।

রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব ইহার অনুভাব।

বৈরাগ্যাদি ইহার ব্যভিচারীভাব।

এই রসের বর্ণ কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। শ্রীনারায়ণ ইহার দেবতা।

উদাহরণ—

"একটি একটি করে' তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো।
ভেঙে গেছে দিনের মেলা,
বস্‌বে সভা সন্ধ্যা বেলা,
শেষের সুর যে বাজাবে তা'র
আসার সময় হোলো
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো॥

* * *

এতদিন যে গেয়েছ গান
আজকে তারি হোক অবসান"

"শেষের সুর যে বাজাবে তা'র আসার সময় হোলো" "এত দিন যে গেয়েছ গান, আজকে তারি হোক অবসান" ইত্যাদি আলম্বন বিভাব।

"দুয়ার তোমার খুলে দাওরে
আঁধার আকাশ পরে,
সপ্তলোকের নীরবতা
আসুক তোমার ঘরে।"

প্রাণের দুয়ার খুলিয়া দিয়া সপ্তলোকের নীরবতার সঙ্গলাভ করার ইচ্ছা ইহার উদ্দীপন বিভাব।

এতদিনের পুরাতন গান অবসান করা ইহার অনুভাব।

"এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র
সেই কথাটাই ভোলো
সেতার খানি নূতন বেঁধে তোলো॥"

এ যন্ত্র যে আমার নয় এই জ্ঞান শান্ত রসের ব্যভিচারী ভাব।

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের রস-সমুদ্রের গণ্ডুষ মাত্র বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থিত করিলাম। আমার অক্ষমতার রস বিচারে যে সব ত্রুটি হইল তজ্জন্য আমি মহাকবির নিকট এবং পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীসুরজিৎ দাস।

অপরাজিতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাতপাক ঘোরা হইলে, স্ত্রী আচার শেষ হইলে, একটি ক্ষুদ্রকক্ষে বরকন্যাকে বসাইয়া বিনোদের দ্বারা যখন কন্যা সম্প্রদান করা হইল, অতিক্রান্ত-যৌবন দোহারাশরীর বরের স্থূলহস্তে যখন তন্বী বালিকা কন্যার ক্ষীণহস্ত রক্ষিত হইল, বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিতা কন্যার বক্ষ ভেদ করিয়া কোন্ গভীর অন্তস্তল হইতে বারবার একটা প্রশ্ন উত্থিত হইতে থাকিল— এই স্বামী? এই আজীবনের সাথী?

সহচরীদের স্বামীবিষয়ক আলাপে তার কিশোরহৃদয়ে স্বামী সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, প্রত্যক্ষ স্বামীর তাহার সহিত কোথাও মিল পাইল না। স্বামী বলিতে চোদ্দ বছরের মেয়ে বুঝিয়াছিল—যার মত নিকট সাথী আর কেহ হইতে পারে না। সখিদের কাছে চির-শ্রুত সেই স্বামীআদর নেবার—আদর দেবার, মান করিবার মান ভাঙ্গাবার, সাধিবার সাধাবার একটি মধুর অবলম্বন। শুভদৃষ্টিতে যাকে দেখিল তাকে ত স্বামীর মত নিকট বস্তু, প্রিয়বস্তু লাগিল না; তাকে দেখিয়া যে ভয় করিল, সম্ভ্রম আসিল, বুক থম্‌কিয়া গেল। শিখার ভিতর হইতে

* এই প্রবন্ধ রচনায় আমি কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ রসগঙ্গাধর বাগ্‌ভটালঙ্কার কাব্যগ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি।

কোন্ এক প্রাণী বলিতে থাকিল—না না না এ নয়! কোথায় কি ভুল হয়েছে। এ কার একটা মস্ত কৌতুক! এখনি ধরা পড়িবে।

বালিকার অন্তর্ব্বাণী বাহিরে কেহ শুনিতে পাইল না। এমনতর কথা যে তার মনের মধ্যে উঠিয়াছে তাহা কাহারও কল্পনায়ও আসিল না। বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ের আবার এ বিষয়ে ভাবনাই বা কি, চিন্তাই বা কি। যার সঙ্গে হাতে হাতে যুড়িয়া দিবে সেই হইবে স্বামী, সেই হইবে বরণীয়, সেই হইবে প্রেমাস্পদ। কাণা হউক পদ্মলোচন হউক, ঘাটের আসন্নমড়া বৃদ্ধ হউক, নবযৌবন কুমার হউক, কুচরিত্র হউক সুচরিত্র হউক—কন্যার পক্ষে সবই সমান। হিন্দুর ধর্ম্মে মুমুক্ষু যোগীর ভাগে যে সমদর্শিতা চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া রক্ষিত হইয়াছে, হিন্দুর ঘরে কন্যার ভাগে তাহা অকাট্য অনুশাসনরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। 'ব্রাহ্মণি শ্বপাকে চ' ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের প্রতি সমভাবাপন্ন নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগীরা যত্নশীল হইয়াও যে যোগীভ্রষ্ট হন, হিন্দুর কন্যা জন্মমাত্র সেই যোগী আরূঢ়া রহিয়াছে এমনি একটা অলীক স্তোকবাক্যে মনকে প্রবোধ দিয়া চলিতেছেন হিন্দুঘরের বাপ-মা-ভাই-মাতা-মহী-পিতামহী-পরম্পরা। ঘরে ঘরে পদে পদে ঠোকর খাইতেছেন, তথাপি সত্যকে স্বীকার ও মিথ্যাকে তিরস্কারের সাহসে কুলাইতেছে না।

নবম পরিচ্ছেদ

বাসিবিয়ের দিন আত্মীয়াকুটুম্বিনী ও পাড়াপ্রতিবেশিনীরা বরকন্যা বিদায়ের পূর্ব্বে যৌতুক করিতে আসিলেন। মাথায় ধান দূর্ব্বা দিতে দিতে পুরাণ বাড়ীর ছোট-খুড়ীমা গদগদভাবে বলিলেন—"আহা কি সুন্দর মানিয়েছে, যেন হর গৌরী।"

তুলনা শুনিয়া শিখা চমকিয়া উঠিল। কথাটা আধখানা সত্য মনে হইল! এত-দিন যে শিবঠাকুরের সে পূজা করিয়া আসিয়াছে ইনি সেই শিবই হবেন। কোথায় যে ভুল হইয়াছে এবার ধরিতে পারিল। ভুলটা সারার উপায়ও দ্রুত উদ্ভূত হইল। যথাস্থানে জানাইলেই ভুল সংশোধন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র রহিল না। মনে মনে গৌরীর চরণে প্রণত হইয়া কহিল—"হে মা গৌরি তোমার শিব ত আমি চাইনি, শিবের পদে স্বামী চেয়েছি! ঠাকুর কেন এসেছেন মা! ঠাকুর দেবতা কি স্বামী হয়? স্বামী যে মানুষ!"

তার সরল বিশ্বাসে স্থির করিল পার্শ্ব-বর্ত্তী নমস্য দেবতা দেখিতে দেখিতে সহজ মানুষে রূপান্তরিত হইবেন। মিনিট কতক পরে তীব্র আগ্রহে একবার পাশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। যিনি ছিলেন তিনিই আছেন, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মানুষ হউন, দেবতা হউন রাজা মহেন্দ্র-নারায়ণ যে শিখার স্বামী এ অমোঘ সত্যের তিলমাত্র ব্যত্যয় হইল না।

পিসিমার আশীর্ব্বাদ, সখীদের কৌতুক, দাসীদের ক্রন্দনরোল ও সর্ব্বসাধারণের হট্টগোলের মধ্যে শিখা পিতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। সকলে অবাক্ হইল। রসিকা নূতন দিদিমা বলিলেন—আজকাল-কার মেয়েরা কি বেহেয়া দেখেছ? কাঁদ্‌তেও জানে না। টস্‌টসে পাকা বরটি পেয়ে নাতনীর আহ্লাদ আর ধরে না!

সখীরা ভাবিল হীরামোতির ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া রাণী সাজিয়া শিখা আনন্দে বিভোর হইয়াছে। পিসিমাও নিশ্চিন্ত হইলেন। মেয়ে যদি কান্নার বন্যা ছুটাইয়া যাইত, তবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেন। তাকে পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল নিরশ্রু দেখিয়া তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন। এই পাষাণের ভিতর জীবনদাহ কি যে বহ্নি প্রচ্ছন্ন রহিল তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। নিজের কৃতকর্ম্মের গর্ব্বে ইষ্টদেবতাকে ধন্য ধন্য করিলেন।

নহবৎখানায় বিদায়ের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। সেই কোমল করুণ সুরের লহরী বিনোদের বুকে তীব্র আঘাত করিল। সে নিজের কক্ষে ছুটিয়া আসিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিল। অল্প ক্ষণ পরে উর্ম্মিলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তার কপালে হাত রাখিল। স্বামীর চোখের জলে হাতখানা ভিজিতে তারও চোখে জল ভরিয়া উঠিল। বিনোদ মুখ তুলিয়া "উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া উদাসস্বরে কহিল—আজ একটা কুমারী কন্যার বলিদান হয়ে গেল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরলা দেবী

বিশ্ববার্ত্তা

—:০:—

বিলাতে—

সেই ৩০শে এপ্রিল বিলাতে কয়লার ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার শেষ হইল না। কয়লা মজুরদের প্রতিনিধি মিঃ কুকের এক সুর "একপেনী কম নয় এক মিনিট বেশী নয়" (Not a penny off, not a minute on.) কিন্তু মাইনার্স ফেডারেসন প্রস্তাব দিয়াছিল—(১) ধর্ম্মঘটের আগে যেমন ঘণ্টা ও মজুরীর ব্যবস্থা ছিল তাই থাক, (২) চার মাসের মধ্যে একটা জাতীয় বন্দোবস্ত হোক, (৩) নূতন বন্দোবস্তের স্কীম, ও কয়লা কমিশনের প্রস্তাবিত মজুরী সম্বন্ধে কমিশনাররা যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে. (৪) সরকারকে এসম্বন্ধে যথাশীঘ্র সম্ভব একটা আইন তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে ওসব মজুর ও খনিদাররাই ঠিক করিবে, সরকার ইহাতে হাত দিবে না। সরকার কয়লা কমিশন বসাইয়া ২ কোটি ১০লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিল, অথচ

কমিশন যে যুক্তি দিল তাহা গ্রহণ করিতে নারাজ। ওদিকে খনিদাররাও নূতন কোন বন্দোবস্ত পছন্দ করিতেছে না কোন আপোষে তাহারা রাজী নয়। মজুররাও এক গোঁ ধরিয়াছে "nationalisation" সত্য বুঝুক ভুল বুঝুক তাহাদের ধারণা হইয়াছে এই যে খনিদাররা সরকারের সমর্থন ও সাহায্য লইয়া মজুরদের অন্ন ও অঙ্গে হাত বসাইতে চায়, কয়লা ক্ষেত্রে উহাদের চেষ্টা সিদ্ধ হইলেই অপর পুঁজিদারেরা সর্ব্ব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দানা কাড়িয়া খাইবে। মিঃ কুক হয়ত একটু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে চাহেন, তবু জনসাধারণ শ্রমিকদের উপর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে কেবল ঐ এক কারণেই।

ফ্রান্সে—

লড়াইয়ের সময় ইউরোপের জাতিগুলি আমেরিকার নিকট হইতে যে কড়ি ধার করিয়াছিল তাহার ফল এখন ফলিতেছে। ১৯২২ সালে "ব্যালফুর নোটে" ঠিক হয় যে ইংরাজরা কোন ইউরোপীয় মিত্রের কাছ থেকে তাদের ঋণের টাকা ফিরিয়া চায় না, তবে মার্কিন ঋণ শোধ করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা দিলেই ইংলণ্ড কৃতার্থ হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ ফ্রান্স ও ইটালী অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া ইংরাজের ঋণ এক রকম বাতিল করিবারই চেষ্টা করে। ফ্রান্সকে যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে না তাহা নহে। ফরাসী মুদ্রার দাম কমিতে বসিয়াছিল। হেরিয়ট মন্ত্রীত্বে ফ্রাঙ্কের দাম এত কমিয়া যায় যে জনসাধারণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। ফলে পঁয়কারের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নূতন ট্যাক্স বসান হয়। মন্ত্রী বলিতেছেন ফ্রাঙ্ককে এবার খাড়া করিয়া তুলিবেন, না তুলিলে বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট কমিয়া যাইবে, বেলজিয়মের বিশেষ দুরবস্থা হইবে, এমন কি সাক্ষাতে বা পরোক্ষে ইটালীর আর্থিক দুর্দ্দশারও কারণ হইবে।

স্পেনে—

স্পেন ইটালীর সঙ্গে সেদিন হঠাৎ একটি সন্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। স্থির হইয়াছে, অবশ্য বাহ্যতঃ, যে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে। আসল কথা সবাই মনে করিতেছেন যে স্পেন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভূমধ্য সাগরের প্রভুত্ব ব্যাপারে ইটালীকে সাহায্য করিবে। কাজেই ইউরোপে এখন দুই সমস্যা দাঁড়াইল—প্রথম, বলশেভী সমস্যা, দ্বিতীয় ভূমধ্য সাগর সমস্যা। স্পেন আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র তাহাদেরই জন্যই লিগ অব নেশন্‌সের কাউন্সিলে স্থায়ী আসনের অধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারিল না। প্রাই মো দি রিভেরা প্যারী ঘুরিয়া আসিলেন, ডন্ আফঁসো লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, কোনই ফল হইল না। কাজেই ইটালীর সহিত মিত্রতা করিয়া শক্তিধরদের ভূমধ্য সাগরে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইয়াছে!

ইটালীতে—

ইটালীতে আর্থিক অবস্থা নাকি ভাল নয়। শ্রমিকদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ। ফ্যাসিজ্‌ম এই আট মাসে পড়িল কিন্তু দেশে সুখ আনিতে পারিল না। মুদ্রার অধোগতি হইতেছে, সরকার চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অর্থ সচিব কাউন্ট ভলপি পদত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, মুসোলিনি তাঁহাকে ছাড়িতেছেন না—কারণ, অমন বিশ্বাসী লোক মিলিবে না, কারণ মার্কিণে ভলপির মান যথেষ্ট। মিঃ মেলন তাঁহার বন্ধু। মুসোলিনী যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন সুদিন আনিতে।

গ্রীসে—

গ্রীসে রক্তহীন বিপ্লব হইয়া গেল। বলশেভী-বাদী প্যাঙ্গালোসের হাত হইতে জেনারাল কনডিলিস শাসনতন্ত্র ছিনাইয়া লইয়াছেন। গ্রীসের সাবেক রাজা বিলাত হইতে বলিতেছেন, ইহা রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টা। শীঘ্রই গণতন্ত্রের নূতন নির্ব্বাচন হইবে।

রুশিয়ায়—

রুশিয়াতে বলশেভীদলে একটা মতান্তর বা মনান্তর হইয়া গিয়াছে। কঠিন প্রাণ জার জিলস্কী মারা গিয়াছেন বা নিহত হইয়াছেন। জিনোভিফ্, ল্যাশেভিচ্, থিশেলফ, শুগেফ প্রভৃতি বলশেভী নেতাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। অনেকেই নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ইঁহাদের অপরাধ এই যে শাসন ব্যাপারে প্রোলেটারিয়েটের ক্ষমতায় ইঁহারা বিশ্বাসবান নহেন। কিন্তু মতবাদ ও বাক্যের লড়াই যতই চলুক রুশ সরকার চমৎকার এক ফৌজ তৈরী করিতেছেন। জঙ্গী স্কুলগুলিতে রীতিমত লড়াই শিক্ষা দেওয় হইতেছে। "জি, পি, ইউ" দল রাষ্ট্রের মধ্যের সমস্ত অশান্তি দমনের জন্য সর্ব্বদা তৈরী হইয়া আছে। ইহাদেরই সৈনিকরা আজ চীনে যাইয়া শক্তিধরদের বেকুব করিয়া তুলিয়াছে।

চীনে—

প্রাচ্য খণ্ডে চীনের কথাই বড় কথা। বলশেভী অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে দুনিয়ার জাতির উপর সেখানকার জাতীয় ফৌজ গুলি চালাইতেছে। শক্তিধররা রণসর্দ্দার উপি-ফু ও চাং সোলিনকে দিয়া এই জাতীয় দলকে কাবু করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছেন। হয়ত বা উপিফু জাতীয় দলের হাতে বন্দী। সবারই টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। মার্কিন, ফ্রান্স, জাপান, ইংরাজ মিলিয়া চীন সরকারকে চিঠি দিয়াছেন। চীন কিন্তু বেপরোয়া!

তুরস্কে—

তুরস্কে গঠন কাজ পুরাদমে চলিয়াছে। জেনানাদের বোরখার সহিত যেমন গিয়াছে পর্দ্দা, মরদদের শির হইতে তেমনি ফেজ উঠিয়াছে। কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে সরকার অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু এক বিষয়ে কৃশ্চাণরা তুরকীদের ঠাট্টা করিতেছে আর ভারতীয় মোছলমানরা তোপ করিতেছেন। বিষয়টা এই—তুর্কীরা নাকি সম্প্রতি কয়েক মাসে পঞ্চাশ লক্ষ বোতল নূতন মার্কা শ্যাম্পেন খরচ করিয়াছে। সম্প্রতি স্মার্ণা বিচারে বিদ্রোহী দলের নেতাদের কোতল করিয়া ফেলিয়া য়্যাঙ্গোরা মন্ত্রীসভার ন্যায় সচিব মামুদ এসাদবে বলিয়াছেন যে—গাজী মুস্তাফা কেমাল আমাদের জাতির ত্রাণ কর্ত্তা, ইতিহাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আজ দুই সহস্র বৎসর হইতে দুনিয়া তাঁহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বৈজ্ঞানিক—

আমেরিকায় মেয়েদের সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে যে মেয়েদের সর্ব্ব প্রথম শেখা দরকার প্রাথমিক শুশ্রূষা করা।

* * *

ক্যান্সার ব্যাধি সম্বন্ধে ডাঃ চার্লস এইচ, মেয়ো হলেন পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন এই ব্যাধি পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসিত কর্ব্বার উপায় তিনি করছেন। তিন ভাগের এক ভাগ এই ব্যাধি হয় পাকস্থলীতে, চামড়ায় হয় শতকরা আড়াইটায়, বুকে হয় শতকরা সাড়ে দশটা। গত বছর এক আমেরিকাতেই ১ লক্ষ লোক ক্যান্সারে মরেছে। তার উপরেই বুকের ব্যারাম। তাতে মরেছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার।

* * *

ব্রেজিলের বোটানিষ্ট ডাঃ জেরাল্ডো কুলম্যান বল্‌ছেন ওদেশে কুষ্ঠের এক রকম অব্যর্থ ওষুধের গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্ববিদ ডাঃ রাথষ্টোন আলভারেজ কুষ্ঠ ব্যাধির সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করেছেন। ইনি বলেছেন যে কুষ্ঠে চালমুগরা তেলের ব্যবহার শত শত বছর আগে জানা ছিল, তবে গন্ধ খারাপ বলে বিশেষ কেউ ব্যবহার করতে চাইত না। কুষ্ঠের আধুনিক ওষুধই হচ্ছে চালমুগরা। (New York Evening Journal—June 1, 1926).

* * *

মাঝারী বয়সের একজনের মাথার চাঁদিতে এক ইঞ্চি চৌকোনা জায়গায় চুল রয়েছে প্রায় ১২০০, মুখে ১৬০, বুকে তারও অর্দ্ধেক। মেয়েদের মাথার চাঁদিতে এক ইঞ্চি চৌকোতে চুল আছে প্রায় ৬০০। চুল যার যত কাল চুল তার তত ঘন। মেয়েদের মাথায় মোট চুল বোধ হয় দেড় লক্ষ। পুরুষদের চুলের চাইতে ওদের চুল মোটা ও ভারী। মাসে চুল বাড়ে প্রায় ২ ইঞ্চি। মাথার চুল টেকে ছয় বছর। চোখের পাতার চুল টেঁকে ১৩০ দিন। তারপর নতুন চুল গজায়।

* * *

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ্জ এমার্সন আবিষ্কার করেছেন যে সোজা হয়ে দাঁড়ানার উপর সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি নির্ভর করে।

* *

ইউরোপের সব চাইতে বড় নর্ত্তন বিশারদ রুথোল্‌প লাবান গানে স্বর-লিপির মতন নাচনার লিপি বের করেছেন। এই নর্ত্তনলিপি দেখলে মেয়েরা নাচনার ছন্দ ও লাস্য ঠিক করে নিতে পারবে।

দশ কথা—

দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গল থেকে গত ৩০শে মে ইংলণ্ডে সাদামটনে ১৫০০ রং বেরঙের চিড়িয়া গিয়ে পৌঁচেছে। বোধ হয় এগুলো কোন চিড়িয়া খানার শোভা বর্দ্ধন কর্ব্বে। তিনটী পাখী এদের মধ্যে দুধ আর মধু খায়, তিনটি পাখী আওয়াজ করে যেন হাতুড়ী পিট্‌ছে। একটি ভুঁইয়ের উপর দিয়ে এত জোরে দৌড়াতে পারে যে ঘোড়াও তা পারে না। পাখীগুলো কিনেছেন পেট্রেরিয়ার মিঃ সি, এস, ওয়েব। দাম প্রায় ২৫ হাজার টাকা।

* * *

গত ৩০ শে মে ব্রুসেল্‌সে এক পায়রা ও এক মোটর সাইকেল চালকে দৌড়ের বাজী হয়েছে পায়রা তিন মিনিটে হেরে গেছে।

* * *

মার্কিনের মিঃ এণ্ড্রু মেলন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। সেদিন মেয়ে মিস্ এলসার বিয়েতে তিনি ২০ লক্ষ পাউণ্ড যৌতুক দিয়েছেন, এ ছাড়া মুক্তোর মালা, দাম তার ২০ হাজার পাউণ্ড। বিয়ের আসরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও সুইডেনের যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন।

* *

তার নাম উজ্জা। লণ্ডন পশুশালার গুজরতী হাতী। তার সামনের দুই পা দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তাররা সেদিন "এক্‌স্ রে" দিয়ে তার পা পরীক্ষা করেছে। ডাক্তার ছবি নিয়ে বলেছে ভারী ঠাণ্ডা রোগী। পরীক্ষা হয়ে গেলে উজ্জা মহা বিরক্তে কুলো কান নাড়্‌তে লাগল, আর চীৎকার করে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল।

* *

ডায়বেটিসের জন্য প্যারিস প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ হেনরী চবণের ও ডাঃ ডবলু, এস, সি কোপম্যান নতুন রকমের ইনসুলিন প্রয়োগ করছেন। দু'বেলা খাবার আগে প্রত্যহ দুবার করে বেশী মাত্রায় ইনসুলিন দেওয়ায় ১৫ দিনের মধ্যে glycoswia নষ্ট হয়ে যায়। তার পর কয়েক মাস বিনা ওষুধেই

রোগী বেশ ভাল থাকে। তবু ডাক্তাররা তিনমাস পর আবার তাকে ইনস্থলিন প্রয়োগ করেন। আবার প্রয়োগ ফাঁক যায়। ফলে গত তিন বছরে ১৬০টি রোগী আরাম হয়েছে।

*　　*

অষ্ট্রেলিয়ার সীডনীতে তাদের বাড়ী। সহোদর ও সহোদরা। তিন ভাই, বোন। ভাই বড়, নাম টম গ্লীসন ওজনে ৪৪৮ পাউণ্ড। ভগ্নী বেলার ওজন মাত্র ৩৬৩ পাউণ্ড। কনিষ্ঠা য়্যানা দুঃখ করে যে তার ওজন মাত্র ৮৪ পাউণ্ড।

*　　*

বেলগ্রেডে একজন ৬৩ বৎসর বয়সের বুড়ো একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন অপরাধীর গ্লাণ্ড নিয়ে বৃদ্ধের শরীরে লাগান হয়। লোকটা এখন বলছে যে তার বয়স ৩০ বছর যেন কমে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে অপরাধী ব্যক্তিটাকে মুক্তি দেওয়া হবে। বৃদ্ধরা সবাই মিলে ডাঃ কেলেস্নিকভের এই অদ্ভুত চেষ্টার জন্য সুখ্যাতি করছে শত মুখে।

ভিয়েনাতে আজকাল উপোসের ধুম পড়ে গেছে। যুবতী আলেকজান্দ্রা সেনকোভিচ সুন্দরী নর্ত্তকী। ইনি জুন মাসে ত্রিশ দিন উপোস করেছিলেন; আলেকজান্দ্রা বলেছেন যে, শীগগিরই আমি দুনিয়ার উপোসীদের উপর টেক্কা দেব।

*　　*

রাস্তা থেকে পেরেক কাঁটা ইত্যাদি খুঁটে নেবার জন্য এক রকম ঝাড়ু যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেদিন ৫ মাইল পথে এক যন্ত্র ১৫০ পাউণ্ড পেরেক কুড়িয়েছে।

*　　*

তুষার পাত থেকে ফলের বাগিচা রক্ষা কর্ব্বার জন্য বিজলি দিয়ে বাগিচা গরম রাখবার চেষ্টা চলছে।

*　　*

লণ্ডনে গত বছরে মাত্র একটি লোক রেলে কাটা পড়েছে।

—তারা

রাহুর প্রেম

—:০:—

রাহু যেদিন পড়ল ধরা স্বর্গেতে
　　অশ্রু-ফোঁটা কা'রোর চোখে পড়্‌ল কি?
তার রোদনের বেদন ছায়ে ঘর পেতে
　　চোখের জলের আল্পনা কেও গড়্‌ল কি?
মৃত্যু-সমান চোর-অপরাধ—তার তলে
　　হৃদয় ভরা প্রণয় কত—জান্‌ত কে?
দোষ দিয়েছে সবাই মিলে সরগোলে
　　বিদ্রোহী সে বিপথগামী ভ্রান্তকে!

কেউ কি সেথায় ছিল যেজন ধীর ভরে
একটুখানি ভেবেছিল তার কথা ?
কেউ বুঝেছে নয়ন জলের নির্ঝরে
রাহুর প্রেমে লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ ব্যথা ?
রাহুর চোখে দিবস রাতি বয় ধারা,
বাঁশীর সুরে কাঁদন তারি উঠ্‌ছে গো !
দুঃখ-মিলন হৃদয় কারো দেয় সাড়া ?
তারি তরে কান্না কি কার ছুট্‌ছে গো !
বড়ই ভীষণ রাহুর প্রেমের টান নাকি,
দোসর হৃদয় অশ্রু ঝরায় কোন্ লাজে ?—
মর্ত্ত্যবাসী ! কাঁদ্‌তে পার কান্না কি ?—
রাহুর প্রণয় চিরতরেই একলা যে !

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস

শুভ দৃষ্টি

(গল্প)

রোজ তার সঙ্গে দেখা হতো, কিন্তু কখনও কিছু মনে হয়নি ! একদিন তাকে খুঁজতে এসে দেখলুম, বাগানে বসে একটা পায়রাকে বুকে নিয়ে সে আদর করছে। স্নেহ যেন তার হৃদয় থেকে উথলে পড়ছে ! পায়রাটি তার সেই অমৃতময় স্পর্শে এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতিতে অভিভূত হয়ে তার বুকে নির্ব্বিঘ্নে ছোট মাথাটী গুঁজে স্বর্গ-সুখ ভোগ করছিল। আমি কিছু না বলে একটা গাছের ডালে ভর দিয়ে তাদের এই খেলা দেখতে লাগলুম !

সে কি যাদু মন্ত্র জানে ? কি অপূর্ব্ব এ পরিবর্ত্তন ! তার রোজকার মূর্ত্তি কোথায় মিশিয়ে গেল ! দেখলুম, স্বপ্ন-রাজ্যের এক রাণী তার মাধুর্য্যের লহর তুলে এই পাখীটিকে নিয়ে খেলা করছে আর নিজের গৌরবে নিজেই মেতে উঠছে ! আমি তার দিকে চাইলুম, মোহাবিষ্টের মত—বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

আমার দিকে মুখ তুলে সে হাসলে। তেমন হাসি তাকে কখনও হাসতে দেখিনি—কাউকে না!

তার ছোট্ট চাঁপাফুলের মত হাতটীতে আমার স্ফুরিত অধরোষ্ঠের একটী গাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করে বল্লুম, "তুমি এত সুন্দর—তা তো আমি জানতুম না!"

হেসে আমার মুখের উপর তার স্নেহ-কোমল দৃষ্টি ন্যস্ত করে সে বললে, "আজ কি হয়েছে, বল দেখি? রোজ তোমায় দেখি—কখনও কিছু মনে হয়নি! আজ তোমার ঐ চাহনিতে আমার শরীরের মধ্যে কি এক বিদ্যুৎ খেলে গেল! মনে হলো, আমি আর আমার নই! আজ থেকে আমি আর এক জনের!"

এস, ওয়াজেদ আলি

নৃত্য-কালী

—:০:—

দাঁড়িয়ে আলোক-শিবের বুকে আঁধার নাচে নৃত্য-কালী,
ফুলের বুকে নাচ্‌চে ঝরা,
যৌবনেরি বক্ষে জরা,
জীবনেরি মর্ম্মে নাচে মৃত্যু—দিয়ে করতালি!
প্রথম আসা-র বুকটি দলে' শেষ বিদায়ের নিত্য ক্রীড়া,
হয়ে-ওঠার বুকের 'পরে
ফুরিয়ে-যাওয়া নৃত্য করে,
হাসির বুকে অশ্রুময়ী সর্ব্বনাশীর নৃত্য-ক্রীড়া!
দাঁড়িয়ে আলোক-শিবের বুকে আঁধার নাচে নৃত্য-কালী,
জ্বলার বুকে নাচন নেবার,
জাগার বুকে ঘুমিয়ে-দেবার,
প্রসব-ঘরের বাতির শিখায় চিতা-ধূমের নৃত্য খালি!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুসলমানের সঙ্গীতাতঙ্ক

বাঙ্গালার মুসলিম লীগের সম্পাদক কুতুব-উদ্দিন আহমেদ সাহেবের মতানুসারে মসজিদের সম্মুখে গানবাজনায় আপত্তির হুকুমটা আধুনিক। তাহা হইলেও এতদিন শুধু মসজিদের সম্মুখেই গীতবাদ্য নিষেধের আব্দার চলিয়া আসিতেছিল, এখন কিন্তু তাহা গৃহে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, পাবনার কতিপয় যুবক মুসলমান পল্লীর নিকট ইছামতী নদীতে নৌকায় গান-বাজনা করিতেছিল! মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তাহারা ঐ পল্লীর নিকট গান বাজনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে "গোবিন্দ" বিগ্রহ লইয়া কতকগুলি হিন্দু জলপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ইলিয়ট ব্রিজের নিকট আসিলে মুসলমানেরা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে! ঢাকায় পটুয়াখালী পল্লীতে এক হিন্দুর গৃহে বাদ্য-সহকারে বিবাহ-উৎসবেও নাকি মুসলমানেরা আপত্তি করিয়াছিল! বরিশালে নলচিটিতে মনসা পূজায়ও বাজনা বাজাইতে গোলমাল হইয়াছিল। এইরূপ আব্দার রক্ষা করিতে গেলে গান-বাজনার চর্চ্চা দেশ হইতে বিসর্জ্জন দিতে হয়। দেশে এই বাদ্য-বিভীষিকা শেষে মৌরসীপাট্টা করিয়া না বসে!

হোম-মেম্বরের নজীর

ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম-মেম্বার মুডিম্যান্ সাহেব সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পক্ষপাতী নহেন। তিনি মুসলিম লীগের সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সাহেবের মতের উল্টা নজীর দেখাইয়াছেন। টেল্-অল্-কবীরের যুদ্ধের বৎসর কে কোন্ মস্জিদের কাছে বাজনা না বাজাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের দরবারে আর্জ্জি পেশ করিয়াছিল, তিনি সেই দশ বৎসরের অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন; কিন্তু রাজস্ব-সচিব ব্র্যাকেট সাহেব লি কমিশনের মন্তব্য উপলক্ষ্যে কর্ণেল

ক্রফর্ড সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে তিন পারেন না বলিয়া জবাব বৎসর পূর্ব্বের কথাও বলিতে দিয়াছেন।

মোহাম্মদীর অশিষ্টাচার

মৌলানা মহম্মদ আলী এবং সৌকত্-আলী এতদিন ভারতের সর্ব্বজন মান্য নেতা ছিলেন! অহিংস অসহযোগের প্রবল প্লাবনে যখন আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত হইতেছিল, তখন কংগ্রেসের ছত্রতলে দণ্ডায়মান হইয়া এই দুই মহারথী মহাত্মা গান্ধীকে পুরোভাগে স্থাপন পূর্ব্বক ভারতের স্বরাজ-সাধনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেশবাসীও এই দুই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিককে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই। কারাগার হইতে প্রত্যাগমনের পর—তাহারা মৌলানা মহম্মদ আলিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মান—জাতীয় মহাসভার সভাপতি-পদে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দুর্ভাগ্য—কিছুদিন হইতে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। দিল্লীর খেলাফত-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা এবং মক্কা রওনা হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে, ৮ কোটি মুসলমান দ্বারা ২৪ কোটি হিন্দুকে নির্ম্মূল করিবার ভয় প্রদর্শন হইতে ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপান্তর প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে মক্কায় বিশ্ব-মোস্লেম-কংগ্রেসের অধিবেশনে পরাধীন ভারত-বাসী বলিয়া তাঁহারা বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া ভারতের জাতীয় দলের সংবাদপত্রসমূহ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বর্ত্তমান কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অতি নিরপেক্ষ এবং সংযতভাবে সমালোচনা করিতেছেন। ইহাতে কলিকাতার মোহাম্মদী পত্রিকা এমন অশিষ্ট এবং অসংযত ভাষায় উক্ত সংবাদপত্রসমূহকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতিকে আক্রমণ করিয়াছেন যে তাহা পড়িয়া আমরা হতভম্ব হইয়াছি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মানুষকে কতদূর বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, তাহা মোহাম্মদীর ঐ সব অযথা উক্তি হইতে বুঝা যায়! নমুনা-স্বরূপ আমরা দুই একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, "হায়রে! হিন্দু সাংবাদিকের পরাধীন মস্তিষ্ক! মনিব-জাতির কল্পিত মিথ্যাও কি

তোমাদের নিকট বেদ-বাক্য ?" তারপর "এই সকল অর্ব্বাচীনদের মূর্খতা দেখিলে হাসি সম্বরণ করা যায় না।" "এদেশে সেদিন ইংরেজের প্রথম আগমনে যখন আলেমগণ তাহাদের সহিত অসহযোগের ফৎওয়া দিয়াছিলেন, এবং তোমাদের ভাষা তোমাদিগকে শিখিবার উপদেশ দিয়াছিলেন তখন "শ্বেত-প্রভু-পাদ"-দর্শনে সেই অমূল্য ও রত্নতুল্য উপদেশে তোমরা কর্ণপাত কর নাই।"

"বলিতে কি এখন সেই শ্বেতপাদ প্রণত হইয়া স্বদেশের বুলি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছ।" তারপর মোহাম্মদীর হীন অশিষ্টাচরণ চরমে উঠিয়াছে—এই কয়েক পংক্তিতে, "মাতৃদ্রোহী কাপুরুষ তোমরা, তোমাদের মুখে স্বদেশ-প্রেমের বচন কপ্চানি একেবারে অশোভন। সাবধান! আর বেশী নাড়াচাড়া করিলে ভণ্ডামির হাঁড়ি সদর রাস্তায় ভাঙ্গিয়া দিব।" কোন সংবাদপত্রের শিক্ষিত সম্পাদক এরূপ ভাষায় অপরকে গালাগালি দিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণার অতীত!

মোহাম্মদীর হিন্দু-বিদ্বেষ

মোহাম্মদী এত দিনে সত্য সত্যই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ভয়, পাছে সমস্ত মুসলমানই হিন্দু হইয়া যায়! গত ১৭ই ভাদ্রের মোহাম্মদীতে কুমিল্লার "অভয়াশ্রমের" প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলা হইয়াছে, "মুখে বলা হইয়া থাকে, খদ্দর ও স্বরাজ মন্ত্র প্রচারই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য, কিন্তু আশ্রমের খদ্দরের নীচে যে বিষধর সর্পের ব্যবস্থা আছে, তাহা এতদিন কেহই বুঝিতে পারে নাই।" তাহার কারণ, আশরফ আলি নামে হাজিগঞ্জের এক মুসলমান বালককে নাকি আশ্রমের নেতা ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া তাহার মুসলমান ধর্ম্মের উপরে আস্থা শিথিল করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নূতন নাম হইয়াছে "আশ্রম কুমার।" এই ব্যাপারেই মোহাম্মদী ভীত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতিমাসেই বাঙ্গালার চারিদিক্ হইতে যে হিন্দুদিগের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার সংবাদ আসিতেছে, তাহা বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের অবিদিত নাই। এ সংবাদ তাঁহার কাগজে পূর্ব্বেও অনেকবার বাহির হইয়াছে এবং এ সংখ্যাতেও চট্টগ্রামের পটীয়া থানার

অন্তর্গত হাসিমপুর গ্রামের জনৈক হিন্দু বিধবার "স্বেচ্ছায়" ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ দেখিলাম।

যদি কেহ এক সম্প্রদায়ের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া "স্বেচ্ছায়" ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও অপরের প্রতি ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অলৌকিক আবিষ্কার

ভারত-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যশোরাশি আজ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত। সৃষ্টির যবনিকার অন্তরালে অলক্ষ্য থাকিয়া অনাদি কাল হইতে যে অনন্ত মহাশক্তির লীলা চলিতেছে,—ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্তব্ধ নেত্রে, পুলকিত কর্ণে তাহার মনোহর ক্রীড়া এবং সঙ্গীত দর্শন এবং শ্রবণ করিতেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের অনুভূতি পাইয়া আজ এই বৈজ্ঞানিক-প্রবর প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক নিত্য নূতন কত রহস্যের সন্ধানই না সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন! কিছুদিন হইল আচার্য্যদেব বিশ্ব-জাতি-সঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য জেনেভায় গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি তাঁহার অলৌকিক আবিষ্কারসমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতেছেন। সম্প্রতি মেজর ব্রাউন ডি, এফ., সি নামক জনৈক ইংরেজ একখানি ইংরেজী কাগজে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি আচার্য্যদেবের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, গত সপ্তাহে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একটি উদ্ভিদের হৃদ্‌-স্পন্দন সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বক্তৃতা করিয়া জেনেভায় সমবেত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ইন্‌ষ্টিন্‌ বলিয়াছেন যে, আচার্য্যের একটিমাত্র আবিষ্কারের জন্যও তদীয় সম্মানার্থ জাতি-সঙ্ঘের রাজধানীতে তাঁহার একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত। প্রায় ত্রিশ বৎসর গবেষণার পর আচার্য্যদেব সবিজয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত জীবনই এক। বাস্তব প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইস্পাত এবং উদ্ভিদও ঠিক মানুষের ন্যায় অনুভব করিতে পারে; প্রত্যেক জিনিষই মানুষের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তিনি এমন চমৎকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা উদ্ভিদের

স্নায়বিক অবস্থার পরিমাপ পর্য্যন্ত করা যায়। তৎপর মেজর ব্রাউন আচার্য্যদেবকে একজন ভগবদাত্ম (mystic) রূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি দেখিয়াছেন, আচার্য্য আহারে বসিয়াছেন, কিন্তু আহার্য্যের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া উদ্ভিদের নিদ্রা, অনুভূতি এবং সঙ্গম-জীবন সম্বন্ধে নূতন কোন পরীক্ষার কথা ভাবিতেছেন। তিনি জীবন-সমস্যা সমূহ মধ্যে এত গভীর ভাবে চলিয়া যান যে, তাঁহার শ্রোতাগণ হতভম্ব হইয়া যেন অন্ধকারে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে। আচার্য্য বসু বর্ত্তমান যুগের মানব বলিয়া মনে হয় না—তিনি ভবিষ্যতের। তিনি সেই অনাগত যুগের অধিবাসী, যে যুগে প্রাচীর অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্বলন্ত কল্পনা-শক্তির সহিত প্রতীচীর স্নিগ্ধ বাস্তবতার মিলন হইবে। আচার্য্যদেব উৎসাহের একজন প্রতীক। তিনি ঘটিকা-যন্ত্রের নির্ম্মাতার ন্যায় পরিশুদ্ধভাবে তাঁহার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি একজন সবল-মস্তিষ্ক—গণিতবিদ্; তিনি অলৌকিক কার্য্যসমূহ সাধিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য একজন অধ্যাপক হইতে তিনি একজন আন্তর্জ্জাতিক মানবে উন্নীত হইয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া সুস্থশরীরে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নিত্য নূতন রত্নরাজি আহরণ পূর্ব্বক জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রবীন্দ্র-বার্ত্তা

কবি ও ফাসিজ্‌ম্

শান্তিকামী, সাম্যবাদী রবীন্দ্রনাথ, ইটালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ব্যবহারে নাকি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এরূপ একটী সংবাদ সেদিন রয়টারের তারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটী শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই একটু অবিশ্বাসের হাসি দেখা দেয়।

সত্য বটে মুসোলিনি কবিবরের অতিসাধের বিশ্ব-ভারতীতে ইটালীয়-সাহিত্যের সমগ্র গ্রন্থাবলী দান করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা দ্বারা বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার নিজ হস্তে গড়া জীবন-সাধনার ফলস্বরূপ এত-বড় একটা আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কেহ ধারণা করিতে পারে না। ইহা লইয়া যখন সমগ্র দেশের উপর দিয়া একটা আলোচনা ও আন্দোলনের হিল্লোল খেলিতেছিল, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁহার বন্ধু রেভারেণ্ড সি, এফ, এণ্ড্রুজ সাহেবকে জানাইলেন যে মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিনি বুঝিয়াছেন, মুসোলিনি নিজেই ফ্যাসিষ্ট-নীতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় নহেন। তবে "বাবু যত বলে পারিষৎদল বলে তার শতগুণ।" মুসোলিনি অপেক্ষা তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের ফ্যাসিষ্ট-নীতি-প্রীতি অত্যন্ত প্রগাঢ়। বিপক্ষ-দল-দমনপ্রয়াসী হইয়া ফ্যাসিষ্টদল যে কত প্রকারে গর্হিত আচরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অত্যাচারের তুলাদণ্ড লইয়া হিসাব করিলে অত্যাচারী হিসাবে রুশিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্রই প্রবল, না ফ্যাসিষ্ট দল প্রবল তাহা বলা সুকঠিন।

কিন্তু মুসোলিনির যত দোষই থাকুক না কেন তাঁহার দ্বারা ইটালীতে ধর্ম্মঘট বন্ধ প্রভৃতি বহু প্রকারের সুফলপ্রদ কার্য্যও যে না ঘটিয়াছে তাহা নহে। এক-কথায় মুসোলিনীকে শক্তিশালী—শুধু শক্তিশালী কেন অতিমানব লেনিনের ন্যায় শক্তিশালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে লেনিন যদি চলিয়া থাকেন দক্ষিণে মুসোলিনি চলিয়াছেন সোজা উত্তরে – সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে।

এ সমস্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ রয়টারেও অনেক কথা বাহির করিয়াছিলেন এবং সেই রয়টার সংবাদেরই প্রতিধ্বনি জাগিয়াছিল ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ানএর জনৈক সংবাদ দাতার সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তার ভিতর দিয়া। তিনি উক্ত সংবাদ-দাতাকে জানাইয়াছিলেন যে স্বাধীন মত-বাদের স্থান ইটালীতে আজ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইটালী যাত্রার প্রাক্কালে তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে দেশে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ থাকিয়া ইটালীয়ানদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়া একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। কিন্তু প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরই মিথ্যা খবর প্রচারের এক একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। ইটালীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে নাই। তাই তিনি যখন ইটালীতে উপস্থিত হইলেন তখন ফ্যাসিষ্ট-নীতি-বাদিরা তাঁহাকে বুঝাইতে ক্রটী করিল না যে ফ্যাসিজ্‌মই পতনোন্মুখ ইটালীকে ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে এ কথা জানাইতেও ভুল করে নাই যে ওসম্বন্ধে যত ভয়াবহ খবর প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই অলীক ও ভিত্তিহীন। রবীন্দ্র-নাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কেবলমাত্র ইটালীয়ান নয় ইংরাজেরা এবং আমাদের বৈদেশিক রাজদূতেরাও মুসোলিনী ও তাঁহার কার্য্যাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা করে! তাহাদের বিশ্বাস একমাত্র মুসোলিনীই আর্থিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের হাত হইতে ইটালীকে রক্ষা করিয়া তাহার লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। ইটালীতে ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে পারে

এরূপ সাহসী ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত স্থানে উপস্থিত হইলে গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা কম, ইটালীর সরকারপক্ষ শুধু সেই সেই স্থানেই তাঁহাকে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ফ্যসিজ্‌মের দ্বারা প্রপীড়িত লোকমুখে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর নৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইটালীতে মুসোলিনির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—গণ-মতই ভাল, না একজন মাত্র শক্তিশালীর অঙ্গুলি-হেলনে দেশ পরিচালিত হওয়া ভাল ?

রয়টারের জাল-বার্ত্তা

রয়টারের তারে আর একটি তথা-কথিত রবীন্দ্রবার্ত্তা লাভেও আমরা পরম আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ভারতের অনেক সংবাদপত্র বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতে পারে এবং সেই কারণে উহাকে পত্রে স্থান দেন নাই। সেই বার্ত্তাটি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। রয়টার কতদূর দায়িত্বহীন কার্য্য করিতে পারে তাহার নমুনাস্বরূপ আমরা সেই জাল বার্ত্তাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার পর রয়টারের কোন্ সংবাদটী বিশ্বাস্য আর কোন্‌টী অবি-শ্বাস্য পাঠকদের নির্ণয় করা দুরূহ হইবে।

"শান্তিনিকেতন তথা ভারত ত্যাগ করিয়া বিশ্বখ্যাতির হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত রোমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু সেখানেও উদ্ধার পাই নাই। খ্যাতিবিমুখ মুসোলিনির সহবাসকালেও ভূরিপ্রশংসার চাপে আমাকে উৎপীড়িত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। খ্যাতি-রাক্ষসী বিন্দু বিন্দু করিয়া আমার রক্ত শোষণ করিতেছিল। তাই আমি সুখ্যাতির ধ্বংস কামনায় বঙ্গবাসী বন্ধু-বর্গের ও এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি জীবনের অবশিষ্ট দিন যে নির্ব্বাণ কামনা করিয়াছি সেই নির্ব্বাণ বিনিময়ে অমরত্বও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নই। বিশ্বখ্যাতির প্রতি দৃকপাত না করিয়াই আমি নাইট উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলাম, ইহাই আমার এ কথার সত্যতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য।"

প্রজাতন্ত্র ও ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রজাতন্ত্র ঈপ্সিত হইলেও তাহা পাইবার পূর্ব্বেই প্রজা-সাধারণের মন স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত উপাদানে গড়িয়া উঠা চাই, নতুবা জাতিকে কোনও এক প্রবলতর জাতির অধীন হইয়া পড়িতেই হইবে। তিনি বলেন বহুকাল যাবৎ নির্দ্দিষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্তরূপে যাঁহারা মনের গতি চালাইতে অভ্যস্ত না হয়েন তাঁহারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইংরাজের ধৈর্য্য, স্থিরতা ও আইনানুবর্ত্তিতা বহুবর্ষের স্বাধীনতারই ফলস্বরূপ। অধুনা ধর্ম্মঘটের একটা প্রবল স্রোত বহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মঘট করিতে যেটুকু রাজনীতি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক তাহা এক ইংরাজ বাদে অন্য কোন জাতিরই দেখা যায় না।

বার্ণার্ড শ

রবীন্দ্রনাথ মিঃ বার্ণার্ড শকে প্রগাঢ় ভক্তি করেন। তিনি যে তাঁহাকে শুধু প্রতিভার খাতিরেই সম্মান করেন এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। রবীন্দ্রনাথ বার্ণার্ড শএর ভিতরে এমন একটা মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা শুধু প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না, তাহা অনুভব করিবার বিষয়ও বটে। তাই তিনি শ্রদ্ধানত চিত্তে তাঁহাকে ভক্তি করেন। রবীন্দ্রনাথ বার্ণাড´শএর নিজের নিকট হইতে একটা গল্প শুনিয়াছিলেন। গল্পটা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই গল্প হইতেই ইহা স্পষ্ট হইয় ফুটিয়া উঠিবে যে মিঃ বার্ণাড´শ কি উপাদানে গঠিত। সাফ্রেজিস্টের গোলমালের সময় একটা লোক কোনও এক কারারুদ্ধ প্রসিদ্ধ সফ্রেজিস্টের নিকট হইতে আসিয়াছে জানাইয়া ৫০ পাউণ্ড ধার চাহিয়া একখানি জাল চিঠি বার্ণাড´শকে দেয় এবং বার্ণাড´শ তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ লোকটাকে প্রদান করেন। পরে ঘটনাক্রমে প্রকাশ পায় যে চিঠিখানি জাল। তখন অপর একটা লোক আসিয়া বার্ণাড শ কে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি দোষীকে শাস্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করিবেন কিনা। বার্ণাড শ তাহাকে বলেন, কিছুতেই না—কেননা যে একার্য্য করিয়াছে সে আমার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনই করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিল যে একমাত্র আমারই এইরূপ ঠকিবার উদারতা আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ।

বিলাতের কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের ছাত্রদের চিন্তাধারার একটা যোগ সাধনার জন্য তাঁর মনে বরাবরই একটা প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়া আছে। তাই আজ মুসোলিনি প্রদত্ত ইটালীয়ান্ গ্রন্থরাজি বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা প্রফেসর টুসীর নিকট সাগ্রহে পাঠ করিতেছে। বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা একজন ইটালীয় পণ্ডিতকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইলেও দেশ পশ্চিমের নামে খড়্গহস্ত। যাহা হউক তিনি আশা করেন ভারত একদিন তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার সুর মিলাইয়া তাঁহার বাণী সফল করিয়া তুলিবে।

হিন্দু বাল-বিধবা-বিবাহ

আজকাল অনেক স্থান হইতেই হিন্দু বালবিধবার পুণর্বিবাহর সংবাদ আসিতেছে। ইহা যে হিন্দুসমাজের পক্ষে অশেষ মঙ্গলদায়ক, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস শ্রীমতী সুভাষিনী নাম্নী হিন্দু বাল-বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রায় ৩০০০ হাজার হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি পাবনা জেলায় বেড়া থানার এলাকায় রঘুনাথপুর গ্রামে শ্রীমতী কমল বাসিনী নাম্নী আর একটী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বাল-বিধবার বিবাহ উক্ত জেলার শিবরামপুর নিবাসী শ্রীশিবনাথ দাসের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর পিতার নাম ডাক্তার শ্রীহরিদাস দাস। বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র ও আচার অনুসারে হইয়াছিল। রঘুনাথপুর, শ্রীনিবাস দিয়া, কৃষ্ণপুর, নাটিয়াবাড়ী, ভারেঙ্গা ও পোরজনা প্রভৃতি গ্রামস্থ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজপতিগণ সানন্দে—এই বিবাহ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সকল ব্যাপারে উদ্যোক্তা ও উৎসাহ-দাতা তাঁহারা যে দেশের ও সমাজের অশেষ মঙ্গলকামী তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহিলা-ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা

ভারতের একদিন ছিল যখন মাতৃ-জাতির নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে ভারতবাসীর শির নত হইয়া আসিত, মাতৃজাতিকে যখন দেশ সম্মান ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তখন ছিল না দেশের লোকের প্রতি নিমিষে একটা কুদৃষ্টির তীব্র লীলা। আজ আমাদের দেশের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রায়শঃই আমরা শুনিতে পাই নারী অপহরণ ও নারী নির্য্যাতনের করুণ মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ; দেখিতে পাই সামাজিক শৃঙ্খলতার একটা প্রাণ-শূন্য কঙ্কাল। সমাজের এই ভীষণ অধঃপতনের সময় যদি আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব রাজপুত রমণীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত-লক্ষ্মীরা শারীরিক শক্তির আরাধনা করেন তবে এই সঙ্কটের কতক পরিমানে লাঘব হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায়। তাই সেদিন যখন ইউনিভারসিটী ইন্‌স্‌টিটিউটে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সভানেতৃত্বে মহিলা--ব্যায়াম--সমিতির উদ্যোগে, নারী শিক্ষালয়, সঙ্গীত শিক্ষালয়, মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয়, রাজরাজে-শ্বরী বিদ্যালয় প্রভৃতির ছাত্রীবৃন্দকে বীর সাজে সজ্জিত দেখিলাম তখন মনেএকটা অভূতপূর্ব্বানন্দ ও তৃপ্তির আস্বাদ পাইলাম। দেখিলাম প্রথমে বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী বালিকারা লাঠি ও অসি ক্রীড়াপ্রদর্শন করিল। ইহার মধ্যে লাঠি ও তলোয়ারে একটী বাঙ্গালী ও একটি মাড়োয়ারী বালিকার ক্রীড়া বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহারা উভয় হস্তেই অসিচালনা করিয়াছিল। মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী অসিক্রীড়ায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বালিকা-দের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, স্কিপিং বা দড়ি খেলা এবং ছোরা চালনার ও ছোরার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও বিশেষ দক্ষতার সহিত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে দেখিলাম। মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ও কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী ছোরা খেলা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এদেশের মেয়েদের ভিতর এরূপ ব্যায়াম চর্চ্চা, অসিচালনা ও মুষ্টি-যুদ্ধের প্রচলন এই প্রথম। তাই যদ্যপি এই মেয়েদের অভিনয় বিশেষ দক্ষতার পরি-চায়ক নাও হইয়া থাকে তথাপি উহা উপেক্ষার জিনিষ নয়। অঙ্কুরকে সুশোভন বৃক্ষে পরিণত দেখিতে হইলে অঙ্কুর যাহাতে বৃদ্ধিলাভে সক্ষম হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, তাহাকে অবহেলায় দলিত মথিত করিয়া ফেলা কোন বুদ্ধিমানেরই কার্য্য নহে। তবে যাঁহারা মেয়েদের মধ্যে এই ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তক তাঁহাদিগকে এটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে করি যে তাঁহারা যেন আধার ও

আধেয়ের প্রতি বিশেষ সতর্ক-দৃষ্টি রাখেন। কোন্ মেয়ে কি শিক্ষার উপযুক্ত, কোন্ শিক্ষা কাহাকে দেওয়া উচিত, এরূপ পাত্রাপাত্রের জ্ঞান থাকা কর্ত্তৃপক্ষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা ব্যায়ামে সুফল না ফলিয়া উহার বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা বেশী। অসিক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে হইবে যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার উপযুক্ত শক্তি আছে কি না? আমি অসি শিক্ষায় রত হইলাম কিন্তু আমার হাতের কব্জীতে জোর কম—কি ফল আমি আশা করিতে পারি? ইহা আমার হস্ত-কব্জীকে শুধু শিথিল করিয়াই তুলিবে, শক্তিবর্দ্ধন তো দূরের কথা। সুতরাং শিক্ষকের পাত্রা-পাত্র-জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সেদিন আমরা মহিলা-ব্যায়াম-সমিতির উদ্যোগ দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্টই হইয়াছি; কিন্তু বিশেষ দুঃখের কথা এই যে এ অধিষ্ঠানে কোন বঙ্গ-মহিলা যোগদান করেন নাই। বঙ্গ-বালিকারা যোগদান করিয়াছিল সত্য কিন্তু বঙ্গ-মহিলার অভাব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

মাড়োয়ারী মহিলাদের এ বিষয়ে উৎসাহ আছে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি বঙ্গমহিলারা আগামী বৎসর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে ত্রুটী করিবেন না। স্বাস্থ্য চর্চ্চার অধিকার শুধু পুরুষদের একচেটিয়া থাকা উচিত নয়; মেয়েদের মধ্যেও ইহার বিস্তার লাভ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় মহাজাতি-সঙ্ঘের কার্য্যক্রম ও নিয়মাবলী

বর্ত্তমান সংখ্যার 'ভারতী'র প্রথমেই "ভারতীয় মহাজাতি-সঙ্ঘ" সম্বন্ধে সভা-নেত্রীর অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘ সম্বন্ধে আমরা মফঃস্বলের বহু ভদ্র-লোকের নিকট হইতে অনেক ঔৎসুক্যপূর্ণ চিঠি পত্র পাইতেছি। তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে সঙ্ঘের কার্য্যক্রম ও নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল :—

(১) সঙ্ঘের অধীনে বীরাষ্টমী সমিতি সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সকল সমিতির কার্য্য হইবে, শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্ব, সাহস এবং

বীরত্বের উদ্বোধন করা আমোদ-উৎসবের অনুষ্ঠান করা, এবং একই জাতীয় সাধনায় গণ ও গণ্যদিগকে মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা।

(২) সঙ্ঘ, দেশের সর্ব্বত্র ব্যায়াম চর্চ্চার আখড়া সমূহ স্থাপন করিবে, এবং পাশ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে স্বাস্থ্যকর অবস্থা আনয়ন ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি প্রচলনের চেষ্টা করিবে।

(৩) সঙ্ঘ, স্ত্রীলোক ও অসহায় পুরুষদের রক্ষার্থ শিক্ষিত আর্ত্তত্রাতাদল গঠন করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা প্রদান করিবে।

(৪) জাতীয়তার প্রকৃত ব্যাখ্যা, এবং অস্পৃশ্যতা অথবা সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূরীকরণার্থ সঙ্ঘ সময় সময় সাধারণ বক্তৃতা আলোচনা এবং কথকতার ব্যবস্থা করিবে।

(৫) সঙ্ঘ, সমবেত পূজার উদ্দেশ্যে সার্ব্বজনীন মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবে, এবং সর্ব্ব সাধারণের মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করিবে।

(৬) পারস্পরিক মত,সহিষ্ণুতা, উদারভাব এবং অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে জানাশুনার প্রসার জন্য সঙ্ঘ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোক-সম্পাতকারী সাহিত্যের প্রচার এবং উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৭) ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য সঙ্ঘ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার-মন উপদেশক শ্রেণী গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৮) সঙ্ঘ এমন সব কাজ করিবে যাহাতে জাতির অন্তরে নব জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও নিরক্ষর নরনারী একদিকে অবিশ্বাস অপরদিকে কুসংস্কারের পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জাতীয় সাধনা-লব্ধ মত ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগের অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয়।

গঠন প্রণালী

(১) সভ্য।

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতীয় যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ, এবং অন্যূন দ্বাদশবর্ষীয় বালক বালিকা ন্যূনকল্পে বাৎসরিক চারি আনা চাঁদা দিয়া, এবং সঙ্ঘের বিশ্বাসে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইতে পারিবে।

(২) বিশ্বাস।

প্রত্যেক সভ্যকে নিম্নলিখিত বিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে :—

"আমি বিশ্বাস করি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের একীকরণের দ্বারা ভারতে একটি মহাজাতি সংগঠন এবং তৎপক্ষে উচ্চতর আদর্শ বিশিষ্ট মানুষ বিকাশের প্রচেষ্টার মধ্যেই ভারতের জাতীয় মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।"

(৩) ভোট দিবার অধিকার।

১৮ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেক সভ্য—যিনি সঙ্ঘের বাৎসরিক সাধারণ

সভায় অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে, অথবা প্রথম সাধারণ সভার সময় অন্ততঃ সভার দিনও তাঁহার দেয় বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করিবেন—তিনিই ভোট দিবার অধিকারী।

(৪) প্রাদেশিক শাখাসমূহ।

(ক) ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশই মহাজাতি-সঙ্ঘের প্রাদেশিক শাখা গঠন করিতে পারিবে।

(খ) প্রাদেশিক সমিতিতে জেলা-সমিতি সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত অন্ততঃ ১৫০ জন সভ্য থাকিবে। প্রত্যেক জেলা হইতে কতজন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে তাহা একটী সাময়িক প্রাদেশিক সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে; প্রাদেশিক শাখার অনুষ্ঠানের জন্যই উক্ত সাময়িক সমিতি নির্ম্মিত হইবে। প্রাদেশিক সমিতি সময় সময় উক্ত জেলা সমিতির সভ্য-সংখ্যা অদলবদল করিতে পারিবে।

(গ) প্রত্যেক বৎসর সচরাচর আগষ্ট মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে প্রত্যেক প্রাদেশিক সমিতি তাহার কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত করিবে। কার্য্যকরী সমিতিতে উক্ত প্রাদেশিক সমিতির শতকরা ৪০ জন সভ্য এবং একজন সভাপতি, এক বা একাধিক সহকারী সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। এক বা একাধিক সহকারী সম্পাদকও থাকিতে পারেন;—ইঁহারা কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নাও হইতে পারেন। প্রাদেশিক শাখার প্রবর্ত্তন কালে গঠিত সাময়িক কার্য্যকরী সমিতি পরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতির সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবে।

(৫) জেলা সমিতি সমূহ।

সঙ্ঘের যে সমস্ত সভ্যের ভোট দিবার অধিকার আছে, তন্মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জন সভ্য লইয়া একটি জেলা সমিতি গঠিত হইবে। জেলা সাধারণ সমিতি সমূহের শতকরা ৪০ জন সভ্য লইয়া জেলা কার্য্যকরী সমিতি সমূহ গঠিত হইবে। এই জেলা কার্য্যকরী সমিতিতে পাঁচ জন কর্ম্মচারী থাকিবেন—ইঁহারা প্রতিবৎসর জেলা সাধারণ-সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কর্ম্মচারীদের তালিকা এইরূপ,—একজন সভাপতি, দুইজন সহ-কারী সভাপতি, একজন সম্পাদক, (দুইজন সহকারী সম্পাদকের সহিত) এবং একজন কোষাধ্যক্ষ প্রাদেশিক সমিতির মঞ্জুরী সাপক্ষে জেলা সমিতি গুলি উপ বিধান সমূহ রচনা করিবে।

(৬) চাঁদা ইত্যাদি :—

(ক) প্রাদেশিক সমিতিতে দেয় বাৎসরিক ৬৲ টাকা চাঁদা না দিলে কোন সভ্যেরই প্রাদেশিক (সাধারণ) সমিতিতে ভোট দিবার কোন অধিকার থাকিবে না।

(খ) সাধারণ সভ্যপদের চাঁদার উপর বাৎসরিক ৪৲ টাকা চাঁদা না দিলে কোন সভ্যের প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতিতে

ভোট দিবার কোন অধিকার থাকিবে না।

(গ) প্রাদেশিক সমিতিতে বাৎসরিক ১০৲ টাকা চাঁদা দিয়া জেলা সমিতি সমূহের একখানি করিয়া মঞ্জুরী পত্র (affiliation certificate) লইতে হইবে।

(৭) সাধারণ পরিচালক মণ্ডল।

প্রাদেশিক সমিতি সমূহের নির্ব্বাচিত অন্ততঃ ২০ জন সভ্য লইয়া একটী কেন্দ্রীয় পরিচালক মণ্ডল থাকিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সমিতি কেন্দ্রীয় পরিচালক মণ্ডলের দুইজন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। উক্ত ২০ জন সভ্য একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন।

(৮) কোরাম (ন্যূন সংখ্যা)।

প্রাদেশিক (সাধারণ) সমিতির সভায় ১৫ জন সভ্যে একটী সভা গঠিত হইবে, এবং প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতির সভায় ৬ জন সভ্যে একটী সভা গঠিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য

—*—

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩৩। "দেশবন্ধুর ব্রত" শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি. এ. লিখিত 'স্মৃতি-তর্পণ'। প্রবন্ধের মুখবন্ধে লেখক অনেক বড় বড় কথা বলিয়া চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের রচনায় কোনো বিশেষত্ব দেখিলাম না। উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য্যে আসল কথার অসদ্ভাব ঘটিয়াছে খুবই। তবে মহাজনের চরিত-কথা সব সময়েই তার নিজের বৈশিষ্ট্যে উপভোগ্য—মনের উৎকর্ষ সাধন করে। 'রসতত্ত্ব' আলোচনা। হেগেল, আরিষ্টটল, স্পিনোজা প্রভৃতি বড়' বড় নাম আছে, দর্শনের বড় বড় কথা আছে—কাজেই 'গবেষণা-মূলক'। এ সব প্রবন্ধ 'লম্বশাটপটাবৃত' হইয়া মাসিক পত্রের একদিকে যেমন শোভা বিস্তার করে—তেমনি নিরীহ পাঠকের চমক লাগাইয়া দেয়, শুধু দর্শন-ডালি! ঐ চোখ মেলিয়া দ্যাখো—উপভোগের বস্তু নয়! "প্রথম বাঙ্গালী" শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ীর সরস সংগ্রহ। "ময়মনসিংহের মহিলা কৃত্তিবাস" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দের উপাদেয় রচনা। 'চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের সর্ব্বসাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন।' এই প্রবন্ধে লেখক চন্দ্রাবতীর পরিচয় দিয়াছেন; এবং তাঁহার রচিত 'রামায়ণের'ও পরিচয় দিয়াছেন। সীতার জন্মরহস্য চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়াছেন—রাবণ মনিরক্তপূর্ণ রত্ন-কৌটা মন্দোদরীকে দিয়া বলেন, ইহাতে তীব্র বিষ আছে; এ বিষে দেবতারও প্রাণনাশ হয়। যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখো। রাণী মন্দোদরী একদিন অভিমান করিয়া এই বিষ পান করেন। বিষ খাইয়া এক আশ্চর্য্য ডিম্ব প্রসব করিলেন। সেদিন কনক লঙ্কার প্রাসাদ সকলের স্বর্ণচূড়া সুবর্ণ-কলস ও পতাকাসহ ভূলুণ্ঠিত

হইল। সেই ডিম্ব রত্নকৌটা-সমেত সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। সেই ডিম পাইল মিথিলার মাধব জেলে। কৌটাটী দেবতার দান ভাবিয়া ধূপধূনা জ্বালাইয়া ধানদূর্ব্বা দিয়া সে তার পূজা করিতে লাগিল। জেলের দুঃখ-দৈন্যও সেই সঙ্গে ঘুচিল। মাধবের স্ত্রী সতী স্বপ্ন দেখিল, চাঁদের আলোয় ঘর তার ঝলমল করিতেছে, এবং সেই কৌটা হইতে এক অপরূপ রূপসী বালিকা বাহির হইয়া আসিয়া বলিতেছে—"বাপ মোর জনকরাজা গো রাণী মোর মাও। কালকা বিয়ানে লইয়া রাণীর কাছে যাও॥" কৌটা আসিল জনক-রাজার কাছে। সতী বলিল,—

"স্বপ্ন যদি সত্য হয়, কন্যা জন্মে ইতে।
আমার নামেতে কন্যার নাম রাইখ সীতে॥"

জনকের গৃহে কন্যা জন্মিল। 'সতীর নামেতে কন্যার নাম রাখে সীতা—চন্দ্রাবতী কহে কন্যা ভুবন-বন্দিতা॥" চন্দ্রাবতী সেকালের মহিলা-কবি, তাঁর রচনা হইতে উদ্ধৃত ছোট ছোট টুকরা হইতে তাঁর কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য হইলেও উপভোগ্য। "আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়"—প্রবন্ধে হুণ্ডীর কথা বুঝানো হইয়াছে। "মুর্শিদাবাদ"—সচিত্র প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "পুরাতনী"—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ রচিত। খুব উপাদেয় প্রবন্ধ। পুরাতন কথার মনোজ্ঞ বর্ণনা। এ সংখ্যায় রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাম প্রভৃতির কথা আছে। 'এদেশে রেলগাড়ি চলিবার পূর্ব্বে পাল্কী, গাড়ী ও নৌকা ছিল। 'ঠিকা উড়িয়া বেয়ারার পারিশ্রমিকের দৈনিক হার ৫ জন ঠিকা বেয়ারা সিকা ১ টাকা, অর্দ্ধদিন ৷৷০ ; ৫ মাইলের অনধিক দূর যাইবার মজুরি প্রতি বেয়ারা চারি আনা, ৮ মাইলে একদিন ধরা হইত। সেকালে পাল্কির মত দেখিতে অথচ চাকা-বিশিষ্ট এক প্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ী ছিল, উহাকে ডাক বলিত। 'জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল ৮ জন দাঁড়ির পুরা দৈনিক ২৲ টাকা; ১০ জনের ২৷৷০ টাকা, ১২ জনের ৩৷৷০ টাকা, ১৪ জনের ৫৲ টাকা, ১৬ জনের ৬৲ টাকা, ২৪ জনের ৮৲ টাকা। চারি ঘোড়ার গাড়ী প্রতিদিন ২৪৲, মাসে ৩০০৲, দুইঘোড়ার গাড়ী প্রতিদিন ১৬৲, মাসে ২০০৲। ছয়মাসের জন্য মাসিক ১৫০৲। একবৎসরের জন্য মাসিক ১৩৩/৪ পাই, কেবলমাত্র দুটী ঘোড়া প্রতিদিন ১০৲, মাসে ১৬০৲ ছ-মাসে মাসিক ১১০৲ টকো বগি ও ঘোড়া প্রতিদিন ৫৲ মাসে ১০০৲ ছয়মাসে মাসিক ৮০৲, বৎসরে মাসিক ৬৪৲ টাকা। '১৮৫৪' খৃষ্টাব্দে জুন মাসে প্রথম রেলোয়ে-এঞ্জিন আসিয়া পৌছে এবং ২৮এ তারিখে মিঃ হজসন উহা পাণ্ডুয়া অবধি চালাইয়া পরীক্ষা করেন। তৎপরে এই বৎসরে ১৫ই আগষ্ট হুগলি পর্য্যন্ত, ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এবং পরবৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পাকা রকম রেল খোলা হয়। এই বৎসর মাঘমাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ৪, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮, তৃতীয় শ্রেণীর ১৭, এবং ওয়াগন্ ভ্যান্ প্রভৃতি মোট ৬৪ খানি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩ খানি গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার সমস্তগুলিই কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি এবং সেটন্ কোম্পানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম যে এঞ্জিনখানি বিলাত হইতে আসিয়াছিল, তাহার নাম ফেয়ারী কুইন।"..."রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম ভাড়া ধার্য্য ছিল ১৶০ এবং পৌছিতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা।' "বিচারের অধিকার" শ্রীযুক্ত রাম দাস হালদার রচিত ছোট গল্প। ইহাতে তরুণ আছে, তরুণী আছে, বোর্ডিং আছে, তরুণের ব্যথা আছে, মোটরকার আছে, প্রেমের প্রলোভন আছে এবং প্রলোভনের সঙ্গে লড়াইও আছে—অর্থাৎ বিলাতী গন্ধে রচনাটি আগাগোড়া ভরপুর। এতভেও যদি আধুনিক ছোট গল্প না হয় তো আর কিসে হইবে! 'ব্রাহ্মণ' ছোট গল্প—শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ রচিত; মন্দ নয়। 'পারসীকগণের গায়ত্রী' শ্রীযুক্ত অশোক নাথ ভট্টাচার্য্য রচিত মনোজ্ঞ নিবন্ধ। পারসীক

শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বুঝাইয়াছেন যে পারসীকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর বর্ণ নাই। সুতরাং তাঁহাদের গায়ত্রী-পাঠে সকল পারসীকেরই সমান অধিকার। 'আমিনা বিবির আত্মকথা' রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর-রচিত গল্প। গল্পটি পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। গল্পটি এমন যে ইহার কাছে অপর লেখকের 'অতি-অশ্লীল' গল্পও লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে! গল্পের সূচনাতেই দেখি, একজন রসিক-লাল 'কার্য্যোপলক্ষে' এক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, একটি 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রমণী' 'কলসী কাঁখে করিয়া জল লইয়া' ফিরিতেছে। রসিকলালের 'ঔৎসুক্য-পূর্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ' দেখিয়া কাছে আসিয়া সে বলিল—আপনি কোথায় যাবেন? আপনার নাম কি? এবং পরিচয় লইয়া রমণী রসিকলালকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বাহিরের ঘরে তাকে বসাইল। চমৎকার! কোনো রমণীর প্রতি এমনি ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা কোন্ ভদ্র নীতির অন্তর্গত, যদি কেহ জানিতে চায় তো সিংহ মহাশয় তার কি জবাব দিবেন? তারপর তাকে আনিয়া বাহিরের ঘরে বসানো, এই বা কোন্ দেশের আচার! বিশেষ রসিক যখন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া নিরুপায় নিরাশ্রয় হয় নাই! তারপর আরো উদ্ভটতা আছে। হুঁকায় দু-এক টান দিয়া রসিক-লালের কৌতূহল জাগিল, রমণীর পরিচয় লইবার। রমণীও অমনি বিনা-দ্বিধায় এমন এক কাহিনী বলিয়া চলিল, যে-কাহিনীকে গল্প বা শ্লীলতার দিক দিয়া কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না! ভাষায় ও বর্ণনায় এতখানি অসংযম নগ্ন মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কোনো ভদ্র গৃহে এ সংখ্যা ভারত-বর্ষ রাখিতে হইলে এ কয়টি পৃষ্ঠা কাটিয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই! সিংহ মহাশয় কি দুর্নীতিমূলক গল্পকে ভ্যাংচাইয়াছেন? গল্পের tone-এ তো তা মনে হয় না! তবে? সব চেয়ে মজা এই যে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া গল্পটি রমণী এমন নির্লজ্জার মত বলিয়া গেল যে পড়িয়া অবাক হইতে হয়! আরো মজা,—গল্পটি শোনা মাত্র রসিকলাল তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন! 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের অধো-গতি' শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দারের আলোচনা। আলোচনাটি যুক্তিতে পরিপূর্ণ। 'খেয়াল-খাতা' কৌতুক-রসাভাবের ক্ষীণ চেষ্টা। 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' উপাদেয়—রক্তকবরীর সমালোচনা, জিনগণ, সীতা-রামের শিলা-লিপি, অক্ষয়ানন্দের পারাভস্ম—এই চারিটি নিবন্ধ এই প্রসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সৌরভ, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

'পল্লীর গান' উপাদেয় সংগ্রহ, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। পল্লীর বিস্মৃত ও লুপ্তপ্রায় গান যাঁর সাহায্যে যত সংগৃহীত হয়, ততই মঙ্গল। 'নাগরাজ্যে কয়েক বৎসর' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার আসাম প্রদেশান্তর্গত মককচঙ্গ গ্রামের পরিচয় দিয়াছেন। লেখক বলেন, মহাভারতে বর্ণিত নাগদেশ বা নাগলোক বর্ত্তমান নাগাপাহাড়ে অবস্থিত। খনমাতে নাগকন্যা উলুপীর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। মণিপুর হইতে খনমা পর্য্যন্ত সুরঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ।

বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সম্প্রতি দেশে এক শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব হইতেছে,—সাহিত্যে এতটুকু কিছু সৃষ্টি করিবার শক্তি যাঁহাদের নাই,—শুধু আনাতোল ফ্রাঁস, টুর্গেনিভ, শেকভ প্রভৃতি বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকটিমাত্র রচনা ইংরাজীর তর্জ্জমায় পড়িয়া পাণ্ডিত্যে দিগ্‌গজ বনিয়াছেন ভাবিয়া বাংলা সাহিত্যের যা-খুশী আলোচনা লিখিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান্—দম্ভে নিজেদের মাষ্টার-মশায়ের মস্ত উঁচু আসনে বসাইয়া বাংলার লেখকদের যেমন-খুশী সার্টিফিকেট বিতরণ করেন পরম অসঙ্কোচে

অকুতোভয়ে! ইহার প্রমাণ পাইলাম বঙ্গবাণীর এ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যে মৌলিকতা', লেখকের নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। ক্লাবে বা 'আড্ডা'-ঘরে এ-সব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে তাহা দুঃসহ ঠেকে না! কেন না সেখানকার দল খুব ছোট, এবং এ-শ্রেণীর লেখক সে ছোট দলে বড় বড় নামে বন্ধুদের তাক্ লাগাইয়া দিলেও দিতে পারেন! কিন্তু সাহিত্যের দরবারে এ লেখা ছাপানোয় শুধু নিজের অহমিকাই প্রকাশ পায় না—হাস্যকর উদ্ভটতারো সৃষ্টি হয়। কারণ, দেশে এমন নিরীহ পাঠক এখন খুব অল্পই আছেন যাঁরা ছাপার অক্ষরে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই শিরোধার্য্য করেন! 'ধোঁয়া' ছোট গল্প শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। গল্পটি সুখপাঠ্য। 'ধর্ম্মে গোঁড়ামি ও ঋষি টলষ্টয়' শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত ক্ষুদ্র আলোচনা, নেহাৎ উপেক্ষার যোগ্য নয়। 'বঙ্কিম-সাহিত্যে সন্ন্যাস' বিশেষত্বহীন। দশ বৎসর পূর্ব্বে হয়তো চলিতে পারিত, কিন্তু এখন এ-সব পুরানো কথার পুনরুক্তি কাহারো চিত্তস্পর্শ করে না। 'লালন ফকীর' মনোজ্ঞ সংগ্রহ। লালন বেশী দিনের লোক নহেন, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সমসাময়িক। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে লালনকে ডাকিয়া তাঁর মুখে গান শুনিয়াছেন। লালনের জন্মবৃত্তান্ত হিন্দু-সমাজের অনুশীলনযোগ্য। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁকে লইয়া নবদ্বীপে যান্ তীর্থ করিতে। সেখানে লালনের বসন্ত রোগ হয় এবং মা তাঁকে নদীর ধারে ফেলিয়া আসেন। এক মুসলমানের মেয়ে নদীতে জল আনিতে গিয়া লালনকে কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করেন। পরে শিশু বড় হইলে যশোরের সীরাজ সাঁই তাঁকে আনিয়া মানুষ করেন ও লালন কালক্রমে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বড় হইয়া মার সঙ্গে তিনি দেখা করেন। মা কাঁদিয়া বলেন —বাবা মুসলমান হইয়াছিস্ তুই—তা সেইখানেই থাক্। তবে মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিস্ লালন মার এ কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। লালন অচিরে গানে ও জীবনের মহিমায় খ্যাতিলাভ করেন। লালন বিবাহ করেন যশোরের অন্তর্গত হরিশপুরের খোনকারের কন্যা বিশোকাকে। লালনের বাউলের দল ও বহু শিষ্য ছিল। লালনের দলে এতটুকু দুর্নীতি বা অশ্লীলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে লালন বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন—সেগুলি ভাবে ও কবিত্বে পূর্ণ। প্রবন্ধে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—

আমি পথের পদ চিহ্ন পাই।
কোন্ বনে গেলিরে কানাই
ও তুই দাঁড়ারে।

প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত জসিমউদ্দিনের সহিত আমরাও বলি, 'সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন —এদিকেও কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না?' লেখক বলিতেছেন—সেগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইবে। 'কর্ম্মে দীক্ষা' শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী-লিখিত এবং টাঙ্গাইল 'ছাত্র-সম্মিলনীর' তৃতীয় সভাপতির বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ-স্বরূপ পঠিত। আড়ম্বরহীনতা, নীতিপরায়ণতা, পল্লীসম্বন্ধে কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখক বহু উপাদেয় কথা বলিয়াছেন; কথাগুলি তরুণ দলের পড়িয়া দেখা উচিত। 'পারের কড়ি' ৺গোকুলচন্দ্র নাগের রচিত ছোট গল্প; চমৎকার। 'রোমে স্ত্রী-স্বাধীনতার সুফল ও কুফল'—শ্রীযুক্ত বিমান-বিহারী মজুমদার-রচিত প্রবন্ধ। 'আত্মঘাতী মোহ'—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সময়োপযোগী রচনা, চিন্তাশীলতায় মণ্ডিত। লেখক বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিলে আমরা হয় মুসল-মানদের গালি পাড়ি, না হয় মিলনের প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে গোটাকতক সদুপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু কেন যে মিলন হয় না, এ কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না। হিন্দু-মুসলমানের মিলন কেন হয় না, এ কথা বুঝিতে গেলে শুধু ইংরেজের ভেদনীতির উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। গোড়ার কথাটা…মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে, বিশেষতঃ মূর্ত্তিপূজক হিন্দুকে একেবারে কাফের বলিয়াই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগৎই যে এককালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে আর বিধর্ম্মীকে এই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে যে পরম পুণ্য সঞ্চয় হয়, এ বিশ্বাস অধিকাংশ মুসলমানের মনেই বর্ত্তমান। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে মুসলমানেরা যে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করিত, ইংরেজ রাজত্বকালেও সে প্রাধান্য ভোগ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদের মন হইতে যায় নাই। কাজেই তাহারা অপর সকলের অপেক্ষা কিছু বেশী বেশী অধিকার পাইবার আব্দার প্রায়ই করিয়া থাকে। অপরের যাই হোক, মুসলমানের প্রাধান্য বজায় থাকা চাই-ই চাই। এরূপ মনোভাবের আরও একটা প্রচ্ছন্ন কারণ, দেশে হিন্দু-সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহার বেশী পরিমাণে। সেইজন্য মুসলমানদের মনে আশা একদিন এদেশ মুসলমান-প্রধান হইয়া উঠিবে। কেমন করিয়া হিন্দু-সংখ্যা কমিয়া গেল বা লোপ পাইল, তাহা পাবনার দিকে চাহিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মেয়ে চুরি, হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গুণ্ডার দাঙ্গা সবই হিন্দুস্থানকে মুসলমানের দেশে পরিণত করিবার এক একটী উপায়। একবার যাহাদের যেন-তেন প্রকারেই মুসলমান করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের যদি আবার হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের বড় আশায় ছাই পড়ে। সেই জন্য শুদ্ধি ব্যাপারটার উপর মুসলমান একেবারে হাড়ে হাড়ে চটা। তাহা হইলে হিন্দুদের কর্ত্তব্য কি? শুদ্ধি ও সংগঠন দ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, নয়া একতার নামে আত্মঘাতী গোঁজামিল? 'ভারতের লোক-সংখ্যা বনাম দারিদ্র্য' শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত রচিত প্রবন্ধ। লেখক এ প্রবন্ধে facts ও figures বেশীর ভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন Wadia এবং Joshia Wealth of India প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে; এবং নানা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়াছেন, প্রজাবৃদ্ধিই দারিদ্রের কারণ নয়। দারিদ্র্যের কারণ এই যে,—এই দেশের অনেক জমি এখনো বিনাচাষে পড়িয়া আছে; তাহাতে চাষের কোনই বাধা বিঘ্ন নাই। সেই জমি চাষে আনিলে ভারতবর্ষ তাহারত বর্ত্তমান লোকসংখ্যার ত্রিগুণ লোককে খাওয়াইয়া এবং বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। লেখক বলিতেছেন,—দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রায় সমস্তই বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত। কাজেই লাভের টাকা সবই বিদেশে চলিয়া যায়। ইহারো যেমন প্রতিকার আবশ্যক, গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-নীতিরও তেমন পরিবর্ত্তন আবশ্যক।' কিন্তু ধরুন, গভর্ণমেণ্ট বাণিজ্য-নীতির কোনো পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন? যে প্রতিকার আমাদের দ্বারা সম্ভব, লেখকের কাছে তাহার হদিশ, আমরা চাহিতেছি।

বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৩৩।

'দপ্তরে'—'সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব' নিবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ সরকার সতীত্ব মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় কি না?—এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, মাসিক-পত্রাদিতে এই মত নাকি এখন প্রচারিত হইতেছে! কিন্তু ঠিক এই কথাটাই কি উঠিয়াছে? না, কথা উঠিয়াছে এই যে, তালা-চাবি বন্ধ করিয়া নারীকে রক্ষা করিতে গেলে মনুষ্যত্বের ও নারীর নারীত্বের অমর্য্যাদা করা হয়! 'লোলুপ নয়নকে শাসনাধীনে রাখিতে না পারিলে কিরূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে, কুন্দ, শৈবলিনী, দেবযানী, নগেন্দ্র,

বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি তাহার উদাহরণ-স্বরূপ!' এ কথা সকলেই মানে। 'সংযম-বিষয়ক শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতিদ্বারা তাহাদের চরিত্র সম্যকরূপে গঠিত ও সুদৃঢ়' করা উচিত, এ কথাও মানি; কিন্তু যতদিন তা না হয়, 'তাহাদিগকে অন্তঃপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়—লেখকের এই শেষের কথাটা লইয়াই না অনেকের বিরোধ। 'Frailty! thy name is woman'—এ কথাটা আমরা মানিতে রাজী নই। স্ত্রীলোক শারীরিক বলে দুর্ব্বল হইলেও তাঁর মনের বল পুরুষের চেয়ে কম নয়, বা কম হইতে পারে না! শিক্ষায় সুসংস্কৃত চিত্ত আত্মসংযমে যতখানি সক্ষম, অশিক্ষিত চিত্ত তেমন নয়। নরকের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও অসংযম বা পাপের পথ হইতে নিবৃত্ত রাখার কল্পনা এযুগে নেহাৎ হাস্যকর মনে হয়। মুক্ত আলো-হাওয়ায় নর-নারী সকলেরই তুল্য অধিকার আছে। পুরুষ ও নারী—দুজনকে লইয়া জগৎ। পুরুষের হাতে শক্তি আছে বলিয়া পীড়ন বা বন্দিত্বে আবদ্ধ করিয়া নারীর যে 'সতীত্ব' রক্ষা করা হয়, সে সতীত্বের মূল্য খুব কম। আগুনে হাত পোড়ে, সকলে জানে। তাই বলিয়া যদি কেহ দীপ না জালিয়া রান্নাবান্নার জন্য আগুন না জ্বালিয়া চুপ করিয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সে তো জড়! আর যে দীপ জ্বালিয়া রান্নাবান্না করিয়াও আগুনে হাত পোড়ায় না, সেই না মানুষ! 'লজ্জা' জিনিষটি খুব ভালো কিন্তু তার একটা সীমা আছে। আর 'অবরোধের প্রাচীর ভাঙ্গিলে' বা বাহিরের আলো-হাওয়ায় বাহির হইলেই যে নারীকে লজ্জা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে-লজ্জা নারীকে জড়ো-সড়ো পুঁটলি করিয়া রাখে, সে লজ্জা সমর্থন-যোগ্য নয়। বাহিরের পুরুষকে দেখিলেই নারী তার পশ্চাতে ছুটিবে, এই মনোভাব নারীর পক্ষে অত্যন্ত কুৎসিত ও অপমান-জনক। যে নারী পুরুষেরও জননী, জায়া, কন্যা, তার প্রতি এ-ভাব অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত। বীরপূজা বা গুণপূজায় সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা কেহ করে না; যে করে, সে পশু। সকল চিত্তেই normal ও abnormal দুটা দিক আছে। Abnormality-কে বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Cleptomanias, Somnambulism যেমন নরনারীর স্বাভাবিক অবস্থা নয়, তেমনি বাহিরে আসিয়া যদি কোনো নারী নিজের চরিত্র নষ্ট করেন, তবে সেটাকে নারীগণের স্বাভাবিক অবস্থা ভাবিয়া হা-হতোঽস্মি করিলে তো চলিবে না! বহু পুরুষ বহুবিধ সংসর্গে মিশিয়াও যে নিজের চরিত্র ঠিক রাখেন। তবে? দুনিয়ায় নিছক সাধুসঙ্গ তো মিলিতে পারে না। আমরা দু' একজন এমন পুরুষ মানুষ দেখিয়াছি, যাঁরা নিজের স্ত্রীকে অসৎপথের পথিক করিয়াছেন। তাছাড়া অবরোধের মধ্যেও কি কোন পাপ ঘটে না? আমাদের কথা এই যে পাপ বা অপাপ একমাত্র অবরোধের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়। নরনারীর চিত্তই তার পাপ-পুণ্যের সহায় বা অন্তরায়। যে চিত্ত শিক্ষার ধার না ধরিয়া কতকগুলা সংস্কার মাত্রকে অবলম্বন করিয়া একধারে পড়িয়া আছে, সে চিত্ত প্রবলতর বা ধূর্ত্ততর চিত্তবৃত্তির আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। শিক্ষায় উন্নত চিত্ত নিজের বলে নিজেকে শাসনে রাখে। শিক্ষাই আসল জিনিষ। এ শিক্ষা পুঁথির বিদ্যা নয়, শিক্ষার সঙ্গে আবার environments এর প্রভাব ও খুবই। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ঢাকার ছাত্র সম্মিলন নিবন্ধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতার মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমতী নাইডু বলিয়াছেন, বালকদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের জননীগণ এ-বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না।...শক্তি-সঞ্চয় অর্থে গুণ্ডামি করা নয়,

আত্মরক্ষার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। যে প্রকৃত শক্তিশালী, সে কখনো শক্তির অপব্যবহার করে না।' 'উৎকলিঙ্গ' শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের কবিতা! বর্জ্জয়েস অক্ষরে প্রায় তিনপৃষ্ঠা-ব্যাপী—অসাধারণ বটে, কবিত্বে নাহোক বাহাদুরীতে! 'ইটাজাতির ইতিবৃত্ত'-ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জবাসী ইটা নামক একটি ধ্বংসোন্মুখ জাতির ইতিবৃত্ত, মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। 'কপালকুণ্ডলা' বিদ্যালয়ের home-exercise এর মত লেখা। সমালোচনার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা অন্ধ বিশ্বাসের অথবা বিচার-বুদ্ধি-বিহীন, সংশয়-শূন্য অহেতুকী ভক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। শিল্প মঞ্জরীতে সেমিজ তৈরী করার হদিশ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের খুবই উপযোগিতা আছে, 'বৌদ্ধযুগে সমাজ চিত্রের একাংশ, শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র লিখিত—এ-সংখ্যার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা করিয়া লেখক সে সমাজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। উৎসবের নানা অঙ্গের তালিকাটি খুবই উপভোগ্য। নৃত্য, গীত, বাদিত্র (কনসার্ট) প্রেক্ষ (থিয়েটার) আখ্যান (আবৃত্তি), বেতাল (যন্ত্রবাদ্য) বিবিধ ক্রীড়া—হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষযুদ্ধ, অজাযুদ্ধ, মেণ্ডকযুদ্ধ (মেড়ার লড়াই), কুক্কুট-যুদ্ধ, বর্টুকযুদ্ধ (পাখীর লড়াই), দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তী ও উযোধিক (তলোয়ার খেলা)। তারপর অন্য কথা,—চোরের ভয় খুবই ছিল। চোরের ভয়ে গৃহস্থ দিনের বেলাতেও কপাট দিয়া রাখিত। গণিকার খুব সম্মান ছিল। রাজগৃহে সিরিমা নামক প্রধান গণিকার দর্শনী ছিল দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ। সিরিমা রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সভা-চিকিৎসক জীবকের ভগিনী। জীবক নিজে গণিকা-পুত্র।' গণিকারা ভিক্ষুদের ভোজন করাইতেন। 'স্নানাগারে, শায্যাগৃহে, মালাগন্ধ যোগাইতে গণিকাদের ডাক পড়িত। তাহারা রাজছত্র ধরিত চামর ব্যজন করিত।' 'বেশ্যাদের…নৃত্য, গীত, অভিনয়, বাদ্য, চিত্রশিল্প, গন্ধদ্রব্য তৈয়ার করা, কৃত্রিম পুষ্প রচনা, কথাবার্ত্তা কহিবার কায়দা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইত।' 'রূপযৌবনসম্পন্না, সুবেশা, নানাশিল্পাভিজ্ঞা মনোহারিণী বাকপটু, মিষ্টরসনা, সুরসিকা গণিকার সঙ্গলাভ অনেকের পক্ষে প্রিয় ছিল।' বধূর প্রতি শাশুড়ীর অত্যাচার এবং শাশুড়ীর প্রতি বধূর অত্যাচার ঠিক একালের মতই ছিল। মাতুলকন্যার সহিত বিবাহ সেকালে প্রশস্ত ছিল।

আর্থিক উন্নতি। প্রথম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩১।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এই নূতন পত্রিকার সম্পাদক। ইহাতে গল্প, কবিতা বা বিচিত্র রাজনৈতিক মতামতের ফোয়ারা নাই। ভারতের অর্থ-সমস্যাই আজ সব-চেয়ে বড় সমস্যা। আর সেই সমস্যার সমাধান কি করিয়া হয়, সম্পাদক মহাশয় বিবিধ বিশেষজ্ঞের বিবিধ আলোচনায় তাহারি চেষ্টা করিয়াছেন। কাজের কথায় এ পত্রিকাখানির প্রতি পৃষ্ঠা পূর্ণ। তরুণের দলকে বক্তৃতাবাগীশ করিবার সত্যই কোনো প্রয়োজন নাই। বক্তৃতা প্রচুর হইয়াছে। কথায় চিঁড়ে কখনো ভেজে নাই, ভিজিবেও না। কাজের দিকে সচেতন হওয়া দরকার। এই পত্রিকাখানি বেকারের দলকে কাজের ইঙ্গিত দিবে, ব্যবসায়ীকে লক্ষ্মীর প্রাসাদ-ভবনের পথ নির্দ্দেশ করিবে। বাঙ্গালীর মিলিত চেষ্টা এই পত্রিকার ইঙ্গিতে চলিলে দেশের সব চেয়ে বড় অভাব ঘুচিবার আশা হইবে। এ পত্রিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

আরতি।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের 'আমার

পরীক্ষা গ্রহণ'—আলোচনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পড়িয়া দেখিতে বলি। লেখক বি-এর উত্তর-পত্র-পরীক্ষক। পরীক্ষার্থীদের ভাষার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। পড়িয়া চোখে জল আসে। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা, সাহিত্য ও রচনা-রীতি কি-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সন্ধান কখনো লইয়াছেন কি?

প্রকৃতি। ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৩।

বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্বের কথাই এ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

কারবারী। ২১ শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সাপ্তাহিক পত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। এ সংখ্যায় 'ছাপাখানার কথা' উল্লেখযোগ্য; প্রেশ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। প্রবন্ধটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। এত সংক্ষিপ্ত না করিয়া আরো একটু বেশী ছাপিলে ভালো হয়।

গন্ধবণিক। শ্রাবণ, ১৩৩৩।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধুর 'শাক' বেশ উপাদেয় হইতেছে। 'নানা কথায়' খুলনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্তের 'মল্টেড্ মিল্ক' নামক শিশু ও রোগীর খাদ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া গন্ধবণিক ছাত্রাবাসের পরিচয় পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। কলিকাতায় গন্ধবণিক ছাত্রদের বাসের সুবিধার জন্য এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাসিক ভাড়া শীট্ পিছু দ্বিতলে ২৷৷০, একতলায় ২৲ টাকা। বড় বাড়ী ঘরের মেঝে মর্ম্মর-প্রস্তর মণ্ডিত। পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যাদি আছে। ছাত্রাবাসটি কেবল উচ্চশিক্ষালাভেচ্ছু যুবকগণের জন্য। ৪৫।বি।১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের কাছে শীটের জন্য গন্ধবণিক ছাত্রদিগকে পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। খুব সাধু অনুষ্ঠান। হায়, ব্রাহ্মণ সভা, কায়স্থ সভা, তোমরা ঐ বক্তৃতাই দাও, আর তার রিপোর্টই ছাপিতে থাকো, কাজে হাত দিয়ো না!

গ্রন্থ-সমালোচনা

—০—

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক ছন্দে অনুদিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা। সর্ব্বপ্রকার আচার ও ভেদ-নীতির অন্তরালে মানব-চিত্তের আসল রূপটি যে বিভেদ-বিহীন, একই সুখ-দুঃখের দোলায় দোদুল হয়, প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য তাহাতে নাই, ইহার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা সাহিত্যে। সেই বন্ধু-প্রীতি, মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, প্রিয়ার প্রেম, মায়া, মমতা, ভক্তি, মানব-চিত্তের চিরন্তন বৃত্তি,—সে বৃত্তি পলিটিক্সের গণ্ডীর বাহিরে আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল, এ সত্যটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে, যখন আমরা সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্বদেশেই সুধী-সম্প্রদায়ে তাই সাহিত্য-চর্চ্চার এত আদর, এবং দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের অপরিসীম। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার দুইটী শ্রেষ্ঠ উপায় আছে। এক, সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা, আর, সাহিত্যানুবাদের দ্বারা। অপর

সাহিত্যের অনুবাদে,—অবশ্য বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া এ অনুবাদ করিতে হইবে—সাহিত্যের পুষ্টি অনিবার্য্য। ইহার দ্বারা অপর সাহিত্যের সহিত ঘরের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হয় এবং অপর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের পরিচয় পাইলে তাহা আহরণ করিয়া ঘরের সাহিত্যকেও তুল্য সম্পদে বিশিষ্ট করিয়া তোলা যায়। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন কাব্যের নানা ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। আধুনিক ফরাসী, রুশ, জর্ম্মান সাহিত্যের অনুবাদও বিভিন্ন ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছে; এবং তদ্বারা ঐ সকল সাহিত্য সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত বহু নাটক কাব্যও ইংরাজী জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হইয়া ঐ সকল ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতিরও ইংরাজী ও অপর পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। অনুবাদের ফলে আর একটা লাভ হয় এই যে এক জাতি সাহিত্যের মারফৎ অপর জাতির চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় পায় এবং পরস্পরের মধ্যে সহানু-ভূতিও সেই সূত্রে জাগরিত হয়। পলিটিক্সের দিক দিয়া এ এক মস্ত লাভ। হয়তো কালে এই সাহিত্যের মারফতেই বিরাট বিশ্ব-মানবতার সৃষ্টি হইবে। সাহিত্য সভ্যতার মাপকাঠি। প্রাচীন ক্লাসিক-সাহিত্যের অনুবাদ হইতে আমরা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সভ্যতা-বিকাশের পরিচয় পাই। এ পরিচয় মনোবৃত্তির সংস্কারে প্রভূত সহায়তা করে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতির জ্ঞান, কবিত্ব-শক্তির যে পরিচয় পাই, তাহা অসীম আনন্দ দান করে। হোমার-ভার্জ্জিল, সাদী-হাফেজ, ওমর-খৈয়াম প্রভৃতি মনীষীগণ সেকালে যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তার অনুবাদ যেমন বাংলা সাহিত্যে শুধু আদরণীয়ই নহে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ বর্দ্ধিত করিবে, তেমনি শকুন্তলা, 'মেঘদূত' প্রভৃতিও অনুদিত হইয়া যে-কোনো সাহিত্যের গৌরব ও সম্পদ বর্দ্ধিত করে। সকলের পক্ষে সকল মূল ভাষা শিখিয়া ঐ সব ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যের পরিচয় লওয়া সহজ ব্যাপার নহে; এক্ষেত্রে অনুবাদ-সাহিত্য ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রাচীন পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য আজ সর্ব্বজনবিদিত। ইংরাজী ভাষার কল্যাণে ওমরের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু ইংরাজীতে ওমরের পরিচয় পাইলেই সব পাওয়া হয় না—ওমরের কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন, তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের ভাব-সম্পদও সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। ওমরের কবিতার প্রথম বাংলা তর্জ্জমা করেন ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী মূল পারস্য হইতে। বহু বৎসর পূর্ব্বে ভারতীতেই তাহা ছাপা হয়। ৺ লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় ও বাংলা ছন্দে ওমরের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেন, তাহাও ভারতীতে বাহির হয়। তার বহু বর্ষ পরে ওমরের বঙ্গানুবাদ দু-একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্ত। সম্প্রতি সুকবি সর্ব্বজন-প্রিয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব বাংলা ছন্দে ওমরের কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। এ বইখানি প্রকাশ করিয়াছেন বাংলার সুবিখ্যাত প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। বহিখানি সুবৃহৎ; বহু ত্রিবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত, আকার প্রকাণ্ড—ছাপা বাঁধাই প্রভৃতির দিকটাও এত পরিপাটী যে এ বহিখানি শুধু ভাবের দিক দিয়াই নয়, সর্ব্বদিক দিয়াই পরম মনোরম ও লোভনীয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব বহিখানির মুখবন্ধে ওমর খৈয়ামের জন্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—'পারস্যের খোরা-শান প্রদেশের নৈশাপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল; আন্দাজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল, গীয়াসুদ্দিন উমর্ আবুল ফতে ওমর বিন্ ইব্রাহিম্ আল

খৈয়াম। ওমর একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবে তিনি জন-সাধারণের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন...তাঁর কবিতাবলীর বহুল প্রচার থাকা সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ রোবাইএর মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম-বিধির প্রতি একটা অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল...ওমর স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি দেশের প্রচলিত শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছলেন। জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী বলে তাঁর যে দুর্নাম আছে, ফরাসী লেখক নিকোলা তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে তিনি সুরা ও সাকারী রূপকের মধ্যে সেই অরূপেরই সন্ধান দিয়াছেন,...তিনি দেশের যুক্তিহীন অসার ধর্ম্ম ও তার মিথ্যা-উপাসনার ভণ্ডামি নতশিরে সহ্য করেন নি—প্রকৃত সত্যসন্ধানীর মত ঐ-সকল কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ...তাঁর রচনা থেকে এ'কথা বোঝা যায় যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতেন,—এবং অদৃষ্ট-বাদী ছিলেন। ওমরের যে কয়টি অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তার মধ্যে ফিট্‌জিরাল্ডের অনুবাদই অধিকাংশ সুধীর অনুমোদিত। —এই ফিট্‌জিরাল্ডের অনুবাদকেই নরেন্দ্র বাবু গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে সুকবি; ছন্দের উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা—তাঁর রচনা সকল সময়েই প্রাণবন্ত, কাজেই তাঁর এই বাংলা ছন্দানুবাদে তিনি ওমরের কবিতার প্রাণটুকুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন আগাগোড়া। তাঁর ছন্দ-লীলায় সজীবতা আছে, ঝঙ্কার আছে এবং ওমরের ভাবটুকুকে শতদলে বিকশিত করিয়া তিনি তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁর অনুবাদে কোথাও জড়তা, বা অস্পষ্টতা নাই। তাহা আগাগোড়া স্বচ্ছ আবেগময় ও মর্ম্মস্পর্শী—কোথাও অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না! দু-একটি নমুনার লোভ ছাড়িতে পারিতেছি না। ফিট্‌জিরাল্ডের ইংরাজী অনুবাদ—

Indeed the Idols I have loved so long
Have done my credit in men's eyes
much wrong;
Have drown'd my Honour in a shallow
Cup,
And sold my Reputation for a Song.

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ :—

ভালবেসে এতকাল যে প্রতিমাদলে
কুহকিনী কল্পনার ছলে
ভেবেছিনু জীবনের শ্রেয়;
তারাই আমারে আজ করেছে গো লোক-চক্ষে
হেয়!
ক্ষুদ্র এক পানপাত্রে ডুবে গেছে সম্ভ্রম আমার।
সঙ্গীতের সুস্বর ঝঙ্কার
শ্রবণে ভরিয়া অবিরাম
বিকায়ে দিয়েছি মোর জগতের যা-কিছু সুনাম।

আর একটি অনুবাদ,—

মন্দিরে কি মসজিদে ভাই,
প্রভেদ কিছুই নাই;
উভয় গৃহেই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই!
ক্রুশের-প্রতীক, কোষাকুশী
কিম্বা জপের মালা,—
শঙ্খ প্রদীপ ধূপ-ধুনা বা
চেরাগ-বাতি জ্বালা—
সকলই সেই একজনেরই
পূজার উপচার,
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চ্চনা হয় যাঁর!

আর-একটি,—

নওরোজে আজ নূতন সুরে
ওরে আমার চিত্ত পুরে
উঠছে জেগে লোভ।

ফেলে-আসা-জীবন-পথের অতৃপ্ত সব ক্ষোভ
দিচ্ছে মনে সাড়া ;
ভাবের দুলাল হৃদয় আমার সদাই লক্ষ্মীছাড়া
উধাও হয়ে যায়,

নির্জ্জনতার শান্তিটুকু যেখানটিতে পায়।

ওমরের কবিতা আমাদের এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমি, এখানে এই কাজের ছুটাছুটি—এ-সব ভুলাইয়া দেয়, চিত্তকে এক অলৌকিক মাধুর্য্য-রসে ভরাইয়া তোলে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ওমরের যে ছন্দানুবাদ করিয়াছেন তাহাও আমাদের কাজ ভুলাইয়া মন গলাইয়া এক স্বপ্নমধুর কাব্যলোকে উধাও লইয়া চলে! যে কয়খানি বাংলা ছন্দানুবাদ বাহির হইয়াছে, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের ছন্দানুবাদ শ্রেষ্ঠ- তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুলিতে মূলের রস অনুপম মাধুর্য্যে ভরপুর আছে—সমস্ত কবিতাগুলিই বৈচিত্র্যে উপভোগ্য। তার উপর ছবি। অসংখ্য ত্রিবর্ণ ছবিতে সোনায় সোহাগা হইয়াছে। প্রকাশক মহাশয় ভিতরের মাধুর্য্যটুকু বাহিরের বৈচিত্র্যে শোভায় অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন—অজস্র অর্থব্যয়ে। সকল দিক দিয়া বহিখানি এমন চমৎকার হইয়াছে যে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে এ বহিখানি হাতে লইয়া আমরা সগর্ব্বে দাঁড়াইতে পারি। এবং এ কথাও অসঙ্কোচে বলিতে পারি, এত বড় এবং এমন সৌষ্ঠব, এতখানি ভাব-সম্পদের জন্য চারিটি মাত্র টাকা মূল্য,—তারিফের বস্তু। আশা করি, বাঙ্গালী মাত্রেই—অবশ্য যাঁরা কবিত্বের মর্ম্ম বোঝেন এ গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া প্রিয়তমাকে উপহার দিবেন।

নির্ম্মাল্য

শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ. প্রণীত। কলিকাতা, এলম্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একটু ভূমিকা আঁটিয়া দিয়াছেন—তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—'এই কবিতাগুলির মাঝে মাঝে বেশ উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা ও কবিত্ব আছে—তাহাতে দেবী ভারতীর আশীর্ব্বাদের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম, যেটুকু ভাবুকতা ও কবিত্ব তাহা একান্ত পরস্ব অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ধার করা। সাহিত্যে ধার করিয়া কারবার চলে না। নিজের মূলধন থাকা চাই। লেখকের তার অভাব।

কৌতুক-যৌতুক।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মুদ্রাঙ্কিত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। সাহিত্যে যে কয়টি রস আছে, হাস্য-রস তার মধ্যে প্রধান না হৌক, তুল্য-মূল্য বটে! হাসাইবার শক্তি বড় সামান্য শক্তি নয়! কাতুকুতু দিয়া বা ভাঁড়ামি করিয়া হাসানো নয়, বিশুদ্ধ কৌতুক-রস সাহিত্যে যে শুভ্র সংযত হাসির ধারা বহিয়া আনে, তাহাতে মন পরিশুদ্ধ হয়, সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রস-রাজ অমৃতলালের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁর রচিত 'বিবাহ-বিভ্রাট' বাঙলার শ্রেষ্ঠ প্রহসন। তাঁর রচিত 'বাবু', 'রাজা-বাহাদুর' 'গ্রাম্য বিভ্রাট' 'একাকার',-'সাবাস আটাশ' 'খাস-দখল' প্রভৃতি প্রহসন কৌতুকনাট্য, পঞ্চরংগুলি অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক—যে কোনো ভাষায় অনুদিত হইলে, সে ভাষার সাহিত্যকে বিভূষিত করিবে। তাঁর ব্যঙ্গ-রঙ্গ শুধুই হাসির ফোয়ারা, এ কথা বলিলে ঠিক হইবে না। সে হাসির ধারায় চিন্তাশীলতার এমন সুন্দর নিপুণ সমাবেশ—হাসি ও চিন্তায় মিলিয়া যেন গঙ্গা-যমুনার সৃষ্টি করিয়া চলে। এ বহিখানিতে গল্প ও কবিতাচ্ছলে অনেকগুলি সরস রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে হাসি আছে, চিন্তাশীলতা আছে—তাছাড়া আছে বাংলার বহু প্রাচীন আচার-রীতির মনোজ্ঞ কাহিনী, বাংলার পল্লীর স্নিগ্ধ মধুর ছবি, আর কত হারানো স্মৃতি, ইতিহাসের কত সে সম্পদ-কণিকা! আভাষে-ইঙ্গিতে লেখকের স্বদেশ-প্রীতি স্বজাতি-প্রীতি হীরক খণ্ডের

মত তাহাদের মাঝে মাঝে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে বহিখানি অমূল্য সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। প্রথমেই গ্রন্থখানির উপহার-পৃষ্ঠ। রসরাজ বাঙলাদেশের মহিলাকুলের হাতে বহিখানি সাদরে উপহার দিয়াছেন—

অক্ষয় কঙ্কণ করে সীঁথিতে সিঁদুর।
বিছানায় ছানাপোনা, ভাঁড়ারে ইঁদুর॥
অন্নপূর্ণারূপে আলো কর রান্নাঘর!
চক্ষে যেন লক্ষ্মী দেখে নিত্য তোমার বর॥
শাশুড়ী শ্বশুর বুঝুন বৌয়ের যশ!
হোক দাসদাসী সব মিষ্টভাষে বশ॥

বাঙলার মেয়ের এর বাড়া বড় আশীর্ব্বাদ আর কি আছে! হাসির ভিতর দিয়া সমস্ত দেশের Spiritটুকু এই কয় ছত্রে কি সুন্দর ফুটিয়াছে! ছোট্ট একটু ইঙ্গিতে অনেকখানি আভাষ জাগানো একটা উচ্চাঙ্গের আর্ট—বিশেষ সাহিত্যে। সেই আর্ট এ বহিখানির প্রত্যেকটি রচনায়। 'কৌতুক-যৌতুকে' সাতটি কবিতা ও তেরোটি গদ্য রচনা আছে। গদ্য রচনাগুলিতে গল্প আছে প্রচুর, আর আছে দেশের পলিটিক্স, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং আরো বহু প্রয়োজনীয় কথা। রচনার ভাষা ও ষ্টাইল স্বচ্ছ ঝরঝরে। তার মধ্যে গবেষণার হুঙ্কার নাই, বা পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। রহস্য-রস প্রচুর আর মস্ত বিশেষত্ব এই যে সে প্রাচুর্য্যের মধ্যে এতটুকু বিলাতী ভাব মেশে নাই—খাঁটী স্বদেশী। প্রথম কবিতা 'আমের ধুমধাম'। অমৃতলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন—

সস্তায় অবস্থা 'ভুলে' কেনে লোক দেনা তুলে
খরচে সহরে লোক খুব ডাকাবুকো।
... ...
দয়া করে ভগবান, দেচেন অমৃত দান,
ঘৃত দুধ চিনি মেলে খেলে এক আম।

স্বপ্নলোকের কবিত্ব ইহাতে নাই, আছে ভীষণ বাস্তব; কিন্তু মন একেবারে এ কবিতার ছত্রে ছত্রে বিমুগ্ধ হইয়া অমৃতলালের প্রতিভার পায়ে পুষ্পবর্ষণ করিতে চায়। তারপর লেখকের জাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া কেমন ফুটিয়াছে, দেখুন—

দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেরোনা থাবা,
করোনাকো প্রিজার্ভের পথ-আবিষ্কার।
জাহাজ চড়িলে মাঙ্গো পছন্দ করিলে অ্যাঙ্গো,
তাম্রেতে পাব না বাঙ্গে আম্রের সুতার।

ইহার উপর টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। 'শারদা-মঙ্গল' কবিতাটিতে বঙ্গে শরৎ-শ্রীর যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহা শুধু মৌলিক নয়; তার ছত্রে ছত্রে শিউলির গন্ধ ছুটিয়াছে, আর শুভ্র শোভার কবিতাটী ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে। দুটী ছত্র আমাদের অত্যন্ত মিষ্ট লাগিয়াছে—

কাপাস গাছে ফুল ধরেছে ভরবে তুলার ফল।
তাই নে সতী কাটবে সুতো ঘুরিয়ে চরকা-কল॥

তারপর 'ইলিশ।'—অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

চকচকে চাকা চাকা সিকি ঢাকা অঙ্গ।
কালাপেড়ে দাঁড়াখানি তনু ধনু-ভঙ্গ॥
... ...

চোখের সামনে 'ইলিশকে' মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমনিভাবে কোন কবিতাটিই উপেক্ষার নয়; বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে ভরপূর। 'পতিত ডাক্তার' গল্প। গল্পটির প্রতি ছত্রে কৌতুক-রস প্রচুর, আর শেষের দিকে যে করুণ রস আপনা হইতে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহা মন হইতে মুছিয়া যাইবার নয়। 'মুৎসুদ্দির' পরিচয় লেখক দিয়াছেন—'মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান এদেশে কোম্পানির আমলের এক নূতন সৃষ্টি। তখন এত বড় বড় সব ব্যাঙ্ক ছিল না, দেশী মহাজনেরা দেশীয় অন্যান্য লোকের সহিত সাহেবদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দৈব-পুরুষ ভাবিলেও তাঁহারা যে ব্রাহ্মণেরই ন্যায় নিঃস্ব, আশীর্ব্বাদমাত্র-সম্বল, এইরূপ একটা ধারণা করিয়া ছিলেন। মহাজনরা ভাবিতেন যে 'এণ্ড কো' সাহেবদিগের পিঠে কোট আর মাথায় হ্যাট মাত্রই

ভর্সা, জাহাজে চড়িলেই সব ফর্সা! সুতরাং সরাসরি সাহেবকে কেহই ধারে মাল দিতেন না। মুৎসুদ্দি হইতেন ধনখ্যাতিলব্ধ অট্টালিকাবাসী সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী। তাঁহারা guarantee (দায়ী) হইলে মহাজন মাল ছাড়িত। বরফের সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন, বরফ তখন আজকালকার মত সুপ্রাপ্য ছিল না। মুটে মজুরে তখন বরফ খাইতে পাইত না।... কলিকাতার এখন যেখানে ছোট আদালত আছে, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে একটা বাড়ী ছিল, তাহার নাম Ice house বা বরফ গুদাম। ঐ বাড়ীটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় এক আমেরিকান কোম্পানীকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। সর্ত্ত ছিল যে বারো মাস তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে বরফের সরবরাহ রাখিতে হইবে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ক্রেতায় বরফ কিনিতে পারিবে, সাধারণ মূল্য দু' আনা সের। মজুদ মাল কমিয়া আসিলে নেহাৎ চার আনা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবে, ইহার উপর কখনো নহে। পণ্ডিত ডাক্তার সেকালের হাতুড়ে ডাক্তার হইলেও তার যে দরদী চিত্তের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। সে মূর্খ ডাক্তার, প্রেশ ক্রপশন লেখক ঔষধ-কিনিয়া আনে। তার সঙ্গে সঙ্গে বেদানাও কিনিয়া আনে, গিন্নিকে জোর করিয়া খাইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে (রোগীর) শিয়রে বসিয়া বাতাস করে। তার পর রোগীর মৃত্যু হইলে খাটের এক কোণ ধরিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসে। 'কৌলিক দুর্গোৎসবে' প্রাচীন বাংলায় উৎসবের সেই অনাবিল আনন্দ স্রোত, সেই প্রাণখোলা মেশামিশি, 'যোদ্‌দা' গল্পে সেই উদার আত্মভোলা বাঙালীর এমন নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন যে দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। যোদ-দা বস্তুটি কেমন? লেখক বলেন, চেষ্ট, চেষ্ট এণ্ড মোষ্ট মিষ্টি'! খাসা বর্ণনা। বিদ্যা অমূল্য ধন— আলোচনাটী বাংলা দেশের যত স্কুল কলেজের হলে বড় বড় হরফে লিখিয়া নোটীশের মত আঁটিয়া রাখিবার যোগ্য। মাতৃভক্তি গল্পটী আগাগোড়া কৌতুকরসে মণ্ডিত—তার মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, আধুনিক সভ্যতার প্রতি যে শ্লেষ, যে ব্যঙ্গ লেখকের লেখনীর মুখে বাহির হইয়াছে, তার মূল্য কষিয়া নির্দ্ধারণ হয় না। তরুণ নব্য বাঙালী ছেলের পোষাক-পরিচ্ছদ ও মেয়েলিভাব প্রভৃতির সম্বন্ধে লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন, ট্রামওয়ে যেতে যেতে মিনুর পাঞ্জাবি গায়ে, সোজা সিঁথি, শুঁড়তোলা জুতা, বই হাতে অনেক বাবাজীকে দেখে মনে মনে ইচ্ছা হয় যে জিজ্ঞাসা করি, 'বাছা, তুমি কোথায় পড়, বে'থুনে—না মহাকালীতে?'—চমৎকার! 'বিশ্বকর্ম্মা-পূজায়' লেখকের এই যে ইঙ্গিত,—'যামিনী বাবু, আপনার নলিন ছেলেটি যত আদরেরই হোক, যত-বড় ধনীর ছেলেই হোক, ছত্রধারী রাজার পুত্র নয়, এটি মনে রাখিবেন। পাটান না একটু তারে, চাকর তো বাড়ীতে ঢের আছে! কেউ তো বলবে না, আপনি গরীব! দিলেই বা বাবাজী তার পড়বার ঘরটা ঝাঁট, নে গেলেই বা দু বালতি জল তুলে দোতলায়। শ্রমটা যে নীচের কাজ, সে সংস্কারটা দূর হয়ে আর শরীরটাও বনে যাবে। বাড়ীতে তো রাজমিস্ত্রী লাগে, দেখবেন দিকি একবার মজুর-মজুরনীর শরীরের দিকে চেয়ে। কি স্বাস্থ্য, কি বুকের ছাতি, কি সুডৌল হাতের গুলি, সর্ব্বাঙ্গের গড়নে কি সৌষ্ঠব! তারা দুধ-ঘিও খেতে পায় না, 'ফাউল মটনও তাদের জোটে না।' এমনি কত ছত্র উদ্ধৃত করিব? এমনি রসাল ভাবে-ভরা উক্তিতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। বহু ছত্র একেবারে epigrammatic। এমন সুখ-পাঠ্য উপাদেয় সরস বহি বোধ হয় বাঙলার আর নাই! শিক্ষার সঙ্গে এতখানি আমোদ, মজার সঙ্গে এতখানি ভাবুকতা বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। 'রস' আর তার সঙ্গে হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। অন্য দেশ হইলে এক মাসে এ বহির প্রথম সংস্করণের হাজার কাপি নিঃশেষ হইয়া যাইত। বহিখানির রচনায়

আগাগোড়া একটা বিশেষত্ব এই যে এ বই একা পড়িয়া তত সুখ হইবে না! দু'পাতা পড়িলে মনে হইবে, বন্ধুবান্ধব ডাকিয়া মজলিস বসাইয়া এ বহি একসঙ্গে সকলে মিলিয়া পড়ি—আর তা করিলেই এ বহির রস আরো বহু সহস্রগুণ উপভোগ করা যাইবে। সামনে পূজার ছুটী—বাঙ্গালী মাত্রকেই আমরা বলিতেছি, ছুটীর দিনে এ বহিখানি সংগ্রহ করুন। যদি প্রবাসে যান তো একখানি সঙ্গে লউন,—ছুটীর অবসরকাল পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা একসঙ্গে বসিয়া এ বহি পড়িয়া শুভ্র সংযত হাসি হাসিয়া খুশী মশ্‌গুল্ হইয়া যাইবেন। এই সঙ্গে অমৃতলালের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আরো বহু বহু কাল এমনি হাসির তারে গাঁথিয়া এমনি কাজের কথা আমাদের তিনি শুনান্। দেবী ভারতীর বীণায় তাঁর সুর এমনি অম্লান এমনি মধুর, এমনি জাগরূক রহুক আরো বহু দীর্ঘ দীর্ঘকাল ধরিয়া!

অগ্নিশিখা।

শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস। জোসেফ হাটনের 'By order of the Czar' নামক বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। এ উপন্যাসখানি রুশে যুগান্তর আনিয়াছে। নায়িকা য়্যান্ বিশ্ব-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। লেখক লাইন ধরিয়া অনুবাদ করেন নাই। তাঁর অনুবাদে রস আছে, আবেগ আছে, ফলে উপন্যাসের রসটুকু কোথাও আহত বা পীড়িত হয় নাই। ঘটনার প্রবাহটি চমৎকার বহিয়া চলিয়াছে এবং অবান্তর চরিত্র ও বিষয় পরিত্যক্ত হওয়ায় বিদেশীয়ত্বটুকু সাহিত্যের রস উপভোগে মোটেই ব্যাঘাত জন্মায় না। ফেরারী, লসিনস্কী নাথান প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে যেমন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি বাঙলার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত পাঠক-পাঠিকার চিত্তকেও তারা স্পর্শ করিবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাইও পরিপাটী।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বিশ্বভাণ্ডার প্রেস—২১৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।